৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৬৬

সংবাদ-সাহিত্য

বিজয়া

গত ১লা সেপ্টেম্বর কৃষ্ণা অঘোর-চতুর্দশী হইতে ৩১শে অক্টোবর মহাঘোরা শ্যামা অমাবস্যা পর্যন্ত পুরা দুই মাসকাল ক্ষুদ্রতম বঙ্গদেশ অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা এবং বৃহত্তম বঙ্গ অর্থাৎ বিহার-উড়িষ্যা-আসাম ও পূর্ব-পশ্চিম বাংলার উপর দিয়া যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবিক অন্তর্ঘাতী দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বৈদেশিক আক্রমণের ঝড় বহিয়া গেল তাহাতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার একান্ত ভক্ত-সন্তান পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালীদের স্বতঃই মনে হইয়াছিল—জননী কুন্তীর মত মা-দুর্গা আমাদিগকে জলে ভাসাইয়া দিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। পরিত্যক্ত কর্ণের মত আমাদেরও মনে হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
> চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
> জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত,—আশাহীন
> কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
> শূন্য পরিণাম।···
> আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে···
> নামহীন গৃহহীন—····
> আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী,
> দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।

আমাদের এমনই দুরবস্থা যে মাত্র তিন লাইনে আমরাও জয় আশা নাম গৃহ দীপ্তি ও কীর্তি হারাইয়া ছয় ছয় বার হীন হইতে বাধ্য হইয়াছি। তাই থতমত হৃদয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহমনে নিতান্ত ঐতিহ্য বজায় রাখিতে আমাদের গ্রাহক পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা ও ভাল-মন্দ সমালোচকদের নির্জিত বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি। এই সর্বগ্রাসী তামসী অন্ধকারে আশার একটিমাত্র ক্ষীণালোক দেখিতে পাইতেছি—নেহরু কৃষ্ণমেনন থিমাইয়া কারিয়াপ্পা ডাঙ্গে নাম্বুদ্রিপাদ একজোট হইবেন স্থির করিয়াছেন; ভারত-শকুন শ্রীরাজাগোপালাচারীও প্রয়োজন ঘটিলে ধনুকধারী হইবেন, এমন কি কৃপালানীর কৃপা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না। আরও দু-এক টুক্‌রা ছোটখাটো ভরসাও পাইতেছি। সংবাদপত্রে যেরূপ চেল্লাচেল্লি চলিতেছে তাহাতে অতঃপর ভাক্‌রা-বাঁধে আর ফুটা হইবে না, কোক-আভ্‌ন আবার চালু হইয়া দুর্গাপুর শেষ পর্যন্ত বেকার বাঙালীর দুর্গতিনাশপুর হইবে, হলদিয়াতেও বাঙালী চোখে হলুদ সরষেফুল দেখিবে না। সর্বশেষ ভরসার কথা—বিমানচারী তারকাদের, আমাদের এই বিপর্যয়ে শুধু দূর নিম্নে পঙ্কিল মাটিই দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাঁহারা সহৃদয়তার সহিত অনুভব করিয়াছেন এবং হয়তো ফ্ল্যাশব্যাকে দেখিয়াছেন সে মাটি জলে ডুবিয়া গিয়া মৃত্তিকাবাসী মানুষের অশেষ দুর্গতিরও কারণ হয়।

তাঁহাদের কন্টিনিউয়িটি একটু বিপর্যস্ত হইলেও আমাদের কন্টিনিউয়িটি বজায়ে তাঁহারা সহায় হইতেছেন।

গোপালদার বিজয়া

বিজয়ান্তে লহ নমস্কার।
খুলিয়াছে উত্তর দুয়ার।
আর বন্ধু ভয় নাই, নীলগিরি আলতাই
ক্রমে ক্রমে হবে একাকার।
কেবল বিরল-জ্যোতি? কী বল তাহাতে ক্ষতি,
হবে বঙ্গ জ্যোতির ভাণ্ডার!
পীতে ও তামাটে মিলে খাবে সারা বিশ্বে গিলে,
ফল্গু-তুস্কো হবে ছারখার।
দ্বিসহস্র বর্ষ পরে মিলন আসিছে ঘরে,
বৃথা কেন করিছ চিৎকার?
করেছ যে কোলাকুলি এখুনি তা গেলে ভুলি—
দশ বর্ষ হয় নাই পার!
লাডাকে গা-ঢাকা দিয়ে আসে বঁধু, ধর গিয়ে
ওগো বধূ, চরণ তাহার।
ঘরেই পুষিছ দূতী বৃথা আজ খুঁতখুঁতি
এল কাল বাসক-সজ্জার।
বিজয়ার শেষ নমস্কার—
সবারে জানাই শেষবার॥

"ডাইং অ্যাণ্ড ক্লিনিং"

গোপালদা বিজয়ার নমস্কারের সঙ্গে একটি "বন্ধা-বন্দনা" ও একটি নিরেট হেঁয়ালি ছাড়িয়াছেন। এই থান-ইটের ঘায়ে আমাদের ধোলাইকামী পাঠকেরা আহত হইবেন বুঝিতেছি, তবুও আমরা নাচার। গোপালদাই এটির শিরোনামা দিয়াছেন "ধোলাইখানা"—

খুলেছি জুতোর দোকান, রেস্তোরাঁ—আর
ধোলাইখানা।
কেন তা জানো সবাই, মুখে আমার
বলতে মানা।
ছাতাওয়ালা গলি ছেড়ে,
সাজিয়ে ধোলাইখানা বেড়ে
ব্যাঙের ছাতার মত বেড়ে
ছেয়েছি এ শহরখানা।
কেন তা জানো সবাই, মুখে তা ভাই,
বলতে মানা॥

শুরুতে মুকতলাতে সেঁধিয়ে, ছিলাম
চরণ-তলায়,
মাঝেতে 'চিকেন' ও 'প্রন' বানিয়ে, দিলাম
গলায় গলায়।
চরণ ধরি, উদর ভরি
কণ্ঠে পরাই মিলন-দড়ি;
শেষটা দেব ধোলাই করি
তোমাদেরো মনের মলায়।
মিলেছিলাম পায়ে-পেটে, রইব সেঁটে
গলায় গলায়॥

শু-মেকার আর সূপকার, তারো পরে
বদলেছি ভোল,
ধোপা সেজে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে
বাধাচ্ছি গোল।
লাল শালুতে নামটি লিখে
আগুন জ্বালি দিকে দিকে,
হাঙ্গামাটা হলেই ফিকে
ছুঁড়িয়ে মারি সোডার বোতল—
তোমাদেরি গুণ্ডা ধ'রে মোড়ে মোড়ে
বাধাচ্ছি গোল॥

ধোলাইখানার ভড়ং দাদা, রইবে নাকো
আর বেশীদিন,
তোমার ঘরেই গজাবে ভাই, লাখো লাখো
হো-চী-মিন।
ফ্যালফেলিয়ে দেখবে চেয়ে
ধোলাইখানায় কসাই যে এ!
কান পেতে শোন, আসছে ধেয়ে
ফা-হিয়ানই শুধতে যে ঋণ—
ধোলাই-এর ফুরবে কাজ, পাবে যে রাজ
হো চী মিন॥

আয় তোরা আয়, চা খাবি কে, এ মজার
ধোলাইখানা,

প্যাঁজই তো শেষাশেষি হয় পয়জার—
বলতে মানা।
নতুন ফয়ার নতুন বাণী
শেখাব, তা আমরা জানি ;
করিস্ নে ভাই, কানাকানি
কারণ পাশেই আছে থানা।
এসেছি কাছা [illegible], তৈরি আছি
বলতে মানা॥

ন্যা-বন্দনা"

গোপালদার "বন্যা-বন্দনা" মোটেই দুর্বোধ্য নয়, তবে জ্ঞান-ও-প্রগতি-বিরোধী। মনে হয় গোপালদা প্রকৃতিকে -হ্যাণ্ড দিবার পক্ষপাতী। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—ণবিক বোমা, রকেট, স্পুটনিকের যুগে এই পিছন-টার প্রবৃত্তি সমর্থন-যোগ্য নয়। বন্যাকে সম্বোধন রিয়া গোপালদা বলিতেছেন—

বন্যা গো বন্যা,
ওগো বিগলিত ছোট—নাগপুর-কন্যা!
মারে ডি. ভি. সি. বাঁধে বাঁধিয়া পড়েছে ফাঁদে
যত ব্যাটা ইঞ্জিনী-ইয়ার, তু ধন্যা
ময়ূরাক্ষীর চরে অজয়ে ও দামোদরে
চিরদিন চিরকাল সুখে বহ বন্যা।

তোমারে ঘাঁটাতে গিয়ে হায় রে,
চ পরি-কল্পনা-দক্ষেরা মাথা-কাটা-ছাগমুণ্ডিত হয়ে যায় রে!
ভৈরবে হাঁক দিয়ে ছুটে আস ভীমনাদে তন্বী,
গৈরিকা নহ আর, তুমি যেন তরলিত বহ্নি।
সিমেণ্ট-লৌহ-ইট সে আগুনে সবি চিট্,
তুমি কারো বশ নও, তুমি নও পাচশালা-পণ্যা।
এলোকেশী তব তোড়ে ভাসিয়ে মশান-জোড়ে,
তিলাইয়া মাইথনে, এসো হয়ে বন্যা।

গোপালের নিবেদন পায় তোর—
ভেঙে ফেল্ শৃঙ্খল, বাজুক চরণে চারু রুমুঝুমু পুরাতন
পাঁইজোর।
ডি. ভি. সি.রে ভয় তার? ভিনি-ভিডি-ভিসি যার মন্ত্র,
জীমূত সহায় যার মানিবে সে কেন বল, মানুষের
বন্ধন-যন্ত্র!
যাহা খুশি কর্ তোর শুধু এ মিনতি মোর,
গরীবের ভিটে আর ধেনো জমি বাদ দিয়ে বাকী
সব ভাসাস্, অনন্যা।
লোহা-লক্কড় নিয়ে বিজ্ঞানে জ্ঞান দিয়ে
ছুটে চল্ অবিরল খলখল বন্যা॥

বিজ্ঞানের প্রয়োজন

গোপালদার বিজ্ঞান-বিমুখতা সত্ত্বেও দেশগঠনে বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। 'হোয়াটেভার ম্যান হ্যাজ ডান্ ম্যান ক্যান ডু'—মানুষ যাহা করিয়াছে মানুষ তাহা করিতে পারে—বর্তমান বৈজ্ঞানিক মানুষ তাহার উপরেও জোর গলায় বলিতে পারিতেছে, মানুষ যাহা কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই, মানুষ তাহা করিতে পারিতেছে; পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ, গভীরতম সমুদ্রতল, নিবিড়তম অরণ্য-ভূমি, দুর্গমতম মরুপ্রান্তর এ সকলই মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জয় তো করিয়াছেই, অসীম শূন্যলোক অতিক্রম করিয়া গ্রহান্তরেও সে পৌঁছিল বলিয়া। ইতিমধ্যেই মৃন্ময়-মানুষ প্রায় চিন্ময়-গতি আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছে। ব্যাধি-মহামারী প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া অকালমৃত্যু অনেকটা নিবারণ করিয়াছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-টাইফুন অতিবর্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকৃতির উন্মত্ত শক্তিকে কুক্ষিগত করিতে পারিলেই মানুষ সভ্যতাসঞ্জাত ব্যাধি, ইনস্যানিটি ও করোনারি থ্রম্বসিসের সঙ্গে যুঝিতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানকে দূর-ছাই করা আমাদের পক্ষে সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। শ্রীনেহরু পঞ্চকোট (পাঁচেট) বাঁধ উদ্ঘাটন করিবেন, ফরাক্কা বাঁধের ভিত্তি স্থাপিত হইবে, এই সকল একান্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-কর্মকে আমরা গোপালদার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সত্ত্বেও স্বাগত জানাইব।

এ যুগের পাঠকেরা না জানিতে পারেন, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যাঁহারা 'শনিবারের চিঠি'র পাঠক ছিলেন তাঁহাদের রামদাদাকে মনে পড়িবে। রামদাদাই সর্বপ্রথম গড়ের মাঠ হইতে অশ্বারোহী উটরাম সাহেবের অন্তর্ধান ও তৎসহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। রামদাদা ১৯০৮ সনে মানিকতলা বাগানে বারীন্দ্রের বোমার দলে ধরা পড়িয়াছিলেন, পরে মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য হাজত হইতে ছাড়া পান। মাঝে মাঝে "লুসিড্ মোমেণ্ট" আসিত, তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া অতি গভীর দর্শন ও বিশ্বাসের কথা বলিতেন। তখন তিনি কবি ও দ্রষ্টা। এইরূপ এক সময়ে তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন (১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে)—

পরশু রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অন্ধকার ঘরের জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেশের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম। মনে হইতেছিল এই শাপভ্রষ্ট জাতির দুর্ভাগ্যের শেষ কখনও হইবে না। বংশে বংশে যুগে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল সামাজিক পাপ করিয়া আসিয়াছেন, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা দেশের দীনহীন মানুষকে প্রতিদিন পীড়ন করিয়া, অপমান করিয়া, স্বাধীনতার পথে যে প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, সে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ করে নাই, পাপের বোঝা ভারী হইয়াই চলিয়াছে। বহু যুগের দুর্বুদ্ধির ফলে জাতির যে দাসত্ব, একদিনের মায়ামন্ত্রে তাহা দূর হইতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা নিরর্থক জাতিহিংসা করিয়া গুপ্ত ঘাতকের মত পথে পথে বিচরণ করিয়া নিরীহ মানুষের রক্তপাত করিয়াছি। স্বাধীন হইবার পথ ইহা নহে। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনের দেবতাকে যেন সেখানে দেখিতে পাইলাম। জোড়-করে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, প্রভু, পথ দেখাইয়া দাও। শুধু আমাকে নয়; বারীন, উপেন, কানাই, উল্লাস, সত্যেন, হেমচন্দ্র সকলকেই। আমার অপরিচিত যাহারা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অন্ধকার গুহায় অথবা গভীর অরণ্যে, বার্লিনের রাজপথে অথবা মস্কোর চা-খানায় সাধনা করিতেছে, মানুষ হইয়া মানুষকে হনন করিবার অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদের অজ্ঞানতা দূর কর। আমি আজ যেমন বুঝিতে পারিতেছি, সমস্ত জাতির স্বাধীনতা অপেক্ষা একটি মানুষের প্রাণের মূল্য বেশি, সকলের মনে সেই বোধ জাগ্রত কর। ভাবিতে ভাবিতে পূর্বকৃত পাপের জন্য আমার চোখ ফাটিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতে লাগিল। আমার সম্মুখে অন্ধকার আকাশের স্তিমিত নক্ষত্রগুলি স্তিমিততর হইয়া মিলাইয়া গেল। খানিকটা চোখের জল পড়িয়া মনের আবেগ যখন শান্ত হইল, তখন সহসা আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, কৃষ্ণাচতুর্থীর খণ্ডিত চাঁদ ম্লান আলো বিকীর্ণ করিতে করিতে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, শিশিরভারাক্রান্ত আকাশের উপর জ্যোৎস্না তুষারের মত দেখাইতেছে। আমি স্তম্ভিতভাবে শীতক্লান্ত পৌষ রজনীর সেই নির্জন শোভা দেখিতে লাগিলাম। অনন্ত নক্ষত্রলোকের তলদেশে আমাদের এই বিরাট পৃথিবী কতটুকু। তাহার পরিচয় কি। দিকে দিকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যে নক্ষত্রপাত হইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! মানুষের সুখদুঃখ স্বাধীনতা-পরাধীনতা বিরাট সমুদ্রবেলায় ক্ষুদ্র বালুকণার পিপাসা! অথচ এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানব একাই তাহার মনের ভিতর সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। যেখানে সে ক্ষুদ্র, সেখানে কাহারও সহিত তাহার বিরোধ নাই; যেখানে সে বৃহৎ, সেখানেই সে বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে। মস্কো জয় করিতে গিয়া মদগর্বিত নেপোলিয়ান হয়তো তাঁহার নিরীহ সৈন্যবৃন্দকে কীটপতঙ্গের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখেন নাই। দে[illegible] তাঁহার চলিত না। কিন্তু মানুষ যেখানে মানুষকে ভালবাসিয়াছে, শুধু চালনা করে নাই, সেখানে সে অত সহজে তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে নাই। বুদ্ধদেব মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানুষের কল্যাণ-চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা ছিল না, স্বস্তি ছিল না। বুদ্ধদেব কি মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন? না। তিনি মানুষকে মৃত্যুর অতীত মৃত্যুর চাইতে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। আমিও এক মুহূর্তের জন্য সেদিন যেন মানুষকে মৃত্যুর চাইতেও মহৎ বলিয়া দেখিতে পাইলাম। মনে হইল বৃথা দ্বন্দ্ব, বৃথা বিরোধ। তফাত নাই। কাহার স্বাধীনতা কে কাড়িতেছে!—

গোপালদা এই রামদাদারই অনুজ, তিনিও কবি এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। রামদাদা যখন মারা যান, গোপালদা তখন বার্লিনে মস্কোতে বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখার্জি

রেন্দ্র ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র রায়) ও অ্যাগ্নেস স্মেড্‌লির লে বিপ্লবের তালিম লইতেছিলেন। দেশে ফিরিয়া াদার বিক্ষিপ্ত ও অসমাপ্ত ডাইরি পড়িয়া তাঁহার তিগতির পরিবর্তন হয়। তিনি আবার নিরুদ্দিষ্ট হন। রে জানিতে পারি তিনি লাসায় গিয়া বজ্রধর-সম্প্রদায়ভুক্ত লামাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অলৌকিক াক্তির অধিকারী হন। আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের নালন্দা, ালিনে দীর্ঘকাল বাস ও শিক্ষা তাঁহার পক্ষে নিষ্ফলা য়। অলৌকিককে অধিগত করিতে গিয়া তিনি লৌকিক বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়েন। গোপালদাকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এই ব্যাকগ্রাউণ্ড বা পটভূমিকার পরিচয় প্রয়োজন ছিল। কাজেই গোপালদার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানকে আমরা উপহাস করিতে পারি না। যদি ভারতবর্ষে আবার এমন দিন আসে যেদিন রামদাদা গোপালদাদারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন এবং রুশ-রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণ মধ্যপথেই খণ্ডিত হইবে তখন বিজ্ঞানবিমুখ হইবার অবকাশ আমাদের যথেষ্ট মিলিবে। আপাততঃ আমরা ইহা ভাবিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছি যে, মানুষ, সে যেখানকার মানুষই হউক, শূন্যজয় করিতে সক্ষম হইয়াছে, শিশু-রূপকথার গোড়ার ছড়াটি—"আয় চাঁদ টি দি' যা" আজ শিশুদেরও হাসির খোরাক যোগাইতে চলিয়াছে; অচিরকালমধ্যে রুশ বৈজ্ঞানিক বারবাশোভ সকল কবি-কল্পনা-ও-কৌমুদীমহিমাসহ আমাদের চিরপ্রিয় চাঁদা-মামাকে বাড়বানলে নিক্ষেপ করিবেন। কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' এবং মহাকবি শেক্সপীয়রের 'মিড সামার নাইটস ড্রিম' স্ক্র্যাপ হইতে আর বিলম্ব নাই। জেসিকারা আর "ইন সাচ এ নাইট অ্যাজ দিস" বলিয়া স্মৃতি-রোমন্থনে মিথ্যা স্বপ্নজাল বুনিয়া পোসিয়াদের চিত্তচমৎকার ঘটাইবে না, রবীন্দ্রনাথেরাও আর "আজ শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী, স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি" গান গাহিয়া বিরহীর দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘতর করিবার সুযোগ পাইবেন না, শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িতেই থাকিবে, সুসময় আর আসিবে না।

সুতরাং, ময়ূরাক্ষী-দামোদর-অজয়-ভাগীরথী-দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ আপাততঃ যত বিপর্যয়ই ঘটাইতে থাকৃ, আমরা আবার তাহাদের বাঁধিব, নেপাল-দার্জিলিঙ-সিকিম-ভুটানবাহী যাবতীয় নদীকে আয়ত্তে আনিয়া তাড়িৎশক্তি উৎপাদন করিব, উন্মাদিনী প্রকৃতিকে শাসনে আনিয়া তাহাকে দিয়াই মুড়িঘণ্ট ও চিংড়ির কাটলেট রাঁধাইয়া ছাড়িব।

মানুষের জয়যাত্রা

বিজ্ঞানদানবের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়া মানুষ যতদিন না জড়-যন্ত্রে পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন তাহার জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, মৃত্যুভয় তাহাকে দমাইতে পারিবে না। এখানে মানুষ শুধু পুরুষ নয়—নারীও। মানুষের এই বিজয়-অভিযানের সাফল্যাত্মক ও বিয়োগান্তক পরিণতি আমরা গত দুই মাস কালের মধ্যে বারবার দেখিলাম। রুশ-রকেট চন্দ্রকে স্পর্শ করিল, তিন নম্বর লুনিক চাঁদের অজ্ঞাত পৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ ও বিচিত্র তথ্যসংগ্রহে তৎপর হইল, বাঙালী-কন্যা কুমারী আরতি সাহা সমগ্র এশিয়ার নারীকুলের অগ্রণীস্বরূপ ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে পারগ হইলেন, বাঙালী সাঁতারু বিমলচন্দ্রও পশ্চিমবঙ্গের মান রাখিলেন। এই গেল সাফল্যের দিক। ভয়াবহ ও শোচনীয় বিয়োগান্ত দুর্ঘটনা ঘটিল গত মাসে চো-ওয়ু পর্বতাভিযাত্রী বীরনারীদলের। তাঁহারা অকস্মাৎ তুষার-ঝঞ্ঝাহত হইয়া তিনজন শেরপাসহ নিশ্চিহ্ন হইলেন। এই ঘটনায় বিচলিত হইয়া একাধিক পুরুষসিংহ নারীদের পর্বতাভিযানে অযোগ্যতা প্রমাণ করিতে বসিলেন। যেন তাঁহাদিগকেই নিষ্ঠুর উপহাস করিবার জন্য অদ্য ৭ই নবেম্বর সংবাদ আসিল, গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গাভিযাত্রী জাপানী পুরুষদল তুষার-ঝটিকার কবলে পড়িয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। কুলী শেরপাসহ তাঁহারা সর্বসাকুল্যে বত্রিশজন ছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রসিদ্ধ পর্বত-বিজয়ী মৃত ল্যাম্বার্ট মাত্র ১৯৫৪ সনে গৌরীশঙ্কর-জয়ের চেষ্টা ছাড়িয়া ওই শৃঙ্গ মানুষের অগম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বগামীর সতর্কবাণী অদম্য মানুষকে দমাইতে পারে নাই। আমরা জানি পরবর্তী দল অচিরাৎ আগাইয়া আসিবেন এবং চো-ওয়ু ও গৌরীশঙ্কর অজেয় থাকিবার গৌরব বেশীদিন ভোগ করিবেন না।

জওহর-বিরোধী জয়প্রকাশ

গতকল্য ৬ই নবেম্বর উত্তর-বোম্বাইয়ে নবনির্মিত ইউসুফ মেহের আলি-নগরে ভারতীয় প্রজাসোসালিস্ট পার্টির রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভূদানী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ঘোষণা করেন, "শ্রীনেহরু একজন গণতান্ত্রিক একনায়ক। দেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে তিনি অন্তরায়-স্বরূপ। তাঁহার অবসর গ্রহণেই প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

বিনোবাজী-নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ-গোলক হাতে পাইয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ "ল্যাঙ্গোয়েজ অফ দি হার্ট" অর্থাৎ মর্মের গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। অনুরূপ অবস্থায় রাজাগোপাল, কৃপালানী, অজয় ঘোষ, রামমনোহর, হয়তো ইন্দিরা গান্ধীও অনুরূপ কথাই বলিবেন। কিন্তু জওহরলালকে বাদ দেওয়া কি এতই সহজ! বর্তমান পৃথিবীতে বড় বড় দেশের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কবি ও ভাবুক—বর্তমানের উপর দাঁড়াইয়া অতীত এবং ভবিষ্যৎকে একত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তিনি কর্মী নন, তাই দুনিয়ার কর্মী নেতারা বিপদে পড়িলে তাঁহারই মুখ চাহিয়া থাকেন। জড় বিজ্ঞানযুগের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে এখন তিনিই একমাত্র নির্গমন-ও-পলায়ন-পথ, এক্‌জিট ও এস্‌কেপ। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের বাস্তব দেহশক্তি এমন কিছু প্রবল হইয়া উঠে নাই যাহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রবল শক্তিরা তাহাকে সমীহ করিতে পারে, নয়াচীনও পাশবিক শক্তিতে ভারত অপেক্ষা প্রচণ্ড ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ও পশ্চিমে গণনীয় রাষ্ট্র-সমূহের কর্ণধারেরা স্বাধীন ভারতের মুখপাত্র ভাববাদী জওহরলালকেই খাতির করিয়া চলেন, তাঁহার মধ্যে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পান।

এই বৎসর (১৯৫৯) দিল্লীতে প্রদত্ত আজাদ-স্মৃতি-বক্তৃতায় অতীত ও বর্তমান ভারত সম্পর্কে তিনি যে সুগভীর আশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সত্তাকে সেই ভাবে অনুভব বর্তমানে একমাত্র তিনিই করিতে পারেন, জয়প্রকাশ নারায়ণেরা নয়। শ্রীনেহরু বলিয়াছেন :

"বর্তমান যুগের হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা দুই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি—ভবিষ্যতের দিকে এবং অতীতের দিকে। দুই দিকেই আমাদের সমান আকর্ষণ। কি ভাবে আমরা এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাব? কি ভাবে জীবনকে গড়ব যাতে আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজন মিটবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের হৃদয় ও মন সঞ্জীবিত থাকবে? কোন্ নতুন আদর্শকে অথবা নতুন জগতের উপযোগী হতে পারে এমন ভাবে পরিবর্তিত কোন্ পুরনো আদর্শকে আমরা জনসাধারণের সামনে ধরব? কি ভাবে তাদের আমরা সচেতনতায় ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করব?

ভারতবর্ষে আমাদের নিজস্ব সব সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জগতের বৃহৎ সমস্যাগুলিও আমাদের সমস্যা। এ জগৎ তার বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ভারতবর্ষে আমরা বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত আছি। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে এক বিরাট প্রচেষ্টায় আমরা ব্যস্ত। অন্য যে কোন রকম অগ্রগতির পক্ষে এ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। কিন্তু একটা সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হয়। শুধু এই যথেষ্ট, না, আরও কিছু করা প্রয়োজন? কল্যাণ-রাষ্ট্র এক মহৎ আদর্শ, কিন্তু তা তো [illegible]স বিবর্ণও হতে পারে। যে সব রাষ্ট্র ঐ ল[illegible] পৌছে গে[illegible]ছ তারাও নতুন নতুন সমস্যা ও সঙ্কটের সৃষ্টি করে, যার সমাধান শুধু বৈষয়িক অগ্রগতি বা যান্ত্রিক সভ্যতা দ্বারা হয় না। মানব-প্রকৃতির কতকগুলি মৌল প্রয়োজন পূরণে ধর্মের এক প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই ধরনের ধর্মের প্রভাব আজ শিথিল হয়ে পড়েছে। তা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আঘাত প্রতিরোধ করতে পারছে না। ধর্ম প্রয়োজনীয় হোক বা না হোক, কোনো একটা মহান আদর্শে বিশ্বাস থাকা অত্যাবশ্যক। এ বিশ্বাস এমন হওয়া প্রয়োজন যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করবে এবং আমাদের একত্রে সংঘবদ্ধ রাখবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক ও শারীরিক দাবীর উর্ধ্বে কোনো একটা উদ্দেশ্যবোধ আমাদের থাকা দরকার।…

ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে; বিশ্বাস ও উদ্যম নিয়ে সার্থক উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের অতীত উত্তরাধিকারকে

জায় রাখতে হবে এবং তা থেকে বাঁচবার খোরাক াহরণ করতে হবে। পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু ধারা-াহিকতাও আবশ্যক। অতীত ও বর্তমানের ভিত্তির ়পর ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে। অতীতকে অস্বীকার করা াবং তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল নিজেদের ন্মূল করে ফেলা, রসহীন বিশুষ্ক হয়ে যাওয়া।···

বর্তমানের শ্রম ও চাঞ্চল্য থেকে কি সৃষ্টি হবে? াগামীকালের ভারতবর্ষ কি রকম হবে আমি বলতে ারি না। আমি শুধু আমার আশা ও কামনা ব্যক্ত রতে পারি। স্বভাবতই আমি চাই, ভারতবর্ষ বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করুক, তার বিশাল জনসমষ্টির জীবনযাত্রার ান উন্নয়নের জন্যে তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিষ্পন্ন রুক। আমি চাই, ধর্ম বা বর্ণ, ভাষা বা প্রদেশের নামে াজকের এই সব সংকীর্ণ বিরোধ অন্তর্হিত হোক এবং ক শ্রেণীহীন বর্ণভেদহীন সমাজ গড়ে উঠুক, যে সমাজে াত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিকাশ াভের সুযোগ পাবে। বিশেষভাবে আমি আশা করি, র্ণের অভিসম্পাত নিশ্চিহ্ন হবে, কারণ বর্ণের ভিত্তিতে ক গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র কোনোটাই সম্ভব নয়।

চারটি বিরাট ধর্ম ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে। ার নিজের চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় দুটি: হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম; এবং দুটি আসে বিদেশ থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষে ারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়: খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম। বিজ্ঞান াজ ধর্মের প্রাচীন প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু র্ম যদি যুক্তিনিরপেক্ষ অনড় মতামত এবং আচার-অনুষ্ঠান নয়ে না থেকে জীবনের উচ্চতর বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়, াহলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য র্মের বিরোধ ঘটার কথা নয়। এই সমন্বয় সাধনে সাহায্য রবার অসামান্য সৌভাগ্য ভারতবর্ষের হতে পারে। দ কাজ হবে অশোক-লিপিতে উৎকীর্ণ প্রাচীন ভারতীয় ািতিহ্যেরই অনুসারী। অশোকের এই বাণী আমরা আজ রণ করব:

'আত্মিক শক্তির বৃদ্ধি বহু প্রকারের।

কিন্তু মূল হল বাকসংযম: স্বধর্মের প্রশংসা এবং অন্য ধর্মের নিন্দা অথবা বিনা উপলক্ষে বা বিনা প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে লঘু মন্তব্য পরিহার করা।

উপযুক্ত উপলক্ষ্য দেখা দিলে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও যোগ্যভাবে সম্মানিত করা উচিত। যদি এই ভাবে আচরণ করা যায় তাহলে স্বধর্মকে অধিকতর মর্যাদা দান করা হয় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও সাহায্য করা হয়। এর বিপরীত আচরণ যদি করা হয় তাহলে স্বধর্মের অনিষ্ট করা হয় এবং অন্য ধর্মেরও অপকার করা হয়।

যে স্বধর্মকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু অপরকে তার স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করে এবং যে স্বধর্মকে অন্য সকল ধর্মের চেয়ে বড় বলে প্রচার করে, সে নিশ্চিতভাবে তার স্বধর্মের অনিষ্ট করে।'

আজকের চেষ্টায় আমরা যে রকম গড়ব আগামী কালের ভারতবর্ষ সেই রূপ নেবে। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ শ্রমশিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাবে; বিজ্ঞানে ও টেক্‌নলজিতে সে উন্নত হবে; আমাদের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উঁচু হবে, শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভালো হবে এবং শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।···

কিন্তু আমার চিন্তা শুধু আমাদের বৈষয়িক অগ্রগতি নিয়েই নয়, আমাদের জনসাধারণের চরিত্রের গুণ ও গভীরতার কথাও আমি ভাবি। শিল্প-প্রগতির দ্বারা ক্ষমতা আহরণ করে তারা কি ব্যক্তিগত ধনসম্পদের অন্বেষায় এবং আরামের জীবনযাপনে নিজেদের হারিয়ে ফেলবে? তা এক মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। কারণ তার দ্বারা ভারতবর্ষকেই অস্বীকার করা হবে।···

আমরা বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাহীন হতে পারি না, কারণ বিজ্ঞান বর্তমান জীবনে মূল বাস্তব সত্যের প্রতিভূ। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ যে মৌল নীতি সমর্থন করে এসেছে তার প্রতি নিষ্ঠাহীন হওয়া আমাদের আরও অনুচিত।"—'চতুরঙ্গ'—বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৬।

এই সুদীর্ঘ ২৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি প্রত্যেক ভারতবাসীকেই পড়িতে অনুরোধ জানাই। বর্তমান পৃথিবীতে নানা রাষ্ট্রশক্তি ও মতবাদের যে সংঘর্ষ ও সংঘাত চলিয়াছে, ভারতবর্ষের উপর তাহার প্রভাব কি ভাবে কাজ করিতেছে

সে সম্বন্ধে ভারত-রাষ্ট্রের বর্তমান প্রধান কর্ণধারের বক্তব্য ভারতবাসীর জানা প্রয়োজন।

গোলাম-চোর

রবীন্দ্রনাথ "দুই বিঘা জমি"তে বাবু-চোরের কীর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। বেচারা উপেনের দুই বিঘা জমি মাত্র ছিল। ছলে বলে কৌশলে বাবু সেটুকু আত্মসাৎ করিয়া উপেনের লাঞ্ছনার একশেষ করিলেন। বাবুর অনেক ছিল, তৎসত্ত্বেও প্রস্থে ও দীঘে টানা সমান করিবার জন্য উপেনের সামান্য দুই বিঘারও প্রয়োজন হইল। গোলাম বা ভৃত্যশ্রেণীর মানুষের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ওই বাবু সর্বপ্রথম গোলাম-চোর হইলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রেও সম্প্রতি এইরূপ এক গোলাম-চোরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। চোর অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের অর্থাৎ দিদি-বৌদিদি-চুরি-ছিরি-গলি-ঘুঁজি-সাহিত্যের একজন হোমরাচোমরা বাবু হইয়া বসিয়াছেন। কানাঘুষায় শুনিতাম, তিনি সাহেব-বিবিদের মারিয়া বেশ পসার জমাইয়াছেন। দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শোনা গেল বেচারা গোলামদেরও তাঁহার হাতে নিষ্কৃতি নাই। বাবু কোন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত থাকাকালে কোন উপেন উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ-বাসনায় একটি উপন্যাস প্রেরণ করেন। গোলামের দুই বিঘা জমি বাবুর বাগানের জন্য যথারীতি তোলা থাকে। পরে একদিন শোনা গেল, বাবু এক সাহিত্য-জলসায় উহা নিজের নামজারি করিয়া জাহির করিয়াছেন। উপেন আপত্তি জানাইয়াছিল কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। স্বয়ং বাবুর নিকট দরবার করিলে তিনি একটা বাবুসুলভ "অবাক"-মার্কা জবাবও দিয়াছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বাবুর বাগান সম্পূর্ণতর হইয়াছে। গোলাম উপেন কাঁদিয়া-কাটিয়া দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে পাকড়াইবার চেষ্টায় আছে। নব 'কথা ও কাহিনী' রচিত হইলে উপেনের জবানিতে অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যের সৌরভ বৃদ্ধি পাইবে। শোনা যাইতেছে, বাবুর এইরূপ কীর্তি আরও আছে এবং প্রয়োজন হইলে ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

মুখ ও মুখোশ

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আমাদের নিত্য আরাধ্য রু দেবতার দুই মুখ—দক্ষিণ ও বাম। আমরা প্রার্থনা জানাই হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ বা প্রসন্ন মুখ—তাহা আমা দিকে ফিরাইয়া আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। আমাদে শাস্ত্রমতে বর্তমানে রাজার স্থলাভিষিক্ত রাষ্ট্রপতিও দেবত কিন্তু তাঁহার একটা মুখই আমরা দেখিতে পাই—দক্ষি মুখ। তিনি অপ্রসন্ন হইলে মুখোশে মুখ ঢাকিয়া আমাদে দণ্ড বিধান করেন, মুখোশের অন্তরালে তাঁহার মুখবিকৃ আমরা দেখিতে পাই না। গত ৭ই নবেম্বর কর্নাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর শ্রীডি. সি. পাঘাতে হীরকজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ধারওয়ারে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দক্ষিণ মুখে ঘোষণা করিয়াছেন, "বয়স্ক ও শিক্ষকদে প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই শিক্ষার অবনতির প্রত্যক্ষ কারণ শ্রদ্ধাহীনতার কারণ সম্পর্কে তিনি এই মাত্র বলিয়াছে যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের সংখ্যাধিক্য শিক্ষকের সহি ব্যক্তিগত স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে দেয় না, কাজে গুরু-শিষ্য পরস্পর অপরিচিতই রহিয়া যায়। কি আরও গভীরতর কারণ যে পলিটিক্স, রাষ্ট্রপতির দক্ষি মুখ তাহা বলিতে চাহে নাই, কারণ সেই সর্বনা পলিটিক্সই তাঁহার স্বদেশ বিহারে বঙ্গভাষাভা[illegible] বিদ্যালয়সমূহে বঙ্গভাষা উচ্ছেদে তৎপর হইয়াছে। ব মুখ বেহার সরকারের মুখোশের আড়ালে ভ্রূকুটি করিতেছে এ কথা আজ ভারতভাগ্যবিধাতারা বিস্মৃত হইয়াছে যে মানভূমের চাণ্ডিল চাষ পচম্বা ধলভূম খাস পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও অজ পল্লীগ্রাম হইতেই বেশি বাঙালী সেখানকার কথাবার্তা শিক্ষাদীক্ষা হিসাবনিকাশ দলি দস্তাবেজ সকলই বাংলাভাষায় হইয়া থাকে। এ বাংলাকে রাতারাতি হিন্দী করিবার জন্য (ভারত-সংবিধ এক যুগ চালু থাকিবার পরও) এই অঞ্চলে হিন্দীওয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের যেভাবে নিযুক্ত করা হইতেছে তাহা শ্রদ্ধা প্রেম ভালবাসা ও ভক্তির কোনও স্থান নাই। ম বলে, শ্রদ্ধা-ভক্তি কর, কিন্তু মুখোশ বলে, মার লাগাও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ছাত্রদের যে ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো তাহাতে ছাত্রেরাই শিক্ষক-অধ্যাপকদের শ্রদ্ধার প হইয়া পড়ে। রুদ্রের বাম মুখের বিরূপতা সহনীয়, বি মুখোশ অসহ্য।

আমার নেহরু

রঞ্জন

১৯১২ সনে নেহরু যখন তেইশ বছর বয়সে বিদেশী শিক্ষা শেষ করে ভারতে ফিরলেন, গান্ধীজী তখনও দক্ষিণ আফ্রিকায়। আমি? আমার জন্মের তখনও আট বছর দেরি। বয়সের এই বৃহৎ ব্যবধান সত্ত্বেও আমার প্রবন্ধের নামে যে স্বত্বাধিকারের ইঙ্গিত আছে, তার মধ্যে অহমিকার লেশমাত্র নেই। ইতিহাসে আমার নগণ্যতা এবং নেহরুর গুরুত্ব সম্বন্ধে অচেতন থাকব, এমন নির্বোধ আমি নই। নাম নির্বাচনের কারণ দুটি। এক, ভারতের রাজনৈতিক গগনে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যাঁর সঙ্গে আমি এমন আত্মীয়তা বোধ করি। দুই, রাজনীতি-উদাসীন লেখক হিসাবে নেহরুর পরিচয় আমার কাছে গণনেতার ভূমিকায় তো নয়। সে পরিচয় মানুষরূপে, একান্ত আপন ব্যক্তি-রূপে। নেহরুর সঙ্গে একবারও বাক্যবিনিময় করি নি, কাছে থেকে দেখেছি শুধুই শারীর অর্থে—যখন আকাশবাণীর ভার্য্যকাররূপে মূল্যবান সময়ের অপচয় করতাম। এই দূরত্ব সত্ত্বেও আমার মনে নেহরুর যে একটি অন্তরঙ্গ প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, তা সত্য দিয়ে তৈরী আর আশা-নিরাশা দিয়ে ঘেরা।

লেখক হিসাবে নিজেকে রাজনীতি-উদাসীন আখ্যা দিয়েছি, অথচ আমার আলোচ্য ব্যক্তির জীবন রাজনীতিতে আকীর্ণ। আর এই কি একমাত্র প্রভেদ? নেহরু অভিজাত, ধনীসন্তান, বিদেশী শিক্ষার উৎপাদন। আমি অখ্যাত সাধারণ পরিবারের সাধারণ ছেলে, য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয় অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এবং ভ্রামণিক-রূপে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের যে নকশা নেহরুর মনে ছিল বলে আমার রাজনীতির অ-আ-ক-খ শেখার সময় ধারণা হয়েছিল তা আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। পূর্ববঙ্গে যখন সন্ত্রাসবাদের জোয়ার, তখন আমি অতি ছোট এবং সাঁতার শিখি নি। গান্ধী-আন্দোলনের বন্যা যখন এল, তখন আমি অতি বড়, আর রুচি ছিল না হুজুগে। (এখন স্বীকার করতে ক্ষতি কী যে সে আন্দোলন অংশতঃ হুজুগমাত্র ছিল, নইলে স্বাধীনতালাভের বারো বছরের মধ্যে তার পূতিগন্ধময় ভস্মাবশেষ দেশ ছেয়ে ফেলল কী করে?) আর সব ভারতীয়ের মত আমি ব্রিটিশ-শাসনের অবসান চেয়েছি মনে মনে। কবুল করব, তার জন্য কাজ সামান্যই করেছি। কিন্তু নেহরুর বিবর্তন দূর থেকে লক্ষ্য করেছি কৌতূহল ও মনোযোগ দিয়ে, মাঝে মাঝে শ্রদ্ধা ও মোহ দিয়ে। রাগ করেছি বা নিরাশ হয়েছি আগের অনুরাগ ও আশার আতিশয্যের জন্য।

* * *

নেহরুকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি '৩৬-'৩৭-এ। নেহরু নির্বাচনসমরে অবতীর্ণ হয়ে সারা ভারতে বক্তৃতা দিয়ে

বেড়াচ্ছেন। আসাম যাবেন দুপুরের একটা গাড়িতে, আমি কলেজ পালিয়ে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। তিনি রেলগাড়ির কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে প্রতীক্ষমাণ শ দেড়েক সমবেত ছাত্রের উদ্দেশে মিনিট কুড়ি বললেন। বক্তৃতা নয়, মনোলগ। মামুলী কথা। ছাত্রদের রাজনীতিতে কৌতূহল থাকবে বইকি, কিন্তু সে যেন ছাত্রানুযায়ী হয়, মাত্রানুযায়ী হয়। আন্দোলনে সক্রিয় সংযোগের পক্ষপাতী তিনি নন, সাধারণ অবস্থায়। একটি উক্তিও চমকপ্রদ নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এমন স্বচ্ছ একটা আন্তরিকতা ছিল যে আজও অনেকগুলি কথার স্বর স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। সেই প্রথম নেহরুর প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ল আমার মনে। বলা বাহুল্য, নেহরু সে কথা আজও জানেন না, কিন্তু আজও তিনি একমাত্র ভারতীয় নেতা যাঁর ব্যক্তিগত নিন্দা শুনলে আমি ব্যথিত হই, প্রতিবাদ করি। তাঁর নানা কাজ ও মতের সমালোচনা শুনি বইকি, করিও।

যে মানুষটিকে পছন্দ করি তিনি প্রধানমন্ত্রী নন, কংগ্রেসী তো ননই। আমার নেহরু পাহাড় ভালবাসেন, বম্বেতে প্রথম বর্ষণে শিহরিত হন, তরুণ কবির সঙ্গে দেখা হলে তার লেখা অধুনা প্রকাশিত কবিতা থেকে দু-ছত্র আবৃত্তি করেন, শাসকরূপে রামমনোহর লোহিয়াকে গ্রেফতার করে পরদিন তাঁর হাজতে এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম পাঠান, শিশুদের নিয়ে খেলা করেন, বিশৃঙ্খলা দেখলে মেজাজ হারান, অপরের পানাহারের স্বভাবে হস্তক্ষেপ অপছন্দ করেন, সুন্দরী চিত্রতারকা দেখলে খুশী হন এবং তার সঙ্গে ছবি তুলতে আপত্তি করেন না, ফরসা পোশাক পরলে নিজেকে দেশদ্রোহী বলে মনে করেন না, থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ না করলে নিজেকে পাপিষ্ঠ জ্ঞান করেন না। তালিকা দীর্ঘতর করা আদৌ দুরূহ হত না, কিন্তু নেহরুর কোন্ দিক আমাকে আকৃষ্ট করে তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। এ কথাও গোপন করার প্রয়োজন দেখি না যে আমার নেহরু-প্রশস্তিতে অন্যান্য একাধিক নেতার প্রচ্ছন্ন সমালোচনা নিহিত আছে।

* * * *

আর কদিন বাদে নেহরুর বয়স সত্তর হবে। কে কোন ছবিতে এখন তাঁকে বয়স্ক দেখায়। তবু ; বারো বছর তিনি যে বিরাট বোঝা একক স্কন্ধে ব করেছেন তার ভারে সদয়তর আবহাওয়ায়ও অন্য কেউ নুয়ে পড়ত। অথচ নেহরুকে যাঁরা চলাফে করতে দেখেছেন তাঁদের বলতে হবে না, কী অবিশ্ব দৈহিক সামর্থ্য এখনও তাঁর। লাফিয়ে সিঁড়ি ওঠেন, ছু ছাড়া চলেন না। দিনে ষোল থেকে আঠারো ঘণ্ট রুটিন—আজ শ্রীনগরের ঠাণ্ডায় আর পরদিন কলকাত ভেজা গরমে। এই আপাত-অপরিসীম কর্মক্ষমতা— আমার অশেষ ঈর্ষার বস্তু—শুধু শারীরিক হতে পা না। এর উৎস নেহরুর চিত্তের চিরতারুণ্য। কোন নতুন আইডিয়া তাঁকে আকর্ষণ করে। মা মাঝে তা ব্যয়বহুল মোহ হলেও মনের এই সজীবতা শ্রদ্ধা না করে পারি নে।

সত্য বলতে কি নেহরু ভারতে সাধারণতঃ যে কারণে নিন্দিত বা সমালোচিত হন আমি তাঁর সে গুণগুলিকেই সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি। প্রধান অভিযে তিনি নিজে অস্বীকার করেন নি; তিনি অভারতী মানস, ইংরেজের চাইতেও একটু বেশী ইংরেজ হিন্দীভাষীদের সঙ্গে সাম্প্রতিক অতিসান্নিধ্যে নেহরু ইংরেজী কথনও লেখনের অবনতি হয়েছে, আংশিক কা অতিকথনও। এ-অবনতি একাধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষের উল্লাে কারণ, আমার হতাশার। বলা হবে, ভাষা তো চিন্ত বাহন মাত্র; শব্দান্তরে, মাধ্যম। স্মরণ করিয়ে দে গান্ধী-নেহরুর জীবনদর্শনের প্রথম স্বতঃসিদ্ধই কি এই ; যে উদ্দেশ্য ও উপায়—এণ্ড্স এবং মীন্স—অবিভাজ্য এক অসাধু হলে অপর অবিধেয় হতে বাধ্য? আমি যে করব, চিন্তা ও তার প্রকাশের মাধ্যম হিন্দীর মত অপ হলে চিন্তাও আশানুরূপ উত্তম হতে পারে না। এ নেহরুর ক্ষেত্রে তাই ঘটছে।

* * *

আরও স্পষ্ট হওয়া যাক। নেহরু নিজে জানে তাঁর মৌলিক চিন্তাশীলতা ঠিক অসীম নয়। ত তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তারীতির উপর

মাদের কালে—প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছেন প্রধানতঃ জন্ম যে তিনি বাইরে থেকে কয়েকটি বিদেশী ভ্যালু মদানি করেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যদি বিদেশী বলে আধুনিক বলি তা হলে বিরূপতা কমবে। হরু বিপ্লবী নন, সংস্কারক। তাই তাঁর বিদেশী নস মহাত্মার ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে নি, তস্বীকার করেছে—যদিও মৃদু প্রতিবাদের সঙ্গে। হাত্মা যখন অপসৃত হলেন, নেহরু তখন সুযোগ পেয়েছিলেন স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার। (প্রথম জীবনে প্রবল প্রভাব ছিল পিতা মতিলাল নেহরুর।) নেহরু-চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ এবং প্রথম দুর্বলতা ই যে—তিনি সন্দেহী, unassertive। তিনি তর্ক রেন, প্রতিবাদ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ঢ়তর সহযোগীর কাছে—বা তীব্র কিন্তু অন্ধ গণাবেগের কাছে—স্বীয় মত সমর্পণ করেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক রিবেশে এই পথই প্রশস্ত। নেহরুর, এবং আরও নেকের, এই শিক্ষা গ্রহণ করতে এখনও বাকী যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্রিটেন একক, একান্ত অপ্রতিনিধি। আমাদের প্রধান বিভ্রান্তি এই যে ক্ষুদ্র এবং সংহত ব্রিটেনের মৃদু-মেজাজ রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতিবৃহৎ ও বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষে রোপণ করলে সোনা ফলবে। ফসল যে অন্য হয়েছে তা নিশ্চয়ই তর্কাতীত।

ব্রিটেনের শান্ত-কবোষ্ণ পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র যে তার সেদিনের কথা তাও মনে রাখা দরকার। চল্লিশ বছর আগেও সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না। আজও বিশেষাধিকারের অন্ত নেই। সম্প্রতি The Establishment কথাটার প্রচলন বেড়েছে, প্রধানতঃ তিরস্কার হিসাবে। বি. বি. সি., টাইমস পত্রিকা, অল সোলস কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে নাকি শাসকগোষ্ঠীর অদৃশ্য খুঁটি ও ঘাঁটি রয়েছে। মোদ্দা কথা, ব্রিটিশ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত—ভারতীয় সমাজ নয়, এখনও। এই বিবর্তনের সময় হয়তো দৃঢ়তর নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। বদলে নেহরু দিলেন সহিষ্ণু শাসন। ফলে ধনীরা ধনীতর হতে পারলেন, অলসরা অলসতর, অসৎরা আরও অসৎ—আর আমি পারলাম আমার সমগ্র পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজ মতানুযায়ী অগোছালো কিন্তু মুক্ত জীবন যাপন করতে, স্বাধীন ও নৈরাজ্য-প্রধান মতামত প্রকাশ করতে। নেহরুর কাছে আমার ব্যক্তিগত শ্রেণীগত কৃতজ্ঞতা প্রচুর বইকি। আর সবাই সমান কৃতজ্ঞ না হলে নেহরুর বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। এই শেষের তাঁরা নেহরু-নেতৃত্বকে হয়তো চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই নেহরু নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে তাঁদের দুর্ভাগ্য দ্বিগুণিত হত। এই বিরাট দেশের বিরাট সমস্যার দ্রুত সমাধান কোন এক ব্যক্তির সাধ্য নয়। আমি তো প্রায়ই মনে মনে বলি—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি ভারতবর্ষের প্রধান-মন্ত্রী নই। নিশ্চিত ব্যর্থতা জেনেও নেহরু যে এ চাকরি নিয়েছেন, এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। আগামী চোদ্দই নভেম্বর নেহরুর জন্য আমার সশ্রদ্ধ সহানুভূতি রইল, আর রইল জনৈক স্বার্থপরের কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে বিনয় ঘোষ রচিত রামমোহন ও হেস্টিংসের আমলের কলকাতার সামাজিক বিবরণ "সুতানাটি সমাচার" ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইবে।

কবি, গাহ মম গান

(বিখ্যাত তামিল কবি শ্রীসুব্রহ্মণ্যভারতীর একটি পদ অনুসরণে)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি, তুমি গাহ গান
শানিত গীত কৃপাণ হস্তে খণ্ডিত কর অপমান
দুখদারিদ্র্যের অমা হরিতে
টঙ্কারে ঝঙ্কারো সুর নিভৃতে
সারা বিশ্বে মানুষ হোক প্রেমে একতান
কবি, গাহ তুমি সেই গান
কণ্ঠে আন সঙ্গীত তব
তালে-মানে ইঙ্গিত নব
কল্পনায় অভিনব, সুরচ্ছন্দ প্রাণ
মধুনিষ্যন্দ চির-আনন্দতান।
এই কথা সবে বলে
ব্যথার পূজনে দেশের বেদনে যে সুর-অগ্নি জ্বলে
মহৎ পথের দিশায়
যে গান ধায় বৃহতের তরে, উর্ধ্বের অভীপ্সায়
সে গীত সুধারস-স্বপন
ছন্দনিবেদনে বন্দনবীজ করি বপন
যখনি চেয়েছি ভারতীর কাছে, কর কৃপা দেবী
তখনি তুমি বলেছ মোরে 'থাম থাম কবি
গাহ শুধু মোর গান
তব মূর্ছনায় নব প্রাণ পাক আমার জীবনমান।'

এসেছে বরষা ঘনঘোর হরষে
আকাশে কাঁপন বাতাসে রভসে
ইন্দ্রসভার তন্দ্রাজড়িত আসরে
চন্দ্রচূড়ের চন্দ্রাতপের বাসরে
মেঘমেদুর দামিনী
তিমিরনিবিড় যামিনী
বঙ্কিম চমকে থমকি যায়
উত্তর বায় পূরবৈঁয়া হায়
তড়িৎ-বধূদের মঞ্জীর রণনে
শুনি কি ধ্বনি তার মনের গহনে ;
আমি কবি, ছন্দে চেয়েছি রচিতে সে অমৃতগীতে
স্বরগমায়ার অবতরণ সত্যে ঋতে
ঝরঝর কথা ও কাহিনী
পত্রমর্মর বিচিত্র বাহিনী।
কণ্ঠ আমার রোধিলে তুমি, বাণী হারাল ভাষা
তোমারি জয় গাই তাই শুধু, নাই আর কিছু আশা
বাক্য-অতীতা হে মাতা ধাত্রী
বাক্য হরেছ তুমি মা দাত্রী।
যারা দেখেছে তোমাকে, তামসগর্ভে, আলোকশিখায়
প্রস্তরের স্তরে স্তরে চেতন-রেখায়
মহাকালের গতির পথে একটি ক্ষণ যবে স্তব্ধ
আরতির বিরতিতে, আরব্ধ,
বজ্রের আলোকে, শ্যামল নবাঙ্কুরে
ভঙ্গুর দুর্বাদলের অঙ্কুরে,
তারাই, শুধু, তারাই দেখিতে পায়
তোমায় যারা চায়, বারে বারে চায়
তবু তুমি ডাকিছ মোরে এ কী গো বিস্ময়—
'শোন কবি, গাহ গান, মোর গান, এই তব পরিচয়

—

আলো যদি নিবে যায়, যাক্ না

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আলো যদি নিবে যায়, যাক্ না—
আমি তো মানস-পানে মেলিয়াছি উদ্দাম পাখ্‌না!
অনন্ত মহাকাশ পাতিয়াছে মায়াপাশ,
কভু নীল কভু সাদা, কভু কালো রাশরাশ—
ভেদ ক'রে উড়িতেছি চিরদিন বারো মাস;
যত উড়ি তত হায়, অবকাশ বেড়ে যায়
জানি না কবে যে পার হব এই ঢাক্‌না!
আলো যদি নিবে যায়, যাক্ না॥

একটি পাখায় সুর, একটিতে ছন্দ
যতদিন রবে মোর এই ওড়া নাহি হবে বন্ধ।
গাহিতে গাহিতে গান লভি যেন নির্বাণ,
নাইবা পেলাম মোর মানসের সন্ধান;
শূন্য মথিত করি যেন শেষ কলতান
নেমে আসে এ ধরায়, এবং ঊর্ধ্বে ধায়
ভেদ করি মহাব্যোম, তিমির নীরন্ধ্র।
একটি পাখায় সুর, একটিতে ছন্দ॥

যদি স্থির থাকে মোর লক্ষ্য—
ক্লান্ত না হয় যদি মোর দুটি সাবলীল পক্ষ,
অস্বচ্ছ কুয়াশায় ধরাতল যদি ছায়
মেঘ-আবরণে যদি নীলাকাশ ঢেকে যায়
করি যদি দিগ্‌ভুল ঝড়-ঝঞ্ঝার ঘায়
ছায়াপথ-ধ্রুবতারা আঁধারে হলেও হারা
উল্কার বেগে যদি হই চ্যুতকক্ষ—
কী ভয় থাকিলে স্থির লক্ষ্য।

ভাল লাগে পাখা মেলে ওড়াটা,
ভাবি না ভবিষ্যৎ, ভুলে গেছি যাত্রার গোড়াটা।
কোথা কৈলাস, কোথা জীবনের সে মানস-তীর্থ,
ভুলেছি সরল পথ কেবলি রচিয়া চলি বৃত্ত;
যদি হয় নভোপথে রাজহংসের শেষ নৃত্য—
কী তাহাতে আসে যায়, জানি ধূপ শুধু চায়
অবিরাম তিলে তিলে নিঃশেষে পোড়াটা।
ভাল লাগে পাখা মেলে ওড়াটা॥

নীড়ে কবে ছিনু, আজ আকাশের যাত্রী,
মুছে গেছে সংসার, মিলে গেছে দিন আর রাত্রি।
ভাবনা ও সংশয় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ভয়,
মাটির ধরার ব্যাধি নভে হ'ল নিরাময়;
আনন্দ চিত্তের অবসাদ করে জয়—
কোথা হতে এসে আলো ঘুচায় তিমির কালো
বর-বরাভয় দেন কে যে বরদাত্রী।
নীড়ে কবে ছিনু, আজ আকাশের যাত্রী॥

আলো যদি নিবে যায়, যাক্ না—
মাথার উপরে থাকে—থাক্ ওই নিঃসীম ঢাক্‌না।
আগে পিছে নভোচারী রাজহংসের সারি
চোখে নাহি হেরিলেও পাই আশ্বাস তারি;
সুমুখের সুর ধরি' পিছে দেব সঞ্চারি'—
গাহিতে গাহিতে গান প্রাণ হোক্ অবসান,
উড়িতে উড়িতে ভেঙে পড়ুক দু' পাখ্‌না।
আলো যদি নিবে যায়, যাক্ না॥

জেনেছি আপনজন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জেনেছি আপনজন, আপন স্বভাব। অন্য কেউ
হয়তো ভাববে তবু বেহিসেবী এই ব্যক্তি তার
সংসারের সমস্ত হিসেবে। যেহেতু উদ্বেল ঢেউ
যখন হৃদয়ে লাগে সব ভুলে আমি যন্ত্রণার
নির্জন স্বরাজ্যে ফিরে বুকের উত্তাপে কিছু ফুল
নির্বিঘ্নে ফোটাতে চাই ; একমুঠো শিউলির ঘ্রাণ
নির্ভয়ে ছড়াতে যাই সত্তার গভীরে। টগর বকুল
এবং অন্যান্য ফুল জাগবেই যদি শোনে গান

জেগে-ওঠা নিভৃত সত্তার। কত স্বর্ণরেণু-মাখা
বিষণ্ণ মুহূর্তগুলো গুঞ্জরিত হয় বুকে-বুকে
এক-এক আশ্চর্য উপায়ে। কত পদচিহ্ন-আঁকা
পরিত্যক্ত দীর্ঘপথ পার হয়ে আজও যে কৌতুকে
বুকের উত্তাপে ফুল এখনো ফোটাই। বেহিসেবী
হতে পারি যেহেতু হৃদয়ে এক ভর করে দেবী।

বনবাণী

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

হেমন্তের পীতপত্র আলগ্ন এখনো তরুশাখে
মূর্ছিত সন্ধ্যার আলো অন্তর্লীন যেমন আকাশে
চিহ্নহারা অন্ধকারে শেষ স্নিগ্ধ পরিচয় রাখে
তেমনি বিলীন হবে পাতাঝরা হিমের বাতাসে।

সেদিন শীতের হাত অরণ্যের প্রাণের নিবিড়ে
হিমস্পর্শ দেবে তার ; তবু তারে জানাব স্বাগত-
রিক্তরাত্রি তপস্যায় অন্ধকার তারার তিমিরে
বনবীথি আয়োজন কল্পান্তেও মৌন অব্যাহত।

আবার নতুন লেখা নবপত্রে কচি কিশলয়ে
স্বপ্ন পাখি, প্রজাপতি, প্রাণভূমি স্পন্দিত শ্যামলে
মধু কণ্ঠ, মধু মাস, বনরাজি পুষ্পিত বিস্ময়ে,
প্রথম 'প্রেমের স্পর্শ আকাশে অরণ্য-সভাতলে।'

দেখ তার বুক চিরে জমা কত হেমন্তের রেখা
যা তোমার মধুঋতু সে যে তার মৃত্যু দিয়ে লেখা

অধরা

সুশীলকুমার গুপ্ত

আমার সংসারে নিত্য গোপনে সে করে আনাগোনা।
দেওয়ালঘড়িতে তার হৃৎপিণ্ডধ্বনি, নীল টবে
গোলাপে স্বপ্নের নকশা, ছায়া-তাঁতে আলোশাড়ি-বোনা,
করুণকণ্ঠের সুধা ক্ষরিত পাখির কলরবে।

হাওয়ার নিটোল হাতে লেখে মোছে নাম অপরূপ,
সাজায় ফুলদানি, চুপে চিক তুলে সলজ্জ তাকায়,
উঠোন পিছল করে জল ঢেলে, ভীরু আয়নায়
ছায়া ফেলে, খাঁচা খোলে, জ্বালে তাকে মৃগনাভিধূপ।

টেবিলে কাচের জারে রঙিন মাছের খেলা দেখে
শিশুর বিস্ময়ে হাসে, দেয়ালের মূক চিত্রপটে
মায়াবী দৃশ্যের রঙ আনে, ভরে স্তব্ধতার ঘটে
ঝিঁঝির সুরের মধু, শোয় পাশে হাতে মাথা রেখে।

সে ধরা দেয় না ; শুধু জেলে রাখে রহস্যপিপাসা,
অরূপ কাব্যের বুকে গড়ে চিত্ররূপময় ভাষা।

একটি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

এখানে ওখানে ফ্যাকাশে আকাশ হতাশা-ধূসর বুঝি,
মনের সঙ্গে মিলেছে মেঘের বর্ণেরই বাহাদুরি
হৃদয়টি নিয়ে গভীর স্বপ্ন তখন করেছে চুরি ;
এক বিষাদ অনুভূতিলীনে বুঝেছিই সোজাসুজি।

কিন্তু অনেক পসরা-সজ্জা পৃথিবীর পরিবেশে ;—
সাতরঙা শুধু রামধনুকের রঙিন যে রোশনাই
বর্ষার দিনে চোখে বিদ্যুৎ, কত রূপে ঘোষণাই
প্রকৃতির পটে বিচিত্র যত ঠিক তো প্রাণেই মেশে।

ফুলে আর ফলে নানা রঙ নানা গন্ধের গৌরবে
সবুজ পাতার আড়ালে আড়ালে বাতাসেই দোলাদুলি
একটি সূর্যে রোদের সোনালী হয়তো অনেকগুলি
মাটির জীবনে জাগাবে দীপ্তি প্রাণের তো সৌরভে।

আমরা যখন এবং যদি বা মোদের ছোট্ট মন
মিলে গিয়ে থাকে সেই দিন কোন কাজ থেকে ফুরসতে
মুছে ফেলি যত কান্নায় ফেটে কে জানে সে কার মতে
একটি স্বপ্ন বার বার এসে ছায়া দিলে অনুখন।

গল্প

টাকা

তরুণ রায়

উপন্যাস লেখবার জন্যে বসেছিলাম। ঠিক বসেছিলাম বললে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে না, বরং বলা উচিত—মুডের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। শুনেছি শবরী রামচন্দ্রের জন্যে অপেক্ষা করে তাঁকে নিজের ঘরে এনেছিলেন, শবরীর অপেক্ষা করাও সার্থক হয়েছিল। আমি অপেক্ষা করলাম বটে কিন্তু সে মুড আর এল না।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম, মুডের জন্যে তো রোজই তপস্যা করি—আজও করেছি, তবে আজকের অনুষ্ঠানে ভুল হল কোথায়? বুঝলাম, ভুল হয়েছে নিশ্চয় কিন্তু এমন মনের অবস্থা যে ভুল বোঝারও শক্তি নেই। আবার ভাবলাম ভুল তো অনেক রকমের হয়। এ কি সেই ধরনের কোন মধুর ভুল যা নিয়ে কবিরা গান রচনা করেন, যার জন্যে তরুণ যুবক আনমনা হয়ে যায়, যে কথা স্মরণ করেও বৃদ্ধের মুখে হাসি ফোটে! এ মধুর ভুল তো সকলের জীবনেই কাম্য। আমার জীবনেও যদি আজ ওই ভুল ঘটে থাকে তার জন্যে খুশী হওয়া উচিত। কিন্তু এমনই বরাত, দেখলাম এ ভুল সে মধুর ভুল নয়। তবে এ কী?

মনে পড়ল কাল আমার এক পাতানো দিদির কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠি আত্মীয়তায় ভরা, মিষ্টি কথায় ভর্তি। কিন্তু সারকথা এই বোঝা যায়, কিছু টাকার প্রয়োজন—তাই আমার কাছে এই আবদার। শুনেছি যে আবদার স্নেহের, তা নাকি মিষ্টি; কিন্তু কেন জানি না, আমার কাছে তা মনে হল না। মনে হল, সে খুব চালাক, তাই এই পাতানো সম্বন্ধের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এনে সুবিধে বুঝে দু-ফোঁটা ভেজাল-মেশানো চোখের জল ফেলে টাকাটা আমার কাছ থেকে বার করে নিতে চায়। মনে মনে হাসলাম। আমাকে সে যতটা বোকা ঠাউরেছে, বোকা হলেও ততটা বোকা আমি নই।

এইখানে চিন্তার শেষ হলে কথা ছিল, কিন্তু তা হল কই? ঠিক করলাম টাকা আমি পাঠাব না। কেনই বা পাঠাব? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত খেটে আমি টাকা রোজগার করব, আর একজন শুধু স্নেহের ভণিতায় আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তা নিয়ে যাবে? এই তো প্রথম নয়, এর আগেও ওকে আমি টাকা পাঠিয়েছি। কিন্তু কই, একটা কানাকড়িও তো ফেরত পাই নি!

এমনই মজা যে এখানেও চিন্তাস্রোতকে থামাতে পারলাম না। ভেতরের আমিটা খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দিল, আগেই বা তাকে টাকা দিয়েছিলে কেন? আগে পেয়েছে বলেই এখন চাইতে সাহস করছে। কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু আমার যুক্তিবাদী মন আমার চারধারে যুক্তির বেড়াজাল বুনে ফেলে। তখন সে ছিল সহায়-সম্বলহীনা, তাকে দেখবার কেউ ছিল না। তাই পরোপকারী আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু এখন তার কী দরকার? তার স্বামী আছে, সন্তান আছে, দেখবার হাজারো লোক আছে। আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিতা ওকে আমার সাহায্য করা নিষ্প্রয়োজন।

ভেতরকার অশ্লীল আমিটা হি-হি করে দাঁত বার করে হাসে—তার মানে, সে যতদিন কুমারী ছিল তুমি তাকে সাহায্য করেছ, এখন আর সে রসবোধ পাও না, তাই বলছ তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কথাটা যেন চাবুকের মত আমার গায়ে এসে লাগল। আমার নিজের মন যদি এই কথা ভাবে, অন্য লোকে তো ভাববেই। আর সেও ভাবতে পেছপা হবে না। অতএব কী দরকার এই গোলমালে যাবার! তার চাইতে টাকাটা পাঠিয়ে দিই, সব হাঙ্গামা চুকে যাবে। কিন্তু এ যে মস্ত বড় মিথ্যে, একে স্বীকার করাও যে অন্যায় পাপ।

আবার ভাবলাম, যখন তাকে সাহায্য করেছি তখন নিজেও রোজগার করতাম না, অন্যের কাছে চেয়েচিন্তে এনে সময়-অসময়ে টাকা পাঠিয়েছি। কিন্তু আজ আমি রোজগার করি—যে টাকা সে চেয়েছে, অবহেলায় দিতে পারি। তবু কেন আমি দিচ্ছি না। আমি কি কৃপণ হয়ে

গেছি? যখন হাতে মাত্র দশ টাকা আসত—নিজের অসুবিধে করেও হয়তো দশ টাকাই দান করেছি। কিন্তু এখন সঙ্গে একশো টাকা থাকলেও বোধ হয় তা দিতে পারি না। আগে কেউ টাকা চাইলে চুক্তিহীন ভাবে টাকা দিয়েছি, কিন্তু এখন কাউকে টাকা না দেওয়ার জন্যে হাজারো যুক্তি খুঁজে বেড়াই।

একদিন সত্যিই আমি কবি ছিলাম—যখন প্রকৃতির শোভা আমাকে মুগ্ধ করত, চাঁদের রূপ দেখে খুশী হতাম। আজও হয়তো কবিতা লিখি, কিন্তু বিষয়বস্তু গেছে পালটে। প্রকৃতির সহজ রূপ আর তত ভাল লাগে না। চাঁদের বদলে টাকাই কবিতার প্রেরণা যোগায়। কত অলস-মন্থর মুহূর্তে চাঁদ আর টাকায় তুলনা করি। দুজনেই গোল, দুজনেই রূপোলী। চাঁদের মধ্যে কেউ বাস করতে পারে না, ঠাণ্ডায় জমে যায়। টাকার মধ্যেও কেউ বাস করতে পারে না, নিজের দম্ভে মারা যায়। চাঁদ কবির মনে কল্পনার জাল বোনে, টাকা মানুষের মনে রঙিন স্বপ্নের ছবি আঁকে। যে শিশু চাঁদে হাত দিতে চায়, সে-ই অসুখী; যে মানুষ টাকার মরীচিকা দেখে, সেও মারা যায় তার বাসনাকে অতৃপ্ত রেখে।

যার টাকা নেই সে দুঃখী—এ তার অভাবের জন্যে। যার অভাব নেই সে দুঃখী—অন্যের প্রতি ঈর্ষার জন্যে যার টাকা আছে সেও দুঃখী—তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষ জন্যে। অতএব টাকাই সব দুঃখের মূল। এত ক বুঝি, তবু কেন আমিও সেই খপ্পরে গিয়ে পড়ি তা বুঝ পারি না। তবে এইটুকু বুঝি, সব সাধু সব মহাত্মা রাষ্ট্রনায়ক সব বৈজ্ঞানিক এদের সকলের চাইতেও সে—যে টাকার সৃষ্টি করেছিল। ধন্য তুমি—হে টাব সৃষ্টিকর্তা! মানুষের জীবনের সমস্ত শান্তি তুমি করেছ, তাকে অসুখী করেছ, ক্ষুধার্ত করে তুলেছ, সকল অনুভূতিকে নষ্ট করেছ। ধন্য তুমি—ইতিহা পাতা খুঁজে তোমাকে আমি বার করব। তুমি ম গেছ, কিন্তু তোমার অতৃপ্ত আত্মা মানুষের মনে বাস লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হে নিষ্ঠুর, এই শি উপরে আমি তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করব। অ যাজ্ঞিক—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে তোমার অতৃপ্ত আত্ম তুষ্ট করব। হে ভয়ঙ্কর, তুমি সুন্দর হয়ে ওঠ, মান রাজ্য থেকে তুমি বিদায় নাও। তোমার জাদুক পরশে আর আমাদের পশু করে রেখো না, এ আমাদের মুক্তি দাও। তোমার কাছে এই অ প্রার্থনা।

জীবন ও মৃত্যু

দুর্গাদাস সরকার

জীবন না মৃত্যু বড়
সমাজ চৈতন্য কিংবা শ্মশান সমাধি
অথবা দুয়ের স্বয়ম্বর গূঢ়তর :
এ প্রশ্নের বাদী-প্রতিবাদী
সচল নদীতে মৌন ঘূর্ণি সৃষ্টি করে প্রতি ঘায়
একটি আত্মার দুটি অ-লোক সত্তায়।

মৃত্যুভয় প্রতিক্ষণ, জীবন-জিজ্ঞাসা চিরকাল,
এ দুয়ের মাঝখানে মহাকালধৃত মর্ত্য-হাল।

মৃত্যু নাকি মৃত্যুতেই শেষ,
যে মৃত্যু জীবনে জয়ী—তারও নাকি ছদ্মস্বর্গবে
খাতায় যে থাকে নাম, জ্ঞানের গৌরব,
মূল্য তার সব
যে দেয় সে সজীব প্রাণের শুদ্ধশ্বাস,
সত্য হয়ে ধরা দেয় তখনি আকাশ
পূর্ণ করে খ্যাতি তার পৃথিবীর সন্তান-সন্ততি।

প্রাণেই মূলেই সৃষ্টি। সৃষ্টি হতে প্রাণ।
তারি মধ্যে জয়দৃপ্ত জীবনের আদিগন্ত গান।

জিনিয়াস

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ভবিতব্যের আক্রোশ পিছু নিয়েছিল, অকস্মাৎ শরীরে ঘুণ ধরার নোটিস পেলাম। মামলা সামলাতে চিকিৎসা-সঙ্কট এসে উপস্থিত। গৃহস্থ-চালেই কিছুদিন ওষুধ-পথ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা চলছিল, কিন্তু রোগের উপর সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ায় চিকিৎসা ধুম করে শুরু হল। ঘটনাটি দাঁড়াল ঢাকঢোল বাজিয়ে রোগের উৎসব।

চোখের জল, মাথার ঘাম, তাজা রক্ত ইত্যাদি শরীরের যাবতীয় ক্লেদ ও সার পদার্থের পরীক্ষা এমনই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চলতে লাগল যে রোগ নির্ণয়ের পথে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কথায় কথায় হোঁচট খেতে লাগলেন। হোঁচটের সঙ্গে বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ ঘটায় ফৌজদারী মামলার সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠল। প্রমাদ অবস্থা, তর্ক হাতাহাতির দিকে এগিয়ে যেতে সকলেই বুঝলেন, হাসপাতালে নিজেদের মাথা ফাটিয়ে রোগী হওয়া অপেক্ষা মিলে মিশে একটা রোগ সাব্যস্ত করে ফেলা ভাল। সুবুদ্ধি ঘটে আসতে সকলেই ঠিক করলেন, রোগটা super hypertension (সুপারহাইপারটেনশন)।

শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে রোগের নামকরণ হতেই খবর দ্রুত রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। হিতৈষীরা একের পর এক বাড়িতে হানা দিতে লাগলেন। ভিড় করে সমবেদনা জমাট বাঁধতে লাগল। আমাকেও ভদ্রাচার সম্বন্ধে সাবধান হতে হল, পাছে নিঃস্বার্থ দরদীদের ওপর কোন অপ্রিয় কথা বলে ফেলি। ওই তো আমার রোগ। সব সময় মেজাজ তুড়িলাফ খাচ্ছে। অকারণ কটু কথা বলা প্রায় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

একজন এসে জানালেন, মেজাজটা—কি বলে, চড়া হয়ে গিয়েছে, একটু সামলে চল হে—রক্তের উপর চাপ ভাল কথা নয়। হাই ব্লাড-প্রেসার তেড়ে উঠলে যে কোন সময় কলজে পর্যন্ত চৌচির হয়ে যেতে পারে। তখন দামী প্রাণটাই বেহাত হয়ে যাবে। একবার মরলে আর ফিরে দেখতে হবে না। তাই বলি সামলে চল! প্রাণটা যে আমার কাছে দামী এবং একবার মরলে যে বরাবরের মতই মরতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু প্রাণ বেহাত বা বেদখল হলে কোন আদালতে স্বত্বাধিকারীর দাবি পেশ করতে হবে তা তো জানা নেই। বন্ধু ভয় দেখিয়ে চলে গেলেন কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করলেন না। প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত অবস্থা। দুশ্চিন্তা যখন অথৈ পাথারে খাবি খাচ্ছে তখন আর এক বন্ধু গোপনীয়কে আড়ালের বাইরে আনার জন্য অস্থির। চুপি চুপি বলে গেলেন, সকলের কথায় কান দিয়ো না। ভয় পাবার মত কিছু হয় নি। ভগবৎকৃপা থাকলে তোমাকে সেরে উঠতেই হবে, তবে না সারা পর্যন্ত ভোগান্তি আছে ওইটুকুই যা কষ্ট। তা বাপু তুমি যে রোগ বাধিয়েছ, তাতে অনেক বিষয় সাংঘাতিক ভয়ের কারণ আছে বইকি। চড়া রক্তের কারবার কি না, চিন্তাশক্তি পর্যন্ত অনেক সময় গোলমেলে হয়ে যায়। মানে কি আর বলব, তুমি তো সবই বোঝ—রক্তের চাপ চড়তে চড়তে মাথায় গিয়ে উঠলেই চমৎকার—মানে কি বলে তুমি তো সবই বোঝ। এতটা বলার পর যা বোঝানোর দরকার তাই অব্যক্ত রেখে বন্ধু বিদায় নিলেন। যা অব্যক্ত রইল, তার গভীর অর্থ তলিয়ে দেখলে দাঁড়ায়, রোগ আমার বহুরূপী, পাগল না হবার সম্ভাবনাও বাদ পড়ে নি। গোলমেলে ভবিষ্যতের চিন্তায় কাবু হয়ে পড়েছিলাম। কাকেই বা দুঃখের কাহিনী বলি, কেই বা নিত্যনতুন ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। যার কাছেই উপদেশ চাই সেই নতুন রোগের সন্ধান দিয়ে যায়।

চরম সময়ে দৈবকৃপার নাগাল পাওয়া গেল। আর একজন বন্ধু এসে ভরসা দিয়ে গেলেন, পাগল হওয়া একটা নতুন খবর নয়। তুমিও যেমন, পাগল নয় কে হে। দুনিয়াসুদ্ধ সকলেই পাগল। এই ধর না জিনিয়াস পাগল, প্রেমের পাগল, ভক্তির পাগল, রূপের পাগল, রসের পাগল, যাকে বলে রস-ক্ষ্যাপা, সহজ পাগল, বদ্ধ পাগল—ওরা সকলেই পাগল। যে যার তালে আছে। একের সঙ্গে অপরের যা প্রভেদ তা শুর ও শ্রেণীর। যেমন চালাক আর বদ্ধ পাগল। যে বেটা চালাক সে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায় এবং যে বেটা বদ্ধ পাগল সে আপনাকে নিয়েই বিভোর, সে রাজাও সাজে, ফকিরও বনে, দুনিয়াকে একাকার দেখে। শেষেরটিই শুধু নিরীহ নয়, নির্লিপ্তও বটে, কাঁঠাল ভাঙা ওর ধাতে সয় না। তুমি হলে পয়লা নম্বরের পাগল, অর্থাৎ তুমি জিনিয়াস। তোমার জাতে আভিজাত্যের ছোঁয়া লেগেছে, একটু নয়, বেশ খানিকটা। আমি বলি, বিষে বিষক্ষয়ের ওষুধ লাগাও। পাগলই যদি হতে হয় তো জাতের ইজ্জত বাঁচিয়ে পাগল হও। এর জন্যে প্রোগ্রেসিভ আবহাওয়ার দরকার। এইটুকু বদল হলেই বাজিমাত—রাতারাতি প্রতিষ্ঠার আগডালে গিয়ে উঠবে। তখন তোমার হাঁচি-কাশি, গলাখাঁকরানি, সর্দি সব কিছুই খবর হিসাবে কাগজে বেরুতে থাকবে, এমন কি সিনেমার নামকরা তারকাও প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে হয়তো গোটা আধ-মিনিট কথা বলে ফেলতে পারে। এর চেয়ে বড় সম্মান তুমি কি আশা করতে পার? সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে নিজের ফটো তুলে রেখ। একটি করে হাঁচি আর একটি করে ফোটো ছাড়তে পারলেই হল, তোমার রোগও সারবে আর নামের posterity (পশ্চারিটি)ও কায়েমী হতে থাকবে। দেখতে দেখতে যখন তুমি স্বনামধন্য মহামান্যবর ব্যক্তি হয়ে উঠবে তখন কিন্তু এই শর্মাকে মনে রেখ ভায়া।

বন্ধুর হেঁয়ালিপূর্ণ প্রস্তাব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমার মানসিক অবস্থা সুস্থ নয় দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী মাথা চুলকোতে লাগলেন—যেন লাভজনক ব্যবসায় মোটা অঙ্কের গলদ এনে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরে গুছনো ভাষায় বন্ধু বললেন, যা বুঝছি তাতে রোগের চিন্তাকে ঘোরানো দরকার, এমন চিন্তা যাতে মন প্রফুল্ল হয়ে তোমাকে ছবি আঁকতে হবে, হাল-ফ্যাশনের চালের ছবি। যে ছবিতে রূপের গন্ধ পাওয়া ছবির মানুষ ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসে, কথা কয়, যা বলে তা চোখ দিয়ে শুনতে হয়। রূপসৃষ্টির তা তোমার উপর ভর করেছে। প্রভাবের লক্ষণ তো সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। অমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ো না, রূপের গন্ধ চোখ দিয়ে শোনার কথা পরে বুঝিয়ে দেব। ওসব কথা ভাববার সময় নেই। রোগটা জাঁ ধরনের, বুনো ওলের ঝাঁজ আছে, সুতরাং ওষুধে তেঁতুল না লাগালে তুমি গেলে। বিষে বিষক্ষয়— ধরেছি, তোমাকে পাগল হয়েই মাথার রোগ সা হবে। সৃষ্টির আবেগকে বাধা দেওয়া কোন কাজের নয়। কালই তোমাকে রঙ তুলি ইত্যাদি ছবি আঁ সরঞ্জাম কিনে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর আগে কিছু রেখে যেতে চাই। কিছু না পারি অন্ততঃ একজন sophisticated (আনসফিস্টিকেটেড) ভেজালহীন শি যদি তৈরি করে যেতে পারি, তা হলে কৃষ্টির কো অ দেওয়া অর্ঘ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুমি এখন উপযুক্ত পাগল হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অ্যাকাডে আদর্শের ভুলভ্রান্তি থেকে নিরীহ বেচারা শিক্ষার্থীরা যায়, তুমিও রোগমুক্ত হও।

উত্তরে বললাম, সে কী কথা, আমি তো কখনও আঁকি নি। আর আবেগ-টাবেগ কী বলছ, ওসব ব আমার কখনও ছিল না। না বাপু, অযথা রঙ কিনে ঝামেলা বাড়িয়ো না। এমনিতেই অসুখের জ অস্থির, তার উপর চোখ দিয়ে শোনা, কান দিয়ে শোঁকা, ফ্রেম টপকানো ছবির মানুষের সঙ্গে কথা আমার দ্বারা হবে না।

আমার কথা শুনে হিতৈষী কেমন বিমর্ষ হয়ে গে তিনি দুঃখ পান এমনটি চাই নি। ভাবলাম, সাজলেই তো পাগল হচ্ছি না। আর তুলি ধ কেউ আমাকে শিল্পী বলবে না। চিন্তা বন্ধুর শুভেচ্ছ সমর্থন করার জন্য বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে

৳ দ্বিধা বাগড়া দিচ্ছিল সেইটুকু খোলসা করে নেবার জিজ্ঞাসা করলাম, রোগমুক্তির জন্য না হয় পাগল নাম, রঙ তুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। কিন্তু করতে গিয়ে যদি সত্যিই পাগল হয়ে যাই তা হলে র অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছ? মি থেকে পরিত্রাণ পেলেও শিল্পী ঘাড় কামড়ে করছি কি? শুনেছি, ছবি আঁকার নেশা নাকি র দমের মত ব্যোমে চড়িয়ে ছাড়ে। ছবি আঁকার একবার মনেপ্রাণে লেগে গেলে সব একাকার হয়ে তখন রাজা, উজির, প্রজা, আবালবৃদ্ধবনিতা, জ্ঞ আনাড়ী সকলেই নেমে আসে মাইরী-মার্কা রর ধাপে। আমি কি অতটা প্রগতিশীল হতে ? গুরুজনদের এখনও প্রণাম করি, গুণীর সামনে না থেকেই যে মাথা নত হয়ে যায়।

ন্ধু উত্তর দিলেন, গুরুজনকে প্রণাম করা, বা গুণীর ন মাথা নত করা খুব সুস্থ মনের লক্ষণ, এমন কথা কোচে বলতে পারি না। গুণীকে মানা মানেই তে স্বাক্ষরের সংখ্যা বাড়ানো। যুগপরিবর্তন হয়েছে, খোঁচা মেরে এখন আর ছবিতে বা মূর্তিগঠনে nwork (টিমওয়ার্ক) চলবে না। রূপের formalised লাইজ্‌ড্‌) আদর্শও সম্পূর্ণ অচল। আজকের শিল্পী র কথা বলে। ইণ্ডিভিডুয়ালিটির যুগে কেউ মাটির স্নতা আঁকড়ে থাকে না। যে যুগে হাইড্রোজেন বম হয়, চন্দ্রলোকে বাড়িভাড়া পাওয়া যায়, সে যুগে মাটি ড় থাকা ব্যাকডেটেড মানুষের কারবার! আজকের সবই "আমি"। রূপ অরূপে পরিণত হয়েছে— স্ট্র্যাকশনকে না পাকড়ালে নিজের সত্তাকে অস্বীকার ত হবে। সবই মাটির ঊর্ধ্বে। তোমার মধ্যে যে অহং আছে তাকে বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে 'I'-এর শুরু করে দাও। বন্ধু আরও কি সব দুর্বোধ্য যুক্তি হর চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছি দেখে, বক্তব্যকে সুবিধাজনক করে নিয়ে বললেন, শ্চর্য, আমি যা ভাবছি, তুমিও সেই রাস্তা ধরেছ। কে যে শ্রেণীর পাগল বানাতে চাইছি তুমি দেখছি লাক্রমে সেই ধাপে উঠে গিয়েছ। তুমি আসলে ষ্টির জন্য জন্মেছ, তোমার কাছ থেকে রসের কথা শোনার জন্য রসিক উন্মুখ হয়ে আছে। তুমি জিনিয়াস, সুতরাং রসগ্রাহীকে তৃষ্ণার্ত রাখার অধিকার তোমার নেই। তোমার কাছ থেকে বৃহত্তর দানের জন্য আমরা সকলে অপেক্ষা করছি। সবই নির্ভর করছে তোমার কায়মনোবাক্যে পাগল হবার ওপর। এতটা বলে বন্ধু বিদায় নিলেন।

রোগের পীড়ন তখন সহ্যের সীমায় এসে গিয়েছে। পরিত্রাণের যে কোন প্রস্তাবকেই সাদরে গ্রহণ করা প্রায় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিষে বিষক্ষয়ের কথাই ভাবছিলাম। আর্টের জটিল বিশ্লেষণ না বুঝলেও, দ্বিধার বাধা ইতিমধ্যে অন্তর্ধান করেছে। বাস্তবিকই নিজেকে জিনিয়াস ভাবছি। স্থির বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে, আমার দানে কার্পণ্য এসে পড়লে ইতিহাসের একটি পাতা খালি থেকে যাবে। সুতরাং পাগল না হলেই নয়।

বন্ধুর হিতোপদেশ আমাকে সম্মোহিতের মত করে ফেলেছিল। মন-মাতানো রঙের আকর্ষণে বিভোর হয়ে গিয়েছি, মাতালের মত মন টলছে। বালসুলভ কৌতূহল ছবিকে জানার জন্য অস্থির। ভাবপ্রবণতা ও ছবি আঁকার প্রয়াস, আত্মপ্রকাশের জন্য পথ খুঁজে চলছে। রূপসৃষ্টির চক্রান্ত এলোমেলো ভাষায় কত কী বলে তার ঠিকানা নেই। ভাষণ কখনও চুপি চুপি কথা কয়, কখনও চাপা চিৎকার দ্বারা আত্মজাহিরের জন্য ব্যস্ত হয়। ভবিষ্যতের ঘটনা বাস্তব হয়ে ওঠে, দেখি কাগজে কাগজে আমার নাম। আমাকে কেন্দ্র করে ছোট বড় ঘটনার বিবৃতি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হচ্ছে, বাস্তবিকই আমি মান্যবর ব্যক্তি হয়ে গিয়েছি। এইরূপ মানসিক অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ক্রমান্বয়ে চিন্তাশক্তি অনির্ভরশীল হয়ে আসতে লাগল। অবসাদগ্রস্ত মনকে বেশীক্ষণ সজাগ রাখতে পারলাম না। ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে পড়লাম।

গাঢ় নিদ্রার পর, প্রায় ধাতস্থ বোধ করছি, সম্মোহনের আধিপত্য নিস্তেজ হয়ে এসেছে। বিচারশক্তি এখন নির্ভরশীল। এই সময় বন্ধু ফিরে এলেন, সঙ্গে ছোট বড় ছিমছাম সাহেবী ধরনের কতকগুলি পুলিন্দা। আবরণ মুক্ত হতে দেখি, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, তুলি রঙ কাগজ আরও কত কি—সকলের নামও জানি না। ভাবতে

লাগলাম লোকটা আমাকে পাগল বানাতে গিয়ে নিজেই পাগল হয়ে গেল না কি? গুচ্ছের খানেক টাকা খরচ করে সাহেবী দোকান থেকে এতগুলি দামী জিনিস কিনে আনল, সবই তো নষ্ট হবে। আত্মপ্রশ্ন নিজের অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। বন্ধুর সে দিকে লক্ষ্য নেই, বাণ্ডিল খোলার ব্যস্ততায় তন্ময় হয়ে ছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হল, বাণ্ডিলের ভিতর সাত রাজার ঐশ্বর্য লুকনো আছে। মেঝের উপর জিনিয়াস গড়ার মাল-মসলা গুছিয়ে রাখতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। এতক্ষণ পরে আমার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবকাশ পেলেন। আমার দিকে তাকাতেই, তাঁর চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল—বাঘ শিকার ধরার আগের মুহূর্তের মত। ভেক যেমন সাপের দৃষ্টির সামনে আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, আমিও তেমনি আবার নিজেকে হারালাম। এই সময় শুনতে পেলাম বন্ধু বলছেন, পেয়ে গিয়েছি। বিস্ময়-জড়িত বিস্ফারিত নেত্রে বেশ খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে যেতে লাগলেন, কী অপূর্ব জ্যোতির্ময় কান্তি। তোমার নিজের চেহারা আয়নায় ভাল করে দেখেছ? দেখেছ কি তোমার ভিতর থেকে জিনিয়াসের পার্সনালিটি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে! আশ্চর্যের কথা, এত বড় শক্তিকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেমন করে? প্রশ্নের মধ্যে শ্লেষ বা রসিকতার কোনরূপ আভাসমাত্রও নেই। মনে হল, বন্ধু অন্তর্যামী, অবচেতন মনের খবর তাঁর কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সোজা চলে গেলাম প্রসাধন-ঘরে। আপাদ-লম্বিত দর্পণের সামনে দাঁড়ালাম, জ্যোতির্ময় রূপ দেখার জন্য। কী সর্বনাশ! প্রতিবিম্ব দেখে আঁতকে উঠলাম। স্বাস্থ্যোন্নতির সাধনায় আমি আধখানা হয়ে গিয়েছি। ডাক্তারী মতে মেদ বর্জনের প্রয়োজন হওয়ায়, স্বল্পাহার নিক্তির ওজনে এসে গিয়েছিল। ফলে আমার পুষ্ট গাল চুপসে গিয়েছে, নধর উদরের পাত্তা নেই, চোখের তলায় গাঢ় কালিমা। সপ্তাহ খানেক ক্ষৌরকার্যের অভাবে, সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা কালো-সাদা দাড়ি-গোঁফ বেরিয়েছে। বীভৎস চেহারা দেখে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, জিনিয়াস হতে হলে কি এই রকম না হলেই নয়?

বন্ধু যেন শিকার নিয়ে খেলা করছিলেন, একটু পরে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। তখন আমি অস্বস্তিব দাড়ির উপর হাত বোলাচ্ছিলাম। স্পর্শানুভূতিতে ম হচ্ছিল মুখের উপর একরাশ ছারপোকা চরে বেড়াচ্ছে বন্ধু দাড়িতে হাত বোলানই দেখছিলেন, বললেন, ওটা দরকার হবে—আর একটু বড় হলেই কাজে লাগা চাই। শিজান (Cezan) প্যাটার্নই তোমার মুখে খ খাবে ভাল, বোহেমিয়ান চাল চলবে না। সাদা-কালে হুড়োমুড়ি রয়েছে কিনা! একটু ধৈর্য ধর, কয়েক পরেই দেখবে তোমার নব কলেবর। খোঁচা খো দাড়িতে প্যাটার্নের বাহার। কোটরগত চক্ষু ও তোবড়া গালের সাহায্যে নব কলেবরের ব্যাখ্যা শুনে খুব উৎসাহি হয়ে উঠছিলাম না। একদিকে ডাক্তারের তোয়া অনশন, অপর দিকে জিনিয়াসের আবির্ভাবে অ শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। দাড়ির প্যাটার্ন সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করার আগেই বন্ধু ব্যাখ্যা শুরু করলেন, তো দরকার ইন্টেলেকচুয়াল দাড়ি, তার তোয়াজই আলা জিনিয়াস হতে গেলে কেবল তুলি চালালেই চলে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চাই। তাই দাড়ির ব্যাখ্যা দিচ্ছি এইবার পরিচ্ছদের কথায় আসি। সোজা কথা. ঢিলে পাঞ্জাবি আর পায়জামাকে বর্জন করতে হ গোড়ালিচুম্বিত গলাবন্ধ জুব্বা দরকার। খাস লক্ষ্ণৌ সুর্মা-পরা দরজীকে বলে এসেছি, আজকালের ম মাপ নেবার জন্য এসে যাবে। আঁট-সাঁট ছাঁট ঘাবড়ো না, ওই হল এদেশে আধুনিক জাত-জিনিয়া ফ্যাশন। প্রথম দর্শনেই লোকে বলে দেবে পয়লা চলেছে। চুড়িদার জুব্বা মানানসই করে পরতে ধৈর্যের দরকার হয়। অনেক সময় চামড়াও ছেঁড়ে, ক দুজন মানুষ টান না মারলে জুব্বার হাতার খানি তিব্বতী জামার মত বাইরেই থেকে যায়। হাজার ফ্যাসানেব্‌ল টাইট ফিটিং তো, কত আর ঢিলে যায়? পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বন্ধু জানালেন, কাবুলী ধর বাঙালী মালকোঁচা, যদি ওই মালদার জুব্বার সঙ্গে প পার তা হলে তো সোনায় সোহাগা। গোঁফ পরিচ্ছদ সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেল, এইবার তো আবেষ্টনীর কথা বলি। কারুকার্যখচিত চৈনিক,

্যান, ভিক্টোরিয়া, বা ডাচ বার্গোমাস্টার আমলের চেয়ার-টেবিল আজকাল কি বলে একেবারে 'ছ্যাঃয়ে'র প্তরে পড়েছে। ওদিকে তাকাবার উপায় নেই, যত ত্র পার ঘর থেকে বিদায় কর। দাম দিয়ে কেউ কিনবে া, সুতরাং চক্ষুশূল বস্তুগুলির সৎকার হওয়া দরকার। আমি বলতে চেয়েছিলাম, জ্বালানী কাঠ করে ফেল। য ফ্যাশন মরেছে তার সান্নিধ্য মানেই ভূতের সঙ্গে হবাস। অর্থাৎ তুমি এখন প্রেতলোকে বাস করছ— াঁচার মধ্যে ফিরে এস, তা নইলে রোগও সারবে না। ড়ার দাবিও কায়েমী হয়ে যাবে। বন্ধুর বলার ভঙ্গীতে কেমন একটা দরদ ছিল, কোন কথাই অবিশ্বাস করতে পারলাম না। বীভৎস দাড়িকেই দেহের বাহার বলে মেনে নিলাম। কিন্তু বাপ-দাদার আমলের আসবাবপত্র সম্বন্ধে এক কথায় সায় দিতে পারছিলাম না। অনেক ঘরোয়া কথা ওদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানি, যাদের সঙ্গে ওদের প্রথম পরিচয় তারা অতীত যুগের মানুষ। তাঁরা চলে গেলেও স্মৃতি তো মরে নি। নয়া চালের টেবিল-চেয়ার সম্বন্ধে দ্বিধার কারণ কি একটা? শূন্যে ঝোলা পায়াহীন কাঠামো দেখলেই আতঙ্ক এসে উপস্থিত হয়, বুক দুরদুর করে ওঠে, মনে হয় বসতে গেলেই হাসপাতালে যাবার ব্যবস্থা হল। সেজেগুজে আছাড় খাওয়াটা ফ্যাশনসম্মত হলেও শরীরের কথা ভেবে একটু ইতস্তত করছিলাম। বললাম, তা হলে স্টীল পাইপের চেয়ার-টেবিলগুলো ঘরে ঢুকবে নাকি? ওগুলো দেখলেই যে আমার আতঙ্ক আসে—আতঙ্কের সঙ্গে কি হাইপার-টেনশনের সোহাগ চলবে? আশা করেছিলাম কাতর আবেদনে বন্ধু গলে যাবেন। হল বিপরীত। পরোপকার-ব্রতে বন্ধু আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কর্তব্যের কড়া পাহারা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খাড়া ছিল, প্রশ্ন তাঁর প্রিন্সিপাল-এর খোঁচা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বন্ধুও বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। খুব সম্ভবতঃ মনে মনে যুক্তিকে শানিয়ে নিচ্ছিলেন। উত্তর যা শুনলাম তার অর্থকরণ আমার দ্বারা সম্ভব হল না। সোহাগকে সূত্র করে বন্ধু তখন বলে চলেছেন, রসের সংস্পর্শে সোহাগের আবর্তন মানেই প্রেমঘেঁষা কারবার। সুন্দরের ছোঁয়া লাগা প্রেম, একবার অন্তরকে নাড়া দিলে ভাল-মন্দর বিচারে বসার সময় থাকে না—এটা ঋষিবাক্য। বিশ্বাসের উপর বিশ্লেষণ চড়াও হলে শালগ্রামশিলা পর্যন্ত দেবাসন-ভ্রষ্ট হয়ে সাধারণ পাথরের নুড়ি হয়ে যায়। সুতরাং ভক্তি বল, ভালবাসা বল, প্রেম বল, এমন কি চলতি ফ্যাশনকে মানাও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যার মধ্যে যে গুণ চাও, দেখবে বিশ্বাস আগলিয়ে রেখেছে তোমারই আনন্দের জন্য। যুক্তির আশ্রয় নিলে নাজেহাল হয়ে যাবে, মীমাংসার নাগাল পাবে না, তাই বলি আমার মত হিতাকাঙ্ক্ষীর উপর বিশ্বাস হারিয়ো না, যা বলি করে যাও। আরও বলি, আতঙ্কই যদি বিশ্বাসের উপর বিদ্বেষ এনে থাকে তো তোমার জেনে রাখা ভাল যে শিল্পশাস্ত্রে আতঙ্ককেও একটি রসের নির্যাস বলে ধরা হয়। সুতরাং রূপের আওতা থেকে লোমহর্ষকারক ঘটনাকে বাদ দিতে পার না। জিনিয়াস হতে হলে তোমাকে একবার নয়, বহুবার আছাড় খেতে হবে। আছাড় কি কেবল চেয়ার থেকে পতন! রসবোধ ও জ্ঞানের পথে এগুতে হলে আছাড়ই তোমার মূলধন। বন্ধু আছাড়ের সঙ্গে বিশ্বাসকে এমনভাবেই জড়িয়ে দিলেন যে গত্যন্তরে মেনে নিলাম দুর্ভোগকে এড়ানো চলবে না। বন্ধু আমাকে ঠিক চিনেছিলেন। নিজেকে জিনিয়াস ভাবা সম্বন্ধে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল তা বিশ্বাসের শাসনে শায়েস্তা হয়ে গেল।

উক্ত ঘটনার পর কিছুদিন কেটে গিয়েছে। শাস্ত্র-সম্মত চিকিৎসার পর্ব শেষ হয়েছে, ছবির ছোঁয়ায় সুস্থ হয়ে উঠছি। পুরোদমে ছবি আঁকছি—দিনে তিন চারটের কম নয়। আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বন্ধুর অক্লান্ত চেষ্টায় জিনিয়াসের প্রতিকৃতিও ছাপা হয়েছে। ছবির তলায় আমার নাম না থাকলে আসল মানুষকে চেনা সম্ভব হত না। নব কলেবর ও জ্যোতির্ময় কান্তি আমাকে আড়াল করলেও নামকে ঢাকে নি। নিজেকে হারালেও নাম যে ভবিষ্যতের মানুষকে গড়ে তুলছে তাতে সন্দেহ নেই। মোট কথা রূপসৃষ্টির দীক্ষা বাস্তবিকই আমাকে ক্ষ্যাপার মত ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে।

কিছুদিন হল বন্ধুর দেখা নেই। কাগজেও নামের আওয়াজ শুনি না। এদিকে যেদিন থেকে বন্ধু শদির সঙ্গে খ্যাতির যোগ ঘটিয়েছেন সেই দিন থেকেই

সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরখ করার জন্য বহুবার নাকে কাঠি দিয়ে সাংঘাতিক ভাবে হেঁচেছি—ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্দি,কাশি ডেকে এনেছি। ওই কারণে জ্বরে পর্যন্ত ভুগেছি, তথাপি সম্পাদকীয় হৃদয়কে সজাগ করতে পারি নি। ব্যর্থতায় বিশ্বাসের উপরই বীতরাগ এসে গিয়েছে, ভেবেছি, তবে কি আসলে আমি জিনিয়াস নই? বন্ধুর কলমই আমাকে জিনিয়াস করল? উত্তেজনা কমে গেলে সান্ত্বনা কানের কাছে বলে গেছে, ধৈর্যই হল জিনিয়াসের বৃহৎ সম্পদ, অবুঝদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যথাসময়ে তোমার পাওনা উপযুক্ত ভাবেই পেয়ে যাবে।

ধৈর্যকে আঁকড়ে থাকায় আঁকারও বিরাম নেই। দিনের পর দিন ছবির বংশবৃদ্ধি হয়ে চলেছে। টাকাও খরচ হচ্ছে জলের মত। দুজন উপরি খানসামা বাহাল হয়েছে গোড়ালি-চুম্বিত জুব্বা পরাবার জন্যে। এর উপর তিনজন ওস্তাদ কাঠের মিস্ত্রী প্রত্যহ নতুন ছবির ফ্রেম করে চলেছে। ফ্রেম ছবি আঁকার আগেই প্রস্তুত থাকা দরকার, কারণ আমি ফ্রেমের সামঞ্জস্যে ছবি আঁকি—কোন বিশেষ ছবির জন্য ফ্রেম তৈরি হয় না। দম দেওয়া কলের মত ছবি এঁকে চলেছি। থামবার উপায় নেই। অপর দিকে সৃষ্টির দ্রুতগামী গতিকে সামলাতে হলে একমাত্র পথ ছুতোর মিস্ত্রীদের বিদায় করে দেওয়া। স্থির ধারণা জন্মাল, ওদের কর্মদক্ষতাতেই আমার দুর্ভোগ বেড়ে চলেছে। দুঃখের কারণকে সামনে পেতেই গলা টিপে ধরার মত এক কথায় ওদের জবাব দিয়ে দিলাম। ফলে নতুন উপসর্গ এসে জুটল পুলিস কোর্টে, ছোটাছুটির হাঙ্গামায় পড়ে গেলাম। ঘটনাটি এইরূপ:—মিস্ত্রীদের হঠাৎ ছাড়িয়ে দেওয়ায় তারা চলতি প্রথায় মনিবকে চোস্ত ভাষায় গালাগালি দিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিল। দরোয়ানদের পালোয়ানী ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। প্রভুভক্তি দেখানোর এমন সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে পারে নি। কয়েক ঘা চড় মেরে গালিগালাজ বন্ধ করতে চেয়েছিল। পালোয়ানী চড়ে খোকাকে আদর করার মৃদু স্পর্শ ছিল না। এই কারণে মিস্ত্রীদের মুখশ্রীর কিছু পরিবর্তন ঘটে, দু-চার জায়গা কেটে রক্ত বার হয়, শক্ত দাঁত নরম হয়ে যায়। পালোয়ানী এই ঘটনার জন্য একেবারে পুলিস-কেস। মোকদ্দমা চলতে থাকুক। আদালতের বিশদ বিবরণ দিয়ে উপস্থিত পাতা ভর্তি করতে চাই না।

ছবি আঁকা বন্ধ হওয়ায় নিজেকে ফিরে পেতে লাগলাম। চিন্তাকে ঘাঁটাতে গিয়ে মনে হল ছবি আঁকাই আসল রোগ, বাকিগুলি উপসর্গ মাত্র। নিজে আমি চিন্তা করতে পারি, এইটুকু ধারণা যখন সবে প্রকৃতিস্থ হবার সুযোগ দিতে আরম্ভ করেছে তখন বিনা নোটিসে বন্ধু উপস্থিত হলেন—সঙ্গে কয়েকজন সাহেব মেম। বেলা তখন দুপুরঘেঁষা, আহারান্তে দিবানিদ্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। সাহেব-মেমেদের দেহে দোলায়মান ক্যামেরা দেখে অনুমান করে নিলাম, আর কিছু লাভ হোক বা না হোক আজ দু-চারটে ফোটো উঠবেই। সুতরাং অতিথিদের সম্বর্ধনার প্রয়োজন আছে। যথারীতি বৈদেশিক প্রথায় পরিচয়ের পালা শেষ হতে, ক্যামেরা-সংযুক্ত বৈদ্যুতিক আলো চমকাতে লাগল। আমি নানা ভঙ্গীতে ক্যামেরার ভিতর আটক পড়তে লাগলাম।

খাঁটি মেমসাহেব আমার ফোটো তোলায় আত্মতুষ্টিতে মন প্রায় ভরে উঠেছিল। যে সময় ফোটো তোলা হচ্ছিল তখন আমি ভাবছিলাম ওরা আমার নাম কাঁধে করে দেশদেশান্তরে নিয়ে যাবে, আমার কাজ সম্বন্ধে কত কথাই বলবে। আকস্মিক আনন্দের ধাক্কা এমনভাবেই ভিতরে আলোড়ন তুলল যে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কথা বলার চেষ্টা করলেই দেখি ভাষা জড়িয়ে যাচ্ছে, থেকে থেকে তোতলার মত হয়ে যাচ্ছি। এদিকে মেমসাহেব আধ আধ ভাষায় প্রশ্ন করে চলেছেন। তোতলামি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আমি মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। আমার ব্যবহারে বন্ধু বিরক্ত হয়ে উঠেছেন কিন্তু ঘটনাটি লঘু করার প্রয়োজন থাকায় মেমসাহেবকে জানালেন, গত মাস থেকে আমি মৌনব্রত গ্রহণ করেছি। মৌনী বলতে কি বোঝায়, এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কিভাবে প্রাচীন ঋষিরা কথার অপচয়কে শাসনাধীন করতেন তার পূর্ণ ব্যাখ্যা মুখস্থ বলার মত আবৃত্তি করে গেলেন। বর্ণনার বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ায় মেমসাহেব দেখলাম সব কথা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। আমি যে ঋষিতুল্য মানুষ তাতে আর সন্দেহ নেই। একে জিনিয়াস, তার উপর ঋষি! মেমসাহেব আমার দিকে বিস্ময়পূর্ণ

মেঝের তাকিয়ে রইলেন। আমার অবস্থা তখন কি রকম না বলাই ভাল। বন্ধু বোধ হয় এতটা আশা করেন নি। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। বলতে চেয়েছিলাম, মেমসাহেব, কোন্ দুঃখে আমি বোবা হতে গেলাম! ঋষি বলতে যা বোঝায় তার কোন গুণই আমার নেই, আমার কোন পুরুষে কারও ছিল না। কিন্তু আমি কিছু বলবার চেষ্টা করছি দেখেই বন্ধু দৃঢ়বদ্ধ জোড়হস্ত মুখের সামনে এনে বললেন, এখন কোন পাপ কথা মুখে এনো না, তোতলামি করলেই সব কিছু ভেস্তে যাবে। তোমার যা বলবার আছে তা আমি জানি এবং আমাকেই বলতে হবে। মনে রেখ, সাহেবরা চলে গেলেই নতুন ওষুধের কথা বলবার আছে। বন্ধু দৃঢ়বদ্ধ জোড়হস্তে দাঁড়াতেই, সাহেব-মেম সকলেই মানুষ-পূজার ফোটো তুলে নিলেন। দেশে গিয়ে নিশ্চয় দেখাবেন কিভাবে মৌনীর পূজা আজও ভারতে হয়ে থাকে।

এর ফাঁকে একজন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আমার শিক্ষাগুরু কে? বন্ধু পাশেই বসে ছিলেন। হঠাৎ ঊর্ধ্বে তর্জনী খাড়া করে জানিয়ে দিলেন, শিক্ষক স্বয়ং ভগবান। এত বড় মিথ্যাকে হজম করায় অসুবিধা বোধ করছিলাম। বন্ধু আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে বলে চললেন, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দীক্ষামন্ত্র হল স্বাতন্ত্র্যবাদ। সুতরাং মানতেই হবে, প্রকাশভঙ্গিতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, রূপসৃষ্টির শেষ কথা। অতএব কে শিক্ষক, কী প্রথায় শিক্ষা, কতটা জ্ঞান লাভ হয়েছে জানার চেষ্টা অর্থহীন। এই সূত্রে নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে, গুরুকে মানামানি পৈশাচিক আবিট্রেশনকে প্রশ্রয় দেওয়া। গুরুর দলই হল দাসত্বের আদি পৃষ্ঠপোষক। ওরা শিষ্যদের ভেড়ার মত চরিয়ে স্বার্থ-সাধন করে। মেষেরও আহার সম্বন্ধে নিজস্ব রুচি আছে, কিন্তু মেষপালকের আদেশ মানতে হলে ইচ্ছানুযায়ী আহার খুঁজে নেবার অধিকার নেই। আশা করি মানুষকে ভেড়া বানাতে চান না। বন্ধুর গভীর চিন্তাশীলতা ও দৃঢ় মত শুনে সাহেব-মেমরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এর পর আলোচনা বহুমুখী হয়ে গেল। সমাজতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে ধর্ম রাজনীতি অর্থশাস্ত্র খেলাধুলা শৃঙ্গার-রসের কথা কোনটা বাদ পড়ল না। শৃঙ্গারের মওড়ায় আসতেই আর্টের আড়াল উঠে গেল—বক্তব্যের মানে বোঝার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হল না।

ইতিমধ্যে বেলা বাড়তে বাড়তে দুটোর কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে, বন্ধু অতিথিসেবায় তৎপর। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে উঠে গেলেন। ফোনের ঘণ্টা নড়ল। শুনতে পেলাম ফিরপোর বাড়িতে ফরমাশ দিচ্ছেন—এখুনি ছয় জনের জন্য ওয়েটার-সমেত লাঞ্চ পাঠাও। মেনুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ আহার্যের উল্লেখ করেই বিলটা আমার অ্যাকাউণ্টে লিখে নিতে বললেন।

আহারকালীন ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা হল। শেষ পর্যন্ত বন্ধু বড় সাহেবকে ঠিক পেড়ে ফেললেন। ছবি বিক্রির প্রস্তাবে সাহেবের লাভের অংশ ঠিক হয়ে যেতেই পাটের বাণ্ডিলের সঙ্গে আমার ছবিকেও বস্তাবন্দী করে ইউরোপ ও মার্কিন দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মাল রপ্তানীর মাস তিনেক পরে, বিলাতী কাগজে দেখলাম আমার নবকলেবরের ছবি। ছবির তলায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ, কোন সাহেবের লেখা—আমি চিনি না। প্রবন্ধ ছোট হলে কি হয়, বক্তব্যের সার অংশ ছাঁকতে পারলে ধরা পড়ে পাওনার অধিক বলা হয়েছে। প্রবন্ধের মধ্যেই প্রচার করা হয়েছে, শীঘ্রই একটি বড় রকমের প্রদর্শনী খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কলকাতায় শীতের আমেজ লাগতে আরম্ভ করেছে। কৃষ্টির হাটে সাজগোজ পড়ে গিয়েছে। বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠানে ঢাক পিটিয়ে শানাই বাজিয়ে, শাঁখ ফুঁকে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আগমনীর বার্তা প্রচার হচ্ছে। উৎসবের কেন্দ্রগুলি বেশীর ভাগই সাহেব-পাড়ায়, বড়দিনের মরসুমে শহর সরগরম হয়ে উঠেছে।

বন্ধু বেকার বসেছিলেন না, পত্র মারফত জানালেন, তোমার ছবির বাছাই চলেছে, আমাদের খাস প্রেসিডেণ্ট প্রদর্শনীর ফিতে কাটায় সম্মতি দিয়েছেন। সার ভবলচাঁদ লাখপতিয়া অভ্যর্থনা কমিটিতে দরজা আগলাবার ভার নিয়েছেন। শুকনো ভাণ্ডার আড়তদার (এখন জমিদার) মঙ্গলঘটে জল ঢালবেন। দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্বন্ধে আরও অনেকের নাম আছে, তবে ছবি বাছাই কে করছেন সে বিষয়ে উল্লেখ নেই। ওটা নগণ্য ব্যাপার, তাই এই কর্তব্যের ভার যিনি বা যাঁরা নেন তাঁর বা তাঁদের নাম উহ্যই থাকে। চিঠির শেষের দিকে লাল কালিতে দাগ দিয়ে জানিয়েছেন, খরচের

জন্য মোটা টাকা লাগবে, কয়েক হাজার নগদ ঘরে আনিয়ে রেখ। এদিককার ব্যাপার আর একটু পাকা হলেই টাকা সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাব, কিংবা নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।

সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে, বড়দিন আগতপ্রায়। সবুর আর সয় না। বন্ধুকে লিখলাম, যত শীঘ্র পার এস, ব্যাঙ্ক থেকে তোলা টাকা অযথা খরচ হয়ে যাচ্ছে। চিঠির উত্তর এল না, বন্ধু স্বয়ং এলেন একরাশ খামে-পোরা নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে। আমন্ত্রণ লিপি ছাপানোর কায়দা দেখে তারিফ না করে পারলাম না। বেজায় দামী কাগজে সোনালী হরফের ছাপা পড়েছে। চিঠি ও খামের আকারও অতি বড়। তারই ভিতর একটি বিলাত থেকে ছাপানো ছবি। ছবির তলায় চিত্রকরের নাম। নাম পড়ে খটকা লেগে গেল। স্মৃতির ভাঁড়ার তোলপাড় করেও বার করতে পারলাম না—কখন আমি ওই ছবিটি এঁকেছিলাম। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি রকম হল, আমি তো এ ছবি কখনও আঁকি নি! এ যে একেবারে হিজিবিজি! ছবির এই নমুনা দেখলে কেউ আমার প্রদর্শনীতে আসবে? আমার কথা শুনে বন্ধু আমার দিকে এমন ভাবেই তাকালেন, যার সোজা অর্থ আমি একটি বিয়াকুফ। বন্ধুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি যেরূপ রুখে আমার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল তাতে বুঝলাম আমি শিল্পী হলেও নিজের কাজ সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই। বন্ধু নিমন্ত্রণকেও ফাঁদের মধ্যে ফেলেছিলেন। ছাপানো চিঠির সঙ্গে টাইপ করা পত্রও ছিল। আমার সামনে ধরে বললেন আপিস ঘরে চল, এগুলো সই করতে হবে।

যবে থেকে আমি জিনিয়াসের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলাম, তবে থেকেই বন্ধু আমায় আগলিয়ে রেখেছেন। আগলানোর পন্থায় পাঁজরা-ভাঙা পোশাক ও পায়াহীন চেয়ারের পীড়ন তো ছিলই তার উপর দেহরক্ষী ঘরে থাকায় ঘাগী আসামীর মত সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হত, স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। যাঁরা মান্যবর করার জন্য আমাকে ঘিরে থাকতেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্পেশাল সেক্রেটারি। কেউ প্রধান সেক্রেটারি, কেউ পার্সন্যাল অ্যাসিস্টেন্ট। কাউকেই আমি চিনি না। বন্ধুর আদেশ অনুসারে ভিড়ের মধ্যে ওরা আমাকে ঘিরে থাকে। বাইরের লোক কথা বলতে চাইলে ওরাই কথা বলে। আমি প্রশ্নোত্তরে কেবল এক হাসি। হাসিও একটু কসরতি হাসি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুর নির্দেশ মত রোজ নিজেকে মুখ ভ্যাংচানো প্রথায় অভ্যাস করতে হয়েছে। সংক্ষেপে আমার গু[ণ] যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তা হলে তা নিজেকে [ম]ুখ ভ্যাংচানোর আর্ট। সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে। একদিন বেপরোয়া হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর কতদিন খেলা করবে। বন্ধু হেসে বললে ব্যবসাবুদ্ধি তোমার কম। সহজভাবে যদি সকলের সঙ্গে মেশ তা হলে প্রথমেই পর্দানশীন দাড়ি [বে-]আবরু হবে। অমন একটি দুর্লভ বস্তুর আড়াল যদি খসল তা হলে তোমার ইজ্জত রইল কোথায়? এইখানেই কি লোকসানের শেষ; একবার তোমার নাগাল সহজ হয়ে গেলে, রাম শ্যাম যদু সকলেই ঘা[ড়ে] এসে চাপবে এবং তারপর সুবিধা পেলেই, গলায় [দড়ি] দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে কোথায় থাকবে তোমার নাম [আর] কোথায় থাকবে লোকেদের অজানাকে জানার কৌতূ[হল]। ঝোলা ও কৌতূহল সম্বন্ধে এমন ভাবেই আমাকে [সাবধান] করে দিলেন যাতে মনে হল, সাধারণের সঙ্গে স[হজ] ভাবে মেশার প্রস্তাবে যেন একটি কুকর্ম করে ফেলেছি।

দিন কেটে যাচ্ছিল, আমার ছবি দেখানোর [সময়] আসতে দেরি আছে। ইতিমধ্যে ভিন্ন প্রদর্শনী [দেখার] আমার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। মনস্থির করে ফেলল[াম] একলাই ছবিঘরে ঢুকব। পরের মুখে ঝাল [খেয়ে] লাভ নেই। রূপ ও রঙের রসগ্রহণ করতে হলে নি[জে] পরীক্ষা করা ভাল। আমি যাকে সুন্দর বলি তা অপরের কাছে বীভৎস হয় তা হলে নিজের ভুল জা[না] সুবিধা একলা গেলে অনেক বেশী পাব। কেন জ[া]না, রঙ-তুলির সংস্পর্শে আসার পর কখনও কথ[া] নিজের অজ্ঞাতে রঙের মেলা মেশাতে সুরের ঝ[ঙ্কার] শুনেছি। ঝঙ্কারের আড়ালে কি ভাবে সুর বাঁধা হয়ে [আছে] জানি না, তবে এটা সত্যি, আমি আনন্দ পেয়ে[ছি]। আমার আনন্দের পিছনে কৈফিয়তের দাবি নেই, সুত[রাং] যেটুকু আনন্দ সংগ্রহ করতে পারি সেইটুকু [...]

কেই নিজেকে বঞ্চিত করি কেন। আত্মপ্রশ্ন আমার ংল্পকে দৃঢ় করে দিল। যথাস্থানে রওনা হবার জন্য স্তুত হলাম।

প্রদর্শনীর কাছাকাছি এসে গিয়েছি। ছবিঘরের মনে প্রথমেই নজরে পড়ল, জমকালো নোটিস বোর্ড। চিত্র হরফে লেখা, বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার করলাম—Modern Art। আমার মত আর দু-একজন দুরবস্থায় ড়েছিলেন। একজন তো ধুৎতেরি বলে যে দিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকেই ফিরলেন। পাঠোদ্ধার সে কি হবে, প্রবেশদ্বারের সামনে পৌঁছবার উপায় নেই। ভিড় পথরোধ করে দিয়েছে। বেশ খানিকটা অপেক্ষা করতে হল। হাল-ফ্যাশানের নতুন গাড়ির মডেল দেখতে লাগলাম। বেশির ভাগ গাড়ির সামনে পিছন বোঝা যায় না। কোনটা উড়ন্ত নৌকার মত, কোনটা বুকে-হাঁটা সরীসৃপের মত প্রায় মাটি ছুঁয়ে আছে। গাড়ির এই সব নবকলেবর দূর থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম, তাই আমার বাহনকে ওদের কাছ থেকে তফাতে রাখতে হয়েছিল। দ্রুত-পরিবর্তনশীল ফ্যাশানের সঙ্গে সমতালে চলার শক্তি আমার ছিল না। তাই যে গাড়ি একদিন উচ্চপংক্তিতে স্থান পেত আজ তাকে অস্পৃশ্যের লাইনে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে—পাছে গাড়ির মালিককে বেয়াকুফ বলার জন্য মাজিতের দল তেড়ে আসে।

হাল-ফ্যাশানের গাড়ি থেকে যাঁরা নামছেন তাঁরাও নয়া চালের জীব। মোটা মোটা সিগার বা পাইপ মুখে না থাকলে পুরুষ বলে চেনার উপায় নেই, তথাপি ওরা পুরুষ বলেই পরিচয় দেয় এবং আইনের কবল থেকেও ছাড়ান পায়। পুরুষের বর্ণনা দিলে নারী সম্বন্ধেও কিছু বলতে হয়। বিদুষীদের মধ্যে যাঁরা চুল ছাঁটা, পাতলুন (slacks) পরা, তাঁদের পিছন কিংবা সামনে থেকে দেখলে অনশনক্লিষ্ট কিশোর বলেই ভ্রম হয়। ভুল সংশোধনের জন্য যদি কেউ অনুরোধকে কঠোর করে তোলেন তা হলে খাতিরে পড়ে বলতে হয় ওঁরা সচল তক্তা। যাঁরা সোজাসুজি শাড়ি পরেছেন, তাঁদের বয়সে আগুনের ফুলকি না থাকলেও প্রসাধনের প্রকরণে যৌবনের ঝাঁজ আছে। গঠ-কে চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টায় যে অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রয়োগ হয়েছে তা তাজ্জব লাগিয়ে দেয়। নিবিড়ভাবে জাপটে ধরা শাড়ির ভাঁজ সত্ত্বেও যেসব বিশেষ অঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে, সেগুলি দেহের সঙ্গে কিন্তু দোলে না। শাড়ির আড়ালে বে-আবরুর এমন লীলা বৃন্দাবনে কখনও ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। বিউটি প্যারেডের অগ্রিম রিহার্সাল দেখতে ভালই লাগছিল কিন্তু বেণীক্ষণ শাড়ি ও গাড়ির দিকে নজর দিলে ফুটপাথেই গেঁথে যেতে হবে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি আমার অবস্থায় আরও অনেকে পড়েছেন। চরিত্রের উপর কটাক্ষের ভয় থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছবিঘরে ঢুকতে হল।

ছবিঘরের ভিতরেও বেজায় ভিড়। দেওয়ালে কয়েকটি ফ্রেমের ডগা ছাড়া আর কিছু দেখার উপায় নেই। আমার কাছাকাছি যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা কোমর বেঁধে আলোচনা চালিয়েছেন—সম্পাদকীয় মতের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন দল গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি দলই বাছাই করা নেতার দ্বারা চালিত। ডিউলি ইলেক্টেড নেতার নেতৃত্বে, কোন্ শিল্পী জ্ঞানমার্গে উঠে যাচ্ছেন ঠিক নেই। ঠেকার জোরে ডগায় তোলার সফলতা নির্ভর করে অবোধ্য ভাষায় সম্পাদকের নিকট বেনামী চিঠি ছাড়ার উপর। কথায় কথায় আমার নাম শুনতে পেলাম, কান খাড়া হয়ে উঠল। অদেখা ছবি সম্বন্ধে আলোচনা অস্বাভাবিক কিছু নয়, লাগাম-ছাড়া কল্পনাকে পুরোদমে ছোটার অধিকার দিতে হলে এই হল প্রশস্ত পথ। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার উপর নির্ভর করে আমাকে ঠেঙিয়ে ঠিক করার প্রস্তাব যখন উঠল, তখন একজন ছবিকে কাছে না পেয়ে ত্রুটির প্রধান কারণ আমার চেহারাকে সাব্যস্ত করলেন। বিচারকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাঁর দাড়ির নকল করেই আমি জিনিয়াসের স্থান দখল করেছি। লোকমুখে আমার শ্রীবদনের ব্যাখ্যা যা শুনেছিলেন তারই উপর আস্থা রেখে বললেন, লোকটা শুধু দাড়ি-চোর নয়, আরও বদগুণ আছে। চেহারার বৈশিষ্ট্য এমনই স্থূল যে ওই কারণেই শিল্পী হওয়া অসম্ভব। এতবড় সত্যকে আমি নিজেই অস্বীকার করি না, তাই বলে দাড়ি-চোর দুর্নাম কেমন করে! নম্বর দেওয়া ফ্যাশানের অনুকরণে দাড়ি

ছাটল সাহেব-নাপিত, আর চোর হলাম আমি! বক্তা ইন্‌স্পায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁর উচ্ছ্বাসকে যদি কেউ আরও উসকে দেয় তা হলে ব্যাপারটা বাস্তবিকই স্থূলত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সম্ভাবনা আরামপ্রদ মনে হল না, ভিন্ন দলের দিকে এগুতে লাগলাম।

প্রদর্শনী-গৃহে এতক্ষণ মানুষই দেখছিলাম। ছবির কাছে আসার সুবিধা পাই নি। এইরূপ সমাবেশে পড়ার কথাও নয়, কারণ ভিড় বাড়ানই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁরা এই সব পরিবেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে আসেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের নিয়েই অস্থির। পরস্পরের স্তুতি-স্তোত্র এমন ভাবেই আবৃত্তি করতে থাকেন যে, একজন থামলেই আর একজনের পালা শুরু হয়, কথার শেষে মনে পড়ে আর এক পার্টির কথা—সেখানে না গেলেই নয়। টাটকা স্ক্যাণ্ডালের (কেচ্ছার) নোটিস পাওয়া গিয়েছে। ফি-ফি নাকি ডিভোর্সের জন্য ব্যস্ত। টাটকা কেলেঙ্কারির প্রতি আমার আসক্তি নেই এমন কথা বলি না, তবে বিপদসঙ্কুল আলোচনা এড়াতে পারলে খুশী হই।

ভিড় থেকে সরে দাঁড়াবার চেষ্টায় ছিলাম, এমনই সময় শুনলাম একজন বয়স্ক লোক বলছেন, আরে রাখ তোমাদের মডার্ণ আর্ট, ফোক আর্ট, আর কি বলে চাইল্ড আর্ট। যতসব এস্‌কেপিস্টের দল। ওদের সকলকেই চিনি। সব কটা শিং ভেঙে বাছুর হয়েছে, অথবা ভাঙা শিং নিয়ে তড়পাতে আরম্ভ করেছে। আসলে ওরা এক একটি নিধিরাম সর্দার—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, শুধু হাত দিয়েই মাথা কাটতে চায়। ড্রইং পর্যন্ত না শিখে ডেঁপোর দল আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে গেলেন, টর্চ-বেয়ারারের খেতাব পেলেন, আর আমরা বুকনির সাহায্য নিতে না পারায় ধামাচাপা পড়লাম। যদি গলাবাজী করে বলতে পারতাম পুকুর চুরির কথা, জানিয়ে দিতাম নবতম আর্টের সবকিছু সরঞ্জাম যোগাড় করে শিল্পী হতে চলেছি, তা হলে দেখতে আমাদের স্থান কোথায়। আজকাল সরঞ্জাম হল শিল্পী হবার প্রধান অবলম্বন। আজকাল যে বেটা যত বড় আনাড়ী, বুদ্ধির দৈন্যে মস্তিষ্ক বেকার, মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাস—সেই

বেটাই কৃপার ওজনে বড় শিল্পী। এইখানেই কি শে অতি আধুনিক বিদেশী ছবির সংমিশ্রণে স্বদেশী ে আর্টের যে ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্টের সিন্‌থেসিস চ তার ঘরোয়া কথা ফাঁস করে দিলেই দেখবে যত (দেবী খাড়া হয়েছেন, সকলের ভিতরেই রয়েছে খ গাদন। আমরা সাহেবী ছড়ার কীর্তন শুনেই বে উপরের চাকন-চিকনে সন্তুষ্ট। আরে ওই চাকন-চি যে চটচটে আঠার, মানে ঘামতেলের জৌলুস, তার ' কেউ রাখে? জৌলুসের তলায় যে চোরাই মা গুপ্তি-গুদাম থাকে তা যদি সকলে জানত তা হলে অ পুকুর চুরির খবর বার হয়ে যেত। চোরাই মাল করার উপায় নেই। ওরা বামাল ধরাও ' তথাপি চোরদেরই মান্যবর করার জন্য কী চেষ্টা!

ভদ্রলোক রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, অ সুবিধার লাগল না। তেতে-ওঠা আবেষ্টনী থেকে আসার চেষ্টা দেখলাম। যাঁরা ঘরের মাঝাম জায়গায় হাঁফ ছাড়ার সুবিধা নিয়েছেন তাঁরা সক পুরুষ, ভুল করার অজুহাত নেই। রোমান্স-জ "একটুকু ছোঁয়া" অথবা একটুকুকে "ঘনীভূত" করে নে উত্তেজনা এ দিকটায় কম খানিকটা। এগুতে প্রথ নজর পড়ল একজন সুদর্শন ব্যক্তির উপর। ঘোর কৃষ্ণ উচ্চাঙ্গে ধপধপে সাদা পাট-দোরস্ত পাঞ্জাবি, নি কোঁচানো মিলের ধুতি। কোঁচানো কোঁচা অতি পকেটস্থ হয়েছে—পাছে কাপড়ের কুঞ্চিত বাহার ভূলু হয়ে যায়। এই কারণে ভদ্রলোক প্রায় আড়ষ্ট। পড়ল বয়স্ক ভদ্রলোকের কথা। তিনি কোঁচার বাহ আড়ষ্ট ভদ্রলোককে দেখলে হয়তো বলতেন, কোঁচানো ধু পরতে গিয়ে যদি আড়ষ্ট হয়ে যাস, তার উপযুক্ত সম যদি নাই দিতে পারিস তো কষে মালকোঁচা দিয়ে কা পর্‌, অথবা কোমর বেঁধে রাস্তায় চল্‌। এতেও বহরের দাম না সামলাতে পারিস তো হাঁটু-বহর কা কেন্‌। মিতব্যয়িতার জন্যে তারিফও পাবি, তার স সস্তায় বাবুগিরিও হয়ে যাবে। দোহাই বাবা, বাহা কোঁচা দিয়ে পকেট মারাস নে। কোঁচানো ধুতি যদি ফু পাপড়ির মত মাটিতে না লোটালো, চলার পথে ধু পরিষ্কার না করে দিল তো ব্যয়সাপেক্ষ সৌখিনত

পছন্দে ছোটো কেন? প্রাচীন ঘরোয়ানা চালের রুচি াজ গোরস্থ। আভিজাত্যের যে কোন প্রসঙ্গ যখন রেছে তখন ওদের বিস্মৃতির আশ্রয়ে শান্তিতে থাকতে দ—মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা মারিস নে। আভি-াত্যের উপর যতই বিদ্বেষ থাক্, খাঁড়া মনের সাধে কাপালেও রক্ত বার হবে না, কারণ মারের ডাকে মড়া াড়া দেয় না।

সামঞ্জস্য-পীড়নকারী মানুষটি শুনলাম মূর্তিকার, য়েল কলেজ নামক কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাপীঠের প্রাক্তন াত্র। কিছুদিন বিলাতে থাকার দরুন বাংলা উচ্চারণ টমটে হয়ে গিয়েছে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, মার্জিত চি উর্ধ্বমুখী হলে অমনটি হয়েই থাকে। কিন্তু অনুমানের দা সরে যেতে জানা গেল উচ্চারণের বিকৃতি ঘটেছে বিয়ে কথা বলার দরুন। মাতৃভাষাকে কামড়ে খেলে তটা রসনার তৃপ্তি পাওয়া যায় তা বিলাত-ফেরতা লতে পারেন, তবে কামড়ের গুণে কথার মানে যদি বচকে ঠে তা হলে বুঝতে হবে পায়োরিয়া রোগ মনকে পর্যন্ত চিয়ে ছেড়েছে।

বচকান ভাষার পূতিগন্ধ যখন ছড়াতে আরম্ভ রেছে, ছোঁয়াচে ব্যাধির তাড়নায় ব্যবসায়-সিদ্ধিদাতা ণেশ ঠাকুর পর্যন্ত উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়েছেন, সেই সময় বর পাওয়া গেল, মহানগরীতে বিলাতী ব্রোঞ্জমূর্তি ার থাকবে না। দৈনিক পত্রিকা মারফত প্রচার য়েছে, উৎপাটন-দক্ষ শিল্পী চাই, আবেদন পাঠাও।

মার্কামারা পেশাদার আত্মমর্যাদার ক্ষণভঙ্গুর নগুলি জোড়া-তাড়া দিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে কর্মপ্রার্থী য় দাঁড়ালেন। ললাটে রয়েলমার্কা ছাপ লাগিয়ে য়েছিলেন। প্রার্থনা এক কথায় মঞ্জুর হয়ে গেল। র্তিগুলি কপিকলের সাহায্যে ফাঁসীকাঠে ঝোলানোর াদেশ সংগ্রহ হতেই রূপস্রষ্টা ধ্বংসের কাজে লেগে ালেন।

একটির পর আর একটি মূর্তি ঝোলানোর ব্যবস্থা মনই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুসম্পন্ন হতে লাগল যে তাঁর র্মদক্ষতার সংস্পর্শে এলে নির্বিকারচিত্ত জহ্লাদের নয়ও টলে যেত। আহার-সন্ধানী গৃধিনী জীবিতকে তপ্রায় দেখলে মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য যে ভাবে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, ধর্মান্ধ বিধর্মীর বিশ্বাসকে ধ্বংস করায় যে আনন্দ পায়, রাজনীতির কূটচক্রান্ত মানুষকে ঔদার্য সম্বন্ধে যে ভাবে উদাসীন করে তোলে, সেইরূপ অর্থ-লোলুপ শিল্পী ব্যর্থতার তাড়নায় শিল্পীদ্রোহী হয়ে উঠলেন।

অর্থোপার্জনের চেষ্টায় মা-লক্ষ্মীর কৃপা যখন জানা-জানি হয়ে গিয়েছে, সেই সময় একটি অশোভন ঘটনা ঘটে গেল। কর্তৃপক্ষ আদেশ পাঠালেন, কোন নেটিভ শিল্পীর প্রস্তুত মূর্তি স্তম্ভের উপর স্থাপন করতে হবে।

মানহানিকর আদেশ বিলাত-ফেরতা হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারলেন না। খবরটি আর্টের পলিটিকাল সার্কেলে চালু করে দিলেন। এক্সটার্নাল ও ইণ্টার্নাল অ্যাফেয়ার্সের কেন্দ্রে ঘোর ঘটা করে বৈঠক বসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, বাছাই করা সম্পাদকের কাছে বেনামী চিঠি পাঠাও। নামকরা দৈনিক পত্রিকায় একবার আমাদের মত বার হলে বাছাধনকে পাততাড়ি গোটাতে হবে, চাই কি আত্মহত্যাও করে বসতে পারে। দরকার হলে বেনামী চিঠির মত শিল্পীকে শক্ত দড়িও উপহার পাঠানো যেতে পারে। ছাপার অক্ষরে খবরের কাগজে কিছু বার হবেই। লোকে ধরে নেবে বিচারের চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজে যে মন্তব্য বার হয় তার উপর আর কথা থাকতে পারে না।

সম্পাদকের কাছে উড়ো চিঠি আমাদের দেশে একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার—বিশেষ করে যখন ছবি বা মূর্তি সম্পর্কে মতামতের আলোচনা চলে। এই প্রসঙ্গে খানিকটা পাতা যে কোন প্রকারে ভরাট হলেই হল। কে লিখল, লেখার মধ্যে কোন সার পদার্থ আছে কিনা, লেখার উদ্দেশ্য কী এবং ফলাফল কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে দামী সময়টাই বাজে কাজে নষ্ট হয়, এতটা যুক্তি সমর্থন করে না। সংক্ষেপে আর্ট সম্বন্ধে ফ্যাশান-মত্তদের বাদ দিলে জনসাধারণ এখনও নির্লিপ্ত। দরদের অভাবে ফলাফল যা হয় তা ধোপার বাড়িতে কাপড় কাচানোর মত। ধোপে যদি কাপড় টিকে যায় তো কপাল জোর বলতে হবে আর যদি না টেকে তো ধোপার তাতে কী ক্ষতি! বরং আছাড়ের কৃপায় কাপড় যদি না ছেঁড়ে তা হলে বুঝতে হবে পরিষ্কারের চেষ্টায় রজক সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নি। নতুন ও বিদেশী কাপড় ছিঁড়লে একই

কারণ প্রয়োগ করা চলে। ধোপার কর্তব্য আছাড় মারাতেই শেষ—ওই হল তার পেশা এবং বাঁচার অবলম্বন। সম্পাদকের দৃষ্টান্তেও ভিন্ন যুক্তি নেই—খালি পাতা ভরাট করতে পারলেই হল। আর্টের প্রতি ওইটুকু কৃপাই যথেষ্ট। দৃষ্টান্তের তুলনায় গাড়িতে জোতা বলদকে টেনে আনা যায়। চাবুকের মারে বলদ চলে। কেন চলে, কতটা ওজন বহন করতে হবে এবং গন্তব্যস্থল কোথায়—সে খবর জানার অধিকার বলদের নেই। বরং চাবুকের মারে বলদ যদি ভড়কায়, চামড়া ফাটার যন্ত্রণায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, খানায় পড়ে দম বন্ধ হয়ে মরে তা হলে বলদকেই দোষী সাব্যস্ত করতে হয় তার পিঠের চামড়ায় কড়া পড়ে নি বলে। তুলনায় নির্বিচারে সম্পাদকীয় কৃপা আর চাবুকের মারে তফাত কোথায়? প্রশ্নের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। কথাটা শুনেছিলাম কোন বৈঠকে। শোনা কথার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার যোগ আছে বলেই উদ্ধৃত করে দিলাম।

আঁতে ঘা দেওয়া চিঠি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। বাছাই-করা সম্পাদকের কৃপা পাওয়া সত্ত্বেও চক্রীর দল বিব্রত হয়ে পড়লেন। দেখা গেল, নেটিভ শিল্পী পাততাড়ি গোটানোর পরিবর্তে দেশের মাটিতে কায়েমীভাবে ইমারত গাঁথার ব্যবস্থা চালিয়েছেন। ইতিমধ্যে ভিত্তি স্থাপন পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। এর পর সামঞ্জস্য-পীড়নকারী উহ্লাদ শিল্পীর পিছনে ধাওয়া করে কোন লাভ নেই। নেটিভ শিল্পীকেও ছাড়ান দিতে হয় কারণ এখন তিনি মানুষের প্রতিমূর্তি গড়া ছেড়ে দেবদেবীকে নিয়ে পড়েছেন। বিলাত-ফেরতার উপদেশ মেনে চার হাজার বৎসরের পুরাতন অ্যাসেরিয়ান দেয়াল-চিত্রের নকল আমদানি হচ্ছে আধুনিক দেব-দেবীর গঠনে যোগ দেবার জন্য। দোআঁশলা রূপকল্পনায় নাকি বিদেশী প্রাচীনত্বের ছোঁয়া লাগলে রিজুভিনেশন স্থায়ী হয়ে যায়। নেটিভ শিল্পী দোআঁশলাকে নিয়ে থাকুন—সৌখিন লোকের ভাগে বাগড়া দিতে চাই না। রস প্রকাশের ব্যাপারে কত রকমের সান্নিমেশন ঘটে তার ঠিক নেই—ওদিকে নজর না দেওয়াই ভাল। এরই ফাঁকে বিলাত ফেরতার কথা মাঝেমাঝে মাথা খাড়া করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু ছবি দেখার সঙ্কল্প দৃঢ় হওয়ায় ভিড়ের দিকে মুখ ফেরালাম।

তখনও মানুষের মাথাই দেখছি। কে একজন ভ দিয়ে গেলেন, আনুষ্ঠানিক কাজগুলি শেষ হলেই কমে যাবে। আসল কাজ হল ছবি বিক্রি—যার বহু শিল্পীর বাঁচা মরার হিসাব নিকাশ জড়িয়ে আ গত্যন্তর নেই, অপেক্ষা করতে হল।

উৎকণ্ঠাপূর্ণ কতকগুলি মুখ দেখলাম। মনে হল শিল্পী, কালকের কথা ভাবছে, আজকের বাঁচাকে হ কোন রকমে সামলে নিয়েছে। ছবি বিক্রি না হয়তো কাল হাঁড়ি চড়বে না। সোনার চাঁদ ঝুনঝুনিয়া শুকনো ডাঙার আড়তদার জাতীয় হঠাৎ-টাকাওয় কৃপা না পেলেই নয়। ওরা হল আর্টের নয়া পৃষ্ঠপে তথাপি ছবির দিকে ওদের নজর ফেরাতে হিমসিম যেতে হয়। ছবির প্রতি যেটুকু দয়া আসে, তা স্বার্থকে তোয়াজ করার জন্য। ঝুনঝুনিয়া শেয়ার-মা নাম করা অর্থশোষক হলে কি হয়, আপন ঘরে পৌঁছে না। সবলেরই ট্যাঁক ভারী—তারা টাকা গু বাজিয়ে ঘরে তোলে না, টনের ওজনে সিন্দুক বে করে। যারা সুদের কারবারী, যারা নিজের সিন্দুক টাকা ধার করে, যারা যেন-তেন-প্রকারে অর্থো ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তারা কৃষ্টির আসরে পড়লে অনুমান করে নেওয়া চলে কোন মতলব অ মতলব যে কী তা আমরা বুঝি। আপন ঘ বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা—মাজিতের ছোঁয়া লাগিয়ে জাতে এইরূপ একটি বৈশিষ্ট্যের ধ্বজা ওড়াতে হলে ও পৃষ্ঠপোষকতা সবচেয়ে সোজা পথ। ছবি বাছাই শক্ত কাজ নয়। শিল্পীর নাম ও ছবির দামের সামঞ্জস্য আনতে পারলেই জঘন্য কারবারের ঝা কাটে। সহজাগ্রত রসগ্রাহী শিল্পীর নাম তলিয়ে নিজের নাম খাড়া করতে পারলেই বাধ্যতামূলক ক শেষ হয়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, একটু বসতে অবসাদগ্রস্ত ভাবটা কেটে যেত। এদিক ওদিক তা দেখলাম পাশের ঘরে কোণের দিকে বসার ব্যবস্থা ও একটি অতিজীর্ণ কাঠের চেয়ার—বোধ হয় চাপ বসার জায়গা। ওইখানে বসে লোকটা চারধারে রাখে। উপস্থিত তাকে দেখছি না—বোধ হয় বাইরে

ঢুকতে গিয়ে থাকবে। ভাবলাম একটু জিরিয়ে নি, বসার অধিকারী ফিরে এলেই তার স্থান ছেড়ে দেব। জীর্ণ আসনের প্রাচীন কাঠ বয়সের অত্যাচারে ফেটে গিয়েছে। ফাটলের ভিতর যেসব জীব বাস করে, তারা রক্ত শোষণে ঝুনঝুনিয়ার দীক্ষাদাতা। বাসস্থান মৌরুসী করবার শর্ত এমনই পাকা যে কোন প্রকারের বলপ্রয়োগ বা আইনের সাহায্যে ওদের উচ্ছেদ করার উপায় নেই। জন্মশর্তে বংশপরম্পরায় ভোগ-দখলের দাবি কায়েমী করে ফেলেছে। লাট-বেলাট যে কোন মাংসল জীব ফাটলের তল্লাটে এলেই হল। অনধিকার সান্নিধ্যের ফল যে কী হতে পারে তা এক মিনিটে ডিরেক্ট অ্যাকশন দ্বারা জানিয়ে ছাড়ে।

প্রদর্শনীর বিবরণ পড়ার জন্য খবরের কাগজ কিনেছিলাম। কাগজটি সঙ্গেই ছিল, এতক্ষণে কাজে এল। চেয়ার পেতে নিশ্চিন্ত মনে বসলাম। সবে আরাম গা-সওয়া হয়ে আসছে, এমনই সময়ে একটি ছোকরা অলুথালু বেশে আমার সামনে উপস্থিত। বেশ একটা উত্তেজনা ঘাড়ে করে এসেছিল। ভাবলাম চেয়ারে বসে স্বত্বাধিকারীর দাবির উপর বে-আইনী কাজ করে ফেলেছি। কিন্তু লোকটির সংযম দেখে স্তম্ভিত হলাম। কানের কাছে চুপিচুপি বলল, ওই নিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওভারকোটের তলায় পুরে নিয়েছে। ওই যে—ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ধরুন মশাই—ছবি নিয়ে পালাল।

আকস্মিক ঘটনার প্রথমটায় থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। যে লোক আরাম ভোগের জন্য বসেছে তাকে চোর ধরতে বলে যে অন্যায় কাজ হয়েছে তা ছোকরা যখন বুঝল—তখন বলে গেল, মশাই বাড়ি যান, চোরাই মাল কেনার জন্য পুলিস আপনার বাড়িতেই প্রথম হানা দেবে। লোকটা বলে কি! এত বড় স্পর্ধা পেল কেমন করে! নিশ্চয় ও শিল্পী। যা ইচ্ছে তাই করা, যা খুশী তাই বলা কেবল অহমপুষ্ট শিল্পী হলেই পারে। ওদের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরে যে দরদ জমা হয়েছিল ছোকরার এক কথায় সবকিছু ভেস্তে দিল। চুরি সম্বন্ধে পরে অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম, নাম-করা শিল্পীর আঁকা ছোট ছবির প্রতি মার্জিত (cultured) চোরদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর এবং হাতসাফাই আরও চমকপ্রদ। মজার কথা এই যে ওরা স্বেচ্ছায় ধরা দেয় খবরের কাগজে নাম বেরুবে বলে। কিছু সান্ত্বনা পেলাম। নামের প্রতি মোহ কেবল আমারই নেই, আমার মত হতভাগা আরও অনেকের আছে।

কৃষ্টির সাধনা যে বিপদসঙ্কুল যোগাভ্যাস—তা যেদিন থেকে আমাকে শিল্পী সাব্যস্ত করা হয়েছে সেদিন থেকে হাড়েহাড়ে অনুভব করছি। চোরাই মালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের কথা বলে লোকটা রসভঙ্গ করে দিল। বিবেচনা করে দেখলাম, আর ছবি দেখে কাজ নেই—ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভাল। উঠতে যাব, এমন সময় একটি চোখ ঝলসানো দৃশ্য সঙ্কল্পকে বাধা দিল। দেখলাম জোড়ে একটি মহিলা এবং যুবক আমার সামনে উপস্থিত। মহিলার মস্তক মুণ্ডিত না হলেও মাথার চুল এমন ভাবেই ছাঁটা যে প্রথম দর্শনেই মনে হয় বৈধব্যের পরেই অশৌচ পালন করছেন। ভুল ভাঙে ঠোঁট আর নখের দিকে তাকালে। কি অপূর্ব সামঞ্জস্যের পরিবেশ! "ঠোঁটের সিঁদুরে" পড়েছে বেগুনী রঙের ছটা। লালের সঙ্গে নীলের কী সাংঘাতিক সংঘর্ষণ!

ছটার সমতার সামলাবার জন্য হাতের নখগুলি হয়ে গিয়েছে ঝকমকে জমকালো সবুজ। ধরে বেঁধে কচি ও কাঁচার এমন মেলামেশা কচিৎ দেখা যায়। প্রসাধনের শাসনে বয়স মুখ লুকলে কি হয়, আড়ালের পেছনে প্রাচীনের উঁকি সুস্পষ্ট। সঙ্গের মানুষটি মার্জিত ও মজা, বয়সের মৌতাতে মশগুল, নারীসুলভ অর্ধনিমীলিত চাউনি। ভদ্রলোকের দাড়ি নেই তথাপি তাঁকে শিল্পী বলেই মনে হয়, কারণ অগোছাল পরিচ্ছেদের সঙ্গে নতুন ফ্যাশানের পুরাতন কটকী চটি রিপুকর্ম ও বহু তালিতে সুসজ্জিত। মহিলা শিল্পীর হাত ধরে আছেন। মৃদু নিষ্পেষণের মাধ্যমে গাঢ় উচ্ছ্বাসের আদান-প্রদান চলছে। যে কথার প্রয়োজন নেই তাই দিয়ে ছবির আলোচনা চলছে। আলোচ্য ছবি বোধ হয় আমার পিছনে ঝোলানো ছিল। ভাবলাম এই সুযোগে একটু মার্জিত হয়ে নিই। ছবি দেখার সুবিধার জন্য উঠে যেতে চাইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আর একবার রসভঙ্গের কারণ হলাম। জোড়ের হাত আলাদা হয়ে গেল। নিরীহ প্রেমের

উপর যেন কশাঘাত পড়ল। সুবিধার প্রস্তাবে মহিলা চোস্ত ইংরেজীতে ছবির ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন—তার সঙ্গে রাসকিন ইত্যাদি মনীষীদের কোটেশন। রোঁদা এবং আরও কয়েকজন মহাশিল্পীর নাম উল্লেখ হতেই মহিলার সমর্থনে মজা পুরুষটি জানালেন, ওরা বাজের দল—গত যুগের মানুষ। ফাঁপরে ফেলে দিল। এরা কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় যুগ পরিবর্তন করে নাকি? কিংবা এখুনি কোন ফরাসী দরজীপাড়া থেকে ফিরেছে? ও-পাড়ায় সকালের ফ্যাশান বিকেলে চলে না। ফ্যাশান চুলোয় যাক, ভদ্রাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে একটি জলজ্যান্ত কেলেঙ্কারির অপঘাত মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলাম। লোকে বলবে আমার নজরই খারাপ। মনও পচা পাঁকে ডোবা। সবই মানলাম, তবু বলতে হয় আমার রক্তমাংসের শরীর তো! ঘটনাটি চোখের সামনে দেখে কজন সন্দেহকে সামলে রাখতে পারে? সামলাতে হলে মনকে আধ্যাত্মিক স্তরে তুলতে হয়। অমন দুর্ভোগকে ডেকে আনতে গেলাম কেন?

কৌতূহল খোঁচা দিচ্ছিল। খবর নিয়ে জানলাম, ছিটকে পড়া তারকা কোন অপ্সরীর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী। দীর্ঘকাল মর্তলোকে বসবাস করছেন, মাটির মানুষকে রসকলায় মার্জিত করার প্রয়োজন। দূরসম্পর্কীয়া হলে কী হয়, অপ্সরীর আত্মীয় তো বটে! ধৈর্যকে আঁকড়ে বসে রইলাম, যদি ভিন্ন আত্মীয়ার দর্শন লাভ হয়ে যায়। বাঞ্ছিতার পরিবর্তে ভিন্ন ঘটনার আবির্ভাব হল। একজন লোককে দেখলাম, ছবি দেখতে দেখতে পিছু হাঁটছেন। উলটো চলার গতি যখন রসগ্রাহীকে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে তখন শুনলাম, ভদ্রলোক অভিনয়ের অনুকরণে বলে চলেছেন, আগুন—আগুন লেগে গিয়েছে। আগ্নেয়গিরির আগুন আশেপাশের সবকিছু পুড়িয়ে খাক করে দেবে। তাঁর দৃষ্টি ছবির দিকে আবদ্ধ থাকায় চেয়ারের পায়ায় ঠোক্কর খেলেন এবং আছাড় সামলাতে গিয়ে সমস্ত দেহভার হাতের ঠেকায় আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিলেন। একটি গোটা সুস্থ মানুষের ভারে তখন আমার মাথা কাত হয়ে গিয়েছে। মাথা সরাতে গেলে আরও জোরে চেপে ধরছেন। ধৈর্যের নেকনজর পেতে গিয়ে এমন একটি ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়ব ভাবতেও পারি নি। নড়াচড়ায় ওজনের সঙ্গে বড় বড় নখে চাপ পড়তে লাগল। ঘরের ভিতর আগুন না লাগলে এসব মানুষ মনের আগুনে পোড়ে—এইটুকু ভরসা থাকা বাঁকা ঘাড় নিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, আগুন লাগ কোথায়? ভাবলাম উত্তর দিতে গিয়ে লোকটা অন্য মনস্ক হবে, সেই অবসরে নখীর কবল থেকে মাথাট বাঁচিয়ে নেব। আশা ফলপ্রদ হল না, বরং বাঁকা মুরারী মত চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে যেতে লাগলেন, বি আশ্চর্য, আপনি ছবি দেখতে এসে এই কথা বলছেন আপনার দৃষ্টিনাশ হয়েছে। ছবির মধ্যে অমন জ্বলন্ত আগুনকে দেখতে পাচ্ছেন না? অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সর্বগ্রাসী হবার জন্য লোল জিহ্বা বার করেছে। দেখছেন না রঙে আগুন ছবির ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এল বলে! উঠুন উঠুন চেয়ার থেকে শীগগির উঠুন।—কোথাও আগুন দেখলা না কিন্তু নখের চাপুনি থেকে বাঁচার জন্য চেয়ার ছেড়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ দেখি লোকটি চেয়ারে বসে পড়েছে প্রবাদবাক্য শুনেছিলাম—ছোটলোক গাছে ফলে না। এই ঘটনায় সত্যটি জানার সুবিধা পেলাম। মনে মনে বললাম, আমাকে বেদখল করে বাছাধনের আরাম ভোগ বেশীক্ষণ চলবে না। নড়াচড়ায় ফাটলের উপর কাগজ ছিঁড়েছে, এখুনি রক্ত শোষকের পল্টন বেরিয়ে আসবে তখন তোমার তুড়িলাফ দেখবার ইচ্ছা রইল।

চেয়ার থেকে বিতাড়িত হয়ে খানিকটা এগিয়ে দেখি নিজের অজ্ঞাতে একটি বৃহৎ ছবির সামনে এসে পড়েছি ছবির শিল্পীও সেখানে উপস্থিত। ছবিতে বিক্রির ছাপ পড়েছে—লাল রঙের টিপ। শিল্পী নারী। যৌবন-জড়ানো বয়স, দেখতে আহামরি কিছু না হলেও—গঠনে ফাঁকি না থাকলে বলা যায় নারী পূর্ণাঙ্গী—আকর্ষণীশক্তি আছে তবে কি কেলেঙ্কারির টানে এদিকে এসে পড়লাম প্রশ্নই মনকে ভিজিয়ে দিল। এমনই অবস্থা যে রস প্রকাশের আবেগকে রাখা যায় না। অপর দিকে অপরিচিতার সঙ্গে কথা বলার সাহসও নেই। কোন পথ খুঁজে না পেয়ে অভিজ্ঞের মত ছবি দেখা আরম্ভ করে দিলাম। একবার ছবির খুব কাছে আসি, আবার পিছিয়ে যাই। কখনও একটা চোখ বন্ধ করে দেখি, কখনও ঘাড় এদিকে বাঁকাই, কখনও ওদিকে। ছবির সামনে আগু

ছু হাঁটা দ্রুত চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যা চেয়েছিলাম
ই পরম বাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেল। শাড়ির সঙ্গে ছোঁয়ার
নুভূতি পেলাম। নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাও যদি এমনটি ঘটিয়ে
কে তা হলেও অসুবিধা ছিল না। বেপরোয়ার মত বলে
লাম, ক্ষমা করবেন, ছবি দেখায় অন্যমনস্ক ছিলাম।
রী ক্ষমার কথা শুনেই অবাক। তারপর সহজ ভাবেই
নালেন, ঠিক আছে। তার উত্তরে আমি খুশী
য়েছি দেখে প্রশ্ন করলেন, আপনার ছবিটি ভাল লেগেছে
কি? ছবি ভাল লাগা অবান্তর কথা, তবে আলাপের
ক্ষে এইটুকুই এখন অবলম্বন। গদগদ ভাবে উত্তর
লাম, কেবল ভাল লেগেছে বললে রূপস্রষ্টার প্রতি
বমাননা করা হয়। রঙের পরিবেশন আমাকে
য়াপুরীতে নিয়ে ফেলেছে (ছবিটি একরঙা ফ্ল্যাট ওয়াশ
ইং), মনশ্চক্ষে বহু রঙিন ফুলের পাপড়ি দেখেছি,
র সঙ্গে পাপিয়ার ডাক, বসন্তের সাড়া—সংক্ষেপে আমি
গ্ধ হয়ে গিয়েছি। আরও অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম,
ন্তু সেগুলি মুখস্থের বাইরে থাকায় আনকোরা নতুন
থা ব্যবহার করতে সাহস পেলাম না। ভাবোচ্ছ্বাস
ড়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত হয়তো সাজানো ভাষার খেই
রাতাম। বক্তব্যকে সংযত করে জানালাম, ছবি দেখে
ধু মুগ্ধ হই নি, যিনি চিত্রকর—তাঁর ভক্ত হয়ে
য়েছি। নারীর মুখে স্বাভাবিক লজ্জার ছটা ছড়িয়ে
ড়ল। ছটা যে প্রভাব তাঁর মুখের উপর বিস্তার
রেছিল তা মার্জিত আচরণের ব্যায়াম থেকে আমাকে
ষ্কৃতি দিল। স্বল্প চেষ্টাতেই সহজ হবার সুযোগ
লাম। ভারী বিশেষণগুলি তাঁকে লজ্জাবনত করে
রেখেছিল। আমি কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।
রের ওজন সামলে নিয়ে জানালেন, ছবিটি তাঁরই
কা। আবার মুগ্ধ হলাম। এতক্ষণে ছবিটি ভাল
রে দেখার অবকাশ পেলাম। কপালে করাঘাত
রার ইচ্ছা হল। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম জানি
, যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তারই সামনে দাঁড়াতে
থায় চক্র এসে গেল—অ্যাবস্ট্রাকশনের চরকি-বাজীর
মনে পড়ে গিয়েছি। উদ্ধারের জন্য পথ খুঁজতে
গলাম। রোমান্স অন্তর্ধান করেছে—এইবার নারীর
লা। শিল্পীকে একবার প্রশংসা করলে বাঘে-ছোঁয়া
আঠারো ঘায়ের মত অবস্থা দাঁড়ায়। নারী আমাকে ক্রস
একজ্যামিনেশনে চেপে ধরলেন। প্রশ্নমালা এমনই সুচারু
রূপে গাঁথতে লাগলেন যে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম।
কথাপ্রসঙ্গ যে ভাবে বিস্তার লাভ করছিল তাতে
নিঃসন্দেহ হতে হল—নারী শুধু মাকড়সার জাল আঁকেন
না, ওই জাতীয় ছবি সম্বন্ধে পড়াশোনাও আছে। এতদিন
পর বন্ধুকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দেবার জন্য ব্যাকুল
হয়ে উঠলাম। বুঝলাম, কেন তিনি ভিড়ের মধ্যে বহু
স্বরের সেক্রেটারি দিয়ে আমায় আগলে রাখতেন, কেন
তারা আমার হয়ে কথা বলত, কেন আমি বাইরে বেরুলেই
বন্ধু আমাকে স্বল্পভাষী হবার উপদেশ দিতেন। পরম
হিতৈষীকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিত্রাণের পথ
খুঁজতে লাগলাম। এদিক দিয়েও ছাড়ান নেই। এমনই
সিজ্জান চালে দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে যে আমি শিল্পী নই
বললে লোক ভাবে নম্রতার ভান করছি—ভানের আড়ালে
ঔদ্ধত্য লুকিয়ে আছে। ছবি সম্বন্ধেও যেটুকু বলতে
পারি তার মুখস্থ পাঠ তো ইতিমধ্যে উজাড় করে ফেলেছি।
এখন নতুন বুলি না শিখলে মুখ খোলারও উপায় নেই।
কী করব ভাবছি, এমন সময় বামাকণ্ঠে প্রশ্ন শুনলাম:
আপনি কি মনে করেন ছবিতে একটা গল্প না জুড়ে
দিলেই নয়? শুধু নিছক প্যাটার্ন কি সুন্দরের কথা
বলতে পারে না? এবং ছবি আঁকলেই কোন একটা
উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে? এমন শর্ততেই বা শিল্পী
স্বাক্ষর দেবে কেন? তা ছাড়া চলতি মতে যাকে সুন্দর
বলা হয় তা তো গতানুগতিকতার স্বীকৃতি—গত যুগের
সংস্কারবদ্ধ মত। এই মতেরও স্থানকালপাত্র হিসাবে
প্রভেদ দেখা যায়। অতীতের প্রভেদকে যদি মানেন
তা হলে নবজাগরণ যে আদর্শকে সামনে ধরছে
তাকে অস্বীকার করেন কেমন করে?—একটানে অত
লম্বা আর্টের ফর্দ বলে যেতে সন্দেহ এল, উনিও হয়তো
আমার মত কতকগুলি ছাঁচে-ঢালা আর্টের বুলি মুখস্থ
করে রেখেছেন। আর একটু এগুলেই বে-মক্কায় পা পড়ে
যাবে। কিন্তু খানায় পড়লে তুলবে কে! যাই হোক,
মহিলার প্রশ্ন শুধু জটিল নয়—মঞ্চে ওঠা বক্তৃতার দিকে
এগুতে অন্তরে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে আরম্ভ
করেছে, তথাপি উত্তর কিছু দিতে হয়। বিবেচনা করে

দেখলাম, প্যাটার্ন বলতে ওই মাকড়সার জালের কথাই মহিলা বলছেন। যত বড় আর্টই জালের মধ্যে জড়িয়ে থাক্‌, প্রতিপত্তি মাকড়সাকে জড়ায়। সুতরাং আমার তরফ থেকে কিছু বললে গঙ্গাজল অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বলতে চাইছিলাম, মাকড়সার জালেরও একটা ইতিহাস আছে—গোড়া আছে, শেষ আছে। সবই যদি থাকে তা হলে জাল তৈরির উদ্দেশ্যও আছে। উদ্দেশ্যকে জড়িয়ে গল্প ফেনিয়ে তুললে মহাপাতকটা হতে গেল কেন? জালের সঙ্গে মাকড়সার অন্নসংস্থানের বিবৃতি, হিংস্র প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, বংশবৃদ্ধির প্রথায় আত্মঘাতীর কথা—কত কী উদ্দেশ্য আছে। যুক্তি ও বিচার ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তুচ্ছ মাকড়সার জালকে বিরাট সেন্টেকুচুয়াল এক্সপ্রেশন বলতে মন চাইছিল না। ওই ছবির মধ্যে যত বড়ই আর্টের আদর্শ আঁকড়িয়ে থাক্‌, বাহ্যিক রূপে আমি দেখছি কেবল মাকড়সার জাল—তাও গোটা নয়, অনেক জায়গায় ছেঁড়া। বাহ্যদৃশ্যের উপরে কিছু গড়ে তুলতে হলে কল্পনাকে অদৃশ্যের পিছনে ছোটাতে হয়। খোঁজার বস্তুটি কোথায় পাওয়া যাবে তাও জানি না—অজানা পথে দম ফুরিয়ে গেলেই তো চমৎকার। বিচার করে দেখলাম, এমন জায়গায় চুপ করে থাকলেই গাম্ভীর্যপূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গী গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ঘোর ঘটা করে অভাবনীয় সম্ভাবনা আমাকে ঘেরাও করে ফেলল। সঙ্কেত পেলাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে—এমন কিছু যা আমার বাঁচার ধারাকেই বদলিয়ে দিতে পারে। মহিলা হয়তো আমার মানসিক অবস্থা কতকটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আরও কাছে এসে বললেন, আপনি কেমনতর হয়ে গিয়েছেন। চলুন, নীচের রেস্তোরাঁতে চা খেতে খেতে ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মত করে আর কেউ ছবিটি দেখে নি। আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি শিল্পী কিংবা আর্টের দরদী। আপনার সহানুভূতিতে মনে বল পেলাম। ওই রকম ছবি আরও আঁকব। আপনার সামনে অনেক বাজে কথা হয়তো বলে ফেলেছি, ছোট বোন মনে করে ক্ষমা করবেন।

ওই রকম ছবি আরও অনেক আঁকার প্রতিশ্রুতিই আমাকে তফাতে নিয়ে ফেলেছিল। তার উপর ঘনিষ্ঠতা ভগিনীর তল্লাটে আনতে রসার্থের যাবতীয় তোড়জোড় কোতল করতে হল। প্রেমহন্তা হয়ে কথা বলার স্পৃ ছিল না। জানালাম, মাদুলি নিয়েছি, দোকানে থাও বারণ। কথায় বেশ খানিকটা অভিমানের যে দিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম মাদুলির উল্লেখে এ কিছু দরদের কথা শুনতে পাব। কিন্তু প্রত্যাশা ফ হবার আগেই পূর্ববর্ণিত একটি অনক্লিষ্ট জীব "হা অমিতা" বলে শিল্পীকে আমার সামনে থেকে নি গেলেন। ঘরের ভিতর ধূমপান বারণ। বুঝতে পার না অপহরণকারী পুরুষ কি নারী! প্রদর্শনীতে ধড়ফড়ানির অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে স্থানটি পরিত্য করলাম।

নিজের কথায় ফিরে আসি। ইতিমধ্যে সাঁকোর তল অনেক জল বয়ে গিয়েছে। স্রোতের টানে কত ভালমন্দ ভেসে এসেছে তার ঠিকানা নেই। প্রয়োজনী সংগ্রহ করার উদ্যমও ছিল না, কারণ জানতাম যা চ তা পাব না এবং দৈবাৎ যদি কিছু হাতের নাগালের ম এসে যায় তা হলে যাচিত বস্তু আমার ছোঁয়ায় পরশপা হবে যাবে না।

নিষ্কর্ম অবস্থায় দিন কাটছিল। ভবিতব্য ও শি কৃচ্ছ্র সাধনার কথাই ভাবছিলাম। দিনের পর দিন ঘটনা চলচ্ছবির মত চোখের সামনে এসেছে, আ অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। দুরবস্থায় কা খবর এল। বন্ধু লিখেছেন, তোমার ঘরে-তৈরী ছ ফ্রেমগুলি বাতিল করে উড়োজাহাজে বিলাতে পাঠ হয়েছিল, কারণ ডিজাইন একেবারে অচল। যাতায় খরচ লাগল বেশ। সময় ছিল না, তোমার অনুমতি নিয়েই মোটা টাকা ধার করে খরচ করে ফেলে বিচার করে দেখলাম, সামান্য কয়েক হাজার টাকার তোমার স্বাস্থ্যের উপর কুড়ুল মারা আমার দ্বারা সম্ভব না। তোমার দরুন খরচ-বাবদ টাকাটা দেবার অসুবিধা থাকে তো জানিয়ো। ভাবব, না হয় উপকারের জন্য খরচটা নিজেই বহন করলাম। ফ্রেমসহ নবকলেবর নিয়ে ছবি যখন আবির্ভূত হবে সুন্দরকে কাছে পেলে দেখবে আনন্দ তোমার ঘরে

ড়েছে। ছবি ও ফ্রেমের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে সামঞ্জস্যের তটুকু গরমিল কেউ সইতে রাজী নয়। এই রকম রমিল যেখানে এসে পড়ে সেখানে ডিসকর্ড মারমুখী হয়ে ঠে—যা কিছুতেই আমি সমর্থন করতে পারি নি। বন্ধু চিঠির শেষে জানিয়েছেন, তোমার যা উদার মন তাতে নানি আমার টাকা তুমি নেবে না। তাই অনুরোধ করছি নগদ দেবার ব্যবস্থা করো। অন্যথায় হিসাবের ব্যাপারে ক্রস্‌ড চেক ফ্যাসাদে ফেলে দেয়। ব্যাঙ্কের হিসাব তো সন্দেহের সুবিধা আপনা থেকেই খুঁজে নেয়। যা আঁকি তা ছবি হয় কি না জানি না, তবে অসুখের চিন্তা ছেড়ে ভিন্ন কেন্দ্রে মন নিবিষ্ট করার জন্য রোগের উৎপাত ইতিমধ্যে চড়াও হয় নি। এতটা উপকার বন্ধুর কৃপায় পাওয়ার পর হিসাবের উপদ্রবকে দাবিয়ে রেখেছিলাম।

বলাই বৃথা, ছবির নবকলেবর দেখার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম। খবর এল, ছবির সঙ্গে নতুন নিমন্ত্রণ-পত্র ও ক্যাটালগ আসছে। ক্যাটালগে আছে ডজনখানেক ছাপানো ছবি ও জিনিয়াসের পরিচিতি। বন্ধু এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। ক্যাটালগটি ছোটখাট সচিত্র জীবন-চরিত হয়ে গিয়েছে। বার্তাবাহক জানিয়ে গেল, দু-একদিনের মধ্যেই বন্ধু নিমন্ত্রণ-পত্র ইত্যাদি নিয়ে আসছেন পরামর্শ ও হিসাব বুঝিয়ে দেবার জন্য। পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না, কারণ স্বাস্থ্যোন্নতির সব ভারই তো তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া যে মানুষ আমার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করছেন তাঁর কাছে টাকার হিসাব চাওয়া যায় কেমন করে।

উদ্বোধনের দিন স্থির। প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বারে ফিতে কাটার ব্যবস্থাও পাকা। মণ্ডায় মণ্ডায় বিজ্ঞাপনের পাহারা মজুত। আকর্ষণের দাঙ্গায় বিশেষণের বেড়া এমন ভাবেই ছবির প্রতিলিপিকে ঘেরাও করেছে যে ও-তল্লাটে স্নায়ুরোগগ্রস্ত নীতিবাদী এগুতে গেলেই কেলেঙ্কারির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাবে।

বন্ধু জানতেন, বাছাই করা বিশেষণ আর ছবিতে নারীর গুছানো শ্লথ বেশ যে কোনও সুস্থ পুরুষের মনকে টলিয়ে দিতে পারে। শুধু টলিয়ে ছাড়ে না, ছবির কেন্দ্রে দৃষ্টিকে বেঁধে ফেলে। আমার মত যারা দুর্বল তারা কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে যতটা পারে ভোগের দিকটা কাজে লাগিয়ে নেয়, এবং আমার চেয়েও যারা দুর্বল তারা কিছু না করতে পারলে আইন বা নীতির পাহারাকে খুঁচিয়ে জাগায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে পাহারাওয়ালা যতই চোখ রাঙাক, ছবি ও কথা উভয়েই বেপরোয়া, কারণ যে ছবির ভিত্তিস্থাপন হয়েছে হিজিবিজির উপর, তার ব্যাখ্যা বিচারের তোয়াক্কা রাখে না। কতকটা 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়ে'র মত। যার পুঁজিই নেই সে দৈন্যকে ভয় করতে গেল কী দুঃখে! ছবি সম্বন্ধে ভাষণ? সে তো রাশীকৃত বিশেষণের চিৎকার। ওগুলো ঝরা ফুলের ভিড়—গাছের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। মোট কথা আমাকে নিয়ে শহরে হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে গিয়েছে। আয়োজনের সাফল্যে আমার উৎফুল্ল হয়ে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু নানা সমস্যা বহু দিক থেকে ঘিরে ধরায় বিপন্ন বোধ করছিলাম।

আসল দুশ্চিন্তা ছবিকে নিয়ে। যে ছবিকে কখনও দেখলাম না, তাকে নিজের আঁকা বলে মানি কেমন করে। তা ছাড়া ছবি বলতে আমি যা বুঝি (ভিতরের আনাড়ীকে সাক্ষী রেখেই বলছি) তা যদি হিজিবিজির ফাঁদে আটক না পড়ে তা হলে প্রগতিশীল চিন্তাধারা আমাকে বিয়াকুফ বানিয়ে ছাড়ে। স্বেচ্ছায় আমার মত মানুষের পক্ষেও বিয়াকুফের খ্যাতি মাথা পেতে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। খোঁড়াকে খোঁড়া বললে যেমন বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে না, তেমনি মনের খোঁড়া আর দেহের খোঁড়ায় পার্থক্য থাকলেও কোন ত্রুটিকেই সম্পদ বলে মানা চলে না। অপরদিকে 'বিয়াকুফ' একটি উঁচুদরের খেতাব—মার্জিতদের দান, যা উপেক্ষা করলেও বিপদে পড়তে হয়। ওতপাতা ইনটেলেক্‌চুয়াল গুণ্ডা সুবিধা পেলেই পিছন থেকে ছোরা বসিয়ে দেবে। দিনকাল যা পড়েছে তাতে এইরূপ আচরণের বিরুদ্ধে নালিশও চলে না। ইনটেলেক্‌চুয়াল মারে ব্যক্তিগত মতের সমর্থন থাকলে আইন সেখানে বেকার, কারণ, গরিবের নালিশে উকিল নড়ে না—নথি খুলে দেখিয়ে দেয় ফ্রীডম অফ এক্সপ্রেশনের কি একটা অবোধ্য ধারা। অর্থাৎ যার যা খুশি তাই বলতে পারে, আইনের ব্যাখ্যা অনুকূল হলেই হল। উকিল বলে, এসব ইন্টারপ্রিটেশনের কারবার! বুঝবে না, সুতরাং

বিয়াকুফই থেকে যাও। নেহাত চাঁদার মারের জন্য দরকার না হলে তোমার দিকে কেউ আসবে না, কেউ তাকাবে না।

আইনের ব্যাখ্যা, চাঁদার মার এবং খেতাব-পূজার চিন্তা যে সময় আমাকে প্রায় পেড়ে ফেলেছিল, সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে বন্ধু এলেন। তাঁর ব্যস্ততার পিছনে যে তাড়া ছিল তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, ঝটপট কাজ সেরে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। আমার দুঃখের কাহিনী শোনাব ভেবেছিলাম কিন্তু বন্ধুর ব্যস্ততা দেখে আর সাহস পেলাম না। ত্বরিতে চামড়ার ব্যাগ থেকে একরাশ ক্রেডিট বিল আমার সামনে ধরে বললেন, সই কর, হিসাব-নিকাশের নিষ্পত্তি অচিরাৎ হওয়া দরকার। ভাবটা রীতিমত রোখা। স্পষ্ট বলেই ফেললেন, পাপের বোঝা বইতে গিয়ে নাজেহাল হলাম। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সব ঝামেলা চুকিয়ে দিতে চাই। পাওনাদারদের তুমি তো জান, ওরা সামান্য ফেলে রাখতে বাঁচে আর মরে। ছোট্ট পুঁজি নিয়ে কারবার, দোষই বা দিই কেমন করে। কোন্ দোকানের জিনিস কেনা হল জানি না তথাপি দোকানীকে আমি না চিনলেও চিনি!

ভাবলাম, বন্ধু হয়তো আর এক নতুন আর্ট শেখাচ্ছেন।

অঙ্কশাস্ত্রে আমার জ্ঞান কতটা বন্ধুর নিকট তা অজ্ঞাত নেই। তবু বারবার কেন যে পরীক্ষায় ফেলেন বুঝি না। বহুবার আমার হিসাবের ভুলে অপরের লাভ বাড়িয়েছি এবং বন্ধুর প্রয়োজনেই ভুলকে সংশোধন করি নি—পাছে তিনি ভাবেন আমি তাঁকে সন্দেহ করছি। এই ঘটনায় সদরের খাজাঞ্চিবাবু বলেছিলেন, আমার হিসাবে গলদ নেই, ভুলটা সাজিয়ে নেওয়া। বন্ধুর সামনে সত্য কথা বলায় তাঁকে বাবুহাটার কাছারিতে তৎক্ষণাৎ বদলী করতে হয়েছিল।

সই করার তাগিদ লেগেই ছিল। কাজটা শেষ করে ভাবলাম এই বার তিনি নিশ্চিন্ত হবেন, কিন্তু এমনটি ঘটার কথা নয়। স্বাক্ষরের কাজ শেষ হতেই বন্ধু বলে বসলেন, টাকাটা? এক্ষুণি যে প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে হয়। কাল ছবির প্রি-ভিউ, পরশু তোমার শেষ পরীক্ষার দিন। জানই তো স্বয়ং আমাদের প্রেসিডে[ন্ট] আসছেন দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য। লোকে বলে উ[নি] রত্নাকর। জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি ও খ্যাতি থেকে আরম্ভ ক[রে] মানুষ পর্যন্ত কিনে ফেলেন। দরদস্তুর অর্থের বিনিম[য়] হয় কিন্তু কাজের পর দেখা যায়, প্রতিশ্রুতিকে জিম্মা[য়] রেখে দেয় টাকা গা ঢাকা দিয়েছে। রুচির সঙ্গে বংশা[নু]ক্রমিক ধারার কোন সম্বন্ধ নেই। ওঁর যা কি[ছু] সংগ্রহ সবই টাটকা কেনা। সাধে রত্নাকর বলে[?] উনি জানেন না কী? উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বল, ছবি ব[ল] মূর্তি বল, সাহিত্য বল, যে কোন কৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষ[য়ে] উনি পরম বিজ্ঞের মত জনসাধারণের সামনে বক্তৃ[তা] দিতে পারেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে গেলে [দু-] একটা অবান্তর কথা বেরিয়ে যায়। ভুল শোধরাবার চেষ্টা[য়] ডবল ভুল দিয়ে ত্রুটিকে আড়াল দেন। আড়াল দেবা[র] আর্টকে উনি এমন ভাবেই আত্মসাৎ করেছেন যে লা[ট] বেলাট পর্যন্ত এক মঞ্চে কথা বলার জন্য দাঁড়ালে রত্নাকরে[র] প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে যান। তাঁর টাকার দাপ[ট] এমনই বিস্ময়কর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা পর্যন্ত তটস্থ-ভয়ের চোটে নাকি ডক্টরেট দেবার আয়োজন চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব না দিলে কোন নামক[রা] সমালোচককে প্রেসিডেণ্ট কিনে ফেলবেন। কুছ পরো[য়া] নেই, যা লাগে দিয়ে দেব বললে তাঁকে রুখছে [কে]? শিল্প-সমালোচক তো দূরের কথা, যারা সমালোচকে[র] জন্মদাতা শিল্পী, তাদেরই উনি কিনে ফেলেছে[ন]। ওঁর আশেপাশে যে ভাবে শিল্পীরা ঘুরে বেড়ায় তা[তে] মনে হয় ভেড়া বনে গিয়েছে। শুধু শিল্পী নয়, খা[ন]দানী ঘরের নামকরা ওস্তাদ প্রকাশ্য মজলিসে তাঁ[কে] কুর্নিশ দিচ্ছে। ওর পদমর্যাদার মূল সূত্রে খ[বর] নিয়েই তোমাকে জিনিয়াস বানাবার সাহস পেয়েছিলাম[।] প্রেসিডেণ্টের গুণকীর্তন শুনে মনে হল তবে কি উ[নি] আমারই মত আর একটি জীব। ভয় করার মত বি[ছু] নেই! ওই চিন্তা তখনকার মত চাপা দিয়ে জানালা[ম] নগদ কাছে কিছু নেই। যা দিতে হবে বল, কাল আনি[য়ে] রাখব। বন্ধু উত্তর শুনে অবাক। চোখ চড়ক গা[ছে] তুলে বললেন, সে কি! তোমাকে যে ব্যবস্থা ক[রে] রাখার কথা আগেই জানিয়েছিলাম।

কথার ভঙ্গীতে বিরক্তির সাড়া এমন পর্দায় উঠেছিল ৗকার করতে হল দোষ করে ফেলেছি। অপরাধীর ই বললাম, তুমি তো জানই, হিসাব আমি করতে পারি আমার অক্ষমতার স্বীকৃতিতে যে আভাস ছিল তা হয় তিনি বুঝে ফেলেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি কঠোর উঠল, স্থির নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিকে বেশীক্ষণ দেখা যায় না। যে শক্তি আমাকে নিয়াস হবার দীক্ষা দিয়েছিল, সেই দীক্ষার প্রভাব রায় অনুভব করতে লাগলাম। সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, মনে হচ্ছিল, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। ধীরে র বসবার ঘর থেকে উঠলাম। খাজাঞ্চিখানার দিকে ছি, মনে হল বন্ধুও আমার পিছু নিয়েছেন। তাঁর তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, তবুও তাঁর উপস্থিতি ন্ধে কোন সন্দেহ নেই। খাজাঞ্চিখানায় রেভিনিউ রেস্তার লোহার দরজা খুললাম। বড় বড় তিন-চারটে তি প্রাচীন তালা—ছোট কুলোর মত তাদের আকার। দের কল নড়তেই ঝনাৎ ঝনাৎ করে আওয়াজ হতে গল, তারপর সিন্দুকও খুলে ফেললাম। অতি আধুনিক ন্দুক। হরফ আর নম্বর সাজিয়ে খুলতে হয়। খোলার ষ্ঠা কি ভাবে মনে রেখেছিলাম বলতে পারি না। রজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম-বেল বেজে উঠল। মনে ল—দরোয়ানরা লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘরের বাইরে ড়িয়েছে। আমার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। রেভিনিউ কিস্তির নগদ টাকা সিন্দুকের ভিতর জমা ছিল। হুণ্ডি র করে আর বইতে পারি না। আশ্চর্যের ব্যাপার, ন্ধু যেন কানের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, পারবে া?—আমি উত্তর দিলাম, না। বন্ধু অতি নিকটে সে বললেন, দরোয়ানদের বল নিয়ে আসতে। এখান থকে বার হবার আগে যেভাবে দরজা আর সিন্দুক লেছিলে ঠিক সেইভাবে বন্ধ করে ফিরে এস। আমি তোমার জন্য বসবার ঘরে অপেক্ষা করব।

অর্ধ-ঘুমন্ত অবস্থায় বন্ধুর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করে বসবার ঘরে ফিরে এলাম। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম বলতে পারি না। পুরো জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম ঘরে খাজাঞ্চিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। হঠাৎ মহাল থেকে ফেরার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, বাবুহাটার খাজনা দিতে এসেছিলেন। সব ঘটনাই তিনি শুনেছেন। বললেন, আজ দু-দিন হল এই ভাবে কেটেছে, ভয় পাব না! তিন পুরুষ ধরে এই বাড়ির নুন খেয়েছি। এ যাত্রা সামলে নিতে পারব, কিন্তু···বলে থেমে গেলেন। কিন্তুর পর যা বলতে চেয়েছিলেন তা আমি বুঝেছিলাম, মনকে স্তোক দিলাম—পরশু আমার শেষ পরীক্ষা।

বধ্যভূমিতে দণ্ডের নৃশংস দৃশ্য যেমন প্রাচীনকালে প্রমোদের উপকরণ ছিল, দৃষ্টান্তকে স্মরণীয় করার জন্য ডঙ্কা পিটিয়ে যেমন লোকসমাগম করা হত, আমাকে উপলক্ষ করে সেইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিরা এসেছেন ছবির বুক চিরে রক্তস্নাত সুন্দরকে দেখার জন্য। নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজনে আদর্শবাদীরা খড়্গকে শানিয়ে রেখেছেন—পাছে বাড়তি ভাল কথা পাশ কাটিয়ে পালায়। না পালালেও মাথা কাটার প্রয়োজন থেকেই যায় রক্তপিপাসু খাঁড়ার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।

প্রদর্শনী-গৃহে ঢুকতেই মনে হল আমি একান্ত একলা—বন্ধু আসেন নি। সেক্রেটারিদেরও দেখছি না। কথা দিয়েছিলেন, আমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, তিনি নিজে এসেই প্রশ্নোত্তর সামলাবেন। প্রয়োজন হলে সুবিধাজনক প্রশ্ন প্রতিনিধির মুখে পুরেও দিতে পারেন। সবই ঠিক কিন্তু দেওয়ালে ঝোলানো ছবির কাতর স্বীকারোক্তিতে মনে হল ওগুলো কাস্টমসের ডিউটি-ডিঙনো মাল। ওদের চেহারা কোন বিলাতী পত্রিকায় দেখেছি। বাইরের কাগজ কেন, দেশী পত্রিকাতেও মনে পড়ে ঐ রকম ছবির বিবৃতি পড়েছিলাম। ছবি সংক্রান্ত বহুবিধ সম্ভাবনা আমাকে দম বন্ধ করে মারার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়াতুর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনায় মন দিলাম। প্রি-ভিউয়ের সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল—প্লামকেক, রকমারি স্যানডুইচ, রাজভোগ, দিলখোশ, মাটনপাফ, ক্রিম-রোল আরও কত কি! সবই অভ্যাগতদের বিতরণ করছি কিন্তু লোভনীয় খাদ্যের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। ভোগীকে ভোগের সামনে নির্লিপ্ত দেখার চেয়ে আর কিছু দুর্ভোগ থাকত পারে বলে আমার জানা

নেই। নিয়তির উপহাসে নিজের প্রতি কৃপান্বিত হয়ে পড়ছিলাম, এই সময় একজন ভদ্রলোক ভরা প্লেট আমার সামনে ধরে বললেন, আপনি তো সকলকে দিতে ব্যস্ত, নিজে তো কই খাচ্ছেন না। দরদীর কথা শুনে কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শুভানুষ্ঠানে রোগের কথা বলতে চাই নি। নির্বাক অবস্থায় দরদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পুনরায় কিছু আহারের অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আমি 'দিগ্বিজয়ী' পত্রিকা থেকে এসেছি। সত্যি কথা লুকব না, আমি ছবির কিছু বুঝি না। আপনি যদি সেরা ছবিগুলির নাম করে কিছু গুণাগুণ বলে দেন, তা হলে বিশেষ উপকার হয়। যেগুলি আপনার মতে শ্রেষ্ঠ ছবির কোঠায় পড়ে না সেগুলির ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব। ও তো কয়েকটা বিশেষণের মারপ্যাঁচ মাত্র। আর যাই হোক এটা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে, এ রকম আতিথেয়তা কোথাও পাই নি—যেমন চা তেমনি মিষ্টান্নগুলি।

ছবি বোঝেন না তবুও কতকগুলির ব্যাখ্যা নিজে করে নেবার প্রস্তাব শুনে শঙ্কিত হলাম। তবে কি নিরপেক্ষতার চরম বিধান খাঁড়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে? এতক্ষণ ভদ্রলোক প্লেট ধরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আহার সম্বন্ধে আমার নির্লিপ্ততা ছবির প্রশ্নে নির্বাক থাকায় তিনি কী ভাবলেন জানি না, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগলেন। চলার সঙ্গে ভরা প্লেট খালি হতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, লোকটা কী দাম্ভিক হে, কথা বলতে চায় না। নিজে হাতে করে খাবার নিয়ে গেলাম, অন্ততঃ একটা ধন্যবাদ দে—না, কিছু না। বাবুসাহেব বোকা সেজে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেন ছবির তিনি কিছুই বোঝেন না কিংবা ভাবটা আমাদের মত অবুঝের সঙ্গে কী কথা বলবেন! আমরা যেন ওর চায়ের শ্রাদ্ধ করার জন্যই এখানে এসেছি। আরও অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু রাজভোগের অনেকটা অংশ একগ্রাসে গলাধঃকরণকালীন ভুল রাস্তায় চলে যাওয়ায় সাংঘাতিক বিষম খেলেন। আশেপাশের লোক বিব্রত হয়ে পড়ল, প্রায় ডাক্তার ডাকার অবস্থা। কিছুক্ষণ বাদে সামলে নিতেই দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। সে কী ভয়াল দৃষ্টি! আমার পক্ষে বর্ণনা করা শক্ত। চাউনির অর্থ যা উপলব্ধি করলাম তাতে সন্দেহ রইল না যে তিনি ছবি বুঝুন বা না বুঝুন চায়ের শ্রাদ্ধের সঙ্গে ছবির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। উভয়ের শ্রাদ্ধ ধুম করেই হবে।

ঘটনাটি সহজ হয়ে আসার আগেই ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধি নোটবুক হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। নিকটে এসেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে—এক্সক্লুসিভ রাইট নিয়ে আমি লিখি, একটু গোপনে বসতে পারলে ভাল হয়। ভদ্রলোক ওইটুকু বলাতেই পিছন থেকে একজন গম্ভীর স্বরে জানালেন, হোয়াটস দি আইডিয়া গোপনে এক্সক্লুসিভ রাইট চালাতে চাও, ব্যাপার কী! আমরা কি ভ্যারেণ্ডা ভাজতে এসেছি? পরমুহূর্তে একস্বরে রব উঠল, ঠিক কথা, যা বলেছ! আমরা কি ভ্যারেণ্ডা ভাজতে এসেছি? তৃতীয় বক্তা সামনেই ছিলেন। প্রথম প্রশ্নকারীকে সরিয়ে দিয়ে জানালেন বাবুর কালকে হল জারনালিজমে হাতেখড়ি, আর আজ উনি এসেছেন আর্ট সম্বন্ধে লিখতে—তাও আবার গোপনে এবং এক্সক্লুসিভ রাইট চাই। ভাবি, দেশটার হল কী যত সব—

কথায় বাধা পড়ল। অতি পাতলা ধরনের মানুষ দেখতে ছোকরার মত হলে কী হয়, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। টিটকারির ঝাঁজ দিয়ে মধ্যবয়স্ককে উদ্দেশ করে জানালেন, আপনি পুরনো ঘাগী আমরা সকলেই জানি। বুড়ো বয়সে সিনেমা নিয়ে পড়েছেন—বেশ করেছেন। আপনার সৌভাগ্যের ওপর আমাদের আক্রোশ নেই। তাই বলে আর্ট সম্বন্ধেও আপনি যা খুশি তাই বলবেন? আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি, সেখানে মেক-আপের ভেজাল চলে না। একটু আগে ওদিকে যে কথা হচ্ছিল তা ট্রুথ এবং সিনসিয়ারিটি নিয়ে। উত্তরে মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি রুখে উঠে বললেন, মুখ সামলে কথা বল কিন্তু। চরিত্রের উপর ঠেস মারা চলবে না। সৌভাগ্যের আড়ালে কী বলতে চেয়েছ আমি তা বুঝি। তোমরা যাকে ভেজাল বল, আমরা তাকেই বলি আর্ট। প্রকাশ্যে লুকনোই হল শিল্প-চাতুরীর চরম সার্থকতা। ছবি বা মূর্তির বড় কথা হল ইলিউশন

নন ও এস্কেপিজম। সোজা কথা, যাকে বলে চোখে দেওয়া। ওই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছে যত মর ইজ্‌ম্। আধুনিক বা পুরাতন—যে এলাকাতেই দেখবে ইম্প্রেশনিজম থেকে আরম্ভ করে কিউবিজম, টিজম, ডাডাইজম, সুরিয়ালিজম—এমন কি প্রজেনসনাল রিয়ালিজম পর্যন্ত ভেজালের আড়াল দিয়ে জাহির করছে। খুনখারাপির মত সত্য ঘটনা জর উপর খাড়া করলে অমন দৃশ্য কেউ বসে দেখবে প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য একটি দরজায় ামুড়ি লেগে যাবে।

মধ্যবয়স্কের কথা শেষ হতে আর একজন যোগ দন। তিনি আড়াল থেকেই বলছিলেন, সিনেমাস্তুতি পনার মুখেই মানায় ভাল। তবে আপনাদের কারবার গ্ল্যামার নিয়ে। যখন সিমপ্লিসিটির ধার ধারেন তখন আর্টের উচ্চ আদর্শকে বিকৃত করেন কেন?

মধ্যবয়স্ক হুঁশিয়ার লোক। তাঁকে এক কথায় পেড়ে না সহজ নয়, কারণ তিনি যে কোন প্রশ্নের উত্তর নতে জিইয়ে রাখেন। আড়ালের মানুষটিকে জবাব গাতে সময় লাগল না। বিশেষ ভঙ্গীতে জানালেন, মার উপদেশের জন্য কৃতার্থ হলাম। কিন্তু বৎস, মার-জাতীয় বহু বেড়া টপকাতে পারলেই মপ্লিসিটির নাগাল পাওয়া যায়—এই সিম্প্‌ল খবরটা রাখ না? তোমরা যাকে সিম্প্‌ল বল তা জটিলতার কৃত রূপ, সহজের কিনারাতেও ঘেঁষতে পারে না—রণ জটিলতার সার কথা লুকিয়ে থাকে ওই সিমপ্লিসিটির ড়ালে। আমরা সিমপ্লিসিটিকে বলি সলিউশন অফ ফিকান্ট প্রবলেমস্! ইতিমধ্যে কে একজন আমার দী হয়ে উঠেছিলেন। বললেন, আপনাদের সাহসকে রিফ করি। জিনিয়াসের সামনে দাঁড়িয়ে কী সব -তা বলছেন! তার চেয়ে আর এক প্লেট যথাস্থানে লান দিন—বুদ্ধির দাম বাড়বে, ভদ্রলোকের আয়োজনের তিও শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

এমন একটি প্রস্তাবে আশা করেছিলাম তর্কের কিছু রাম হবে, অভ্যাগতরা ছবি দেখার সুযোগ নেবেন, মালোচনার মাল-মসলা যোগাড় হবে। হল বিপরীত। ার এক প্লেটের প্রস্তাব উঠতে ভদ্রলোক প্রায় খেপে উঠলেন। দিগম্বররূপে মনের কথা বেরিয়ে এল। ভদ্রলোক তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন, পাঞ্জাবির আস্তিন গোটাচ্ছেন। মধ্যস্থতার ডাকে একজন গোটানো হাতার কাছে গিয়ে বললেন, কর কী, কর কী, এখানে নয়।—কে কার কথা শোনে, ধস্তা-ধস্তির মধ্যে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, Withdraw your words with apology or I shall make you eat them with some of your broken teeth. আহারের লোভ দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাও ওইটুকুই আমি বুঝি?

রাগের ভাষা যখন ইংরেজীতে ছোবল মারে তখন বুঝতে হবে ভেজালহীন সিনসিয়ারিটির সার কথা বেরিয়ে এসেছে। সিনসিয়ারিটি ক্ষেত্রবিশেষে সাংঘাতিক হতে পারে—বিশেষ করে যখন মারের প্রস্তাবে নিষ্ঠার যোগ ঘটে। এই ক্ষেত্রে ঝটপট কাজ সেরে সরে পড়াই রীতি, কিন্তু যা প্রত্যাশিত তা ঘটল না—উলটে ভদ্রলোক আস্তিন নামিয়ে শাস্ত্রসম্মত ভাবে জানালেন, You are lucky dog dear old thing, I let you off now, but mind I reserve my exclusive right for future occasion, I should say you are not only a snob but a genius in the Art of snobbery!

স্বরের তরফ থেকে কড়া উত্তর আসছিল। তাঁকে বোধ হয় সেখান থেকে মধ্যস্থদের ভিতর কেউ অন্য কোথাও নিয়ে গেলেন। আমি ভাবতে লাগলাম, এটা কী রকম হল! জলজ্যান্ত মানুষটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে—অমন সুবিধা পেয়েও সাধু উদ্দেশ্যকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় জিইয়ে রাখা কেন? আমার শারীরিক শক্তি থাকলে চাঁদার মারের পথ দেখিয়ে বেমালুম সরে পড়তাম। সন্দেহ হল, এরা কি ফিউচারিস্ট স্কুলের প্রচারক! বর্তমানের আনন্দ যদি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখে তা হলে ওরা বাঁচে কিসের জন্য? ওরা কি জানে না ভবিষ্যতেরও ভবিষ্যৎ আছে? চিন্তা উত্তেজনার স্তরে উঠে পড়ছিল, যা আমার পক্ষে মোটেই ভাল নয়। সমালোচকের আপ্যায়ন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ভিড়ের বাইরে আসার চেষ্টা করলাম। দেখলাম পথ বন্ধ। আমাকে ঘিরে একটি ব্যূহ রচনা হয়েছে। কী করব ভাবছি এমন সময় চাঞ্চল্যের গতি ভিন্ন দিকে মুখ ফেরাল। শুনলাম রায়বাহাদুর আসছেন।

খেতাবের ঘোষণা যেভাবে গৃহীত হল তাতে সন্দেহের ফাঁক থাকল না যে, রায়বাহাদুর একজন বিশেষ মান্যবর ব্যক্তি। কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। সকলেই সন্ত্রস্ত, ব্যূহ ইতিমধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রায়বাহাদুর আমার দিকে এগিয়ে আসতে মানুষটিকে চিনতে সময় লাগল না—এ যে আমাদের টাটু! ছেলেবেলায় একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি। বাস্তবিকই বাঁটকুলে লোকটি বল নিয়ে টাটুর মত ছুটত। পুরনো কথা মনে পড়তে আলিঙ্গনের জন্য হাত বাড়ালাম। আনন্দের উচ্ছ্বাস একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। বলে ফেললাম, এই যে টাটু, কি রকম আছ? অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই।

প্রীতির সম্ভাষণে গলে যাবার কোন লক্ষণ দেখলাম না। বরং রুখে গাম্ভীর্যকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমার নাম রায়বাহাদুর ঝুনঝুনিয়া। চলুন প্রিভিউয়ের ব্যবস্থা কি রকম হল দেখে আসি। ছবিগুলি আপনার কি রকম লাগল?

লোকটা ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা আরম্ভ করল না কি! আমি যেন ছবিগুলি কখনও দেখি নি। চোরের মন পুঁই-আদাড়ে ঘুরছিল। সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞাসা করে ফেলার ভয়ে কোন উত্তর দেবার সাহস পেলাম না। মান্যবরের পথানুসরণ করতে লাগলাম। চোরকে বামাল ধরতে পারলে পুলিস যেমন আগে আগে চলে, চোর থাকে পিছনে, তেমনি রায়বাহাদুর আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিলেন। ছবি দেখা আমার তখন বাধ্যতামূলক কর্তব্য হয়ে গিয়েছিল। রায়বাহাদুর বুঝিয়ে দেবার চেষ্টায় ভালমন্দ অনেক কিছুই বলে যেতে লাগলেন। বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো হচ্ছিল, আমি কিছুই বুঝছিলাম না। ভদ্রাচারের অবশ্যপালনীয় রীতি খতিয়ে যা বলছিলেন তাই সমর্থন করে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত হিজিবিজি জড়িয়ে থাকা রেখাগুলি সহস্রপদী কেন্নাইয়ের মত আমার মাথার ভিতর ঘুরতে লাগল। ভদ্রাচার তখন গ্যালাণ্ট রিট্রিটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিচার করে দেখলাম আর বেশীক্ষণ এখানে থাকলে কথা বলে ফেলতে পারি—যা অশুভ ঘটনার একটি সুনিশ্চিত সঙ্কেত। রায়বাহাদুরের সামনে এসে বললাম, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন আমি নিশ্চিন্ত। আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হয়, শরীরটা ভাল নেই।

রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন, দুঃখের কথা, আজকেই আপনার শরীর খারাপ হল! ভেবেছিলাম ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করে নেব। আপনার বন্ধু পরিচয়পত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, কিছু দেনা-পাওনার কথা ছিল তা আপনার হ্যাণ্ডনোট আর ব্যাঙ্ক-ড্রাফট দুই সমান। টাকাও আপনার পক্ষে বেশী নয়। প্রদর্শনীর ঝামেলা কেটে যাক, পরে আপনার বাড়িতে গিয়ে কথা বলব।

ব্যাঙ্ক-ড্রাফট, হ্যাণ্ড-নোট, বন্ধুর পরিচয়পত্র—তার উপর টাটুর সঙ্গে রায়বাহাদুরের যোগ ঘটায় অস্বস্তিকর চিন্তা আমাকে উৎকণ্ঠায় ফেলে দিল। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম রায়বাহাদুর চালাক লোক, সবই লক্ষ্য করছিলেন বললেন, ভাববার মত কিছু নেই, ওই বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব।

পরের দিনের কথা। অভ্যর্থনার আনুষ্ঠানিক করণীয় শেষ হতে প্রেসিডেণ্ট মঞ্চে উঠলেন। মাইকের মারফত আমার পরিচয় ও ছবির বিবরণ শুরু হল। তাঁর বাণীতে প্রশংসার চেষ্টা এবং ছবির বিশ্লেষণ এমনভাবেই সাজানো হয়েছিল যে নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে, বহুবার পুনরাবৃত্তির ঘর্ষণে অনেক শব্দের বিকৃতি ঘটেছে অথব অনেক জায়গায় গোটা শব্দই উবে গিয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, বিকৃতি সত্ত্বেও বক্তৃতায় কোন অসুবিধা হয় নি, কারণ, হাততালির ব্যবস্থা আগেভাগেই প্রস্তুত ছিল। হায়ার্ড মোর্নার্সদের যেভাবে টাকা দিয়ে শোকাচ্ছন্ন করা হয় সেইভাবে প্রেসিডেণ্টকে তারিফের জন্য সংগ্রহ করা হয় নি এমন কথা হলফ করে বলা যায় না আসল কথা সবই হয়, কিন্তু রসরাজ রাজশেখরবাবুর ভাষায় বলা চলে—'হয় কিন্তু জাস্তি পার না'।

মঞ্চের কাজ শেষ হতে উর্ধ্বলোক থেকে প্রেসিডেণ্ট আমাদের ধাপে নেমে এলেন। নামার সময় বার তিনেক হাতঘড়ি দেখে নিলেন। আমার কাছে আসতেই বললেন আপনার ছবি এত ভাল লেগেছে যে একবার দেখে আশ মেটে না। আর এক সময় আসব ভাল করে দেখার জন্য।—যাতে ছবি দেখার জন্য সময় নষ্ট না হয় সেদিকে শুকনোডাঙার আড়তদার বিশেষ নজর রেখেছিলেন

রণ এইরূপ শর্ত যেখানে না থাকে সেখানে ফিতে টার দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট নেন না। কিছু না দেখেই যদি টা আকর্ষণ আমার ছবির প্রতি এসে থাকে তা হলে বি দেখলে কী হত!

যাই হোক, বিদায় নেবার আগে তাড়ার কারণও বলে তে হল। জানালেন, আপনারা তো জানেন, নিজের তে আমার কোন সময় নেই। আমি বলি, এত কি টা লোকে পারে! এই দেখুন না, এখুনি আমাকে ীত-সম্মেলনে যেতে হচ্ছে। আমি না গেলে াদ⋯খাঁ তানপুরায় হাত দেবেন না। ঘরোয়ানা লের ধ্রুপদ গান—দু-একজন উপযুক্ত শ্রোতা না হলে রর বিস্তারও আসে না, তানে দরদও দেওয়া যায় না। ই ঠিক, কিন্তু ধ্রুপদ চালে সঙ্গত-সহ সঙ্গীত বুঝতে হলে নদানী ঘরের ট্র্যাডিশন চাই। পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর াল যখন মেঘগর্জন ডেকে আনে, মালকোষ রাগে যখন ংহের হুঙ্কার শুনতে হয়, সুর পরমব্রহ্মে বিলীন হয়ে কারের ধ্বনি তোলে তখন ধ্রুপদের সান্নিধ্য দরকার হলে াধ্যাত্মিক রসে ডুবে যেতে হয়। এই সুরের প্রতিক্রিয়াকে পলব্ধির জন্য দীর্ঘকালের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন— হঠাৎ-পাওয়া কালচারে বোঝার উপায় নেই। াধুনিক সঙ্গীতে যাঁরা শোক-নিংড়ানো সুর শোনায় ভ্যস্ত, যাঁরা বৃহৎ ফোড়ায় অস্ত্রোপচারের পর করুণ ার্তনাদকে আহা মরি কি মধুর গলা বলেন, তাঁদের ানন্দের স্থান হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডে—সঙ্গীতের ঠকী মজলিসে নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা ছেড়ে দুঃখের কাহিনী বলি। প্রিভিউয়ের আগে সেই যে হুণ্ডি-ভর্তি টাকা নিয়ে বন্ধু ালেন তারপর আর দেখা নেই। ইতিমধ্যে নানা ঘটনার াবির্ভাবে বহুবার তাঁর বাড়িতে লোক পাঠাতে য়েছিল। প্রতিবারই খবর পেয়েছি তালা বন্ধ। বাড়ির ালিকও শুনলাম বাকী ভাড়ার তাগাদায় ওদিকে লোক াঠিয়েছিলেন। বারবার রুদ্ধ দ্বারের সংবাদ তাঁকে ায় জরাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। বাড়ির মালিক যখন শ্চিন্তায় অতিষ্ঠ তখন বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেলেন। ঠি বোম্বাই থেকে লেখা। চিঠির সার অর্থ: বিশেষ রুরী কাজে এদিকে আসতে হয়েছে, ফিরতে সময় লাগবে। বাকী ভাড়ার জন্য নালিশের কথা কেন উঠল বুঝলাম না—বিশেষ করে আপনার প্রিয় সম্পত্তিটি যখন কিনে ফেলার কথা ভাবছিলাম। আপনার সব পাওনা শিল্পীর কাছে রেখে এসেছিলাম। ওদিকটা খবর নিলে বর্বরতার নির্লজ্জ রূপকে উলঙ্গ করে সামনে ধরার প্রয়োজন হত না। এই সূত্রে আপনাকে জানাতে চাই যে, পাওনা থাকলেই ইচ্ছামত তাগিদ ভদ্রাচার সমর্থন করে না। তাগাদার ভাষায় স্পষ্ট ভাবে আমাকে সন্দেহ করা হয়েছে, সুতরাং মানহানির মামলা থেকে আপনার রেহাই নেই। শুভার্থী হিসাবে বলি শিল্পীর কাছে টাকাটা আদায় হলে উকিলকে দেবার জন্য তুলে রাখবেন।

একে অর্থাভাব, তার ওপর শুভার্থীর সমবেদনায় ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে আমার দ্বারে ধরনা দিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর পাওনা আমার জিম্মায় থাকলে তৎক্ষণাৎ আমি দিয়ে দিতাম। শিল্পী হিসাবে বদনাম থাকলেও টাকাকড়ির ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করা চলে। তবু অর্থাভাব তাঁকে এমনই নাছোড়বান্দা করে তুলেছিল যে কৃপার চেয়ে ছেড়ে দে বাবা বলার জন্য বাড়িভাড়ার বাকী টাকা দিয়ে দিলাম। যাবার সময় চোখভরা জল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সব টাকাই কি মোকদ্দমার জন্য তুলে রাখতে হবে?—উত্তর দেবার কিছু ছিল না। জানালাম, ভবিষ্যতের কথা পরে দেখা যাবে। পরের ধার শোধ করে ভাবলাম ডবল পুণ্য লাভ হল, কিন্তু পুণ্যের ঘুষ দিয়েও পাপের নজর থেকে মুক্তি পেলাম না। কয়েকদিন পরেই ঝুনঝুনিয়ার চিঠি রেজিস্টারী ডাকে হাজির। তার সঙ্গে বন্ধুর চিঠি (নকল) জুড়ে দিয়েছেন। ঝুনঝুনিয়ার চিঠিতে ব্যবসাদারী ছাপ পড়েছে শুধু হরফে নয়, 'হয়কে নয়' বিনম্র ভাষাতেও।

প্রদর্শনী থেকে ছবি কেনার জন্য ঝুনঝুনিয়া দাম চেয়েছেন। আমার আঁকা ছবি কিনে আমারই কাছে দাম চাওয়ায় কোন রসিকতা ছিল না। সুতরাং গভীর অর্থ বোঝার জন্য তলিয়ে দেখতে হল। সংলগ্ন চিঠি রহস্যপূর্ণ। পড়ে স্তম্ভিত হলাম। বন্ধু ঝুনঝুনিয়াকে লিখেছেন, আপনাদের মর্যাদার কথা ভেবেই ছবি কেনার প্রস্তাব করেছিলাম। এতবড় অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের মধ্যে

যদি কেউ ছবি দাম দিয়ে না কেনেন, তা হলে সমস্ত আয়োজনই হাস্যকর হয়ে ওঠে—এমন কি আপনাদের রুচির উপরই অবাঞ্ছনীয় মন্তব্য কাগজে বেরিয়ে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ছবি সম্বন্ধে কোন কিছুই আপনারা বোঝেন না—এমন একটি সংবাদ যদি লোকে মেনে নেয়, তা হলে ভবিষ্যতে মাননীয় হবার জন্য যা কিছু সঞ্চয় করেছেন তা ধোপে টিকবে না, ধারাল কৃষ্টির খোঁচায় সব কেটে যাবে। ছবি দাম দিয়ে কেনার অসুবিধা থাকলে শিল্পীর কাছে চাইবেন। কারণ টাকাটা যে আপনার কাছ থেকেই এসেছে এটুকু অন্ততঃ জনসাধারণের জানা প্রয়োজন। অ্যাসোসিয়েশনের আমি ট্রেজারার—নগদ টাকা হাতে না পেলে তাহা মিছে কথাই বা বলি কেমন করে? আত্মসম্মানবোধকে তিনি কখনও ঝিমিয়ে থাকতে দেন নি। কাগজে কেলেঙ্কারি বার হবার সম্ভাবনা থাকলে তিনি যেমন করে পারেন রোধ করবেন। টাকাটা আপনি ধার হিসাবে দিলেও মোটা হারে সুদ দিতে তাঁর বাধবে বলে মনে হয় না। একান্তই যদি টাকাটা ধার হিসাবে দিতে হয় তা হলেও আপনার লাভ বই লোকসান নেই। মোটা অঙ্কের সুদ সম্বন্ধে আমি নিজেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। চেষ্টা করে দেখুন, বিফল হলে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

কয়েকদিন বাদে উকিলের চিঠিসহ আমার হ্যাণ্ডনোটের নকল এসে উপস্থিত। রসিদের অঙ্ক ভীতিপ্রদ, প্রায় ব্যাঙ্ক খালি করার নোটিস।

ব্যবসার কেন্দ্রে যখন শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি চলে তখন লাভের অংশের হিসাব হয় অন্তরালে—অর্থাৎ যাকে বলে ডুবে ডুবে জল খাওয়া। অমন আড়ালের আশ্রয় নিলে শিবের বাবাও টের পায় না। উপস্থিত শেয়ানাদের খবরা নিয়ে মাথা ঘামানোয় লাভ নেই। মোটের উপর আমার যা লাভ হল তা বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা।

ঘটনার ঘূর্ণ্যমান চক্র এমন ভাবেই ঘুরছিল যে কথায় কথায় আতঙ্ক এসে উপস্থিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলাম জাল-জুয়াচুরির মামলায় জড়িয়ে পড়ার চেয়ে আপোসে মিটমাট করে ফেলা ভাল। যুক্তি দায় দিতে বন্ধুদত্ত হিতোপদেশের দাম চুকিয়ে দিলাম। মনে হল একটা ভারী বোঝা মন থেকে নামিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু ভবিতব্যের বোঝাপড়া তখনও বাকী ... মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়লাম। বাঁদরের মানহা... তার সঙ্গে কপিরাইটের ইনফ্রিঞ্জমেণ্ট ও গুনাগা... দাবি। আমি নাকি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী মর্কট-শিম্পাঞ্জির ছবি নকল করে নিজের আঁকা বলে চালিয়ে... উক্ত মর্মে বাঁদরের উকিল চিঠি পাঠালেন, সঙ্গে গুনাগা... দাবিতে এমন একটি প্রত্যাশা ছিল যা আমার পক্ষে কথায় দিয়ে ফেলা সম্ভব নয়।

প্রবঞ্চনার পর প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা আমাকে স... পাগল করে তুলেছিল। মান-অপমান বাঁচা-মরা ... কিছু থেকে রেহাই পাবার জন্য বেপরোয়া ... গিয়েছিলাম। ঠিক করে ফেলেছিলাম পয়সা ... করে আর উপদেশ কিনছি না। উকিলের কাছেও ন... একলাই আদালতে হাজির হলাম। বাড়িতে আ... মহলে কান্নাকাটি পড়ে গেল। জমি-জমার ক... বহুবার আদালতে এসেছি। এখানকার ডাক-হাঁ... সঙ্গে পরিচয় থাকায় নিজের নাম শোনার অপে... আদালত-ঘরের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। যথা স... আমার ডাক পড়ল। দরজার দিকে এগুতে ... দেখি বান ডাকার মত মানুষের ভিড় বেগে আমার ... এগিয়ে আসছে। ভিড়ের সর্বাগ্রে দেখলাম—সাদা সাহে... কোলে মিশ-কালো বাঁদর। বাঁদরের আশেপাশে ... ফটোগ্রাফারের দল। তারপরই জনস্রোত ও কোলাহ...

সাহেব ও শিম্পাঞ্জী আদালত-ঘরে ঢোকার সঙ্গে চতুর্দিক থেকে ভিড় এমনই দরজার সামনে জড়ো হল ... ভিতরে ঢোকা সম্বন্ধে হতাশ হবার যোগাড়। লোকে... যতই বোঝাবার চেষ্টা করি, আমাকে না হলে মো... চলতে পারে না, পথ দিন—ততই কোলাহলে তাচ্ছি... গুঞ্জন বেড়ে ওঠে। অস্পষ্ট ভাষায় কেউ যেন ধমক দিয়ে যায়, চুপ কর, বাঁদর বিরক্ত হবে। নিরস্ত হবারও ... নেই, অপরদিকে বারবার আমার নামের ডাক শু... সমন পেয়ে আদালতে হাজিরা না দিলে কী হতে পা... আমি জানি। সঙ্কট অবস্থা। অবশেষে ফুলপ্যাণ্ট... একজন পুলিস-অফিসারকে সামনে পেলাম। তিনি দ... সামনে ডিউটির টহল দিচ্ছিলেন। মিনতির স্বরে ... অধিকারের কথা জানালাম। কর্তব্যবোধ যেখানে ...

খানে কৃপার প্রশ্ন অবান্তর। মিনতি তাঁর হৃদয়কে ড়া দিলেও প্রিন্সিপল্ বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। শৃঙ্খলার য়োজনে দরজার সামনে ভিড় কমানোই তাঁর কর্তব্য। মত অবস্থায় আমার আরজি বাতিল হলে অভিযোগ লে না। অন্তরের অস্থিরতাকেও সামলাতে পারছি না। ন পড়ল সমনের কথা। পকেট হাতড়াতে প্রয়োজনীয় াগজের টুকরোটি পাওয়া গেল। অধিকার প্রতিষ্ঠার ড়পত্রের ছোঁয়া পেতেই সাহস বেড়ে গেল, সমনটি র সামনে ধরে ইনটেলেকচুয়াল দাড়িতে হাত বোলাতে গলাম। ভাবটা, এখন আর ভগবান সাক্ষী রাখার কাব নেই। দাড়ির বৈশিষ্ট্যই আমাকে সনাক্ত করার ক্ষ যথেষ্ট। বিশ্বাস ও সন্দেহের ভাগ-বখরায় যেদিকই ঝুঁকে ভারী হোক, আমাকে তেমন অসুবিধায় পড়তে ন না। অফিসার বোধ হয় ধরে নিয়েছিলেন, অমন ড়ির যে মালিক সে জিনিয়াসই হবে। মোকদ্দমায় জনিয়াসের উপস্থিতির যে প্রয়োজন আছে, তা অফিসার ানতেন। প্রমাণ সত্ত্বেও আমার দাবিকে অস্বীকার রলে হয়তো তাঁর ওপর একটি ভিন্ন কেসের চাপ পড়ে বে। ভবিষ্যতের চিন্তা এবং অবাঞ্ছনীয় সম্ভাবনাকে ড়াবার জন্য অফিসার আমাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে লেন। ঠেলাঠেলিতে দরজার সামনে একটু বিশৃঙ্খলার ষ্টি হল। দ্বারের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি পড়তেই দাড়ির পায় আমি জিনিয়াস সাব্যস্ত হয়ে গেলাম। বিরাট থ্যা পরম সত্য বলে প্রমাণিত হতেই "সত্য ছাড়া মিথ্যা লিব না" ইত্যাদি হলফ খেয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম।

কাঠগড়ায় হলফ খাওয়ার পালা শেষ হতে উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পেশা কী? পেশা তো পরের াথায় কাঁঠাল ভাঙা অর্থাৎ জমিদারী—নিষ্কর্মার চরম ম্পদ। যাকে নীচু জাতের কাজ বলা হয়। সর্বসমক্ষে নিজেকে অস্পৃশ্য বলতে বাধছিল। স্বীকারোক্তিতে মার াবার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। ভাবতে লাগলাম, ছেলে-বেলায় পড়া গল্প "The wolf and the lamb"-এর দৃষ্টান্তের যদি পুনরাবির্ভাব ঘটে তা হলে করছি কী। আমি নিজে কোন ত্রুটি না করলেও, প্রজাদের বংশধর তো টে। আমার ঠাকুরদার দোষ দেখিয়ে যদি আমাকে মার দেওয়া দরকার হয়, তা হলে বিপদকে আদর করে আহ্বান করা হবে। সবদিক ভেবে চুপ করে রইলাম।

আমার অবস্থা দেখে উকিল বললেন, নিজের পেশা স্বীকার করায় অসুবিধা আছে দেখছি। আপনার স্মরণ-শক্তিকে একটু চাঙ্গা করে দিই। জিজ্ঞাসা করি, আপনি ছবি আঁকেন কি? উত্তর দিলাম, তুলি আর রঙ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, তবে সেগুলিকে ছবি বলা চলে কিনা জানি না।

উকিল জেরার জাল বুনছিলেন, কোন্ উত্তরকে কী ভাবে কাজে লাগাবেন একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। ঠক্—ঠক্—ঠক্ করে বেঞ্চির উপর টোকা মেরে চলেছেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার জবানবন্দী লিখে নিচ্ছিলেন। তাঁর লেখা শেষ হতে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত?

সত্যকে স্বীকার করতে হলে যা বলা উচিত, তাই বললাম। আমার উত্তর শুনে উকিলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বেশ রেগে গিয়েই জানালেন, আমি জানতে চেয়ে ছিলাম ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি কী নামে পরিচিত। ধমক শুনে ভড়কে গেলাম। সন্দেহ হল, জেরার চোটে নিজের নামটাও ভুল করলাম নাকি! সঙ্গে সঙ্গে নতুন নামকরণও সম্ভব নয়। উকিলের রাগ সামলাতে আর একটা বিপদে পড়ব। কী উত্তর দেব ভাবছি, এমনি সময় গোখরো সাপের ছোবলের মত বদ্ধমুষ্টি সশব্দে বেঞ্চির উপর এসে পড়ল। তারপর শুনলাম, আহা মরি কি মধুর নাম! আদর করে কে আপনাকে কী বলে ডাকে শুনতে চাচ্ছি না। এবার উত্তর দিন। জিনিয়াস নাম কার?

উত্তর দিলাম, জিনিয়াস কার নাম হতে পারে এমনটি জানা নেই। আমার ধারণা জিনিয়াস বলতে অসাধারণ গুণসম্পন্ন কোন বিশেষ মানুষকে বোঝায়।

মাথা চুলকানোর মুদ্রাদোষ সেরে নিয়ে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তা হলে আপনার মতে যে কোন বিষয়ে অসাধারণ গুণ থাকলেই মানুষ জিনিয়াস বলে প্রতিপন্ন হতে পারে? প্রশ্ন সোজাই মনে হল। নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিলাম, আপনার ধারণাকে সমর্থন করি। উকিলবাবু সহজের আড়াল নিয়ে যে গোলকধাঁধার ভিত্তি গাঁথছিলেন তা বুঝতে পারি নি। আমার উত্তর শুনে ফাঁদের ফাঁক বড় করতে লাগলেন। প্রশ্ন বাঁকা পথে সচল

হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সমর্থনকে স্বীকার করতে হলে দাঁড়ায় নির্ভুল নকল করাও একটি গুণ, এবং যে ব্যক্তি ওই বিশেষ গুণে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেছে তাকেও জিনিয়াস বলা চলে? উত্তর দিলাম, প্রকারান্তরে চলে বইকি।—উত্তর দিয়েই মনে হল কথাটা বেফাঁস বেরিয়ে গিয়েছে। সামলে নিয়ে বক্তব্যকে পরিষ্কার করে বলা ভাল। উত্তরের জের টেনে জানালাম, বলতে চেয়েছিলাম নির্ভুল নকলের মধ্যেও তারতম্য থাকে। উত্তর শুনে উকিল কথার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উত্তরের ঘাড় কামড়ে ধরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তারতম্যটি মাঝখানে কোন্ প্রকারের?

উত্তর দিলাম, নোটজালের নির্ভুল নকলবিৎ অসাধারণ ক্ষমতার জন্য একদিক থেকে জিনিয়াস ধার্য হলেও কৃষ্টির কেন্দ্রে জালিয়াতের শিল্প নৈপুণ্যতার স্থান নেই। চোরের গুণকে সঠিক বিচার করতে হলে আদালতই উপযুক্ত স্থান—রসিক নয়। এবং সুচিন্তিত বিচার হলে গারদখানায় বাসের আদেশই ন্যায্য পুরস্কার। তুলনায় কৃষ্টির অবদানে যিনি জিনিয়াস বলে সাব্যস্ত হন, তিনি রূপস্রষ্টা। ভাবব্যঞ্জক উচ্ছ্বাসকে রূপায়িত করতে পারাটাই তাঁর প্রধান কাম্য। পুরস্কার যা পান তা আনন্দের উপকরণ। বিজ্ঞান বা দর্শনের জ্ঞান-অন্বেষী সম্বন্ধে একই কথা খাটে। সন্ধানের পথে নতুনকে খোঁজা ও পাওয়াই তাঁর মস্ত বড় লাভ। এই জাতীয় জিনিয়াস যা পায় তাই ঘটনাক্রমে জনহিতকারী বৃহৎ দান হয়ে দাঁড়ায়। দানের কৃপায় মানুষ এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পায়, দুঃখে-ঘেরা আবেষ্টনীতে আনন্দের সাড়া শোনে। কিন্তু জালিয়াত জিনিয়াস গারদখানায় আটক না পড়া পর্যন্ত মানুষকে সব সময় বিপদ কাঁধে নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়।

উকিলবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, যে সব মহাশিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বিশেষ মানুষের মুখাবয়ব হুবহু নকল করেন তাঁদের আপনার যুক্তি মানতে হলে তো জিনিয়াস বলা চলে না?

উত্তর দিলাম, নিশ্চয় বলা চলে। কিন্তু তাঁদের কাজে··· অনেক কিছু বলার ছিল, কথাটা শেষ করতে পারলাম না। উকিলবাবু তেড়ে সামনের বেঞ্চে ঘুষি মে বললেন, বাস্, আপনি যা বলেছেন, তার বেশী শোনা কিছু নেই।

এই ঘটনার পর আমার ছবির প্রদর্শনী থে ঝুনঝুনিয়ার কেনা ছবি আনা হল। তাঁর হুকু অনুসারে মনঃসংযোগসহ দেখলাম এবং স্বীকার কর বাধ্য হলাম, ছবিগুলি আমার চিত্রপ্রদর্শনীতে টাঙা হয়েছিল। আমার স্বীকৃতির পরেই বিলাতে প্রকাশি মর্কটরাজের আঁকা ছবির প্রতিলিপি দেখানো হল। ছাড়া প্রদর্শনীতে টাঙানো ছবির সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই থাকলেও পার্থক্য কোথায় বলতে পারলাম না। পুন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে হল, প্রদর্শনীতে টাঙানো ছ সঙ্গে বাঁদরের আঁকা ছবির কোন প্রভেদ নে পরক্ষণেই শুনলাম, ভিন্ন সাক্ষী আমার উচ্চাসন দ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। কালবিলম্ব না ক নেমে পড়লাম।

বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী এবং স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উ কি ভাবে কেস খাড়া করেছিলেন জানি না। অক প্রমাণের ফলে হাকিম যা রায় দিলেন তাতে প্রায় অঙ্কের টাকার খেসারত সাব্যস্ত হল। অন্যথায় ছ মা সশ্রম কারাবাস। আপীলের স্পৃহা ছিল না। কোনপ্রকারে সংগ্রহ করে দিয়ে দিলাম। জিনি বাঁদর আমাকে নামের মোহ থেকে মুক্তি দিল। পরিত পুরাতন রোগ অভিনব চিকিৎসার তাড়নায় দূরে ছি যাবতীয় ঘটনা ও অর্থাভাবের সহায় পেয়ে আমার ক ফিরে এসেছে। কানের কাছে বলে চলেছে, আর যাব না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা নেই। কালের মহাকালের দিকে উল্কার গতিতে এগিয়ে চলেছে। শুনছি—কবে বাঁচার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাব। বন্ধু কোথায়? তাঁকে জানাতে চেয়েছিলাম, চিত্রকর আমার হয়ে ছবি এঁকে দিল, যাবার আগে সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খুশী হতাম। আমার শেষ কথা যেতাম—জিনিয়াসের শক্তি আত্মসাৎ করা সকলের সম্ভব নয়।

কোহিনূর

'সম্বুদ্ধ'

স্টারমশাই পড়াচ্ছিলেন।

চতুর্থ শ্রেণী। ইতিহাসের ক্লাস।

পড়াচ্ছিলেন : আমাদের এই ভারতবর্ষ কত যুগ-স্তর ধরে শিক্ষায় সভ্যতায় শক্তিতে সমৃদ্ধিতে া জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়েছিল। এই দেশেরই সৃষ্টি আর উপনিষদ; এই দেশেরই মানুষ বুদ্ধদেব আর চতন্যের বাণী আজও পৃথিবীতে শান্তির চরম কল্পনা গণ্য; এই ভারতেরই সন্তান আচার্য শীলভদ্রের কাছে নিতে দেশ-মহাদেশ গিরিশ্রেণী পার হয়ে বিদেশীরা শে এসেছিলেন; এই ভারতেরই সন্তান দীপঙ্কর ান অতীশকে মহাসমাদরে বরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্রাট—তাঁর দেশকে বৌদ্ধধর্মের উপদেশে দীক্ষা ত। ভারতের প্রচারিত সেই বৌদ্ধধর্ম আজও অর্ধেক য়া জুড়ে প্রচলিত রয়েছে। শুধু অতীত কালের রবেই গর্বিত নই আমরা। সে-যুগে ছিলেন শীলভদ্র র দীপঙ্কর, ছিলেন চরক আর নাগার্জুন। এ-যুগেও মনই আছেন আমাদের গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ; আছেন চার্য রমন আর জগদীশচন্দ্র। মহত্ত্বের সাধনায় ত্ত্বের গৌরবে ভারত কোনদিন কারও পেছনে পড়ে কে নি—এই কথা মনে রেখে অগ্রসর হবে তোমরা, লেরা। মনে রাখবে, আগামী যুগের রবীন্দ্রনাথ ন্ধীজী হবে তোমরাই, তবেই তোমাদের স্বাধীন দেশের লে হয়ে জন্মগ্রহণের সার্থকতা। আমি বুড়ো হয়েছি। ন্মছিলাম পরাধীন দেশে—ইংরেজের দাস হয়ে। সে সত্বের অবসান হল, দেখে গেলাম। এই আমার বহু াগ্য। এই দেশকে আবার প্রাচীন যুগের মত মহান্ রে গড়ে তুলবে তোমরা—এই হোক তোমাদের নিদ্রা-াগরণের স্বপ্ন। তোমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন শিশু য় জন্মেছ; তোমরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান। শিক্ষা-র্জনের যে সুযোগ, আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-সম্ভাবনা আমাদের াছে স্বপ্নের অতীত ছিল, তোমরা তা অনায়াসে পাবে। এই হল স্বাধীনতার অর্থ। সেই স্বাধীনতার মান তোমরা রাখবে, মূল্য তোমরা বাড়াবে—তোমাদের নিয়ে এই আমার কামনা; তোমাদের সেই সিদ্ধিই আমার সারা জীবনের কঠোর তপস্যার কাঙ্ক্ষিত ফল।

একটি সুন্দর ছেলে উঠে দাঁড়াল। কালো রঙ, চোখেমুখে বুদ্ধি আর ঔৎসুক্য ঝলমল করছে। বলল, সার্।

মাস্টারমশাই ঝুঁকে দেখলেন : কে, নৃপেন? বল বাবা।

স্নেহ আর বাৎসল্য উছলে পড়ল তাঁর কণ্ঠে।

সার্, আচার্য শীলভদ্রের বাড়ি ছিল কোথায়?

বাঃ, বেশ প্রশ্ন। শোন ছেলেরা। আমাদের এই বাংলাদেশেই বাড়ি ছিল তাঁর। পূর্ববঙ্গে, ঢাকা জেলায় বজ্রযোগিনী বলে গ্রাম। একা শীলভদ্র নয়, শ্রীজ্ঞান অতীশেরও বাড়ি ছিল বজ্রযোগিনী। আমাদের এই যুগেও বজ্রযোগিনীরই লোক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মশাই। একদিকে দেশপ্রেম, অন্যদিকে বহুবিধ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য—এমন অপূর্ব সমাবেশ বেশী দেখা যায় না। বজ্রযোগিনীরই আর এক সন্তান—গণিতশাস্ত্রের জাদুকর শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু। আমাদের এই বাংলাদেশেরই সন্তান এঁরা, এই তো আমাদের আরও বড় গৌরব। আর ভেবে দেখ, একটিমাত্র গ্রাম থেকে যদি এতজন মহদ্ব্যক্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে, কতগুলো গ্রাম আছে সারা ভারতবর্ষে!

গলা ভারী হয়ে এসেছিল হয়তো। মাস্টারমশাই কেশে গলা সাফ করলেন, চোখ আর চশমা মুছে নিলেন। বললেন, তারপর শোন : শুধু যে ধর্ম আর জ্ঞানের চর্চাতেই বড় ছিল ভারতবর্ষ, তা নয়। শিল্পে বাণিজ্যে, ধনে ঐশ্বর্যে, কিসে না ছিল এর সমৃদ্ধি। ভারতের মসলিন ছিল জগতের বিস্ময়ের বস্তু, ভারতের বাণিজ্য আর সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল জাভা বালী সুমাত্রায়, ভারতের তাজমহল আর

ময়ূর-সিংহাসন আজও সমগ্র জগতের বিস্ময়। আর শুধু যে মানুষই তার সাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছিল এই দেশকে তাও নয়—ভগবানও তাঁর দান অকৃপণ হাতে ঢেলে দিয়েছেন এই দেশের ওপরে। আর্যাবর্তের চির-উর্বর ভূমি, সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অজস্র জলধারা, হিমালয়ের তুষার আর বনসম্পদ ভারতবাসীকে অপর্যাপ্ত জীবিকার অধিকারী করে রেখেছে চিরকাল। ভারতের মাটিতে সোনা ফলে, ভারতের খনি থেকে ওঠে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, হীরা—

সেই ছেলেটি আবার উঠল। হীরার খনি আছে সার্?

নিশ্চয়ই আছে। হীরার খনি আছে দক্ষিণ ভারতে, গোলকুণ্ডায়। গোলকুণ্ডার খনি থেকেই উঠেছিল প্রসিদ্ধ হীরা—কোহিনুর। এতবড় হীরা পৃথিবীতে বেশী নেই। সম্রাট আকবরের উষ্ণীষে বসানো ছিল সে হীরা। উজ্জ্বল দীপ্তির জন্যে তার নাম দেওয়া হয়েছিল কোহ্-ইনুর—'জগতের জ্যোতি'। সেই কোহিনুরপরে হয় পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের। তারপরে হস্তগত হয় বৃটিশ-রাজের। সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুকুটে তাকে বসানো হয়েছিল। এখন তাকে ভারতে ফিরিয়ে আনবার কথা চলছে।

নৃপেন আবার উঠল: কোহিনুরের দাম কত সার্?

দাম!—মাস্টার মশাই সস্নেহে হাসলেন। বললেন, কোহিনুরের দাম তো টাকায় হয় না বাবা, টাকার অঙ্কে তার দাম কেউ মাপে নি কোনদিন। যে যখন পেয়েছে অন্যকে যুদ্ধে হারিয়ে কোহিনুরকে হস্তগত করেছে। সে রত্ন বীরের লভ্য—টাকা দিয়ে কেনবার নয়।

কিন্তু সার্, এখন তো আর ইংরেজ রাজকে যুদ্ধে হারিয়ে কেড়ে আনা হবে না তাকে। দাম একটা নিশ্চয়ই হিসেব করতে হবে?

তা বটে। কিন্তু, কোহিনুরের দাম, কোহিনুরের দাম···

মাস্টার মশাই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস যতগুলি পড়েছেন, যতগুলির নাম জানেন—অধরচন্দ্র মুখুজ্জে, ভিনসেন্ট স্মিথ্, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার—কোহিনুরের দামের কথা কি কিছু লিখেছেন কেউ? মনে পড়ছে না তো!

নৃপেন দাঁড়িয়েই আছে। বলল, বলুন না সার্?

মাস্টারমশাই চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, দাম? হ্যাঁ, বলব বাবা, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আজ ন একটু বই পড়ে দেখতে হবে।

বলবেন তিনি ঠিকই। ছাত্র প্রশ্ন করেছে—সে প্রশ্ন তাচ্ছিল্য করা বা ধমকে থামিয়ে দেওয়া তাঁর ধর্ম ন কিন্তু বই দেখতে হবে। কোন্ বইটা? কলেজে যে হবে একবার। প্রফেসররা জানবেন নিশ্চয়ই, বা হয়ে এনসাইক্লোপীডিয়াতে আছে। কম বই কি কলেজে!

নৃপেন বলল, আচ্ছা, থাক্, সার্।

না না, থাকবে কেন। মাস্টারমশাই সন্ত্রস্ত হ উঠলেন: প্রশ্ন যখন মনে হয়েছে, থাক্ বলে তো ছে দিতে নেই তাকে। তা হলে শিখবে কী করে! বল আমিই বলব। বই দেখে এসে বলব আর একদিন।

একটি ছেলে বলল নৃপেনকে, বসে পড়্ না, এই ভা ছেলে। দাম জেনেই বা কি করবি তুই, কিনতে যাবি?

মাস্টারমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কে বললে রে, ে বললে এ কথা?

শুনে ফেলবেন, তা ছেলেটি ভাবে নি। ভয়ে ভয়ে উ দাঁড়াল।

মাস্টারমশাই তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষ বললেন, ও কী কথা হল? কিনবে না বলে জানতে হ না? ওরকম আর কক্ষনো বলবে না।

ফাঁড়া কেটে গেল। উৎফুল্ল হয়ে ছেলেটা বলল, ই সার্। আচ্ছা সার্, বই তো দেখা হবেই। আন্দাজ ক ভেবেও তো নেওয়া যায়। কত দাম হতে পারে?

বেশ তো, তাই এস। আন্দাজই করা যাক। ব হতে পারে দাম ভাব তো?

কত বড় হীরে সার্?

এই, মানে ধর, এই রকমটা—হাত তুলে এব আন্দাজী মাপ দেখালেন মাস্টারমশাই।

ও বাবা! তা হলে নিশ্চয়ই তিন-চারশো টাকা হ

নৃপেন বলল, দূর বোকা। তিন-চারশো টাকা হ তাকে মহামূল্য বলে? আরও ঢের বেশী, না সার্?

হ্যাঁ, বটেই তো।

আমি বলব সার্?

বল।

হাজার। দু হাজার। না, তিন হাজার, না সার্

তা তো হবেই। মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠে উৎসাহ আর
ন্দ: তা আর হবে না! এই কোহিনুরকে নিয়ে
বার কত রাজা-মহারাজার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে গেল—
র দাম কি আর দু-তিন হাজারের কম হতে পারে?
বল আরও বেশীই হবে।

সেই ছেলেটি বলল, পাঁচ হাজার, সার্?

তাও হতে পারে বইকি।

আমি বলব সার্? দশ হাজার!—নৃপেন সোৎসাহে
ল।

ঠিক ঠিক। দশ হাজারের কম নয় কী বল?

ছুটির ঘণ্টা পড়ল। মাস্টারমশাই বই খাতা গুছিয়ে
তে লাগলেন। ছেলেরা হৈ হৈ করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরদিন।

নৃপেনদের বাড়িতে মহা তর্ক। নৃপেনের দিদি বলছে,
হিনুরের দাম দশ হাজার টাকা! কোন্ বুদ্ধিমানে
লছে তোকে?

যা-তা বলো না বলছি। আমাদের সার্ বলেছেন—
হাজার টাকার কম হবে না। বলেছেন, বই দেখে
ল করে বলে দেবেন।

ও দাদা, শুনছ? মাস্টার বলে দিয়েছেন কোহিনুরের
ম দশ হাজার টাকা! আবার না কি বই দেখে ভাল
রে বলে দেবেন। খুব শেখাচ্ছেন তো?

বিনা পয়সার ইস্কুল তো! এই রকমই হয়!

কিন্তু, এ কী রকম পড়ানো? বই দেখে এসে বলবেন,
জে জানেন না?

আচ্ছা, আমি যাবখন।

দাদার নতুন সরকারি চাকরি। তাজা উৎসাহ।
সইদিনই স্কুলে গেলেন।

হেডমাস্টার সব শুনলেন। মাস্টারমশাইকে ডাকিয়ে
নলেন ক্লাস থেকে। বললেন, এই শুনুন—ইনি কী
লছেন। আপনি বলেছেন ক্লাসে এই কথা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলেছি। মিছে কথা কেন বলব?

এরকম কেন বলেছেন?

আজ্ঞে, ঠিক ইচ্ছে করে বলি নি তো—কথায় কথায়
ইরকম দাঁড়িয়ে গেল কথাটা। মানে—

দাদা ঝাঁজালো গলায় বললেন, কথায় কথায় মানে?
াসে কি পড়ান, না, গল্প করেন ছেলেদের নিয়ে?

মাস্টারমশাই চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন।
কচকে চেহারা, ঝকঝকে স্যুট। বিনীতস্বরে বললেন, গল্প
নয়। আলোচনা একটু করতে হয় বইকি মাঝে মাঝে।
ছেলেদের তাতে চিন্তার অভ্যাস বাড়ে।

আর আপনাদের কাজে ফাঁকি দেবার সুযোগ মেলে।
প্রিপসটরাস্!

মাস্টারমশাই আবার চোখ তুলে তাকালেন। ত্রিশ
বছর মাস্টারি করছেন তিনি। এর বয়স ত্রিশ বছর হবে
না। চোখ নামিয়ে নিলেন। উত্তর দিলেন না।

কথা বলছেন না কেন? কোহিনুরের দাম বলেছেন
দশ হাজার টাকা! এর বেশী আপনার কল্পনায় আসে
নি! এই বিদ্যে নিয়ে পড়াতে আসেন? আবার
বলেছেন, বই দেখে এসে বলব। নাইস! লজ্জা হল না?

মাস্টারমশাই এবার মুখ তুলেই তাকালেন। বললেন,
লজ্জা—আজ্ঞে, বড়লোকের ভূষণ। তা ছাড়া, বাহাত্তর
টাকা আট আনা মাইনে পাই, দশ হাজার টাকার ওপরে
আমার কল্পনা পৌঁছবার তো কথা নয়।

সো, ইনগ্র্যাটিচুড! পাঁচ টাকা মাইনে ছিল—
আচ্ছা আই উইল সী টু দিস। থ্যাঙ্ক ইউ।

বেরিয়ে গেলেন।

মাস দুই পরে ওপর থেকে চিঠি এল।

বিদায়সভায় হেডমাস্টারমশাই খুব দরাজ গলায়
বললেন, আত্মদাতা দধীচিদের অস্থি নিয়েই যুগে যুগে
ধর্ম আর সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হয়েছে······

মাস্টার ও ছাত্রেরা প্রাণপণে করতালি দিলেন।

সভা যখন একেবারে ভেঙে গেছে, নৃপেন এসে প্রণাম
করল। চোখ দুটি ছলছল করছে। ছেলেমানুষ, কোন্
কথার টিকে থেকে কার চালে আগুন লাগে—সে কিছু
জানে না। বলল, সার্, চলে যাচ্ছেন?

মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ। বললেন, হ্যাঁ বাবা।
বুড়ো হয়েছি—

নৃপেন একটু ইতস্তত করল, বলল, একটা কথা
জিজ্ঞেস করব সার্?—একটু থামল, কুণ্ঠিতস্বরে ভয়ে ভয়ে
বলল, আর তো কেউ বলে দেবেন না।

বল।

দধীচি কী, সার্?

মাস্টারমশাইয়ের নিষ্প্রভ চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে
উঠল। বললেন, বলব বইকি বাবা, এক্ষুণি বলছি।
শুনে যাও, পরে আর তো সময় পাব না। দধীচি ছিলেন
ব্রহ্মর্ষি, মহাপুরুষ ·····

পড়ানো শুরু হয়ে গেল।

ভুল যদি হয়ে থাকে, ভয় কী ?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ভুল যদি হয়ে থাকে, ভয় কী ?
আশার আলোয় কভু নিরাশার কালো ছায়া রয় কী ?
এ জীবন-পারাবারে পাল তুলে বারে বারে
আসে যায় নিরবধি স্মরণের খেয়া-পারে
ভুলের বেদনা-ভরা তরণী সে চুপিসাড়ে ;
তাই যারা কাছে আসে প্রেমের এ বাহুপাশে
ভালবাসা বুকে নিয়ে, ক্ষয় তার হয় কী ?
ভুল যদি হয়ে থাকে, ভয় কী ?

প্রেমের দুয়ার যদি বন্ধ—
দখিন মলয় যদি ভুলে যায় আপনার ছন্দ,—
আকাশের তারাদল চেয়ে থাকে ছলছল,
যেন কি কহিতে চায় উচ্ছ্বাসে টলমল,
বিথারিয়া ছায়াপথে স্বপ্নের শতদল,
আমি শুধু তারি পানে সুরে সুরে গানে গানে
ঢেলে দিই বুকভরা প্রেম-মহানন্দ—
প্রেমের দুয়ার যদি বন্ধ !

ঝঞ্ঝার সাথে প্রেম হয় কী ?
জীবনের পাশা-খেলা দিন দিন 'ছয়-তিন-নয়' কী ?
টানাপোড়েনের ঘায় উধাও পরাণ ধায়
অলঙ্ঘ্য নিয়তির সীমা কে খুঁজিয়া পায়,
কাঁচা গুটি পেকে যায়, পাকা গুটি টাল খায়—
খেয়ালের খেলাঘরে উল্লাস কেঁদে মরে—
প্রাণের তুফানে পাড়ি এত দুর্জয় কী ?

কোথা শুরু, কোথা তার অন্ত ?
দুর্গম, দুর্জয়, সর্পিত দুস্তর পন্থ
যেন কোন্ দুরাশায় বিরাম লভিতে চায়
কামনার বেদীমূলে শঙ্কিত বেদনায় ;—
থরথর কম্পিত আকাশের আলোছায়
যেন কী না-বলা কথা যেন কী অজানা ব্যথা—
তমসায় মিশে যায় রক্ত-দিগন্ত।
কোথা শুরু, কোথা তার অন্ত !

আমি সেই তীর্থের যাত্রী—
কেটে যায় অমানিশা, ওই দেখ, ভোর হল রাত্রি !—
পাখির কূজন এসে দিগন্তে যায় ভেসে,
তরুণ অরুণ রবি আবার উঠেছে হেসে ;—
তটিনী কলস্বনা, বহিছে নিরুদ্দেশে
অসীম সাগর-পানে কুলু কুলু কলতানে,
তৃষিত এ ধরণীর শ্যামলিমা-ধাত্রী !
আমি সেই তীর্থের যাত্রী।

প্রেমে, বল, হয় কে বা নিঃস্ব ?
তারি মাঝে আরাধনা-বন্দিত সাধনার বিশ্ব !
যত খুশি দিয়ে যাই যেন তার শেষ নাই,
ফুরাবে না স্রোত কভু, কূল খুঁজে নাহি পাই—
সে আলো-উৎস মুখে বাঁধিয়াছি নীড় তাই,
সুমুখে দু চোখ মেলে অতীত পিছনে ফেলে
দেখে যাই ধরণীর প্রেমময় দৃশ্য !
প্রেমে, বল, হয় কে বা নিঃস্ব !

কবে সেই আশা হবে পূর্ণ ?
বন্ধুর চলা পথে হবে কি অন্ধকার চূর্ণ ?
প্রেমের এ অভিসার উন্মন, দুর্বার—
বঞ্চিত হৃদয়ের সঞ্চিত ব্যথাভার
রঞ্জিত করিবে কি অনন্ত রূপে তার
ভুলে-ভরা জীবনের নিষ্ঠুর হেরফের ?
নিখিলের সঙ্গীতে ভরিবে কি শূন্য ?
কবে সেই আশা হবে পূর্ণ ?

ভুল যদি হয়ে থাকে, ভয় কী ?
ভালবেসে ভুল করা সবচেয়ে ভাল তবু নয় কী ?
বুকে-জমা যত কালো মুছে দিক তারি আলো—
জীবন ভরিয়া শুধু মরমের সুধা ঢাল ;
সবারে চাহিয়া কাছে সবারে বাসিয়া ভাল
প্রেমের জগতে হায় নিঃশেষ-ভরসায়
নিজেরে বিরহী ভাবা অকারণে সয় কী ?
ভুল যদি হয়ে থাকে, ভয় কী ?

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রথম খণ্ড : উপন্যাস

দি ব্রাদার্স কারামাজোভ

নিরবধি কালে বিপুলা এই পৃথ্বীতে নিশীথ রাত্রির তিমির অন্ধকারে আকাশের দিকে যতবার মানুষ তাকিয়েছে, ততবার সে যা অনুভব করেছে তা মানুষের ভাষায় বর্ণনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে মানুষ। নিরবধি কালে বিপুলা এই পৃথ্বীতে ধ্যানসমাহিত হিমালয়ের পায়ের কাছে মানুষ যতবার এসে দাঁড়িয়েছে, ততবার সে যা অনুভব করেছে তা মানুষের ভাষায় বর্ণনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে মানুষ। নিরবধি কালে বিপুলা এই পৃথ্বীতে বসুন্ধরাজননী বিপুল নীলাম্বুরাশির বুকে কান পেতে যতবার মানুষ শুনতে পেয়েছে অতল জলের আহ্বান, ততবার সে যা অনুভব করেছে তা মানুষের ভাষায় বর্ণনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে মানুষ। আর নিরবধি কালে বিপুলা এই পৃথ্বীতে মানুষের মুখে যতবার উচ্চারিত হয়েছে সৃষ্টির ছন্দ আর যতবার মানুষের কানে গেছে সেই ছন্দে উচ্চারিত জীবনের জয়ধ্বনি, ততবার সে যা অনুভব করেছে তা মানুষের ভাষায় বর্ণনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে মানুষ। নিশীথ রাত্রির নীল তারা, ধ্যাননিমীলিত গৌরীশৃঙ্গের তুষারদৃষ্টি, বসুন্ধরাজননীর অতল জলরাশির কলতান—এরাই কেবল জানে সৃষ্টির জন্মরহস্য। এই 'তিনে'র সঙ্গেই শুধু তুলনীয় মরলোকে অমরলোকের বাণী : রামায়ণ আর মহাভারতের।

মানুষ একদিন চাঁদে গিয়ে পৌছবে। ছায়াপথে ছড়িয়ে আছে যে নাম-জানা আর নাম-না-জানা অসংখ্য গ্রহলোক—সেখানকার লোকেদেরও জ্ঞানের আলোকে ধরে নিয়ে আসবে মানুষ, কুজ্ঝটিকা আর কুয়াশা দু হাতে সরিয়ে সরিয়ে হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করবে সে, পাতালপুরীর অতল অন্ধকারের অহ্বানে সাড়া দেবে—তুলে নিয়ে আসবে তার আলোক-চিত্র। কিন্তু নীল তারার আর নিঃসঙ্গ গিরির অনির্বচনীয় মহিমা অথবা মহাসমুদ্রের জ্যোতির্ময় মূর্ছনা মুছে যাবে না তবু। এদের নিয়ে রূপকথার দিন ফুরবে না কিছুতেই। সেদিনও আর কোন মানুষ এদের নিয়ে গড়বে আর কোনও রূপকথা। যেমন যাবে না কোনও কালে মহাকাব্যের দিন—অন্য কোনও মানুষের মুখে সেদিনও ধ্বনিত হবে অন্য কোনও জীবনের অপরূপ কথা।

নিশীথ রাত্রির নিঃসঙ্গ ওই নীল তারার মত, হিমালয়ের ধ্যাননিস্তব্ধ নিরুপম সেই নীরবতার মত, মহাসমুদ্রের বিরামহীন বিপুল এই ক্রন্দনের মতই রামায়ণ আর মহাভারত হচ্ছে মানুষের চিরকালের ধন। আর মানুষের হাতে তৈরী বহু যুগের কীর্তির সঙ্গে তুলনা চলে শকুন্তলা আর কুমারসম্ভবের, ইলিয়াড আর অডিসির। আর ক্ষণকালের মহাকাব্য হচ্ছে : দি ব্রাদার্স কারামাজোভ। ভুল বললাম। গদ্যে মহাকাব্য হয় না, মহৎ কাব্য হয়। মানুষের হাত দিয়ে রচিত মানুষের সেই মহত্তম কাব্যই আমার বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রের প্রথম পুণ্য নাম। মহাভারতের কথা অমৃত সমান—যে শোনে আর যে শোনায় দুজনেই পুণ্য হয়। দি ব্রাদার্স কারামাজোভ যিনি লিখেছেন আর যিনি পড়েছেন তাঁরা দুজনেই ধন্য।

দস্তয়েভস্কির সবশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহাগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হবার পর বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়। অব্যক্ত আনন্দ-বেদনার দুঃসহ অন্তর্জ্বালায় উন্মথিত হয় মানুষের হৃদয়। সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি শুদ্ধ মৃত কথায় প্রকাশের পথ খুঁজে মরে। যুগযুগান্তের সঞ্চিত পাপের

নির্বুদ্ধিতার আর অন্তহীন অহমিকার স্তূপ যে মানুষ— তার হয়ে মানুষের কবি এই মহত্তম মানবসংহিতায় যে একটিমাত্র কথায় উচ্চারণ করেছেন সেই মৃত্যুহীন মনুষ্যত্বের বাণী—সে শুধু তাই বারংবার আবৃত্তি করতে হয় দি ব্রাদার্স কারামাজোভ পড়বার পর :

"If one loves all living things in the world, this love will justify suffering and all will share each others guilt. Suffering for the sin of others will then become the moral duty of every true Christian."

পাপকে ঘৃণা এবং পাপীকে ঘৃণা না করার মামুলী কথা বলেন নি কোথায়ও দস্তয়ভস্কি। পাপের জন্যে পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত এবং পাপীর জন্যে পুণ্যবানের অশ্রুবর্ষণে যেদিন ধারাসিক্ত হবে এই পৃথিবীর রৌদ্ররুক্ষ রাজপথ, সেইদিনই শুধু পাপের অসুরলোক উত্তীর্ণ হবে পুণ্যের সুরলোকে—তার আগে নয়।

মরলোকে অমরলোকের বাণী যদি হয় মানুষের চিরকালের ধন রামায়ণ আর মহাভারত, তা হলে অসুরলোকে সুরলোকের জয়ধ্বনি হচ্ছে দস্তয়ভস্কির দি ব্রাদার্স কারামাজোভ। গদ্যের মৃত কথা দিয়ে রচিত হয়েছে এই মহত্তম মানবকাব্যের কথামৃত। ফিয়োদোর দস্তয়ভস্কি মানুষের মহত্তম কবি; দি ব্রাদার্স কারামাজোভ বিশ্বসাহিত্যে বৃহত্তম মানবদলিল।

দি ব্রাদার্স কারামাজোভের কথা লিখতে লিখতেই আমার কলম দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, আমার মন দুলছে রীতিমত। বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে উল্লেখের বাইরেও এত উল্লেখযোগ্য বই আছে যে আমি যাদের তালিকাভুক্ত করেছি এই আলোচনার ফর্দে তাদের চেয়ে যাদের করি নি তাদের দাবি কারুর কারুর কাছে এতটুকু কম নয়। কিন্তু তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার কারণ নেই। তার কারণ সাহিত্য অঙ্ক নয়। কথাসাহিত্যে মানুষ তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজে; যে সৃষ্টি তার ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার যত বিস্তৃত যত গভীর এবং যে উত্তর সে জীবনের কাছ থেকে পেতে চায়, তার কাছাকাছি যায় সেই সাহিত্যসৃষ্টিকেই সে তত বড় মনে করে। কাজেই কোনও দুজন লোক বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রের গ্রন্থনা করলেও তাদের তালিকা কিছুতেই অবিকল এক হবে না কোনও দিন। তাই বিশ্বসাহিত্যের এই সূচী[illegible] যাদের ডেকে এনেছি তারা কেন বিশ্বসাহিত্য [illegible] সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পারলেই আমার ক[illegible] শেষ। কিন্তু তবুও আমি দ্বিধাগ্রস্ত। এবং আমার [illegible] দ্বিধার অপর নাম ফিয়োদোর দস্তয়ভস্কি।

দি ব্রাদার্স কারামাজোভ ছাড়াও দস্তয়ভস্কি আর [illegible] খানি অনুরূপ অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন [illegible] জনপ্রিয়তর নাম : ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট। এর কো[illegible] একটিকে বাদ দিয়ে কেন আর একটি সূচীপত্রের অন্ত[illegible] করেছি এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তো কারুর প[illegible] তার জবাব দেওয়া শক্ত হবে। বস্তুতঃ বিশ্বের [illegible] ছোটগল্পকারদের শেষ উত্তরাধিকারী সমারসেট মম্ [illegible] The World's Ten Greatest Novels- আলোচনার প্রারম্ভেই তাই বলেছেন :

When I consider how many obstac[illegible] the novelist has to contend with, how ma[illegible] pitfalls to avoid, I am not surprised t[illegible] even the greatest novels are not perf[illegible] I am only surprised that they are not m[illegible] imperfect than they are. It is largely [illegible] this account that it is impossible to pi[illegible] out ten and say they are the best. I co[illegible] make a list of ten more that in th[illegible] different ways are as good as those I h[illegible] chosen : Anna Karenina, Crime and P[illegible] ment, Cousin Bette, The Charterhouse [illegible] Parma, Persuasion, Tristram Shan[illegible] Vanity fair, Middlemarch, The Ambassado[illegible] Gil Blas. I could give good reasons [illegible] choosing those I have and equally g[illegible] reasons for choosing those I have just me[illegible] tioned. My choice is arbitrary."

মম্ তাঁর মূল বইতে দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্য[illegible] বলে দস্তয়ভস্কির যে বইয়ের উল্লেখ করেছেন তা হ[illegible] 'The Brothers Karamazov'। সেই মূল বই[illegible] মুখবন্ধে 'Crime and Punishment'-কে তারই এ[illegible] বলে ধরেছেন। সে বইগুলির নাম করতে গিয়ে বলেছে[illegible] 'in their different ways are as good as th[illegible] I have chosen…'

মম্ তাঁর নিজের নির্বাচনকে নিজেই 'arbitrary' আখ্যা দিয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কি নীরব কবির মতই নির[illegible]

লোচক সোনার পাথরবাটির মত শুনতে ভাল, আসলে স্তব। এ পৃথিবীতে মানুষ কেন, কিছুই নিরপেক্ষ । এমন কি মা-ও নন। হাতের পাঁচ আঙুলের মতই য়র চোখেও তাঁর পাঁচ ছেলে কিছুতেই সমান নয়। ারের ভার যাঁর ওপর—তাঁরই নিরপেক্ষ হওয়া যতদূর ব ততদূর হলে ভাল। কিন্তু সম্পূর্ণ পার্ফেক্ট হওয়া ন উপন্যাসের পক্ষে অসম্ভব, তেমনই উপন্যাসের যিনি ালোচক তাঁর পক্ষেও পার্ফেক্ট নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা কাশকুসুম রচনার মতই অলীক। পাঠকের মত ন্যেই উচ্ছ্বসিত নন সমালোচক। পাঠকের যা-ই মনের নয় তা-ই পরিত্যাগ করায় অথবা ভাল না লাগলে তা উলটে যাওয়ায় যেমন কোনও বাধা নেই, ালোচকের তা নয়। কারণ সমালোচকের স্বধর্ম হচ্ছে : থানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও ইতে পার অমূল্য রতন। কিন্তু সেই সমালোচকেরও পূর্ণ নিরপেক্ষ হবার উপায় নেই। থাকলে বিশ্বের ষ্ঠ উপন্যাসের তালিকা একটাই হত ;—একটার বেশী টা তালিকারও প্রয়োজন হত না অনুভূত।

সেই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,—ব্যক্তিগত ভাল াগা মন্দ লাগার পার্সোন্যাল বায়াস, যার হাত থেকে মালোচকেরও রেহাই নেই তার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ স্বীকার রেও আমি কেন 'Crime and Punishment'কে াতিল করে 'The Brothers Karamazov'কেই কবল উল্লেখের যোগ্য মনে করেছি বিশ্বসাহিত্যের চীপত্রে, সে কথার উত্তরে এখন এইটুকুই মাত্র বলতে ারি যে কেবলমাত্র পার্সোন্যাল বায়াসই তার একমাত্র ারণ নয়। দি ব্রাদার্স কারামাজোভের ক্ষেত্রে অন্ততঃ মামার বিচার আর যাই হোক 'arbitrary' নয়। এবং এইটুকু বলেই আমি থামছি না। বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রের ভূমিকায় আমি যে বলেছি দস্তয়ভস্কির নাম প্রথমে উল্লেখ করলেও পরবর্তী কেউই দ্বিতীয় তৃতীয় নন—সকলেই অদ্বিতীয় নিজের নিজের ক্ষেত্রে, এখন আমি আমার সকথা প্রত্যাহার করতে চাই। এবং প্রত্যাহার করে কথাই বলতে চাই যে বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে উপন্যাসের ক্ষেত্রে দি ব্রাদার্স কারামাজোভের নাম যে আমি প্রথম সিয়েছি সে আমার ব্যক্তিগত খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নয়, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের ওপর আস্থা না রেখে পারি নি—এই কারণে। সেই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের কারণ আমি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করব। এখন কেবল এই মাত্র বলি যে তলস্তয়, বালজাক, ফ্লবেয়ার এবং আর আর অবিস্মরণীয় কথা-সাহিত্যকারেরা সবাই সেই মম্-এর স্মরণীয় উক্তিতে··· 'Can see through brickwalls',—এই কারণেই Greatest Writersদের অন্যতম। এঁরা সকলেই নিপুণ শল্য-চিকিৎসকের হিউম্যান অ্যানাটমিকে নিবিড়ভাবে জানার চেয়েও অনেক নিবিড়তরভাবে জেনেছেন হিউম্যান মাইণ্ডের অ্যানাটমি। ঠিক, কিন্তু দস্তয়ভস্কি সেখানেই থামেন নি।

ফিয়োদোর দস্তয়ভস্কি আমাদের হাত ধরে নিয়ে গেছেন মানুষের মনোলোকের সেই আদিভূমিতে যেখানে পাপের প্রথম চিন্তা অঙ্কুর হয়ে প্রতীক্ষা করছে একদিন মহীরুহ হয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়। আলোছায়ার, মেঘরৌদ্রের, সাদাকালোর চিরন্তন দ্বন্দ্বের মতই পাপ ও পুণ্যের অবিরাম সংগ্রামে মানুষ যেখানে প্রতিমুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত—মানুষের সেই রক্তাক্ত মর্মমূলকে তুলে ধরেছেন দস্তয়ভস্কি একবার ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে, আর একবার দি ব্রাদার্স কারামাজোভে। কিন্তু এ জন্যেও আমি দস্তয়ভস্কিকে প্রথম সারির প্রথম আসন দিতে রাজী নই। মানুষের সেই মর্মমূলে—যেখানে পাপের কীট বাসা বেঁধেছে তাকে উন্মুক্ত করেই ছুটি নেন নি দি ব্রাদার্স কারামাজোভের স্রষ্টা। ক্ষত-উন্মুক্ত মানুষের রক্তাক্ত মর্মমূলে বিশ্বাসের প্রথম প্রলেপ বহন করে নিয়ে গেছেন তিনি। এই মর্ত্যলোকেই একদিন অমর্ত্যলোক রচনা সম্ভব, যদি প্রত্যেকটি মানুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে সমগ্র মানবগোষ্ঠি ; সমগ্র মানুষের অপরাধের জন্যে যদি প্রত্যেক মানুষের দু চোখ সমবেদনার অশ্রুজলে ভরে যায় একদিন, তবেই। এই জলন্ত জাগ্রত বিশ্বাসের খাপ-খোলা বাঁকা তলোয়ারেরই নাম—দি ব্রাদার্স কারামাজোভ। আর এর স্রষ্টা অবিশ্বাসের নয়, নব আশ্বাস এবং অবিচলিত বিশ্বাসের কালাপাহাড়—ফিয়োদোর দস্তয়ভস্কি।

দি ব্রাদার্স কারামাজোভ, ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং দি ইডিয়ট একদিকে যেমন মানবজীবনের মহৎ কাব্য,

আর একদিকে তেমনই দস্তয়ভস্কির নিজেরও জীবন-মহাকাব্য। সব ঔপন্যাসিকেরই নিজের জীবনের ছায়া অবশ্যম্ভাবী পড়ে তাঁর উপন্যাসে। দস্তয়ভস্কির সব রচনাতেই কোথাও না কোথাও তাঁকে এত স্পষ্ট মনে হয় যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় পর্যন্ত। দস্তয়ভস্কির সেই জীবনকাব্য না জানা হলে তাঁর মহত্তম রচনাকে হৃদয় দিয়ে জানা অসম্ভব। কোনও কোনও বুদ্ধিমান সমালোচক ইতিমধ্যেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন—সন্দেহ করি উপন্যাসের আলোচনায় ঔপন্যাসিকের জীবন এতদূর পর্যালোচনার যৌক্তিকতার বিষয়ে। সে সন্দেহ পণ্ডিতের, বৈয়াকরণের এবং আলঙ্কারিকের—জীবন-রসরসিকের নয়। পণ্ডিত বৈয়াকরণ এবং আলঙ্কারিক পুথির শুষ্ক পত্রে খুঁজে বেড়ায় জীবনজিজ্ঞাসার জটিল সূত্র। এবং যত গলদঘর্ম হয় সে, যত জটিলতর হয় ব্যাখ্যার কূট, তত মনে হয় তার পণ্ডিত হওয়া সার্থক। জট পাকাতে যার আনন্দ তার নাম পণ্ডিত; জট খুলতে যে কোনদিন নিরানন্দ নয়, সে-ই রসিক। রসিক জানে তার জীবনজিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে না পুথিতে; তার জন্যে যেতে হবে পুথি-লিখিয়ের জীবনে। কারণ সাহিত্যের প্রথম দাবি পাঠকের কাছে যা তা এ নয় যে পাঠককে নিদারুণ পণ্ডিত হতেই হবে। তার প্রথম ও প্রধান দাবি হচ্ছে অতি সামান্য; পাঠককে যা সর্বাগ্রে এবং সবশেষে হতেই হবে তা হচ্ছে—সহৃদয়হৃদয়।

কিন্তু কেবলমাত্র রসের দায়ে নয়, যুক্তির কারণেও বটে। কবিকে খুঁজো না জীবনচরিতে—সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবিতার ক্ষেত্রে এ কতদূর সত্য জানি না, কথাসাহিত্যের বেলায় এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। কেন নয়, তার উত্তরে 'প্রডিজি'-প্রসঙ্গে অলডাস হাক্সলীর একটি উক্তি স্মরণীয়। হাক্সলী বলছেন যে, সঙ্গীতের নৃত্যের চিত্রের এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতার বেলাতেও 'প্রডিজি' অথবা 'বালক বিস্ময়' সম্ভব কিন্তু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রডিজির' দর্শন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ গান নাচ ছবি কবিতা অত্যন্ত অল্প বয়সেও কারুর কারুর মধ্যে বাসা বাঁধে না, শুধু স্বর্ণদর্পণ নির্ঝরিণীর মত সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। এমন ঘটনা সভ্যতার ইতিহাসে বিরল হলেও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের কুরুক্ষেত্রে কর্ণার্জুন ছাড়া কারুর আবির্ভাব নেতৃত্বে অভিষিক্ত হবার পক্ষে অসম্ভব অন্তরায়। কারণ? কারণ, গল্প-উপন্যাস জীবনের কথাচিত্র। সেই মানবজীবনের অন্তস্তল পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগে যে শুধু তাই নয়, অনেক ঘটন-অঘটনের, অনেক সুযোগ-দুর্যোগের, অনেক স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার দুস্তর পারাবার পার হয়ে তবে কেউ কেউ তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে; কেউ বা তার পরেও পারে না। তাই কেবলমাত্র প্রতিভা অথবা প্রেরণা সম্বল করেই জন্ম দিতে পারে না কেউ মহৎ উপন্যাসের। বহু আঘাটায় ঘুরে ঘুরে তবে কোনও ভাগ্যবান উঠতে পারে ঘাটে জীবনগঙ্গায় অবগাহন করে। প্রতিভার সোনায় অভিজ্ঞতার খাদ না মেশানো পর্যন্ত সেই অলঙ্কার প্রস্তুত হয় না; যার নাম—কথাসাহিত্য।

ফিয়োদোর দস্তয়ভস্কির সৃষ্টির চেয়ে দস্তয়ভস্কি নিজে কম বিচিত্র, কম বিশাল পুরুষ ছিলেন না। যে আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি ধরায় আসেন সেই আলোর সম্পূর্ণ উত্তাপ পেতে হলে আমাদের যেতেই হবে আলোর নীচে, তাঁর জীবনের অন্ধকারতম কোণে। দস্তয়ভস্কির জীবনীকারেরা জানিয়েছেন, দস্তয়ভস্কির জীবনে সবচেয়ে সর্বনেশে প্রভাব পড়েছিল যার সে নারী নয়—জুয়া। সাধারণ জুয়াড়ীর সঙ্গে দস্তয়ভস্কির তুলনা করলে পথের ধারে পড়ে-থাকা মত্তপের সঙ্গে নিমচাঁদের তুলনা করার রসাভাস ঘটবে। জুয়া ছিল দস্তয়ভস্কির নিশ্বাস-প্রশ্বাস। জুয়া ছিল দস্তয়ভস্কির দুরন্ত প্যাশন। মানুষ যেমন মদ খেতে খেতে মদ না পেলে পাগল হয়ে যায়, যে প্যাশনের বশবর্তী হয়ে ঘরের পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে মানুষ কুৎসিততম বারনারীর মধ্যে নিজের অবদমিত উত্তেজনার মুক্তি যাচ্ঞা করে, যে প্রেরণায় সিংহাসন মুকুট দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িতা দেবকাম্য কান্তাকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ে রৌদ্ররুক্ষ রাজপথে মানবজীবনের চরম জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর অন্বেষণে, সেই ভাষায় প্রকাশ-অসম্ভব বস্তুর তাগিদেই সর্বস্ব হারিয়েও দস্তয়ভস্কি বারবার ফিরে গেছেন জুয়ার আড্ডায়।

দস্তয়ভস্কি, যিনি মৃত্যুর সুনিশ্চিত পদক্ষেপ কান পেতে শুনেছেন সেমেনভস্কি স্কোয়ারের তুষারতীর্থে; দস্তয়ভস্কি যিনি সাইবেরিয়ার যতটুকু জীবিত তার চেয়েও মৃত মানুষদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন যৌবনের সেই নানা রঙের দিন, সে-ই দস্তয়ভস্কি যে তাঁর নিজের জীবন নিয়ে দু হাতে জুয়ার ছিনিমিনি খেলবেন এ আমাদের কাছে যত অস্বাভাবিকই হোক, এই বোধ হয় জীবনসঙ্গত ব্যাখ্যা সেই এক সৃষ্টির চেয়েও বৃহৎ স্রষ্টার বিচিত্র জীবননাট্যের

ব্যাডেন-ব্যাডেনে দস্তয়ভস্কির স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা যা কিছু বাঁধা দেবার মত তাঁর সব বাঁধা দেওয়া হয়ে গেছে দস্তয়ভস্কি সেই মুহূর্তে জুয়ায় চার হাজার ফ্রাঙ্ক জিতে চিঠি লিখছেন।

এই স্মরণীয় চিঠিতে অবিস্মরণীয় চরিত্র দস্তয়ভস্কি ভিতরের পুরুষ বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

[ক্রমশঃ]

অম্ল-মধুর

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

প্রথম অঙ্ক

স্থান : ব্লাড ব্যাঙ্ক। সময় : সকাল নটা

ড ব্যাঙ্কের সামনের দিক। বাইরের দরজা থেকে দূরে টেবিলের সামনে রক্ত জমা দিতে এসে জন-ক লোক লাইনে দাঁড়িয়েছে। লাইনের দ্বিতীয় টির হাতে রেশনের ব্যাগ, রোগজীর্ণ চেহারা। লের পাশে পর্দা-ঘেরা কুঠরি। আশেপাশে আর রের দিকে পর্দা-ঘেরা কুঠরি আর কাঠের কুঠরি দেখা য়। কুঠরির গায়ে ঝুলনো পোস্টারে ব্লাড ব্যাঙ্কের াজনীয়তা জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে—বড় বড় র লেখা রয়েছে 'ব্লাড ব্যাঙ্ক'। এ ছাড়া রয়েছে ার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে 'সুখী পরিবারে'র ছবি, রপত্র আর প্রাচীরপত্র ইত্যাদি কুঠরির গায়ে গায়ে না। ঘরে ঢুকে প্রথমেই এ সবের উপর চোখ পড়ে ; খোলা ভিতর দিক ঠাহর করা যায় না।

র পাশে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ডাক্তার ঘোষ াজপত্র দেখছেন। ডাক্তার ঘোষের বয়স ত্রিশের নীচে ই মনে হয়। ডক্টর সান্যাল এসে ঘরে ঢুকে ডাক্তার ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডক্টর সান্যালের বয়স শের মত—বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর বৈজ্ঞানিক। ডাক্তার ষ উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন ডক্টর সান্যালকে।]

ডাক্তার ঘোষ। (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার ডক্টর সান্যাল, চয়ার দেখিয়ে) বসুন। তারপর—খবর কি বলুন ?

ডক্টর সান্যাল। (নমস্কার করে) রাজধানীতে যাচ্ছি, সতে বসতে) ভাবলাম দেখা করে আসি।

ডাক্তার ঘোষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপার কি বলুন তো! গজে দেখলাম নূতন কমিশন পেয়েছেন।

ডক্টর সান্যাল। সে কি ছাই আমিই ঠিক জানি!

ডাক্তার ঘোষ। (সঙ্গে সঙ্গে) সারকুলার পেয়েছেন তো ?

ডক্টর সান্যাল। পেয়েছি। পেয়েও যে তিমিরে সে তিমিরেই আছি এখনও। এ সব সারকুলার থেকে কি কিছু বোঝবার জো আছে ডাক্তার ঘোষ! সব রাখ-রাখ ঢাক-ঢাক! তবে হ্যাঁ, আমাদের জাতীয় মহাসভা জনসাধারণের জন্যে চেষ্টা করছে বটে বলতেই হবে—

ডাক্তার ঘোষ। জাতীয় সরকার বলুন—

ডক্টর সান্যাল। ওই একই কথা ঘোষ। মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে 'মহাসভা-নগর' গড়ে দিয়ে লুটনলালজী সরকারী গুড়ের কনট্রাক্টে লাল হয়ে গেল দেখলে না ? লোকে দেখল লুটনলালজীর টাকায় 'মহাসভা-নগর' তৈরি হয়েছে, সরকারী গুড়ের কনট্রাক্টে কত টাকা মুনাফা করলে কেউ দেখতে পেলে না। যাক গে, বলছিলাম কি, কমিশনের পর কমিশন বসিয়ে সাধারণের জন্যে কী চেষ্টাটাই না এবার করা হচ্ছে! বিরোধী দলের মুখ চুন! এর পর আর কারুর কিছু বলবার থাকবে না।

ডাক্তার ঘোষ। সারকুলার দেখে কি কিছুই বুঝতে পারেন নি ?

ডক্টর সান্যাল। গোপন সারকুলার, তার থেকে কিছুই ঠিক বোঝা যায় না ডাক্তার ঘোষ।

ডাক্তার ঘোষ। নতুন ট্যাক্স নয় তো ?

ডক্টর সান্যাল। আরে না, ছাতি লাঠি সবকিছুর ওপরই তো ট্যাক্স বসানো হয়ে গেছে—এ সব নয়। মোদ্দা কথাটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলেই মনে হচ্ছে।

ডাক্তার ঘোষ। আপনার সে বড়িটা তো ওরা পেটেণ্ট করেছে দেখলাম।

ডক্টর সান্যাল। কোন্ বড়ির কথা বলছ ?

ডাক্তার ঘোষ। কেন, ওই বার্থ কনট্রোল বড়ি—মানে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল।

ডক্টর সান্যাল। তার জন্যে মেলা টাকা দিতে হয়েছে। আসলে এটা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একেবারে গোড়ায় রয়েছে কি না!

ডাক্তার ঘোষ। (বিস্মিত) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ায়! জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল!

ডক্টর সান্যাল। (মৃদু হেসে) ঠিক তাই।

ডাক্তার ঘোষ। ঠিক বুঝতে পারলাম না ডক্টর সান্যাল!

ডক্টর সান্যাল। এতে বোঝবার কী আছে! একটা পরিকল্পনা কতকগুলো মূলসূত্র ধরে চলে ডাক্তার ঘোষ।

ডাক্তার ঘোষ। মূলসূত্র?

ডক্টর সান্যাল। ঠিক তাই। বিনা উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরি হয় না। আচ্ছা, প্রথম আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ তুমি?

ডাক্তার ঘোষ। সে তো অনেক কিছু—বহু সমস্যার সমাধান।

ডক্টর সান্যাল। অনেক কিছু থাকলেও আসলে একটা কিছু আছে ডাক্তার ঘোষ। ধর, খাদ্যসমস্যা। আচ্ছা, অন্নবস্ত্র-গৃহসমস্যাই ধর—তার মূলে রয়েছে মানুষ, কেমন?

ডাক্তার ঘোষ। সে তো আছেই। মানুষ না থাকলে তো কোন সমস্যাই থাকত না।

ডক্টর সান্যাল। ঠিক কথা। কিন্তু সমস্যা নিয়ে সরকার কেন, কোন কিছুই চলতে পারে না। যে করেই হোক, সমস্যা মেটাবার পথ খুঁজে বের করতে হবে। আর মানুষ থাকলে সমস্যাগুলোও থাকবে।

ডাক্তার ঘোষ। (কথা শেষ করতে না দিয়ে) সমস্যা মেটাতে গিয়ে মানুষ মেরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন নাকি? মানুষ উজাড় করে ফেললে—

ডক্টর সান্যাল। আরে, আগে শোনই না কী বলছি। এত সহজ হলে তো সব গোল চুকেই যেত। একটা সমস্যা 'ট্যাক্‌ল' করা কি এত সহজ! কি বলছিলাম—মানুষ থাকলেই সমস্যাগুলো থাকবে। এর ওপর মানুষ যদি বেড়ে চলতেই থাকে, সমস্যাগুলোও আরও বেড়েই চলবে। সুতরাং সমস্যার সমাধান করতে হলে মানুষ কমাতে হবে, অন্ততঃ আর বাড়তে দেওয়া কিছুতেই চলবে না। কাজেই, পঞ্চবার্ষিকীর সঙ্গে আমার পিলের যোগ কোথায় এবার বুঝলে?

ডাক্তার ঘোষ। যোগটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ডক্টর সান্যাল! (মাথা চুলকে) কঠিন ঠেকছে।

ডক্টর সান্যাল। বুদ্ধি তোমাদের আর কবে হবে এক কথায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলসূত্র হলো বা কন্ট্রোল—মানে জন্মনিয়ন্ত্রণ।

ডাক্তার ঘোষ। এবার কিছু কিছু বুঝতে পারছি তাই বলুন—কৌশলে কাজ সারতে হবে! মানুষ থাকলে, মানে—কোন উপায়ে মানুষ মেরে উজা করে ফেলতে পারলে সমস্যাও থাকবে না। আমার কথা ঠিক নয়?

ডক্টর সান্যাল। নিশ্চয়ই ঠিক নয়। তোমাদের বু মোটা। অত সোজা করে এ সব বুঝলে চলে না, ঘুরি বুঝতে হয়। আর বুঝে পথ বাতলাতে হয় আরও বাঁ করে। বুঝেছ—সে কথা অন্যের কাছে কিছুতেই ফাঁ করতে নেই। ফাঁস করেছ কি তোমার হয়ে গেল! জীব উন্নতি যদি করতে চাও, আমার এ উপদেশ মনে রাখবে নইলে কি আমার বার্থ কন্ট্রোল পিলের এত কদর হ এবারকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কমিশনে আমা ডাকছে কেন জান?

ডাক্তার ঘোষ? কেন? বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অ বৈজ্ঞানিক বলে?

ডক্টর সান্যাল। আরে না! ওরা জানে আমা দিয়ে কাজ হবে। অথচ ওরা ছাড়া আমি নিজে বুঝতেই পারব না কী ওরা আমাকে দিয়ে করিয়ে নে (হেসে) বুঝলে?

ডাক্তার ঘোষ। কি করে বুঝব বলুন। না বোঝ পথেই তো আপনারা চলছেন। কিন্তু আপনাদের কা প্রকাণ্ড ফল তো আমরা দেখতে পাব ডক্টর সান্যাল— চাপা দেবেন কী করে?

ডক্টর সান্যাল। চাপা দেব কেন। দেখাবার জ তো আমরা কাজ করব, হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দে সেখানেই আমাদের বাহাদুরি। আর সমস্যার হাত থে বাঁচবার জন্যেই সাধারণে তা কুড়িয়ে খাবে।

ডাক্তার ঘোষ। তাই বটে, মরেও মানুষ বাঁ আপনার কথাই ঠিক ডক্টর সান্যাল—নতুন জীবনের জ আমাদের মরা দরকার! একটু বসুন। (লাইন দাঁড়ানো লোকদের দেখিয়ে) এদের বিদেয় করে এ আমি আসছি।

ডক্টর সান্যাল। দাঁড়াও। কী বললে? নতুন
নর জন্যে মরা দরকার? এই দর্শন আউড়ে আউড়েই
রা গেলে। সহজ জিনিসটাকে ঘুলিয়ে না দিয়ে
তেই ছাড়বে না।

ডাক্তার ঘোষ। এইমাত্র বাঁকা করে বাতলাতে
দেশ দিলেন, আপনার সে উপদেশ মেনে চলবার
। করছিলাম ডক্টর সান্যাল। আসলে আমি
টিক্যাল—মানে রাজনৈতিক জীবনের কথা বলেছি।
রলে রাজনৈতিক চেতনা আসে না। আচ্ছা, এক্ষুণি
ছি। (উঠে দাঁড়িয়ে যেতে উদ্যত হলেন)

ডক্টর সান্যাল। আরে দাঁড়াও, শোন।

ডাক্তার ঘোষ। (ফিরে) শোনবার আর কী
ছে বলুন? কমিশনের পর কমিশনে যাচ্ছেন, এবার
পনি নির্ঘাত সরকারী উপাধি পাবেন। যোগ্য লোক,
র দাম—মানে উপাধি আপনি এ বছর পাবেনই।

ডক্টর সান্যাল। যোগ্য লোক আর কটা উপাধি
চ্ছে বল! উপাধি তো অপদার্থ আর অযোগ্যদের ওপরই
ষত হচ্ছে দেখতে পাই। এত বড় পরিকল্পনায় আমার
াবরেটরির জন্যে মাত্র কটা টাকা ওরা মঞ্জুর করলে
থলে তো! অথচ আমি—(থামলেন)

ডাক্তার ঘোষ। আপনাকে না হলে ওদের চলবে না।
র পরের পরিকল্পনায় আরও বেশী টাকা আপনি পাবেন—
াবেন না। আপনার মত এত বড় বৈজ্ঞানিক
পশ্যালিস্টকে হাতছাড়া করবে না ওরা। আপনাদের
ত বিশেষজ্ঞদের ওরা ভয় করে ডক্টর সান্যাল—মনে মনে
রা ভয় করে।

ডক্টর সান্যাল। ভয় করবে কেন? ক্ষমতা তো সব
টনলালজীদেরই হাতে! ট্যাক্স বসালেও মুনাফা শিকার
রবে ওরা, পরিকল্পনার মুনাফাও শিকার করবে ওরা।
াকা লুটে লাল হবে তো ওই লুটনলালজীরাই ডাক্তার
ঘাষ!

ডাক্তার ঘোষ। ট্যাক্স বসালে লুটনলালজীরা টাকা
টবে কী করে?

ডক্টর সান্যাল। দেখো নি, ট্যাক্স বসালেই বাজার
থকে মাল উধাও! আসলে রাতারাতি সব মাল
দামবন্দী করে ওই লুটনলালজীরাই। তারপর ট্যাক্স
বসালে বিনা ট্যাক্সের মজুদ মালের দাম বাড়িয়ে টাকা
লুটবে।

ডাক্তার ঘোষ। আর পরিকল্পনার?

ডক্টর সান্যাল। সরকারী পরিকল্পনার কনট্রাক্ট করেও
টাকা লুটবে। মহাসভাকে দু লাখ টাকা চাঁদা দিলে,
এদিকে সভাপতিকে ধরে জলের কলের কনট্রাক্টে কত
টাকা মারলে দেখলে না? কোটি কোটি টাকার মালিক—
দেশটাও ওদের মুঠোর ভেতর। বুদ্ধির জোরে ওদের সঙ্গে
আর কাঁহাতক পাল্লা দেব বলো। (একটু থেমে) আচ্ছা—
(ইতস্তত:)

ডাক্তার ঘোষ। বলুন।

ডক্টর সান্যাল। আচ্ছা, এখানে তুমি কত টাকা
মাইনে পাও বলো তো?

ডাক্তার ঘোষ। হঠাৎ এ কথা কেন?

ডক্টর সান্যাল। পরিচয় হওয়ার পর থেকে তোমার
কথা আমি ভেবেছি। তোমার ভাল হোক আমি চাই,
ডাক্তার ঘোষ।

ডাক্তার ঘোষ। আপনি আমাকে স্নেহ করেন, এ
আমি জানি ডক্টর সান্যাল।

ডক্টর সান্যাল। বলছিলাম কি, ডাক্তারী পাস করে
তুমি সরকারী চাকরিতে ঢুকেছ। পড়ে আছ এই ব্লাড
ব্যাঙ্কে, কিন্তু আখেরে কী পাবে তুমি? কত টাকা মাইনে
দিতে পারবে এরা? তা ছাড়া এখানে থেকে উন্নতি
করবার কী সুযোগই বা তুমি পাবে ডাক্তার?

ডাক্তার ঘোষ। কী আপনি বলতে চান ঠিক বুঝতে
পারলাম না ডক্টর সান্যাল! এ ছাড়া কী করতে পারি
বলুন?

ডক্টর সান্যাল। বলছিলাম কি, তোমাকে আমার
ল্যাবরেটরিতে নিলে কেমন হয়? মাইনে অনেক বেশী
দিতাম—ইচ্ছামত কাজ করতে পারতে। উন্নতির সব পথ
খোলা—ভেবে দেখো।

ডাক্তার ঘোষ। সরকারী চাকরির মায়া চট্ করে
ছাড়া যায় না ডক্টর সান্যাল। আপনার প্রস্তাব আমি ভেবে
দেখব।

ডক্টর সান্যাল। তাই ভেবে দেখো। জোর আমি
করছি না, তোমার ভালর জন্যেই বলছি। তোমার মত

একজন বুদ্ধিমান কর্মঠ লোকের আমার দরকার। উন্নতি করবে। আচ্ছা, হবে এখন। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি—

ডাক্তার ঘোষ। বেশ তো, জিজ্ঞাসা করুন। (আবার চেয়ারে বসে পড়লেন)

ডক্টর সান্যাল। জিনিসটা ডেলিকেট—কিছু মনে করো না।

ডাক্তার ঘোষ। কিছু মনে করব না। আপনি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

ডক্টর সান্যাল। ঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। শুনলাম শেষ মুহূর্তে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ নাকি ভেঙে গেছে! এদিকে শুনতে পাই তোমাদের আগে থেকেই জানাশোনা ছিল—

ডাক্তার ঘোষ। ঠিকই শুনেছেন ডক্টর সান্যাল।

ডক্টর সান্যাল। বিয়ের দিন ঠিক, চিঠি দেওয়াও হয়ে গেছে। এ নিয়ে নানা গুজব শুনছি—

ডাক্তার ঘোষ। গুজব মিথ্যে, আর ইলা বলছে বিয়েও মিথ্যে। কাজেই—(থামলেন)

ডক্টর সান্যাল। কাজেই তুমি মেনে নিলে!

ডাক্তার ঘোষ। মেনে না নিয়ে উপায় কী? ভাব-ভালবাসা যতই থাক্, একজন যদি বিয়ে মিথ্যে মনে করে তাকে বিয়ে করা চলে না ডক্টর সান্যাল!

ডক্টর সান্যাল। বিয়ে মিথ্যে মনে করে মানে? (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'সুখী পরিবারে'র ঝুলনো ছবি দেখিয়ে) আমরা এসব সুখী সংসারের ছবি আঁকছি—এমন করলে পঞ্চবার্ষিকীর পরিবার-পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে ডাক্তার ঘোষ! সমাজ টিকবে না—

ডাক্তার ঘোষ। হয়তো টিকবে না। ইলা বলছে আরও বড় সমাজ গড়ে উঠবে।

ডক্টর সান্যাল। বেশ তো, বড় সমাজ গড়ে উঠুক। তা বলে বিয়ে থাকবে না? এ কেমন কথা?

ডাক্তার ঘোষ। ইলা তো তাই বলে বেড়াচ্ছে। বলছে বিয়ে নাকি এক ধাপ্পা, মিথ্যে সংস্কার। মেয়েদেরই নাকি এতে অসুবিধে বেশী। তাই মেয়েদের এতে আপত্তি জানানো উচিত। মেয়েরাও তার কথা শুনছে, তার চারধারে জড়ো হচ্ছে দেখলাম।

ডক্টর সান্যাল। ব্যাপার কী! হঠাৎ মেয়েরা খেপে উঠল কেন?

ডাক্তার ঘোষ। কি জানি! ইলা বলছে বিয়ে নাকি পুরুষের কারসাজি! সত্য বলে মানুষ এ ব্যবস্থা গড়ে নি সুবিধে বলে পুরুষেরা এর পত্তন করেছে।

ডক্টর সান্যাল। সুবিধে কি সত্য নয়?

ডাক্তার ঘোষ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল, না সুবিধেটা সত্য নয়। চুরি করা চোরের সুবিধে হতে পারে কিন্তু সত্য বলে সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

ডক্টর সান্যাল। কিন্তু এ যে সরাসরি পরিকল্পনার বিরোধিতা—সিডিসন! মতলবখানা কি?

ডাক্তার ঘোষ। মতলব আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় এ একটা রাজনৈতিক চাল ডক্টর সান্যাল। ইলা আগামী ইলেকসনে দাঁড়াবার মতলব ভাঁজছে। আপনার কি মনে হয়?

ডক্টর সান্যাল। ওঃ, তাই বলো! এতক্ষণে ব্যাপারখানা বুঝলাম। সামনের ইলেকসনে দাঁড়াবার মতলব কিন্তু—বিয়েটা! (চোখে সন্দেহ, মাথা দোলাতে লাগলেন)

ডাক্তার ঘোষ। আপাততঃ মুলতবী রইল।

ডক্টর সান্যাল। দাঁড়াও, ভাবতে দাও। জল কোথায় গড়াচ্ছে—মানে গড়াবে, আগে বুঝে নিই। বিয়ে মিথ্যে আর ধাপ্পা—এ কথাগুলো তো মেয়েদের কথা নয় ডাক্তার ঘোষ! (মাথা নেড়ে নাকে শব্দ করলেন) উঁ-হুঁ— শুধু ইলেকসনই নয়, এ ছাড়াও আছে। রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক চাল বলে মনে হচ্ছে ডাক্তার ঘোষ। নৈতিক আর অর্থনৈতিক বলেই মনে হচ্ছে—

ডাক্তার ঘোষ। মানে! কী বলতে চান?

ডক্টর সান্যাল। মানে? মানে বলতে চাই তোমার ওই ইলা মিত্তিরের পেছনে পাকা মাথা—মানে ঝানু লোক রয়েছে। এগুলো ওর নিজের কথা নয়। মেয়েরা কিছুতে বিয়ে ধাপ্পা আর মিথ্যে বলতে পারে না। অন্যের কথা ডিটো মারছে তোমার ওই ইলা মিত্তির, শেখানো বুলি কপচাচ্ছে। খুব চালাক লোক পেছনে রয়েছে। ব্যবসায়ী—(ভুরু কুঁচকে) লুটনলালজী নয় তো? (জিজ্ঞাসু চোখে ডাক্তার ঘোষের দিকে তাকালেন)

ডাক্তার ঘোষ। ব্যবসায়ী! ইলার পেছনে ব্যবসায়ী
ছ! আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না ডক্টর
ল। কী বলছেন আপনি এসব?

ডক্টর সান্যাল। (অবহেলায়) কিছু নয়, যেতে দাও।

ডাক্তার ঘোষ। (সন্দিগ্ধ) লুটনলালজীর ওপর
নার রাগ আছে, না?

ডক্টর সান্যাল। একা একা লুটছে, থাকবে না?
ার যদি তাকে আমি সুবিধেয় পাই! বাগে পেলে—

ডাক্তার ঘোষ। (প্রসন্ন হাসি হেসে) একদিন ঠিক
। যাবেন। একটু বসুন। (লাইন করে দাঁড়ানো
দের দেখিয়ে) এদের বিদেয় করে এক্ষুণি আসছি।

ডক্টর সান্যাল। (উঠে দাঁড়িয়ে) বেশ। আমিও
ারকে একটা ফোন করব ভাবছি।

ডাক্তার ঘোষ। (যেতে যেতে ফিরে) ফোন ভেতরে,
নই—

[ডক্টর সান্যাল ভিতরে চলে গেলেন]

ক্তার ঘোষ লাইনে দাঁড়ানো লোকদের দিকে এগিয়ে
র প্রথম লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।]

ডাক্তার ঘোষ। (প্রথম লোকটিকে) রক্ত জমা
, না?

প্রথম লোকটি। (সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে) হ্যাঁ
ারবাবু, দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন। এক্ষুণি কাজে
তে হবে।

ডাক্তার ঘোষ। এস, ভেতরে এস।

ক্তার ঘোষ লোকটিকে নিয়ে পর্দা-ঘেরা কুঠরিতে
লন। তৃতীয় ব্যক্তি লাইন ভেঙে দ্বিতীয় ব্যক্তির
সামনে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।]

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (চোখ রাঙিয়ে) এই, কী হচ্ছে
!

তৃতীয় ব্যক্তি। আমার তাড়াতাড়ি আছে ভাই,
ণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (দাঁতমুখ খিঁচিয়ে) এক্ষুণি হয়ে
, তাড়াতাড়ি আছে! আর আমারই যেন তাড়াতাড়ি
। (রুখে) লাইন ভাঙলে ভাল হবে না বলছি—

তৃতীয় ব্যক্তি। এই তো চেহারা—পাটকাঠি! কী
ব তুমি শুনি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (হাত ও মুখের ভঙ্গিতে ভয় দেখিয়ে)
এগিয়ে দেখই না কী করি। পা ভেঙে দেব না?

তৃতীয় ব্যক্তি। (কণ্ঠে বিরক্তি) যাক গে। আর
কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে শালারা!

[প্রথম লোকটি রক্ত জমা দিয়ে বেরিয়ে এল, হাতে বরাদ্দ
ফল ও টাকা। লোকটি করকরে দশ টাকার নোট ট্যাঁকে
গুঁজতে গুঁজতে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ঘোষ বেরিয়ে
এসে দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে দাঁড়ালেন। লোকটির হাতে
রেশনের ব্যাগ, রোগজীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট চেহারা।]

ডাক্তার ঘোষ। (দ্বিতীয় লোকটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে
তাকিয়ে) তুমিও রক্ত জমা দিতে এসেছ বুঝি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (ঢোক গিলে) হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ঘোষ। জমা যে দেবে, শরীরে রক্ত কোথায়?
এই তো চেহারা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। জমা দেবার মত ঢের রক্ত এখনও
আছে ডাক্তারবাবু। তিন মাস আগে চেহারা এমন ছিল
না—গায়ে রক্ত ছিল। তিন মাস কাজ নেই—বেকার, তবু
রক্ত আছে।

ডাক্তার ঘোষ। রক্ত দিলে মারা যাবে যে হে!
না না, হবে না—

দ্বিতীয় ব্যক্তি। রক্ত না দিলেও মরব।

ডাক্তার ঘোষ। ভাল আপদ যা হোক। মরবে
মরবে—তাই বলে রক্ত নিয়ে আমি তো আর মেরে ফেলতে
পারি নে। বলছি, রক্ত দিলে মারা পড়বে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তা হোক। রক্ত না দিলে আমার
চলবে না।

ডাক্তার ঘোষ। তা হোক! চলবে না মানে? মারা
যেতে তোমার আপত্তি না থাকলেও আমার আপত্তি
আছে। সরে যাও—

দ্বিতীয় ব্যক্তি। উপায় নেই। রক্ত আমাকে জমা
দিতেই হবে ডাক্তারবাবু। উপায় থাকলে কি আর রক্ত
জমা দিতে আসতাম!

ডাক্তার ঘোষ। উপায় নেই মানে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (হাতের রেশন ব্যাগ দেখিয়ে) রেশন্
নেব। রক্ত জমা না দিলে না খেয়ে মরব, বউ ছেলেমেয়ে
সব মরবে। রক্ত জমার টাকায় রেশন নেব, তবে হাঁড়ি

চড়বে। এ ছাড়া টাকা পাবার আর কোন পথ নেই ডাক্তারবাবু। কোন উপায় নেই!

ডাক্তার ঘোষ। না থাক্ উপায়। সর, দেখি— (তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকালেন)

[পেছনের (তৃতীয়) ব্যক্তি দ্বিতীয় লোকটির পিঠে চিমটি কাটতে সে ফিরে তাকাল। বাঁ হাতের উপর ডান হাত উপুড় করে পেছনের লোকটি ইঙ্গিত করে দেখাল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ফিরে তাকাল আবার ডাক্তারের দিকে।]

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (অনুনয়ের স্বরে) পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমার রক্ত নিন। রক্ত জমা দিয়ে রেশন নেব। আজ তিন দিন বউ-ছেলে-মেয়ে উপোস করছে, ছেলেমেয়ে খিদেয় কাতরাচ্ছে। চোখে আর দেখতে পারি নে—

ডাক্তার ঘোষ। (কঠিন কণ্ঠে) হবে না—হবে না। সরে যাও। (তৃতীয় ব্যক্তিকে) দেখি, তুমি এগিয়ে এসো তো হে।

তৃতীয় ব্যক্তি। (দ্বিতীয় ব্যক্তির পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্বগত ভাবে) বোকা উজবুগ আহাম্মক! দরকার হলে জোঁককে রক্ত খাওয়াতে হয়!

[হতাশ মুখে দ্বিতীয় ব্যক্তি বেরিয়ে গেল। ঠিক সে সময় একটি সাধারণ শ্রেণীর প্রৌঢ়বয়স্ক লোক ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার ঘোষের সামনে দাঁড়াল। ডাক্তার ঘোষ না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোলেন।]

প্রৌঢ় লোকটি। (ব্যস্তভাবে) রক্ত—আমার রক্ত চাই!

ডাক্তার ঘোষ। (তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে কুঠরির দিকে যেতে যেতে না তাকিয়ে) রক্ত চাই? কে তুমি?

প্রৌঢ় লোকটি। আমি নারায়ণ ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ঘোষ। (তাকিয়ে দেখে) ও, তুমি! তাই বলো!

নারায়ণ। ছেলের পেটের ভেতর ঘা, এক্ষুণি তা কাটতে হবে। রক্ত না দিলে বাঁচবে না।

ডাক্তার ঘোষ। তুমি রক্ত দিলে না কেন?

নারায়ণ। দিতে চেয়েছিলাম, তাতে চলবে না। একমাত্র ছেলে আমার হাসপাতালে মারা যাচ্ছে ডাক্তার-বাবু। রক্ত দিন।

[নারায়ণ ডাক্তার ঘোষের হাতে হাসপাতাল থেকে নি আনা এক টুকরো কাগজ দিল। ডাক্তার ঘোষ দেখে ফিরিয়ে দিলেন।]

ডাক্তার ঘোষ। রক্ত চাই বললেই রক্ত মেলে ন মজুদ রক্ত নেই।

নারায়ণ। রক্ত না হলে ছেলে বাঁচবে না ডাক্তারবা আমার জমা দেওয়া রক্ত আছে।

ডাক্তার ঘোষ। আছে আছে! মজুদ রক্ত য থাকবে তখন পাবে, এখন মজুদ রক্ত নেই। (এ ভেবে) আচ্ছা, টাকা পঞ্চাশেক এক্ষুণি দিতে পার?

নারায়ণ। টাকা! টাকা কোথায় পাব?

ডাক্তার ঘোষ। (ধীরে) যাও, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-এম. এ. মুরুব্বী ধর। লিখিয়ে নিয়ে এস—চেষ্টা করে দেখ (জোর গলায়) রক্ত নেই—যাও। (ধীরে, বিরক্তি সকলেরই রক্ত চাই, না থাকলে দিই কোথেকে ব আচ্ছা, দাঁড়াও—

[বাইরে গাড়ি থামবার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে তিলক-কাটা পাগড়িবাগানো এক মারোয়াড়ী ভদ্রলে এসে ঢুকলেন।]

ডাক্তার ঘোষ। আরে, লুটনলালজী যে! করতে করতেই এসে হাজির! রাম রাম লালজী। আইয়ে

লুটনলাল। (পরিষ্কার বাংলায়) নমস্কার বাবুজী

ডাক্তার ঘোষ। (ব্যস্তসমস্ত) আইয়ে আইয়ে লাল বৈঠিয়ে।

লুটনলাল। খুব জরুর আছে বাবুজী, বসবার নেই।

ডাক্তার ঘোষ। সময়কা কেয়া বাত শেঠজী, কি জরুর—বৈঠিয়ে না।

লুটনলাল। না ডাগ্‌তার বাবুজী, জরুরী ব এসেছি। এখন বসবার সময় নেই—আরজি আছে।

ডাক্তার ঘোষ। আপকে মর্জি, বাতলাইয়ে, সব যায়গা।

লুটনলাল। বাড়িতে সিরিয়াস অপারেশন, ডাগ্‌তা বসিয়ে রেখে এসেছি। আমার শালীর মেয়ে—রক্ত তাড়াতাড়ি করুন বাবুজী।

[লুটনলাল ডাক্তার ঘোষের হাতে চিরকুটে

।ক্রিপশন দিলেন। চিরকুট পড়ে ডাক্তার ঘোষের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।]

ডাক্তার ঘোষ। আপকে ওয়াস্তে সবকুছ হ্যায় শেঠজী! ; রক্ত! মজুদ রক্ত তো নেই।

লুটনলাল। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত নেই! এ কী কথা ।তার বাবুজী! ঠিক বলছেন, না, আমাকে ঠকাচ্ছেন? তো রক্ত জমা দিয়ে গেল—

ডাক্তার ঘোষ। (দাঁড়ানো লোক দুটিকে দেখিয়ে) র গায়ে রক্ত আছে নাকি যে রক্ত জমা দেবে! তাকিয়ে ন। উলটো এদেরই রক্ত দরকার।

লুটনলাল। এরাই দেবে। রক্তের চেয়ে এদের টাকার দার বেশী ডাগ্‌তার বাবুজী।

ডাক্তার ঘোষ। আপনার কথাই ঠিক। টাকার জন্যে পনাদের রক্ত দিতে দিতে রক্ত এদের ফুরিয়ে এসেছে ঠজী! ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা কোত্থেকে দেবে বলুন? ব্যাঙ্কে দ রক্ত নেই, দিতে পারব না। আপনি অন্য উপায় খুন. বুঝলেন?

লুটনলাল। (চোখে সন্দেহ) সব ঠিক আছে বাবুজী— ববেন না। কত টাকা চাই বলুন?

ডাক্তার ঘোষ। (মুখভাবে চাপা ক্রোধ) টাকা! টাকা কলেই সব পাওয়া যায় না শেঠজী! মাফ কিজিয়ে।

লুটনলাল। (অবহেলায় মাথা নেড়ে) টাকায় সবই লে বাবুজী! কত টাকায় মেলে সেটাই আসল কথা।

ডাক্তার ঘোষ। (ক্রোধ ঠিক চাপতে না পেরে) াপনি আসুন। (ফিরে চলে যেতে উদ্যত হয়ে আবার র লুটনলালের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। চেয়ে দেখলেন দূরে দাঁড়ানো নারায়ণের দিকে। হাত বাড়িয়ে তার াত থেকে হাসপাতালের কাগজখানা নিয়ে তাকিয়ে খেলেন। তারপর লুটনলালকে বললেন) বেশ, কত াকা দিচ্ছেন বলুন?

লুটনলাল। (মুখে শয়তানী হাসি) কত চাই?

ডাক্তার ঘোষ। আচ্ছা, বের করুন টাকা পঞ্চাশেক। খি কী করতে পারি।

লুটনলাল। (টাকা বের করে) এই নিন।

নারায়ণ দ্রুত এসে ডাক্তার ঘোষ ও লুটনলালের মাঝখানে দাঁড়াল।]

নারায়ণ। (লুটনলালকে ভয় দেখিয়ে) খবরদার! টাকা দিয়ে তুমি রক্ত নিয়ে যাবে—সে হবে না। খুন করব।

ডাক্তার ঘোষ। নারায়ণ!

লুটনলাল। (ভয় পেয়ে পিছু হঠে) ক্যা হুয়া! তুম কোন্ হ্যায়? একদম পাগলা হ্যায়!

নারায়ণ। (চিবিয়ে চিবিয়ে) পাগলা হ্যায়! আমার ছেলে মরছে—রক্ত নেই! আর শালীর মেয়ের জন্যে তুমি রক্ত নিয়ে যাবে! (ভয় দেখিয়ে) রক্ত নিয়ে যেতে দেব না, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব—

[লুটনলাল ভীতমুখে ডাক্তারের দিকে তাকাল।]

ডাক্তার ঘোষ। (জোরে নারায়ণকে ধমক দিয়ে) কী হচ্ছে এ সব? তোমার ছেলের জন্যে রক্ত চাই? ('চাই'য়ের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে হাত ও মুখের ভঙ্গি করে)

নারায়ণ। (ঠিক বুঝতে না পেরে) চাই ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার ঘোষ। (শুনতে পান নি এমন ভাবে— আগের কথা 'রক্ত চাই'য়ের সঙ্গে জুড়ে। ধমক ও কথায় অতিরিক্ত জোর) রক্ত দেবে?

নারায়ণ। দেব।

ডাক্তার ঘোষ। চলো। (লুটনলালকে) থোড়া ঠরণে হোগা শেঠজী—বৈঠিয়ে।

[ডাক্তার ঘোষ নারায়ণকে নিয়ে পর্দা-ঘেরা কুঠরীতে গিয়ে ঢুকলেন। লুটনলালজী একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। দাঁড়ানো লোক দুটির আলাপ শোনা যেতে লাগল।]

সামনের ব্যক্তি। শালারা টাকার জোরে ধরাকে সরা দেখছে! ডাক্তারের জন্যে খুব বেঁচে গেল। নইলে মার লাগাত ওই নারায়ণ।

পেছনের ব্যক্তি। বেশ হত তা হলে। খুব মজা হত!

সামনের ব্যক্তি। মানে?

পেছনের ব্যক্তি। মানে, নারায়ণকে সাহায্য করতাম। (হাতের ভঙ্গি করে) হাত নিশপিশ করছিল আমার। গুম গুম ঘা কয়েক বসিয়ে দিতাম পিঠে—হাতের সুখ হত!

সামনের ব্যক্তি। (কথায় বিরক্তি) ভুত্তোর! আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে!

[নারায়ণ বেরিয়ে এল। হাতে ফল টাকা। একটু পরে ডাক্তার ঘোষ বেরিয়ে এসে নারায়ণকে রক্ত দিতে নারায়ণ উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার ঘোষ ভিতরে চলে গেলেন। ঠিক সে সময় একটি লোক দৌড়ে ছুটে এসে নারায়ণকে বলল।]

আগন্তুক। এখানে কি করছিস তুই? ছেলে এদিকে কি রকম হাঁসফাঁস করছে। শীগগির—শীগগির চল্!

[লোকটি হাত ধরে টানতে টানতে নারায়ণকে নিয়ে গেল।]

নারায়ণ। (যেতে যেতে ফিরে) টাকার জোরে আমার রক্ত নিয়ে গেল! এর শোধ তুলব আমি। শোধ আমি নেবোই নেব। এই বলে গেলাম।

[নারায়ণ বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ঘোষ বেরিয়ে এসে লুটনলালকে বললেন।]

ডাক্তার ঘোষ। শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই ঠিক হল শেঠজী। টাকার জোরে রক্ত পেয়ে গেলেন।

লুটনলাল। (উঠে দাঁড়িয়ে) রামরাম বাবুজী। (বেরিয়ে গেলেন)

[ডক্টর সান্যাল ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বসলেন।]

ডাক্তার ঘোষ। (লাইনে দাঁড়ানো লোক দুটিকে) আজ আর হবে না, কাল এস তোমরা।

[হতাশ মুখে লোক দুটি বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ঘোষ আবার গিয়ে ডক্টর সান্যালের সামনে চেয়ারে বসলেন।]

ডাক্তার ঘোষ। তা হলে রাজধানীতে কবে যাচ্ছেন?

ডক্টর সান্যাল। কালই যেতে হবে—না গিয়ে উপায় নেই। আরও পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচজন আসবে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে।

ডাক্তার ঘোষ। কিন্তু কী নিয়ে পরামর্শ করবেন? আর কী ঠিক হবে?

ডক্টর সান্যাল। সে কি আর ছাই আমিই জানি! তবে যাচ্ছি যখন, তখন পরামর্শও করব, একটা কিছু ঠিকও করব।

[একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ডাক্তার ঘোষ ও ডক্টর সান্যাল পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। মেয়েটি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশ, হাতে মস্ত বড় ফাইলে কাগজপত্র, কোমরে শাড়ির আঁচল জড়ানো—কেমন মারমুখী চেহারা।]

কোমরে আঁচল বাঁধা মেয়ে। (ডাক্তার ঘোষ ও ডক্টর সান্যালকে নমস্কার করে) ডাক্তার ঘোষ?

ডাক্তার ঘোষ। হ্যাঁ, আমি। আপনি? (জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন)

কোমরে আঁচল বাঁধা মেয়ে। আমি? নারী-প্রগতি সঙ্ঘের সম্পাদিকা। আমার নাম গীতা ঘোষাল।

ডাক্তার ঘোষ। (চেয়ার দেখিয়ে) বসুন। দাঁড়ান, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। (ডক্টর সান্যালকে দেখিয়ে) ইনি হচ্ছেন ডক্টর সান্যাল—বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক।

[দুজন দুজনকে নমস্কার করলেন।]

গীতা। (চেয়ারে বসতে বসতে ডক্টর সান্যালকে) কি সৌভাগ্য, হঠাৎ আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল! আপনার মত স্বনামধন্য পুরুষ—(ফাইল সামনের টেবিলের উপর রাখলেন)

ডক্টর সান্যাল। আমিও আপনার গুণপনার খবর রাখি গীতা দেবী। পরিচয় হয়ে ভালই হল।

গীতা। কাগজে দেখলাম কমিশনে রাজধানী যাচ্ছেন।

ডক্টর সান্যাল। (অবহেলায়) হ্যাঁ, যেতে হবে বইকি! এ সব পরিকল্পনা-টল্পনা তো আসলে আমাদেরই—মানে বিশেষজ্ঞদেরই কাজ। ওরা এসবের কী বোঝে বলুন। এ তো আর ট্যাক্স বসিয়ে দেশ শাসন নয়!

গীতা। যা বলেছেন! এটা তো আপনাদেরই যুগ ডক্টর সান্যাল! আসলে দেশ শাসন আপনারা বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকরাই তো করছেন!

ডাক্তার ঘোষ। ঠিক হল না গীতা দেবী, দেশ শাসনে আপনাদেরও হাত রয়েছে।

গীতা। (ঠিক বুঝতে না পেরে) মেয়েদের?

ডাক্তার ঘোষ। বিদেশের মনীষীরা তাই বলেন।

ডক্টর সান্যাল। এ দেশ বিদেশ নয় ডাক্তার ঘোষ!

ডাক্তার ঘোষ। (কথায় বিদ্রূপ) আজ আর ঠিক চেনা যাচ্ছে না ডক্টর সান্যাল! যাক গে, (গীতাকে) তারপর খবর কি বলুন গীতা দেবী?

গীতা। খবরটবর সুবিধের নয়—সে আমি বলছি না

ডাক্তার ঘোষ। সুবিধের নয় মানে?

গীতা। মেয়ে জাতটা ভারি অকৃতজ্ঞ ডাক্তার ঘোষ, ানক নেমকহারাম—

ডাক্তার ঘোষ। আপনার মুখে এ কী কথা! নারী-াতি সঙ্ঘের সম্পাদিকা—মেয়ে-সমাজ আপনাকেই তো দের মুখপাত্র ভাবে।

গীতা। মুখপাত্র ভাবে না ছাই ভাবে। ভাবতে ওদের । গেছে। নারী-প্রগতির জন্যে দিনের পর দিন ছি, তাদের জন্যে এত করলাম। নইলে কোথায় থাকত া! মরা হাজা স্বামীদের নিয়ে ঘর করতে হত! আর মাকে বলে কিনা রাইটিস্ট! প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী!

ডক্টর সান্যাল। (সান্ত্বনার সুরে) বলুক। আপনি বেন না গীতাদেবী। নারী-প্রগতির ইতিহাসের াড়ায় আপনার নাম লেখা হবে।

গীতা। এ সব বলা যায় না ডক্টর সান্যাল। জাতীয় তহাস-কমিশনের ব্যাপারটা দেখলেন তো! ডক্টর ুমদার কমিশন ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হলেন। নেতার ার নেতাজীদের নাম চাপা দেবার জন্যে কমিশন ভেঙে ল। এক্ষুণি আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী বলতে ারম্ভ করেছে—(ডাক্তার ঘোষকে) থাক্ এসব, খন যে জন্যে এসেছি শুনুন—

ডাক্তার ঘোষ। বলুন।

গীতা। কেসটা ঘোরালো। তাই আমাকে আসতে ল। মরবার ফুরসত নেই, এক্ষুণি ফিরতে হবে। লা মিত্রের কেস নিয়ে আমি এসেছি। আপনি নাকি াকে বিয়ে করবেন না ঠিক করেছেন?

ডাক্তার ঘোষ। (বিস্মিত) ইলা কি নারী-প্রগতি ঙ্ঘে নালিশ করেছে নাকি?

গীতা। সরাসরি না করলেও কেসটা আমার হাতে সেছে। তদ্বির এর করতেই হবে।

ডাক্তার ঘোষ। কিন্তু কী করে এতদূর গড়াল—ানে এ কেস আপনার হাতে গেল! সে কথাই যে ভেবে াচ্ছি নে।

গীতা। (মৃদু হেসে অবহেলায়) আসতে বাধ্য ডাক্তার াষ, আসতে বাধ্য। শহরের সব মেয়ের ইতিহাস ামাদের নখদর্পণে, সব মেয়ের রেকর্ড আমাদের ফাইলে তোলা রয়েছে। নারী-প্রগতি সঙ্ঘ একটা যাচ্ছেতাই প্রতিষ্ঠান নয়, মেয়েদের অভাব-অভিযোগ এখানে আসবেই। আর কেসটা এসেছে যখন তখন ব্যবস্থাও এর একটা আমাকেই করতে হবে। (ফাইল টেনে) দাঁড়ান, ফাইল থেকে কেসটা বের করি। চোখের সামনে রেকর্ড রাখতে হবে—আপনাদের মুখের কথায় বিশ্বাস নেই।

ডাক্তার ঘোষ। ঢের হয়েছে, বের আর করতে হবে না। বিয়ে আমি করব না।

গীতা। সেটাই তো কথা! বিয়ে করবেন না বলেই তো কেস!

ডাক্তার ঘোষ। ধরুন, ইলাও যদি অমত করে? বিয়ে করতে রাজী না হয়?

গীতা। রাজী না হওয়াই তো স্বাভাবিক। তাতে কেসের কী হল? বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল, মায় নেমন্তন্ন চিঠি পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এ তো আর মিথ্যে নয়? দাঁড়ান, বের করে দেখাচ্ছি। সব আমার ফাইলে আছে। (ফাইল টানলেন)

ডাক্তার ঘোষ। বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল সে তো আর আমি অস্বীকার করছি না। এখন ভেঙে গেছে।

গীতা। বিনা কারণে এমনি ভেঙে গেলেই হল? এর কৈফিয়ত দিতে হবে না? মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার দিন শেষ হয়ে গেছে ডাক্তার ঘোষ। দিন বদলে গেছে।

ডাক্তার ঘোষ। (বিরক্তি ভরে) বিয়ে করব না বলছি, জোর করে বিয়ে দেবেন না কি?

গীতা। এতদিন আপনারা মেয়েদের উপর জোরজুলুম চালাতে কসুর করেন নি, আজ মেয়েরা জোর চালালেই চিৎকার করবেন?

ডাক্তার ঘোষ। আপনার মতলবখানা কী খুলে বলুন। জোর করে বিয়ে দেবেন?

গীতা। বিয়ে দেব কেন; জোর করে ক্ষতিপূরণ আদায় করব। আপনি চাকরি করছেন, রোজগার করছেন। ইলা যতদিন পর্যন্ত রোজগার না করবে কিংবা বিয়ে না করবে ততদিন আপনাকে তার খরচ দিতে হবে। আইনতঃ সেটা দিতে আপনি বাধ্য।

ডাক্তার ঘোষ। আইনতঃ বাধ্য মানে?

গীতা। কেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পড়েন নি?

ডাক্তার ঘোষ। মজা মন্দ নয়, বিয়ের আগেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন!

গীতা। বিয়ের আগে বলে কী বলতে চান আপনি? কী বোঝাতে চান? বিয়েতে আর বাগ্‌দত্তাতে হিন্দু আইনে তফাত কোথায়?

ডাক্তার ঘোষ। বাগ্‌দত্তা!

গীতা। কেন, আঁতকে ওঠবার কী হল? মেয়েদের যুগ যুগ বাগ্‌দত্তা করে শাস্ত্র দিয়ে শাসন করতে পারলেন, মেয়েরা তাতে কোনদিন টুঁ শব্দটি তো করে নি। আজ আইনের জোরে মেয়েরা শাস্ত্রের সুবিধে যদি পায়, তাতে আঁতকে উঠলে চলবে কেন?

ডাক্তার ঘোষ। বাগ্‌দত্তা বলতে কী বোঝেন আপনারা?

গীতা। বোঝাবুঝির কী আছে এতে। মেয়ের তরফ থেকেই হোক আর ছেলের তরফ থেকেই হোক পাকাপাকি কথা হয়ে গেলেই মেয়ে বাগ্‌দত্তা হল। আজকাল ছেলেমেয়েরা নিজেরাই কর্তা যখন, তখন এ ছাড়া এর আর কী অর্থ হতে পারে বলুন?

ডাক্তার ঘোষ। তা হলে তো মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করাই বিপদ দেখছি।

গীতা। বিপদের ঝুঁকি কিছুটা আছে বইকি। শুধু মেয়েদের তরফ থেকেই ঝুঁকি থাকবার দিন আজ শেষ হয়ে এসেছে ডাক্তার ঘোষ! ক্ষতিপূরণ আপনাকে দিতেই হবে। আপনার এ কেসটাতে তো নিমন্ত্রণ-পত্র পর্যন্ত রয়েছে—অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিমন্ত্রণ-পত্রের তারিখ থেকে ইলার সমস্ত খরচ আপনাকে চালাতেই হবে। অবশ্য যতদিন পর্যন্ত সে বিয়ে না করছে কিংবা রোজগার না করছে ততদিন মাত্র।

ডাক্তার ঘোষ। (চটে) যান যান। বিয়েও করব না, ক্ষতিপূরণও দেব না।

গীতা। বিয়ে না করুন, ক্ষতিপূরণ আপনাকে দিতেই হবে। ক্ষতিপূরণ দিতে আইনতঃ আপনি বাধ্য হবেন। (ডক্টর সান্যালকে) কি বলেন ডক্টর সান্যাল?

ডক্টর সান্যাল। ভাবছি, আপনি বিজ্ঞান পড়লে উন্নতি করতেন গীতাদেবী। আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি- মানে আপনার প্রতিভা আছে।

গীতা। বিজ্ঞান-টিজ্ঞান না পড়েই কি এত বড় কা[জে] হাত দিয়েছি ডক্টর সান্যাল? (ডাক্তার ঘোষকে) বুঝলে[ন] ডাক্তার ঘোষ, ইলার জায়গায় আপনি থাকলে—মানে ই[লা] চাকরি করলে আর আপনি বেকার থাকলে আপনি ছাড়তেন না। আইনটা তো আর এক পক্ষের জন্যে হ[য়] নি। এ আপনাকে দিতেই হবে।

ডাক্তার ঘোষ। আমি দেব না।

গীতা। আইনের জোরে দিতে আপনাকে বা[ধ্য] করব। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন মেয়েদের যেটুকু সুবি[ধে] দিয়েছে সেটুকু আদায় আমরা করবই। (উঠে দাঁড়িয়ে) সাত দিনের ভেতর আমার আফিসে গিয়ে এর একটা র[ফা] করবেন।

ডক্টর সান্যাল। সত্যি, আপনাদের কাজ দেখে আ[মি] খুব সন্তুষ্ট—মানে ইম্প্রেস্‌ড হয়েছি গীতাদেবী। আপনা[দের] প্রতিষ্ঠান যাতে সরকারী সাহায্য পায় সে জন্যে আ[মি] চেষ্টা করব।

গীতা। ধন্যবাদ ডক্টর সান্যাল। আমাদের দা[বি] সরকার কিছু কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, বাকীটা মেনে নিতে বাধ্য করব আমরা। আমাদের বাদ দি[য়ে] সরকার টিকতে পারে না ডক্টর সান্যাল।

ডক্টর সান্যাল। (চিন্তিত ভাবে) টিকতে পারে [না] মানে? আপনাদের ওপর লুটনলালজীদের চোখ পা[ড়ে] নি তো?

গীতা। পড়তেই হবে, চোখ পড়বেই। পুঁজিপতি মোটা টাকার চাঁদা দিয়ে হাত করবার চেষ্টা করবেই। এ[ত] বড় প্রতিষ্ঠান—টনক নড়বে না? সব আমাদের মুঠো[র] ভেতর। আমাদের দাবি মানতেই হবে। (ডাক্তা[র] ঘোষকে) মনে রাখবেন ডাক্তার ঘোষ, সাত দিনে[র] ভেতর—

ডাক্তার ঘোষ। আচ্ছা, ইলা যদি কেস না ক[রে] তার অমত জানায়—

গীতা। অতি স্বাভাবিক। ইলা কেন, কোন মে[য়ে] তার ভালবাসার লোকের বিরুদ্ধে কেস চালাতে চাই[বে] না—এ আমরা জানি। মেয়েদের দরদী দুর্বল মন-

াদের এই ভাল হওয়ার সুযোগ আপনারা চিরদিন ছেন। সে আমরা আর হতে দিচ্ছি না। ইলা চালাবে কেন? ইলা কে?

ডাক্তার ঘোষ। ইলা কেউ নয়?

গীতা। ইলা কেন, কোন মেয়েই কিছু নয়। কেস বে প্রতিষ্ঠান—মানে 'নারী প্রগতি সঙ্ঘ'। ক্ষতি-ণর টাকা আপনাকে মাস মাস সঙ্ঘে জমা দিয়ে চ হবে, ইলা পাবে সঙ্ঘের মারফত। ইলার দুর্বলতার াগ নিতে আপনাকে কে দিচ্ছে বলুন? এক্ষুণি এর া মিটমাট করে ফেলুন, নইলে ভাল হবে না। সাত র ভেতর কেস মিটমাট না করলে বিপদে পড়বেন বলে াম। শেষটায় পস্তাতে হবে। চাকরি নিয়েও টানাটানি ত পারে, বুঝলেন?

ডাক্তার ঘোষ। ভয় দেখাচ্ছেন?

গীতা। ভয় দেখাব কেন, আইন দেখাচ্ছি। মনে বেন, সাতদিন। নইলে আইনের হাত থেকে কেউ ানাকে বাঁচাতে পারবে না। (টেবিলের উপর থেকে ল টেনে নিয়ে ডক্টর সান্যালের দিকে তাকালেন)

ডক্টর সান্যাল। (উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে) চমৎকার াদেবী, চমৎকার! আপনার কথা শুনছিলাম আর মনে তারিফ করছিলাম।

গীতা। কী যে বলেন ডক্টর সান্যাল! এটুকু আমার র্ব্য বই তো নয়।

ডক্টর সান্যাল। এর জন্যে নয়, ভাবছিলাম আপনি ভাল আইন ব্যবসায়ী হতে পারতেন। চলুন, আমিও । আমার গাড়িতে আপনাকে বরং আপনার ফিসে পৌঁছে দেব। (ডাক্তার ঘোষকে) আচ্ছা, আজ সি ডাক্তার ঘোষ—

ডক্টর সান্যাল আর গীতা ঘোষাল যাবার জন্যে উদ্যত য়েছেন সে সময় বছর চব্বিশের একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকল।]

ডক্টর সান্যাল। এস, এস সুকুমার।

সুকুমার। (এগিয়ে গিয়ে) নমস্কার সার্।

ডক্টর সান্যাল। (গীতাকে) জানেন গীতাদেবী, ও ুমার রায়, আমার প্রিয় কৃতী ছাত্র। আমার াবরেটরিতে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, থাকলে উন্নতি াত। কিছুতেই থাকল না।

ডাক্তার ঘোষ। (গীতাকে) আমার দিকটাও আপনাকে একটু ভেবে দেখতে হবে গীতাদেবী। শুনলেই বুঝতে পারবেন সব। ভেতরে চলুন, কথা আছে।

গীতা। (ডাক্তার ঘোষকে বোঝাবার চেষ্টা করে) একটু অপেক্ষা করুন ডক্টর সান্যাল, এই এক্ষুণি আসছি।

[ডাক্তার ঘোষ গীতা ঘোষালকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।]

ডক্টর সান্যাল। তোমাকে আমি ফোনে ডেকেছিলাম সুকুমার—(থামলেন)

সুকুমার। বেরোচ্ছিলাম, আপনার ফোন পেয়েই এখানে চলে এসেছি। কেন বলুন?

ডক্টর সান্যাল। কমিশনে ডেকেছে, রাজধানীতে যাচ্ছি। পথে খবর পেলাম, রাজধানীতে এক মাস কাটিয়ে ফিরেছ। ভাবলাম খবর জেনে নিই, এই আর কি!

সুকুমার। কিসের খবর সার্?

ডক্টর সান্যাল। তোমার খবরই বল। সুবিধে কিছু হল? যোগাড় করতে পারলে কিছু—চাকরি-বাকরি?

সুকুমার। যোগাড় যে করব, তা চাকরি দেবে কে বলুন?

ডক্টর সান্যাল। কেন? আসলে চাকরি তুমি করতে চাও না—সে কথাই বল। নইলে তোমার মত ছেলে—

সুকুমার। আমার মত ছেলে দেশে ঢের আছে সার্। কী হবে তাদের দিয়ে, কে তোয়াক্কা রাখে তাদের? আমার মত ছেলের তো দরকার নেই!

ডক্টর সান্যাল। মানে? কী যে বল! তোমরাই হলে দেশের ভবিষ্যৎ—

সুকুমার। দেশের ভবিষ্যৎ না আর কিছু! ও সব কথা শুনতেই ভাল। গত এক মাসে ঢের শিখে ফেলেছি সার্—চাকরি আমি করবই না ঠিক করেছি।

ডক্টর সান্যাল। চাকরি করবে না মানে?

সুকুমার। করব না মানে—করব না। কার জন্যে করব বলুন? চাকরি করব আমি, আর ভুঁড়ি বাগাবে আর একজন? সে হচ্ছে না।

ডক্টর সান্যাল। মানে? কী বলতে চাও?

সুকুমার। মানে চাকরি করব তো ওই লুটনলালজী না হয় লুটনলালজীদের ভাই ঝুটনলালজীদের! তার চেয়ে চাকরি না করাই ভাল।

ডক্টর সান্যাল। যাক গে, যা ভাল বোঝ করো। আচ্ছা, আমাকে কমিশনে ডেকেছে। কিসের কমিশন কিছু জানতে পারলে?

সুকুমার। পারব না কেন? তিনটে কমিশন বসছে শুনলাম।

ডক্টর সান্যাল। তিনটে? বল কি! তা হলে তো—

সুকুমার। (শেষ করতে না দিয়ে ডক্টর সান্যালের মুখের কথা কেড়ে) আপাততঃ লাখ কয়েক টাকা খরচ হবে। পরে আপনাদের কাজের জন্যে আরও লাখ কয়েক কিংবা তারও বেশী!

ডক্টর সান্যাল। বড় কাজ বল? কি কি জানতে পারলে?

সুকুমার। পারব না কেন? বৃহৎ ব্যাপার!

ডক্টর সান্যাল। খুলে বল।

সুকুমার। প্রথম, পীরের আজানে বৃষ্টি হতে পারে কি না তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা! যখন খুশি জল, যখন খুশি ফসল! এক পীরের পেছনে হাজার দশেক টাকা খরচ হয়ে গেছে এরই ভেতর!

ডক্টর সান্যাল। আর দ্বিতীয়?

সুকুমার। কাশীর এক সন্ন্যাসী কী এক ফল না মূল আবিষ্কার করেছে। বলছে আগেকার দিনের মুনি-ঋষিরা খেতেন। একবার খেলে তিন মাস আর খেতে হয় না—স্বাস্থ্য শ্রী দিন দিন খুলতে থাকে। একটি ফলে এক পরিবারের এক বছর, আর এক একর ফলালে তিন দেশের সমস্যা সমাধান। এক কথায় খাদ্যসমস্যা আর থাকবে না, পরিবার-পরিকল্পনারও একটা সুরাহা হবে। সন্ন্যাসীকে ধরে আনা হয়েছে। তার জন্যে কত টাকা খরচ হয়েছে জানতে পারি নি। সে জন্যেও বৈজ্ঞানিকদের কমিশন বসছে শুনলাম।

ডক্টর সান্যাল। আর তৃতীয়?

সুকুমার। তৃতীয় হল মন্ত্র আর ম্যাজিক! যজ্ঞ-মহাযজ্ঞের আয়োজন চলছে দেখে এলাম। বুদ্ধির বহর দেখে আমি বেকুব বনে গেছি সার্। সব সমস্যা মন্ত্রে আর ম্যাজিকে মিটবে। চীনে ঘন ঘন কমিশন কেন পাঠানো হচ্ছে জানেন? মন্ত্র আর ম্যাজিক ওরা জানেই জানে! নইলে মাত্র দু বছর আগে স্বাধীন হয়ে চীন সব সমস্যা মেটাল কী করে বলুন? দেখেও শে[illegible] আজব দেশের আজব জীব সব! আবার ক[illegible] বসাচ্ছে!

ডক্টর সান্যাল। তুমি অনর্থক চটছ সুকুমার।

সুকুমার। (শেষ করতে না দিয়ে) অন[illegible] সরকারী হিসেবে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ খাদ্য বেড়ে[illegible] জনসংখ্যার হিসেবে কতগুণ তা ভেবে দেখুন। তবু লো[illegible] খাদ্য পাচ্ছে না কেন? সারাদিন রোদে আটার [illegible] লাইনে দাঁড়িয়ে খালি হাতে ফিরে আসে কেন? খাদ্য গেল কোথায়? বলতে পারেন তার জন্যে কালোবাজারীদের হাত থেকে খাদ্য টেনে বের কর[illegible] জন্যে কমিশন বসে না কেন? মজুদদার চোরাকারবারী[illegible] দালাল সব! কমিশন বসাচ্ছে পীর সন্ন্যাসী ম্যাজিকের!

ডক্টর সান্যাল। কিন্তু জনসাধারণের উন্নতির জ[illegible] চেষ্টা যে হচ্ছে এ তো ঠিক সুকুমার?

সুকুমার। মাথায় বস্তু আর মগজে বুদ্ধি না থাক[illegible] জনসাধারণের উন্নতি করা যায় না সার্—এ কথায় বি[illegible] করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আসল কথা মাথায় বস্তু থ[illegible] চাই, নইলে শুধু পরিকল্পনার পর পরিকল্পনাই হবে, [illegible] কমিশনের পর কমিশনই বসবে, দেদার টাকা খ[illegible] হবে—মানুষের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। পরিকল্প[illegible] আর কমিশনের খরচ যুগিয়ে যারা শুকিয়ে মরছে, উপ[illegible] দিচ্ছে, তাদের কথা ভাববার দিন আজ এসে গেছে স[illegible] শ্মশানে প্রেতের নৃত্য কদিন চলবে আর?

[ডাক্তার ঘোষ আর গীতা ঘোষাল বেরিয়ে এলেন।

ডাক্তার ঘোষ। (গীতাকে) তা হলে বুঝলেন [illegible] দেবী, একটু সময় পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়[illegible] ছ মাস।

[ব্লাড ব্যাঙ্কের উর্দি-পরা কম্পাউণ্ডার রুদ্ধশ্বাসে ছুটে [illegible] ঢুকল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি পড়ল তার উপ[illegible]

ডাক্তার ঘোষ। কি হে কম্পাউণ্ডারবাবু, এত[illegible] পাত্তা নেই, ডুব মেরেছিলে কোথায়?

কম্পাউণ্ডার। (অতিরিক্ত ব্যস্ততায় ডাক্তার ঘোষ[illegible] ব্যাপার শুনেছেন সার্! সাংঘাতিক কাণ্ড! সব ছারখ[illegible] সর্বনাশ হয়ে গেছে সার্!

ক্তার ঘোষ। কী হয়েছে খুলে বল ?

পাউণ্ডার। আর বলেন কেন সার্! রণচণ্ডী
র! সরকারী দপ্তরখানায় চড়াও হয়েছেন! সব
! পরিকল্পনার ছবি আর পোস্টার ছিঁড়ে আগুন
দিয়েছেন সার্!

ক্তার ঘোষ। কী সব বাজে বকছিস ?

পাউণ্ডার। বাজে? নিজের চোখে দেখে এলাম
মেয়েদের মিছিল, মুখে শ্লোগান—খাদ্য মজুদ
না, ধনীর দালাল সরকার চুলোয় যাক, আমাদের
মানতে হবে—খাদ্য চাই—খাদ্য চাই! অবস্থা
সার্!

ক্তার ঘোষ। বেশ তো, তাতে আমাদের কী ?

পাউণ্ডার। (ব্যস্তভাবে) এক্ষুণি এসে পড়ল সার্,
র এখানেও এসে সব জ্বালিয়ে দেবেন। দরজা বন্ধ
ার্। এই সুখী পরিবার আর পরিকল্পনার ছবি সব
এক্ষুণি লুকিয়ে ফেলছি।

গিয়ে ব্যস্তভাবে পরিকল্পনার পোস্টার আর 'সুখী
র' ইত্যাদির ছবি খুলে ঘরের মেঝেয় স্তূপাকার
করতে লাগল।]

ক্তার ঘোষ। আরে, এ করছিস কী? মেঝেয়
স্তূপাকার করছিস সব! এক্ষুণি এসে যদি আগুন ধরিয়ে
দেয় ?

কম্পাউণ্ডার। সেজন্যেই তো সার্, এক্ষুণি আমি
সব লুকিয়ে ফেলব। আপনি ভাববেন না সার্—

[স্তূপাকার করতে লাগল]

ডক্টর সান্যাল। (গীতাকে) ব্যাপার কি বলুন তো ?

গীতা। কি জানি, বুঝতে পারছি না কিছু।

ডাক্তার ঘোষ। (গীতাকে) আপনি—আপনিই এর
জন্যে দায়ী।

গীতা। (ভুরু কুঁচকে) আমার প্রতিষ্ঠান বলে তো
মনে হচ্ছে না। বামপন্থী ইলা মিত্রের দল—

সুকুমার। (চোখেমুখে কৌতুক আর খুশি) বামপন্থী
ইলা মিত্র! তা হলে তো দেখতে হয়—

[সুকুমার দ্রুত বেরিয়ে গেল]

গীতা। (ডক্টর সান্যালকে) চলুন ডক্টর সান্যাল,
আমরা বরং ব্যাপার কী দেখে আসি। (ডাক্তার
ঘোষকে) আপনি তাড়াতাড়ি দরজা-জানালা ভেজিয়ে
বন্ধ করে দিন ডাক্তার ঘোষ।

[ডক্টর সান্যালকে নিয়ে গীতা ঘোষাল বেরিয়ে গেলেন।]

[ক্রমশঃ]

কাগজের নৌকা

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন শান্ত হবে এ প্রমত্ত নদী।
আলোর মুকুট পরে'
ফেনার দোলনা চড়ে'
বহুরূপী-রঙে
যে বিচিত্র কাগজের নৌকাগুলি আজ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাপাদাপি করে,
একদিন অনেকে তাদের
উত্তাল লবণ-জলে
নাকানি-চুবানি খেয়ে
লুপ্ত হবে জলের পাতালে।

সেদিন থাকবে ভেসে
দিগন্তের শান্ত নীলে
অবশিষ্ট যে ক'টি তাদের,
তাদেরই চূড়ায় জানি, সমুদ্র পরাবে জয়-টীকা:
তারাই দিগন্ত দিবে পাড়ি
খুঁজে পাবে অনন্তের কূল:
সে ক'টিই হবে শুধু
কাগজের বোঁটা ছিঁড়ে শাশ্বতীর ফুল।

মহাশূন্য-ছায়া-পথে পথচারী কাল-পুরুষেরা
হঠাৎ আকুল হবে তাদের সৌরভে,
বহু যত্নে কালে-কালান্তরে
গাঁথবে তাদের মালা
হিরণ্ময় কালের সুতায়।
বজ্র-দীর্ণ বহু বহু ঝড়ের প্রলয়ে
আতঙ্ক-কুটিল মোহরাতে
বিপন্ন, বেপথু বিশ্ব
শান্তির সান্ত্বনা পাবে,
পাবে তার আলো আর আশার সংকেত
সেই নম্র নিরুদ্বেল মৃত্যুহীন সৌন্দর্যের চোখে।
মৃত্যু নিজে লজ্জা পাবে দেখে দেখে সে অমৃত প্রাণ
স্রষ্টাও পাবেন তার সৃজনের দুর্লভ প্রেরণা।
এ নায়ের মিছিলেতে এই নীলিমায়
যারা যারা ভাসিয়েছে
অনামী স্রোতের ফুল
আয়ু-হারা কাগজের নাও,
জানি না কোথায় তার স্বপ্নের বন্দর,
কোন্ থানা-ডাকঘর—
কত দূর ঠিকানার গাঁও···

একটিও বাঁচে যদি,
জলের লেফাফা খুলে, যদি সাধ হয়,
তুলে নিও তারে, হে সময়!
অন্ততঃ ভিড়তে দিয়ো সে বেনামী বন্দরের ঘাটে
আমরা নাইবা থাকি,
নিজের নামটি শুধু
নীরবে গেলাম রেখে জলের মলাটে।

[পূর্বানুবৃত্তি]
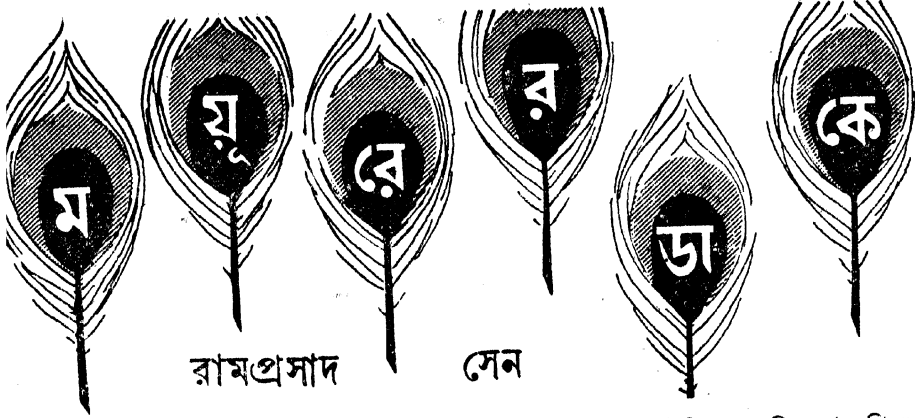
ুনিক জয়পুর যেন নলরাজার সারথ্যে উল্কাবেগে উড়ে চলেছে—ঋতুপর্ণের স্খলিত উত্তরীয় উদ্ধারের না না রেখেই। ছুটছে সবাই, নিশ্বাস ফেলবার শ নেই কারও। রাজপথে বাস মোটর লরি অটোসাইকেল। কৃষিক্ষেত্রে ট্র্যাক্টর বুলডোজার। শে এরোপ্লেন হেলিকপ্টার। ঘরে ঘরে রেডিও। মোড়ে সিনেমা অ্যামপ্লিফায়ার। বিকট নির্ঘোষে আবিষ্কারকর্তা মানুষকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে।

া-হা-হা! আর একটু হলেই লোকটা লরির তলায় ছল গো! খুব বেঁচে গেছে।—গোলচা-ভবনের ছাদ লাল পাথরের ঝরকার মধ্য দিয়ে রাজপথ দেখছিল ী। পাঁচটা বাজল, এখনও কী গরম!

ৌরপ্রতিষ্ঠানের লাল মোটরের ট্যাঙ্ক কংক্রিটের য় জল ছিটিয়ে চলে গেল। গরম ভাপ দোতলায় পৌছল।

ওই যে, মাস্টারণী নামছে সাইকেল-রিক্শ থেকে। ওই া মুখ নিয়েও চাঁদে হাত দেবার সাধ! ফাঁদ পেতেছে কে ধরবে বলে! ভিক্টরের বিরুদ্ধেও তো অনেক কথা াল কাল দাদার কাছে। ভিক্টরকে তা হলে চেনে? াগুলো কী নির্বোধ! আঁটসাঁট একটু গড়ন দেখলেই র মাথা ঘুরে যায়। কদিন থেকে যা দেখছি দাদাকে প্রায় খেপিয়ে তুলেছে। আর একটু হলেই কাল তো া গিয়ে পৌছেছিল। কিছু পয়সা হাতাবার মতলব আর কি। চোখের চাউনি—যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গিলে খাবে। আমায় যে পরশু চলে যেতে হবে দিল্লী। নইলে দিতাম ওর 'নখরা' ঘুচিয়ে। ও কে! ওই ফুটপাতে মোটর-সাইকেল রেখে এদিকে আসছে! ভিক্টর না!—দ্রুত স্পন্দনে ধকধক করে উঠল তার বুকটা। চুড়েলের কাছে এসে যেন কী বলে ডাকল? 'অনসূয়া' বলে তো নয়। ঠোঁট নাড়া দেখে তো তা মনে হল না। আঃ, ভুতনীর মুখটা আবার 'ছাজ্জা'র আড়ালে পড়ল। যাক, ভিক্টরের মুখটা তবু দেখা যাচ্ছে। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। চলার ভঙ্গী দাঁড়াবার ভঙ্গী সেই বেপরোয়াই আছে আজও। কিন্তু এ কী হাসি ওর মুখে! এ যে 'বেয়ুকুফে'র হাসি। একটা অবস্থাতেই পুরুষগুলো কেবল এই হাসি হাসে—যখন সে রমণীর যৌবনজলুস দেখে সম্মোহিত হয়। শেষে ভুতনীর প্রেমে পড়ল ভিক্টর! তার কৈশোরের 'মজনু'র এ কী অধঃপতন! ও কি, এখনি ওদের কথা বলা শেষ হয়ে গেল! ভিক্টর তো ও ফুটপাতে ফিরে গিয়ে মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে। চলে গেল? কী ভীষণ শব্দ করেই না গেল! এখনও যেন কাঁপছে বুকটা। ভিক্টরের তো মোটর-সাইকেল নেই। হয়তো চমু কৌড়সাহেবের। কিংবা জুয়োয় বাজী জিতেছে। তা হলে এই ব্যাপার। চুড়েল দাদার কাঁধে ভর করেই ক্ষান্ত হয় নি, ডাকিনীমন্ত্রে ভিক্টরকেও জাদু করেছে। উঃ, পর্দাপ্রথা উঠে গিয়ে কী দশাই হয়েছে জয়পুরের! 'ডাকন' চুড়েল টিড্ডার মত (পঙ্গপালের মত) ছেয়ে ফেলেছে

ব্যাগ নিয়ে গ্যায়রসীর সঙ্গে বেরিয়ে এল ফটক পার হয়ে। সৌখিন ছোট ছাতা ধরে গ্যায়রসী চলল পাশে পাশে। গরম হওয়া বইছে থেকে থেকে। ফুটপাতের উত্তাপ জুতোর চামড়া ভেদ করে পায়ে এসে লাগছে। ইয়াদগারের সামনের গেট দিয়ে না ঢুকে তারা রামবাগ রোডের কাছে পশ্চিম ফটকের মধ্য দিয়ে বাগিচায় ঢুকল। চুটোর মধ্যে এসে পৌঁছল বাঘের পিঁজরার লনের কাছে। চারিদিকে তাকিয়ে জান্‌কী দেখল ভিক্টর তখনও আসে নি। দাসীকে বলল, তুই রিঁচ, বান্দর, ববরশের (ভাল্লুক, বাঁদর, সিংহ) সব দেখ্‌, আমি এই গাছটার ছায়ায় বসছি। যদি দেখিস ভিক্টর এসে গেছে তখন একটু দূরে থাকিস. তুই তো জানিস ছেলেবেলা থেকে আমরা ভাইবোনের মত। সে একটা বিপদে পড়তে পারে তাই সাবধান করে দিতে এসেছি। লক্ষ্মীটি, কাউকে কিছু বলিস নি। আমি তো কাল দিল্লী চলে যাচ্ছি, আবার কবে আসব তার ঠিক নেই। তাই এলাম আজ তার সঙ্গে দেখা করতে।

গ্যায়রসী শের বান্দর দেখতে গেল না, অদূরেই একটা গাছের ছায়ায় বসে মনিব-কন্যাকে পাহারা দিতে লাগল। যা জয়পুর হয়েছে আজকাল! লুচ্চা বদমাইশ চতুর্দিকে। মনিবের মেয়ে খেয়ালের বশে এসেছে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তারই।

গাছের ছায়ায় বসে জান্‌কী তাকিয়ে রইল অ্যালবার্ট হলের সামনের রাস্তাটার দিকে। ভিক্টর এলে এই পথেই আসবে। আশেপাশে জনকয়েক মেয়ে পুরুষ বসেছিল। মিউজিয়াম চিড়িয়াখানা দেখতে এসে হয়তো জিরোচ্ছে। কথায়বার্তায় বাইরের লোক বলেই মনে হল তার। কী পরিবর্তনই এসেছে জয়পুরে। সে জয়পুরের আর কোন চিহ্নই নেই। আগে সকলেই সকলকে জানত। এখন কেউই কাউকে চেনে না। সুবিধাও হয়েছে তেমনি। কেউ কাউকে লক্ষ্যও করে না। আগেকার কালে এমন করে একা এলে রক্ষে ছিল! নিমেষেই রাষ্ট্র হয়ে যেত যে, শেঠ সাহেবের ন'যোয়ান মেয়ে বাগিচায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যুগের মেয়েরা সত্যিই ভাগ্যবতী। শাসন-বারণের বালাই নেই। লজ্জা-শরমেরও ধার ধারে না কেউ। পাঁচটা বাজলেই যোয়ানীর 'লুটাই' শুরু হয়। বাগিচায় ফুটপাতে সিনেমায় মোটরে টাঙ্গায় সাইকেল-রিক্‌শয় 'জোড়ি জোড়ি' সব চলেছে। হাতঘড়িতে দেখল আড়াইটে বেজেছে। কই, ভিক্টর তো এল না! আগেই জানত আসবে না। চুড়েল তাকে জাদু করেছে। গ্যায়রসী কি বুঝতে পারবে ভিক্টর তার আহ্বান উপেক্ষা করেছে! বড় লজ্জা!

কাঁইয়া কাঁই ছো বাঈসাহাব? (কেমন আছ?)—রঙিন চশমাটা খুলে ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলে চকিতে উঠে দাঁড়াল জান্‌কী। দু হাত বাড়িয়ে ভিক্টরের কোটের আস্তিন চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, ভিক্টর, এসেছ? আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।—সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভিক্টরের মুখ। বলল, আজও পার না আমাকে বিশ্বাস করতে? চিরদিন কেবল সন্দেহই করে গেলে। বড্ড রোগা হয়ে গেছ দেখছি।—জান্‌কী বলল, রোগা তুমিও হয়ে গেছ খুব। আরও লম্বা হয়ে গেছ। যেন বড় হয়ে গেছ অনেক। বিশ্বাস তোমাকে? জান্‌কী ছাড়া পৃথিবীতে আর কে তোমাকে বিশ্বাস করেছে ভিক্টর। এই আগুন-লাগা দুপুরে, লু আঁধি অগ্রাহ্য করে, মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে আর কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ভিক্টর?

হেসে ভিক্টর বলল, গর্ব করো না জান্‌কী। অপরিণামদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা কল্যাণবুদ্ধি হারিয়ে নির্বোধ স্বার্থপরদের হাতে সঁপে দিয়েছেন তাঁদের তপস্যার ফল। যন্ত্রবাহনের দৌরাত্ম্যে পৃথিবীটা আজ তাই ছোট্ট বলে বোধ হচ্ছে। আর তুমি ভাবছ এই ছোট্ট পৃথিবীতে তোমার মত আর কেউ নেই। কিন্তু মানুষের মনোজগৎ আজও রয়েছে অনন্ত দুর্গম অনাবিষ্কৃত।

আরশির সামনে মহড়া দেওয়া ভাবভঙ্গীগুলোর কথা এতক্ষণে মনে পড়ল জান্‌কীর। খাটো চুলে মাথা ঝাঁকিয়ে কটাক্ষ হেনে বলল, একটু নিরিবিলি জায়গায় চল দিকি নি। এখানে বড্ড লোকের ভিড়। অনন্ত অপরিণামদর্শী অনাবিষ্কৃত এই সব দাঁতভাঙা কথা বুঝি চুড়েলের কাছ থেকে আমদানি করেছ? তোমার বিদ্যে তো ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত। আগে তো এই গুরুগম্ভীর ভাষা আওড়াতে না?

চ্ছ্বাসশূন্য কণ্ঠে ভিক্টর বলল, হ্যাঁ, সে দশ বছর
। কিন্তু চুড়েল তুমি কাকে বলছ ?
ানকী বলল, বলছি। একটু নিরালা জায়গায় চল।
ন আশপাশের লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে।
ভক্টর বলল, যেখানেই যাও, লোকে তাকাবেই।
ানকী বলল, 'শাওণ ভাদো' কুঞ্জে চল না।
ভক্টর বলল, সেখানে স্টুডেন্টরা আড্ডা দিচ্ছে।
চেয়ে চল বেড়াতে বেড়াতেই কথা বলা যাক।
াবদারের সুরে জানকী বলল, আমি যে বসতে চাই
।
হেসে ভিক্টর বলল, আর আমি যে সবে যাত্রা শুরু
ছ জানকী। আচ্ছা চল এখানকার টেনিস ক্লাবে।
: পাঁচটা পর্যন্ত কেউ সেখানে তোমার দিকে তাকাবে
এক আমি ছাড়া।
জানকী বলল, তাই চল।
অ্যালবার্ট হলের সামনের রাস্তা পার হয়ে বাঁ দিকের
মাড়িয়ে তারা ক্লাবের দিকে অগ্রসর হল। লতা
নো উঁচু বেষ্টনীতে ঘেরা ক্লাবটি লোকচক্ষুর অন্তরালে।
ছ তারা দেখল, সবুজ রঙের ছোট কাঠের ফটক ভিতর
ে তালা বন্ধ।
ভিক্টর 'আজিজ আজিজ' বলে হাঁক দিতেই একটি
করা মালী প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে এল। তাকে
 সেলাম করে ফটক খুলে দিল। খেলোয়াড় ভিক্টরকে
জজ চেনে। প্যাভিলিয়নের ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে
। খুলে দিয়ে খাতির করে বসাল।
মালীকে শুনিয়ে জানকী বলল, রোদ একটু পড়লে
রা চিড়িয়াখানা দেখতে যাব। কি বল দাদোভাই ?
কণ তোমাদের ক্লাবে একটু জিরিয়ে নিই।
হেসে ভিক্টর বলল, Why confuse that poor
ow. He knows that I have'nt got a
er of my own.
আজিজ ভিক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, খাদ্য-পানীয়ের কিছু
বস্ত করবে কি না ?
জানকীর দিকে চেয়ে ভিক্টর জিজ্ঞাসা করল, জল খাবে ?
জানকী বলল, হ্যাঁ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।
রেফ্রিজারেটার থেকে কুয়াশা-ধরা ঠাণ্ডা জলের বোতল
আর গ্লাস ট্রেতে করে এনে সামনের টিপয়ের উপর রেখে
আজিজ বলল, বাইরের লনে আমি কাজ করছি, দরকার
হলে ডাকবেন।—মক্ষিকা-নিবারণী জালির দরজা বন্ধ করে
সে বেরিয়ে গেল।

ভিক্টর বলল, এইবার তো নিরিবিলি হয়েছে ? কেন
ডেকেছ বল ?

প্রখর রৌদ্রে খোলা আকাশের নীচে জানকী যেন
এতক্ষণ দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। ছাদ-দেয়ালের বাঁধা
গণ্ডির মধ্যে এসে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল,
এখানে ভয়ের তো কিছু নেই ?

হেসে ভিক্টর বলল, আছে বইকি। এই যে আমি বসে
আছি—জয়পুরের মেয়েরা যে আমাকে ভয় করে। একটা
মেয়েকে নিয়েও ইলোপ করলাম না। একটা মেয়েকেও
পথে বসালাম না। এমন কি বিয়ে পর্যন্ত করলাম না কোন
মেয়েকে। তবু বদনাম কিনলাম রাবণ রাজার মত।

উচ্ছ্বসিত হয়ে জানকী বলল, কেন সীতাকে চুলের
মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গেলে না ? দোষ তো তোমার।
কেন চিঠির গোছা ফেরত দিলে ?

ভিক্টর বলল, তখন অসামাজিক কিছু করি নি,
খানিকটা নিজের মন বুঝতে পারি নি বলে। আর
খানিকটা বাদলের বন্ধুত্বের খাতিরেও বলতে পার।
বন্ধুত্বের দাবি নিয়েই সে আমার কাছ থেকে চিঠিগুলো
ফেরত চেয়েছিল।

জানকী বলল, আমি যে তোমায় চিঠি দিয়েছিলাম,
দাদা সে চিঠি তোমায় দেয় নি ?

ভিক্টর বলল, হ্যাঁ, দিয়েছিল। কিন্তু সেটা তো ছিল
একটা বিজনেস লেটার।

চোখ ছলছলিয়ে এল জানকীর। বলল, কতখানি
বিশ্বাস কতখানি ভালবাসা থাকলে যে ও রকম চিঠি
লেখা যায়, সে তুমি কোনদিন বুঝতে পারবে না ভিক্টর।

জানকীর একদেশদর্শিতা লক্ষ্য করে ভিক্টর আর কথা
বাড়াতে চাইল না। বলল, পুরনো কথা থাক্ জানকী।
ডাকলে কেন, তাই বল।—জানকীর জন্যে এই মনে করে সে
বেদনা অনুভব করল যে, কিছুতেই তার সুরে সে সুর
মেলাতে পারছে না। দেখল, অর্থ সম্মান সামাজিক
প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও একটা অবলম্বন না থাকলে মেয়েরা

উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কিন্তু জান্‌কীর তো ছেলে রয়েছে! তাকে মানুষ করে তুলুক না! দান-ধ্যান করুক। নারী-কল্যাণ সমিতি গড়ে তুলুক। দেশের কাজ করুক। তাকে নিয়ে কেন আবার এই টানাটানি!

চোখের জল সামলে জান্‌কী বলল, শোন, কাল আমি দিল্লী যাচ্ছি। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। সেখানে আমার দরিয়াগঞ্জের বাড়িটায় তুমি থাকবে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। জয়পুরে এর দোরে তার দোরে তোমায় আমি ঘুরে বেড়াতে দেব না। তুমি আমার ছেলের গার্জেন হয়ে থাকবে। সে দায়িত্ব যদি নাও নিতে চাও তো এমনই থাকবে।

কপট বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ভিক্টর বলল, তা হলে আমার মধ্যে মহাপুরুষদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে বল? জয়পুর থেকে একেবারে নির্বাসনদণ্ডের আজ্ঞা! কিন্তু গ্যালিলিওর মতন প্রাণের ভয়ে যদি মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করি, তা হলে কি করবে? কিংবা সক্রেটিসের মত পলায়ন প্রত্যাখান করে 'হেমলক' পান করতে প্রস্তুত হই, তখন কী করবে?

বিষণ্ণ মুখে জান্‌কী বলল, সত্যিই ভিক্টর, তুমি হেমলকের পাত্র তুলে আপন খুশিতেই চুমুক দিতে যাচ্ছ। বিষভাণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দাও। চলে এস আমার সঙ্গে দিল্লীতে।—উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ও চুড়েল, ও বিষকন্যা! দেখ নি ওর মুখ? অর্ধেকটা ভূতনী আর অর্ধেকটা মেয়ে-মানুষ!

এতক্ষণে ভিক্টর বুঝতে পারল জান্‌কীর অন্তর্দাহের কারণ। প্রাণখোলা হাসিতে প্যাভিলিয়ন পূর্ণ করে চিৎকার করে উঠল, অরে অজিজ, ইণ্ডিকানে আ! (আরে আজিজ, এখানে আয়)

ঘাবড়ে গিয়ে জান্‌কী বলল, ওকে কেন ডাকছ?

জালির দরজা খুলে আজিজ এল। হেসে ভিক্টর বলল, অরে, চায়ে তো পিলা। লা তেরি চিট্‌বুক লা, ম্যে দাম মাড়ছুঁলা।

আপ্যায়িত মুখে আজিজ বলল, অজী সাব, চায় কা দাম কাঁই মাড়লা। ম্যে আব্বার লাউছুঁ। চলে গেল প্যাভি-লিয়নের কিচেনে ইলেকট্রিক হিটারে জল গরম করতে।

জান্‌কী বলল, উঃ, আমায় যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

সিগারেট ধরিয়ে ভিক্টর বলল, তা হলে তোমার মতে মাস্টারসাব হল এক সাংঘাতিক জীব!

নাকের উপরটা কুঁচকে জান্‌কী জিজ্ঞাসা করল, মাস্টারসাব! সে আবার কে?

ভিক্টর বলল, যাকে তুমি গালমন্দ করছ, সে। তাকে আমি নাম ধরে ডাকতে পারি না।

সোজা হয়ে বসে জোরে নিশ্বাস টেনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল জান্‌কী। তারপর ভিক্টরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে বলল, এতদূর গড়িয়েছে! সেদিন তোমার মুখ দেখেই ধরেছি। এমন 'বেঅকল' 'বেয়কুফে'র মত চেয়ে থাকতে ভিক্টর সিংকে এর আগে আমি কোন-দিন দেখি নি। তোমার রুচিবোধকে যে আমরা চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি ভিক্টর। এর চেয়ে তুমি যদি একটা ভঙ্গন চামারকে বিয়ে করতে, সেও হোত 'লাখো দর্জা আচ্ছা' (লক্ষ গুণ ভাল)।

প্রচ্ছন্ন পরিহাসে ভিক্টর বলল, উ-হুঁ, ও কথা বল না। এই ভঙ্গন চামাররাই তো রাজস্থানের পদ্মিনী। সে যাই হোক, মাস্টারসাবকে তো আমি বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছি ও কিষণ গোপালজীর ছাত্রী। ছবি আঁকে খুব ভাল আমায় সাহায্য করবে শিল্পসৃষ্টি করতে।

ধৈর্য হারিয়ে মুখ বিকৃত করে জান্‌কী বলে উঠ[illegible] বাজে বকো না ভিক্টর। তুমি খোকা নও। ও তোমা[illegible] শিল্পসৃষ্টি করতে সাহায্য করবে না, সাহায্য করবে শু[illegible] পালে পালে চুড়েল আর ভূতনী সৃষ্টি করতে।

বিরক্ত হয়ে ভিক্টর বলল, ডোণ্ট বি ভালগা[illegible] জান্‌কী! ভাল ভাবে কথা বল। যা-তা বলছ কেন[illegible] নিজেকে ছোট প্রমাণ করছ কেন?

ক্রোধে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে জান্‌কী বলল, তোমার গা[illegible] লাগল তো? কিন্তু এমন কথাও আমি জানি যা শুনবে[illegible] ওই 'রেণ্ডি'টার উপর তোমার ভালবাসা এক মুহূর্তে উ[illegible] যাবে।

ক্রোধে ভিক্টরের মুখ লাল হয়ে উঠল। আগুনের ম[illegible] জলে উঠল তার চোখ। তবু প্রচণ্ড শক্তিতে আত্মসংবর করে সে নীরব রইল। দেখি, জান্‌কী আর কি বলে!

জান্‌কী বলে চলল, শুনবে? ছেলেদের পড়ানোর প[illegible] ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদার সঙ্গে ওর প্রেমালাপ চলে। ডাক্তা[illegible]

লিগ প্লাষ্টিক সার্জারী করে ওর মুখের দাগ মুছে দেবে ছে। আর ফীয়ের হাজার হাজার টাকা যোগাবে বাদলরাম। আসছে সপ্তাহে ওরা বোম্বে যাচ্ছে রেশন করাতে। শুনবে, দাদা ওকে বুকে জড়িয়ে —আর চুড়েল দাদার পায়ে লুটিয়ে মায়াকান্না দে। কী বলে কাঁদে শুনবে? বলে—আমার শঙ্কর বান, ঈশাই ভিকুমাঙ্গার হাত থেকে আমাকে রক্ষা ! তুমি নাকি একদিন এমন বিকট চাউনিতে ওর ক তাকিয়েছিলে যে সে আতঙ্ক এখনও তার দূর হয় । দাদা তাকে অভয় দিয়েছে। এসব আমার বানানো নয় ভিক্টর। এসব আমি নিজে চোখে দেখেছি, জের কানে শুনেছি।

ভিক্টরের রোষদীপ্ত মুখ ধীরে ধীরে বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে ল। পলকের জন্য তার দৃষ্টি ঝাপসা হল। খেলার ঠে দুর্বল প্রতিপক্ষ হঠাৎ যেন তার পা থেকে বল কেড়ে য়ে স্কোর করে দিল। হাজার হাজার দর্শকের ধিক্কার-নিতে তালা লেগে গেল তার কানে। ঘাড় নীচু র সে মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে। বল সেণ্টার করে বার নতুন খেলা শুরু হল। শান্ত হল কল্লোলিত তরঙ্গ।

পরাজয়ের গ্লানি দূর করে মাথা তুলে তাকাল ভিক্টর। ল, আমার আবিল মন, আমার কাঙাল মন এসব কথা ন আলোড়িত হয় নি বললে মিথ্যা কথা বলা হয়। ন্তু আমার বিশ্লেষণকারী মন এতে এতটুকুও ক্ষুব্ধ হয় নি ন্‌কী।

কণ্ঠে সহানুভূতি ঢেলে মাথা নেড়ে জান্‌কী বলল, তুমি বাজে কথা বলছ ভিক্টর। তুমি যথেষ্ট বিচলিত য়েছ। আচ্ছা, কী পেলে তুমি ওর মধ্যে যা তোমায় পাগল রে তুলেছে? ওর দেহের গড়ন? ওর চোখ? ওর চুল? উনিভারসিটির ছাপ? কিংবা ওর মুখের ওই কালো গটাই? রাগের মাথায় আমি ওকে যা-তা বলেছি। ন্তু তোমার ব্যথাও আমার বুকে বেজেছে। এমন করে থ নীচু করে থাকতে তোমায় আমি কোনদিন দেখি নি ক্টর। তাই জানতে ইচ্ছা করে, কোন্ মন্ত্রে ও আঁধির ত তুফানের মত আকাল বৈশাখীর মত ভিক্টর সিংকে করেছে। শান্ত বিনম্র করে তোমার গলায় জনজির (শিকল) দিয়েছে? শিকারখানার পোষা বাঘেরার (চিতাবাঘ) মত তোমার চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে।

ক্লান্ত হাস্যে ভিক্টর বলল, এই দশ বছরে কথায় দিব্যি মুনশীয়ানা আয়ত্ত করেছ জান্‌কী। উত্তর দিতে লোভ জাগে। কিন্তু পাঁচটা প্রায় বাজে। আনাড়ী খেলোয়াড়রা 'সিঙ্গিলস্' খেলার 'চান্স' পাবার জন্যে রোদ থাকতেই এসে হাজির হয়। তোমায় দেখলে তারা হয়তো খেলায় উৎসাহ পেতে পারে, কিন্তু তুমি যাবে দমে। তার চেয়ে এবার ওঠা যাক। আমার কাঙাল মনের কোলাহলে শিল্পীমনের ঘুম ভেঙে গেছে। এখনও অনেকক্ষণ আলো পাব। আমি গিয়ে ছবি আঁকতে চাই কিছুক্ষণ। চল।

অধর দংশন করে জান্‌কী বলল, তা হলে বলবে না, কী বিশেষত্ব তুমি ওর মধ্যে দেখছ?

ভিক্টর বলল, চল, রাস্তায় যেতে যেতে বলব।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দশ টাকার একখানা নোট বার করে ভিক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জান্‌কী বলল, তোমার আজিজকে দাও। অনেকক্ষণ আমাদের বসতে দিয়েছে, খাতির করেছে।

ভিক্টর বলল, ঘুষ দিচ্ছ, না, তুমি শেঠের মেয়ে সেইটেই জাহির করতে চাইছ?

জান্‌কী বলল, ঘুষও দিই নি, শেঠের মেয়ে বলেও দিই নি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে কেবল দান করছি।

ভিক্টর বলল, তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দের মূল্য হচ্ছে দশ টাকা!

জান্‌কী বলল, পাগলের মত যা তা বকো না ভিক্টর। আমি তোমার জন্যে কী দাম দিয়েছি সে আমিই জানি। চুড়েল কী দাম দিয়েছে এখন কেবল সেইটেই জানতে চাই।—আবার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একতাড়া নোট বার করে ভিক্টরের দিকে তুলে ধরল। বলল, নাও, সব দিয়ে দাও ওকে।

ভিক্টর বলল, থাক্, টাকা দিয়ে ওকে আর নষ্ট করো না।

একখানা দশ টাকার নোট বাইরে রেখে বাকী নোটগুলো ব্যাগে পুরতে পুরতে জান্‌কী বলল, আমার সঙ্গ আর ভাল লাগছে না তোমার, না?

ভিক্টর বলল, আমি চাচার কোয়ার্টারে গিয়ে ছবি আঁকতে চাই জান্‌কী। এখনি 'মার্কার' এসে পড়বে।

প্যাভিলিয়ন থেকে দুজনে বেরিয়ে এল। আজিজ নত হয়ে সেলাম করে বলল, আর কিছু হুকুম ফরমান।—জান্‌কী দশ টাকার নোটখানা দিতে গেল। আজিজ আপত্তি জানাল। ভিক্টর দেখল, লোভ ঠিকরে বেরুচ্ছে তার চোখ থেকে। বলল, নিয়ে নে আজিজ। বাঈজী মহারাজ খুশী হয়ে দিচ্ছেন, নে।

টাকা নিয়ে আজিজ সেলাম করে ফটক খুলে দিল।

টেনিস কোর্টের বেষ্টনী ছেড়ে ছায়াঘন গাছের সারির মধ্য দিয়ে চলল দুজনে। জান্‌কীকে এদিক ওদিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে দেখে ভিক্টর জিজ্ঞাসা করল, বডিগার্ডদের খুঁজছ বুঝি?

জান্‌কী বলল, হ্যাঁ, গ্যায়রসীকে এনেছি সঙ্গে।

জান্‌কীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ভিক্টর দেখল, অদূরে একটা গাছতলায় গ্যায়রসী দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে পেয়ে পিছনে পিছনে আসতে লাগল।

ভিক্টর জিজ্ঞাসা করল, মোটর কোথায় রেখেছ?

জান্‌কী বলল, হেঁটে এসেছি।

সুর না মেলার অস্বস্তি নিয়ে নীরবে তারা পাশাপাশি চলতে লাগল।

ভিক্টর বলল, আর আমার সঙ্গে না যাওয়াই ভাল। ফটক এসে গেছে। রামবাগ রোড দিয়ে বহু পরিচিত লোকই অনবরত যাওয়া-আসা করে। চিনে ফেলবে তোমাকে। মিথ্যা লজ্জা পাবে। আচ্ছা, তবে এইখান থেকেই বিদায় নেওয়া যাক।

সানগ্লাস খুলে সজল চোখে ভিক্টরের মুখের দিকে চেয়ে জান্‌কী বলল, জয়পুর তবে তুমি ছাড়বে না? বলে যাও, অনসূয়া তোমাকে এমন কী দিয়েছে যার জন্যে তার সমস্ত দোষ তুমি উপেক্ষা করছ?

ঈষৎ হেসে ভিক্টর বলল, অনুরাগেই হোক বা আতঙ্কেই হোক সে শুধু ধৈর্যের সঙ্গে বসে একদিন আমার প্রলাপ শুনেছিল জান্‌কী। তোমরা আমায় গোল স্কোর করতে দেখে হাততালি দিয়েছ। হেরে গেলে দুয়ো দিয়েছ। জুয়োয় মদে ডুবে যেতে দেখে ধিক্কার দিয়েছ। কিন্তু কথা বলবার সুযোগ আমায় কেউ কোনদিন দাও নি। ক্রোড়পতি থেকে শুরু করে ভজন চামারের দুঃখ-বেদনা চিরদিন প্রতিবিম্বিত হয়েছে আমার হৃদয়ে। কিন্তু আমার ব্যর্থতা নৈরাশ্য তোমাদের অসাড় বুকে কোনদিন সাড়া জাগাতে পারে নি। আর দশ বছর আগেও যদি মাস্টারসাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হত, তা হলে হাথরোয়ের মাতাল ভিক্টর সিংকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে জগৎ দেখতে পেত।

সানগ্লাস চোখে পরে ফণা-তোলা সাপের ভঙ্গীতে মাথা তুলে জানকী বলল, আর দশ বছর আগে ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলে তুমি 'রেপ কেসে' পড়তে ভিক্টর। গ্যায়রসী—

বলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিয়ে বাগান থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল জান্‌কী।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিউ কলোনীর মধ্য দিয়ে ফেরবার পথ ধরল ভিক্টর। জান্‌কী তার বহু দিনের থিতিয়ে যাওয়া মনের পাঁক ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে আজ। সুরাতৃষ্ণায় শুষ্ক হয়ে উঠল তার কণ্ঠতালু। এতক্ষণে সে অনুমান করল অনসূয়ার পরশু দিনের আড়ষ্টতার কারণ। মোটর-সাইকেল থেকে নেমে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হেসে সম্ভাষণ জানায় নি। নিজেও কথা বলে নি। কেবল কথার উত্তর দিয়েছিল। বলেছিল, শেঠ সাহেবের বাড়ির ছেলেদের এখানে পড়াই। বলেছিল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে আজ যাচ্ছি আমি। পাছে সে অপ্রস্তুত বোধ করে ফটকের পাহারাতিদের সামনে, তাই তখনি সে চলে এসেছিল এই মিথ্যা আচরণের কী প্রয়োজন ছিল তার? জান্‌কী বলল—বাদলের পা জড়িয়ে ধরে সে নাকি বলেছে, ইশাই ভিকমাঙ্গার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর! তা হলে গোড়া থেকে অভিনয় করে আসছে অনসূয়া বাদলরামের বাড়িতে পড়ায়, সেকথাও তো আগে কোনদিন বলে নি! নাঃ, সাহস আছে মেয়েটার। খেলো... ভিক্টরকেও খেলা দেখিয়ে তাজ্জব বানিয়ে দিল। হাঁটতে হাঁটতে চেঁচিয়েই বলে উঠল ভিক্টর, বেশ বেশ, চমৎকার খেলেছ।—রাস্তার লোকে থমকে তাকাল তার মুখের দিকে। চেনা লোকেরা ভাবল মদ খেয়ে চলেছে অচেনারা পাগল ভেবে পাশ কাটিয়ে গেল। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কাছ দিয়ে যেতে মাথা তুলে তাকাল ভিক্টর। দেখল পাঁচিল পার হয়ে বাইরে পড়েছে ফুলসুদ্ধ সূর্যমুখী গাছের একটি শাখা। হাত বাড়িয়ে নিল ফুলটা দল পাপড়ি কেশর ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিল রাস্তায়—যে জটিল সমস্যার একটা সমাধান করে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

চাচার কোয়ার্টারে ফিরে এল ভিক্টর। রঙ তুলি কাগজ নিয়ে ছাতে উঠল। রাজস্থানের পাণ্ডুর গোধূলি মহাশূন্যতা ছবিতে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

[ক্রমশ]

গল্প

স্বপ্নবন্ধ

মিহির আচার্য

দীর্ঘ রোগভোগের পর অবশেষে একদিন ডাক্তারের কাছে ভাত খাবার ছাড়পত্র পেলে রুগীর সেদিন কতখানি আনন্দ হয় জানা নেই, কিন্তু আমি যেদিন কয়েক মাস বন্ধুবান্ধবদের দরবারে টালা থেকে টালিগঞ্জ, বেহালা থেকে বেকবাগান হাঁটাহাটির পর মাঝারি বয়সের একটি চাকরকে গৃহিণীর হেপাজতে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আপিসে এসে ফাইলের ফিতে খুলে বসলাম, সেদিন আমার খুশীর অন্ত নেই। বালুরঘাট থেকে আলিপুরে বদলী হয়ে এসে গড়িয়ায় এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় উঠেছিলাম, সেই থেকে দাম্পত্যকলহ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। কলকাতার কাছে চাই একটা বাসা। বাসা যদি মিলল তো কাজ করার লোক মিলবে না কেন! তারপর চলল তিন মাসের অধ্যবসায়। এবং আজ সকালেই নতুন চাকরকে সঙ্গে করে একেবারে সুশীলার জিম্মায় রেখে দিয়ে আপিসে আসা।

টিফিনের আগে হঠাৎ টেলিফোন। দোতলার ফ্ল্যাটের ডাক্তার লাহিড়ীর ওখান থেকেই ফোন করেছে সুশীলা।

হ্যালো—হ্যাঁ, আমি নিরাপদ—কী বলছ?

কী চাকরই খুঁজে এনেছ!—সুশীলার কণ্ঠস্বর: শীগগির বাড়ি এস। বাড়ি এসেই বিদেয় কর ওকে।

সে কি!—বিস্মিত হবার পালা এবার আমার। শুধু বিস্মিত নয়, আহতও। তবে কি চোরটোর! পাজি গুণ্ডা! একলা বাড়িতে ওর সঙ্গে থাকা সুশীলার পক্ষে নিরাপদ নয়।

না না, সে অনেক কথা। অত কথা আমি বলতে পারব না। কোনও কিছু শুনতে চাই নে। ওই লোকটা বিদেয় না হলে আমি জলগ্রহণ করব না—এই বলে রাখছি।—শব্দ করে রিসিভার রেখে দিল সুশীলা।

কাজকর্ম মাথায় রইল। অফিসারের কাছে ছুটি নিয়ে তখনই আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

দরজার কড়া নাড়তে সুশীলাই ছুটে এল দরজা খুলতে: এসেছ? উঃ, বাঁচলাম।

কই, লোকটা কোথায়? কি, করছিল কী? জিজ্ঞেস করলাম।

আহা, তোমার যেমন কথা। করবে আবার কী! ও কি বাঘ, না ভালুক।—সুশীলার কণ্ঠে ঝংকার।

তবে!—আমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন।

এ বাড়িতে ওর কাজ করা চলবে না।

মাত্র একবেলা বেচারি এ-বাড়ির অন্ন মুখে দিয়েছে কি না দিয়েছে এরই মধ্যে বরখাস্তের নোটিস!

আচ্ছা, তুমি পুরুষমানুষ, ঝি-চাকরের ব্যাপারে নাক গলাও কেন বল তো?

না গলিয়ে উপায় কী। যখন জানি এই চাকরকে তাড়িয়ে কালকেই আবার ঝি খুঁজতে পাঠাবে। তি[illegible] মাস হয়রানির পর যদি চাকর জুটল তাও তোমার কপা[illegible] সইল না। কিন্তু এর পর আর যেন আমাকে বিরক্ত করো না।

একটু পরে হাতে গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে লোক[illegible] বিদেয় করে দিলাম।

ধূমায়িত চায়ের বাটি নিয়ে সুশীলা এবার গোপন রহ[illegible] ভেদ করবে বলে মনে হল।

বলল, লোকটাকে তো বেশ ভালই লেগেছিল গো[illegible] কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে মা-মা বলে এমন ভা[illegible] জপিয়ে ফেলেছিল, ভাবলাম যাক লোকটা তা হলে টি[illegible] গেল। তারপর কী হল শোন। খাওয়া-দাওয়া[illegible] পর ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এতক্ষণ তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয় নি। তা মুখপোড়া—এই সময় অকস্মা[illegible] একটা হাসির ঢোক প্রতিহত করতে গিয়ে মু[illegible] আঁচল গুঁজল সে। তারপর বললে, আজ্ঞে মা, আমা[illegible] নাম নিরাপদ, পিসিমা ডাকত নিরু বলে। আমার ত[illegible] বিষম খাবার অবস্থা। না পারি হাঁচতে, না কাশতে[illegible] তারপরেই কোন রকমে ছুটে গিয়ে তোমাকে ফোন ক[illegible]

হাসিটা ছোঁয়াচে জিনিস। আমার এবম্বিধ ক[illegible] অবস্থাতেও না হেসে পারলাম না। হাসতে হাসতে[illegible]

■
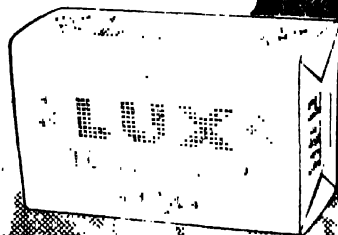
সাশ্চর্যে এই কথাটা মনে পড়ছিল, মেয়েদের কাছে স্বামী নামক জীবটি কেবল অভিধামাত্র—বিশেষ ব্যক্তিত্ব নয়।

হপ্তাখানেক গড়াতে না গড়াতে সুশীলাই অবাক করে দিল আমাকে।

আপিস থেকে ফিরে দরজার কড়া নেড়েছি, নতুন অপরিচিতা বিধবা মেয়েছেলে এসে দরজা খুলে দিল।

সুশীলা খাবার-ঘরে বৈকালিক জলযোগের তদারক করছিল। মুখ টিপে হেসে বলল, কেমন, দেখলে তো?—যে আত্মতুষ্টিতে মেয়েরা পুরুষের ওপর কর্তালি করে সেই হাসি।

বললাম, নতুন বহাল হল বুঝি?

হ্যাঁ গো।

কোত্থেকে আমদানি করলে এটিকে?

ডাক্তারের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে না, তারই পরিচিত। মেদিনীপুরে বাড়ি। কোনদিন দেশের বাইরে পা দেয় নি। তা ওদের দেশে এবার ভারি অজন্মা, তাই গতরে খাটতে এসেছে।

তা হলে কাঁচা নরম মাটি—গড়ে-পিটে মনের মত করতে পারবে, তাই না?

সুশীলা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসল।

বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বয়স। মুখে অনর্গল হাসি। কাজে কামাই নেই। যত উৎসাহ তার চেয়ে ভুল করে বেশী, আর হাসে ততগুণ। দেহাতি ভোঁতা অবোধ মায়া জড়ানো মুখে। চেষ্টা করলে মাটির গন্ধ পাওয়া যাবে বুঝি।

বিনোদ না বিনোদিনী কী যেন নাম মেয়েটির।

যতক্ষণ বাড়িতে থাকি আমাদের নিঃসন্তান নির্জন সংসার সুশীলার আর বিনোদিনীর কলকোলাহলে ভরে থাকে। সুশীলা এমনিতেই চেঁচিয়ে কথা বলে—মনে হয় ঝগড়াই করছে বোধ হয়। আর এই উচ্চকণ্ঠের সঙ্গে বিনোদিনীর অর্থহীন হাসি চমৎকার সঙ্গত। গ্রামীণ অজ্ঞ মেয়েটিকে কাজে-কর্মে ভদ্রস্থ করতে সুশীলার সারা সকাল ফুরিয়ে যায়। সাবান দিয়ে চায়ের বাসন ধোয়ার নির্দেশ—তবু কি না বিনোদিনী রোজ রোজ ছাই ঘষে ঘষে কাপ-প্লেটগুলির দফারফা করবে! সুন্দর সৌখিন ট্রে-টার বুকে আঁকা সুন্দর কাবুলী মার্জারটাকে সে দুদিনেই ছাই দিয়ে মেজে মেজে প্রায় অদৃশ্য করে দিয়েছে। রাগ হয় কি না! দোষ করলে তা শোধরানোর মধ্যেই প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু খালি খালি হাসবে মেয়েটা আর বাজে বাজে মাথা খারাপের মত প্রশ্ন তুলবে, 'কেন?' কোন কিছু করতে বললেই ওর প্রথম জবাব হবে—কেন? এই সেদিন—

তোমাকে গোটাদুয়েক খাম আনতে দেব বলে বললাম দৌড়ে গিয়ে দাদাবাবুকে বলে এস তো। তুমি তখনও ট্রাম-রাস্তায় পড় নি। তো আমাকে উলটে প্রশ্ন করল: কেন?—সুশীলা আঁচলে ঘাড় মুছতে মুছতে বলল, বল তো রাগ হয় কিনা?

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, নতুন তো। পরে ঠিক হয়ে যাবে।

ছাই হবে। সেদিন বিছানা করতে করতে হি হি করে হাসি—বেশী রাগলে মানুষের বোধ হয় হাসিও পায়। আমাকে কি বললে জান? বললে, আচ্ছা দিদিমণি, তুমি দাদাবাবুর ডান দিকে শোও কেন বল তো? কথা শোন! আমার তখন রাগব কি কাঁদব অবস্থা। তবু দম চেপে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী হয়? বললে, ডান না ডাইন—ডাইনীরা ওত পেতে থাকে। স্বামীর অমঙ্গল হয়—

হো হো করে হেসে উঠলাম।

গম্ভীর গলায় সুশীলা বলল, তুমি হাসছ! হাসতে পারলে!—তারপর একটু মৌন থেকে বলল, তোমাদের পুরুষদের, মেয়েদের ব্যাপারে নির্বিকার পক্ষপাত আছে।

বললাম, পক্ষপাত কোথায় দেখলে?

নয় তো কি:—থমথমে গলা সুশীলার: আমাদের দাম্পত্য ব্যাপারে ওর গ্রাম্য কৌতূহলটা কি হেসে উড়িয়ে দেবার মত?

মাথা চুলকে বললাম, অবশ্য এত গভীরে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি।

থাক্ হয়েছে। আগা কেটে আর গোড়ায় জল ঢালতে হবে না।

বোবার শত্রু নেই ভেবে নতুন উপন্যাসে উটপাখির মত মাথা গুঁজলাম।

দিনের পর দিন তবু সুশীলার অধ্যবসায়ের কমতি
। সে যেন মেজে-ঘষে বিনোদিনীকে পালিশ করে
:ব। মেয়েটা দিনভোর কাজ করে। ভুল করে বার বার
ওকে শোধরাবার প্রাণপণ প্রয়াস সুশীলার। যেন
হয় যতই রাগ দেখাক, বিরক্তি দেখাক, তার পেছনে
ান প্রশ্রয়ই আছে সুশীলার। বৈচিত্র্যের লোভ—
ার দুঃসহ শূন্যতাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা। আর
। দুপুরে দুটি মেয়ে এক ছাদের তলায় দীর্ঘকাল থাকলে
হয়—ধীরে ধীরে তাদের আলাপ-পর্ব কেমন ঘরোয়া
য় ভরে উঠছিল তা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। বিকেলে
পিস থেকে ফিরে বাথরুমে গেছি, দৃশ্যটা চোখে পড়ে।
না উনুনে লুচি ভাজছে সুশীলা, পাশে চাকিতে লুচি
। দিচ্ছে বিনোদিনী। ওদের ঘরোয়া আলাপের
ফোঁটা কানে আসত, আমার উপস্থিতিতেও তা
মাত্র ব্যাহত হত না। বিনোদিনীর বিগত শ্বশুর-
ড়ী, পতিদেবতার কথা। কথকতার ভঙ্গিতে সে এমন
। দেশগাঁয়ের কথা বলত যার ফলে আমাদের মত
গতপ্রাণ জীবদেরও মনে গ্রাম সম্পর্কে যে শাশ্বত
মৃতি সুপ্ত রয়েছে তাকে উসকে তুলত।

সত্যি, মানুষের কথা ভেবে কষ্ট হয়।—খাবারের
চাবি হাতে সুশীলা সেদিন বলল।

হেসে উত্তর দিলাম, তা হঠাৎ ডোমেসটিক সায়েন্স
ড় দর্শন নিয়ে পড়লে কেন ?

সুশীলা বলল, বিনোদিনীর কথা বলছি। পরের
ড়িতে দাসিবাঁদীগিরি করতে হবে ভাবতে পারে নি।
মী মরলেও পথে বসিয়ে যায় নি। ভিটে আছে শ্বশুরের,
ড়াই বিঘের মত ধানজমিও আছে। কিন্তু জলের
ভাবে পর পর দু বছর ক্ষেতে ধান নেই। এই দু
রে সত্তর আশি টাকার মত দেনা হয়ে গেছে। ওই
না শোধ করবার জন্যেই ওর খাটতে আসা।

বললাম, তার মানে ওই টাকাটা উসুল করেই সে
য় হাঁটা দেবে।

দেয় যদি দিক না। ওর অসময়ে সামান্য উপকার
তে পেরেছি সেইটেই যথেষ্ট। তা ছাড়া সংসারের কাজে
। আর ফাঁকি দিচ্ছে না।—চলে যেতে যেতে সুশীলা
ল, হাঁ, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি। দেখ, কাল আপিস
ক ফেরবার সময় একটা সুটকেস কিনে এন তো।

সুটকেস!

হ্যাঁ, বিনোদিনীর জন্যে। টিনের একটা সুটকেসের
ওর ভারি শখ। এই সাত-আট টাকার মধ্যে। টাকাটা
ও-ই দেবে।

কেন? হঠাৎ সুটকেস কী হবে ?

ওর মাইনে রাখবে।—সুশীলা মুখ টিপে হাসল।

তথাস্তু।

মনে মনে বিরক্ত হলাম। যত সব বাড়াবাড়ি! আমার
গ্রামীণ কল্পনার সঙ্গে এই আর্থিকতার মিল নেই। আমার
নিরুপদ্রব সংসারে ওর টাকা রাখার এই সবিশেষ তৎপরতা
বেমানান।

সুটকেস আনার কয়েকদিন পর সুশীলাই খবরটা
কানে দিল।

এও হয়েছে আর এক জ্বালা।—সুশীলার ঘটনা শুরু
করার এক ধরনের কায়দা—গৌরচন্দ্রিকা।

চিঠির কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললাম, কি রকম!

যত বলি সুটকেসটা তক্তপোশের নীচে রেখে ঘুমোও,
শোনে না। রোজ রাত্রে মাথার কাছে রেখে ঘুমনো চাই।

বললাম, খুব সাবধানী তো!

শুধু কি তাই: সুশীলা বলল, রোজ রাত্রে শোবার
আগে সুটকেস খুলবে। টাকাগুলো বার করে গুনতে
পারুক আর নাই পারুক উলটে-পালটে দেখবে, তারপর
মাথায় ঠেকিয়ে আবার গুছিয়ে ভেতরে তুলে রাখবে। কী
জ্বালাতন বল তো ?

সুশীলার পক্ষে জ্বালাতনের কী হেতু বুঝতে না পেরেও
উত্তর দিলাম, টাকা খরচের যখন বালাই নেই তখন
তার প্রতি অপত্যস্নেহ উথলে ওঠাই স্বাভাবিক।

ঘটনার আবর্তের বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখে
সে সম্পর্কে দার্শনিকতা সুলভ। কিন্তু ঘটনার জালে
জড়িয়ে পড়লে সেই নিরাসক্ত দার্শনিকতাও যে কত ভঙ্গুর
ঠেকে, সেদিন সন্ধ্যায় আপিস-ফেরত বাড়ি এসে সেটা
বুঝতে পারলাম।

রোজ সন্ধ্যায় খবরের কাগজখানা খুঁটিয়ে পড়া আমার
স্বভাব। এবং সেটা সুশীলাও জানে ভাল করে। কিন্তু
সেদিন আমার টেবিলে কাগজখানার হদিস মিলল না।

সুশীলা বলল, কেন? টেবিলেই তো ছিল।

চেঁচিয়ে বললাম, পাচ্ছি নে। খুঁজে দিয়ে যাও।

না। কোথাও পাওয়া গেল না কাগজটা। এ-ঘর সে-ঘর কোথাও খুঁজতে বাকী রাখল না সুশীলা। দুপুরেও তো কাগজটা ছিল টেবিলের ওপরে পেপারওয়েট চাপা। ছেলেপিলের সংসার নয় যে ঘরের জিনিস তছনছ হবে। দুটো কি তিনটে প্রাণী। অগোছাল হবার জো নেই।

চিন্তিত মুখে খাবার-ঘরে ফিরে এল সুশীলা।

আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম ওদের গলা।

বিনোদিনী, আজকের কাগজখানা বাবুর টেবিলে ছিল দেখেছ?

কেন?—বিনোদিনীর চিরন্তন অর্থহীন কেন! তারপর প্রাণ-বার-করা অনর্গল হাসি। হাসি থামবার পর ওর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলাম: সুটকেসের তলাকার কাগজটায় পোকা ধরেছিল, তাই একটা নতুন কাগজ পেতেছি।

বাবুর টেবিল থেকে নিয়েছ কাগজটা?—সুশীলার কণ্ঠস্বর: আজকের কাগজটাই?

বা রে! কাগজ দরকার ছিল নিয়েছি। আজকের না কালকের—আমি মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি নাকি!

সুশীলা এল চোরের দায়ে ধরা-পড়া অপরাধীর মত।

কী হল কাগজটা?—না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম।

সুশীলা হতাশ গলায় বলল, আর বলো না। সব গোলমাল হয়ে গেছে। বিনোদিনী···

থাক্‌। আর বলতে হবে না। বাড়িটাকে নরক বানিয়ে তুলেছ।

তুমি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছ।—সুশীলা আত্মপক্ষ সমর্থন করবার চেষ্টা করল।

না বলে-কয়ে কাগজ সরিয়ে সুটকেসজাত করবার সাহস সে পায় কোথা থেকে? ইংরিজিতে প্রবাদ আছে: যে লোক বেরাল মেরে হাত পাকায় পরিণামে সে মানুষ খুন করতে পারে।

আমার প্রবাদবাক্য হৃদয়ঙ্গম করে অথবা অন্য কোনও কারণে জানি না, ব্যস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুশীলা।

সেদিন বিকেল থেকে মাথা ধরেছে। তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরে বিছানা নিয়েছি। রাত্রে কিছু খাবার ইচ্ছে ছিল না। রাত্রির পাট চুকিয়ে আমার জন্যে এক কাপ ওভালটিন এনে শুয়ে শুয়ে আমাকে শুশ্রূষা করছিল সুশীলা।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কত রাত্রি হবে জানি না, হঠাৎ বন্ধ দরজায় দ্রুত করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

দিদিমণি, অ দিদিমণি: বাইরে থেকে বিনোদিনীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর: ঘুমিয়েছ নাকি?

কে? বিনোদিনী?—ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সুশীলা।

দরজা খুলে দিতেই ঝড়ো বাতাসের মত হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল বিনোদিনী। সে হাঁপাচ্ছে।

আচ্ছা দিদিমণি: ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল বিনোদিনী: আমি তো সেই লক্ষ্মীপুজোর পরে তোমার বাড়িতে কাজে লেগেছি। তা ক মাস হল? তিনমাস? তো তিন মাসে আমার কত মাইনে হল? পঁয়তাল্লিশ তো?

সুশীলা হতভম্বের মত বলল, কি হয়েছে কী?

এই দেখ না—এই তো আমার টাকা। হিসেবে মিলছে না তো।—মেঝের ওপর পাট-পাট করে বিছিয়ে দিয়েছে বিনোদিনী নোটগুলো।

অসহ্য মাথার যন্ত্রণার পর সবে ঘুম আসছিল, অকস্মাৎ এই উৎপাতে ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠতে লাগল অন্তর।

কী পাগলামী করছ। এই দেখ—দশ টাকার দুটো নোট কুড়ি টাকা, পাঁচ টাকার দুটো দশ টাকা, আর এক টাকার আট খানা—কত হল? আটত্রিশ টাকা হল তো? আর সাত টাকা গেছে তোমার সুটকেস কিনতে।

এতক্ষণে বিনোদিনীর মুখে হাসি ফুটল।

তাই বল। আমি খেয়ে উঠে গুনতে গিয়ে দেখি হিসেবে মেলে না। ভাবলাম, গেল কোথায় টাকা! তারপর ভাবলাম, দিদিমণির কাছে যাই, সব মিলিয়ে দিতে পারবে।

অতঃপর প্রস্থান।

কিন্তু ততক্ষণে আমার ঘুম চটে গেছে।

শ্বাসরোধকারী অবস্থা। পরিস্থিতিকে তরল করবার
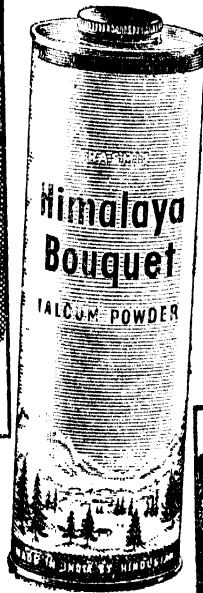
প্রয়াস পাচ্ছিল সুশীলা। কিন্তু তখন আমার নির্বেদ অবস্থা, রাগ বিরক্তি আর শিরঃপীড়া গলে গলে অনুভূতিহীন মস্তিষ্ক।

এ বছর তোড়জোড় করে বর্ষা শুরু হল। পরপর দু বছর অনাবৃষ্টির পর বিধাতা যেন এবার মুখ তুলে চেয়েছেন। কলকাতা থেকে নব্বুই মাইল দূরে মেদিনীপুরের সেই রামনগর গ্রাম। আর সে গাঁয়ের পূব সীমানা ঘেঁষে আড়াই বিঘে জমি। বৃষ্টির জল পেয়ে মাটি ভিজেছে—নরম মাখনের মত মাটি।

সুশীলা খবরটা ঠোঁটে করে নিয়ে এল।

শুনেছ? বিনোদিনী তো আর থাকতে চাইছে না। দেশে যাবে। ভাশুরপোকে বিশ্বাস কী? লাগোয়া জমি হলেও বিনোদিনীর জমিতে লাঙল নামবে সে ভরসা নেই।

গম্ভীর গলায় বললাম: তার মানে! ওর ধার শোধ করবার মত টাকা জমে গেছে?

আহা, তোমার যেমন কথা। দেশে থেকে নিজের জমির ধান খেয়ে যদি বেচারী বাঁচতে পারে, আমরা বাধা দেবার কে।

কিন্তু আমাদের সুবিধা-অসুবিধাও তো দেখতে হবে?

দেখবে বইকি। ও তো আর হুট করে চলে যাবে না। আমরা লোক যোগাড় করতে পারলে সে যাবে।

কিন্তু লোক চাই বললেই তো আর পাওয়া যায় না।

অথচ এবেলা ওবেলা তাগাদা সুশীলার। বিনোদিনী ছটফট করছে। ধান বুনতে দেরি হয়ে গেলে পড়তি ফসলের আর তেজ থাকবে না।

আবার টালা থেকে টালিগঞ্জ, বেহালা থেকে বেক-বাগান। বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধ।

অবশেষে লোকের খবর মিলল।

টালার এক বন্ধুর বাড়ির ঝিয়ের ছেলে যতীন।

পরদিন রবিবার সকাল-সকাল বেরুলাম যতীনকে গ্রেফতার করে আনবার জন্যে।

বেলা বারোটা নাগাদ যতীনকে সঙ্গে করে বন্ধ দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলল সুশীলা। কেমন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত চেহারা।

এ কি! লোক নিয়ে এসেছ একেবারে! কিন্তু, এদিকে:—বিভ্রান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় কণ্ঠস্বর সুশীলার।

কী হয়েছে?

মহা মুশকিল বাধিয়েছে বিনোদিনী। কী কেলেঙ্কারি বল তো! তুমি বেরিয়ে যাবার সময়ও যদি বলত। উঃ, কী সাংঘাতিক!

ব্যাপার কী?—আমি আবার জিজ্ঞাসা করি।

ছি ছি, কী হবে এখন বল তো। মানুষকে বিশ্বাস করবারও জো নেই। এমন মিথ্যে কথা বলতে পারে এমন ধোঁকা দিতে পারে! কী উপায় করি এখন বল তো।

নাটক না করে আসল ব্যাপারটা বলবে কি?—আমার কণ্ঠস্বর দ্বিপ্রহরের মত উদগ্র জ্বালাময়।

এই বিনোদিনীটা এমন মিথ্যুক, এমন ধাপ্পাবাজ মাগো! তুমি বেরিয়ে যাবার পর আমার পা জড়িয়ে ধরে অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমার পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল—দিদিমণি, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না গো। সব মিথ্যে—সব মিথ্যে বলেছি তোমাদের। আমার দেশ বাড়ি বলে কিছু নেই, এক ছটাক জমিও নেই। পড়ে ছিলাম শেয়ালদার ফুটপাথে। ওই মানদাই আমাকে তোমাদের বাড়ির কাজে লাগিয়ে দেয়।

বিনোদিনীর কাহিনী শুনে জমে পাথর হয়ে গেছি।

সুশীলা তখনও বিড়বিড় করে বকছে: সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। মুখপুড়ী এতদিন কেন যে মিথ্যে বানিয়ে বলেছে—কে জানে! এখন কী করি বল তো?

যতীনের দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি সেও বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তারপর যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এমন ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের লোক ঠিক হয়ে গেছে বুঝি? তাতে কী হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি।

ভেতরের বারান্দা থেকে পায়ের আওয়াজ।

এ কি! বিনোদিনীই বেরিয়ে আসছে যে! যেমন ভাবে ধীর পায়ে একদিন এসেছিল এ বাড়িতে। কেবল বাড়তি একটি সম্পত্তি সঙ্গে নিয়েছে—তার ফুল-কাটা সুটকেসটা।

সে কি, কোথায় যাচ্ছ তুমি!—সুশীলা ওর হাত চেপে ধরল।

চেয়ে দেখলাম বিনোদিনী হাসছে। সেই অনর্গল নিরাবরণ হাসি। বলল, বা রে, দেশে ফিরতে হবে না! জমিতে ধান বুনতে হবে না! কী যে বল দিদিমণি। চলি গো দাদাবাবু।

বিনোদিনী আমাদের নির্বোধ চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি স্থির বুঝতে পারলাম, বিনোদিনী অন্য এক পাড়ায় আবার কারুর বাড়িতে কাজ নেবে। সেখানেও সে তার দেশ-গাঁয়ের গল্প, ক্ষেতের গল্প বানিয়ে বলবে। যতদিন না তার স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ততদিন সে এই অভিনয় করে যাবে।

৬
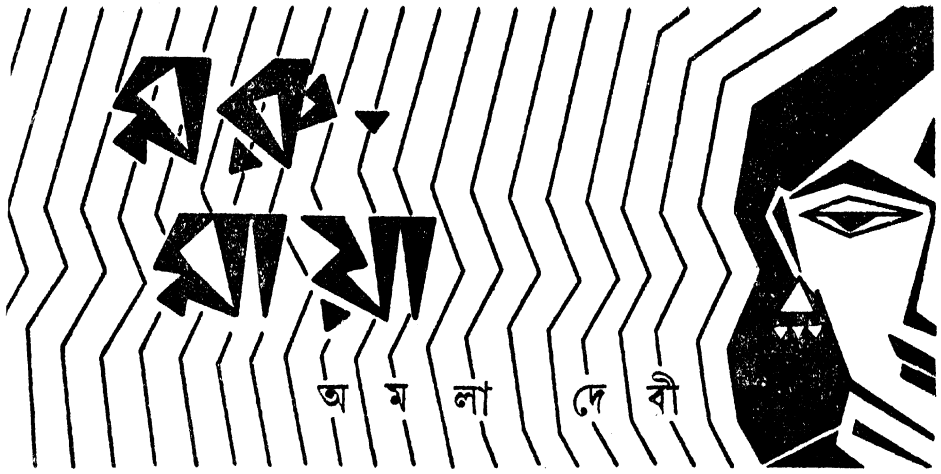
দিন সকালবেলায় রাধা গৌরদাসের ওখানে গেল।
গৌরদাস আজ সকালেই স্নানাহ্নিক সেরে
সছিল। কপালে তিলকমাটি দিয়ে তিলক আঁকা।
ক দেখে খোকা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, বাবা
মা এসেছেন।

উনোন ধরানো হয়ে গিয়েছিল। হাঁড়িতে জল ফুটছিল।
রদাস একটা পাতার ঠোঙায় কতকগুলো চাল নিয়ে
ল। এরপর সেগুলো সে জলে ছেড়ে দেবে। রাধা
ই হাতের কাজ বন্ধ করে বলে উঠল, আপনি!

রাধা ধমকে উঠল, আবার আপনি?

গৌরদাস ভুল শুধরে বলল, না না, তুমি। তুমি
জও এসেছ!

রাধা বলল, কাল যে আমার হাতের রান্নার প্রশংসা
লে। ওই লোভটা মেয়েমানুষের বড় লোভ। তাই
জও এলাম। আর যে কদিন এখানে থাকব
লবেলায় মাঝেমাঝে এসে রান্না করে দিয়ে যাব।
ত্রে খাবার পাঠিয়ে দেব। তা হলে তোমাকে আর
জ রোজ রান্না করতে হবে না।—খোকাকে বলল, কাল
ত্রে খাবার খেয়েছিলে তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

ভাল লেগেছিল?

খোকা ভ্রূ নাচিয়ে বলল, খুব ভাল লেগেছিল, আজও পাঠিয়ে দেবেন তো?

বলছি তো রোজ দেব।—গৌরকে বলল, চালগুলো রাখ। আমি ব্যবস্থা করছি।

গৌর বলল, আমি তা হলে কী করব?

রাধা বলল, বসে বসে কীর্তন গাও না। তোমার কীর্তন অনেক দিন শুনি নি।

গৌরদাস বলল, আমার কীর্তন আগে কখনও শুনেছিলে?

রাধা বলল, কাঁচামাটিতে। ওখানে আমারও মামার বাড়ি ছিল কি না। প্রেমদাস বাবাজী আমার দাদুর বন্ধু ছিলেন। আমিও ওঁকে দাদু বলতাম। রাসপূর্ণিমায় একবার ওখানে ছিলাম। তখন তোমার কীর্তন শুনেছিলাম।

গৌরদাস বলল, ভাল লেগেছিল?

রাধা বলল, হ্যাঁ।

রাধা রান্না করতে বসল। গৌরদাস গান ধরল। খোকাও তার সঙ্গে গাইতে লাগল।

মনে পড়ল রাধার। সন্ধ্যেবেলায় কীর্তন করত গৌরদাস। পাড়ার সকলে আসত শোনবার জন্য। মন্দিরের চাতালে চন্দ্রা ভাবে বিভোর হয়ে গৌরদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত।

সে রান্নাঘরে রান্না করত বসে বসে। চন্দ্রা তাকে

কতদিন যাবার জন্য টানাটানি করত। সে বলত, আমার তো বসে বসে গান শুনলে চলবে না ভাই, রান্না এখনও বাকী।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ল রাধার। সংসারে তখন খুব অভাব চলছে। গৌরদাস তখন কীর্তন গাইত। একদিন ওকে বলল, এত ভাল কীর্তন গাও, কোন শহরে গিয়ে বড়লোকের বাড়িতে বাড়িতে গাইলে দুটো পয়সা আসবে।

গৌরদাস বলল, ঠাকুরের নাম বিক্রি করে বেড়াব?

সে বলল, তাতে দোষ কী? লোকে লেখাপড়া শিখে পরের ছেলেদের পড়িয়ে টাকা নেয় না? তুমি একটা বিদ্যে শিখেছ—যা লোকের ভাল লাগবে, যা শুনে লোকে আনন্দ পাবে। তার বদলে পয়সা নেবে না? কত লোকই তো ওই রকম ভাবে রোজগার করে।

গৌরদাস জবাব দিল, লোকে যা করে করুক, আমি পারব না।

গান শেষ হল। গৌরদাস জিজ্ঞাসা করল, কী? ভাল লাগল?

রাধা বলল, হ্যাঁ।—একটু চুপ করে বলল, এই গান যদি শহরে গাইতে তা হলে শহরের লোকেরা বাড়িতে ডেকে পয়সা দিয়ে শুনত।

গৌর বলল, ভেবেছি অনেকবার, সুযোগ হয় নি। তা ছাড়া বড়লোকদের বাড়িতে পাত্তা পেতে হলে সাজ-পোশাক চাই। কথায় বলে না—আগে দর্শনধারী তবে গুণবিচারী—এও তাই। এই চেহারা এই পোশাক নিয়ে কোন বড়লোকের বাড়ির দরজায় দাঁড়ালে দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

রাধা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি শীগগির এখান থেকে চলে যাব। এখান থেকে অনেক দূরে একটা গাঁয়ের মেয়ে-স্কুলে মাস্টারণীর চাকরি পাব আমি। থাকবার জায়গাও পাওয়া যাবে। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে তো?

গৌরদাস বলল, রাধামাধবের ইচ্ছে হয় তো যাব।

রাধা ছেলেটিকে ডাকল: গোপাল?

গোপাল একটু দূরে দাঁড়িয়ে কি করছিল। এসে একেবারে কোল ঘেঁষে বসল। মায়ের স্নেহ বেশী পায় নি। মাতৃস্নেহের তৃষা ওর চোখে মুখে ফুটে উঠল।

খোকাকে রাধা বুকের কাছে টেনে নিল। খোকা চুপি চুপি বলল, আপনাকে মা বলব, মাসীমা বলতে ভাল লাগে না।

রাধা বলল, তাই বলো।

রাধা খোকাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার সঙ্গে যাবে তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, হুঁ—

রাধা বলল, যদি তোমার বাবা না যান?

খোকা গৌরদাসকে বলল, হ্যাঁ বাবা, যাবে না মায়ের সঙ্গে?

গৌরদাস বলল, তোর মায়ের সঙ্গে যেতে পারলে তো বেঁচে যেতাম বাবা। এত কষ্ট সহ্য করতে হত না।

খোকা বলল, সে মা নয়—আমার এই মায়ের সঙ্গে যাবে কিনা বল?

চুপ করে রইল গৌরদাস।

গৌরদাসের জবাব না পেয়ে বলল, বেশ, তুমি না যাও, আমি চলে যাব।

গৌরদাস বলল, আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?

খোকা বলল, হুঁ।

গৌরদাস দৃষ্টিহীন চোখ দুটি রাধার দিকে রেখে মৃদু হেসে বলল, তবে আবার কি! কান পাকড়ে যখন ধরেছ, যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পার।

৭

সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথ এল। বলল, আজ রোগীর ভিড় ছিল খুব। কলিয়ারী থেকে একটা ডাক এসেছিল। কর্তার সিংয়ের বাড়ি থেকে। সময় হল না বলে যেতে পারলাম না।

রাধার চেনা লোক। কমলা—মানে যে মেয়েটিকে ব্রজলাল নিয়ে পালিয়েছে তার বাবা। জিজ্ঞাসা করল, ওর নিজের অসুখ নাকি?

বিশ্বনাথ বলল, না ওর মেয়ের।

সবিস্ময়ে রাধা বলল, ওর আরও মেয়ে আছে নাকি!

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়! আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
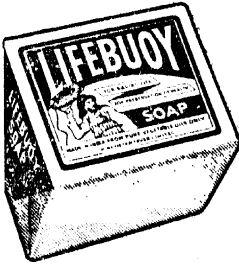
বিশ্বনাথ বলল, না।

রাধা বলল, তবে ?

বিশ্বনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে, আপনাকে বলা হয় নি। সে মেয়েটি ফিরে এসেছে।

সভয়ে রাধা বলল, তাই নাকি! ব্রজলালও!

বিশ্বনাথ বলল, না। ও একাই এসেছে। নিজে আসে নি। কর্তার সিংয়ের লোকরা কেড়ে নিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা এই। ব্রজলাল বিলাসপুরের কাছে চিরিমিরি বলে একটা জায়গায় ছোটখাটো কাঠের গোলা করে মেয়েটিকে নিয়ে বাস করছিল। এখানে ওর দলের লোকেরা খবরটা জানত। কর্তার সিংকে কেউ কিছু বলে নি। তাদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবী ছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে কর্তার সিংকে খবরটা জানিয়ে দিল। কর্তার সিংয়ের লোকেরা ওখানে গিয়ে ব্রজলালের কাঠের গোলাটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ব্রজলালকে মারধোর করেছে, মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে চলে এসেছে।

রাধা চুপ করে বসে রইল। একটু থেমে বলল, তা হলে ব্রজলাল তো আবার এখানে আসতে পারে ?

বিশ্বনাথ বলল, খুব সম্ভব।

রাধা বলল, ভাই, আমার ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে দাও। ও এখানে আসবার আগে আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। ও এসে পড়লে আমি যা কিছু আশা করেছি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।—একটু চুপ করে থেকে বলল, সারাটা জীবন আমার এমনই কেটে গেল—কোন সাধ কোনদিন মিটল না। আমার শেষ সাধ—গৌরদাস আর তার ছেলেটির জন্য ঘর বেঁধে দেওয়া। যেন এই বয়সে ও বেচারাকে আর পথে পথে ঘুরতে না হয়, যেন ওকে শেয়াল-কুকুরের মত পথের ধারে মরতে না হয়। ওই ছেলেটাকে যেন এখন থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে সারাজীবন পথে পথে না কাটাতে হয়। লেখাপড়া শিখে আর পাঁচজন ভদ্রঘরের ছেলে যেমন করে জীবন কাটায়, ও যেন তেমনই জীবন কাটাতে পারে।

বিশ্বনাথ বলল, আমি চেষ্টা করছি দিদি। বাবা কাল শহরে যাবেন বলেছেন। বাড়িটা বিক্রির ব্যবস্থা করতে। যে কিনবে তার সঙ্গে ওঁর আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছে। ডাক্তার দাসের গ্রাম থেকে চিঠির আশা করছি শীগগির। সব ব্যবস্থা শেষ হতে একটু দেরি হবে। ব্রজলাল যদি এসে পড়ে—সে হয়তো গোপনেই আসবে, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে, প্রকাশ্যে আপনার এখানে আসবে বলে মনে হয় না। তা হলেও আমি শিউশরণকে বলে যাচ্ছি। ও যেন লক্ষ্য করে। ও তো পুরনো লোক। আপনাকে ভালবাসে।

রাধা বলল, মদন শিউশরণ দুজনেই ভালবাসে আমাকে।

বিশ্বনাথ চলে গেল। রাধা ব্রজলালের কথা ভাবতে লাগল বসে বসে।

সুন্দর সুঠাম দেহ। মনটা পাষাণের মত কঠিন ও নির্মম। তাকে তেওয়ারী যে কিনে নিয়ে এসেছিল, জানা ছিল তার। ক্রীতদাসীর মতই ব্যবহার করত। উঠতে বসতে ধমক, তিরস্কার, অপমান। ঠাকুর-চাকরের সামনে মেরেছে কতবার। গোপিয়া হাসত, কিন্তু শিউশরণ তাকে সান্ত্বনা দিত। তেওয়ারীর স্ত্রীকে জানালেও সে ব্রজলালকে কিছু বলত না। বরং তাকে বোঝাতেন, মেয়েমানুষদের পুরুষের মারধোর সহ্য করতেই হয়। তেওয়ারী তাকে কতবার মেরেছে, সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। তাও সে তো স্ত্রী—অর্থাৎ বলতে চাইত ক্রীতদাসীর মারধোর ন্যায্য পাওনা। ব্রজলাল যখন মদ ধরল, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত। গোপিয়াকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠাত। সে যেতে চাইত না। কিন্তু না গিয়েও উপায় থাকত না। ঠাকুর-চাকরের সামনেই কামার্ত পশুর মত তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপর চরম নির্যাতন চালাত। পরদিন মদের নেশা কেটে গেলেও তার ব্যবহারে অনুশোচনা লেশ মাত্র ফুটে উঠত না। তেওয়ারী-গিন্নী বা তেওয়ারীকে কিছু জানিয়ে লাভ ছিল না। কারণ ব্রজলালই এখানকার সর্বে-সর্বা ছিল। তার পরিচালনায় কাঠের ব্যবসা খুব উন্নতি হয়েছিল। চারদিকের কলিয়ারীগুলোর কর্তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে কাঠের বিক্রি সে বাড়িয়েছিল। মাসে অনেক টাকা আয় করছিল। তেওয়ারীর চালের আড়তে যা আয় হত তা তা

ার খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি আমোদ ইত্যাদিতে রচ হয়ে যেত। ব্রজলালের আয়েই এখানকার চলত। কাজেই ঠাকুর-চাকর তার কাছে তটস্থ াকত। তেওয়ারী ও তেওয়ারীর গিন্নি তাকে দিত অনবরত। সে যাই করুক কিছু বলত না। ই সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। আশ্রয়ও তো আর কোথাও া! আশ্রয় জুটলেও বিনা মাইনের চাকরানীকে নশ্চয় ছাড়তও না। বিশ্বনাথ বা তার বাবাকেও সব জানায় নি। কারণ তাতে কোন ফল হত না। নিজেকে আরও ছোট করা হত।

তওয়ারীর মৃত্যুর পর আবার সে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় ়। আবার তীর থেকে স্রোতের কবলে পড়েছে। এবার তরঙ্গ উত্তাল নয়, আকর্ষণ তীব্র নয়, র নীচে মাটি উধাও হয়ে যায় নি, চোখের সামনে তীর-রেখা দৃষ্টি-সীমার বাইরে হারিয়ে যায় নি। সে একেবারে নিঃসহায় হয়ে যায় নি। বিশ্বনাথ শ্বনাথের বাবা, অচিন্ত্যদা সবাই এবার তাকে স্রোত থেকে তীরে তোলবার চেষ্টা করছে। যে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার তাকে এতদিন ধরে ঘিরে রেখেছে, তার মধ্যে যেন একটি প্রদীপ হঠাৎ জ্বলে উঠেছে। তারই ক্ষীণ শিখা অন্ধকারকে একটু ফিকে করে তুলেছে। জীবনের পথটা দেখা যাচ্ছে কতকটা। সঙ্গীও জুটেছে পথ চলবার। এখন কোন রকমে এই শিখাটি যদি টিকে থাকে তা হলে সে তারই ক্ষীণ আলোতে হয়তো সঙ্গীদের নিয়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারে।

আর যদি হঠাৎ ব্রজলাল এসে পড়ে তো সব পণ্ড হয়ে যাবে। সে কোন কথা শুনবে না, কোন কথা বুঝবে না, ক্রীত দ্রব্যের উপর ক্রেতার অবিসংবাদিত অধিকারে তাকে ওর সঙ্গে কোন দূর দেশে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর সেই স্নেহহীন সহায়হীন অজানা দেশে অচেনাদের সঙ্গে বাকী জীবনটা ব্রজলালের সেবা করে কাটাতে হবে। সামান্য খাদ্য পরিধেয় ও আশ্রয়ের পরিবর্তে ব্রজলাল ইচ্ছেমত তার দেহটাকে মাংসের টুকরোর মত চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।

শিউশরণ এসে বলল, দিদি, খেয়ে নেবে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে।
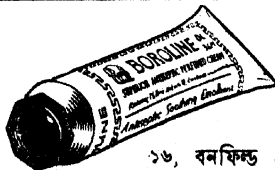
৮

পরদিন সন্ধ্যের পর বিশ্বনাথ এল। বলল, আজ কর্তার সিংয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। মেয়েটিকে দেখলাম। মুখখানি শুকনো। আগের চেয়ে কাহিল হয়ে গেছে। ব্রজলালের কাছে খুব ভাল ছিল বলে মনে হয় না। এখানে বাবার কাছে খুব আদরে থাকত।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কর্তার সিং কী বলল?

বিশ্বনাথ বলল, বলল অনেক কিছু। মেয়েটির ভাল পাত্র জুটেছে। দেশের ছেলে। ম্যানেজারী পাস করেছে। কাছেই একটা কলিয়ারীতে কাজ করছে এখন। আরও ভাল কাজের চেষ্টা হচ্ছে। পাবেও নাকি। পায়ার জোর আছে। তা ছাড়া পাঞ্জাবীদের তো কলিয়ারী এলাকায় আজকাল একাধিপত্য। হাজার টাকা নাকি মাইনে হবে।

রাধা বলল, বিয়েটা হচ্ছে কবে?

হবে শীগগির।

রাধা বলল, ব্রজলালের কথা কী বলল?

বিশ্বনাথ বলল, অনেক কিছুই বলল। জানে তো আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। বলল, এ এলাকায় যদি পা দেয়, প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। পাঞ্জাবীরা ওকে শুয়োর মারা করবে। শেয়ালের বাচ্চা হয়ে সিংহের বাচ্চার উপরে হাত দেওয়ার স্পর্ধার সমুচিত শাস্তি দিয়ে দেবে।

ব্রজলালকে তো ওরাই ঘরে ঢুকিয়েছিল?—বলল রাধা।

বিশ্বনাথ বলল, ব্রজলালের অনেক পয়সা আছে ভেবে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু যে লোকটা বলবামাত্র দু হাজার টাকা বার করতে পারে না, তার উপরে ওদের আর বিন্দু-মাত্র শ্রদ্ধা নেই।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, দু হাজার টাকা কী জন্যে চেয়েছিল? মেয়ের দাম?

বিশ্বনাথ বলল, দাম নয়, সেলামী। দাম পরে দিতে হবে। সিংয়ের তো নিজের মেয়ে নয়, পালিতা মেয়ে। ছোট ভাইয়ের মেয়ে। মা নেই, বাবা আছে। সেও বিশেষ কিছু করে না। সিংয়ের কাছেই থাকে। ওদের খাওয়াতে-পরাতে তার খরচ তো কম হয় নি। কাজেই এ সব তার ন্যায্য পাওনা।

পাঞ্জাবী ছেলেটি কি এসব দেবে?

দেবে মানে? দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। মাইনের অর্ধেক পূজ্যপাদ শ্বশুরমশায়ের হাতে তুলে দিচ্ছে। মেয়েকে ভাল ভাল পোশাক, দামী দামী গয়না প্রায়ই উপহার দিচ্ছে; প্রত্যেক রবিবার রাত নটার শো-তে সিনেমা দেখাচ্ছে—অবশ্য মেয়ের বাবার হেপাজতে।—বলে বিশ্বনাথ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

রাধা দেখেছে মেয়েটিকে। চমৎকার দেখতে। লম্বা, ছিপছিপে। ফরসা রঙ। পরনে সালোয়ার। লাল রঙের পাঞ্জাবি। সবুজ রঙের ওড়না। লম্বা বেণী দুলছে পিঠে। সাইকেলে চড়ে মাইল পাঁচেক দূরে একটা মেয়ে-স্কুলে রোজ পড়তে যেত। মেয়ের বাবা যেত সঙ্গে।

ব্রজলালের যাতায়াত ছিল ওদের পল্লীতে। দু হাতে টাকা খরচ করত। বন্ধু-বান্ধব জুটেছিল অনেক। আড্ডা বসত রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। খরচ আসত ব্রজলালের পকেট থেকে। ওইখানেই মদ খেতে শিখেছিল ব্রজলাল। আরও অনেক কিছু শিখেছিল। পয়সাওয়ালা লোক বলে সুনাম হয়ে গিয়েছিল সারা পল্লীতে। কাজেই আপ্যায়নে তাকে ঘরে ঢুকিয়েছিল কর্তার সিং। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওর হাতে ছেড়ে দিতেও দ্বিধা করত না।

একটা দিনের কথা মনে পড়ল। রাত দুপুর। তেওয়ারী-গিন্নী ঘুমিয়ে পড়েছে। সেও মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে শোবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় গোপিয়া এসে বলল, ছোট সাহেব এসেছে, ডাকছে, জলদি এস।

ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। কী মেজাজে এসেছে কে জানে! মদ খেয়ে এলে তো সব রকম অত্যাচারই চলত। ভয়ে ভয়ে বাইরে গিয়ে দেখল—ব্রজলাল বাইরে দাঁড়িয়ে, পাশে মেয়েটি।

ব্রজলাল হুকুম দিল কড়া গলায়, আলো জেলে আমার বিছানা ঠিক করে দাও।

সে নীরবে আদেশ পালন করে চলে এল। মেয়েটি বোধ হয় তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ব্রজলাল জোর গলায় অবজ্ঞার সুরে বলল, চাকরানী। এমনি নয়—অনেক টাকা দিয়ে কেনা।

বিশ্বনাথ একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, ব্রজলালও চুপ করে বসে নেই। ওর দলের একটা লোক সেদিন আমার কাছে এসেছিল। প্রায়ই আসে ইনজেকশান নিতে। বলল, ব্রজলাল ওদের দলের লোকদের বলে পাঠিয়েছে, মেয়েটাকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে। অনেক টাকা দেবার লোভ দেখিয়েছে। বলে পাঠিয়েছে, বাড়ি বিক্রীর সব টাকা দিয়ে দেবে ওদের। চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

রাধা সবিস্ময়ে বলে উঠল, বাড়ি! কোন্ বাড়ি?

বিশ্বনাথ ম্লান হেসে বলল, এই বাড়ি। এটা ওরই প্রাপ্য বলে জানে তো। এর মধ্যে যে এসব ব্যাপার ঘটে গেছে তা তো জানে না।

ভয়ে রাধার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, ও তো তা হলে শীগগির এসে পড়বে?

বিশ্বনাথ বলল, খুব সম্ভব।

রাধা বলল, এসে সব শুনবে আর তোমার আমার ওপর চটবে। তোমার তো কিছু করতে পারবে না। আমার ওপর চলবে নির্যাতন। যদি একেবারে মেরে ফেলে তো সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই। কিন্তু তা তো করবে না। টেনে নিয়ে যাবে ওর সঙ্গে, তারপর যতদিন না মৃত্যু হবে ততদিন সেই দুর্গতির দুঃসহ জীবন চলতে থাকবে।

বিশ্বনাথ বলল, আমিও ভেবেছি সব। কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ওঁকে আমি আপনার অবস্থাটা বলেছি। উনি বলেছেন, কোন বিপদ হলে ওঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। উনি সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দেবেন।

রাধা বলল, কে ওঁকে খবর দেবে ভাই! শিউশরণ তো ব্রজলালকে প্রাণে প্রাণে ভয় করে। ওকে দেখলে আর নড়তে পারে না। বাকী থাকে মদন। ও কি পারবে?

দুজনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। রাধা বলল, মেয়েটার মনের ভাব কী?

বিশ্বনাথ বলল, গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় পেলে মেয়েদের মন একটু নরম হয়। যতদূর শুনেছি, ব্রজলালের উপর একটু টান থাকা সম্ভব। তবে ও যে ব্রজলালের সঙ্গে যাবে বলে মনে হয় না। খুব খেলোয়াড় মেয়ে। ব্রজলালের আগে আরও দু-একজনকে নাকি খেলিয়েছে। ধরা দেয় নি কারও কাছে।—কথাটার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য বিশ্বনাথ বলল, গৌরদাসদের খবর কী?

রাধা বলল, ভালই আছে। আমি সকালবেলায় গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসি। রাত্রে খাবার পাঠিয়ে দিই। ছেলেটির খুব ফুর্তি হয়েছে।

বিশ্বনাথ বলল, ওরা দুজনেই বেশ চমৎকার গান গায়। আমি শুনেছি। মা প্রায়ই ওদের ডেকে গান শোনেন তো! ওরা যা চমৎকার গান গায়! রেডিওতে যারা গান গায় তাদেরই মতন। সুযোগের অভাবে এরা এমন ভাবে নষ্ট হচ্ছে, এত কষ্ট পাচ্ছে।

রাধা বলল, বেশ তো, সুযোগ করে দাও না গৌরদাসকে। ছেলেটার এখন ওসব করে কাজ নেই। লেখাপড়া শিখুক আগে।

বিশ্বনাথ বলল, ও তো কলকাতা না গেলে হয় না। মফস্বলে ওর কোন ব্যবস্থা নেই।

রাধা চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের পাঁচজনের চেষ্টাতে দুর্ভাগ্যের আকাশজোড়া কালো মেঘের একপাশে একটু আশার আলো ফুটে উঠেছিল। ব্রজলাল যদি এসে পড়ে তো সেটুকু মুছে গিয়ে আবার সেই কালো মেঘ আকাশ জুড়ে আসর জমিয়ে বসে থাকবে। কবে যে মরণ হবে জানি না!

[ক্রমশ]
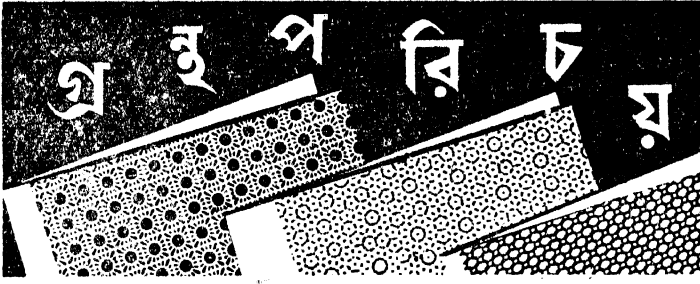
ব্রত জীবন-দর্শন : মুনি শ্রীনগরাজজী [হিন্দী]
সমিতি, দিল্লী। এক টাকা।

ব্রত-দর্শন : মুনি শ্রীনথমলজী [হিন্দী] অনুব্রত
দিল্লী। ২য় সং, এক টাকা।

n Philosophy and Modern Science :
Shri Nagrajji Anuvrat Samiti Kanpur.
। বারো আনা।

ব্রত দিগ্‌দর্শন : মুনি শ্রীনগরাজজী [বাংলা]
সমিতি, কলিকাতা। চার আনা।

ব্রত-দর্শন ও তৎসহ অনুব্রত আন্দোলন দিনে দিনে লাভ করিতেছে। বিশেষ করিয়া বিগত আট মাস গা শহরে প্রবর্তক তুলসী মহারাজজীর উপস্থিতিতে র নাগরিক সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিতেছে। সাধারণতঃ অধিবাসীরা নানা অবাঞ্ছিত প্রলোভনের সম্মুখীন যায় অর্থোপার্জন, পরস্ব অপহরণ, অপরিমিত নাস এখানে নিত্যই মানুষকে আকর্ষণ করে; সৎচিন্তা, সৎদর্শন ও সৎ আদর্শের সঙ্গে বিশেষ ও সম্পর্ক ঘটিবার সুযোগ শহরের নিত্য ধাবমান স্ত মানুষ পায় না বলিয়া তাহারা সহজেই পাপ ভনের কবলে পড়িয়া তিলে তিলে আত্মহত্যা ঙ্গে সঙ্গে পরিবার-পরিজন আত্মীয়বান্ধবকে মারে। ত্তি, ঘোড় দৌড়, ফাট্‌কাখেলা ও অন্যান্য জুয়া, ভদ্র মানুষকে ভুলাইয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিবার গোপন ও মনোহর কেন্দ্র, হোটেল-রেস্তোরাঁ-সিনেমা এমন কি ধর্মস্থানগুলি মানুষকে পাপের পিচ্ছিল পথে ঠেলিয়া দিবার জন্য সর্বদা ওত পাতিয়া আছে। যাহারা অজানিতে শিকারীর কবলে পড়ে তাহাদিগকে যেমন সতর্ক সচেতন করা প্রয়োজন তেমনি যাহারা জানিয়া বুঝিয়া হীন রিপুগুলির চরিতার্থতার জন্য এই পথে অগ্রসর হয় তাহাদিগকেও অপঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সহজ "অনু"ব্রত—তুলসী মহারাজ ও তাঁহার শিষ্য-সন্ন্যাসীসম্প্রদায় প্রচার করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা অনুব্রতের উন্নত আদর্শ শহরবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন। অনুব্রতীকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে না। সংসারাশ্রমের মধ্যমার্গ ধরিয়া সংসারী জীব কিভাবে সমাজের কল্যাণ ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্মিক উন্নতিসাধন করিতে পারে অনুব্রত দর্শনে তাহার সম্যক নির্দেশ আছে। এই দুইখানি হিন্দী, একটি ইংরেজী গ্রন্থে এবং একটি বাংলা পুস্তিকায় অতি সহজ সরল ভাষায় গৃহী অনুব্রতীর কল্যাণ-পথের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা শুধু আদর্শ চোখে দেখিয়াই সন্তুষ্ট নন, এই ব্রতের দর্শনও অনুধাবন করিতে চান এই পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি তাঁহাদের সবিশেষ উপকারে আসিবে।

—শ

সাহিত্যের কথা : গুরুদাস ভট্টাচার্য। চার টাকা।
নাটকের কথা : অজিতকুমার ঘোষ। চার টাকা।
ছোটগল্পের কথা : রথীন্দ্রনাথ রায়। পাঁচ টাকা।
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬।

জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ কতটুকু ও কোথায়, সাহিত্য আলোচনায় এটাই আজ প্রথম প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর একটি নয়—অনেক।

ভিন্ন ভিন্ন উত্তরকে আশ্রয় করে অথবা উত্তরের ভিন্নতার কারণেই, বহু সাহিত্যিক স্কুল গড়ে উঠেছে, সাহিত্য-আলোচনায় বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন গুরুদাসবাবু প্রায় সারা বইটি জুড়ে। তত্ত্বের চেয়ে, মনগড়া মতবাদের চেয়ে তিনি তথ্যের ওপর নির্ভর করতে চেয়েছেন বেশী করে। তাই তিনি মানব-ইতিহাসের প্রত্যূষ থেকে, উৎস থেকে, গোধূলি-লগ্ন বা মোহানা পর্যন্ত বিচরণ করেছেন। একটি প্রতীতিতে পৌঁছানোর জন্য তাঁর আগ্রহ অসীম; একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত তাঁর যেন সোয়াস্তি নেই। সব সিদ্ধান্তেই শেষ পর্যন্ত ভুল থেকে যায়। গুরুদাসবাবু এতদূর কষ্ট করে সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস মন্থন করার পরও এ কথা খেয়াল করেন নি যে দ্বন্দ্বের মধ্যেই থাকতে পারে সত্যের আভাস। সেই আভাসের ওপর পাথর চাপা দিয়ে মনের জিজ্ঞাসা শান্ত করে দেবার নামই সিদ্ধান্তে আসা। ভবিষ্যতের সাহিত্য কী হবে তা পর্যন্ত বলে দিতে চেয়েছেন গুরুদাসবাবু। এতদূর আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এমন একটি লাইনও লিখতে পারেন নি তিনি যা ঘুরে-ফিরে মনে পড়তে পারে। একটিও স্মরণীয় উপলব্ধির অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। তিনি তরুণ, কিন্তু আমাদের প্রত্যয় ও সংস্কারে ধাক্কা দিতে পারে এমন কোনও নতুন চিন্তা তিনি সাহস করে প্রকাশ করেন নি। তিনি অধ্যাপক, কিন্তু বাচালতাকে বাচালতা বলে চিনতেও তিনি পারেন না।

অজিতবাবুর বই এই সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত। তিনি সংযত বিবেকবান এবং পাঠকের ওপর তাঁর আস্থা আছে। গুরুদাসবাবুর যেমন ধারণা পাঠকেরা সব তরলমতি শিশু, অজিতবাবু তেমনি পাঠকদের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মেনে নিয়েছেন। নাটক সম্পর্কে হঠাৎ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ভাবাবেগ সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই উৎসাহের সঙ্গে একটি শঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এটা চলচ্চিত্রের যুগ, এবং বাংলাদেশে চলচ্চিত্র দ্রুত প্রগতির পথ বেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অথচ যথাপূর্ব, নাটকের অভাব এখনও এদেশে প্রকট। নাটকের ওপর চলচ্চিত্রের চিত্রধর্মিতার ও উপন্যাসের বিস্তারধর্মিতার প্রভাব ক্রমেই গভীর হবে। এবং নাট্যান্দোলনের প্রবল তরঙ্গ যদিও ফুলে ফুঁসে উঠছে তবু নাটক সম্পর্কে সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণাই প্রশ্রয় পাবে। অজিতবাবু কিন্তু এই সুযোগে নাটক সম্পর্কে কতকগুলি পরিষ্কার ও যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা আমাদের সামনে এনেছেন। পরিসরে যতটুকু কুলয়, নাটক সম্পর্কে ততটুকু স্বচ্ছ চিন্তা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, ইতিহাস অর্থাৎ প্রাচীন কতকগুলি নাটকের কুলপঞ্জী উদ্ধার করার চেয়ে তিনি নাটকের আসল সমস্যা কী, নাটকের রূপ ও রীতি, রঙ্গমঞ্চের রহস্য এ সবের ওপর আলোকপাত করেছেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় নাট্যক্লাব হয়েছে, নাট্যকারও বর্তমানে অসংখ্য এবং নাটকোৎসাহী ব্যক্তিদের তো কোন হিসাবই করা যায় না। অজিতবাবুর এই বই না পড়লে তাঁরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু পরিণত-বুদ্ধি অধ্যাপককে একটা সোজা প্রশ্ন করার দরকার আছে। স্বকীয় চিন্তার ক্ষমতা তাঁর আছে, তবু এত বেশী ধার করার কী দরকার ছিল তাঁর? আমাদের অধিকাংশ আলোচনা-পুস্তকে কোটেশন এবং নকল ছাড়া এক লাইন এগোন যায় না, এই পরাশ্রয়ী দুগ্ধপোষ্য মনোবৃত্তির অবসান কি একেবারেই সম্ভব নয়? অজিতবাবু বহু পণ্ডিতের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—তাঁদের মত বিচার করার জন্য নয়, ব্যাখ্যা ও সমর্থন করার জন্য। উদ্ধৃতি দেওয়া ও সে প্রসঙ্গে কিছু বলা, আবার উদ্ধৃতি দেওয়া আবার বলতে চেষ্টা করা—এ ছাড়া আর কোনও প্রক্রিয়া আমাদের প্রবন্ধ-লেখকরা জানেন না। অজিতবাবু একজন প্রবন্ধ লেখক মাত্র।

রথীন্দ্রনাথ রায় এ বিষয়ে অনেক স্বচ্ছন্দ। ততটা তত্ত্বঘেঁষা আলোচনা তাঁর নয় যতটা ছোটগল্পের বিখ্যাত রূপকারদের ও রচনা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। গুরুদাসবাবুর পক্ষেই রথীন্দ্রনাথ রায়ের বইখানি সর্বাগ্রে পড়া দরকার, কেন না, রথীনবাবুও ইতিহাসের ধারা বেয়ে উৎসের অভিমুখে পিছিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু কী করে ইতিহাসকে ব্যবহার করতে হয়, বাজিয়ে নিতে হয় তা তিনি জানেন এবং গুরুদাসবাবু জানেন না। বৈদিক গ্রীক সাহিত্য ও বহু দেশের পৌরাণিক, এমন কি লোক-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কি ভাবে গল্প বলার ক্ষমতা মানুষের

আয়ত্ত হয়েছে, কি ভাবে মধ্যযুগে ও রেনেসাঁসের কালে সেই গল্পে আধুনিক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য উঁকি দিতে শুরু করেছে এবং কিভাবে উনিশ শতকে ছোটগল্প তার স্বর্ণযুগে পৌঁছেছে রথীনবাবু তা অতি সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। শুধু বর্ণনাই করেন নি, এক এক যুগ ও এক এক দেশের গল্প আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যেন এক একটি অফুরন্ত রহস্যের ভাণ্ডার খুলে ধরেছেন। সেই সব ভাণ্ডারে গুহাহিত এক একটি মণিরত্নের দ্যুতি আমাদের চোখ ঝলসে দেয় যেন সে ব্যবস্থাও করেছেন। এ ছাড়া ইংরেজ, জার্মান, রুশ ফরাসী আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রখ্যাত লেখকদের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করেছেন তিনি, এবং তাঁর বক্তব্য শূন্যগর্ভ নয়। আরব্যোপন্যাস নিয়ে তাঁর আলোচনা মনে রাখার মত। এটুকু উপরি লাভ। বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে ভুল হয় নি তাঁর। তবু, এ সমস্ত কৃতিত্ব মেনে নিয়েও রথীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, যতটুকু তিনি বলেছেন, সাহিত্যের অভিধান বা বিশ্বকোষ দু-একখানা খুললে এসব কথাই সেখানে পাওয়া যাবে না কি? রথীনবাবু কি একটিও নিজের কথা বলেছেন? পাতার পর পাতা পড়তে পড়তে মনে হয়, কোনও কোনও ইংরেজী বই থেকে তুলে বসিয়ে দেওয়া। আরও এজন্য, যে রথীনবাবু সম্ভবতঃ যেসব বই ও লেখক নিয়ে আলোচনা করেছেন সেসব বইয়ের অংশবিশেষ বা সেসব লেখকের রচনাংশ পড়ে থাকবেন—পুরো বই বা রচনাসম্ভার পড়ে ওঠার বা পড়ে নিজের একটা উপলব্ধি গড়ে নেবার অবকাশ সম্ভবতঃ তাঁর হয় নি। তাঁর লেখার ভাষা স্বচ্ছ, দৃঢ়পিনদ্ধ, এলোমেলো বাক্য তাঁর রচনায় নেই। কী করে একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে হয় তা তিনি জানেন। বহু বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন স্বল্প পরিসরে সুনিপুণ-ভাবে। কিন্তু বক্তব্যগুলি আদৌ তাঁর নিজের নয়। উদ্ধৃতি তাঁর বইয়ে কম, রচনাংশই বেশী। কিন্তু সেই রচনাংশগুলি অভিজ্ঞ লেখকের হাতের অনুবাদ বলেই মনে হয়।

॥ ২ ॥

গুরুদাসবাবু বলেছেন আদিম যুগে জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনেই শিল্পকলা ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়নি তখনও, কিন্তু জাদুবিদ্যাই তখনকার দিনের বিজ্ঞান। শিল্পকলা ও সাহিত্য এই জাদুবিদ্যারই অঙ্গীভূত। তারপর সমাজ এগিয়েছে, জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে, মানুষের প্রয়োজনবোধ ভিন্ন রূপ নিয়েছে। অতএব সাহিত্যরচনার পরিবেশ পালটে গেছে, সাহিত্যের কাছে মানুষের দাবী ভিন্ন রক[ম] হয়ে গেছে। অতএব সাহিত্যের বিকাশ উৎসমুখে আবদ্ধ না থেকে অবাধ হতে পেরেছে। তার ফ[লে] যে কোনও বিকাশবান জিনিসই যেমন পরিবেশের দ্বার[া] প্রচুর প্রভাবিত হয়েও তার বিকাশের একটা নিজস্ব নিয়[ম] খুঁজে নেয়, সাহিত্যও তেমনি নিয়েছে। স্থান ও কা[ল] সাহিত্যের বিকাশের অতি-আবশ্যক জিনিস, কি[ন্তু] তার চেয়ে কম আবশ্যক নয় সাহিত্যের নিজ[স্ব] শিল্পকৌশল, তার অন্তঃপ্রেরণা। আবার এই সম[স্ত] মিলে গড়ে ওঠে সাহিত্যের সামগ্রিক ঐতিহ্য, সে ঐতিহ্য প্রভাবিত করে পরবর্তী যুগের সাহিত্যকে এই কথাগুলিই একবার প্রথমে এবং আর একবা[র] 'শিল্পের চতুরঙ্গ' অধ্যায়ে বলেছেন। ইতিমধ্যে মানুষের সমাজের বিকাশধারা, সাহিত্যের বিকাশধার[া] সভ্যতার বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা ক[রেছেন] তিনি, মৃত্যু ও পুনর্জন্মতত্ত্ব নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষ[ণা] করেছেন, সূর্য-গৌরী কথা তথা ছড়ামালা নি[য়ে] আলোচনা করেছেন এবং নিতান্ত আপত্তিজন[ক] ভাবে অজস্র দীর্ঘবিলম্বিত উপমা ব্যবহার করেছে[ন] যেমন—"একটু একটু করে প্রদীপ নিভে যায়, এ[কটু] একটু করে রাত শেষ হয়। ভোর আসে। আকা[শ] প্রদীপ সূর্য থেকে নেমে আসে আলোর শিখা সা[দা] ঢেউ তুলে। সবুজের ওপর পড়ে, সবুজ হয়; নী[লের] ওপর পড়ে, নীল হয়; কালোর ওপর পড়ে, আলো হয় (পৃঃ ৬৮)। এই একঘেয়ে ও বাসী উপমা ব্যব[হার] পরিণত মানসের লক্ষণ নয়।

বইয়ের শুরুতেই গুরুদাসবাবু একটি গল্প দিয়েছে[ন] ভৃগুর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের গল্প। গল্প শেষ করেই গুরুদাস বলছেন: "ব্রহ্ম অর্থে যদি মানুষের জীবন বুঝি, তবে বিদ্যা বা তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও মূল স্বরূপ আমা[র] কাছে স্পষ্টতর হয়।" ব্রহ্ম অর্থে মানুষের জীবন বোঝা

কার তাঁর নেই, কেন না তৈত্তিরীয় উপনিষদে তা ানো হয় নি। এবং মানুষের জীবন ও ব্রহ্ম সমার্থক ধরলে যদি এই ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বের মূল স্বরূপ স্পষ্টতর হয় তাঁর কাছে, তবে এই গল্প ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে ায়ের চেয়েও বেশী হয়েছে।

"সাহিত্যের রূপকলা", "সাহিত্যের বিচারণা", "বাঙলা ইত্য: মানচিত্র ও মানসচিত্র", "সমকালীন বাঙলা হিত্য" ইত্যাদি কয়েকটি মামুলী অধ্যায় এ বইয়ে দাসবাবু যোগ করেছেন। যে বক্তব্যের ওপর বই- নিকে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তা শেষ হয়ে ছে "শিল্পের চতুরঙ্গ" অধ্যায়ে এসেই। সেই বক্তব্যের টি দিক আমাদের নিঃসন্দেহে ভাল লেগেছে। তা এই সাহিত্যের বিকাশের বা সাহিত্যসৃষ্টির নিজস্ব কগুলি নিয়মও যে আছে তা তিনি স্বীকার করেছেন। হিত্যকে পুরোপুরি সমাজ-নিয়ন্ত্রিত বলে তিনি রায় দেন । মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে যে পরিমাণ আস্থা তাঁর আছে াতে এমন রায় দেবার আশঙ্কা প্রতি পদেই করেছি। াশঙ্কা সফল হয় নি বলে তাঁকে ধন্যবাদ।

॥ ৩ ॥

অজিতবাবুর মতে নাট্যকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় জীবনের সই সব বিক্ষোভ দ্বন্দ্ব আকস্মিক আঘাতের ওপর, যা ীবনের স্বরূপকেই অনাবৃত করে দেয়। কিন্তু এসব তাঁর াটকের উপাদান মাত্র; নাটকের নিজস্ব রীতিনীতির ভতর দিয়ে এগুলিকে চোলাই করে নিতে হয়। এই চালাই করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে গতিবেগ সংঘাত আকস্মিকতা নাট্যোৎকণ্ঠা নাট্যশ্লেষ কাহিনী চরিত্রসৃষ্টি, ংলাপ ইত্যাদি জিনিসের ওপর। এই জিনিসগুলি যে আসলে কী, কিসে কী বোঝায় তা অজিতবাবু সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। ট্রাজেডি ও কমেডি সম্পর্কেও প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন তিনি। তিনি লিখছেন: "ট্র্যাজেডি-লেখক জীবনকে দেখেন গভীর দৃষ্টি দিয়ে, কিন্তু কমেডি-লেখক জীবনকে দেখেন তির্যক দৃষ্টি দিয়ে। ট্রাজেডি-লেখকের কাছে জীবনের বহিরাবরণ মিথ্যা, অন্তর্জগৎই সত্য, আর কমেডি-লেখকের কাছে অন্তর্জগৎ অকারণ, বহিরাবরণই একমাত্র প্রয়োজনীয়। অন্তর্জগতে মানুষ একা আর বহির্জগতে মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিচিত্র। এই একা মানুষের পরিচয় পাই ট্রাজেডিতে আর বিচিত্র মানুষের পরিচয় পাই কমেডিতে।" (পৃঃ ৭৩) এমন ধরনের ছাত্রপাঠ্য উক্তি কেন করেছেন অজিতবাবু পাতার পর পাতা, সে প্রশ্ন নিরর্থক; কেন না প্রকাশক জানিয়ে দিয়েছেন যে এই সিরিজের সমস্ত বই-ই ছাত্রদের জন্য অধ্যাপকদের দিয়ে লেখানো হয়েছে। কিন্তু অজিতবাবুকে এটুকু মনে রাখতেই হবে যে এই ধরনের সরল কিন্তু ভুল উক্তি করা ছাত্রপাঠ্য বইয়ে আরও বিশেষ করেই অনুচিত। যে অন্তর্জগতের কথা তিনি বলেছেন তা বহিরঙ্গ জীবনেরই উলটো পিঠ মাত্র। অন্তর্জগতের যে সব কারবারী নাটক রচনায় নেমেছিলেন, তাঁদের নাটক নাটকরূপে বিশেষ সফল হয় নি এ কথা অজিত- বাবু নাটকের কয়েকটি "রূপ ও রীতি" অধ্যায়ে সাঙ্কেতিক ও অভিব্যক্তিবাদী নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন। সুতরাং সার্থক ট্র্যাজেডি-লেখকরা মূলতঃ অন্তর্জগৎ-বিলাসীদের মধ্যে পড়েন না। অন্তর্জগতে বাস করতে যিনি শিখেছেন তিনি কখনও একা নন, তিনিই বরং শুনেছেন সর্ব বিশ্বের আমন্ত্রণ। তিনি উপলব্ধি করেছেন সকল প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় যোগ। বহিরঙ্গ জীবন-নির্ভর যে প্রাণজগৎ তারই বিপুল অথচ আকস্মিক আলোড়নের কথাই অজিতবাবু বলতে চেয়েছেন। প্রাণিক কামনার বিপুলতা ও বিস্ময়করতা, তার বিরাট ব্যর্থতা ও হতাশা— এসবকেই অন্তর্জগতের রহস্য বলা হয়ে আসছে এতদিন। অজিতবাবুও তাতে সায় দিয়েছেন। কোটেশন- নির্ভরতার বিপদই এই যে, উক্তিকে যাচাই করে নিতে তা শেখায় না।

অজিতবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয় এই কারণে যে আপাত-বিরোধিতার মধ্যেই যে সত্যের আভাস ধরা পড়ে এ কথা তিনি বোঝেন। 'সামাজিক জীবনে নাটকের প্রভাব' দেখিয়েই তিনি যখন নাটকের ওপর সামাজিক জীবনের প্রভাব দেখান, নাট্যকারের শিল্পীসত্তা ও সামাজিকসত্তার বিরোধগুলি দেখাতে থাকেন, তখন মনে হতে থাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে, আর তা স্বাভাবিকও হবে। পরকে চিরজীবন সমর্থন করে চলার দায়িত্ব থেকে বাংলা মননশীল সাহিত্য এতদিনে মুক্ত হয়ে উঠছে। অজিতবাবুর পরের

বইয়ে আমরা তাঁর নতুন অথচ স্বকীয় ভূমিকাই দেখব আশা করি।

॥ ৪ ॥

রথীন্দ্রনাথ রায় ছোটগল্পের স্বরূপধর্ম, ছোটগল্পের রূপকর্মের বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিন্যাস, ছোটগল্পের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের কতখানি যোগ, সাময়িক পত্রিকার ওপর ছোটগল্প কতখানি নির্ভরশীল, ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়েও অলোচনা করেছেন। ছোটগল্পের স্বরূপধর্ম কী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: ছোটগল্পের লেখক জীবনমথিত বিষামৃত পরিবেশন করেন, মর্ত্য-জীবনের রূপময় ভাষ্য তিনি রচনা করেন। ছোটগল্প নীতি-উপদেশের ধার ধারে না, জীবনের সপ্ততাল ভেদ করে জীবনরহস্যকেই ব্যঞ্জিত করে তোলে। প্রাচীন যুগের গল্পের সঙ্গে আধুনিক ছোটগল্পের অনেক পার্থক্যের মধ্যে একটি এই যে, প্রাচীন গল্পগুলি সবই প্রকারান্তরে লোককথা। কিন্তু আধুনিক ছোটগল্প লেখকের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তাঁর নিজস্ব কলাকৃতির সংযোগে গড়ে ওঠে। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য এই যে, ছোটগল্প বিস্তৃত জীবনের মন্থরপ্রবাহের (উপন্যাসের যা উপজীব্য) ভিতর থেকে দু-একটি ভাসমান মুহূর্ত, একটি উজ্জ্বল ঘটনা বা দু-একটি নির্বাচিত ভাববৃত্তকে অবলম্বন করবে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সংহতিতে ও একমুখী পরিণতিতে। বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনায়, তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়ে তোলায় ছোটগল্পের সার্থকতা। তারপর তিনি বলছেন, এসব নাকি ছোটগল্পের বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য, মূল বৈশিষ্ট্য জানতে গেলে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু সেই গভীরে প্রবেশ করে রথীনবাবু নতুন কোনও কথাই আবিষ্কার করতে পারেন নি, বরং কতকগুলি অদ্ভুত ভুল উক্তি করেছেন। যেমন একটি— "আয়তনের দিক থেকে ও বহিরঙ্গ বিচারে ছোটগল্প 'a slice of life'-এরই কাহিনীরূপ, কিন্তু রস পরিণামের দিক থেকে এই কৃশকায় গদ্যকাহিনী জীবনের সমগ্র রূপকেই প্রকাশ করে।" কথার তোড়ে ভেসে না গেলে রথীনবাবু জীবনের সমগ্র রূপ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আর একটু সচেতন হতেন। তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন জীবনের একটি গভীর সত্যকে প্রকাশ করে—বিন্দুতে সিন্ধুর কথাই তাঁর বক্তব্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় আপত্তি এই যে, এই সব চিরাচরিত একঘেয়ে কথাই রথীনবাবু আমাদের বরাবর শুনিয়ে গেছেন। ছাত্রদের পক্ষে তাঁর আলোচনা হয়তো উপযোগী হবে, কারণ রথীনবাবুর লেখায় পয়েণ্ট আছে—অবান্তর কথা তিনি এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু রথীনবাবুর নিজের কথা কোথায়?

"রূপকর্মের বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ" অধ্যায়টি সুলিখিতই নয়, রথীনবাবুর নিজস্ব বিচারশক্তির পরিচয়ও এখানে পাই। ছোটগল্প রচনার টেকনিক সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন তিনি এখানে। বইয়ের শেষের দিকের এই অধ্যায়গুলিতে রথীনবাবুর আর একটি কৃতিত্ব সানন্দে লক্ষ্য করেছি। বিদেশী লেখকদের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী লেখকদের গল্প তিনি পাশাপাশি রেখে নানা প্রসঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছেন। পরিসর ব্যাপক হলে রথীনবাবু আরও বেশীদূর এ রকম আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন এবং যেহেতু এর প্রয়োজন আছে ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে সে রকম কোন বিস্তৃত আলোচনা আশা করব।

সর্বশেষে প্রকাশক মহাশয়ের পরিকল্পনাকে ধন্যবাদ। তবে একটি কথা এই যে আলোচনা-পুস্তক মাত্রেরই জন্য অধ্যাপক মশাইদের দ্বারস্থ হবার অভ্যাস ছাড়ার সময় আশা করি এসেছে। বিদগ্ধ ও গুণীজন নির্বাচনে শুধুমাত্র অধ্যাপকদের মুখ চেয়ে থাকবার সনাতন রীতি অনুসরণ না করলেই হয়তো ভাল হত। যাই হোক, এই সিরিজের পরবর্তী বইগুলি প্রকাশিত হলে সাহিত্যালোচনার একটি অভিনব—হয়তো নির্ভরযোগ্য বইয়ের সেট বাংলাভাষায় তৈরি হবে বলে আশা রাখি।

—পবিত্রকুমার ঘোষ

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬
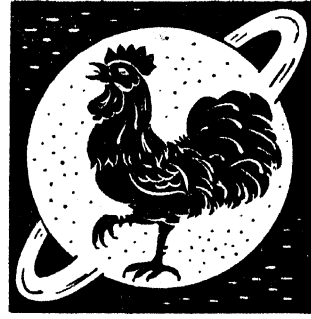
সংবাদ-সাহিত্য

৫২০৫

অশ্বমেধ যজ্ঞ

গোপালদা লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, জায়ান্ট বা দৈত্যদের দিন আর নাই। যেদিকেই চাও বে পিগমি অর্থাৎ বালখিল্যদের রাজত্ব। কাজেই রা আজ হাজার চেষ্টা করিলেও শাস্ত্রোক্ত অশ্বমেধ র উপযুক্ত অশ্ব কোথাও পাইবে না; ওয়েলার রা এ দেশ হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে। যদি কোনও ল কোনারকের সূর্যমন্দিরের শিলীভূত অশ্বটিকে পুনঃ-বিত করিতে পারিতে তাহা হইলেও কথা ছিল। ম-স্ট্যাচুর ঘোড়াটাও আর বহাল তবিয়তে নাই, চ্যুত ও গুদামজাত করিবার সময় তাহার একটা ঠ্যাং হইয়াছে, শুনিয়াছি। যজ্ঞের জন্য নিখুঁত বেদাগ চাই। সুতরাং যুগধর্মকে মানিয়া লইয়া তোমাদিগকে সাধ ঘোলে মিটাইতে হইবে, অশ্বের অভাবে অশ্বতর ই কাজ সারিতে হইবে। তবে তোমাদের বর্তমান জাতীয় দুর্গতি নিবারণের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ একটা ই। অশ্বতরও তো অশ্ব।

প্রশ্ন করিতে পার, কী হইয়াছে দাদা যে হঠাৎ একটা আয়োজন করিতে হইবে? বৎস গোপাল, এই সঙ্কটকালে ইহাই বিধান। সম্রাট পরীক্ষিৎ অত্যন্ত য়ে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ আজও অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। কেন, দেখ নাই, যুদ্ধ মহামারী আত্মঘাত অর্থাৎ কম্যুনাল রায়ট ইত্যাদি ঘটিতে থাকিলেই সনাতন ধর্মের পাণ্ডারা এখনও তোমাদের গিরিশ পার্কে সর্পযজ্ঞ করিয়া থাকেন। জ্যান্ত সাপ আজকাল দুর্লভ বলিয়া, অধিকন্তু কলিকাতার মত জনবহুল শহরে চিড়িয়াখানার নিরাপদ চৌহদ্দি ছাড়া অন্যত্র জীবন্ত সর্পের আমদানি অতিশয় বিপদসঙ্কুল বলিয়া, তাঁহারা মৃত সর্পের চবি দিয়া সে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তোমরাও অশ্বমেধের পরিবর্তে সর্পমেদ যজ্ঞ করিতে পারিতে। কিন্তু আজকাল সর্পমেদমিশ্রিত হবিঃও দুর্লভ হইয়াছে। চীনা-বাদাম, ভেরেণ্ডার বীজ, শিমুল বীজ ও পচা নারিকেল-শাঁসের বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও বৈদিক যজ্ঞোপযোগী আমিষ গুণটি নাই।

তাহা ছাড়া, তোমাদের বর্তমান বিপত্তিতে অশ্বমেধ যজ্ঞই প্রশস্ততম ব্যবস্থা। রামায়ণ-মহাভারতের নজির আছে। রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় যখন আসল রামরাজ্য প্রবলবেগে চালু হইয়াছে তখনই প্রজাদের মনে সংশয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস এমনই ক্রুর-কঠিন হইয়া উঠিল যে রামচন্দ্র আর সন্তানসম্ভবা সীতাকে ঘরে রাখিতে পারিলেন না; অনুজ লক্ষ্মণ তাঁহাকে সরযূ পার করাইয়া, সরযূর জলে কলঙ্কিত হাত ধুইয়া ঘরে ফিরিলেন। রামের মনের অশান্তি আর বুকের দীর্ঘশ্বাস সারা রাম-রাজ্যের উপর করাল ছায়া বিস্তার করিল। সর্বজ্ঞ রামচন্দ্র

এই মহা-অকালকেই অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত কাল বিবেচনা করিলেন। মহাভারতের দৃষ্টান্ত তোমাদের পক্ষে আরও বেশী খাটে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর স্বজন-হননের মহাপাপ ক্ষালনের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সমর্থনে পাণ্ডবেরা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষে পুরুষ প্রায় নাই। সর্বত্র পিতা-স্বামী-ভ্রাতা-পুত্রহারা নারীদের হাহাকার। তবু যতদিন পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শুইয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে শান্তির উপদেশ দিতেছিলেন, সকলে শান্ত হইয়া ছিলেন। ভীষ্মের দেহত্যাগের পর ধৃতরাষ্ট্র-যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবগণ তাঁহার তর্পণান্তে শোকে মুহ্যমান হইলেন। যুধিষ্ঠির বনে যাইতে চাহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র মরণ কামনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যজ্ঞ কর। মহামুনি বেদব্যাস অশ্বমেধ যজ্ঞের পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশেষে বলিলেন, মহারাজ, আপনার আরব্ধকার্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই, সকল শত্রুও আপনার বিজিত হয় নাই। কারণ আপনার অন্তরের অহংবুদ্ধি-রূপ শত্রুকে আপনি এখনও দেখিতে পান নাই। আপনি বাহিরে যে সকল দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহা উপেক্ষা করিয়া মনের ভিতরকার সেই অহংবুদ্ধির সহিত সংগ্রাম করুন। এই সংগ্রাম একার, ইহাতে অনুচর-বন্ধুর, অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন নাই। নিজের মনকে যে বশীভূত করিতে না পারে তাহার দুর্গতির শেষ নাই। আপনি শোক সংবরণ করুন, নিহত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের শোকে অধীর না হইয়া, কামনাবিরহিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। ব্যাসদেব এই সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র ও দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-পুত্র ভরত-অনুষ্ঠিত অশ্বমেধের কথা বলিলেন। রাজসূয়-যজ্ঞের ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিপন্ন যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন।

তোমাদের বর্তমান অবস্থায় অশ্বমেধের সমীচীনতা, যজ্ঞের প্রস্তাবনায় অনুজদের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের উক্তিতেই প্রমাণিত হইবে। উক্তিটি সংক্ষেপে এই :—পুরাকালে প্রজাপতি কর্দমের পুত্র বাহ্লীশ্বর শ্রীমান্ ইল নামক মহাবলশালী পৃথিবী-বিজয়ী প্রজারঞ্জক এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মনোরম চৈত্র মাসে ভৃত্য-সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় গেলেন। অরণ্যমধ্যে দুর্ধর্ষ পর্বতের এক ঝরনায় পার্বতীর অভিলাষানুযায়ী দেবাদিদেব হর নারীরূপ ধরিয়া জলকেলি করিতেছিলেন। সেই পরিবেশের প্রভাবে আসা মাত্র মহারাজ ইলও নারীতে রূপান্তরিত হইলেন। স্ত্রীযোনীপ্রাপ্ত বিপন্ন ইল দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব বলিলেন, পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত শোকার্ত রাজা অন্য বর চাহিলেন না। ইল পার্বতীর অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। তিনি বলিলেন, মহাদেব ও আমি উভয়ে মিলিয়া এক ইউনিট, আমি হাফ, তোমাকে হাফ পুরুষত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। রাজা সেই বর লইলেন ও একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রীমূর্তিতে ইল ও ইলা হইয়া নানা কেলেঙ্কারি করিতে লাগিলেন। ইলার প্রতি কামার্ত বুধ মেয়ে দেখিলেই কিম্পুরুষরমণী বানাইয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, সারা দেশ কিম্পুরুষরমণীতে ছাইয়া গেল। মহারাজ ইল মহা-ফাঁপরে পড়িলেন। তিনিও মুনি-ঋষির বংশধর। তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য বুধ ভার্গব, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, কাশ্যপ-পুত্র প্রমোদ, এমন কি দুর্বাসাও আসিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত ইলের পিতা মহাতেজস্বী কর্দম মুনিও আসিলেন। গুরুতর পরামর্শ-সভা বসিল। কর্দমই পথ বাতলাইলেন, বলিলেন, বৃষভধ্বজ দেবাদিদেবের তুষ্টি ব্যতিরেকে আমি ইলের উদ্ধারের আর উপায় দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞই মহাদেবের একান্ত প্রিয়, সুতরাং আমাদিগকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। মহাসমারোহে যজ্ঞ হইল। ইল সৈন্য-সামন্ত-ভৃত্য সহ পুরুষত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই প্রসঙ্গ রামচন্দ্রকে দিয়া ইহা বলাইয়া শেষ করিয়াছেন :

> ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো হি নরর্ষভৌ।
> স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যেন বাহ্লীপতিঃ পুরা॥

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয় (অর্থাৎ ভরত ও লক্ষ্মণ), অশ্বমেধ-যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব যে পুরাকালে বাহ্লি-দেশাধিপতি ইল স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াও [পুনরায়] পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

ভায়া হে, তোমাদের দেশে আজ আর পুরুষ বড় নাই, সবই কিম্পুরুষ। কাহার বা কাহাদের পাপে এবং অভিশাপে সমগ্র জাতির এই দুর্গতি ঘটিল সে গবেষণায় এখন আর লাভ নাই। কি করিয়া আবার পুরুষত্বে জাতি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার সাধনাই করিতে হইবে। সুতরাং

...মেধ বিকল্পে অশ্বতরমেধ যজ্ঞ এখন একমাত্র কর্তব্য। ...রই আয়োজন কর।

...প্রশ্ন করিতেছ অশ্বতর কোথায় পাইবে? অশ্ব হইলে ...একটিতেই কাজ হইত। কিন্তু অশ্বতর চাই ...ক। দুই-দশটা তোমাদের কাছাকাছিই আছে। ...শুধু তাহাদের ধরিয়াই কাজ হইবে না। সমগ্র দেশে ...দশিক অশ্বের সংযোগে দেশীয় গর্দভদের দ্বারা যেথানে অশ্বতর পয়দা হইয়াছে এই যজ্ঞে তাহাদের সকলেরই ...য় টিকিট মারিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট ...য়ের পূর্বে এই অশ্বতরবাহিনীসহ দিগ্‌বিজয়-পরিক্রমা ...প্ত করিয়া যজ্ঞস্থলে হাজির হইতে হইবে। তাহার পর ...ধুমধামের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান। এই যজ্ঞ পরিপাটিভাবে ...াদন করিতে পারিলেই তোমাদের শাপান্ত, তোমরা ...বার পুরুষত্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বৈদিক অশ্বমেধযজ্ঞমন্ত্র দিয়া অশ্বতরমেধযজ্ঞ করা ...লবে কি না এ প্রশ্ন করিতে পার। অগত্যা চলিবে। ...মচন্দ্র ১৮৭৩ সনের জুলাই মাসে গর্দভ-স্তোত্র রচনা ...রিয়াছিলেন। এ দেশে তখন গর্দভ অনেক ছিল, অশ্বতর ...টিও ছিল না। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও কিছুকাল পরে ...শশতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রথমে গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা বা ...জনগন্ধার মত একটি-দুটি এবং পরে ব্যাঙের ছাতার ...৫ কাতারে কাতারে তাহাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে থাকে। ...ভেরা প্রায় সকলেই অশ্বতরের জন্ম দিয়া বিদায় ...য়াছে সুতরাং আজ আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিলে ...লবে না—

'হে গর্দ্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণসকল ...জন করুন।

আমি বহু যত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল ...ইতে, নবজলকণানিষেকস্নুরভি তৃণাগ্র-ভাগ সকল ...হরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে ...হণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদনপূর্ব্বক আমার প্রতি ...পাবান হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; ...ন না, আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে ...খব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া; নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।'

আজ অশ্বতরে-অশ্বতরে সারা দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ইহাদের দুই শ্রেণী—প্রকট এবং অপ্রকট। অপ্রকটেরাই বিষম। উভয় শ্রেণীই ঘরের কাঁটাগুল্ম খায় এবং পরের বোঝা বহন করিয়া থাকে। পরের সহিত ঘরের বিবাদ বাধিলে ইহাদের দ্বারা ঘরের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই অশ্বতরমেধ যজ্ঞের একান্ত প্রয়োজন। ইহারাই দুর্গম পার্বত্য পথ অবলীলাক্রমে পার হইয়া পরের বিষ-বড়ি ঘরে পাচার করিয়া থাকে। অশ্বতরমেধ যজ্ঞ হইলে এ বিপদও নিবারিত হইবে।

ইহাদের আদিস্থান কোথায় তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়ো না। আর্যদের আদি জন্মভূমির মত ইহাদেরও উৎপত্তিস্থান লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন—ব্যাভেরিয়ার অরণ্য, কেহ বলেন—উরাল পর্বতমালার পশ্চিম উপত্যকাভূমি, আবার কেহ বা বলেন—গোবি-মরুভূমির উত্তরপূর্ব প্রত্যন্তদেশ। আদিতে যাহাই থাকুক, আজ অশ্বতরে অশ্বতরে তারতম্য ঘটিয়াছে। একদল জন্মভূমির কল্যাণ করে, আর এক-দল দেশের সমূহ অকল্যাণ ঘটাইয়া থাকে। তাহারা ভিন্‌দেশের বোঝা বয়। তোমাদের 'কী-বিচিত্র এই দেশে' শেষোক্ত শ্রেণীই প্রবল। অশ্বতরমেধ যজ্ঞ হইলে প্রকট-অপ্রকট উভয় শ্রেণীই অপ্রকট হইবে। তোমাদের সঙ্কট-মুক্তির অন্য পন্থা নাই।"

মহাচীনের প্রতি

গোপালদা এই সঙ্গে একটি কবিতাও পাঠাইয়াছেন, শিরোনামা দিয়াছেন "মহাচীনের প্রতি"। মনে হয় আমাদের গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "আলো নিবে যায়"-এর কবি যেন এই সুনিবিড় তমিস্রায় একটু আলোর সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি এতদিন পূর্বোত্তর সীমান্তে লংজুতে ছিলেন বলিয়াই জানিতাম, এবারকার খামের উপরে দেখিতেছি লাডাকের ডাক-চিহ্ন। অর্থাৎ তিনি হত্যা ও হরণের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও শান্তি ও প্রেমের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কবিতাটি এই:

সর্বধ্বংসী পশুবল মানুষের নয় শেষ কথা ;
ওগো পুরাতন বন্ধু, মনে কর গত ইতিহাস।
চেঙ্গীজ-তৈমুর কবে শুনাইয়া গেছে সে বারতা—
ভয়ের প্রতীক তারা। লাওৎসে ও কনফুসিয়াস
বিরাজে তাদের উর্ধ্বে—তারো উর্ধ্বে মানুষের ব্যথা
প্রশমিতে ত্যাগে-তপে অমিতাভ বুদ্ধের প্রয়াস।
সবই জানো, তবু তব জড়াশ্রয়ী শক্তি-প্রমত্ততা
তোমারে করিয়া অন্ধ ঘটাইছে তব সর্বনাশ।

পশ্চিমে নয়ন মেলে হের কোথা হের্ হিটলার্,
রোম-রাজপথে কারা মুসোলিনী-মুখে নিষ্ঠীবন
ঘৃণায় করিল ত্যাগ ? স্টালিন-বেরিয়া সমাচার
মনে কি পড়ে না বন্ধু, চিয়াংকাইসেক-নির্বাসন!
অন্ধকারে লুপ্ত গুপ্ত—বিংশ বর্ষ হয় নাই পার,
থমকি দাঁড়ায়ে কর ক্ষণকাল অতীত-চিন্তন ॥

* * *

বুদ্ধ-জরথুস্ত্র খ্রীষ্ট-লাওৎসে ও কনফুসিয়াসের—
হৃদয়-মন্দিরে সবে করিছে আজিও পূজারতি ;
মাটির ঢিবিতে ঢাকা পরিণতি মানব-দম্ভের,
থামাতে পারে নি কেহ একচুল মহাকাল গতি!
মহতেরি বাণী হয় একান্ত আশ্রয় মানুষের
স্মৃতি তার বিভীষিকা রাজ্যলোভে যেবা হত্যাব্রতী।
টেনো না, টেনো না তুমি প্রাণহন্তা প্রেতেদের জের,
অস্ত্র নয়, মৃত্যু নয়—নিয়ে এসো প্রেমের ভারতী।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ দিনে হয় শেষ,
কালের তুষার স্তূপে বহু দম্ভ লভেছে সমাধি ;
"বুদ্ধের শরণ লই"—আকাশে-বাতাসে তার রেশ
এখনো ভাসিছে শোন, আলো আনো, এনো নাকো আঁধি।
আবার মিলিত হোক প্রেমে ধর্মে দুই মহাদেশ—
জড়ত্বের আস্ফালনে হইয়ো না আত্মার বিবাদী ॥

ফাঁকা নাচ, না, বাঁকা উঠান ?

গত ২২ নবেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু দিল্লীতে জামিয়া গ্রামীণ ইনস্টিট্যুটের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন :

"ইংরেজী শিক্ষা দেশকে অনেক ভাল জিনিস দিয়াছে কিন্তু ইহার একটা কুফল হইল, সমাজের শিক্ষিতগণ ইহার ফলে নিজেদের উচ্চতরশ্রেণী ভাবিতে শিখিয়াছে। এই প্রশ্নটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেই, যাহাতে শিক্ষিতদের মধ্য হইতে এই আত্মম্ভরিতার মনোভাব দূর হইতে পারে। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কায়িক শ্রমিকদের ঘৃণা করিতেছেন।"—পি. টি. আই.

অর্থাৎ সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠের পরও সীতা রামের বাবাই রহিয়া গিয়াছেন এবং গান্ধীমহারাজ-নেহরুজী-বিনোবা-জয়প্রকাশ-তুলসীজীর কণ্ঠে কণ্ঠে এত মন্ত্রোচ্চারণ এবং পদে পদে এত পদচারণ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে তিমিরে সে তিমিরেই পড়িয়া আছে। স্বাধীনতা-লাভের পর গত বারো বৎসর ধরিয়া শ্রীনেহরু ও শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতবর্ষকে কী শিখাইলেন ? কলকাঠি তো তাঁহাদের হাতেই ছিল। কিন্তু আসলে ভূত যে সরিষার মধ্যেই আত্মগোপন করিয়া আছে, শ্রীনেহরু সে কথাটা ভাবিতে পারেন নাই। ইটন-হ্যারো-কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের মহিমায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুরাই যে ভুলিয়াছিলেন তাহা নহে, জওহরলাল নেহরুরাও এখন পর্যন্ত ভুলিয়া আছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচাইতে লোভনীয় চাকরিগুলি অর্থাৎ বিদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের বড়-ছোট কর্তার পদ এখনও ইটন-হ্যারোর শিক্ষা অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইংরেজী বুলি কপচানোর উপরেই নির্ভরশীল। কাজেই সমগ্র ভারতের ইংরেজীওয়ালা সম্প্রদায় পুত্রকন্যাদের অ্যাম্বাসাডর করিবার লোভে শৈশব হইতেই ইংরেজ-আমলের চাইতেও আরও বেশী সাহেব করিয়া তুলিতেছেন, নেটিবত্বের প্রতি ঘৃণা পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শ্রীনেহরু নিজের ফাঁকা নাচের দোষ না ধরিয়া বাঁকা উঠানের দোষ ধরিতেছেন। অপরাধ এদেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নহে, নেহরু-রাজেন্দ্রপ্রসাদদের চাকুরিপ্রসাদ বণ্টনের। মাত্র তেরো বৎসর কম এক শতাব্দী পূর্বে বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইংরেজী শিক্ষিতদের সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছিলেন :

"আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত

লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে া ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা া জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা াঙালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সম্ভাবনা নাই।"

় যে কারণে শ্রীনেহরুর এত দুঃখ, তাঁহার জন্মের াঠারো বৎসর পূর্বে সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যথিত লেন এবং নিজে ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতির না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার বিলোপ কামনা করেন তিনি বলিয়াছিলেন:

ক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। ণ্রণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং দিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক জন্মিতেছে।"

নহরু স্ব-শাসিত দেশে স্ব-আদর্শের বিপরীত কিছু ই অভিমান করেন। নিজের কৃতকর্মের লজ্জা র জন্য পরের উপর বদজোবান ছুটাইতে থাকেন, খ আসে বলিয়া বসেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া সকল বেচনা করিয়া কথা বলিবার অবসর তাঁহার ? বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে আমি ঘরের কথা রিব কখন। আজ তিনি সত্তর বৎসর বয়সেও ঠোঁট-না বুড়ো খোকা। বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র চৌত্রিশ বৎসর নিম্নোদ্ধৃত নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, লিখিতে পারিয়া-তিনি সর্বদা দেশের কল্যাণ চিন্তা করিতেন বলিয়া। আসলে বিশ্বজগৎ বা ইণ্টারন্যাশনাল পলিটিক্স া, তিনি "বন্দে মাতরং" বলিয়া স্বদেশবাসীকে করিতে পারিয়াছিলেন। আজ সেই চিন্তাশীল কথাগুলি একটু প্রণিধান করিয়া দেখা দরকার। হালী বালখিল্যদের কথায় বিচলিত হইলে আমাদের চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন:

"আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে,...আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।...এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনই বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্ম একটি আবেগ উপস্থিত হইত।" এই নায়কের পরিণতি-বিষয়ে অজ্ঞ অমল হোমও সেই আবেগবশেই বিগত শারদীয় 'যুগান্তরে' ঠাকুরদা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্বলভিত্তি মিথ্যার উপর বিগত ১৫ই নবেম্বরের রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' সত্য-বন্দুকের একটি গুলি ("বাকল্যাণ্ড ব্রিজের গল্প") নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রথমটা আমরা সত্যই অমল হোমের এই নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়ে"র অমল ও শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র উপেন যদি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলেও আমরা এতটা বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু "বাকল্যাণ্ড ব্রিজের গল্প" আদ্যোপান্ত পড়িয়া বুঝিলাম রবীন্দ্র-চরিত্রকে গালগল্পচ্ছলে হীন করার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যদি কেহ অন্ততঃ এই বৎসরে প্রতিবাদ না করিত, যদি "কেবল নিতান্ত আলস্য-বশতঃ এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ না করিত" ("ঠাকুরদা"—একখণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ' পৃঃ ৩০২) তাহা হইলে ঘোরতর অন্যায় হইত। বয়সের বিচারই যদি একমাত্র বিচার হয় তাহা হইলে ৭৯র চাইতে ৯৯ নিশ্চয়ই অধিকতর সম্মানার্হ। শ্রীঅমল হোম গুরুজন-দূষণ-অপরাধ স্কন্ধে লইয়াও যে জাতীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন এজন্য সকলের ধন্যবাদার্হ।

নাম-মাহাত্ম্য

শ্রীমান্ গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই বৎসরের আকাদামি-পুরস্কার লাভ করাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তবে তিনি যদি মনে করেন রচনার উৎকর্ষ-বিচারে তিনি পুরস্কৃত হইয়াছেন তাহা হইলে ভুল করিবেন। দিল্লীর মা সরস্বতী প্রেমেন কাত বা গজেন মাত হইবার মত সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্না নহেন। হইলে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি গজেন্দ্রকুমারের অগ্রণী হইতেন। গজেন্দ্র বিজয়ী হইয়াছেন নামমাহাত্ম্যে। কিছুকাল পূর্বে কেশকায়-শাসিত চলচ্চিত্র বিচারে কার-ভাগান্ত 'ছেলে কার' এই নাম-মাহাত্ম্যে যেমন পুরস্কৃত হইয়াছিল তেমনি প্রেমেন্দ্রের কাব্যটি 'সাগর থে কেফেরা' (অর্থাৎ The sea was infidel or faithless—সমুদ্র আছিল বিধর্মী) এবং রাজশেখর বসুর আনন্দীবাঈ (খাঁটি হিন্দী নাম) নাম-মাহাত্ম্যেই বাজিমাত করিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেল্লা ফতে', পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে', কাহার যেন 'একদম বাঁধকে—জেনানা হ্যায়', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রাণীপসন্দ' ইত্যাদি শুধু টাইম-বারড্ বলিয়া পুরস্কৃত হয় নাই। গজেন্দ্রের গ্রন্থখানিকে 'কল্‌কা তার্‌কা ছেই' (অর্থাৎ The book deals with machines and wires—কল ও তার বিষয়ক) ধরিয়া লইয়াই বিচারকেরা রায় দিয়াছেন। বনফুলের 'জলতরঙ্গ' সাবমিটেড হইলে 'জলতা রঙ' (The paint is burning—রঙ জলছে) এই নামমাহাত্ম্যে গজেন্দ্রের বইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিত।

'চিত্রদর্শন'

বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড-প্রকাশিত কানাই সামন্তের 'চিত্রদর্শন' বাংলা সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও মুদ্রণ-গ্রন্থন-চাতুর্য উভয়দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিন অধ্যায় "চিত্রের স্বরূপ" "চিত্র" ও "কারুকলা" সুচিন্তিত রচনা। শিল্পকে দেখিবার ও উপভোগ করিবার একটা বিজ্ঞানসম্মত সহজ নির্দেশ এইগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রিত চিত্রনিদর্শনগুলি সুনির্বাচিত ও চমৎকার মুদ্রিত। গ্রন্থকারের সুরুচির পরিচায়ক এইগুলি। তবে এই গ্রন্থপাঠে ও চিত্রদর্শনে আমরা প্রধানতঃ জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন—(অবনীন্দ্র-নন্দলাল শিষ্য-প্রশিষ্যসহ) শিল্পেরই পরিচয় পাইলাম। ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে অন্যান্য বহু শিল্পীও কৃতী, এবং চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের 'চিত্রদর্শন' দ্বিতীয় খণ্ডে আশা করিতেছি।

নায়কের মৃত্যু

শিবনারায়ণ রায়

৷ালিতে রেনেসাঁসী সভ্যতার বিবরণ লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক বুর্কহার্ট লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্যক্তিত্ব-র পুনরুন্মেষ উক্ত সভ্যতার অন্যতম প্রধান এবং বিশিষ্ট। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের আওতায় পশ্চিমের মানুষ আত্ম-পের সাধনায় শান্তি খুঁজেছিল। রেনেসাঁসের মধ্য ইয়োরোপের মানুষ আবার আত্মসচেতন হয়ে উঠল। ৷তার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্য, পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে ন, আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ—এটাই হল াঁসী মানসের বৈশিষ্ট্য। ধর্ম মানুষকে দাস্যভাবে ৷রিত করেছিল। রেনেসাঁসী কল্পনায় মানুষ দেখা ায়ক রূপে।

্যক্তিতে নায়কত্ব আরোপ করার দুঃসাহস গ্রীকদের ই বোধ হয় সর্বপ্রথম দেখা যায়। মানুষই সবকিছুর ণ্ড—প্রোটাগোরসের এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে উক্ত ার আভাস আছে। পেরিক্লেসের সমাধিভাষণে ীয় নগররাষ্ট্রের যে আদর্শরূপটি প্রতিফলিত তার ায় প্রত্যয় হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বতঃসিদ্ধতা। এই ৷ না থাকলে শুধু গ্রীক গণতন্ত্র নয়, গ্রীক ভাস্কর্য এবং নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠত না। রেনেসাঁসের শিল্পী মনীষীরা মধ্যযুগের বহুশতাব্দীব্যাপী বিস্মৃতির কবল গ্রীক সভ্যতার এই উত্তরাধিকারকে উদ্ধার ান। তাঁরা নতুন করে উপলব্ধি করলেন যে মানুষ অথবা প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক নয়, মানুষ নিজেই র ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে মানুষ উপাদানসমষ্টি মাত্র নয়, মানুষ স্রষ্টা; যে মানুষ শুধু তার পরিবেশকেই বদলাতে সক্ষম নয়, সে নিজেকেও নিজের কল্পনা এবং প্রয়াসের সামর্থ্যে বিচিত্র ভাবে গড়ে তুলতে পারে। রেনেসাঁসের অন্যতম বিখ্যাত মনীষী পিকো দেলা মিরান্দোলার ভাষায় বলা যেতে পারে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষই একমাত্র জীব যার অস্তিত্বের আদল এবং বিকাশের ধারা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, যার আত্মরূপান্তরের ক্ষমতা অপরিসীম, যে অনিবার্যরূপে স্বতন্ত্র এবং অনন্য।

পশ্চিম ইয়োরোপের যে সভ্যতাকে ইতিহাসে আধুনিক নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যে সভ্যতা আবিষ্কারক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং প্রচারক, যোদ্ধা, ভাগ্যান্বেষী এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতাদের মারফত ক্রমে সমুদ্র, পর্বত, মরুভূমি এবং অরণ্যের বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে, তার অন্যতম প্রধান উৎস হল রেনেসাঁসের এই উপলব্ধি। এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে রেনেসাঁসের স্থাপত্যে এবং চিত্রকলায়, দর্শনে এবং রাজনীতিতে, দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারারদের কীর্তিকলাপে এবং উদ্যোগী বণিকদের সমুদ্রযাত্রায়, এবং সবচাইতে সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যিকদের কল্পনায়। জাতি, সম্প্রদায়, কুলশীল, বর্ণ, বিত্ত, বয়স ইত্যাদি চিহ্নের মধ্যে মানুষের পরিচয় নেই; তার পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে, তার স্বাতন্ত্র্যে, তার কর্মে। রেনেসাঁসের জীবনবোধ অনুসারে "আমার আমিত্ব"-কে সমৃদ্ধতর এবং প্রকাশিত করাই হল মানুষের যথার্থ সাধনা। ব্যক্তি তার বিশিষ্টতাকে ফুটিয়ে তুলুক

বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে; রেনেসাঁসের ভাষায় uomo unico পরিণতি পায় uomo universale-এ।

ফলতঃ রেনেসাঁসের মনীষীরা গ্রীকদের চাইতেও বেশী প্রাবল্যের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তায় নায়কত্ব আরোপ করেছিলেন। নায়কের লক্ষণ কি? যাকে গড়পড়তার ছাঁচে ফেলা যায় না, কারণ সে বিশিষ্ট; ঘটনাস্রোত যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, কারণ সে না থাকলে ঘটনা নিরর্থক; কাসিরারের ভাষায় যে শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাত্র নয়, অভিজ্ঞতার উপাদানকে যে ব্যক্তি নিজের কল্পনা অনুযায়ী রূপ দিতে সমর্থ; উৎকর্ষের মহৎ আকাঙ্ক্ষা (lo gran disio dell'eccellenza) যাকে কখনও তামসিক অভ্যাসাশ্রয়ীতায় নামতে দেয় না; যে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে জানে এবং হেরে গেলেও নতি স্বীকার করে না; যে জোরের সঙ্গে দাবি করতে পারে এবং তার জন্য দাম দিতে প্রস্তুত;—সেই ব্যক্তিই নায়ক। সে স্ত্রী কিংবা পুরুষ, বিবেকবান অথবা শুধু উচ্চাভিলাষী, যোদ্ধা, সওদাগর, এমন কি সুদখোর, শুভ্রকেশ বৃদ্ধ অথবা বিকলাঙ্গ যুবা, যা খুশি হতে পারে। কিন্তু নায়ক হবার জন্য তার যা অবশ্যই থাকা চাই তা হল ব্যক্তিত্ব এবং সকল অবস্থার মধ্যে এই ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখবার শক্তি। এই শক্তি যার আছে সে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারে যে পৃথিবী তার দেশ, কারণ যেখানেই সে যাক না কেন, সেখানেই তার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।

ব্যক্তিত্বের ওপরে জোর দেওয়ার ফলে একদিকে রেনেসাঁসের যুগে যেমন সত্যিই বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাদের অবলম্বন করে বিরাট জীবনী-সাহিত্য গড়ে ওঠে। আত্মজীবনী লেখার এবং আত্মপ্রতিকৃতি আঁকার রেওয়াজও এই যুগে চালু হয়; তা ছাড়া বিখ্যাত মানুষদের ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, তাদের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব, তাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ, তাদের নিয়ে কাব্যকাহিনী রচনা, এসবও এই যুগের বৈশিষ্ট্য। ইতালি থেকে শুরু করে জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে রেনেসাঁসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। ইংল্যাণ্ডে এই বোধের প্রথম প্রস্ফুরণ ঘটে এলিজাবেথান এবং জেকোবিয়ান সাহিত্যে, বিশেষ করে নাটকে; পরে সতেরো এবং আঠারো শতকে এই বোধ উদারতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শেক্সপীয়র এবং তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের রচনা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে তাঁদের কল্পনা মুখ্যত নায়ককেন্দ্রিক ছিল। এই নায়ক মার্লোর লিরিকে নায়িকাকে ডাক দিয়ে বলেছে :

Come live with me and be my Love,
And we will all the pleasures prove...

শেক্সপীয়রের সনেটের ভিতর দিয়ে ঘোষণা করেছে :

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove...

এমন কি জন ডানের কৌতুকসরস অতিশয়োক্তির মধ্যেও এরই উজ্জ্বল উপস্থিতি অস্পষ্ট নয় :

Busie old foole, unruly Sunne,
Why dost thou thus,
Through windowes, and through curtaines call on us?
Must to thy motions lovers seasons run?...
Shine here to us, and thou art every where;
This bed thy center is, these walls, thy spheare.

এই নায়কের আর যে অভাবই থাক, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। সতেরো শতকের প্রথম ভাগে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত সমস্ত অস্তিত্ব এবং অভিজ্ঞতাকে সন্দেহ করার পর অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আর কিছু থাক বা নাই থাক আমি আছি, কেন না আমার সন্দেহক্রিয়ার দ্বারাই আমার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। Cogito ergo sum—ভাবি, সুতরাং আছি। রেনেসাঁস-কল্পিত নায়ক কোনও যুক্তিতর্ক ছাড়াই নিজের অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে উপলব্ধি করেছিল। এই নায়ক কখনও-বা ফলস্টাফের মত দায়িত্ববোধমুক্ত প্রৌঢ় বিদূষক, কখনও-বা ব্রুটাসের মত আদর্শবাদী পণ্ডিত, কখনও-বা হ্যামলেটের মত চতুর কল্পনাপ্রবণ বিশ্লেষণ-প্রিয় যুবক, কখনও-বা লীয়রের মত অন্ধ একাগ্র সর্বস্বপণকারী উন্মত্ত বৃদ্ধ। কিন্তু কি এদের কৌতুকে, কি এদের যন্ত্রণায়, কি এদের বাক্যে,

এদের কর্মে, বিশ্বজগৎ থেকে পৃথক আপন আপন সত্তার চেতনা সব সময়েই প্রবলভাবে জাগ্রত। ধ ওথেলো তাই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে অসহ। কাছে বলি দেবার পর নিজের ভুল জানতে পেরে ঘাতী হবার মুহূর্তেও এ কথা না বলে পারে না :

Speak of me as I am ; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice...

, ব্যথিত, বিভ্রান্ত হ্যামলেট তাই ওফেলিয়ার করুণ র ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোষণা করে :

...this is I,
Hamlet the Dane.

কলানিপুণা নায়িকা ক্লিওপেট্রা তাই স্বেচ্ছাবৃত র মুখোমুখী হয়ে নিজের বিজয়িনী সত্তাকে স্মরণ করে :

ve me my robe, put on my crown ; I have
mortal longings in me...
m fire and air ; my other elements
give to baser life....

ওয়েবস্টারের নায়িকা বিত্তোরিয়া কোরোম্বোনা র নিপুণতার সঙ্গে একটির পর একটি দুষ্কার্য করে ধরা র পরও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্তিমান শাস্তিদাতাদের দ্ধে নির্ভয়ে একা সংগ্রাম করে এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে প আত্মস্থতার সঙ্গে এই মহাগণিকা বলে যায় :

My Soul, like to a ship in a black storm,
Is driven, I know not whither.

নায়কনায়িকাদের চরিত্রে অনেক গলদ আছে। কিন্তু জায়গায় এরা খাঁটি, আর সেটি হল, সব রকম অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় র সামর্থ্যে। এই একটি ক্ষেত্রে মার্লোর বারাবাস, পীয়রের বিভিন্ন পরিণত নাটকের নায়কনায়িকারা, জনসনের ভলপনে, চ্যাপম্যানের বুজি দাঁবোয়াজ, রর ভিন্দিচে, ওয়েবস্টারের বিত্তোরিয়া এবং ডাচেস্ মাল্‌ফি, বোমণ্ট এবং ফ্লেচারের ইভাদনে, এবং র্ডের আনাবেলা ও জোভানি পরস্পরের নিকট-য়ীয়। এলিয়ট এই জাতীয় চরিত্র-কল্পনার ভিতরে নকার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন; তাঁর মতে এলিজাবেথান নাটকে রোমান স্টোইসিজমের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। স্টোইক দর্শন সম্বন্ধে এলিয়টের ধারণা আমার কাছে যুক্তিসহ ঠেকে না; কিন্তু তাঁর এ উক্তিটি সত্য যে স্টোইক মনোভাব খ্রীষ্টীয় "হিউমিলিটি"র পরিপন্থী। এলিজাবেথান নায়ক ভাগ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে বার বার হেরে যেতে পারে; কিন্তু পরাজয়ের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য আগে থেকেই দাস্যভাবের অনুশীলনে তার একান্ত অনীহা। পরবর্তীকালে এই নায়কেরই প্রতিধ্বনি করে মিলটনের শয়তান বলেছে, স্বর্গে সেবা করার চাইতে নরকে রাজত্ব করা ভাল। এরই বংশধর গোয়েটের ফাউস্ট, শেলীর প্রমিথিয়ুস, স্তাঁদালের জুলিয়াঁ সোরেল—সমগ্র সমাজের সঙ্গে যার লড়াই (en guerre avec toute la socie'te')।

দুই

মধ্যযুগের তামসিক জীবনযাত্রা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার ব্যাপারে রেনেসাঁসী নায়ক-কল্পনার মস্ত দান থাকা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে উক্ত কল্পনার মধ্যে অনেক মারাত্মক ত্রুটি ছিল। মানুষ সৃজনক্ষম জীব এ কথা যেমন সত্য, বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনাক্রম নিয়মনির্দিষ্ট এ কথাও তেমনি সত্য। প্রথমটির ওপরে ঝোঁক দিয়ে দ্বিতীয় সত্যকে অগ্রাহ্য করলে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সংঘাত অনিবার্য, এবং সে সংঘাতে ব্যক্তির বিনাশের সম্ভাবনাই সমধিক। রেনেসাঁসী বিশ্ববীক্ষায় তাই ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে আকর্ষণ এত প্রবল। পরবর্তীকালে রোম্যান্টিক আন্দোলনে এই প্রবণতা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য যেমন পরিবেশের বাধাকে লঙ্ঘন করা প্রয়োজন, ব্যক্তির বিকাশের জন্য তেমনি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি অবশ্যকাম্য। রেনেসাঁসের নায়ক দ্বিতীয় দিকটিকে সব সময়ে স্মরণে রাখে নি; ফলে যে কোনও পরিবেশেই সে পরদেশী—স্তাঁদালের ভাষায় etranger।

দ্বিতীয়তঃ, স্বাতন্ত্র্যকেই একমাত্র সাধনার বিষয় করার ফলে রেনেসাঁসী নায়ক সব মানুষের মূলগত ঐক্যের প্রতি উদাসীন। অথচ এই ঐক্যকে মূল্য না দিলে ন্যায়-অন্যায়,

কর্তব্য-অকর্তব্য, এসবের কোনও সার্বলৌকিক ভিত্তি থাকে না। ফলে সমাজজীবন অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির বিকাশ অকল্পনীয়। সব চাইতে বড় কথা, এই মনোভাবের ফলে এক ব্যক্তি অপরকে তার নিজের বিকাশের উপায়মাত্র মনে করে; এবং সে ক্ষেত্রে একের স্বাতন্ত্র্য অনেকের স্বাতন্ত্র্য-বিলোপের হেতু হয়ে ওঠে। রেনেসাঁসী নায়কের এই বিনাশন-প্রবণতা মেকিয়াভেলীর প্রিন্স পরিকল্পনার মধ্যে সবচাইতে সুপরিস্ফুট। রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে তিনি প্রত্যাশা করেছেন সিংহের সাহস এবং শৃগালের ধূর্ততা; অপরের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে বোধ তার পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, দুর্বলতার চিহ্ন। অথচ অপরের প্রতি যে উদাসীন তার নিজের বিকাশও বিকৃত হতে বাধ্য; ক্ষমতার একাগ্র সাধনায় সে ক্রমে মনুষ্যত্বের অন্য সব সম্পদকে বলি দিতে থাকে। রেনেসাঁসী নায়কনায়িকাদের চরিত্রে তাই স্নেহ, দাক্ষিণ্য, দায়িত্ববোধ এবং অপরের হৃদয়বৃত্তি সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতির অভাব আমাদের পীড়া দেয়। তাদের ব্যক্তিত্ব প্রবল, কিন্তু তা সহৃদয়তার দ্বারা পরিশীলিত নয়।

পশ্চিম ইয়োরোপের অধিকাংশ সমাজে মনীষীরা রেনেসাঁসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরোক্ত ত্রুটি সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডে সতেরো শতক থেকে এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা চোখে পড়ে। ডাচ্ মনীষী গ্রুট বা গ্রটিয়াস বিচার করে দেখালেন যে ব্যক্তির বিকাশের উৎস হচ্ছে তার মানবীয় প্রকৃতি বা মনুষ্যত্ব; এই প্রকৃতি সার্বলৌকিক; এই প্রকৃতির নির্দেশ অনুসরণ করে মানুষ উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ করে; এই প্রকৃতির স্ফুরণের জন্য যা কিছু প্রতি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাকেই বলা হয় মানবীয় অধিকার বা রাইট; এবং এই সব অধিকারের সংরক্ষণ এবং প্রবর্ধনের জন্য যে সব আইনকানুন করা হয় তাই হল সমাজ এবং রাষ্ট্রের যথার্থ ভিত্তি। লক প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মিলনকে সুস্থ সমাজের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করলেন; এবং তাঁদের সেই চিন্তাধারার প্রভাবে ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে উদারতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। ক্রমে উদারতান্ত্রিক আদর্শ অন্যান্য দেশের মনীষীদেরও আকৃষ্ট করতে থাকে এবং আঠারো ও উনিশ শতকে এই আদর্শ পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। আঠারো শতকের ফ্রান্সে এবং আমেরিকায়, উনিশ শতকে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আফ্রিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে উদারতান্ত্রিক চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব সুপরিস্ফুট। আমাদের দেশে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিয়োর শিষ্যবর্গ, বিদ্যাসাগর এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট কর্মীদের চরিত্রে এবং ক্রিয়াকলাপে উদারতন্ত্রী জীবনবোধের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

উদারতন্ত্র ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে পূর্ণ মূল্য দিলেও তাকে আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ রাখে নি। উদারতন্ত্রী একদিকে কাণ্টের ভাষায় প্রতি ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য হিসেবে কল্পনা করেছে; কোনও ব্যক্তিই অপরের সার্থকতার উপায়মাত্র নয়। অপর দিকে উদারতন্ত্র যুক্তির দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধ দূর করার প্রয়াস পেয়েছে; অনেকের ক্ষতির দ্বারা একের লাভ, বা একজনের আত্মবিলোপের দ্বারা অনেকের কল্যাণকে আদর্শ বলে স্বীকার করে নি। উদারতন্ত্র অধিকার এবং দায়িত্বকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত করেছে; উদারতন্ত্রীর বিচারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার শর্ত হল অপরের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা, সহ্য করা এবং শ্রদ্ধা করা। এই ক্ষেত্রে উদারতন্ত্র রেনেসাঁসের উপলব্ধিকে সংস্কৃততর করেছে, তাকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করেছে।

রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের উপরোক্ত বিবর্তনের ফলে নায়ক সম্বন্ধে ধারণাতেও গভীর পরিবর্তন দেখা দিল। রেনেসাঁসের নায়ক শুধু স্বতন্ত্র নয়, সর্বসাধারণের থেকে ওপরে ওঠা তার সাধনা। এই সাধনার জন্য সে শুধু সর্বসাধারণের বিরোধিতা করতেই প্রস্তুত নয়, তাদের দমন (এবং প্রয়োজন হলে বিনাশ পর্যন্ত) করতে তার কুণ্ঠা নেই। অভীপ্সার আরশিতে নিজের যে প্রতিচ্ছবি দেখে সে মুগ্ধ—সেটি অতিমানবের। এই নাটকীয় ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এলিজাবেথান সাহিত্যিকেরা স্বভাবতঃই নাট্যরূপের মাধ্যম অবলম্বন করেছিলেন। অপরপক্ষে উদারতন্ত্রের নায়ক আত্মপ্রত্যয়ী হয়েও অপরের প্রতি উদাসীন নয়; নিজের বিশিষ্টতার প্রতি

সত্বেও তার নাটকীয় অতিস্ফীতি ভার অনাকাঙ্ক্ষিত। নিজের 'প্রাইভেসী' রক্ষায় যত্নশীল; কিন্তু সঙ্গে সে সমাজের সঙ্গে নানা রকম সম্পর্ক গড়ে ্যায় উদ্যোগী। তার চেতনায় ব্যক্তিগত এবং ্জিক, প্রাইভেট এবং পাবলিক-এর ব্যবধান স্পষ্ট। ার একান্ত ব্যক্তিগত সেখানে সমাজের হস্তক্ষেপ সে ্রে না; অপরপক্ষে একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ্রর অসুবিধা ঘটাতে সে কুণ্ঠিত। রেনেসাঁসের নায়ক কে ছাড়িয়ে উঠে নিজের বিশিষ্টতা প্রমাণ করতে ; উদারতন্ত্রের নায়ক সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থেকেও ার বিশিষ্টতা হারায় না। বুর্ক্‌হার্ট্‌ লিখেছেন যে শ শতকের শেষভাগে ফ্লোরেন্সে নাকি প্রত্যেক ্রিক আপন আপন খেয়ালমাফিক পোশাক পরত; ্রিক পরিচ্ছদে কোন সাধারণ রীতি ছিল না। কিন্তু র্তী যুগে উদারতন্ত্রী নায়ক পোশাক-আশাকে, আচার-্যারে প্রচলিত প্রথাকেই সযত্নে অনুসরণ করেছে; অথচ ার চরিত্রের কেন্দ্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ মোটেই দুর্বল হয় নি, থা কে অস্বীকার করবে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যাদর্শে এই নব্য নায়ককল্পনার ্ষ্ট ইঙ্গিত চোখে পড়ে। এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ্যালীন অধিকাংশ রোমান্টিক কবিদের থেকে পৃথক। াক্ত কবিরা মুখ্যত রেনেসাঁসী ঐতিহ্য অনুসরণ ছিলেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ চেয়েছিলেন অত্যন্ত ্রণ মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব আবিষ্কার করতে। কি তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সাধারণ মানুষের কথোপ-া এবং ভাবনাচিন্তার ভাষাই কাব্যের যথার্থ ভাষা। ্রের থেকে কোন হিসেবেই উৎকৃষ্ট না হয়েও প্রতি ষ যে অনন্য, এ কথাটা বোঝবার সরলতম উপায় তাকে ভালবাসা। যার মধ্যে অন্য কেউ নায়কত্বের ন লক্ষণ দেখে নি, সেও তার প্রেমিকার চোখে নায়ক। অভাব সর্বগুণান্বিত কোন অতিমানবও পূরণ করতে ্য না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লুসি স্পষ্টত শেক্সপীয়রের ্শিয়া, লেডি ম্যাকবেথ অথবা ক্লিওপেট্রা নয়; কারও থ সে চমক লাগায় নি, তার পরিবেশের ওপরে সে ন স্বাক্ষর রেখে যায় নি। কিন্তু শ্যাওলাঢাকা পাথরের ালে ভীরু নম্র ভায়োলেট ফুলের মত এই অখ্যাত অজ্ঞাত মেয়ে যেদিন ঝরে পড়ল, সেদিন অন্ততঃ তার প্রেমিকের চোখে পৃথিবীর রূপ বদলে গিয়েছিল:

> She lived unknown, and few could know
> When Lucy ceased to be;
> But she is in her grave, and, oh
> The difference to me!

লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু-সংবাদে ম্যাকবেথের উক্তির সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার শেষ চরণ তুলনা করলে সন্দেহ থাকে না যে শেক্সপীয়রের মহানায়িকার চাইতে পরবর্তী কবির এই অতি নগণ্যা নায়িকা তার প্রেমিকের চেতনায় অনেক বেশী অনন্যা রূপে উপলব্ধ হয়েছিল।

এমন সাধারণ মানুষকে নায়ক হিসেবে কল্পনা করলেও তার কাহিনীতে নাটকীয় পরিস্থিতি অবতারণার সুযোগ কম। সংঘাতের চাইতে সহযোগিতা যার বেশী কাম্য, নিজের বিশিষ্টতাকে যে বাহ্য আচরণের মধ্যে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক, বীরত্বের চাইতে শিষ্টতাকে যে বেশী মূল্য দেয়, তাকে নিয়ে ট্র্যাজেডি লেখা কঠিন। আমার অনুমান, আঠারো এবং উনিশ শতকের পশ্চিমী সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডির সংখ্যা যে অত্যন্ত অল্প, উদারতন্ত্রের প্রভাবে নায়ক সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন তার অন্যতম প্রধান কারণ। অপরপক্ষে এই নতুন ধরনের নায়ককে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে উপন্যাসের গদ্যভাষা, মন্থর ঘটনাবিন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বহু চরিত্র অবতারণার অবকাশ বিশেষ উপযোগী। এই ধরনের নায়ক-নায়িকার বিশেষত্ব কোন প্রচণ্ড প্রয়াসের মধ্যে ধরা পড়ে না; ছোটখাট ঘটনা, বিচিত্র সম্পর্ক, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মধ্যে তারা ধীরে প্রকাশ পায়। স্কট কিংবা দুমা এ কথাটা বুঝতে পারেন নি। নাটকীয় একাগ্রতার অভাবে তাঁদের রোমান্টিক নায়ক-নায়িকারা আমাদের অভিভূত করে না; অথচ উপন্যাসের মহৎ সম্ভাবনাকেও তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গদ্যকাহিনীর মধ্যে সার্থক করতে পারেন নি। নতুন ধরনের নায়ক-নায়িকাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসই যে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইংল্যাণ্ডে স্টর্ণ, ফিল্ডিং এবং বিশেষভাবে জেন অস্টেন-এর রচনায়, ফ্রান্সে কঁস্তাঁ, স্তাঁদাল এবং বলজাকের লেখায়, জার্মানীতে গোয়েটের হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টার-এ, রাশিয়াতে গোগোল

এবং গনচারভ-এ। এঁদের মধ্যে স্তাঁদাল অবশ্য রেনেসাঁসী নায়ক-কল্পনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। দান্তে যেমন মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁসের মাঝখানে সেতুবন্ধ, তাঁকেও তেমনি রেনেসাঁস এবং উত্তর রোমান্টিক যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ বলা চলে। তবে মোটামুটি এ কথা বোধ হয় স্বীকার্য যে আঠারো এবং উনিশ শতকে উপন্যাস যেমন সাহিত্যের জগতে নাটকের স্থান গ্রহণ করেছে, তেমনি সমাজ-জীবনে এবং শিল্পীসাহিত্যিকদের কল্পনায় রেনেসাঁসের স্বরাট, প্রচণ্ড এবং ট্র্যাজিক নায়কের রূপান্তর ঘটেছে উদারতন্ত্রের সহিষ্ণু অথচ আত্মপ্রত্যয়ী, ভারসাম্যকামী অথচ গতিশীল, সহৃদয় এবং হিসেবী নায়কে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে; ডস্টয়েভস্কি তার মধ্যে সর্বপ্রধান। কিন্তু উদারতন্ত্র পরিকল্পিত নতুন নায়কের বিচিত্র পরিচয় লাভ করতে হলে যে লেখকের কাছে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে, তিনি ডস্টয়েভস্কি নন, তিনি ইংল্যাণ্ডের চার্লস ডিকেন্স।

তিন

উদারতন্ত্রের নায়ক রেনেসাঁসের নায়ক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও সে যে নায়ক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চললেও নিজের চরিত্রের মূলগত ঐক্য এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সে যত্নবান; অপরের সহযোগিতা যদিচ তার কাম্য, তবু নিজের বিকাশের জন্য সে স্বতঃই উদ্যোগী। রেনেসাঁসের নায়ক-নায়িকাদের পাশে এই ধরনের চরিত্র কিছুটা বিবর্ণ ঠেকে। রফা করতে গিয়ে এরা পরতান্ত্রিক এবং অভ্যাসাশ্রয়ী হয়ে উঠতে পারে, এ আশঙ্কাও অমূলক নয়। তবু সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার্য যে আত্মঘোষণা না করেও এরা অনেকেই আত্মপ্রত্যয়ী, অপর সম্বন্ধে সচেতন হয়েও নিজেদের সহজ প্রকাশে সক্ষম।

কিন্তু গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পশ্চিমের সমাজে এবং সাহিত্যে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে কি রেনেসাঁসী-নায়ক আর কি উদারতন্ত্রী নায়ক কারও স্থান স্বীকৃত নয়। একদিকে কারখানার তৈরী পণ্যদ্রব্যের মত ব্যক্তিও ছাঁচেঢালা মানুষে পরিণত হচ্ছে চলেছে। অন্যদিকে সমকালীন সাহিত্যিকদের কল্পনায় ব্যক্তি তার স্বকীয়তা বিষয়ে সন্দিহান, এবং তার স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অসহ্য আর্তির (angoisse : angst) উৎসরূপে অনুভূত। নবযুগে যখন সমাজের সমস্ত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে চলেছে তখন প্রতি ব্যক্তিই যে অনন্য এবং তার মূল্য যে স্বতঃসিদ্ধ, এ কথা খুব কম ব্যক্তিই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। সমষ্টিবাদ এবং ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের প্রভাবে এ যুগের বহু মনীষী শিল্পী-সাহিত্যিক আজ এ কথা ভুলতে বসেছেন যে মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের স্রষ্টা, এবং ব্যক্তিত্ব ছাড়া সৃষ্টি অসম্ভব। অন্যদিকে মনোবিশ্লেষণ-বিদ্যার আঘাতে অনেকেই ব্যক্তির চরিত্রগত ঐক্যবিষয়ে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। ফলে একদিকে কলকারখানা, সমষ্টিবাদী সমাজদর্শন, ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় বিশ্বাস এবং সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের চাপ, আর অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তার ঐক্য এবং সৃজনসামর্থ্যে অবিশ্বাস আধুনিক সমাজে এবং সাহিত্যে নায়কের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

মৃত্যু যদি আকস্মিক না হয়, তা হলে তার পূর্বে ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয়। উনিশ শতকেই সে লক্ষণ কিছু কিছু চোখে পড়ে। বিশেষ করে ফ্রান্সে—উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রতীকবাদী কবিতায় এবং ডেকাডেণ্ট উপন্যাসে। বোদলেয়ার, মালার্মে, র‍্যাঁবো এবং লাফর্গের কবিতায় রোমান্টিক নায়কের নির্বাণ-সাধনা অত্যন্ত প্রবল-ভাবেই প্রত্যক্ষ। কিন্তু বর্তমান শতকের নায়কত্ব-নায়কের সব চাইতে প্রামাণিক পূর্বচ্ছবি এঁদের কাব্যে মেলে না; তার জন্য যেতে হয় ফ্লোবেয়ার-এর কাছে। উক্ত ঔপন্যাসিকের "বুভার ও পেকুশে"-র চরিত্রে নব্যযুগের নির্বীর্য, আত্মপ্রত্যয়হীন, নপুংসক, স্বাতন্ত্র্যবিমুখ নায়কের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে।

উনিশ শতকে পূর্বাভাস দেখা গেলেও নায়কের সর্ববিধ অর্থে নায়কত্বলোপ বিশ শতকেরই বিশিষ্ট ঘটনা। কম্যুনিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় অথবা ওই দুই সমষ্টিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্যে নায়কের উপস্থিতিই অকল্পনীয়; কারণ ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ওই দুই রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং সমাজদর্শনে অস্বীকৃত। অপরপক্ষে যেসব সমাজ এবং সাহিত্যিক উক্ত দুই আদর্শে অবিশ্বাসী, তাদের কাছেও এ যুগে ব্যক্তিকে নায়কত্ব আরোপ নিতান্ত অবাস্তব কল্পনা। তাঁদের কাছে
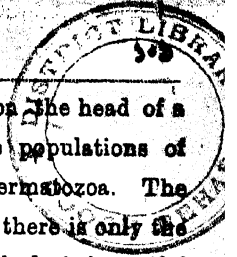
াসী নায়কের শৌর্য আসলে ব্যক্তিসত্তার ক্ষুদ্রতা এবং য়তা গোপন করবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র; তন্ত্রী নায়কের ভদ্রতা আত্মপ্রতারণা বই আর কিছু এঁদের কল্পনায় নায়ক এবং নায়িকার যে রূপটি ভাত তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় এলিয়টের যুগের কবিতায় এবং পরবর্তীকালের নাটকে। র নায়ক নিঃসঙ্কোচে নায়িকাকে সহবাস করার জন্য দিয়েছিল। এলিয়টের নায়ক (যে জানে যে তার টাক, দাঁত বাঁধানো, জীবন কফির চামচে মাপা) ও প্রেমকে স্বীকার করে নেবার সাহসই সংগ্রহ করতে না। আর এলিয়টের নায়িকা?

what have I, but what have I, my friend, ive you, what can you receive from me?

এই জাতীয় নায়কের শেষ পর্যন্ত দৌড় হচ্ছে ক্লান্ত, ক্ত, নিরুত্তাপ স্ত্রীদেহে খানিকটা হিসেবী ধস্তাধস্তি নিরালোক সিঁড়ি হাতড়ে দ্রুত কেটে পড়া। আর র এলিয়টের নায়িকার স্তিমিত চেতনায় যে চিন্তাটি ; আকার নিতে পারে সেটি হল :

now that's done : and I'm glad it's over.

াক্সলির উপন্যাসে আধুনিক স্ত্রী পুরুষের এই সন্ত্রস্ত, াপ্রবণ, সৃষ্টিসামর্থ্যহীন, রুগ্ন রূপটিকে আরও বিশদ প্রকট করা হয়েছে। তারা শুধু নিজেদের বিকশিত অসমর্থ নয়; তারা নিজেদের ব্যক্তিসত্তার ঐক্য ও অনিশ্চিত। যারা অজ্ঞ, নির্বোধ, অনুভূতিহীন, ই নাকি শুধু নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের নিশ্চয়তায় গর্ববোধ াকে। কিন্তু যারা সোক্রাতেসের মত আত্মজিজ্ঞাসায় ় তারা জানে ব্যক্তির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হল আত্মা বা মন শুধু দেহের আকস্মিক, নিরর্থক, শুক অলঙ্কার মাত্র; আর এই দেহের অবশ্যম্ভাবী তি জরা, মৃত্যু, পচন, বিলয়। "দোজ্ ব্যারেন্ ্" উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র মিস্টার কার্ডান-াষায় :

he tragedies of the spirit are mere tings and posturings on the margin of ınd the spirit itself is only an accidental erance, the products of spare vital energy, like the feathers on the head of a hoopoo or the innumerable populations of useless and foredoomed spermatozoa. The spirit has no significance; there is only the body. When it is young, the body is beautiful and strong. It grows old, its joints creak, it becomes dry and smelly; it breaks down, the life goes out of it and it rots away....The farce is hideous, thought Mr. Cardan, and in the worst of bad taste....

দেহের এই নশ্বরতা এবং "অনাত্ত" বিষয়ে এই জ্ঞান কিন্তু এই স্ত্রী-পুরুষদের মনে করুণা, ঔদার্য বা সত্যনিষ্ঠার সঞ্চার করে নি। উলটে এই বোধ তাদের মনে শুধু ভয়, ক্লৈব্য, উৎকণ্ঠা এবং মর্ষকামকেই প্রবল করে তুলেছে। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের কল্পিত চরিত্ররা প্রেম, সৃষ্টি, বিকাশ, বৈচিত্র্য, স্বকীয়তা, এসব বোধে বঞ্চিত। হেমিংওয়ের ভাষায় তারা শুধু জানে :

...death is the unescapable reality, the one thing any man can be sure of; the only security...

এ মৃত্যু ট্র্যাজিক নায়কের মৃত্যু নয়, কারণ আধুনিক সাহিত্যের এই সব স্ত্রী-পুরুষ জীবন থাকতেই তো মৃত। দেকার্তের সিদ্ধান্ত তাদের কাছে অর্থহীন। ভাবনার স্রোত আছে বটে, কিন্তু তার কেন্দ্রে কোন "আমি" নেই; অভিজ্ঞতার বহুবাচনিকতায় ঐক্য দিতে পারে এমন কোন সক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর নায়িকা এলিনর পর্জিটার তাই সত্তর বছর পেরিয়েও নিজের জীবনের মধ্যে কোন সূত্র খুঁজে পায় না :

...somebody had talked about her life. And I haven't got one, she thought....Millions of things came back to her. Atoms danced apart and massed themselves. But how did they compose what people called a life? She clenched her hands and felt the hard little coins she was holding. Perhaps

there's 'I' at the middle of it, she thought ; a knot ; a centre...

...*It's* useless, she thought, opening her hands. It must drop. It must fall. And then ? she thought....She looked ahead of her as though she saw opening in front of her a very long dark tunnel...

এমন লোকের পক্ষে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভেদ সামান্য। এলিজাবেথান নায়কনায়িকার মত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্মরণ করা তার পক্ষে অকল্পনীয়। তার মৃত্যুর পিছনে কোন মহৎ সংঘাত অথবা সার্থকতার কাহিনী খুঁজে পাওয়া যাবে না ; তার অভাবে অপর কোন ব্যক্তির জীবন নিরর্থ হয়ে উঠবে না।

বিস্তারিত উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ খ্যাতিমান সাহিত্যিকের রচনা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, হয় তাঁরা ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সংশয়ী, আর নয় তো ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাঁদের ধারণা যে ব্যক্তিত্বের বিলোপ অনিবার্য অথবা ব্যক্তিত্বের চেতনা যন্ত্রণার কারণ মাত্র। রেনেসাঁসের মনীষীরা ব্যক্তির যে অনন্যতাকে অনুশীলনের দ্বারা বহুমুখী করতে চেয়েছিলেন, উদারতন্ত্রীরা ব্যক্তির যে স্বতঃসিদ্ধ মূল্যকে সার্বলৌকিকতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক-দার্শনিকবৃন্দ নানা পথে, নানা কারণে তার নির্বাণকামী। রাজপথে যানবাহন এবং পথচারীদের স্রোত দেখে শ্রীমতী উলফের নায়িকা উপলব্ধি করেন :

...the normal purpose for which life was framed, its complete indifference to the individuals, whom it swallowed up and rolled onwards...

দীর্ঘ জিজ্ঞাসার শেষে হাক্সলী সিদ্ধান্তে পৌছন :

To be a self is the original sin, and to die to self, in feeling, will and intellect, is the final and all-inclusive virtue... .

জাঁ-পল সার্ত্র্-এর নায়ক রকঁত্যার ভাষায় :

The 'I' that goes on existing is merely the ever-lengthening stuff of gluey sensations and vague fragmentary thoughts...

এই যেখানে ব্যক্তি সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের ধারণা, সেখানে তাঁদের নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে নামচিহ্নিত কিছু স্ত্রী-পুরুষ জায়গা জুড়তে পারে, কিন্তু তাদের নায়কনায়িকা বলা অর্থহীন। এদের স্রষ্টাদের চোখে এরা :

Shape without form, shade without colonr,
Paralysed force, gesture without motion···

আধুনিক সাহিত্যে এবং সমাজে নায়কের এই নির্বাণ-সাধনা কোন্ পথে এবং কি প্রক্রিয়ায় এত প্রবল হয়ে উঠল, ভবিষ্যতে সময় এবং সুযোগ মিললে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

পালিয়ে বাঁচি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ণী নদীর জলে ঢেউয়ের মাথায়
বেড়ায় ভেসে
থা ফুলে ফলে শাখায় পাতায়
উঠছে হেসে
ষা পাখীর পাখায় ঝিলিক হানে
আকাশ-গায়ে
রে জাগায় কাঁপন সোনার ধানে
সাঁঝের বায়ে
নে ঝড়ো হাওয়া বাঁশের বনে
বাজায় বাঁশী
নে গুমরে ওঠে রসিক-মনে
কাঁদন-হাসি
ণী সে-কথা আর সে-ভাষাটুক্
হাতড়ে মরি
স সুরে-তানে-গানে ভাসুক
জীবন-তরী
। এ গোলকধাঁধায় হারিয়েছি ভাই
সবকিছু যে
ী বাউল সেজে ঘুরে বেড়াই
হদিস খুঁজে ॥

গল ! কোথায় পাবি ঠিকানা তুই
শহর-বাটে
ন বেচা-কেনা চলছে নিতুই
বাজার-হাটে
হ ওজন-মাফিক পাওনা-দেনা
নেইকো ফাঁকি
বী ! যা নিবি তুই বাজিয়ে নে-না
দামটা রাখি
টে ভালবাসার নেইকো অবোধ
দাবি-দাওয়া

না ফেলে কড়ি হেথায় জল-বায়ু-রোদ
যায় না পাওয়া
ফাল্‌তু গান-বাণী-সুর-কথা-ভাষা
কোথায় পাবি
মনেরি দুয়ারে কোন্ সকল-নাশা
লাগায় চাবি
ভুলের এ গোলকধাঁধায় হারিয়ে যে যায়
সবকিছু যে
উদাসী বাউল সেজে আপন-ভোলায়
বেড়াই খুঁজে ॥

ছেড়ে এ পাষাণ-পুরী চল্‌রে চ'লে
গাঁয়ের পানে
বাঁচে কি পাথর-লোহা-ইটের কোলে
কেউ পরাণে
শোনে কে, সময় কোথা, মনের গোপন
কথাটা তোর
সবে রয় নিজের সুখে, দুখে আপন
সদা বিভোর
এ নভে চাঁদ ওঠে না, ফোটায় না ফুল
হেথায় মাটি
দিশাহীন এ অকূলে মিলায় যে কূল
মদের ভাঁটি
নিশিদিন মাঠে-বাটে ছোটায় ঘোড়া
ধরতে বাজি
অকেজোর ঠাঁই হেথা নাই শহর-জোড়া
কাজের কাজি
ভুলের এ গোলকধাঁধায় হারিয়ে যে যায়
সবকিছু যে
উদাসী বাউল সেজে মরমিয়ায়
বেড়াই খুঁজে ॥

ধূলাঝাড়া

শ্রীকালিদাস রায়

ধূলা ঝাড়বার দিন এসেছে এখন,
ধূলা ঝেড়ে পাব ভাবি হারাধন, হারানো রতন।
অর্জন হয়েছে শেষ, বর্জনের আবর্জনাস্তূপে
অসতর্কে ফেলেছি কি তাই আজ খুঁজি চুপে চুপে।
জঞ্জাল হয়েছে জড়ো এ গৃহের কোণে,
তার চেয়ে ঢের বেশী মনে।
ডাস্টবিনে সেই সব ফেলবারই কথা,
ফেলে দিতে পাই তবু ব্যথা।
একবার ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখে
ঝাঁটিয়ে বিদায় দিতে হবে একে একে।
নির্বিচারে ফেলে দিলে পাছে কিছু দামী
চ'লে যায় অজানিতে, জড়ো করে রেখেছিনু আমি।
অবসর পেয়ে একবার
নাড়াচাড়া ক'রে দেখি আছে কিছু যোগ্য কি রাখার!

বৃথা হায় দামী কিছু খুঁজি
এ জঞ্জালে আছে শুধু পুঁজি,—
ছোটখাট সুখদুঃখ হাসিকান্না দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়
আশা, তৃষা, উদ্বেগ, বিস্ময়
সবই আজ ধোঁয়া ধোঁয়া। নিদর্শন টুক্‌রা স্মৃতির
কত চিহ্ন মমতা-প্রীতির
সমাচ্ছন্ন ইঁটের গুঁড়ায়
ধূলাভরা অতীতের পথে পথে আমারে ঘুরায়।
ধূলিঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে খনে খনে
উদাস জাগায় শুধু মনে।
ঘষে-মেজে পুঁছে-মুছে রাখবার মত কিছু নয়।
ফেলে দিতে হাত কাঁপে তবু, মায়া হয়
তাই শেষে বাকি থাকে ঢের
চলে তাই মনে আর গৃহকোণে জঞ্জালের জের।
থাক্ সব নিয়ে যাব সাথে
ভালই সমিধ্‌ হবে আমার চিতাতে।

ওরে আয় বিফল বেকার ভাবুক কবি,
পালিয়ে বাঁচি
এখানে হয় না আঁকা, ছায়ায় ছবি
বেড়ায় নাচি
গায় না গান হেথা কেউ কলের গানে
গান যে বাজে
ফিকিরে সবাই ফেরে দাঁওয়ের টানে
সকাল-সাঁঝে
মাটি তো শান-বাঁধানো, শুকিয়ে যে যায়
জীবন-লতা

জনতার কোলাহলে মনেই হারায়
মনের কথা
ছেড়ে এ মানুষ-পেষা জাঁতার কবল
পালা ছুটে
নইলে পাষাণ-পায়ে মরবি বিফল
মাথা কুটে
ভুলের এ গোলকধাঁধায় হারিয়েছি ভাই
সবকিছু যে
উদাসী বাউল সেজে ঘুরে বেড়াই
মানুষ খুঁজে॥

চন্দ্রোদয়ে

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সখী, সোনার বরণ ওঠে চাঁদ দূরে মহুয়াবনের পরে ;
বুঝি বনদেবতারা পাতি ফাঁদ নর-নয়ন-হরিণী ধরে।
চাহে মোহময় উত্তরীতে বাঁধি প্রণয়ীপরাণ হরিতে,
তাই হীরকে হিরণে হরিতে খেলে ছিনিমিনি ছলভরে।
আজি নিদয় দেবতা পাতে ফাঁদ বুঝি হৃদয়-হরিণী-তরে।

হের স্বপনমন্দির ধরাতল, হাসে অকৃপণা মধু-রাকা।
হাসে দশদিশি আলো-ঝলমল সিত মন্দাররেণু মাখা।
আজি মনে যদি জাগে সুখসাধ তারে বাধা দেওয়া, সখী অপরাধ,
চাহে প্রণয়ী অধরসুধাস্বাদ,— তারে অপরাধ দূরে রাখা।
আজি গৃহকাজে থাকা অপরাধ,— মুখ-কমল শরমে ঢাকা।

বহে বায়ু পরিমল-মন্থর, মোর মনোবনে ফুল দোলে।
দোলে আশা-নিরাশায় অন্তর,— মুহু পাপিয়ার মধুবোলে।
আজি নিখিল বাসনা-সরিতে যত অমরার অপ্সরীতে
নামে লীলাভরে জল ভরিতে হাসি শোণিতে তুফান তোলে ;
তোলে আকুলিয়া বনপ্রান্তর তারা ধ্বনিহীন কলরোলে।

আজি অতনু ধরেছে তনু ওই হের হিরণবরণ চাঁদে।
দেহ-দেউলে তাহার পূজা কই ? স্নেহ-কোমল কিরণ সাধে।
তার আলো ঢলে সুখ-আবেশে, তুমি না হাসিলে ব্যথা পাবে সে ;
তুমি যাবে কোথা ভাল-না-বেসে— ঠেলি দেবতার এ প্রসাদে ?
জ্বালি তরুণ তনুতে মণি-দীপ কর বরণ অতিথি চাঁদে।

এ কি অনুভূতি সুধারসময় এল অসময়ে হিয়া ভরি !
বেশী ভাল হওয়া আজি ভাল নয়, থাকা ভাল নয় দূরে সরি।
আজি খুলে ফেল বৃথা বেশবাস, এস আলুলিয়া কালো কেশপাশ,
মোর জীবনমরণ করি গ্রাস ফেল মোহজাল ঘন করি।
তব মাধুরীধারায় অকৃপণ দেহ দেহ-মন মম ভরি।

বন্য বসন্ত

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

শেষ পাতাটি খসিয়ে দিল হতাশ শাখা
আজ কুয়াশার সিক্ত হাতে ;
কোন্ সুগোপন মন্ত্রণাতে
শীতের শাসন-যন্ত্রণাতে কাতর পাখা !
কিসের ধূসর পাণ্ডুলিপি পথের পাশে !
শুকনো ধুলোয় আঁকলে ছবি
শীর্ণ করুণ শ্বেত-করবী,
বকের পালক বিস্মরণের টুকরো ঘাসে।
তবু যে কোন্ গহনগুহায় নিকষ নীলে
হিংস্র সেই সিংহ জাগে
আলোর কেশর ফুলিয়ে রাগে,
হাওয়ায় হাওয়ায় বিপুল ক্ষুধা লাগিয়ে দিলে।
তখন এ কি ত্বরার তরাস শশক-শীতে !
ঘোমটা টেনে আসর ছাড়ি
যায় মিলিয়ে ছায়ার সারি,
লাবণ্য দেয় বন্যতা এক পাংশু, পীতে।

আলস্যে তার ঝলসে উঠে দাঁতের ছুরি।
আচম্বিতে করবে শিকার
অন্ধ, বধির, স্থবির বিকার,
ওত পেতেছে নখর প্রখর পলাশ জুড়ি।
উপত্যকায় বাজল সবুজ প্রতিধ্বনি।
তুষার রাতের শপথ ভুলি
প্রেতের পোশাক ফেলে খুলি,
বেরিয়ে এল হাসি-গলা গানের মণি।
মরণখেলা খেলছে কি প্রাণ হরিণ হয়ে !
কাঁপছে আকাশ, কাঁপছে মাটি,
রঙের ফেনায় পড়ছে ফাটি,
লগ্ন এলো দিগ্বিজয়ের আজ ভাঙ্গনের।
নাই তো এবার আড়ম্বরের বিড়ম্বনা ;
ঝরল অঝোর রক্ত যত
কোথায় ক্ষতি, কোথায় ক্ষত !
হৃদয় শুধু নিদয় ঘায়ে কলস্বনা।

হাওয়া বয়

শ্রীপদ সেনগুপ্ত

সব গান থেমে যায়
আমরা হারিয়ে যাই
বিস্মৃতির গাঢ় তমসায়,
কোন এক মন্দাক্রান্তা
তটিনীর তীরে,
ভাঙা ঘর পড়ে থাকে
কৃষ্ণচূড়া
করবী ছায়ায়।
ঋতুর পাখিরা আসে যায়
ছয় ঋতু পৃথিবীর রঙ বদলায়

সবুজ, ধূসর, নীল—বহুদিন পরে
দেখা দেয় কোন্ এক নব আগন্তুক,
হাতে তার গোপীযন্ত্র
সায়াহ্নের সোনালী আভায়।

দিনরাত পার হয়ে কত
হাওয়া বয় অতীতের
ক্রন্দনের মত
দূর—দূরান্তের।

[সূতানটি সমাচার ওয়ারেন হেষ্টিংস থেকে রামমোহনের আমল পর্যন্ত প্রাচীন কলকাতার সামাজিক জীবনযাত্রার কাহিনী। তিনজন স্বনামধন্য প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে এই কাহিনী সংকলিত। সেইজন্য এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব দুই-ই খুব বেশী। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী হলেন উইলিয়ম হিকি, মিসেস এলিজা ফে ও ফ্যানি পার্কস, এবং তাঁদের রচনার নাম *Memoirs of William Hickey, Original Letters from India, Wanderings of a Pilgrim etc.* এই সব রচনা থেকে কেবল বাংলাদেশ ও কলকাতা শহরের বিবরণগুলি সংকলন করা হয়েছে। সেকালের কলকাতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যখন কৌতূহলের জোয়ার এসেছে, তখন এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠকদের কাছে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ও মনোজ্ঞ হবে বলে মনে হয়।

উইলিয়ম হিকির বিবরণ দিয়ে আরম্ভ করা হল। দুজন বিখ্যাত হিকির মধ্যে ইনি একজন, অন্যজন হলেন জন অগস্টস হিকি—'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক। আমাদের উইলিয়ম ছিলেন 'a gentleman of fashion in the latter end of the Eighteenth Century', এবং কলকাতার সমাজেও তিনি 'gentleman attorney' বলে পরিচিত হন।]

উইলিয়ম হিকি (১)

নভেম্বর, ১৭৭৭ সন। ভোর চারটে থেকে সাগরপাড়ি দিয়ে বেলা প্রায় দুপুর আন্দাজ সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পরে একখানি পানসি নৌকা এল, কর্নেল ওয়াটসন(১) আগেই সেটি ভাড়া করে রেখেছিলেন কলকাতায় যাবার জন্য। বেলা দুটোর সময় আমরা সকলে মিলে পানসিতে করে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম। পানসিতে যেতে আমার আপত্তি ছিল, কারণ বাংলাদেশের এই বিচিত্র নৌকাটি এমনভাবে তৈরি যে তার মধ্যে সোজা হয়ে বসা যায় না, অথবা রোদবৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করাও যায় না। এমন কি পা ঝুলিয়ে একটু আরাম করে বসাও সম্ভব নয়। তবু পানসির অভিনবত্বের জন্য এই অসুবিধাটুকু আমাদের সয়ে গেল। ছজন 'কালা আদমী' (মাঝি) খুব জোরে জোরে দাঁড় বাইছিল, পানসিও চলছিল তরতর করে দুরন্ত বেগে। সন্ধ্যে ছটার সময় আমরা কুলপিতে এসে পৌঁছলাম। আবার জোয়ার আসা পর্যন্ত সেইখানেই বিশ্রাম নেওয়া হবে স্থির হল।

পাশের খালের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগুবার পর একটা ট্যাভার্ন (সরাইখানা) নজরে পড়ল। যেমন নোংরা তেমনই কুৎসিত ও জরাজীর্ণ সরাইয়ের ঘর।

বাংলাদেশের 'house of entertainment'-এর এই দুরবস্থা দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ওয়াটসনের ইচ্ছা হল এইখানেই রাত্রিযাপন করা, কিন্তু বিছানাপত্তর কিছুই পাওয়া গেল না। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমাদের জন্য তোফা খানা তৈরি করে দিলেন সরাইখানার মালিক—চমৎকার মাছ, চলনসই মুরগি, প্রচুর ডিম ও বেকন (কোথায় পেলেন ?), এবং আমার কাছে যা চরম বিলাসিতার ব্যাপার, সেইরকম উৎকৃষ্ট রুটি। ক্ল্যারেট ও মদিরা (মদ্যবিশেষ) আমাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সুতরাং খানা আমাদের বেশ ভালই জমল।

ভোজনান্তে শয়নের ব্যবস্থা করা হল একটি বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর। কর্নেল ওয়াটসন, মেজর মেস্টেয়ার ও আমি—তিনজনে লম্বা সটান হয়ে তার উপর শুয়ে পড়লাম। চোখে ঘুম এল না, কারণ হাজার হাজার মশা সশব্দে গুনগুন করে আমাদের আক্রমণ করতে লাগল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক মশার কামড়ানিতে টেবিলের উপর ছটফট করে আমি উঠে পড়লাম, এবং ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগলাম। এমন সময় বাইরে থেকে বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম—'ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া'—শেয়ালের ডাক। ধীরে ধীরে রাত ভোর হয়ে গেল, এবং দিনের আলো-হাওয়ায় মশার দলও পালাল। তিনখানি চেয়ার জুড়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি শুয়ে পড়লাম, এবং ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে উঠে বেশ ঝরঝরে বোধ করলাম।

সকাল আটটায় গরম গরম চা-কফির সঙ্গে প্রাতরাশ খাওয়া শেষ করে, প্রচুর সিদ্ধ মুরগি ও অন্যান্য খাদ্য নিয়ে আমরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। বেলা দশটার সময় জোয়ার আসতে পানসি ছাড়ল। আমরা ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই গার্ডেনরীচে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়িতে পৌঁছতে পারব। কিন্তু হঠাৎ উত্তরে-হাওয়া বইতে তা সম্ভব হল না, মাঝিরা রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে আমরা উলুবেড়িয়া (Woolburreah) নামে একটি ছোট্ট গ্রামে রাত্রিবাস করলাম। কর্নেল আমাদের গরম গরম ভাত ও মাংসের ঝোল খাওয়াবেন আশ্বাস দিলেন। গ্রামের লোকের সঙ্গে তিনি এদেশী ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছেন দেখে আমরা সকলেই চমৎকৃত হলাম। তাঁর কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে 'নেটিবদে'র ভিড় জমে গেল। আমরাও হাসাহাসি করছিলাম দেখে কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, "আমি চেষ্টা করছি আপনাদের জন্যে গরম ভাত-মাংস যোগাড় করতে, বোঝাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর আপনারা হাসছেন ?" আমরা অবশ্য তাঁকে বোঝালাম যে তাঁকে দেখে আমরা হাসি নি, 'নেটিব'দের হাবভাব দেখে আমাদের হাসি পাচ্ছে, কারণ এ দৃশ্য আমরা আগে কোনদিন দেখি নি। কর্নেল ঠাণ্ডা হলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর চেষ্টা যে সফল হয়েছে, গরম ভাত-মাংস দেখে তা বোঝা গেল। প্রচুর পরিমাণে তাই আহার করে আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করলাম। সুরা সংযোগে খাদ্য খুব তাড়াতাড়ি গলা দিয়ে পেটে তলিয়ে গেল।

শেষ রাতে জোয়ার এল, পানসি ছাড়ল। ভোর হল, পানসির মাথার উপর আমরা উঠে বসলাম। নদীর পূর্ব-তীরে গার্ডেনরীচের দৃশ্য ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চমৎকার সব বাগানঘেরা বড় বড় বাড়ি, দেখতে অতি মনোরম—এ রকম সুন্দর দৃশ্য দেখলে কার না আনন্দ হয়! কোম্পানির বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা এখানকার সুন্দর পরিবেশে বাস করেন। কেউ কেউ কেবল গ্রীষ্মকালে কয়েকমাসের জন্য এখানে থাকেন, কেউ কেউ সব সময় এখানেই বাস করেন, শহরে কেবল কাজ-কর্ম করতে যান। চারিদিকের গাছপালায় যেন সবুজের বন্যা নেমেছে মনে হয়। নিসর্গে কেবল সবুজের ঢেউ—যেন রঙের তুফান উঠেছে। এ রকম অপূর্ব দৃশ্য দেখব—বিশেষ করে বাংলার মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—কল্পনা করি নি কখনও।

রীচের কোলে পানসি ভিড়ল। তীর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়ি। কী সুন্দর বাড়ি যে তা ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য নেই আমার। ভিতের উচ্চতা প্রায় তিরিশ ফুট। তার উপরে বাড়ি, বিশাল তার আয়তন, স্থাপত্যেরও মনোমুগ্ধকর নিদর্শন। সমস্ত গার্ডেনরীচটাকে বাড়িটা যেন দাবিয়ে রেখেছে। উঁচু ভিতের জন্য অন্যান্য বাড়িগুলোকে মনে হয় যেন তলায় হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। বহু দূরে—প্রায় ন মাইল লম্বা ও দু মাইল চওড়া জলের একটা আস্তরের উপর দিয়ে

র্ট উইলিয়ম ও কলকাতা শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা । আগাগোড়া নদীর জলের উপর ছোট বড় শত শত হাজ ও নৌকা নোঙর বেঁধে রয়েছে। তারই ভিতর ক যেন কলকাতা শহর নদীস্নান করে গাত্রোত্থান রছে তার বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে।

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রায় ৪০০ বিঘা জমির মধ্যে কর্নেল াটসনের বাড়ি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে এই ম গ্রাণ্ট দিয়েছিলেন—জাহাজঘাটের ও জাহাজ তৈরির ক নির্মাণের জন্য। তার মধ্যে তিনি অনেক ঘরবাড়ি রি করে ফেলেছিলেন—কামার ছুতোর ও অন্যান্য রিগরদের কাজের জন্য। এ ছাড়া আর-একদিকে তিনি বড় গুদামঘরও তৈরি করেছিলেন—জাহাজ তৈরির য়োজনীয় মালপত্তর ও যন্ত্রপাতি মজুত করার জন্য। তাঁর মির চারিদিকে কাঠও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ানো। ত্য কথা বলতে কি, পৃথিবীর আর কোন জায়গায় রকম বৃহৎ আকারে এত অর্থব্যয় করে যে এই ধরনের কটি বিরাট নির্মাণযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে বলে মার জানা নেই। বিশ্বকর্মার এক বিরাট কারখানা যেন াটসন সাহেব ফেঁদে বসেছিলেন। তাঁর বিপুল প্রচেষ্টা শ্চয় সার্থক হত, যদি না তাঁর বিরোধী কয়েকজন হীন-রিত্রের লোক তাঁর পরিকল্পনাকে বানচাল করার চেষ্টা রতেন। এমন জাহাজঘাট ও কারখানা তিনি তৈরি রতে পারতেন গার্ডেনরীচে, যার জন্য সারা এশিয়াতে টিশ জাতির সম্মান ও গৌরব বাড়ত।

ডক-নির্মাণের পরিকল্পনার ব্যাপারে কর্নেল য়াটসনের সঙ্গে আর একজন ব্যক্তি ছিলেন—তাঁর নাম জর আর্কিবল্ড ক্যাম্পবেল। তিনি বাংলাদেশে াম্পানির চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পরে মাদ্রাজের র্নর হন। এঁরা দুজন রাদারপুরে (Raderpore, দিরপুর) ডক-নির্মাণের পরিকল্পনা করে কোম্পানির নুমতিলাভের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। কোম্পানির রেক্টররা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন রেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় জমিও দান করার বস্থা করেন। জমি ছাড়া জাহাজ নির্মাণের অন্যান্য ন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বাংলাদেশে নিয়ে যাবার বিশেষ ব্যবস্থাও তাঁরা করে দেন। তার সঙ্গে তাঁরা বাংলার গবর্নরকে লিখে দেন যেন যথাসাধ্য তাঁরা ওয়াটসনের পরিকল্পনা কার্যকর করতে সাহায্য করেন।

১৭৭৭ সনের গোড়ার দিকে ওয়াটসন মেজর ক্যাম্পবেলের অংশ সম্পূর্ণ কিনে নেন, এবং নিজে তার একমাত্র মালিক হন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে যাত্রা করি, তখন তিনি এই জাহাজঘাট ও কারখানা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রায় একলক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড খরচ করে ফেলেছিলেন,—"an incredible amount for a private person to risk upon any speculation." বিলেতে যখন ওয়াটসনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেন। সমুদ্রপথে একসঙ্গে আসার সময় তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর হয়, এবং আমার অ্যাটর্নির ব্যবসায়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকজনের কাছে আমাকে চিঠিপত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। শুধু তাই নয়, আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতেও তিনি অনুরোধ করেন।

গার্ডেনরীচে পৌঁছে ওয়াটসনের জাহাজের কলকারখানা দেখে আমার খুব আনন্দ হল। আমরা যখন কারখানা দেখছিলাম, তখন তাঁর একজন ইউরোপীয় ম্যানেজারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতার খবর কি ?" "কিছু জানি না" বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "ওহো, বলতে ভুলে গেছি, দু জন বিরাট লোকের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে : একজন আমাদের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ক্লেভারিং, আর একজন বিচারপতি লা মেতর। আজই সকালে বিচারপতির স্মৃতির সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কামান দাগা হয়েছে—হয়তো শুনে থাকবেন।" জাস্টিস মেত্রের মৃত্যুতে মিস্টার মর্স ও আমার একটু ক্ষতি হল, কারণ আমরা দুজনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বিলেত থেকে চিঠিপত্র এনেছিলাম। বিলেতেই মর্স ও আমি ঠিক করেছিলাম যে আমরা একসঙ্গে একবাড়িতে থাকব। সেইজন্য মর্স একটি ভাল বাড়ি সন্ধান করতেও আরম্ভ করেছিলেন।

বেলা এগারোটার সময় আমার বন্ধু রবার্ট পট ফিটনে করে এসে হাজির হল। দুজনেই দেখা হতে খুব খুশী হলাম। পট বলল যে, সে আমার জন্য চমৎকার একটি

বাড়ির একাংশ সাজিয়েগুজিয়ে একেবারে ফিটফাট করে রেখেছে। এখনই সেটি আমার দখল করা দরকার, এবং তার জন্য তার সঙ্গে ফিটনে চড়ে এখনই সেখানে যাওয়াও দরকার। ওয়াটসন পাশে থেকে আমাদের কথাবার্তা হয়তো শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন যে তা হবে না, হিকি আমার এখানেই থাকবেন, এবং পট যখন ইচ্ছা ডক এলাকায় তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও গল্পগুজব করতে আসতে পারেন। তাতে তিনি আরও বেশী খুশী হবেন। এই কথা বলে তিনি পটকে সেইদিনই ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন, এবং পট তা গ্রহণও করল। আমাকে বারবার কলকাতায় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমি রাজী হলাম, এবং প্রায় চার মাইল পথ ফিটনে করে যেতে বেশ ভালই লাগল।

শীতকাল হলেও তখন সূর্যের তেজ বেশ কড়া ছিল। পট সোজা আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঠেলে তুলল। বাড়িটি হল সুপ্রিম কৌন্সিলের বিখ্যাত সদস্য রিচার্ড বারওয়েলের(২) (Richard Barwell)। তিনি তাঁর ছোটভাই ড্যানিয়েল বারওয়েল ও তার তিন বন্ধু পট, কেটর ও গসলিঙকে বাড়িটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পট আমাকে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, এবং বাড়ির যে-অংশ আমার জন্য ঠিক করা ছিল সেখানে আমাকে নিয়ে গেল। বিশাল বড় বড় ঘর—যেমন লম্বা চওড়া তেমনি উঁচু, এবং অত্যন্ত মূল্যবান সুদৃশ্য সব আসবাবপত্তরে সাজানো। শোবার ঘরে একদিকে বিছানাপাতা খাট, আর একদিকে একটি রাইটিং-ডেস্ক। ডেস্কের উপর দেখলাম, কতকগুলি চিঠি রয়েছে। পট বলল, এগুলি সে আমার জন্য লিখে রেখেছিল। যদি সে কোন কারণে আমার আসার সময় কলকাতায় উপস্থিত থাকতে না পারে এবং তার জন্য আমাকে যাতে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়, সেইজন্য এই চিঠিগুলি লিখে রাখা সে প্রয়োজন মনে করেছিল। সব চিঠিতে একটি কথাই লেখা ছিল এই যে দুনিয়ায় আমার চেয়ে অভিন্নহৃদয় বড় বন্ধু পটের আর কেউ নেই, এবং সেই কারণে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা সকলের কর্তব্য। যাঁদের কাছে চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল, তাঁদের নাম উইলিয়ম পামার(৩), জন শোর(৪) (এখন Lord Teignmouth), মণ্টগোমেরি, নেলার, পার্লিং, ডুকারেল, বার্ড, ব্রিস্টো, গ্রাহাম, হ্যাচ, অ্যাডেয়ার, এভেলিন ও জাষ্টিস হাইড।(৫)

বেলা একটার সময় সাধারণতঃ সাহেবরা মধ্যাহ্নভোজন করেন (হিকি একেই 'ডিনার' বলে উল্লেখ করেছেন)। আর বেশী দেরি নেই দেখে আমি ওয়াটসনের ডিনারের কথা পটকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। পটের ঘোড়া দুটি খুব ভাল ছুটতে পারত। আমরা খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম। পৌঁছে দেখি ওয়াটসন সাহেব আমাদের জন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। ডিনারে মিস্টার ক্লিভল্যাণ্ডও(৬) আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সেইদিনই সকালবেলা তিনি কলকাতা পৌঁছেছেন, এবং কর্নেলের কাছে তিনি তাঁর পালকি চড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে এরকম অদ্ভুত যান আগে কখনও তিনি দেখেন নি, এবং এরকম অভিজ্ঞতাও তাঁর কখনও হয় নি। পালকিতে তিনি চড়ে বসলেন, বেয়ারাদের কাঁধে পালকিও চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু চলার পথে বেয়ারাদের কণ্ঠের ধ্বনি শুনে ক্লিভল্যাণ্ড উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ধ্বনি যত বিলম্বিত টানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, তাঁর উৎকণ্ঠাও তত বাড়তে লাগল। তিনি ভাবলেন, হতভাগ্য পালকি-বেয়ারারা তাঁকে কাঁধে করে বহন করার জন্যই হয়তো চরম ক্লান্তিতে গোঙাতে আরম্ভ করেছে। অবিলম্বে তাদের রেহাই না দিলে তিনি নরহত্যার দায়ে পড়তে পারেন। সুতরাং তিনি থামাতে বললেন। কিন্তু পালকি কাঁধ থেকে নামিয়ে তিনি দেখলেন, বেয়ারারা বেশ মহানন্দে রঙ্গরসিকতা করছে। দেখে তিনি একটু অবাকই হলেন, কারণ তাদের গোঙানির মতন শব্দ শুনে তিনি ভেবেছিলেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যাবে। কিন্তু কোথাও তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, এমন কি তারা যে ক্লান্ত তাও তাদের কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় না। আবার তিনি তাই পালকিতে চড়ে বসলেন। পালকি চলতে লাগল এবং আবার সেই শব্দ শোনা গেল—হৈ আরে হোঃ, হৈ আরে হোঃ। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব এবারে আরও বেশী বিচলিত হয়ে পালকি থামাতে বললেন, এবং বেয়ারাদের হাতে একটি টাকা গুঁজে দিয়ে কোন কথাবার্তা না বলে

করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর ভরসা
। পালকি চড়তে।

ামরা সকলে ক্লিভল্যাণ্ডের পালকির গল্প খুব উপভোগ
ম। কর্নেল ওয়াটসন বুঝিয়ে দিলেন যে এদেশের
ক-বেয়ারারা এইভাবে সুর করে গান গাইতে গাইতে
ক বয়ে নিয়ে যায়। সামনে যে সর্দারবেয়ারা
সে পথের বিবরণ দেয়, অন্যেরা চলার মন্ত্রের
ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। যেমন—"সামনে
হৈ আরে; মাঠ রে ভাই, হৈ আরে; ওই যে
হৈ আরে; পুকুর ঘাট, হৈ আরে; খাল পেরুবি,
ারে" ইত্যাদি। ওয়াটসন এত সুন্দর করে
দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা যারা
ক চড়ি নি তারাও এদেশের পালকিমাহাত্ম্য বুঝে
াম।

রদিন ওয়াটসন আমাকে গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন
সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য গবর্নমেণ্ট
। নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রধান সেনাপতি ষ্টিবার্ট
ওয়েলের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। বারওয়েলের
ওয়াটসন কোন কারণে বিরূপ ছিলেন বলে মনে
বারওয়েল ছিলেন হেষ্টিংসের কৌন্সিলের একজন
এবং তাঁর সমর্থক। কৌন্সিলের আর একজন বিখ্যাত
ফিলিপ ফ্রান্সিস সেই সময় চুঁচুড়ায় বেড়াতে
ছলেন। তিনি কিভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করবেন,
ম্বন্ধে ওয়াটসনের মনে সন্দেহ ছিল। সন্দেহের
—তাঁরা দুজনেই যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন একটি
ঘটে যায়। ঘটনাটি এই :

র্নেল ওয়াটসন ব্রিটিশ সেনাবিভাগে তাঁর কর্মজীবন
রেন ইঞ্জিনিয়ারবাহিনীর সাবঅর্ডার্ন হয়ে। ওয়েস্ট
ক হাভানা অবরোধের সময় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব
। তারপর তাঁকে ইংলণ্ডে জরুরী তলব করে
হয়, এবং তিনি লণ্ডনে এসে দেখেন, লর্ড ক্লাইব
একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে
ৎ সাক্ষাৎ করার জন্য। ক্লাইব তাঁকে সঙ্গে করে
দেশে নিয়ে যাবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন,
ওয়ার-সেক্রেটারি ওয়েলবোর এলিসের কাছে এই
য়াটসনের জন্য আর একখানি চিঠিও তাঁর চিঠির
সঙ্গে লিখে পাঠিয়েছেন। সেই চিঠি নিয়ে ওয়াটসন
যথাসময়ে এলিসের সঙ্গে দেখা করেন। এলিস তাঁকে
যুদ্ধবিভাগের বড় কেরানীর কাছে তাঁর চাকুরিসংক্রান্ত
কাগজপত্র বুঝে নেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ওয়াটসন
তাঁর নির্দেশপত্র নিয়ে কেরানীর সঙ্গে দেখা করতে যান।
এই কেরানী হলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। সেক্রেটারির চেয়ে
কেরানী অনেক বেশী উদ্ধতচরিত্র ছিলেন। তাঁর
ব্যবহারের মধ্যে শিষ্টতার লেশ ছিল না, এবং তিনি তা
ওয়াটসনের প্রতি প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন নি। বড়বড়
কয়েকটি বাঁধানো ভলুম উলটেপালটে তিনি ওয়াটসনের
মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার মনে
হয় আপনি ভুল করেছেন। ওয়ার-সেক্রেটারির কাছে
না এসে আপনার যাওয়া উচিত ছিল অর্ডন্যান্স-বিভাগের
মাস্টার-জেনারেলের কাছে।" উত্তরে ওয়াটসন বলেন,
"কার কাছে আমার যাওয়া উচিত বা উচিত নয়, আশা
করি সেক্রেটারি এলিস তা বিলক্ষণ জানেন। অতএব
তা নিয়ে তর্ক করার মতন সময় আমার নেই। কাগজপত্র
দেবার থাকে দিন, না হয় এলিসের নোটটি ফেরত দিন,
আমি চলে যাই।" এই কথা বলে ফ্রান্সিসের টেবিলের
উপর থেকে এলিসের 'নোট'টি তুলে নিয়ে ওয়াটসন চলে
যান। যাবার সময় তিনি শুনতে পান, ফ্রান্সিস পেছন
থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে বলছেন, "শুনে যান মশাই, শুনে
যান, অত ব্যস্ত হবেন না।"

ওয়াটসন সোজা এলিসের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা
বলেন। ফ্রান্সিসকে এলিস ডেকে পাঠান, এবং তাঁর
ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁকে বেশ ধমকানি দেন। ফ্রান্সিস
তাঁর জীবনের এই ঘটনাটি ভুলতে পেরেছেন বলে মনে
হয় না, ওয়াটসন বললেন। এখন তিনি বিলেতের
কেরানী থেকে বাংলাদেশে গবর্নর-জেনারেলের কৌন্সিলের
সদস্য হয়েছেন। কলকাতার ইংরেজ-সমাজে হেষ্টিংস-
বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তাঁর প্রতিপত্তিও যথেষ্ট
আছে। তাই তিনি তাঁকে অতীতের কথা মনে করে
সাদরে অভ্যর্থনা করতে নাও পারেন বলে ওয়াটসনের
সন্দেহ হয়েছিল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা হবার পর
অবশ্য সন্দেহ তাঁর দূর হয়ে গেল। ফ্রান্সিস তাঁর সঙ্গে
যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করেছিলেন; আগেকার কথা মনে

করে কোন বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নি। অল্পদিনের মধ্যে ওয়াটসনের জাহাজঘাট নির্মাণের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস।

বন্ধু পটকে আমি 'বব' বলে ডাকতাম, এবং তা না ডাকলে সে রাগ করত। বব আমাকে একটা বগি ঘোড়া উপহার দিয়েছিল, তার পিঠে চড়ে রোজ আমি ব্রেকফাস্ট খাবার পর কলকাতায় বেড়াতে আসতাম। জাস্টিস হাইড ও তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে বব আমাকে আলাপ করিয়ে দিল। সুপ্রিম-কোর্টের চীফ জাস্টিস সার্ এলিজা ইম্পে(৭), ও সার্ রবার্ট চেম্বার্সের(৮) সঙ্গেও যথাসময়ে আলাপ-পরিচয় হল। উভয়েই আমার প্রতি খুবই সহৃদয় ব্যবহার করতেন। চেম্বার্স-পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল। মিস্টার ও মিসেস্ চেম্বার্স আমাকে তাঁদের বাড়িতে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতেন। লেডি চেম্বার্স যেমন রূপসী তেমনই গুণবতী মহিলা ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর আঠারো, দুটো সুন্দর সন্তানের জননী তিনি; একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সার্ রবার্টের মা-ও তখন বেঁচে ছিলেন; বৃদ্ধা হলেও সঙ্গী হিসেবে চমৎকার। এঁরা ছাড়া, উইলিয়ম জনসন ও উইলিয়ম স্মোল্ট নামে দুজন ক্লার্ক তাঁদের পরিবারে থাকতেন। আমি যখন কলকাতায় এলাম তখন এঁরা দুজনই মারা গেছেন।

কথা ছিল, মর্স ও আমি কলকাতায় এসে একসঙ্গে একবাড়িতে থাকব এবং কোর্টে প্র্যাকটিশ করব। কিন্তু মর্স বললেন, আমাদের পেশার দিক থেকে দুজনের একবাড়িতে থাকা ঠিক হবে না, কারণ আমরা বন্ধু বলে মক্কেলদের মনে সন্দেহ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আমরা আলাদা বাড়িতে থেকেই কাজকর্ম করব, এবং তাতে আমাদের বন্ধুত্বের হানি হবে না।

১২ নভেম্বর (১৭৭৭) সার্ এলিজা ইম্পে জানালেন যে পরদিন আমাকে কোর্টে হাজির হতে হবে অ্যাটর্নির তালিকাভুক্ত হবার জন্য। যথাসময়ে আমি কোর্টে হাজির হলাম, এবং বিচারকের সামনে যথারীতি শপথ করে সুপ্রিম কোর্টের সলিসিটর, অ্যাটর্নি ও প্রোক্টর হলাম। প্রোক্টর হওয়াতে আমার রোজগারের খুব সুবিধা হয়েছিল, কারণ ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা দ্বিগুণ 'ফী' পেতাম। আমার সহযাত্রী বন্ধু দুজনও (টিল্‌ঘম্যান ও মর্স) সেদিন অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে আমি শহরে সমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, চেনা-পরিচিতের সংখ্যাও বেড়ে গেল অনেক। ঘন ঘন চারিদিকে নেমন্তন্ন হতে লাগল। আগে থেকেই মদ্যপানের অভ্যাস করে ফেলেছিলাম জাহাজে আসার পথে অভ্যাসটি বেশ পোক্তও হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশে এসে ভোজের আমন্ত্রণে তা দিন দিন আরও বেড়ে যেতে থাকল। শ্যাম্পেন ও ক্ল্যারেট খুব বেশীমাত্রায় চালাতে আরম্ভ করলাম। স্বদেশে যা সহ্য হত, বিদেশে বাংলাদেশের পরিবেশে তা সহ্য হবে কেন? কিছুদিনের মধ্যেই অত্যধিক মদ্যপানের কুফল দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড মাথা ধরায় ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রণায় প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকতাম।

১৩ নভেম্বর আমাকে শহরে যেতে হয়েছিল কোর্টের কাজে। বেলা প্রায় একটার সময় বগিতে চড়ে ওয়াটসনের গৃহে ফিরছিলাম, এমন সময় পথে জাস্টিস হাইডের সঙ্গে দেখা হল—পালকিতে করে কোথায় যাচ্ছেন। আ[illegible] দেখে পালকির ভিতর থেকে ইশারা করে থামতে বললেন এবং খালি মাথায় এইভাবে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখে বেশ বকুনি দিলেন। বললেন যে, এদেশে এইভাবে রোদ্দুরে ঘুরলে শীঘ্রই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। আমার চেহারা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে বললেন, এখনই ডাক্তার দেখাতে। নিশ্চয়ই দেখাব বলে তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পেলাম। কিন্তু পরদিনই আমার একটি বেশ বড় ভোজে নিমন্ত্রণ ছিল কলকাতার এক বিখ্যাত ট্যাভার্নে। ভোজ দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়ম পামার। ট্যাভার্নের নাম 'হারমনিক' (Harmonic Tavern) (৯)। এত বড় একটা লোভনীয় ভোজ হাইডের পরামর্শে ছেড়ে দিতে একেবারেই ইচ্ছা হল না। নির্দিষ্ট দিনে ভোজ্য ও পানীয়ের প্রবল টানে হারমনিকে গিয়ে হাজির হলাম তখনও আমার মাজায় ও মাথায় রীতিমত যন্ত্রণা হচ্ছিল

এত বেড়ে গেল যে ভোজ অর্ধেক শেষ হতে না হতে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্যাভার্ন আমাকে চলে যেতে হল। কথায় বলে, লোভে পাপে মৃত্যু—আমারও সেই দশা হল। বব আমার বস্থা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে আমাকে রে তার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইল। আমিও হলাম, কারণ তখন আমার পেটে এমন সাংঘাতিক হচ্ছিল যে, ওয়াটসন সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত যাবার ক্ষমতাই ছিল না।

টের (বব) বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। াড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে চলে গেল, এবং কিছু- মধ্যেই জেম্‌স লেয়ার্ড ও তাঁর বড় ভাই জন লেয়ার্ড, ডাক্তারকে সঙ্গে করে ফিরে এল। জেম্‌স ও জন তখন এদেশে জন কোম্পানির সেরা ডাক্তার। জনের কথাবার্তা থেকে আমি পরিষ্কার বুঝলাম রা আমার সম্বন্ধে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তা ওষুধপত্রের যথাসম্ভব ব্যবস্থা হল, কিন্তু দ্রুত কোন াওয়া গেল না। সারারাত ধরে বমি করলাম। র দিকে ভুল বকতে আরম্ভ করলাম এবং চারদিন অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম পটের ঘরে।

রদিন পরে আমার চেতনা হল। মনে হল, কে মামাকে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কবল থেকে এইমাত্র য়ে তুলেছে। জেগে উঠে দেখলাম, আমার বিছানার প্রিয়বন্ধু পট ভৃত্যদের নিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখেমুখে বেদনার এমন ছাপ পড়েছে যে দেখলেই মনে হয় দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। ার কারণ তখন বুঝি নি, পরে বুঝলাম। আমার ডাক্তাররা নাকি সাফ জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, থামলেও থামতে পারে, কিন্তু বিকার থামবে না। কিছুক্ষণ আগে হয়তো বিকার থামতে পারে। র বিকারের ঘোর কেটে গেছে দেখে পটের তাই মনে য, হয়তো আমার শেষ মুহূর্তও ঘনিয়ে এসেছে। র বুকের উপর একখানি চাদর ঢাকা ছিল বলে ভীষণ ম লাগছিল। তার একটা দিক আলগা ঝুলছিল মামি পটের কাছে একখানা কাঁচি চাইলাম। পট মনে ভাবল, আমার বোধ হয় আবার বিকার দেখা দিচ্ছে। সুতরাং সে হন্তদন্ত হয়ে বলল, "না না, কাঁচিটাচি হবে না, চুপ করে শুয়ে থাক।" আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সে বুঝল না। আবার ডাক্তার ডাকা হল। এবারে দুজন নয়, সাতজন এলেন—ডঃ ক্যাম্পবেল, ডঃ স্টার্ক, ডঃ রবার্টসন, দুই লেয়ার্ড ভাই, এবং আমার দুজন জাহাজের সহযাত্রী ক্লিবল্যাণ্ড ও হোয়ার্থ। ডাক্তারদের গুরু-গম্ভীর বিষণ্ণবদন দেখে আমার মতন সাহসী রোগীরও প্রাণ উড়ে গেল। আমার মনোবল তখনও অবশ্য কিছুমাত্র কমে নি, এবং আমি যে মরব না সে বিশ্বাস আমার অটুট ছিল। কিন্তু সাতজন ডাক্তারকে দেখে মনে হল তাঁরা প্রত্যেকে যেন আমার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

এই হতাশার মধ্যে আমায় দশদিন কাটাতে হল। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাকি ডাক্তারদের মতে আমার 'যায় যায়' অবস্থা হত, এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্তও ভবনদীর পার থেকে ফিরে আসার আশা দেখা দিত না। এ রকম পরিত্যক্ত অবস্থায় আমাকে তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ল্যারেট পান করতে দিতেন এবং তার সঙ্গে বেশ তাজা কমলালেবুও প্রচুর পাওয়া যেত।

মধ্যে মধ্যে যখন প্রচণ্ড জ্বর উঠত, তখন বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটি গরম বাথটবের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হত। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এইভাবে কাটল, কোন উপকার হল না। অবশেষে গরম বাথটব থেকে একদিন ঘরে আসছি, এমন সময় আমার সর্বাঙ্গে গুটি বেরিয়ে গেল, এবং অফুরন্ত ধারায় ঘাম ঝরতে লাগল গা দিয়ে। ডাক্তার ক্যাম্পবেল তখন উপস্থিত ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনি তাড়াতাড়ি ভৃত্যদের ডেকে বললেন, পশমী শাল দিয়ে আমার গা ঢেকে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা জানাতেও তিনি ভুললেন না যে, এইবারই চরম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, এবং খুব বেশী দেরি হলে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার মানবলীলা শেষ হয়ে যাবে। তারপর বোধ হয় শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় আমার বিছানার পাশে তিনি বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার কয়েক মিনিট পরেই তিনি আমার বন্ধু পটকে আশা দিলেন যে, আমি হয়তো বেঁচে উঠতেও পারি। একটা নতুন ওষুধ

বেরিয়েছে—তাতে ভাল কাজ হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তাররা পরামর্শ করে বললেন, আমার পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা আছে।

পরদিন ১ ডিসেম্বর আমার অল্প একটু জ্বর হল বটে কিন্তু ওষুধ খেয়ে সহজেই তা সেরে গেল। ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। দীর্ঘদিন আমার দুর্বলতা কাটল না এবং খাবার রুচিও একেবারে চলে গেল। সাত আট দিন পরে একখানি কড়া টোস্ট খাবার উগ্র বাসনা হল। টোস্টের কামড় শেষ হতে না হতে ডঃ স্টার্ক এসে হাজির হলেন। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু খেয়েছেন কি ?" আমি বললাম, "দু-একখানা কড়া টোস্ট খেয়েছি।" "যাই হোক, খাবার যে রুচি হয়েছে সেটাই ভাল লক্ষণ, তবে কড়া টোস্ট খাবেন না, অপকার হবে।" এই কথা বলে স্টার্ক চলে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডঃ ক্যাম্পবেল এলেন, এবং ঠিক ঐ ভাবেই খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। আমি যখন টোস্টের কথা বললাম, তখন তিনি বললেন যে, রোগীর পক্ষে এর চেয়ে ভাল খাবার আর হয় না। সামান্য টোস্ট নিয়ে দুই ডাক্তারের এই মতভেদে আমি বেশ মজা উপভোগ করলাম। টোস্ট খেয়ে অবশ্য আমার উপকারই হয়েছিল, কোন ক্ষতি হয় নি।

ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম, কিন্তু এত ধীরে ধীরে যে ১৭ ডিসেম্বরের আগে আমি কারও কাঁধে ভর না দিয়ে একা হাঁটতেই পারতাম না। ডঃ ক্যাম্পবেল বললেন যে, জীবনে তিনি এই ধরনের অসুখ থেকে কাউকে আরোগ্যলাভ করতে দেখেন নি। এতগুলি ডাক্তার আমার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য সত্যিই আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পট ও তার ভৃত্যদের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশী। সে ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। পটের ভৃত্যদের মধ্যে একজন ছিল যে আগে লর্ড ক্লাইবের কাছেও কাজ করেছে। ক্লাইবের এই পুরাতন ভৃত্যটি অসুখের সময় সারাক্ষণ আমার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকত। কোনদিন তাকে দেখে মনে হয় নি যে সে ক্লান্তি বোধ করছে। তার এই রোগীসেবা দেখে সকলেই খুব অবাক হয়ে গেছে।

অসুখের পর আমার যখন খুব অরুচি হল তখন এই ভৃত্যটি এটা-ওটা নানারকমের খাবার নিয়ে আমাকে প্রায়ই সাধাসাধি করত, এবং বলত, "এটা খেয়ে নিন, অসুখ হলে লর্ড ক্লাইব এটা খেতে খুব ভালবাসতেন, এবং খেয়ে খুব উপকারও পেতেন।" মধ্যে মধ্যে যখন আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত তখন সে আমাকে নানাভাবে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্পগুজব করে চাঙ্গা করার চেষ্টা করত। কখনও কোন কারণে সে আমাকে দমে যেতে দিত না।

২৪ ডিসেম্বর ডঃ ক্যাম্পবেল অনুমতি দিলেন বাইরে বেরুবার। আমার জন্য একটি পালকি এল, এবং তার মধ্যে শালমুড়ি দিয়ে আমি উঠে বসলাম। অনেকদিন পরে জাহাজঘাটে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়ি ফিরে গেলাম। গঙ্গার ধারে ডক, সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমি দেহে ও মনে বল ফিরে পেলাম। তিনদিনের মধ্যে আমার খিদে এত বেড়ে গেল যে, খেয়ে আর তৃপ্তি হয় না। ১৭৭৭ সনের বাকী কয়েকটা দিনও এইভাবে কেটে গেল। ১ জানুয়ারি ১৭৭৮ আমি বেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠলাম। অসুখের চিহ্ন অবশ্য চেহারা থেকে তখনও যায় নি। শীর্ণ ও ফ্যাকাশে মুখচোখ দেখে বোঝা যেত যে দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে উঠেছি।

বাড়িতে ফিরে আসতে ওয়াটসন বললেন যে ক্লিভল্যান্ড একটি বড় বাড়ি দেখেছেন আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন বলে। বাড়িটি কোর্ট হাউসের কাছে। আমার কাজ-কর্মের খুব সুবিধা হবে বলে আমি তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাজী হলাম। কয়েকদিন পরে আরও একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি দেখতে গেলাম কলকাতায়। চমৎকার বাড়ি। যেমন জায়গা তেমনই বাড়ি—খোলামেলা এসপ্লানেডের উপর। দক্ষিণ ও পূব একেবারে খোলা। বাড়ি থেকে ভাগীরথীর চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। বাড়ির একমাত্র আপত্তিকর ব্যাপার হল—কাঁচা গাঁথনি। আগেকার দিনে বাংলাদেশের অধিকাংশ বাড়িরই গাঁথনি ছিল কাঁচা। এখন কলকাতা শহরে অন্তত এরকম কাঁচা গাঁথনির বাড়ি নেই। সবই চুনসুরকির পাকা গাঁথনির বাড়ি। এই বাড়ির ভাড়া ঠিক হল মাসিক তিনশো টাকা। কোন আসবাবপত্র নেই দেখে পট রীতিমত আশ্চর্য হয়ে

এবং বলল যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ফার্নিচার দিয়ে নিজে বাড়ি সাজিয়ে দেবে। তার জন্য আমাদের বারো-তেরো হাজার টাকা খরচ হল। ৬ জানুয়ারি ঁ আমি ও ক্লিভল্যাণ্ড নতুন বাড়িতে উঠে গিয়ে ত্র বাস করতে আরম্ভ করলাম।

পরদিন ৭ জানুয়ারি সুপ্রিমকোর্টের বার্ষিক উৎসবের । ঐদিন সার্ এলিজা ইম্পে, রবার্ট চেম্বার্স, র্টের অন্যান্য অফিসার ব্যারিস্টার ও অ্যাটর্নিরা সকলে বছরে জাস্টিস হাইডের গৃহে ব্রেকফাস্টে আমন্ত্রিত ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হলে তাঁরা সোজা লাইন দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে কোর্টের দিকে অগ্রসর হতে ন। এই শোভাযাত্রায় শেরিফ, আণ্ডার-শেরিফ ন, তাঁদের কনেস্টবলরাও যোগদান করে। ালত গৃহের সামনে এলে সুপ্রিম কৌন্সিলের একজন শোভাযাত্রায় যোগ দেন এবং বিচারকদের বেঞ্চে বসেন। এইভাবে তখন বিচারকদের সম্মান ন করতেন কোম্পানির শাসকরা। অল্পদিনের ই অবশ্য এই প্রথা উঠে যায়। পরে আর কোনদিন ালন করা হয়েছে বলে আমি জানি না।

কোর্টে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করার পর আমার মক্কেলের ব হয় নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বারোটি কশন' ও তিনটি 'ইকুইটি'র মামলা পেলাম। গোড়ার আমার একটু অসুবিধা হত, কারণ এদেশের ালতের হালচাল সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল তা হলেও আমার বিশেষ ক্ষতি হয় নি তাতে, ণ অ্যাটর্নি ও অ্যাডভোকেট বন্ধুরা আমাকে এ ারে বেশ তৎপর হয়েই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে ছিলেন। ঐদিন ৭ জানুয়ারি সার্ এলিজা ইম্পের তে আমার ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল। কোর্ট ভাঙার বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে আমি তাঁর গেলাম। ভোজসভায় শহরের অনেক গণ্যমান্য বেসুবোর সঙ্গে পরিচয় হল, এবং সময়টা বেশ ভালই ল।

পরদিন ৮ জানুয়ারি মিঃ ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাড়িতে বলিক ব্রেকফাস্টে'র নেমন্তন্নে যেতে হল। তখনকার অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাহেব-সমাজে এটাই ছিল আলাপ-পরিচয়ের রীতি। গবর্নর-জেনারেল ও তাঁর কৌন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে এইজন্য সপ্তাহে একদিন করে 'পাবলিক ব্রেকফাস্ট' দিতেন। আমার জাহাজের সহযাত্রী টিল্‌ঘম্যান ছিলেন ফ্র্যান্সিসের আত্মীয়, তাঁর বাড়িতেই তিনি থাকতেন। আমাকে দূর থেকে দেখে তিনি টেবিলের পাশে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় তিরিশজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি টেবিল ঘিরে বসেছিলেন, ফ্রান্সিস ছিলেন মাঝখানে। উঠে এসে টিল্‌ঘম্যান আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার কাছে যে পরিচয়পত্রগুলি ছিল সেগুলি তাঁকে দিলাম। আঙুল দেখিয়ে পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে বলে ফ্রান্সিস চিঠিগুলি সাগ্রহে পড়লেন। প্রথম চিঠিখানা পড়ে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তিনি অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে মাফ চাইলেন বটে, কিন্তু তারপর যা বললেন তাতে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। চিঠিখানা উলটেপালটে তিনি বললেন, "আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, মিঃ বার্ক কি করে ভাবলেন যে একজন অ্যাটর্নির কাজকর্মে সাহায্য করার মতন আমার সময় আছে!" এমন ভঙ্গিতে তিনি 'অ্যাটর্নি' কথাটা উচ্চারণ করলেন যেন তাঁদের মতন অবজ্ঞার পাত্র আর কেউ নেই।

এতগুলি বিশিষ্ট লোকের সামনে তাঁর এই উদ্ধত ব্যবহারে আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ হঠাৎ দেখি তিনি বেশ ভদ্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। আমাকে তিনি ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করলেন এবং শরীর কী করে সুস্থ রাখতে হবে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। যেমন পিত্ত ও পেটের ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি আমাকে প্রত্যহ সকালে খালি পেটে একগ্লাস এবং রাত্রে শোবার আগে আর একগ্লাস জল খেতে বললেন। লণ্ডনের কোন বিচক্ষণ ডাক্তার তাঁকে নাকি এই উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তা মেনে তিনি খুব ভাল ফল পেয়েছেন।

ডিনারে অনেকের সঙ্গে আলাপ হল, পরে কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়ে গেল। মিঃ ফ্রান্সিস একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কবে ইউরোপ রওনা হচ্ছেন।

"মাসখানেকের মধ্যে"—তিনি উত্তর দিলেন। তারপর পটের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কবে যাচ্ছেন?" পট আমার পাশে বসেই খাচ্ছিল। সে বলল, "তোড়জোড় কিছুই এখনও করি নি, সপ্তাহখানেকের মধ্যে করব।" পট যে ইংলণ্ডে ফিরে যাবে এ কথা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। আমি একটু অবাকই হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করতে পট বলল যে কথাটা শুনলে আমি দুঃখিত হব বলে সে এতদিন বলতে গিয়েও বলে নি।

ফ্রান্সিসের পর গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস থেকে আরম্ভ করে হুইলার, জেনারেল ষ্টিবার্ট, বারওয়েল প্রভৃতি প্রত্যেক বড়সাহেবের বাড়িতে একে একে ডিনারের নেমন্তন্ন হল। কলকাতা শহরের বড়সাহেবদের সমাজ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা কম হল না। অসুখের পর যতগুলি ডিনার খেয়েছি তার মধ্যে ড্যানিয়েল বারওয়েলের ডিনারের কথা আমার মনে আছে। ড্যানিয়েল আমার বন্ধু পটের সঙ্গে একবাড়িতে থাকতেন। তাঁর ভোজসভায় হুঁকো-খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আমার বহুদিন মনে থাকবে। সভায় পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে একটি সুন্দর সুসজ্জিত হুঁকো (গড়গড়া) তাঁরা আমার সামনে প্রজ্বলিত কল্‌কেসহ উপস্থিত করলেন। আমি কয়েকটা টান দিয়ে ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কৃতকার্য হলাম না। বারংবার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হলাম, তখন আমন্ত্রিতদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই পদ্ধতিতে ধূমপান না করলে কি কোন ক্ষতি হবে, না মর্যাদার হানি হবে? একজন বললেন, "নিশ্চয়ই হবে। কলকাতার সাহেবসমাজের এইটাই হল ফ্যাশান; হুঁকো না খেলে বড়সাহেবদের সমাজে আপনি কল্‌কেই পাবেন না।" আর একজন, অপেক্ষাকৃত একটু গম্ভীর-প্রকৃতির, আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ওসব চালবাজ ছোকরাদের কথায় মোটেই কান দেবেন না। আপনি যদি না পছন্দ করেন, তা হলে হুঁকো খেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। হুঁকো-খাওয়া আমাদের ইংরেজসমাজে একটা ফ্যাশান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে তাল দেবার কোন অর্থ হয় না। আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকেই হুঁকো খান না, অতএব আপনিও স্বচ্ছন্দে না খেতে পারেন।"

এই কথা শোনার পর আমি সেই যে হুঁকো ছাড়লাম, ভবিষ্যতে আর কোনদিন তা স্পর্শও করি নি। তাতে আমার উপকারই হয়েছে, কারণ হুঁকো যে কত অনর্থের মূল তা আমি বহু বন্ধুবান্ধবের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। হুঁকোর আসল সমস্যা হল, অনির্বাণ অগ্নি-সহযোগে কল্‌কেতে তামাক যোগানো। তার জন্য হুঁকোবরদার ভৃত্যের গভীর মনোযোগ চাই। কিন্তু যে-কোন ভৃত্যের কাছ থেকে তা পাওয়া যে কত কঠিন সকলেই জানেন। সুতরাং হুঁকোখোরদের জন্য ভৃত্যদের সব সময় তটস্থ থাকতে হয় এবং তাই নিয়ে গৃহে অশান্তির কারণ ঘটে।

ড্যানিয়েল বারওয়েলের এই ভোজসভাতেই আমি কলকাতার সাহেব-সমাজে প্রচলিত আর একটি অসভ্য প্রথা দেখে রীতিমত স্তম্ভিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। প্রথাটি হল, খাবার সময় রুটির টুকরোগুলি পাকিয়ে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারা (pelleting)। আরও আশ্চর্য হলাম দেখে যে, প্রথাটি কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত। কেউ কেউ গুলিটি এমনভাবে পাকিয়ে এত জোরে ছুঁড়তে পারেন যে, কারও চোখেমুখে লাগলে তিনি বেশ আঘাত পান। গুলিগুলো তীরের মতন গিয়ে গায়ে লাগে। ড্যানিয়েল নিজে এই ব্যাপারে এত দক্ষ ছিলেন যে, তিন-চার গজ দূর থেকে তিনি গুলি মেরে বাতি নিবিয়ে দিতে পারতেন, এবং দু একবার নয়—বার বার অনেক বার।

এই রুটি-ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার যে কোন ভদ্রসমাজের প্রথা হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। প্রায়ই এই ব্যাপার নিয়ে খাবার টেবিলে ঝগড়াঝাঁটি হত। অবশেষে একবার এক ভোজসভায় এমন একটি ঘটনা ঘটে যা নিয়ে তুমুলকাণ্ড সৃষ্টি হয়। জনৈক ক্যাপ্টেন মরিসন খাবার টেবিলে এই 'পেলেটিং' একেবারেই পছন্দ করতেন না। কোন ডিনারে গেলে তিনি গোড়াতেই সকলকে তা জানিয়ে দিতেন। তাঁর মিলিটারি মেজাজ দেখে সহজে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে রুটি ছুঁড়তেন না। একদিন কোন ভোজসভায় তাঁর এই সতর্কতা সত্ত্বেও একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন একটি রুটির টুকরোর বেশ কড়া গুলি পাকিয়ে ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য

ড়ে মারেন। লাগবি তো লাগ গুলিটি গিয়ে নর প্রায় রগের কাছাকাছি লাগে। ক্যাপ্টেন আঘাত পান, এবং যিনি ছুঁড়েছিলেন তাঁকে াতে ধরতে পারেন। তারপর তাঁর মাটনের কাঁচের ডিসটি তুলে ধরে, তিনি ঠিক একজন জাগলারের মতন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে দেন। অব্যর্থ লক্ষ্য—ডিসটি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পালে লাগে এবং অনেকটা কেটে যায়। কপাল রঝর করে রক্ত পড়তে থাকে। তারপরেই দুজনে 'ডুয়েল' আরম্ভ হয়ে যায়। এও ইংরেজ-সমাজে আর একটি অসভ্য প্রথা। ডুয়েলের মধ্যে ভা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মিলিটারি ক্যাপ্টেনের দ্রলোক পারলেন না। পিস্তলের গুলির আঘাতে ার মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। এর র্ঘদিন তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। স্বভাবতঃই ঘটনাটি অতি দ্রুত শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। বিশেষ করে সাহেব-সমাজে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং আমি যতদূর জানি, এই ঘটনার পর থেকে পেলেটিং-প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন সাটন ও কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে ট্যাভার্নে নেমন্তন্ন করে বেশ বড় একটি ভোজ দিয়েছিলেন। লৌকিকতার খাতিরে আমাকেও একটি পালটা ভোজ দিতে হল 'হারমনিক ট্যাভার্নে'। ভোজের দিন প্রায় উনচল্লিশ জন খেতে এলেন, এবং সকলেই বেশ গণ্ডেপিণ্ডে গিললেন। মদ্যপানও পর্যাপ্ত পরিমাণে চলল। অনেকে রাত্রি প্রায় তিনটে পর্যন্ত ট্যাভার্নে বসে অবিরাম পান করলেন, এবং ভোরবেলা আমাকে দু'হাত তুলে ধন্যবাদ দিয়ে টলতে টলতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন।

[ক্রমশঃ]

হেনরী ওয়াটসন ১৭৬৪ সনে কলকাতায় নির সার্ভিসে যোগ দেন। ফিল্ড-ইঞ্জিনিয়ার থেকে ঞ্জিনিয়ার হন। ১৭৮৬ সনে মারা যান।

। রিচার্ড বারওয়েল উইলিয়ম বারওয়েলের পুত্র। ম ১৭৪৮ সনে বাংলার গবর্নর ছিলেন। রিচার্ড সনে কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ানির রাইটারের কাজে ১৭৫৮ সনে যোগ দেন। এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতার সুপ্রিম লের একজন সদস্য মনোনীত হন। ফ্রান্সিস, রিং ও মনসনের বিরুদ্ধে তিনিই হেস্টিংসের প্রধান ছিলেন। ১৭৮১ সনে তিনি কৌন্সিলের সদস্যপদ করেন এবং প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে কলকাতায় তাঁর দুখানি বাড়ি ছিল। একটি ৪নং গুহারবার রোডে 'খিদিরপুর হাউস', আর একটি 'রাইটার্স বিল্ডিং'।

য়ারেন হেস্টিংস কলকাতা শহরে ছোট একটি ত থাকতেন—বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটে সেই বাড়ি আছে। আলিপুরে তাঁর বিশাল বাগানবাড়িতে একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জেনারেল ক্লেভারিং থাকতেন ওয়াটারলু স্ট্রীটের কোণে। সেই বাড়িতে এখন কাথবার্টসন অ্যাণ্ড হার্পারের দোকান। মনসন থাকতেন তার পাশেই ১নং মিশন রো। ফিলিপ ফ্রান্সিসের কলকাতার বাড়ি 'the best in Bengal' বলে পরিচিত ছিল। ডালহৌসি স্কয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে প্লে-হাউসের পিছনে ছিল তাঁর বাড়ি। আলিপুরে তাঁর যে বাড়ি ছিল তা পরে ২৪-পরগনার ম্যাজিস্ট্রেটের সরকারী কোয়ার্টার হয়।

৩। উইলিয়ম পামার ১৭৬৬ সনে এদেশে ব্রিটিশ সেনাবিভাগে যোগ দেন। ১৭৮২ সন পর্যন্ত হেস্টিংসের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিলেন। পরে লক্ষ্ণৌ সিন্ধিয়া ও পুণায় 'রেসিডেণ্ট' হন। ১৮১৪ সনে বাংলাদেশে বহরমপুরে মারা যান।

৪। জন শোর (লর্ড তিগেনমাউথ) ১৭৬৯ সনে কলকাতায় কোম্পানির রাইটার হয়ে আসেন; ১৭৭৫-৮০ রেভিনিউ কৌন্সিলের সভ্য হন। 'কমিটী অফ রেভিনিউ'র সভ্য এবং ঢাকা ও বিহারের রেভিনিউ কমিশনার হন। ১৭৮৭-৮৯ সুপ্রিম কৌন্সিলের সভ্য হন। জমিদারী ব্যবস্থার সপক্ষে, কিন্তু কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষে বহু লেখালেখি করেন। ১৭৯৩-৯৮ গবর্নর জেনারেল হন। একজন সুপণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি ছিল।

৫। জাষ্টিস জন হাইড ১৭৭৪ সনে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হলে জুনিয়র বিচারক নিযুক্ত হন। মহারাজা নন্দকুমারের বিচারে অন্যতম জজ ছিলেন। একুশ বছর একটানা জজিয়তি করে ১৭৯৬, জুলাই মাসে মারা যান।

৬। অগস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড ছিলেন সার্ জন শোরের আত্মীয়। ভাগলপুর মুঙ্গের ও রাজমহলের কলেক্টর ও দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন। ১৭৮৪ সনে সমুদ্রপথে বিপর্যয়ে মারা যান, কিন্তু কলকাতায় পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানে তাঁর দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হয়।

৭। সার্ এলিজা ইম্পে বর্তমান মিডলটন রো-তে লরেটো কনভেণ্টের গৃহে বাস করতেন। বিলেতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহপাঠী ছিলেন। ১৭৭২ সনে কমন্স সভায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সেল নিযুক্ত হন। সুপ্রিমকোর্টের প্রথম 'চীফজাষ্টিস' নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং নন্দকুমারের ফাঁসির রায় তিনিই দেন। ১৮০৯ সনে বিলেতে মারা যান। বার্ক (Burke) ও ফ্রান্সিসের উসকানিতে মিল, থর্নটন ও মেকলে বিচারক ইম্পেকে "One of the ogres of Indian history, a traditional monster of iniquity" বলে গেছেন। এঁদের অভিযোগ খুব সঙ্গত বলে মনে হয় না।

৮। রবার্ট চেম্বার্স আইনবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৭৪ সনে সুপ্রিমকোর্টের দ্বিতীয় জজ হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন, ইম্পের পর চীফজাষ্টিস নিযুক্ত হন। চেম্বার্স কাশীপুরে নদীর ধারে একটি বাড়িতে থাকতেন। শোনা যায়, ভবানীপুরেও (তখন গ্রামাঞ্চল ছিল) তাঁর একটি বিশাল বাগানবাড়ি ছিল।

৯। ১৭৭০-এর কিছু পরে মনে হয় 'হারমনিক ট্যাভার্ন' কলকাতার লালবাজার অঞ্চলে স্থাপিত হয়। কয়েকবছরের মধ্যেই হারমনিক যে কলকাতার উচ্চ-সমাজের সেরা মজলিসমহলে পরিণত হয়, এবং অভিজাতদের খানাপিনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে তা হিকির বিবরণ থেকে বোঝা যায়। হারমনিকের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার নিয়ে সাংবাদিক অগস্টাস হিকি (অ্যাটনি উইলিয়ম হিকি নন) প্রায়ই তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকায় ঠাট্টা তামাশা করতেন।

একক জীবন

কুমুদ ভট্টাচার্য

একটি বিস্তৃত কাল। সমস্তটা স্মৃতিতে বিধৃত।
তার আগে কিছু নেই। অর্থাৎ এমন কিছু নেই
যা আপন ইন্দ্রিয়ের চেনা, যার নীচে মর্মের স্বাক্ষর।
এই স্মৃতি ছায়ারূপী। এই ছায়া আমার জীবন।

ছায়া ছাড়া গাছ নেই। গাছটার সবটাই ছায়া।
আজিকে কেবল তার দাঁড়াবার ক্ষণ পাদপীঠ
যেখানে দাঁড়িয়ে গাছ পুরোপুরি ছায়াটাকে দেখে।
প্রতি আজ-অন্তে সেই ছায়া শুধু ক্রমদীর্ঘতরা।

ভবিষ্য কোথাও নেই। আজে তার পরিপূর্ণ রূপ।
আজে তার পরিপূর্তি, আজে তার পরিসমাপ্তিও।
একটি আজের পর গাছ আর কোনখানে নেই।
আজের অঙ্গন জুড়ে একদা একটি শূন্য পীঠ।

এতটুকু ছোঁয়া

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দা যা রহস্যময় মনে হয়েছিল, যা ছিল ছায়ায় ঢাকা; শৈশবের সীমানা পার হয়ে সেই পুরাতন হসা কেমন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, কখন কিভাবে যে অবগুণ্ঠন খুলে গেছে মনে পড়ে না। অর্থ হয়তো গেছে, তবু মন তাকে স্বীকার করতে রাজী নয়। তাকে গ্রহণ করেছিল সেইভাবেই সেইখানেই রাখতে চায়—নতুন অর্থের আবরণে তাকে আবার চায় না।

মার কাছে আজও তাঁরা 'ও-বাড়ির লোক'—এই টতেই তাঁদের পরিচয়, এর ভিতরেই সমস্ত রহস্য আছে। এখন হয়তো বুঝেছি যে কী আসল বয়সের সঙ্গে সেই রহস্যের চাবিকাঠিও হস্তগত, তাঁদের টুক্‌রো কথাবার্তা আচরণ আর ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই সেই শিশুমনের মাপকাঠিতেই কাহিনী বলা সঙ্গত—ঠিক যেমনটি সেদিন মনে আজ তার অর্থ খুঁজে পেলেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে করা চলবে না। আজ আবার শৈশবে ফিরে যাই কথা বলার জন্য—যেমনটি দেখেছিলাম, যেমন। বর্তমানের নিরিখে তাঁদের দেখলে মনে হয় তারা এই পৃথিবীর নন, অস্পষ্ট ছায়াঘেরা কয়েকটি ছবি, আসল মানুষ নন। তাঁদের ইতিহাস নেই, নেই, কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তবু কতদিন তাঁদের কথা শুনেছি, তাঁদের চলাফেরা নিয়ে মনে জাল বুনেছি, তাঁরা যেন আমাকে ওইভাবেই তাঁদের শিখিয়েছেন, ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন।

ছোট মাসিমার মধুপুরের বাড়িতে শীতকালটায় আমি মাস থাকতাম, তখন বয়স হয়তো এগারো কি। ছোট মাসিমা একাই থাকতেন, শহরের প্রান্তে খানি জায়গা নিয়ে তাঁর বাংলো, আর সামনেই চৌধুরী-গিন্নীর বাড়ি 'মধুভিলা'। চৌধুরী-গিন্নী যাবার পর মাসিমা সেই বাড়িটাও কিনে নিয়েছিলেন। ছোট্ট বাড়ি। দুখানি কামরা, সামনে বাগান, ছোট পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা। যেমন হয় এদিককার বাড়িঘর। মাসিমার ইচ্ছে ছিল বাড়িটা ভেঙে কিছু করা, তা আর হয় নি। শেষ পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া হবে স্থির হল। বাড়ির গায়ে লিখে দেওয়া হল "টু লেট" ইত্যাদি।

তারপর একদিন এঁরা বাড়ির সন্ধানে এসে হাজির হলেন।

আমি গেটের ধারে বসে ইট সাজিয়ে বাড়ি তৈরির খেলা করছিলাম। এমন সময় দেখলাম ওঁরা 'মধুভিলা'র সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছোট মাসিমাকে ডেকে আনলাম। মাসিমা এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোকটি বললেন, বাড়িটা আমরা নিতে চাই, কত ভাড়া?

তাঁর মুখটায় কিন্তু হাসি নেই, একটু যেন বিরক্ত ভঙ্গী। মনটা হয়তো ঠিক নেই, কিংবা অন্যমনস্ক। তাঁর পাশে যে মহিলাটি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি কোনও কথা বলেন নি। উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁর ভঙ্গী যেন উৎকণ্ঠায় ভরা।

মাসিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কতদিন থাকবেন? আপনি কী করেন?—লোকটি হেসে বললেন, কিছু না, লিখি। একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজছি, দু মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দেব।

মাসিমা তাঁর মুখের দিকে তাকালেন—একটু যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। লেখক সম্বন্ধে হয়তো কোন ধারণা ছিল না। হয়তো কিছু জানতেন। বললেন, লেখেন? বই লেখেন নাকি!

ভদ্রলোক বিরক্ত ভঙ্গীতে কপাল কুঁচকিয়ে নীরব রইলেন। এতক্ষণে মহিলাটি এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন, তারপর হেসে বললেন, উনি গল্প কবিতা এইসব লেখেন। এখানে আমাদের কেউ জানাশোনা নেই, তবে ভাড়া অ্যাডভান্স দেব।

মাসিমা বললেন, কী নাম?

গোলোক ঘোষ। আমরা কলকাতায় থাকি।

শুধু স্বামী-স্ত্রী? ছেলেপুলে নেই? কতদিন থাকবেন?

এইবারও সেই মহিলাই জবাব দিলেন, শুধু আমরা দুজন। শীতটা থাকব।

মাসিমা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বেশ তো, পছন্দ হয় থাকবেন। আমি চাবি নিয়ে আসি।

মাসিমা চাবি আনতে গেলেন, ওঁরা দুজনে চাপা গলায় কথা বলতে লাগলেন। ভদ্রলোক বললেন, তোমার কি মনে হয় গীতা, বাড়িটা বেশ বড় আছে না?

নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক বললেন, তোমার পছন্দ হয় তো?

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর এখন বেশ মধুর এবং মমতা মাখানো। মহিলাটি 'মধুভিলা'র দিকে তাকালেন। তার পিছনে প্রকাণ্ড প্রান্তর, অনেক দূরে পাহাড় কালো মেঘের মত দেখাচ্ছে।

মহিলাটি বললেন, পছন্দ! এ যদি না পছন্দ হয় তা হলে আর কি পছন্দ হবে বল। এ একেবারে স্বর্গ। এখানে বসে যা ইচ্ছে করা যায়, যা খুশি লিখতে পার। তোমারও কি তাই মনে হয় না দেবী? কী চমৎকার সেটিং!

ভদ্রলোক বেশ ভাল করে দেখলেন তাঁর দিকে, তারপর যেন সচকিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই গীতা। চমৎকার সেটিং!

এরপর দুজনেই সামনের সেই প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই নীল আকাশ আর পাহাড়, আর শান্ত পরিবেশ।

অনেক পরে ওঁদের মনে হল আমিও সেখানে আছি। মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে মুখে প্রসন্ন হাসি এনে বললেন, কি খোকা, তুমি এখানেই থাক বুঝি?

আমি একটু অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বললাম, না।

আমার সেই অপ্রতিভ ভঙ্গীটুকু তাঁদের অবশ্য চোখে পড়ল না। আমার উত্তরটুকুও যে তিনি শুনেছেন মনে হল না। আসন্ন সুখের সাগরে যেন তাঁরা ডুবে গেছেন এমনই মগ্ন-চৈতন্য ভাব।

ছোট মাসিমা ফিরে এসে সেই ধূলিমলিন পথ অতিক্রম করে তাঁদের 'মধুভিলা'য় নিয়ে গেলেন। বাড়িটা ওঁদের খুবই ভাল লেগেছিল মনে হল—বিশেষ করে তার মনোরম পরিবেশ। মাসিমা ত্রিশ টাকা ভাড়া চেয়েছিলেন আর বললেন, তাঁর অনেক ফার্নিচার আছে, দু-চারখানা ওঁদের দিতে পারবেন। ওঁরা তখনই ষাট টাকা দিয়ে বাড়ি নিয়ে নিলেন। এ বাড়িতে এসে চেয়ার-টেবিল-খাট ইত্যাদি কি কি নিতে পারেন তাও দেখলেন।

সেইদিনই তাঁরা বাড়ির সব বন্দোবস্ত করে নিলেন, বারবার এ বাড়িতে এসে চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি নিয়ে গেলেন। তার পরদিন কোন্ রহস্যলোক থেকে তাঁদের নিজের জিনিসপত্রও এল—স্যুটকেস, টাইপরাইটার, গ্রামো-ফোন, কিছু বই—এমনই সব কত কি। দ্বিতীয় দিন থেকে তাঁরা পাকাপাকি হয়ে বসলেন। টাইপরাইটারের শব্দ বা গ্রামোফোনের গান কিংবা হঠাৎ গেয়ে-ওঠা দু-এক লাইন গানে 'মধুভিলা' মুখরিত হয়ে উঠল।

কী যে ছিল ওঁদের মধ্যে কে জানে, আমার শিশুমনে কৌতূহলের আর সীমা রইল না। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁদের সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলাম। তাঁদের সবই ভাল, সবই মধুময়। দেবীবাবু বা ভদ্রলোকটি যদিও মাঝে মাঝে বেশ কোমল ও করুণ হয়ে ওঠেন তবু যেন কোথায় একটা বিষাদের ছাপ। সর্বদাই যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে এই ভাব। মাথার চুলগুলি সর্বদাই শুকনো, তার মধ্যে কয়েকটি বেশ সাদা; চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, গায়ের রঙ উজ্জ্বল। মুখের গড়নটি সুন্দর, টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁট। মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ। হাত দুটি বেশ লম্বা এবং কব্জি চওড়া, প্রচুর লোমে দুটি হাত যেন কালো হয়ে গেছে।

মহিলাটিও বেশ লম্বাচওড়া। ভারী চেহারাতেও একটা কোমলতা আছে। মাথার চুলগুলি বড় নয়—কাঁধ পর্যন্ত। তখন জানতাম না এর নামই ববছাঁট। এর আগে আর এমনটি দেখি নি। চোখ দুটি ছিল আশ্চর্য সুন্দর—সর্বদাই যেন জলে ভরা, টলটল করছে, বেশ ডাগর চোখ। চলাফেরার ভঙ্গিমাটুকুও চমৎকার। নদীর জলে বাতাস লাগলে যে-চঞ্চলতা জাগে সেই মৃদুতরঙ্গ তাঁর গতিভঙ্গিতে ফুটে উঠত। মুখে রঙ মাখতেন না, সাদাসিধে পোশাক।

সাদা শাড়িতে কী সুন্দর মানাত! সেই থেকে
াড়ি আমার ভালই লাগে না। পায়ে থাকত
চটি, তাতে পা দুখানি আরও সুন্দর দেখাত।
ীতে মুখের দিকে তাকাতেন, মনে হত যেন মমতা
য় ভরা—সবই যেন বুঝতেন, সব কিছুই তাঁর ভাল

এঁদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না—এক ষা
লোক। কিসে যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম,
য আকর্ষণ তা বলা শক্ত—শুধু এক দূরের মানুষ,
মানুষ। কোন এক অজ্ঞাত রহস্যলোকের মানুষ,
আর কি! আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ ছিল,
ল—অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যেমন হওয়া উচিত। তবু
য় করতাম আবার ভালবাসতাম—ভাললাগার
। ওঁদের দোরগোড়ায় বুভুক্ষু মন নিয়ে ঘুরে
ম কখন ডাকবেন এই আশায়। অতি ভোরে
দের বাড়ির সামনে ঝাউগাছের পাশটিতে দাঁড়িয়ে
, সন্ধ্যার পরও ঝাউগাছের পাশে দাঁড়িয়ে ওঁদের
দিকে তাকিয়ে থাকতাম—যেন এক রহস্যপুরীর
াঁড়িয়ে আছি। মাসিমা বিরক্ত হতেন, ডেকে
। কী যে দেখার আশা ছিল আমার মনে কে
তবু সেই শিশুমনে মনে হয়েছে ওঁদের মধ্যে
ক প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে, এমন এক আশ্চর্য সংবাদ
যা আমার কাছে স্বপ্নরাজ্যের সংবাদ এনে দেবে।
সই কৌতুকময়ীর নিত্যনতুন কৌতুকের সন্ধানে
য়নে তাকিয়ে থাকতাম।

। আসার কয়েক দিনের মধ্যেই একদিন বিকেলে
আমাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেলেন। যে
দেবীবাবু কাজ করতেন সেই ঘরটি ছোট মাসিমার
ফার্নিচারে চমৎকার সাজানো হয়েছে। ঘরটির
বেশ বেড়েছে। ঘরগুলিতে নতুন চুনকাম করা
বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। মেঝেগুলিও বেশ
-তকতকে। দেয়ালে কয়েকটি ছবি টাঙানো
একটি ছোট্ট বুক-সেলফে কয়েকটি বই।
ছেঁড়া সোফাটায় একটি কাশ্মীরী কাজ-করা
পড়েছে। ঘরের কোণে টুলটিতে একটি
গ্রামোফোন। তখনকার কালে গ্রামোফোন একটি বিচিত্র
বস্তু। গ্রামোফোনের গান শোনার জন্যে বোধ হয় কয়েক
মাইল হাঁটতে রাজী ছিলাম।

জানলার ধারে একটি ইজেল, তার ওপর অর্ধসমাপ্ত
ক্যানভাস, পাশের ছোট্ট টুলটিতে পেন্ট আর ব্রাস।
আমি সেই দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, কে ছবি
আঁকতে পারেন? আপনি নাকি!

গীতাদি বললেন, হ্যাঁ, আমি। একটু-আধটু আঁকি।
তোমার বুঝি ছবি ভাল লাগে?

আমি ছবির ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে বলি,
বা রে, পাহাড়ের ছবি! ওই পাহাড়ের ছবি আঁকছেন, না?

গীতাদি হেসে উঠলেন, তুমি দেখছি ধরতে পেরেছ!

অনেকক্ষণ সেদিকে চোখ রাখার ফলে পরিচিত জগৎ
চোখের ওপর ভেসে ওঠে। আমি বললাম, হ্যাঁ, ওই তো
বাদামপাহাড়!

গীতাদি এবার আরও জোরে হাসলেন, ঠিক বলেছ।

আমি বললাম, কিন্তু রঙটা তো ঠিক হয় নি। ওটা
কেমন সবুজ, আর আপনার ছবিটার গোলাপী রঙ।

গীতাদি খোলা জানলা দিয়ে মাঠের ওপারে
পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেমন এক
ধরা ধরা গলায় বললেন, মাঝে মাঝে আমার কাছে
গোলাপী মনে হয়। আচ্ছা একটু দাঁড়াও, সূর্য আর একটু
নামলে দেখো কেমন দেখায়। তখন হয়তো ঠিক রঙটি
দেখতে পাবে।

আপনার আরও ছবি আছে গীতাদি?

গীতাদি বললেন, আছে—অনেক আছে। তুমি দেখবে?

নিশ্চয়ই, আমি ছবি দেখতে ভালবাসি।

গীতাদি বুক-কেসের উপর থেকে একটি পোর্টফোলিও
তুলে নিয়ে এলেন, তারপর সোফার সামনে মাটিতে বসে
পড়ে সেগুলি মেলে ধরলেন। আমি ছবি দেখতে
লাগলাম আর গীতাদি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গুনগুন
করে গান গাইতে লাগলেন।

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম গীতাদি গান করছেন,
অতি মৃদু অথচ মধুর গলা। গানের কথাগুলি এতদিনে
আর স্মরণে নেই, তবে সুরটা আজও মনে আছে। কখনও
যদি হঠাৎ সেই সুর শুনি গানটাও মনে পড়বে।

হঠাৎ একসময় গান থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন গীতাদি। আমি তাঁর দিকেই চেয়ে আছি, চোখে বিস্ময়ের ঘোর নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সেদিন সেই চোখ অতি গম্ভীর অতি কালো এবং কোমল মনে হয়েছিল। অনেকক্ষণ এই ভাবেই রইলেন। আমাদের কারও মুখে কথা নেই, খালি দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে যেন অনেক কথা, অনেক সুর শুনলাম। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল। আমার সেদিন মনে হয়েছিল, গীতাদির মন আনন্দে ভরে আছে—এ আনন্দ তাঁর জীবনে এতদিন অনুপস্থিত ছিল।

অনেক পরে মৃদু হেসে ধীর গলায় গীতাদি বললেন, কি হল, ছবি দেখছ না?

আমি অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বললাম, দেখছি। কী সুন্দর!

আরও কয়েকটি ছবি আরও কিছুক্ষণ ধরে দেখলাম। বেশীর ভাগই বাড়ি-ঘর, পথের ভিড় এমনই সব দৃশ্য। এই শান্ত সুন্দর ঘরটির সঙ্গে ছবির কোনও সুরসঙ্গতি নেই। মাঝে মাঝে দু-একখানি পোর্ট্রেট দেখলাম, কিন্তু মুখগুলি বড় অস্পষ্ট। তারপর হঠাৎ দুজনের ছবি চোখে পড়ল, তার মধ্যে একজন দেবীবাবু। অপর ব্যক্তি অতি শীর্ণ, গৌরবর্ণ—মুখখানি একেবারে ছোট ছেলের মত। দেবীবাবুর মুখখানিও বিষাদ-মলিন।

আমি ছবিটিতে আঙুল রেখে বললাম, এই তো দেবীবাবু!

গীতাদি কী একটি বই দেখছিলেন, তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।

আমি আবার প্রশ্ন করি, আর ইনি কে?

আমাদের একজন বন্ধু, ওঁর নাম নিশীথ।

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন দেবীবাবু। বোঝা গেল তিনি অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছেন—বেশ শ্রান্ত ভঙ্গী। আমাকে দেখে বিশেষ প্রসন্ন হলেন না, তারপর যখন দেখলেন আমি ছবি দেখছি তখন তাঁর মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। তিনি কঠোর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন, ওকে এসব দেখানোর মানে?

যেন এই বিশেষ ছবিটাই আমাকে দেখতে দিয়েছেন গীতাদি, আর তাঁর সেই কাজটা মোটেই সমীচীন হয় নি।

কোনও উত্তর না দিয়ে দেবীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন গীতাদি। তারপর বললেন, ভুল হয়েছে দেবী। আমি ভুলে গিছলাম ছবিটা এর ভেতর আছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় দেবীবাবু বললেন, হয় ওটা পুড়িয়ে ফেল, নয়তো নিশীথকেই পাঠিয়ে দাও।

গীতাদি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর পোর্টফোলিওটা বন্ধ করে বললেন, আজ এই পর্যন্ত। এস খোকা, দেখ পাহাড়টা এখন গোলাপী দেখাচ্ছে—ঠিক আমার ছবির মত, নয়?

দেবীবাবু সোফার উপর বসে পড়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এ অতি বেয়াড়া দেশ, একেবারে বোরিং। কেমন যেন মরা শহর। কেউ কোথাও নেই।

গীতাদি বললেন, এত বেড়িয়ে তবু ভাল লাগল না?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেবীবাবু শুধু বললেন, রাবিশ।

মনে হল ছবির কথাটি তিনি এতক্ষণে হয়তো ভুলেছেন।

গীতাদি রঙের বাক্সটি আমার হাতে দিয়ে ইজেল আর ক্যানভাস নিয়ে বললেন, চল খোকা, বারান্দায় গিয়ে বসি, এই গোলাপীটুকু আর থাকবে না। কেমন গোলাপী দেখেছ?

আমি বললাম, না, এ তো ঘন সবুজ, নীলও বলা চলে

গীতাদি হেসে উঠলেন। তারপর বারান্দায় বসে ক্যানভাসে রঙ চড়ালেন। মুখে সেই সুর, সেই গুনগুন গান।

আমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছি। আবার ছবির দিকে দেখি। গীতাদির পাহাড়ের ছবিটা কেমন গোল হয়ে এসেছে, কেমন যেন তরঙ্গায়িত—যেন জলের ঢেউ।

তারপর আবার পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করলাম। এইবার পাহাড়টি ওই রকম তরঙ্গায়িত এবং গোলাপী মনে হল।

আমি বলে উঠলাম, এইবার গোলাপী হয়েছে।

গান এবং ছবি আঁকা না থামিয়ে গীতাদি হাসলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, কেমন সুন্দর দুধে-আলতা রঙ।

সেই সময় আমার সেই বয়সে মনে হল, পাহাড়
থ কী হয়ে এসেছে, তাঁর কাছে পাহাড় কী!
চোখের পাহাড় আর তাঁর চোখের পাহাড়ে কেন
ক্য!

দির ছবিতে অবাধ স্বাধীনতা, আশ্চর্য তার বর্ণ-
, অপূর্ব তার বলিষ্ঠতা!

সব ভাবছি, গীতাদি ব্রাসটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে
না, এ আমার হবে না। অনেকদিন বাড়ি-ঘর আর
কেছি, আর নয়।

ন থেকে কে বলে উঠল, ননসেন্স! তোমার
য়ছে তো।

রা দুজনেই সচকিত হয়ে পিছনে মুখ ফেরালাম।
সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেটি ছুঁচো
ত দূরে পড়ল।

ার কিন্তু দেবীবাবু গীতাদির দিকে তাকিয়ে
। সে মুখে আর সেই বিরক্তির ছাপ নেই,
শুধু নিবিড় ভালবাসা। দেবীবাবু বললেন, মাথায়
একটা আইডিয়া এসেছে গীতা।

ঘটনার পর আরও ঘনিষ্ঠ হলাম আমি। সন্ধ্যার
অনেকদিন বারান্দায় ওঁদের সঙ্গে বসে থাকতাম,
বাহাদুরকে দিয়ে ডেকে পাঠাতেন। আমি ওঁদের
দেখতাম, চুপ করে বসে ওদের কথা গিলতাম।
বা সবাই চুপচাপ। পাহাড়ের হাওয়া, কোথাও
পাখির ডাক, কোথাও দূরে রেল-ইঞ্জিনের স্টীম
শব্দ। কখনও বা সাঁওতালী ছেলের ভেসে আসা
সুর। বিচিত্র নিসর্গ দৃশ্য চোখ ভরে সবাই পান
। কখনও দুজনের কেউ গুনগুন করে গান
—আমরা শুনতাম। খুব কমই কথা হত।

মি মহা আনন্দে আছি। ছুটি কাটাতে এসেছি।
র ভয় নেই সামনে, ভাবনা নেই, শুধু শুনছি আর
।

। সুখী। আনন্দে আছে। দিন কাটছে। প্রথমটা
া করলেও আমিও বুঝছি ওদের কোথাও যেন
াক রয়ে গেছে, কেমন একটা নিরাসক্ত নিস্পৃহতা
দুজনের ব্যবহারে। কিন্তু এই পর্যন্ত, এর বেশী কিছু
নয়। দেবীবাবুকে মাঝে মাঝে লিখতে দেখতাম।
লেখার সময় প্রচুর সিগারেট খেতেন, মুখে থাকত তৃপ্তির
ছাপ। তারপর লেখা শেষ হলে গীতাদি ঘরের যেখানেই
থাকতেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতেন, গীতাদি
বুঝতেন, আমিও যেন বুঝতাম। এই আনন্দে আমারও
অংশ কম নয়।

কখনও লেখা শেষ করে সোফায় বসে পড়ে বলতেন,
এইবার যা লিখলাম গীতা, দেখো এর একটা দাম পাবই।
এ রকম আর লিখি নি আগে।

এ কথাটি প্রায় বলতেন দেবীবাবু। হঠাৎ উঠে
দাঁড়িয়ে বলতেন, ওয়ানডারফুল! এমনটি আর কখনও
লিখতে পারি নি।

তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে আদর
করতেন, তুলে ধরার চেষ্টা করতেন—কেমন একটা উন্মাদ
আনন্দ, উৎসাহের আধিক্য।

গীতাদি সেদিকে তাকাতেন না, জানলার ধারটিতে
বসে উদাস নয়নে বাইরে চেয়ে থাকতেন। তারপর
হয়তো বলতেন, জান দেবী, স্কুলে যে সব রচনা লিখতে
দেয় তার মধ্যে 'নগরজীবন বনাম গ্রামজীবন' এই বিষয়টি
বেশী পপুলার। মনে আছে তোমার?

দেবীবাবু চিৎকার করে বলে উঠতেন, সব উৎসাহটা
'ল্যাণ্ডস্কেপে' খরচ করে দেউলে হয়ে যেয়ো না।

গীতাদির গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসত, আর তাঁর
বক্তব্যের অর্থ ঠিক বুঝতে পারতাম না। তিনি বলতেন,
না দেবী, ল্যাণ্ডস্কেপটা তুচ্ছ নয়, এর ভেতরই ওই স্কুলের
রচনার মর্যাল লুকিয়ে আছে—'নগরজীবন বনাম গ্রাম-
জীবন'। এ এক অদ্ভুত বিষয়বস্তু। গ্রামে মানুষের
ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠার একটা সুযোগ আছে—নগরে সে
জনতার একজন। এই পার্থক্য আছে ল্যাণ্ডস্কেপে,
সেটাই আনতে হবে।

দেবীবাবু এমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন যে মনে
হত তিনি কিছুই শোনেন নি। তারপর হঠাৎ বলতেন,
তোমার তর্ক শুনতে ভারী ভাল লাগে। ভারী সুন্দর
দেখায় তোমাকে। এত লাজুক কেন তুমি? শহর
তোমাকে চালাক করতে পারে নি।

গীতাদি আমার দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলে

ওঠেন, কী সব বোকার মত কথা হচ্ছে। খোকন আমরা ভারী বোকা, নয়? তোমার কি মনে হয়?

আমি বোকার মত হাসি, বিড়বিড় করে কিছু বলবার চেষ্টা করি। তারপর বলি, আপনারা কথা বলুন, আমার শুনতে ভারী ভাল লাগে।—আমার কাছে ওঁরা এক বিচিত্র বিস্ময়। তাই দিনরাত ওঁদের সঙ্গে কাটাতেই ভাল লাগত, ছাড়তে ইচ্ছে করত না একটুও।

একদিন শুধু একটু কেমন লেগেছিল, কেমন যেন খাপছাড়া। তখনও অবশ্য নিশীথবাবুর আবির্ভাব হয় নি।

বিকেলবেলা মাঠের শেষে পাহাড়ের কোণ ঘেঁষে আমাদের পিকনিক হচ্ছিল। চা, হাতে তৈরী সন্দেশ—তার ওপর একটি করে গোলাপফুলের পাপড়ি দেওয়া, মাংসর সিঙাড়া এমনই অনেক রকম। গীতাদি সারাদিন ধরে তৈরি করেছেন। দেবীবাবু নিজে হাতে তিনখানি ইট তিন পাশে সাজিয়ে উনুন তৈরি করেছেন। চায়ের জল চাপানো হয়েছে। আমিও হংসমধ্যে বকের মত বসে আছি। কারও মুখে কথা নেই, সবাই খুশী।

সহসা গীতাদি বললেন, দেবী, আজ ডাক দেখা হয় নি। আমরা তার আগেই চলে এসেছি।

দেবীবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, গুড গড। আজকের ডাকেই ওদের চিঠিটা হয়তো আসবে। তোমরা বস, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসব।

যেতে যেতেই দেবীবাবু বললেন, চা-টা রেডী কর, আমি আসছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন দেবীবাবু। তাঁর পা যেন ঠিক নেই—কেমন একটা বিশ্রী উন্মনা ভঙ্গী। আমাদের এই পিকনিকে তাঁর আর এতটুকু উৎসাহ নেই।

গীতাদি ঠিক বুঝেছিলেন, বললেন, কী হয়েছে দেবী? কিছু খারাপ খবর?

দুর্বল ভঙ্গীতে হেসে দেবীবাবু বললেন, এই নাও, দেখ।

চিঠিটার উপর চোখ বুলিয়ে গীতাদি খুশী মনে বলে উঠলেন, বাঃ, চমৎকার। এত শীগগির খবর এসে গেল! আমাদের মধুপুর যাত্রা তা হলে শুভ হয়েছে বল। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এইবার তোমার জয়-জয়কার।

আমি বুঝলাম লেখার ব্যাপার। কিছু একটা ভাল খবর নিশ্চয়ই। কিন্তু দেবীবাবুর মুখে আনন্দ নেই কেন? অন্যদিকে মুখ রেখে চায়ের কেটলিটা নিয়েই দেবীবাবু নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

গীতাদি তো আহ্লাদে আটখানা। বললেন, এতবড় একটা নিউজ—তোমার আনন্দ হচ্ছে না দেবী?

নিশ্চয়ই গীতা। আনন্দেরই তো কথা। কিন্তু আর একটা চিঠিও এসেছে, সেটা তেমন ভাল নয়।

দেবীবাবুর কণ্ঠস্বর এবার অতিশয় গম্ভীর।

কী সেই খবর? খারাপ কিছু?

প্রথমটা জবাব না দিয়ে ওঁর দিকে তাকালেন দেবীবাবু, তারপর অতি মৃদু গলায় শুধু বললেন, নিশীথ আসছে।

গীতাদি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। প্রথমটা কোনও কথা বললেন না। একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, তুমি বরং একটা তার করে দাও, আমাদের এখানে জায়গা নেই।

মাথা নেড়ে দেবীবাবু বললেন, তার আর সময় নেই, সে এতক্ষণে ট্রেনে চেপেছে। নিশীথের কাজে খুঁত নেই।

দেবীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর যখন আবার কথা বললেন তখন মনে হল আমি না থাকলে হয়তো কাঁদতেন। আবেগভরে বললেন দেবীবাবু, কেন নিশীথ আসছে? এতটুকু শান্তি সে কি দেবে না আমাদের?

গীতাদি এইবার হাসলেন, বললেন, আসুক। এই আসাটারও প্রয়োজন ছিল। সব গল্পের আরম্ভ আছে, মধ্যিখান আছে, শেষ আছে—এই তো লজিক। এই গল্পের মিলের খাতিরেই নিশীথ এখানে আসছে। তবে আসুক নিশীথ—সে আমাদের এই ভালবাসার পাহাড়ে এতটুকু দাগ কাটতে পারবে না।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেবীবাবুকে টেনে বসালেন। তাঁর গায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন—যেমন ছোট ছেলেকে সবাই করে।

এরপর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এই প্রসঙ্গ চাপা পড়ল বটে, তবে সেই সন্ধ্যায় কারও মনে শান্তি ছিল না।

াবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে এক একটি তারা :তে দেখলাম।

থবাবু এলেন। পরদিন 'মধুভিলা'য় এসে বুকে দেখলাম। গ্রামোফোন বাজছে, তবে কেমন ভুত ইংরেজী সুর। নিশীথবাবু সেই সুরের তালে চ্ছন। তারপর আমার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে লন।

াকে গীতাদি বললেন, এই তোমার নিশীথবাবু।

থবাবু বললেন, ইনি আবার কে?

াদি হেসে বললেন, আমাদের খোকন, এর কথাই ম।

থবাবু আমার দিকে অনুগ্রহভরা দৃষ্টিতে চাইলেন ছু বললেন না।

র মধ্যাহ্ন, চারিদিক শুব্ধ, রোদের এতটুকু তেজ আছে বটে কিন্তু সে রঙ ফিকে, দুপুর না হতেই চ্ছ সন্ধ্যে হয়ে এল। নিশীথবাবু রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আর যাই হোক, জায়গাটা রিবিলি—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

াদি ও দেবীবাবু কোনও জবাব না দিয়ে ওঁর মুখের াকিয়ে রইলেন।

মাদের বেশ ভাল লাগছে?

বিরক্তির ভাব চেপে রেখে দেবীবাবু বললেন, তা লাগছে।

ার শুব্ধতা। নিশীথবাবু আবার হঠাৎ বলে শোন, আমি এমন হঠাৎ চলে এলুম—তোমাদের আপত্তি নেই তো? আমি অতশত ভাবি নি

াদি বললেন, বোকার মত কথা বলো না নিশীথ। ালই করেছ, তোমারও হয়তো ভাল লাগবে।

থবাবু বললেন, তা হলেই ভাল। আমার কেমন হয়তো তোমাদের ভাল লাগছে না। তোমরা কেমন যেন পেঁচার মত গম্ভীর মুখ করে আছ। াক পুরনো বন্ধু তো! কি বল?

াবাবু কোনও কথা না বলে বাইরের বারান্দায় চলে রেলিঙে হেলান দিয়ে সিগারেট খেতে লাগলেন। নিশীথবাবুও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে বয়সে অনেক ছোট মনে হয়, শরীরটাও পাতলা।

আমি আর গীতাদি ঘরের ভেতর থেকে লক্ষ্য করলাম, নিশীথবাবু হাত-পা নেড়ে কী সব বলছেন, বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে পায়চারি করছেন। একবার দেবীবাবু হাসলেন—যেন না হেসে উপায় ছিল না, নিশীথবাবু নিশ্চয়ই কিছু মজার কথা বলেছেন।

গীতাদি বারান্দা দিয়ে নেমে যেতে যেতে বললেন, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

কোনও উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। দেবীবাবু তাঁর নতুন উপন্যাসের প্লট নিশীথবাবুকে বিস্তারিত বলছেন। নিশীথবাবু শান্ত ভঙ্গীতে শুনছেন, দেবীবাবুর মুখের ওপর তাঁর লক্ষ্য।

নিশীথবাবু মাঝে মাঝে বলছেন, ইট ইজ গ্রেট—সিম্পলি গ্রেট।

দেবীবাবু শিশুর মত সরল ভঙ্গীতে বলেন, সত্যি বলছিস! তোর ভাল লেগেছে?

সত্যি দেবু, ইউ আর গ্রেট!

আমি ভাবলাম দেবু বলে ডাকেন কেন নিশীথবাবু! গীতাদি বলেন দেবী, সে বেশ শোনায়। তবে দেবীবাবুর এসব দিকে নজর নেই। সহসা বললেন, যাই লিখি গে, এই সময়টাই রোজ লিখি আজকাল।

নিশীথবাবুও সঙ্গে গেলেন, আমিও আবার ভেতরে গেলাম। দেবীবাবু লিখতে বসলেন, নিশীথবাবু তাঁর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে একবার আড়চোখে নিশীথের মুখের দিকে তাকান দেবীবাবু। নিশীথবাবু হাসেন—সে হাসি কেমন ম্লান, তাতে প্রাণ নেই।

নিশীথবাবুর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, আপনি কি দেবীবাবুর ভাই?

কেন যে এই প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছিল জানি না। নেহাত বালসুলভ চপলতা। নিশীথবাবু হাসলেন, তারপর দেবীবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা দুজনে ভাই।

কিন্তু আপনাকে তো দেবীবাবুর মত দেখতে নয়?

সব সময় একরকম দেখতে হয় না।

আমি চুপ করে রইলাম। হয়তো এ কথাই ঠিক, ওঁরা দুজনে ভাই। আবার না হতেও পারে।

এখন কিন্তু ওঁদের ব্যবহারটা ঠিক ভ্রাতৃজনোচিত নয়। কেন না হঠাৎ দেবীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বোকার মত কথা বলো না নিশীথ।

দেবীবাবু কথাকটি বলে আবার লেখার দিকেই মন দিলেন, কিন্তু কিছু আর লিখলেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

নিশীথবাবু শুধু বললেন, ধীরে রজনী, ধীরে—

তোমার মুণ্ডু। আমার ইয়ারকি করার সময় নেই।

দেবীবাবুর চোখে যেন ঘৃণার আগুন জলছে। দুজনের মধ্যে এতখানি বিদ্বেষ ও জ্বালা আগে আর কোনদিন দেখি নি।

তারপর দেবীবাবু হঠাৎ উঠে বাইরে চলে গেলেন।

নিশীথবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সব বিষয়েই চ্যাংড়ামি। তুমি এ সব বুঝবে না।

আমি সত্যি কিছু বুঝি নি, চুপ করে বসে রইলাম। সেদিন মনে নিদারুণ অস্বস্তি আর অশান্তি জাগল। কি যে ব্যাপার জানি না, তবে দেবীবাবুর চোখেমুখে একটা ভীষণ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করলাম।

একটু পরেই গীতাদি ফিরে এলেন। যেখানে দেবীবাবু বসেছিলেন সেখানে একটু দাঁড়ালেন। তারপর দেবীবাবুকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। তখন সকলের মুখেই হাসি ফুটেছে।

আমি সুযোগ বুঝে নেহাত ছেলেমানুষের মতই আবার প্রশ্ন করলাম, গীতাদি, নিশীথবাবু কি দেবীবাবুর ভাই?

বিস্মিত গীতাদি বললেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

নিশীথবাবু বলছিলেন।

দেবীবাবু চিৎকার করে উঠলেন, নিশীথটা ইডিয়ট।

গীতাদি সবাইয়ের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন, বিশেষ করে দেবীবাবুর দিকে। দেবীবাবু মাথা নীচু করে রইলেন। তারপর অনেক পরে আমাকে বললেন, আমিও জানি না ভাই—সত্যি জানি না।

দেবীবাবু কি ভেবে বললেন, না, আমরা ভাই নই—বন্ধু। নিশীথ তোমার সঙ্গে চালাকি করছিল।

আমি শুধু বললাম, ও!

বুঝলাম, আমিই নেহাত বোকার মত এক সংকট সৃষ্টি করেছি। বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমি স্বেচ্ছায় যে ভাবে এঁদের সঙ্গে এসে ভিড়েছি, এখন যেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। ওঁরা তিনজনেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনজনে তিন দিকে মুখ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন—কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে।

নিশীথবাবুর আবির্ভাবের সঙ্গেই কেমন যেন তাল কেটে গিয়েছিল। আর কিছুতেই সুর জমছিল না। আগের মত আর এতটুকু নেই। মাঝে মাঝে এমনই সংঘর্ষ লেগে থাকত। তারপর এক পক্ষ অনেকক্ষণের জন্যে বাইরে বেড়াতে যেত, অনেক পরে ফিরত। ফিরে আসার পর আবার পাওয়া যেত পুরনো উত্তাপ, কিন্তু নিশীথের সংস্পর্শে সেই উত্তাপ হিমশীতল হয়ে উঠত।

নিশীথ আর দেবীবাবুকে বোঝা দায়—কখনও খুব ভাব, দুজনে গান করছেন, কবিতা আবৃত্তি করছেন, দেবীবাবু নতুন লেখাটা পড়ে শোনাচ্ছেন, নিশীথ বাহবা দিচ্ছেন, আবার কখনও উভয়ের চোখে জ্বলে উঠত হিংস্র শ্বাপদের বন্য আক্রোশ।

সবই কেমন বেতালা, বিশ্রী। আর সেই বাইরে ব[সে] তারা দেখা নেই, পাহাড়ের গায়ে পিকনিক নেই, সবই কেমন চুপচাপ। মাঝে মাঝে গ্রামোফোন বাজে—নিশীথবাবু নিজে গাইয়ে, তাঁরই গানের রেকর্ড। দেবীবাবু বা গীতাদিকে কখনও রেকর্ড বাজাতে দেখি নি। সব দোষটাই যেন নিশীথের। কিন্তু কী যে তাঁর দোষ বুঝতাম না, তাঁকেও আমার ভাল লাগত আর সকলের মত। কিছুতেই বুঝতাম না এঁদের এত অশান্তির কারণ কি।

একদিন গীতাদি আর আমি অনেকদূর পর্যন্ত বেড়িয়ে ফিরে এলাম। বাংলোয় ঢুকে দেখি দেবীবাবু সোফায় বসে শিশুর মত কাঁদছেন, নিশীথবাবু তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, তাঁর হাত দুটি নিশীথবাবুর কাঁধের ওপর। দেবীবাবুর কান্নার

৷থবাবুর হাত ছুটি কম্পমান। ছুটি ঘটনাই কিন্তু
ছে।

। আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন দেবীবাবু,
রে গেলেন। দেবীবাবুর মুখটা কী বিশ্রী হয়ে
ন কতদিন অসুখ করেছিল, যেন অনেকদিন
ত দেয় নি কেউ। তিনি অতি কষ্টে বললেন,
শেষ—সব শেষ।

দির মুখে এতখানি ঘৃণা রাগ এবং জ্বালা আগে
খ নি। তাঁর মুখখানি একেবারে সাদা হয়ে
তিনি অনেক পরে বললেন, তোমার কী করেছি
নশীথ? কেন তুমি আমাদের সর্বনাশ করতে
আমাদের একটু একা থাকতে দিতে পার না?

বাবু বিশ্রী ভঙ্গীতে হেসে বললেন, ওরকম করে
কে তাকিয়ো না গীতা, আমার কী দোষ।
রজিত আছে। এসব তোমার অজানা নেই—
াই সবটা জানা ছিল তোমার।

দ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, স্বার্থপর, ক্রূট।
ষ কাণ্ড কিছুই বুঝি নি। আমার কেমন ভয়
হল। ছোট মাসিমার বাড়ি দৌড়ে ফিরে গেলাম। ওঁদের
তিনজনকেই যে আমি ভালবাসি। ওঁদের কষ্ট দেখলে
দুঃখ হয়।

আর কোনদিন গীতাদিকে দেখি নি। পরদিন
সকালে যখন 'মধুভিলা'য় গেলাম, গীতাদি নেই। দেবীবাবু
চুপ করে শুয়ে আছেন—যেন খুব অসুস্থ। নিশীথবাবু
গ্রামোফোন বাজাচ্ছেন।

নিশীথবাবুর গতিভঙ্গি বেশ স্বচ্ছন্দ, বেশ লঘু ছন্দ—
যেন একটু খুশী খুশী ভাব। আমি বুঝলাম গীতাদি নেই।
প্রশ্ন করি, গীতাদি কোথায়?

কেউ কিছু বলে না, অনেক পরে দেবীবাবু বললেন,
চলে গেছে খোকন।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বললাম, একেবারে
চলে গেছেন?

দেবীবাবু আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, না না।
হয়তো আসবেন আবার। মন খারাপ করো না খোকন।
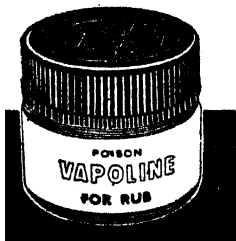
নিশীথ ওঁর মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে যেন দুষ্টুমি ভরা হাসি। দেবীবাবু অবশ্য তা লক্ষ্য করেন নি।

গীতাদি কিন্তু আর এলেন না, অনেকদিন কাটল। প্রতিদিন দেবীবাবুকে প্রশ্ন করতাম, কবে আসবেন গীতাদি?

কখনও জবাব দিতেন, কখনও চুপ করে থাকতেন। কখনও অতি ক্ষীণ গলায় বলতেন, শীগগির আসবেন।—আবার কোনদিন খুব কষ্টে বলতেন, কোনদিনই ফিরবে না আর।

তাঁর কণ্ঠস্বর বেদনায় ভরা। মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা।

ছোট মাসিমাও যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন ওঁদের দুজনের নিমন্ত্রণ হল আমাদের বাড়ি। আমি মাঝখানে—এক পাশে দেবীবাবু, অপর পাশে নিশীথ। মাসিমা সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন। সহসা ছোট মাসিমা বললেন, বউমার কি হল বাবা?

দেবীবাবু বললেন, কলকাতায় ফিরে গেছেন একটু দরকারে।

ছোট মাসিমা বললেন, বউমা কি আবার এখানেই আসবেন তোমরা থাকতে থাকতে?

দেবীবাবু বললেন, আমাদের এখানে থাকার ওপর সেটা নির্ভর করছে। বেশীদিন যদি থাকি তা হলেই আসবেন।

ছোট মাসিমা শুধু বললেন, ও।

বেশ বোঝা গেল তেমন সন্তুষ্ট হলেন না এই জবাবে। এর পর আরও কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন ছোট মাসিমা। তেমন জমল না। নিশীথ মন দিয়ে খেতে লাগলেন, আর দেবীবাবু কেমন অন্যমনস্ক। দুজনের মধ্যে যেন এতটুকু যোগ নেই।

সেদিন সারারাত ঘুম হয় নি। মাঝে মাঝে 'মধুভিলা' থেকে নিশীথের গানের রেকর্ড শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আমি যেন আধো ঘুম আধো জাগরণে গীতাদির সেই গুনগুন সুরের গানটি শুনতে পেলাম। গীতাদি তেমনই মিষ্টি সুরে গাইছেন, আবার হঠাৎ থেমে পড়ছেন। জানলার ধারটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, পাহাড়ের রঙ দেখছেন।

এর দুদিন পরেই ওঁরা 'মধুভিলা' ছেড়ে চলে গেলেন। বেশ বোঝা গেল একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। নিশীথের কপালটা কেটে গেছে, ব্যাণ্ডেজ করা। দেবীবাবুও বেশ অসুস্থ। ছোট মাসিমাকে সকালেই জানিয়েছিলেন আর থাকবেন না, ফিরে যাবেন।

আমার মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছিল—কোথায় যাবেন? কোথা থেকে এসেছিলেন? কেন এসেছিলেন? গীতাদি চলে গেলেন কেন? তিনি কোথায়?

খুব ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু কি জানি কেন কিছুই বলতে পারি নি সেদিন। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল।

সারাদিন ধরে জিনিসপত্র এ বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন দুজনে।

যখন সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে এক্কায় ওঠার সময় হল আমি ছোট মাসিমার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখছিলাম। নিশীথের আর সেই উদ্দামতা নেই, তিনি কেমন চুপসে গেছেন। দেবীবাবু শান্ত গম্ভীর—যেন ছোট ছেলেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁর মুখেও কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ছোট মাসিমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমাকে দেবীবাবু আদর করলেন, বললেন, চললুম খোকন, লক্ষ্মী হয়ে থেকো।

আমার চোখ জলে ভরে এসেছে। আমি কথা বললাম না।

এক্কা ছুটে চলল। আমি বাইরে এসে কিছুক্ষণ দৌড়লাম—দেবীবাবু দেবীবাবু বলে প্রাণপণে চিৎকার করলাম। এক্কা মিলিয়ে গেল। শুধু দেবীবাবুর হাত দেখতে পেলাম।

ছোট মাসিমা বেরিয়ে এসে বললেন, খোকন, তোমার হল কী?

আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

সেই রাতে আর একবার গীতাদির সেই গুনগুন সুরের গান শুনেছিলাম। সেই সুরটুকু আজও কানে আছে।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রথম খণ্ড : উপন্যাস

দি ব্রাদার্স কারামাজোভ

মরণীয় চরিত্র দস্তয়ভস্কি সেই স্মরণীয় পত্রে
নজেকে প্রকাশ করেছেন এইভাবে :

na Grigorievna begged me to be
t with the four thousand francs, and
ve at once. But there was a chance,
and possible to remedy everything.
the examples? Besides one's own
al winnings, one sees everyday others
ng 20,000 and 30,000 francs. Are
aints in the world? Money is more
ary to me than to them. I staked
han I lost. I began to lose my last
ces, enraging myself to fever point.
. I pawned my clothes, Anna
ievna has pawned everything that she
er last trinkets. How she consoled
w she wearied in that accursed Baden
two little rooms above the forge
we had to take refuge!...At last we
escape and leave Baden." [The
's Ten Greatest Novels]

ডন-ব্যাডেন থেকে লেখা এই চিঠি এত সজীব
ত দস্তয়ভস্কির জীবন্ত স্পর্শ মনে হয় যেন
মুছে যায় নি। সর্বনেশে জুয়োর আড্ডায়
হারাবার বিচিত্র যত কাহিনী চিরকাল বিস্ময়ের
করেছে, এ চিঠির লেখকের জুয়ায় আসক্তির
তাদের সকলের চেয়েই বিস্ময়কর, সকলের
বিচিত্র। কেন এ কথা বলছি তার হদিস
করতে দস্তয়ভস্কির হাত ধরে আমাদের যেতেই হবে
সেমেনভস্কি স্কোয়ারে আর একবার—যেখানে কোনও এক
চরমাশ্চর্য প্রত্যূষে জীবন এবং মৃত্যুর ঠিক মাঝখানে No-Man's Land থেকে ফিরে এসেছিলেন 'The
Brothers Karamazov'-এর কাহিনীকার, জীবন-কথা-শিল্পী ফিয়োদোর মিকেলোয়িচ দস্তয়ভস্কি, যাঁর বিপুল
সাহিত্য-অবয়বের দুই আজানুলম্বিত বাহুর বিশ্ববিখ্যাত
নাম : 'Crime and Punishment' এবং 'The
Idiot'.

আমি কোনও দ্বিধার অবকাশ রাখতে চাই না
অতঃপর যখন আমি বলতে চাই যে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর
পদক্ষেপ শুনতে পাবার মুহূর্তেই জীবনের জয়ঘোষণার
তুলনাবিরল অভিজ্ঞতাই সারাজীবন ব্যক্তি ও শিল্পী
দস্তয়ভস্কির কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর বিশৃঙ্খল
দিনযাপনের, বেপরোয়া ঋণপ্রবৃত্তির, কাণ্ডজ্ঞানহীন জুয়ায়
আসক্তির—সমস্ত কিছুর পেছনেই যেমন এই উপন্যাসের
চেয়েও অলৌকিক সত্যঘটনা সারাজীবন নেপথ্যে থেকে
কাজ করে গেছে নিঃশব্দে, তেমনই তাঁর রচনাতেও বিপুল
বিষাদ আর অন্ধ নিয়তির উপস্থিতিকে করেছে অনিবার্য।
দস্তয়ভস্কির বিরুদ্ধে তাঁর একশ্রেণীর স্বদেশবাসীর যে
মাত্রাহীন উষ্মা, তার কারণের জন্মবৃত্তান্তও আত্মগোপন
করে আছে ওই সেমেনভস্কি স্কোয়ারের ঘটনা অথবা
দুর্ঘটনার মধ্যেই। দস্তয়ভস্কির রচনায় একটা নিদারুণ
অস্বস্তিকর আবহাওয়া সারাক্ষণ পাঠককে অস্বাচ্ছন্দ্যের
আবর্তে আন্দোলিত করে। কোনও কোনও মুহূর্তে যেন
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় দস্তয়ভস্কির বক্তব্য এই বলে যে,
জীবনযুদ্ধ নামে যাকে আমরা অভিহিত করি, আসলে তা
পুতুলনাচের ইতিকথা। আর সেই ইতিকথার নিয়ামক

ইতিহাস নয়—যার হাতে পুতুলনাচের পরিচালনভার, তার নাম—অন্ধ নিয়তি। উদ্দেশ্যহীন হত্যার নরকে বসে মানুষের টুঁটি যে টিপে ধরেছে দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে বারংবার এবং তাকে দিয়ে বাধ্য করিয়েছে স্বীকারোক্তির আর্তনাদ করতে—সে কি শুধুই মানুষের বিবেক? না। সে হচ্ছে সেই শয়তান অথবা Evil—দস্তয়ভস্কির জীবনে যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের কথা আমি এতক্ষণ ধরে বলেছি; ওই সেমেনভস্কি স্কোয়ারে যার সূচনা এবং সাইবেরিয়ার নির্বাসনতীর্থে যেখানে জীবনের চেয়ে মৃত্যু কাম্য অনেক বেশী, সেইখানে যার বৃদ্ধি এবং দস্তয়ভস্কির সন্ন্যাসরোগের মধ্যে যার বিয়োগান্ত পরিণতি সে-ই তাঁর সমগ্র জীবন-মহাকাব্যকে করেছে এমন বিষণ্ণ-মধুর।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে যে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র কথানায়কদের পদযাত্রা, তাঁদের জীবনীর জন্যে আমরা যাঁদের যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁদের সকলের মধ্যেই একটা জিনিস লক্ষণীয়। তাঁরা কেউই এঁদের—এই সব সাহিত্যরথীদের অবতারত্বে উত্তীর্ণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নি। এঁরা যা ছিলেন অবিকল তাই এঁদের রাখতে না পারলেও কোথাও এঁদের জীবনচরিত চরিতামৃতের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। হয় নি বলেই দস্তয়ভস্কির জীবনী থেকে আমরা জানতে পাই যে মানুষ দস্তয়ভস্কি শিল্পীকে জন্ম দিতে কতখানি সাহায্য করেছে। এ না জানলে সাহিত্য-বিচারের কী ক্ষতি হয় সে প্রশ্নের জবাবে শরণ নিই যে গ্রন্থের একটি উক্তির, তার নাম—A Writer's Notebook: "The world is an entirely different place to the man of five foot seven from what it is to the man of six foot two." এ কথা যদি এতটুকু সত্য হয় তা হলে কথা-সাহিত্যের বিচারে শিল্পীর ওপর ব্যক্তির প্রভাব অনেক বেশী সত্য। এমন কি লেখার স্টাইল, দৃষ্টিকোণ, ম্যানারিজম, ইডিওসিনক্রেসি সমস্ত কিছুর ওপর ব্যক্তিসত্তার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব তো পড়েই, কখনও কখনও প্রত্যক্ষ প্রভাবও দৃষ্টিগোচর না হয়ে পারে কি? এ কথা কেবল দস্তয়ভস্কির ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।

প্রযোজ্য যে তার কারণ কেবলমাত্র প্রেরণা অথবা প্রতিভায় কবিতা হয়, বুদ্ধির দীপ্তি এবং চিন্তার ঐশ্বর্য সম্বল করে সম্ভব হয় প্রবন্ধ, কিন্তু শুধু প্রতিভা অথবা প্রেরণার মূলধন নিয়ে উপন্যাস রচনা অসম্ভব। জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার খাদ সহজাত কল্পনার সোনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে না মেশা পর্যন্ত হওয়া যায় না বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে উপস্থিত হবার মত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসকার। অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে দেশেবিদেশে যে নতুন ধুয়ো উঠেছে—উপন্যাসে গল্প থাকতেই হবে এমন কথা নেই—তার কারণ, সমস্ত বিশ্ব থেকেই অধুনা বিদায় নিচ্ছে সেই বস্তু যে বস্তু বিশ্বসাহিত্য রচনার পেছনে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। অর্থাৎ কল্পনা করতে পারার সহজাত ক্ষমতার কাঁচা সোনায় বাস্তবাভিজ্ঞতার সোহাগা যোগ করতে জানার দুর্লভ প্রতিভা। ডুমার 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', হুগোর 'লে মিজারেবল', বালজাকের 'দি ওল্ড গোরিয়ট' কি কেবল নিছক গল্প? না। যদি তা হত তা হলে সম্ভব হত না তাদের উল্লেখ এই সূচীপত্রে। তারা যতখানি জীবনের গল্প ততখানিই রচয়িতার মনের মাধুরী দিয়ে গড়া। জীবনের কথা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় উপাদান; কিন্তু সাহিত্য কিছুতেই জীবনের কার্বনকপি নয়। কতটুকু কথা জীবন থেকে নেব এবং তার সঙ্গে কতটুকু মিশেল দেব জীবনসঙ্গত অনুমানের, তারই ওপর নির্ভর করেছে বিশ্বকথাসাহিত্য চিরকাল। সহজাত ক্ষমতার শোচনীয় অভাবেই বর্তমান বিশ্বের কথাসাহিত্য নানা 'ইজমের' ক্রাচে ভর করে উপন্যাসের ছদ্মবেশে দেশে দেশে নন্দিত হচ্ছে যে বস্তু তার আসল নাম—প্রবন্ধ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন মৃত্যু হয়েছে মহাকাব্যের, বাল্মীকি-ব্যাস এবং হোমারেরা যেমন ফিরে আসেন নি আর মহাকাব্যের কুলায়ে, তেমনই বালজাক, ডুমা, হুগো, দস্তয়ভস্কিদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা এবং সময় এখন বোধ হয় সম্পূর্ণ বিগত। মহাকাব্যের বিদায় সভ্যতার অগ্রগতির দিনে যেমন আসন্ন হল তেমনই অতিযান্ত্রিকতার দুর্দিনে মহৎ উপন্যাসেরও অন্তিমকাল বোধ হয় অত্যাসন্ন হয়ে আসছে।

দস্তয়ভস্কির অমিতপ্রতিভাও জন্ম দিতে পারত না 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র, যদি না জীবনব্যাপী ঘটন-অঘটনের মেঘরৌদ্রের মধ্য দিয়ে দুস্তর পথ অতিক্রম

সুযোগ নিজে থেকে তাঁর জীবনের দরজার কড়া নাড়া দিয়ে না ডাকত। যদি না ডেকে নিয়ে নিজের গন্ধে মাতাল এই জীবনমৃগকে দুরাশার ালিতে; যদি না সেমেনভস্কি স্কোয়ারের দরে জীবনের সঙ্গে নতুন করে গাঁটছড়া বাঁধার কক তবু অলীক নয় এমন পালায় আরম্ভ করত য় তা হলে মহাকালের মৃগয়া হত খাঁচার বাঘকে চরে মারার হাস্যকর প্রহসনের অবিমৃষ্যকারিতায় ত। সাইবেরিয়ার জীবন্ত মৃত্যুবাসরে যদি উঁকি সৌভাগ্য না হত দস্তয়ভস্কির, যদি জুয়ার আড্ডায় ারাবার না হত দুঃসাহস, তা হলে 'Crime and shment' ও 'The Brothers Karamazov'-এ ক যথাসম্ভব উজাড় করে দেওয়া হত অসম্ভব। ন্যাসের চেয়েও অলৌকিক ঘটনাপঞ্জীই জুগিয়েছে সৃষ্টির উপাদান এবং সাইবেরিয়ায় সমাজ থেকে ত নানা রঙের দুঃসহ দিন অতিবাহিত করবার ই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত না হলে 'দি ব্রাদার্স াজোভে'র লেখক হতেন না দস্তয়ভস্কি; তাঁর । বিষয় এবং রচনাশৈলী দুয়েরই চেহারা পালটে

স্তয়ভস্কি যা হয়েছেন শেষ পর্যন্ত দস্তয়ভস্কি তা হতে নে না কিছুতেই!

স্তয়ভস্কির একাধিক জীবনীকার তাঁর সম্বন্ধে দের যা জানিয়েছেন তা পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে ল। তার কারণ কেবল জীবনীকারদের দৃষ্টিকোণের ক্য অথবা উপাদান-সংগ্রহের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া এমন নয়। দস্তয়ভস্কির জীবনে পরস্পরবিরোধী মানুষ বরাবর বাস করে এসেছে। কোনও ই নিছক ভালো অথবা অবিমিশ্র মন্দ নয়; ব্যক্তির মধ্যে কেবল ভাল-মন্দ কেন, একাধিক ত্বের উপস্থিতিও আজ আর অবাক করে ামাদের। দস্তয়ভস্কির চরিত্র আজও অবাক নয়, ক করে আমাদের, যেমন করেছে তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্র-রচয়িতাকে। এবং সম্ভবতঃ স্বয়ং দস্তয়ভস্কিকেও সারা জীবন তা মাঝে মাঝেই করেছে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

জুয়োর আড্ডায় যথাসর্বস্ব দিয়ে এসে ঘরে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়েছেন যে দস্তয়ভস্কি বারবার, সেই দি 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-কার দস্তয়ভস্কি সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার বলেছেন: "Dostoyevsky went to the casino incessantly, placed his money on the red and black. The passion, the color, the risk, drew him as irresistibly as life itself." অ্যানা দস্তয়ভস্কির কাছে ছোট ছেলের মায়ের কাছে কেঁদে পড়ার চেয়েও করুণ দেখিয়েছে সেদিন 'Crime and Punishment'-এর অতিপরিণত স্রষ্টার মলিন মুখ। অ্যানা দস্তয়ভস্কি সেই দুরন্ত শিশু ভোলানাথের হাতে বাঁধা দেবার মত শেষ সম্বল তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু তার মুখে পড়তে ভোলেন নি যে-কথা সে-কথা ইতিহাস হয়ে গেছে: "He fell on his knees before me and said that he must play on, that he must play on without fail....And then I realized that he was no ordinary gambler....He did not gamble to win, but because he needed to lose..."

এই হারা হারা নয়; এই হারা দস্তয়ভস্কির সবচেয়ে বড় জিত। জুয়ার আড্ডায় কেবল দিয়েই আসেন নি দস্তয়ভস্কি সব। যথাসর্বস্ব দিয়েছেন বটে, কিন্তু নিয়েও এসেছেন যথাসাধ্য। কী সেই বস্তু যা পরাজয়ের মাথায় পরিয়ে দিয়েছে জয়ের মুকুট? সে বস্তুর নামই জীবনসত্য—যার একটুখানি অনুভূতি লাভ করতে দিতে হয় অনেকখানি। সেই অনুভূতির একটু কিন্তু অনেকখানি হচ্ছে 'Crime and Punishment'-এর অবিস্মরণীয় অতিনায়ক: Raskolnikov। হত্যার অপরাধ যে স্বীকার করে প্রায় স্বেচ্ছায়, কারণ: "One needs to commit a crime not for the sake of the crime but for the sake of the punishment that follows."

এই রাসকোলনিকভের মধ্যে দিয়েই উচ্চারিত দস্তয়ভস্কির জীবনজিজ্ঞাসা: "Tell me is there a God?"—আর তারই উত্তরে প্রতিধ্বনিত দস্তয়ভস্কির

সমগ্র জীবনমহাকাব্য : "Man is saved only because the Devil exists. For only through the Devil does he earn a conscience."

জুয়ার আড্ডায় যে-ই যায় সে-ই যায় না কোনও জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে; যে যায় সে-ও ফেরে না তার জবাব নিয়ে। দস্তয়ভস্কিরা যখন যান জুয়ার আড্ডায়, সুরার পাত্রে গলাধঃকরণ করেন আয়ুহরণকারী গরল, সাকীর শরীরে হাতড়ে বেড়ান জীবনতৃষ্ণায় রমণীয় তৃপ্তি—তখন কি তাঁরা কেবলই বিকৃত কামনার দাস অথবা অভ্যাস চরিতার্থকারী অপদার্থ? না। তা হলে কি সেই বস্তু যার অন্বেষণে এঁদের এই নিরুদ্দেশযাত্রা? কিসের খোঁজে এঁদের অগম্য নয় আব্রহ্মস্তম্ব কোনও স্থল? এ প্রশ্নের উত্তর গদ্যে অসম্ভব; এরই উত্তরে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা :

"কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে' চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।"

দস্তয়ভস্কির বাবা—মস্কোর দরিদ্রদের জন্যে নির্মিত হাসপাতালের ডাক্তার—একদিন তাঁর জমিদারি দেখতে বেরিয়ে আর ফিরে এলেন না। গাড়ির বসবার আসনের তলায় তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল বটে কিন্তু গাড়োয়ানকে পাওয়া গেল না কোথাও—ঘোড়াদেরও নয়। শোনা যায় ডাক্তার দস্তয়ভস্কির অমানুষিক নৃশংসতার প্রতিশোধ নিতে গ্রামবাসীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এই নৃশংসতর হত্যাকাণ্ডের প্রতি পর্বে। এই হত্যার খবর গিয়ে পৌঁছল দস্তয়ভস্কির কাছে একটি পত্রের মারফত। চিঠি থেকে যখন চোখ তুললেন দস্তয়ভস্কি তখন তাঁর সামনে হঠাৎ দেখতে পেলেন যাদের তাদেরই নিয়ে তাঁর প্রথম স্বীকৃত রচনা : 'Poor Folk'। 'পুয়োর ফোকে' তিনি তাদেরই ছবি এঁকেছেন যারা বিধাতার পরিহাসে মানুষের অবয়বে মানুষের ব্যঙ্গচিত্র। এরা কেউ দানবের আকৃতিতে শিশুর চেয়েও অসহায়, কেউ আকাশের চেয়েও অনেক নীল আর অপরূপ চোখ নিয়ে জন্মেও দৃষ্টিহীন নির্বোধ। সৃষ্টির ইতিহাসে চরম অনাসৃষ্টি এদের অস্তিত্বের কোনও কারণ খুঁজে পান নি সেদিন দস্তয়ভস্কি, কিন্তু নাম খুঁজে পেয়েছিলেন : 'Poor Folk'।

বিশ্বনিন্দুক সেদিনকার এক সমালোচক ডেকে পাঠালেন দস্তয়ভস্কিকে, বললেন : "Young man, do you know what you have just written? No, you do not. You cannot understand yet."

কথাটা ঠিক—কোন্ মৃগই বা কবে বুঝেছে যে, যার গন্ধে সে মাতাল সেই মৃগনাভির অধীশ্বর সে নিজেই!

'পুয়োর ফোক'-এর সার্থকনামা লেখক এবারে যে আড্ডায় ভিড়লেন সেখানে রাজদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে সেই প্রথম। নতুন সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক চিন্তার অংশীদাররা রাশিয়ার সিংহাসন থেকে জারকে সরিয়ে সেখানে জনগণেশকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ। ভগবান নয়—মানুষই মানুষের হয়ে অবসান ঘটাবে অমানুষিক সমাজব্যবস্থার। দস্তয়ভস্কি নিজের কণ্ঠকে তাদের ঐকতানে মেলালেন সরকারী কর্মচারীর স্বৈরাচারের প্রতিবাদে। এই নব্য সমাজবাদীদেরই একটি সভায় সরকারের হাতে ধৃত হলেন দস্তয়ভস্কি।

সেমেনভস্কি স্কোয়ারে উদ্যতসঙ্গিন বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে হল তাঁকে—কিন্তু মরতে হল না। জীবনের ছাড়পত্র হাতে তাঁকে ঢুকতে হল যেখানে সেখানে বাঁচার চেয়ে মরাই আসল বেঁচে যাওয়া বলে মনে করত মানুষ সেদিন। বিশ্বত্রাস সেই জায়গাটির নাম সাইবেরিয়া।

দস্তয়ভস্কি এই ভয়াবহ জীবন্ত মৃত্যু মাথা পেতে নিয়েছেন। ভাইকে লিখেছেন : "I do not complain; this is my cross and I have deserved it."

এই "I have deserved it"-এর মধ্যেই দস্তয়ভস্কির জীবনজিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে। "I" নয় "We"। প্রত্যেক মানুষকেই মাথা পেতে নিতে হবে ন্যায়ের দণ্ড সমস্ত মানুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে; সমস্ত মানুষকেও শিরোধার্য করতে হবে তাকে প্রত্যেক মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার কারণে।

দস্তয়ভস্কির সাহিত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ এবং তীক্ষ্ণ বীতরাগ দুইয়েরই উৎস দস্তয়ভস্কির ওই ইতিহাস-বিখ্যাত স্বগতোক্তি—"I have deserved it"!

য়ভস্কির জীবনীর মধ্যে মাত্র দুটির কথা এখানে করব। Strakhov নামে একজন লিখেছেন: witzerland, in my presence, he treated rvant so badly that the man revolted said to him: 'But I too am a !" দস্তয়ভস্কির আর একজন জীবনচরিতকার হচ্ছেন ions। দারিদ্র্যের দুঃসহ আশীবিষদংশনে ছটফট যারা চিরকাল তাদের সম্পর্কে দস্তয়ভস্কির আচরণ না করতে গিয়ে Simmons বলছেন: "Was alize their sufferings and make out of ay of life. Instead of practical reforms, ffered them religious and mystical lation."

য়ভস্কির সাহিত্যও এই: "religious and cal consolation"।

য়োদোর মিকেলোয়িচ দস্তয়ভস্কি নিজেই তাঁর ধ্যে সবচেয়ে বড় চরিত্র ছিলেন। ছিলেন বলেই সৃষ্টি সত্যিই বড়। রাসকোলনিকভের অপরাধবৃত্তি Alyosha-র সত্য-শিব এবং সুন্দর প্রবৃত্তি দুই ই উৎস দস্তয়ভস্কি নিজে। একদিকে সঙ্কীর্ণতা, র, দম্ভ, কৃতঘ্নতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চূড়ান্ত যে স্কি, সেই মানুষই বিপন্নকে সাহায্যের জন্যে নিজেকে করতে এতটুকু নন দ্বিধাগ্রস্ত। ভালবাসার কাঙাল শু ভোলানাথ যেমন যথাসর্বস্ব জোর করে নিয়েছেন দস্তয়ভস্কির, তেমনই যথাসম্ভব সমর্পণও করেছেন তার কাছে নিঃসংশয়চিত্তে। নিজে যেমন বিব্রত ন দুনিয়াসুদ্ধ পরিচিত-অপরিচিত সকলকে যখন-যেখানে-সেখানে ধার চেয়ে, তেমনই অপদার্থতম যখন-তখন যেখানে-সেখানে ধার চেয়ে বিব্রত পারে নি তাঁকে।

ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর কথা স্মরণ করেই াত্র নয়, দস্তয়ভস্কির দিকে তাকিয়েও আমাদের র শেষ নেই। শুধু দস্তয়ভস্কি নয়, বিশ্বকথা-ত্যর যাঁরা বিস্ময় তাঁরা মানুষ হিসেবেও বিস্ময়কর ারণে যে, লেখায় তাঁরা যে আদর্শের অনির্বাণ প্রজ্জলিত করেন তাঁদের নিজেদের জীবন কিন্তু সেই র আলো নয়—আলোর নীচে অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার বিলপিল পথ। যে চিন্তা এঁদের রচনা এবং জীবনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করে তা হচ্ছে যে লোক জীবনে এত বিশৃঙ্খল, এত হৃদয়হীন, এত অকৃতজ্ঞ সেই লোকই কলম হাতে নিয়ে বসলে চরিত্রের মুখে এত হাসিকান্নার হীরাপান্না ছড়ায় কোন্ জাদুবলে! যারা এই বিস্ময়ের প্রবক্তা, মানুষকে তারা কাছ থেকে কোনদিনও দেখে না—তাই বলে এমন কথা। দস্তয়ভস্কি জেলে বসে মানুষের ভেতরটা দেখেছিলেন শল্য চিকিৎসক যেমন চিরে চিরে দেখে মানুষের শিরা-উপশিরা, তেমনই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। দেখেছিলেন যে মানুষ কেবলই মন্দ নয়, নয় দেবতার মত অপাপবিদ্ধ। হত্যার অপরাধে, চৌর্যের অভিযোগে, বিকৃত বাসনার তাড়নায় সাইবেরিয়ায় যারা রুদ্ধদ্বার রাত্রিযাপনের দুঃসহ দণ্ড বহন করতে বাধ্য হয়েছিল, দস্তয়ভস্কি তাদের মধ্যে স্বার্থত্যাগের স্মরণীয় দৃষ্টান্তকেই অবিস্মরণীয় করেছেন জীবনের চেয়েও বিচিত্র তাঁর রক্তমাংসে-জীবন্ত কথাসাহিত্যে বারংবার। মানুষ হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় বিস্ময়; তারও চেয়ে যা বিস্ময়কর তা মানুষের মন—যেখানে পূতিগন্ধময় পাপের অতলপঙ্কে পারিজাতের পাপড়ি ক্ষণেক্ষণেই বয়ে আনে স্বর্গের সৌরভ।

দস্তয়ভস্কি নিজেও সেই চরিত্র যাঁর মধ্যে অকৃতজ্ঞতা এবং উদারতা, দেহের ক্ষুধা এবং অন্তরের অনুরাগ, শয়তান এবং দেবদূত, স্বর্গ ও নরক বাস করেছে পাশা-পাশি—কুঁড়েঘরের গায়েই দাঁড়ানো আকাশস্পর্শী উদ্ধত রাজপ্রাসাদের মত।

দস্তয়ভস্কি একা নন—তলস্তয়, বালজাক, দুমা, হুগো এঁরা সবাই পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর এবং উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু এঁরা কেন জীবনে আর একটু শৃঙ্খলপরায়ণ, আর একটু কম উদ্দাম, আর একটু বেশী স্বাভাবিক হলেন না সে প্রশ্ন করা যায় বটে কিন্তু তার জবাব দেওয়া যায় না কিছুতেই। প্রজাপতি কেন মৌমাছি নয়, এ জিজ্ঞাসার জবাব মৌমাছির যেমন জানা নেই, সকল জীবনজিজ্ঞাসুরও তেমনই অজানা। অজানা বলেই সৃষ্টি-রহস্যের সেই স্বপ্নলোক—যার চাবি আজও নয় কারুর করায়ত্ত।

দস্তয়ভস্কি যে-জীবনের গল্প লিখতে চেয়েছিলেন, সে-জীবন নিজে যাপন না করে কেউ সে-জীবনের গল্প লিখতে পারেন না। মাতালের চরিত্র, জুয়াড়ীর জীবন, পতিতার আলেখ্য, 'Poor Folk'-এর বেদনা অথবা Alyosha-র অন্বেষণের ইতিবৃত্ত ঘরে বসে সুবোধ বালকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। দস্তয়ভস্কি, তলস্তয়, বালজাক, ডুমা অথবা ফ্লবেয়ারের কথাসাহিত্য 'ড্রয়িংরুম ড্রামা' নয়, জীবনের কথা। জীবনের সেই কথা—যে কথা বই পড়ে অন্য লোকের মুখে ঝাল খেয়ে অথবা কল্পনার ওপর নির্ভর করে কলমের মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব। কাঁচা জীবনের কাদা দু হাতে ঘেঁটে তবে তৈরি হয় রাসকোলনিকভের মূর্তি, না হলে যা হয়, তা মাটির পুতুল—প্রাণের প্রতিমা নয়।

দস্তয়ভস্কির রচনাশৈলীর দুর্বলতা বিশ্ববিদিত—বালজাকেরও। কিন্তু তবু দস্তয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' বিশ্বসাহিত্য, বালজাকের 'দি ওল্ড গোরিয়ট'-ও তাই। কেন? কারণ ওই কাঁচা জীবন দু হাতে ঘাঁটার কল্যাণে। সাহিত্যের শেষ বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ সে craft নয়—জীবন-সমীক্ষা। লেখার স্টাইল নয়—চরিত্র-সৃষ্টি। কথা নিয়ে খেলতে পারার ক্ষমতা নয়—বক্তব্য। দস্তয়ভস্কির সাহিত্যসৃষ্টি বিশ্বনাথদের সাহিত্য-দর্পণ-অসঙ্গত, কিন্তু জীবনসঙ্গত। এবং যেহেতু 'জীবন' সমস্ত শিল্পকীর্তির চেয়েই মহৎ, সেই হেতু বিশ্বনাথরা শেষ পর্যন্ত আলঙ্কারিক মাত্র, দস্তয়ভস্কিরাই সাহিত্যের অলঙ্কার।

যদি দস্তয়ভস্কি আর একটু নিয়মানুবর্তী হতেন, যদি হতেন আর একটু শান্ত সুবোধ বালক, তা হলে তিনি সাহিত্যের কেরানী হতেন, 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র স্রষ্টা হতে পারতেন না কিছুতেই। এন্থনী ট্রলপ এবং আর্নল্ড বেনেট দুজনেই বলেছেন, বই লেখা আর পাঁচটা কাজের মতই ঘড়ি ধরে করা সম্ভব, এবং সাহিত্যের বিচার সাহিত্য দিয়েই—অর্থাৎ বইটা কেমন ভাবে লেখা হয়েছে বিচারের বিষয় তা নয়, বিচারের বিষয় হচ্ছে বইটা কেমন হয়েছে, তাই। কথাটা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু জীবনসঙ্গত নয়। নয় যে তার প্রমাণ দস্তয়ভস্কি স্বয়ং। তার প্রমাণ তলস্তয়, বালজাক, ডুমা—সবাই।

'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' পাঠে যত মতান্তর হোক, এ বিষয়ে সবাই একমত হবে যে ও বই কেরানীর কাজ নয়। বাড়িতে বসে, ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে এবং যথাসময়ে ঘুমতে গিয়ে, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, সময়ে ছেলেমেয়ের বিবাহ দিয়ে, সংসার এবং সমাজের প্রতি সমস্ত কর্তব্য যথাসম্ভব সুচারুভাবে সম্পন্ন করে অবসর সময়ে 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র মত একখানা বই লিখে ফেলা গোয়েন্দা উপন্যাসের পক্ষেও অলৌকিক, অলীক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, অসার, অপদার্থ কল্পনা। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র তুলনায় বস্তুতঃ তলস্তয়, বালজাক, ডুমা, ফ্লবেয়ারের রচনাকেও একটু রক্তশূন্য মনে হয়। মনে হয় যে তার কারণ, দস্তয়ভস্কি মানুষের যে মর্মমূলে ধ্বংসের কীট বাসা বাঁধে সেই পর্যন্ত নিয়ে গেছেন তাঁর প্রতিভার রঞ্জনরশ্মি। সেই রশ্মিতে জীবনের অন্ধকারতম কোণ হয়েছে রাত্রির তিমির সূর্যস্নানে যেমন হয় দিবালোক, তেমনই অবারিত, তেমনই উজ্জ্বল।

দস্তয়ভস্কি নিরাপদ আশ্রয়ের বাতায়নপথে মানুষের মুখ সৃষ্টির মিছিলে অবলোকন করে লেখবার চেষ্টা করলে তা 'আর্ট' হত কিন্তু 'জীবন' হত না। মিথ্যার প্রবেশ যে পথ দিয়ে, সত্যেরও সেই হচ্ছে প্রবেশপথ। মিথ্যার মুখে ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে সত্যকেও যে প্রস্থান করতে হয় অগত্যা জীবনের দোরগোড়া থেকে—এ কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়, জীবনের কণিকাও বটে।

দস্তয়ভস্কি মানুষের মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন; পাপপুণ্য, ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা, জীবনমৃত্যুর মধ্যে খুঁজে ফিরেছেন মানুষের ধর্ম। ধর্ম মানে—যাকে ধারণ করে মানুষ মানুষ। সেই ধর্মই—মনুর ধর্ম নয়, মানুষের ধর্ম—দস্তয়ভস্কির জীবন এবং সাহিত্যধর্ম। দস্তয়ভস্কির সেই ধর্মের নাম 'Crime and Punishment'; 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'ও সেই 'Crime and Punishment'-এরই ইতিবৃত্ত।

[ক্রমশ]

অম্ল-মধুর

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্কের ছ মাস পরে।

ডক্টর সান্যালের ল্যাবরেটরি। সময় : বিকেল।

াবরেটরির এক পাশে ডক্টর সান্যালের ঘর। দরজা দিয়ে ভিতরে ল্যাবরেটরির গ্যাস-পাইপ দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ কাউন্টারের উপরে দেখা ছোট বড় নানা আকারের যন্ত্রপাতি, নোয়ানো াচ আর রবারের নল। যন্ত্র হাতে ঘোরাঘুরি ‌-একজন যুবক।

র সান্যালের ঘর এক পাশে বাইরের দিকে বাড়ানো, । আফিস-ঘরের মত সাজানো। বাইরের দরজার ম্বালম্বি বড় টেবিল, টেবিলের সামনে ভিতরের ।) ল্যাবরেটরির দিকে মুখ করে ডক্টর সান্যাল তাঁর ডান দিকে বাইরের দরজা, সামনের টেবিলের খেবার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ফাইল ইত্যাদি। ণ কাঠের টুলের উপর টেলিফোনের চুঙ্গি। র বাঁ দিকে বাইরের দরজার মুখোমুখি একখানা চয়ার। এ ছাড়া ডক্টর সান্যালের সামনের দিকে র অপর পাশে তিন-চারখানা চেয়ার রয়েছে। তে ডক্টর সান্যালের মুখোমুখি ল্যাবরেটরির দরজার াছন ফিরে বসতে হবে।

এসে ব্যস্তভাবে গীতা ঘোষাল ঢুকলেন, কোমরে ড়ানো, হাতে ফাইল]

র সান্যাল। আসুন আসুন গীতাদেবী, নমস্কার! যাব ভাবছিলাম, আপনি এসে ভালই হল। খবর কি বলুন?

।। খবর সুবিধের নয়। (এগিয়ে গেলেন)

র সান্যাল। সুবিধের নয় মানে? (জিজ্ঞাসু াকালেন)

গীতা। মানে সুবিধের নয়। (সোজা গিয়ে টেবিলের উপর ফাইল রেখে ডক্টর সান্যালের ডান দিকে টেবিলের উপর দু হাতের ভর দিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন) খুব জরুরী দরকারে এসেছি ডক্টর সান্যাল, ভয়ানক বিপদ!

ডক্টর সান্যাল। বিপদ! বিপদের আবার কী হল?

গীতা। সেই কথাই তো বলতে এসেছি ডক্টর সান্যাল! আপনি স্বনামধন্য পুরুষ। আপনি ইচ্ছে করলে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন।

ডক্টর সান্যাল। এখনও আমি ভাবতেই পারছি না গীতাদেবী, আপনি বিপদে পড়তে পারেন। কী হয়েছে খুলে বলুন?

গীতা। আমিই কি ভাবতে পারছি ডক্টর সান্যাল? কিন্তু বিপদ যখন এসেছে, উপায় তখন একটা করতে হবে বইকি! আপনার পরামর্শ আর সাহায্য পেলে—

ডক্টর সান্যাল। (হেসে) আমার পরামর্শ আর সাহায্য! কী যে বলেন তার ঠিক নেই। আমি পরামর্শ দেব আপনাকে? আপনার এ কথায়ও আমি বিশ্বাস করব ভাবছেন?

গীতা। (ঘুরে গিয়ে ডক্টর সান্যালের বাঁ পাশে দরজার দিকে মুখ করে বসে পড়লেন) বিশ্বাস করুন ডক্টর সান্যাল, সাংঘাতিক বিপদে না পড়লে আপনার কাছে ছুটে আসতাম না।

ডক্টর সান্যাল। (কপাল কুঁচকে) বেশ, না হয় বিশ্বাস করলাম। এবার কী হয়েছে খুলে বলুন তো?

গীতা। পুলিস আমার আফিস দখল করে নিয়েছে, আমাকে ভেতরে ঢুকতেই দিলে না।

ডক্টর সান্যাল। পুলিস? ঢুকতে দিলে না? কী সব বাজে বলছেন? মাথা খারাপ!

গীতা। মাথা আমার ঠিকই আছে ডক্টর সান্যাল।

আফিস-বাড়ির ফটকে ওরা পুলিস বসিয়েছে, বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে চলুন!

ডক্টর সান্যাল। ওরা? ওরা কারা আবার?

গীতা। সেই কথাই তো বলছি। বামপন্থী ইলা মিত্তিরের দল। লুটনলালজীকে সভাপতি করে নতুন কমিটি গড়েছে ওরা।

ডক্টর সান্যাল। লুটনলালজী সভাপতি!

গীতা। হ্যাঁ, লুটনলালজী সদস্য ছিল কমিটির। সে যে সভাপতি হবার তালে আছে এ কথা কী করে বুঝব বলুন? আফিস দখল করে আফিস-বাড়ির ফটকে পুলিস বসিয়েছে। শুনছি ১০৭ ধারাও নাকি জারি করেছে হাঙ্গামা বাধতে পারে বলে।

ডক্টর সান্যাল। বলেন কি? ১০৭ ধারা!

গীতা। তা হলে আর শুনছেন কী? আরও শুনুন, নতুন কর্মচারী, নতুন বেয়ারা, নতুন দরোয়ান। পুরনো বেয়ারা আর দরোয়ানদের জোর করে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। পুরনো কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছে সব। ভেবে দেখুন ডক্টর সান্যাল, কত বড় অন্যায় জুলুম! এর প্রতিকার আপনাকে করতেই হবে।

ডক্টর সান্যাল। (মাথা নেড়ে) কিছুই করতে পারব না গীতা দেবী! লুটনলাল মাথা গলিয়েছে যখন কিছুই তখন আর আমরা করতে পারব না। সব দিক না সামলে সে এ কাজে এগোয় নি। এক যদি মামলা করা যায়। কিন্তু পুরনো কাগজপত্র আমরা আর পাচ্ছি কই?

গীতা। লুটনলালকে আপনি ভয় করেন ডক্টর সান্যাল?

ডক্টর সান্যাল। ভয় না করে উপায় কি বলুন? ক্ষমতা তো সব ওই লুটনলালজীদেরই হাতে। বামপন্থীরা চেনে না ওকে, নইলে ওর খপ্পরে পড়ত না ওরা। মরুক গে, আপনার সরে আসা ভালই হয়েছে।

গীতা। ভাল হয়েছে! ভাল হয়েছে মানে? আমার বিপদ আর আপনি বলছেন ভাল হয়েছে!

ডক্টর সান্যাল। শুনলেই বুঝতে পারবেন। আপনি না এলে আমাকেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হত।

গীতা। খুলে বলুন ডক্টর সান্যাল।

ডক্টর সান্যাল। বলছি সব, শুনলেই বুঝতে পারবেন। জন কুড়ি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারি নেওয়া হচ্ছে, দেখলাম আপনার নাম রয়েছে তাদের প্রথমেই।

গীতা। (বিস্মিত) আমার নাম!

ডক্টর সান্যাল। তাই তো দেখলাম। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি। সার্কুলার এসেছে—(ফাইল টেনে খুঁজতে লাগলেন)

গীতা। নিশ্চয় এ আপনার কাজ ডক্টর সান্যাল!

ডক্টর সান্যাল। কী যে বলেন! আপনার গুণপনার খবর সবাই রাখে গীতা দেবী! তাই তো বলছিলাম, এ ভালই হল। কোন ঝামেলা নেই—মোটা মাইনে, সম্মান আর খাতির প্রচুর। এর পর একদিন হয়তো দেখব রাষ্ট্রদূত হয়ে চলে গেছেন মস্কো কি নিউইয়র্ক। আপনার কেরিয়ার খুলে গেল।

গীতা। আপনি সহায় থাকলে কিছুই অসম্ভব নয় ডক্টর সান্যাল।

[ডক্টর সান্যাল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সে সময় উত্তেজিত ভাবে সুকুমার এসে সেখানে ঢুকল]

সুকুমার। (টেবিলের বিপরীত দিকে ডক্টর সান্যালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডক্টর সান্যালকে) আপনারা—আপনারাই এ করেছেন?

ডক্টর সান্যাল। (ভাল করে সুকুমারের দিকে চেয়ে দেখে ধীরস্বরে) কী করেছি সুকুমার, কী আমরা করলাম আবার? (গীতা ঘোষালের দিকের চেয়ার দেখিয়ে) বস।

সুকুমার। (চেয়ারে বসে উত্তেজিত স্বরে) কী করেছেন শুনবেন? ঘরের মেয়েকে পথে বার করে নিয়ে এসেছেন আপনারা। ভিখিরী সাজিয়েছেন, গ্রাম থেকে শহরের রাস্তায় আসতে বাধ্য করেছেন।

ডক্টর সান্যাল। (হেসে) আমরা রাস্তায় নিয়ে এসেছি? কী করে নিয়ে এলাম?

সুকুমার। (উত্তেজিত) রাস্তায় আসতে বাধ্য করেছেন! গ্রামের কুলবধূ—হুদিন পরে হবে স্ট্রীট-গার্ল—কলকাতার রাস্তার মেয়ে! অস্বীকার করতে পারেন আপনাদের দায়িত্ব?

ডক্টর সান্যাল। (সহজ সুরে) খুব পারি। ধরলাম

গ্রামের কুলবধূ কলকাতার রাস্তার মেয়ে হবে
পরে। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক,
বা কোথায় সে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না
! হঠাৎ তুমি এমন খেপে উঠলে কেন ?

মার। এইমাত্র রাস্তায় দেখে এলাম—মাকে ঘিরে
কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে! না খেয়ে মুখ শুকিয়ে
—অসহায় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে।
জল আটকাতে পারলাম না। কী করে রাস্তায়
াচাবে ও!

র সান্যাল। (নির্লিপ্ত কণ্ঠে) তোমার সাহিত্যিক
উচিত ছিল সুকুমার! ছেলেমেয়ে কটি ?

মার। (ডক্টর সান্যালের নির্লিপ্ততায় চটে)
চটি।

র সান্যাল। বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য। এদেরই
ামার জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল তৈরি করেছি, বুঝলে ?

মার। (আরও চটে—কণ্ঠে তিরস্কার) সমস্যা
আপনার পিলে? আপনি কী নিষ্ঠুর!

র সান্যাল। আমি বৈজ্ঞানিক সুকুমার!

মার। হলেনই বা বৈজ্ঞানিক, তাই বলে নিষ্ঠুর

র সান্যাল। নিষ্ঠুর হব কেন? বৈজ্ঞানিকের
ণ্টাল হলে চলে না। সেন্টিমেণ্টাল না হওয়ার নাম
ওয়া নয়।

মার। ওরা না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরছে আর
সেন্টিমেণ্টালিজ্‌মের দোহাই পাড়ছেন!

র সান্যাল। মরছে মরছে—কী যায় আসে তাতে ?

মার। ওরা মরলে কিছুই যায় আসে না ?

র সান্যাল। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ওরা মরে
দুনিয়া ঠিক যেমন চলছে তেমনি চলবে। ওরা
থেকে দুনিয়ার ক্ষতি ছাড়া এক কাণাকড়ি লাভও
। কী হবে এদের বেঁচে থেকে ?

মার। এ সব কী যা-তা বলছেন আপনি!

র সান্যাল। (মৃদু হেসে) ভেব না তুমি, ওরা
য় মরবে না। কাজের পেছনে কারণ থাকবেই।

তা। নিশ্চয় এরা উদ্বাস্তু—নষ্টামি করবার জন্যে
বেরিয়েছে।

সুকুমার। (কণ্ঠে ঝাঁজ) উদ্বাস্তু মেয়েরাই শুধু নষ্টামি করে বেড়াচ্ছে, এই বুঝি আপনার ধারণা গীতাদেবী ?

গীতা। চারদিকে তো তাই দেখতে পাচ্ছি।

সুকুমার। (কথায় জোর দিয়ে) তা হলে জেনে রাখুন, আমি যাদের কথা বলছি এরা উদ্বাস্তু নয়, এদের বাড়ি চব্বিশ-পরগনায়।

গীতা। নারীপ্রগতি সংঘে পাঠিয়ে দিলেন না কেন ?

সুকুমার। বলেছিলাম, যেতে রাজী হল না।

ডক্টর সান্যাল। কেমন, আমার কথাই ঠিক হল তো? এ আমি জানতাম। জানতাম এদের পেছনে শয়তান ব্যবসায়ী আছে।

সুকুমার। (বিস্মিত) সত্যি! এর এ দিকটা—মানে ব্যবসার দিকটা আমার মাথার মধ্যেই আসে নি সার্‌!

ডক্টর সান্যাল। বৈজ্ঞানিকের সেন্টিমেণ্টাল হলে চলে না—কেন বলেছিলাম এবার বুঝলে? বুঝলে এবার কেন বলেছিলাম এরা মরবে না? (গম্ভীরভাবে আত্মগত) ওরা মরবেও না, হিসেবের মধ্যেও পড়বে না—এখানেই হয়েছে মুশকিল।

সুকুমার। আসলে সবাই আগায় জল ঢালছে সার্‌, গোড়া কোথায় দেখেও দেখতে চাইছে না।

ডক্টর সান্যাল। না দেখাই সুবিধের সুকুমার! তোমার বুদ্ধি আছে।

সুকুমার। গোড়া দেখতে গেলে কাজ করতে হয় সার্‌। বড় বড় পরিকল্পনা আর বড় বড় কথার তখন হবে কী ?

ডক্টর সান্যাল। আর দশটা দেশের সঙ্গে তাল রেখে আমাদেরও চলতে হবে তো! আমাদের দেশেরও একটা ইজ্জত আছে সুকুমার, তুমি শুধু দোষটাই দেখছ!

[ডাক্তার ঘোষ আর ইলা মিত্তির এসে ঢুকল]

আরে এস এস ডাক্তার, তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম।

ডাক্তার ঘোষ। কনগ্রাচুলেশনস্ ডক্টর সান্যাল! (এগিয়ে গেলেন)

ডক্টর সান্যাল। (ইলার দিকে চেয়ে সামনের চেয়ার দেখিয়ে) বস তোমরা।

ডাক্তার ঘোষ। (সুকুমারের পাশে ডক্টর সান্যালের মুখোমুখি বসে) ও ইলা, এরই সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

ডক্টর সান্যাল। ও! বেশ বেশ। (ইলাকে) দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

[ইলা নমস্কার করে একখানা চেয়ার টেনে এনে ডক্টর সান্যালের ডান ধারে দরজার দিকে পিছন ফিরে গীতা ঘোষালের মুখোমুখি বসে পড়ল। গীতা ঘোষাল ক্রুদ্ধ চোখে ইলার দিকে চেয়ে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন]

ডক্টর সান্যাল। (ডাক্তার ঘোষকে) তারপর ডাক্তার, হঠাৎ আমাকে কনগ্রাচুলেশন জানাবার কী হল?

ডাক্তার ঘোষ। কেন, আপনাকে এ বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে—আপনি শোনেন নি?

গীতা ঘোষাল ও সুকুমার। (একসঙ্গে) নোবেল পুরস্কার!

ডাক্তার ঘোষ। (ডক্টর সান্যালকে) এইমাত্র খবর পেলাম, আপনার নতুন আবিষ্কারের জন্যে আপনাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। খবর পেয়েই কনগ্রাচুলেশনস্ জানাতে ছুটে এলাম। আপনার এ পিলের কথা কই আমাদের আগে কিছু বলেন নি তো?

সুকুমার। (ডাক্তার ঘোষকে) কোন্ পিলের কথা বলছেন?

ডাক্তার ঘোষ। (সুকুমারকে) কেন, ওই পাঁচ গ্রেন বড়ি! এক বড়ি খেলে তিন মাস আর ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকবে না—তিন মাস পরে আর এক বড়ি! খাওয়া নেই, শরীর ঠিক আছে—কি মজা! (ডক্টর সান্যালকে) বিজ্ঞান-জগতে আপনি যুগান্তর এনেছেন ডক্টর সান্যাল! নোবেল পুরস্কার দিয়ে যোগ্য লোককেই এবার সম্মান দেওয়া হবে।

ডক্টর সান্যাল। যুগান্তর-টুগান্তর নয়, বিজ্ঞান যা খুশি করতে পারে। এরা আমার আবিষ্কারের জন্যে সম্মান দিচ্ছে ভাবলে ভুল করবে ডাক্তার!

গীতা। এ আবিষ্কার করে আপনি ভাল করলেন না ডক্টর সান্যাল! খাওয়ার সুখ না থাকলে বেঁচে থেকে কোন্ সুখ বলুন? খাওয়ার সুখই যদি চলে যায় তা হলে মানুষ বেঁচে থাকবে কেন?

সুকুমার। সুখ তো যা, ওই রাস্তায় দেখে এলাম! এ আপনার জন্যে নয়—এ বড়ি যারা খাবার পাচ্ছে না তাদের জন্যে।

ডক্টর সান্যাল। (মাথা নাড়লেন) তারাও পাবে না।

ডাক্তার ঘোষ (সান্যালকে) সম্মান দিচ্ছে ভাবলে ভুল করব বললেন কেন?

[বলেই ডাক্তার ঘোষ অন্যমনস্কভাবে পথের দিকে তাকালেন। মনে হল কেউ আসবে এমন আশা করছেন তিনি। এর পর থেকে আলাপে যোগ না দিয়ে আনমনে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন]

ডক্টর সান্যাল। সম্মান দিতে বয়ে গেছে ওদের। সবাই ভাবছে সমস্যার হাত থেকে বাঁচল। আমাকে ভাবে বোকা। আরে খাদ্যসমস্যা মেটানো কি এতই সহজ! বড়ি গিলিয়ে সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবে?

সুকুমার। তা হলে স্যর্, আপনি ধাপ্পা দিচ্ছেন বলুন!

ডক্টর সান্যাল। হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দিচ্ছি—ধাপ্পা দেব কেন? এই এক সমস্যা মিটে যাওয়া মানে সব সমস্যা মিটে যাওয়া—এই সহজ কথাটা বুঝতে পার না? কে পথ ছাড়ছে তোমাদের যে সমস্যা মেটাবে? লুটনলালজীরা বেঁচে থাকতে আমি তো আমি—কোন সরকারের বাবারও ক্ষমতা নেই কোন সমস্যা মেটানো।

ইলা। যা বলেছেন। কম্যুনিজম না হলে কোন সমস্যাই মিটবে না। এ বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদ করে আমাদের—মানে প্রোলিটারিয়েটদের মানে—কিষাণ-মজদুরদের সরকার দখল করতেই হবে।

সুকুমার। (ইলাকে) ভুল করছেন আপনি, সরকার দখলে সমস্যা মিটবে না। লঙ্কার গদিতে যে বসবে সে-ই রাবণ হবে। চাকা ঘুরবে—প্রোলিটারিয়েটরা বুর্জোয়া আর বুর্জোয়ারা প্রোলিটারিয়েট হবে—একের বাড়া আর হবে, সমস্যা মিটবে না। আদৌ সরকার না থাকলে তবেই সমস্যা মিটতে পারে, নইলে নয়।

ইলা। (ঝাঁজের সঙ্গে) কেন, রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, গণ-সরকার আর বুর্জোয়া সরকারের তফাত বুঝতে পারবেন। সাধে কি আর রাশিয়ার কথা আমরা বলি? রাশিয়ায় কোন সমস্যাই নেই। (ডক্টর সান্যালকে) ভাল কথা ডক্টর সান্যাল, শুনলাম আপনি নাকি

তরির কারখানার উদ্বোধন করতে মস্কো

ার ও গীতা। (একসঙ্গে বিস্মিত কণ্ঠে) মানুষ
কারখানা!

ার ঘোষ। (অন্যমনস্কভাবে শুধরে দিলেন)
। মানে ল্যাবরেটরি—ওই একই কথা গীতাদেবী!

।। তাই বলুন। কারখানা মানে ল্যাবরেটরি!
স্কো যাচ্ছেন ডক্টর সান্যাল ?

র সান্যাল। (টেনে) তা যেতে হবে বইকি!
দেশের প্রতিনিধি যাচ্ছে, এ দেশ আমাকে
ধি ঠিক করেছে যখন—

।। সত্যি আপনারা ল্যাবরেটরিতে মানুষ
করতে পারেন ডক্টর সান্যাল ?

র সান্যাল। (অবহেলায়) খুব—খুব পারি।
যা খুশি করতে পারে। এই এলিকসির অব
হল বিজ্ঞানের গোড়ার কথা গীতাদেবী—তাই
গিয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে পেয়েছে।

কুমার। আর বিজ্ঞান আজ এলিকসির অব
—মানে মৃতসঞ্জীবনী পেয়ে গেছে বলুন ? এ কি
সার্, না, আর এক পাতা ধাপ্পা ?

ক্টর সান্যাল। ধাপ্পার যুগ আর নেই সুকুমার, সবই
হাতেকলমে। কবে সেই বর্বর যুগ থেকে মানুষ
জন্যে সাধনা শুরু করেছিল। এলিকসির অব
—মৃত্যুজয়ের সাধনা! কত যুগের সাধনায় আজ
শতাব্দীর শেষ দিকে আমরা এর কলকাঠি হয়তো
েরেছি।

তা। তা হলে এত কষ্ট না করে মরা মানুষকে
েই তো পারেন ডক্টর সান্যাল! ল্যাবরেটরিতে তৈরি
ঝক্কাট পোয়াতে হয় না।

ক্টর সান্যাল। (সামনে পেছনে মাথা ঝাঁকিয়ে)
রি, তা পারা যায়। কিন্তু তা করে মরি আর কী!
াড়ে কটা মাথা গীতাদেবী ? এ করলেই হয়েছে—
কবর দেবে!

তা। মানে ?

ক্টর সান্যাল। মানে অতি সহজ। আচ্ছা, খুলেই
তা হলে। জ্যান্ত মানুষের সমস্যাই মেটাতে পারছে
না, আর মরা মানুষ বাঁচাতে গেলে কি আস্ত রাখবে
ভাবছেন ?

সুকুমার। কারখানায় মানুষ তৈরি করলেও তো সেই
এক সমস্যাই থেকে যাবে সার্ ?

ডক্টর সান্যাল। (কথায় জোর দিয়ে) না, থাকবে
না। সে সমস্যা মেটাবার জন্যেই আমরা কারখানায়
মানুষ তৈরি করব এই সাদা কথাটা বুঝতে পারছ না ?

গীতা। ঠিক বুঝতে পারলাম না ডক্টর সান্যাল!

ডক্টর সান্যাল। অতি সহজ। আমরা যাদের
তৈরি করব তাদের পাকস্থলীই থাকবে না। এক দমে
এক শো বছর চলবে—তারপর খতম।

সুকুমার। (হো হো করে হেসে) ও, তাই বলুন।
এর জন্যে নিশ্চয়ই ঘুষ খাইয়েছে আপনাদের ? সমস্যার
আচ্ছা সমাধান বটে! পাকস্থলীই থাকবে না! এত
কথা কী করে বুঝব বলুন সার্ ?

গীতা। (অবজ্ঞায়) কলের মানুষ!

ডাক্তার ঘোষ। (আনমনে) কারখানায় কলের
মানুষই তৈরি হয় গীতাদেবী!

ডক্টর সান্যাল। সে কেন ? ঠিক তোমার আমার
মত মানুষই তৈরি করব আমরা। ক্ষুধার নিবৃত্তিতেই
মুক্তি—তত্ত্ব ব্রহ্মের চেয়েও গূঢ়! কাজের পেছনে কারণ
থাকবেই।

ডাক্তার ঘোষ। ঠিক বুঝতে পারলাম না ডক্টর
সান্যাল!

ডক্টর সান্যাল। পরিকল্পনা কতকগুলো মূল সূত্র ধরে
চলে এই সাধারণ কথাটা বুঝতে পার না ? বুদ্ধি
তোমাদের কবে হবে ?

ইলা। (ডাক্তার ঘোষকে) চুপ করে কী এত
ভাবছিলে ?

ডাক্তার ঘোষ। ভাবছিলাম নারায়ণটা আবার একটা
কাণ্ড বাধিয়ে না বসে। লুটনলালজীর ওপর যা রাগ—

ইলা। কিছু ভেব না, নারায়ণকে সব বুঝিয়ে
দিয়েছি। মিছিল রওনা করে দিয়ে এসেছি—হাওড়ার
গুদাম। লুটনলালকে ও পাচ্ছে কোথায় ?

ডক্টর সান্যাল। লুটনলালজীর আবার কী হল ?
কিসের কথা বলছ ডাক্তার ?

ডাক্তার ঘোষ। ও কিছু নয় ডক্টর সান্যাল। তারপর আপনার কথা বলুন। কবে মস্কো যাচ্ছেন?

ডক্টর সান্যাল। (মাথা নেড়ে) কিছু নয় বলে তো মনে হচ্ছে না। (মাথা নেড়ে নাকে শব্দ করলেন) হুঁহুঁ—

[লুটনলাল এসে ঘরে ঢুকে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে ডক্টর সান্যালকে নমস্কার করল]

লুটনলাল। (পরিষ্কার বাংলায়) নমস্কার বাবুজী!

ডক্টর সান্যাল। (নমস্কার করে) আইয়ে শেঠজী, (ইলা আর ডাক্তার ঘোষের মাঝখানে চেয়ার দেখিয়ে) বৈঠিয়ে। (জিজ্ঞাসু চোখে) তারপর হঠাৎ আমার এ সৌভাগ্য? কী মনে করে?

লুটনলাল। (দেখানো চেয়ারে ডক্টর সান্যালের মুখোমুখি বসে) জরুরী দরকারে এসেছি বাবুজী। (গীতার দিকে তাকিয়ে) এই যে, গীতাদেবীও আছেন দেখছি, নমস্কার!

গীতা। শেষ পর্যন্ত এই আপনার মনে ছিল লুটনলালজী? আমাকে তাড়ালেন?

লুটনলাল। আমার ওপর খামোকা রাগ করছেন গীতাদেবী—খামোকা রাগ করছেন। অবিচার করলেন আপনি। আপনাকে তাড়াবার আমি কে বলুন? লেকিন—(ইলাকে দেখিয়ে) ওঁরা সবাই আমাকে সভাপতি করলেন—আমি তো আর না বলতে পারি নে।

গীতা। (ইলার দিকে চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক) নারী-প্রগতির জন্যে এত করলাম—মেয়েজাতটাই নেমকহারাম!

ইলা। (স্বগত) যত সব প্রতিক্রিয়াশীল রাইটিস্ট। সরকারের ধামাধরা সব। (সোজা গীতা ঘোষালকে) নারীপ্রগতি—নারীপ্রগতির জন্যে কী আপনি করেছেন শুনি?

গীতা। কেন? বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন—

ইলা। (অসহিষ্ণুভাবে বলতে না দিয়ে) রাখুন আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন! সোজা জিনিসটাকে এমন ঘুলিয়ে তুলেছেন—খোরপোশ দাও, দু বছর পৃথক থেকে দেখ—যত সব হামবাগ! এ আইনের পর কোন ভদ্র মেয়ে আর বিয়েই করবে না। আর সভ্য সমাজে বিয়ের দরকারই বা কী বুঝতে পারি নে আমি। বর্বর আদিম যুগের ধর্ম আর বিয়ে আজকের এ সভ্য জগতে কী করে চলতে পারে ভেবে পাই নে।

ডক্টর সান্যাল। (বিস্মিত চোখে ইলার দিকে তাকিয়ে) বল কি!

ইলা। কেন? আপনিও তো বিয়ে করেন নি?

ডক্টর সান্যাল। সময় পাই নি তাই করি নি, পেলেই করতাম। বিয়ে না করে কী পাবে খতিয়ে দেখেছ?

ইলা। (ঝাঁজের সঙ্গে) বিয়ে করেই কোন্ স্বর্গে উঠব বলুন? মাঝখান থেকে কেবল বাধা বাধা বাধা। মার্কস লেনিন আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন ডক্টর সান্যাল। ধর্ম আর বিয়ের ধাপ্পায় পুরুষেরা চিরদিন মেয়েদের এক্সপ্লয়েট—মানে শোষণ করে এসেছে। ও ধাপ্পাবাজি আর চলবে না।

ডক্টর সান্যাল। (মাথা নেড়ে ধীরে) মার্কস-লেনিনের হিসেবের বাইরেও হিসেব আছে, আর সে বড় সর্বনেশে বেহিসেবী হিসেব।

ইলা। (বলতে না দিয়ে) আমরা কম্যুনিস্ট ডক্টর সান্যাল। এ সব বাজে সেন্টিমেন্টকে আমরা প্রশ্রয় দিই নে।

ডক্টর সান্যাল। প্রশ্রয় কি আর কেউ ইচ্ছে করে দেয়? না দিয়ে পারে না যে!

ইলা। ভাববাদে পেট ভরে না ডক্টর সান্যাল। আপনি বৈজ্ঞানিক, যুক্তির কথা বলুন।

ডক্টর সান্যাল। বৈজ্ঞানিক বলেই বলছি, হৈ হৈ করবে, ধেই ধেই নাচবে—কিন্তু আখেরে কী পাবে খতিয়ে দেখেছ? পেট না হয় ভরল—তারপর? স্বস্তি-শান্তি মিলবে এতে? শেষ পর্যন্ত কী পাবে তোমরা? যাক গে, থাক্ এ সব। কর তোমাদের যা খুশি। (লুটনলালকে) তারপর, লুটনলালজী—

লুটনলাল। গীতাদেবী অনর্থক আমার ওপর রাগ করেছেন।

গীতা। রাগ করব কেন লালজী, এ ভালই হয়েছে। নারীপ্রগতি করবার সময়ই আমি পেতাম না আর। জানেন না তো, আমাকে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি করেছে ওরা!

লুটনলাল। বলেন কি! তা হলে তো—

গীতা। (বলতে না দিয়ে অবহেলায়) কন্‌ট্রাক্ট-টনট্রাক্ট

ছুই এবার আমার হাত দিয়ে যাবে। ভাববেন
ার কথা আমি ভুলব না শেঠজী!

লাল। (হাসিমুখে) সে আমি জানি গীতা
াপনাকে আর বলতে হবে না। আপনাকে
ফাকি দেব না, দেখে নেব এবার ওই
ালাকে।

। আচ্ছা, আপনাদের লজ্জা বলে কিছুই নেই,
ী?

লাল। (বুঝতে না পেরে মাথা চুলকে) এ কথা

। (অবহেলায়) যেতে দিন, এমনই বললাম।
াষাল বাইরে সামনে দৃষ্টি ছেড়ে দিলেন)

লাল। (খুশী মুখে) যা বলেছেন, এ সব যেতে
ভাল। (ডক্টর সান্যালকে) আপনার কাছেই
ান্যাল বাবুজী, জরুরী কথা আছে।

সান্যাল। বলুন।

লাল। আপনার নতুন ফরমুলা আমি পেটেন্ট
বছি। যত টাকা চান দেব—মোদ্দা কথা ফরমুলা
াই।

। সান্যাল। (চোখে কৌতুক, মাথা নেড়ে) সে
। হয় না শেঠজী!

লাল। হতেই হবে। আমার চেয়ে বেশী টাকা
পনাকে দিতে পারবে না।

। সান্যাল। কিন্তু কোথায় আপনি আর তা
বলুন?

লাল। কেন? ঝুমঝুমওয়ালা কি এরই ভেতর—
ঃ)

। সান্যাল। ভয় পাবেন না, ঝুমঝুমওয়ালা নয়।

লাল। তা হলে?

। সান্যাল। কবে বিক্রি করে দিয়েছি।
ার কোম্পানি—টাকা দিয়েছে, নোবেল
র তদ্বির করছে। কত টাকা দিতেন আপনি?
য়ে ভালই করেছি—বিক্রি আমাকে করতেই
।

লাল। (কণ্ঠে হতাশা) শুনেই তাড়াতাড়ি ছুটে
ার এরই ভেতর বিক্রি হয়ে গেল?

ডক্টর সান্যাল। আপনার চেয়ে আরও তাড়াতাড়ি
করবার লোক আছে শেঠজী, আপনি হেরে গেলেন।
মোদ্দা কথা, চড়া দাম হেঁকে আপনিও চাপা দিতেন,
ওরাও চাপা দেবে—ঘাবড়াবেন না।

[ঠিক সে সময় ছুটে এসে নারায়ণ ঢুকল। ঢোকার
ধরনে একসঙ্গে দৃষ্টি ছুটে গেল সকলের]

ডাক্তার ঘোষ। কী খবর নারায়ণ?

নারায়ণ। 'ফেন দাও গো' বলে পথে পথে
কাতরাচ্ছিল। বুঝিয়েছি, দেবার মালিক আজ নেই, জোর
করে নিতে হবে—দশ হাজার লোক জড়ো করেছি!
লুটনলালের হাওড়ার গুদাম লোপাট। আটা চাল সব
হাতে হাতে উধাও।

সুকুমার। (সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে উৎসাহে হাতের
ভঙ্গি করে) সাবাস নারায়ণ! বাঃ বাঃ! লুটনলালের
গুদাম লোপাট! তা হলে তো দেখতে হয়—

[দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, উলটে পড়ল চেয়ার]

লুটনলাল। (উঠে দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ, দুপুরে ডাকাতি!
পুলিস—এক্ষুণি পুলিস ডাকছি।

নারায়ণ। (লুটনলালকে দেখতে পেয়ে মারমুখী
মূর্তিতে লুটনলালের দিকে এগিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল
নেড়ে) পুলিস ডেকে আর কি হবে বাছাধন—সব খতম!
পুলিসের সামনেই লোকে লুট করেছে—পুলিস বাধা দিতে
সাহস করে নি। দশ হাজার লোক—

লুটনলাল। (হতাশভাবে বসে পড়ে) অ্যাঁ, লুট হয়ে
গেছে! এখন উপায়? শ্রদ্ধানন্দ পার্কে লঙ্গরখানা
খুলব কথা দিয়ে কনট্রাক্ট নিয়েছি। চাল আটা লুট হয়ে
গেল, আমি লঙ্গরখানা খুলি কী করে?

নারায়ণ। (চিবিয়ে চিবিয়ে) সে আর খুলতে হবে
না। লোক না খেয়ে মরছে আর উনি চাল গুদামবন্দী
করে লঙ্গরখানা খুলবেন!

লুটনলাল। খেপা কুকুরের দল! এক রাউণ্ড গুলি
ছুঁড়লেই শায়েস্তা হবে।

নারায়ণ। (চিবিয়ে চিবিয়ে) শালা! দু-একজন
নয়, দশ হাজার খেপা কুকুর! তোমার বাড়ির দিকে
লেলিয়ে দিয়ে এসেছি। এতক্ষণ বাড়ির ইট কাঠ আছে কি
না খবর কর!

[ইলা আর ডাক্তার ঘোষ হঠাৎ একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।]

[ডাক্তার ঘোষ, লুটনলাল ও নারায়ণ প্রায় এক সঙ্গে পরপর]

ডাক্তার ঘোষ। এ করেছিস কী! (কণ্ঠে বিরক্তি) এত করে বারণ করলাম। জানি একটা কিছু বাধাবেই!

লুটনলাল (উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে) পুলিস—পুলিস—

নারায়ণ। শালা! পুলিস তোমার বাবা। টাকার জোরে আর রক্ত নেবে! নাও এবার? বলেছিলাম না, শোধ তুলব। নাও রক্ত?

লুটনলাল। (নারায়ণের কথা না শুনে) এক্ষুণি শায়েস্তা করতে হবে এদের। পুলিস—(বেরিয়ে যেতে উদ্যত)

নারায়ণ। (লুটনলালের পথ আটকে) যাচ্ছ কোথায়? যেয়ো না। দশ হাজার—একেবারে খেপে গেছে। তোমাকে পেলে (হাতের ভঙ্গি করে কথায় জোর দিয়ে) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। পুলিসের বাবাও বাঁচাতে পারবে না।

[চোখেমুখে আতঙ্ক, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লুটনলাল আবার বসে পড়ল]

ডাক্তার ঘোষ। উঠুন লুটনলালজী, আমি এদের ফেরাব—চলুন। (ইলাকে নিয়ে ব্যস্তভাবে বেরুতে গিয়ে ফিরে ডক্টর সান্যালের দিকে তাকালেন) যে জন্যে এসেছিলাম ডক্টর সান্যাল, আগামী ৭ই আমাদের বিয়ে। ইলা রাজী হয়েছে।

ডক্টর সান্যাল। (উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ডাক্তার ঘোষকে) কনগ্রাচুলেশনস! (সামনে পেছনে ঈষৎ মাথা দুলিয়ে) আমার চেয়েও চালাক তোমরা। (ইলাকে) কেমন, আমার কথাই ঠিক হল তো? বলেছিলাম না, বেহিসেবী হিসেবেরই জিত হল তো?

[ইলা আর ডাক্তার ঘোষ ব্যস্তভাবে বেরোতে গিয়ে লুটনলালের দিকে তাকালেন]

ডাক্তার ঘোষ। (লুটনলালকে) এখনও বসে রইলেন যে! আর দেরি করবেন না শেঠজী, আমাদের সঙ্গে চলে আসুন!

[ইলা আর ডাক্তার ঘোষের পিছনে নারায়ণ আর লুটনলাল বেরিয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইলেন গীতা ঘোষাল আর ডক্টর সান্যাল]

ডক্টর সান্যাল। (গীতা ঘোষালের দিকে তাকালেন) তা হলে, এখন আমরা—

গীতা ঘোষাল। তা হলে কী আবার? আমি তো রাজীই ছিলাম। শুধু ওই সংঘ আটকে দিয়েছিল। আর কোন বাধাই নেই।

ডক্টর সান্যাল। আমার এক বন্ধু আমার নতুন আবিষ্কারের জন্য হোটেলে এক পার্টির আয়োজন করেছে। তা হলে সেখানেই যাওয়া যাক। (উঠে দাঁড়ালেন)

গীতা। (উঠে দাঁড়িয়ে) চলুন।

[দুজনে বেরিয়ে গেলেন]

যবনিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

র দিন খুব ভোরে উঠল অনসূয়া। আজ তার ক্টরের সঙ্গে দেখা করার দিন। কিন্তু এখন আর নয়। এখন সে বাগ্‌দত্তা—বাদলরাম শেঠের স্ত্রী। ভাবোচ্ছ্বাসে ভেসে গেলে তার চলবে না। কথা চিন্তা করাও এখন পাপ। আর তা ছাড়া লা তার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে। তার কথা ড়িয়েছে যাকে-তাকে। জান্‌কী পর্যন্ত খোঁচা দিল য়ে। ভিক্টরের উপর জান্‌কীর এত দরদ কী উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোক! বাদলরামের বোন ঝাই যায় না। বিয়ের আগে নিশ্চয়ই ভিক্টরের ছু ছিল। মরুক গে। ওরকম ছেলেমানুষি ই করে। তবে জান্‌কীর একটু বাড়াবাড়ি। ত্রা প্রায় ভিক্টরেরই সমান। এখনও যদি সেন্টিমেণ্ট নিয়ে বাচালপনা করে বেড়ায়, চোখে বিশ্রী ঠেকে সেটা। আশ্চর্য, মাতাল মধ্যে কী এমন ঐশ্বর্য দেখতে পেল জান্‌কী য়া যাবার ভয়ে কোমর বেঁধে তার সঙ্গে রতে এল? কাল দেখা হলে বলে দেবে, ওই ঝুটা জহরতের প্রতি আমার কোনও ই। তাবিজ বেঁধে পর তুমি গলায়। জান্‌কীর বয়সের ন্যাকামি নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে হাসি তার। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সে কাজকর্ম করতে লাগল।

উর্মিলা বলল, কি, শেঠানীর যে আজ বেজায় ফূর্তি। আজ তো আর শেঠজীর বাড়ি পড়াতে যাবে না। সময় কাটাবে কী করে?—তার পর বলল, বহেন, বিয়ের পরেও ছেলে পড়াবি? মাইনে নিবি?

অনসূয়া বলল, মাইনে নেব না তো কি অমনি অমনি পড়াব?

দশটা বাজল, খাওয়া-দাওয়া করে গুরুচরণ কাজে বেরুল। ফ্রামজী শেঠের আপিস কোনও দিনই বন্ধ হয় না। অনসূয়ার বিয়েটা হয়ে গেলে সে এই গোলামী ছেড়ে দেবে। বেরিয়ে পড়বে তীর্থযাত্রায়। উর্মিলাও নিজের পথ করে নেবে। চোবেজীর ছেলেটা সকাল-বিকেলই তো আসছে। এক গোদাবরীকে নিয়েই মুশকিল। গুরুচরণ আজকাল ভয়ের চোখে দেখে অনসূয়াকে।

বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে অনসূয়াও চিন্তিত। তবে কি তিনি খুশী হন নি এই বিবাহ-প্রস্তাবে?

এগারোটা বাজল। অথর্ব পিসীকে খাইয়ে অনসূয়া উর্মিলাকে খেতে ডাকল।

একজনের খাবার পরিবেশন করতে দেখে উর্মিলা জিজ্ঞেস করল, তুই খাবি না?

অনসূয়া বলল, খিদে নেই রে।

উর্মিলা বলল, না হয় বিকেলে একবার ঘুরেই এস শেঠজীর কাছে। নাঃ, তুই বাওলা (পাগল) হয়ে গেছিস একেবারে।

জোর করে বসাল উর্মিলা। রুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল অনসূয়া। খেল না কিছুই। খাওয়ার পর উর্মিলা গেল চোবেজীর বাড়ি। অনসূয়া নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল খানিকটা। ঘুম এল না। বারোটা বাজল। উঠে পড়ল সে বিছানা ছেড়ে। নীচে নেমে এল। দরজা খুলে খানিকটা চেয়ে রইল বাইরের দিকে। ধুলো উড়ছে, গরম হাওয়া বইছে। পাড়া নিঝুম। দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে এল। পিসীর ঘরে গিয়ে দেখল তিনিও ঘুমোচ্ছেন। রাগ হল তার পিসীর ওপর, উর্মিলার ওপর, গুরুচরণের ওপর। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। কোনও দ্বন্দ্ব কোনও দুশ্চিন্তা নেই কারও মধ্যে। বাবা চলে গেলেন কাজে, উর্মিলা চলে গেল আড্ডা দিতে, পিসী পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। সে যে একটা মানুষ—তার যে কথা কওয়া দরকার, এটা কেউ বুঝল না। আর কথাই বা কার সঙ্গে কইবে? এত বয়স হল, তার একটি বন্ধু নেই যার কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নেয়।

একটা বাজল। অনসূয়ার অস্থিরতা আরও যেন বাড়ল। কী করবে সে? একখানা টাঙ্গা করে চলে গেলেই হয়। গিয়ে তাকে বলে আসা। এইটুকু শুধু বলে আসা যে, ঘটনাচক্রে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। আর সে তার কাছে আসতে পারবে না। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল সে। পরমুহূর্তেই বিছানায় বসে পড়ল। না, সে পারবে না আর ভিক্টরের কাছে মুখ দেখাতে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল অনসূয়া।

তিনটের জায়গায় পাঁচটার সময় ফিরে উর্মিলা দেখল, অনসূয়া যেন ধুঁকছে। যেন কতদিন ধরে রোগে ভুগে আজ বিছানা ছেড়ে উঠেছে। উদ্‌ভ্রান্ত তার চাউনি। হাঁটতে গেলে পা ঠিক রাখতে পারছে না।

উর্মিলাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল অনসূয়া। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস বহেন? লক্ষ্মী বোনটি আমার, বল্, তুই রাগ করিস নি?

উর্মিলা অবাক হয়ে বলল, কেন, তোমার ওপর রাগ করতে যাব কেন?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে অনসূয়া বলল, আমি বড় হতভাগী রে। আমার ওপর অভিমান করিস নি। যা ঘটে গেল তার ওপর আমার কোন হাত ছিল না। আমি তোদের ঠকাই নি। আমি মিথ্যাচরণ করি নি। আমার সবচাইতে ভাল জিনিসই আমি দিয়েছি। কথা আমি কইতে জানি না বহেন। আর কোনও দিন আমার মুখে কথা ফুটবেও না। ওই ডুঙ্গর পাহাড়গুলোর মত চুপ করে থাকব চির যুগ। কেউ জানবে না আমার কথা।

কাঁদতে লাগল অনসূয়া। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে উর্মিলাও কাঁদতে লাগল তাকে জড়িয়ে ধরে।

কান্নার পর অনসূয়া নিজেকে সামলে নিল। ম্লান হাস্যে বলল, বড্ড ভয় পেয়েছিলি, নয়? তুই চলে যাবার পরই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তুই যখন এলি, স্বপ্নের ঘোর তখনও আমার কাটে নি।—উচ্চ হাস্যের প্রচেষ্টা করে বলল, এখন মনে করে হাসি আসছে। কী দেখেছিলাম জানিস?—আবার জোরে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে অনসূয়া বলল, অহল্যার মত পাথর হয়ে গেছি আমি।

ভয় পেয়ে উর্মিলা বলল, তুই শুয়ে থাক্ বহেন। তোর শরীর আজ ভাল নেই। বাবা এলে ডাক্তার ত্রিবেদীকে আমি ডেকে আনব।

তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে অন[illegible] বলল, আর জেঁপোমি করতে হবে না। চল্ নীচে, চুলা জ্বালা, একটু চা তৈরি করা যাক।—হেসে বলল, তুই দেখছি একেবারে কচি। মেয়েমানুষ হয়েও মেয়েমানুষের কান্না দেখে ঘাবড়ে গেলি! ওরে, আমরা হলাম ডাকন্ চুড়েলের জাত। যখন খুশি কাঁদতে পারি, আবার যখন খুশি হাসতে পারি।

রবিবার শ্যাম সিংয়ের দিনের গাড়িতে ডিউটি ছিল। সাড়ে আটটার মধ্যে টিফিন কেরিয়ারে রোটি শাক নিয়ে সে রানিং-রুমের দিকে রওনা হল। ভিক্টরের প্রোগ্রাম আগে থেকেই তৈরি ছিল। শ্যাম সিং বাড়ি থাকলে সে ঠিক করেছিল অনসূয়াকে নিয়ে রাওলজীর 'বান্ধা'য় বা সুশীলপুরার শীর্ণ জলপ্রবাহটির ধারে গিয়ে বসবে। আর চাচা যদি ডিউটিতে যায়, এই ঘরে বসেই

আলোচনা করবে। চাচার কাছ থেকে গোটা
াকাও চেয়ে রেখেছিল। অফ ডিউটির 'পোর্টার'
দিয়ে শহর থেকে আনিয়ে রেখেছিল, 'মিস্‌রীমওয়া'
ক্কা দাল' (কালাকাঁদ আর মুগের ডাল ভাজা)।
ামিয়ে স্নান সেরে চাচার মাখন-জীনের কোট
কী ব্রীচেস পরে প্রফুল্লমনে প্রতীক্ষা করছিল
। আগমনের। জানকী-নিক্ষিপ্ত পুঞ্জীভূত
এই কদিনের ব্যবধানেই ছিন্নভিন্ন ছত্রাকার
য়েছিল—রাবণের সম্মুখে জটায়ু পাখির মত।
দু-একটা ছেঁড়া পালক উড়ছিল বাতাসে।
কথা মনে করে আজ বরং সে কৌতুক বোধ
াগল। আসুক না অনসূয়া। অবাক করে দেবে
বলবে, Oh thou eternal woman, you
orrigible! বলবে, তুমি কি ভেবেছ মাস্টার-
াদলকে বিয়ে করলে আমি ঈর্ষান্বিত হব?
াব, বুদ্ধ খ্রীষ্ট গান্ধী ছাড়া ভিক্টর অগাস্টাস
বীতে কাউকে ঈর্ষা করে না।

পায়চারি করতে লাগল ভিক্টর। দশটা বাজে।
াও তো এল না! সকালে এসে চাচাকে দেখে
য় নি তো!

ায়ে এল সে বাইরে। কোয়ার্টারের সামনে
ের ছায়ায় ডোঙা মুচি বসত ভোর থেকেই।
ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কোনও ঔরৎ এসেছিল
—মুচি মাথা নাড়ায় খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে
ল। খাওয়া-দাওয়া সেরে হয়তো আসবে। তা
ন্ত সে ভারি রাগ করবে অনসূয়ার উপর।
থাকতে উঠে সে খানা বানিয়ে রেখেছে।
শাক, ঘিয়ার কড়ী আর দাল বানিয়েছে
াতে। রিফ্রেসমেণ্ট রুম থেকে তৈরি করিয়ে
ছ মাংসের 'পসন্দা'। সব তাকে খাইয়ে ছাড়বে।
ত দেরি করছে কেন সে? উঃ, যা গরম পড়েছে!
এত শীগগির কোনও বছরেই গরম পড়ে না।
আসুক আর বাসেই আসুক, ঝলসে যাবে
া। পি-ডবলিউ-আই. বি. সি. দেবের বাড়ি
খানকয়েক খসকি পর্দা আনলে কি রকম
জল 'ছিড়কাও' করে ঘরখানাকে একেবারে
শাওণ ভাদো কুঞ্জের মত ঠাণ্ডা করে রেখে দেবে। আজ
থাক্‌। কখন ও এসে পড়বে তার ঠিক কী? এমনি
চাদর ভিজিয়েই পর্দা টাঙিয়ে দেবে।

এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল, একটা বাজল।
ভিক্টরের উৎকণ্ঠা চরমে গিয়ে পৌছল। নিশ্চয়ই তার
কোনও অসুখ করেছে। নইলে না আসার তো কোনও
কারণ নেই! রাস্তায় কোনও অ্যাকসিডেণ্ট হয় নি তো?

বিকেল হল। সন্ধ্যা হল। রাত্রি হল। অনসূয়া
এল না। নির্জীবের মত ভিক্টর শুয়ে রইল বাইরের
ঘরের খাটে। বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে জানকীর দেওয়া
বিষভাণ্ডের আবরণ ফেলল খুলে। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী
পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল তার ভিতর থেকে।
আকাশ আচ্ছন্ন করে গর্জে উঠল আরব্য উপন্যাসের
'জিনে'র মত।

শ্যাম সিং ডিউটি থেকে ফিরে দেখল দরজা হাট
করে ভিক্টর ঘুমোচ্ছে। বুঝল, ভতিজার পুরনো রোগ
আবার চেগেছে। সুরা পান করে বেহোঁশ হয়ে পড়ে
আছে। নিজেও সে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পান করে
এসেছিল। তাই উদার চিত্তে ভিক্টরের দরজা খুলে রেখে
ঘুমিয়ে পড়ার অপরাধ মার্জনা করে নিজেই দরজা বন্ধ করে
দিল। অনসূয়ার জন্যে রাখা মাংস তরকারি মিষ্টি তৃপ্তির
সঙ্গে আহার করে শুয়ে পড়ল।

খুব ভোরে ভিক্টরের ঘুম ভাঙল। তখনও আবছায়া
অন্ধকার রয়েছে। রাস্তার আলো নেবে নি। বাইরের
দরজা খুলে সে শুয়েছিল। বন্ধ দেখে বুঝল, শ্যাম সিং
ফিরেছে। কত রাত্রে ফিরেছে সে টেরও পায় নি। মুখ
হাত ধুয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিয়ে সে বেরিয়ে
এল। ভঙ্গীরা সবে রাস্তা ঝাঁট দেওয়া শুরু করেছে।
ধুলো উড়ছে ভীষণ। সাড়ে চারটের গাড়ির যাত্রীর দল
ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কেউ বা টাঙ্গা থেকে
মালপত্র নাবাচ্ছে, কেউ বা টিকিট কেনার লাইনে গিয়ে
দাঁড়াচ্ছে। বিকট শব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মেলগাড়ি
ইন করল প্ল্যাটফর্মে। ব্যস্ততা ও কলরব বেড়ে উঠল
যাত্রীদের। যারা নামল তারাও হুড়োহুড়ি করছে, আবার
যারা চলে যাচ্ছে তাদেরও হুড়োহুড়ির অন্ত নেই। কেবল
গান্ধীজীর রেলিঙ-ঘেরা স্ট্যাচুর নীচে অনাসক্ত নির্বিকার

কয়েকজন দুঃস্থ ও পঙ্গু ঘুমিয়ে রয়েছে। মানুষের যাওয়া-আসা তাদের উদ্বিগ্ন করে না। ঈর্ষা বোধ করল ভিক্টর তাদের দেখে। স্টেশনে চা খেয়ে প্ল্যাটফর্মের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া-আসা করল কয়েকবার। কিশোরবয়সে যেমন করত—গাড়িতে সুন্দরী মেয়ে আবিষ্কারের আশায়। আজও দেখল বহু সুন্দর মুখ। কিন্তু অনসূয়ার তুলনায় তাদের সবাইকে অসুন্দর বলে মনে হল তার। পাঁচটায় ট্রেন চলে গেল। ছটা পর্যন্ত সে স্টেশনেই কাটাল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করবে সে। পরিচিত রিকশওয়ালা দেখতে না পেয়ে কমবয়সী একজন সিন্ধীর গাড়িতে চড়ে বসল। তারপর বলল, দাঁড়া, দেখি পকেটে কত পয়সা আছে।—রিকশওয়ালা বলল, পয়সার জন্যে কোনও ফিকর নেই। বউনির চায়ের পয়সা কেবল দেবেন। গোপি কালু নারাণ ওদের আমি চিনি। ওরা আপনার কথা আমায় বলেছে। পয়সার ফিকর আমি করি না।—ভিক্টর তার নাম জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, দেবর্ষি নারায়ণ। ভিক্টর বলল, দেবর্ষি বল?—সে বলল, না, সিন্ধীতে আমরা দেবর্ষিই বলি।—আশাতিরিক্ত চা নাস্তা খাইয়ে দিল তাকে ভিক্টর। বলল, চল, গায়ত্রী দেবী গার্লস স্কুলে।—আজমেরী দরজার চৌমাথায় এসে ভিক্টর রিকশ ছেড়ে দিল। বলল, এটুকু আমি হেঁটেই যাব।—একটা টাকা দিতে গেল, দেবর্ষি নিল না। ভিক্টর রামবাগ রোড হয়ে স্কুলের দিকে অগ্রসর হল। ফটকের অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অনসূয়ার জন্যে। স্কুলে না ঢুকে রাস্তাতেই সে কথা বলে নেবে। কাল কেন এল না এইটুকুই সে জানতে চায়। সাড়ে ছটা বাজে। দলে দলে মেয়ে তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কেউ হেঁটে, কেউ মোটরে, কেউ বা সাইকেল-রিকশয়। লেডিজ সাইকেলেও চলেছে অনেকে। স্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। লেট-কামাররা এসে গেল। এক পিরিয়ড ক্লাস পর্যন্ত হয়ে গেল। অনসূয়া আর এল না। আজই তার বিয়ে নাকি!

কই জানকী তো সে কথা বলে নি! ধৈর্য রাখতে পারল না আর ভিক্টর। না, স্কুলের আপিসে গিয়ে আর সিন-ক্রিয়েট করবে না। দরোয়ানকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মুখে দাগওয়ালী মাস্টারনীজী কি আজ এসেছে?

দরোয়ান আধুনিক। হেসে বলল, কৌন, মিস ভার্গব? নহি, উয়ো আজ নহি আয়ি।

হতাশ হয়ে ভিক্টর চৌমাথায় ফিরে এল। 'মানপ্রকাশ টকিজে'র সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জলে ডোবা মানুষের নিঃশ্বাস নেবার ইচ্ছার মত থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। ইয়াদগারের ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে গেছে। অমৃত ভাণ্ডারে গিয়ে সহদেব হালওয়াইয়ের কাছে ধার চাইল কুড়ি টাকা। সহদেব বলল, বিকেলে কিন্তু দিতে হবে পাঁচ টাকা বেয়াজ!—জিজ্ঞাসা করল, কোথায় খেলা হচ্ছে?

ভিক্টর বলল, কাছেই। খুব কাছে।

জুয়া খেলতে খেলতে চাল আটকালে সহদেবের কাছ থেকে ভিক্টর আগে টাকা নিত। আর সুদ দিত প্রচুর।

বলল, এবারে টাকা দু-এক দিন পরে পাবে। অনেক দিন খেলি নি কিনা। খেলার খোঁচখাঁচগুলো ঠিক মনে নেই।

টাকা নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের পিছনের ছোট প্রবেশপথ দিয়ে সে আজমীর দরজায় ঢুকল। দেখল পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটা প্রতিদিনের মত দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বড় ফটকের প্রশস্ত রাস্তার দু ধারে ঘাসের জমি ফুটপাথের উঁচু লোহার রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। দু দিকেই ধারাহীন ফোয়ারার নীচে জমে আছে ময়লা জল। কালো আলখাল্লা পরা একজন ফকির তার লম্বা চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। চালচুলোহীন ভিখিরীগুলো যে যার স্থান দখল করে বসে আছে। আছে মালিশওয়ালা, কানসাফাই করনেওয়ালা। জাতিগোত্রহীন পথের ছেলেও গোটাকতক বাস করে ওই ফটকের সীমানার মধ্যে। তারা ভিক্ষেও করে, চুরিও করে, কাছের হোটেল-গুলোতে মাঝে মাঝে কিছু কাজও করে আসে। আবার হনুমানজীর মন্দিরে পুজোও চড়ায়। ভারতের রাষ্ট্র-পরিচালকদের সঙ্গে এদের চরিত্রগত সাদৃশ্য দেখে ভিক্টর কৌতুক বোধ করল। পঙ্গু লোকটাকে একজন সিন্ধী চা-ওয়ালা এক গ্লাস চা ঢেলে দিয়ে গেল তার টিনের মগে আর দিল দুখানা বিস্কুট।

ক-সীমানার এই বিচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করতে অনসূয়ার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। শহরে করতেই তার আহত অহমিকা চাড়া দিয়ে উঠল। দ নাহাড়গড়ের রাস্তায় তাদের বাড়িতে। কিন্তু কটা অদৃশ্য বাধা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ম করতে হবে এই বাধা। ফটকের ডান দিকে নায় দৃঢ়পদে প্রবেশ করল সে। সকালের দিকে ল্পই ছিল। বেশীর ভাগ খদ্দেরই বিযে বিষক্ষয়ের মনে রাত্রের অত্যধিক পানের 'খুমার উৎরাতে' । আধপো-তিন-ছটাকের বেশী কেউ খায় না। মেথর, আসে লরি ড্রাইভার, আসে সাহেবী রী শিক্ষিত ভদ্রলোক। আবার ফোঁটা-তিলক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও আসে। সর্বশ্রেণীর সমন্বয় এই না।

ভক্টর এক বোতল নারঙ্গির সরাব নিল। নদার ভিক্টরকে চিনল। আরও অনেকেই । এতদিন পরে তাকে দোকানে আসতে দেখে আশ্চর্য হল না। বরং না আসতে দেখেই সকলে হয়েছিল। সঙ্গী-সাথীর অভাব হল না। প্রথম লের দাম দিতে দিল না আশা সিং নাথাওয়াট।

ী হাসি, কী চিৎকার, কী মত্ত উল্লাস!

টনটে পর্যন্ত হুল্লোড় করে ভিক্টর উঠল। চিরঞ্জীব নে পান খেয়ে ফটকের বাইরে আসতেই ডান । পেট্রোল পাম্পের কাছ থেকে কে তাকে ডাকল। বাহাদুর সিং— ট্রান্সপোর্ট অফিসার। বলল, দিব্যি জে রয়েছ দেখছি? যাবে আমার সঙ্গে? আজমীর এক্ষুণি। আছে দু বোতল মেওয়ার সরাব। য় শিকার করতে করতে যাব—বটের তিতির লে। হরিণ যদি পাওয়া যায় তো কথাই নেই।

ভক্টর বলল, না, আজ যাওয়া হবে না। তুমি বরং য় স্টেশনে নামিয়ে দিয়ো।—গাড়িতে ভিক্টর সহজ-ই কথাবার্তা বলতে লাগল। বাহাদুর সিং জিজ্ঞাসা কতটা উড়িয়েছ? খুব বেশী নেশা হয়েছে বলে নে হচ্ছে না।

ভক্টর বলল, 'ঠেকা'র সরাব, অর্ধেকের বেশী তো জল। ন্যবাদ দিয়ে স্টেশনের ক্রসিংয়ের কাছে নেমে ভিক্টর কানাইয়ালালের মদের দোকানে ঢুকল। দেখল পকেটে তখনও গোটা পাঁচেক টাকা রয়েছে। খিদেও বোধ হতে লাগল তার। 'ভুনিহুই মাস' আর রোটি আনিয়ে খেতে বসল ভিক্টর, জলের বদলে নিল আধ বোতল সস্তা দামের 'হরি সরাব'। দোকানে অনেকেই তাকে সুরাসঙ্গী হতে আমন্ত্রণ জানাল। মাপ চেয়ে উঠে পড়ল ভিক্টর। স্টেশনের একটা বেঞ্চিতে বসে সিগারেট খেতে লাগল। নেশা তার হয়েছে যথেষ্ট। পানও করেছে প্রচুর। কিন্তু সকাল থেকে সময় দিয়ে পান করাবার ফলে বুদ্ধি তার একেবারে জড়ত্ব পায় নি। বুদ্ধি রয়েছে, তবে ঘোলাটে, অস্পষ্ট হয়ে। যে চিন্তা নিয়ে সে আজ সকালে সুরা পান আরম্ভ করেছিল সেই চিন্তাটা সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবল বাহাদুর সিংয়ের সঙ্গে চলে গেলেই হত আজমীর। হঠাৎ একটি শাড়ি-পরা আধুনিক মেয়ে তার সামনে দিয়ে দ্রুতপদে চলে যেতেই তার মস্তিষ্কের জড়তা দূর হল। মনে পড়ল অনসূয়ার কথা। ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজেছে। একটা টাঙ্গায় উঠে পড়ে বলল, চল গোলচা-ভবন।

টাঙ্গা থেকে নেমে পকেটের শেষ টাকাটা টাঙ্গাওয়ালার হাতে দিয়ে ফটকে ঢুকে পাহারাতিদের জিজ্ঞাসা করল, মাস্টারনীজী এসেছেন?—তারা বলল, হ্যাঁ কোঁড়সাব, ছেলেদের পড়াচ্ছেন।—ভিক্টর বলল, তাঁকে গিয়ে বল, আমি দেখা করতে এসেছি খুব জরুরী কাজে। পাঁচ মিনিটের জন্য তিনি যেন একবার দেখা করে যান।

ভিক্টর ড্রইংরুমে গিয়ে বসল।

পাশেই অ্যান্টিরুমে বসে অনসূয়া পড়াচ্ছিল। বাদলরাম আজ এখনও ফেরে নি। পড়ানো তার হয়ে গিয়েছিল তবু বাদলরামের সঙ্গে দেখা করবার বাসনায় সে নানা গল্প বলে ছেলেদের ভুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। অন্দরে গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করতে আজ তার লজ্জা করছিল। বাদলরাম এলে আজ সে বলে দেবে পড়াতে সে আর এখন আসবে না। স্কুলেও ছুটি নিয়ে রেখেছে। ইস্তফা দেবার আগের ছুটি। এ নির্দেশ বাদলরামই তাকে দিয়েছিল। কিন্তু এখানেই বা কী করে সে আর পড়াতে আসে! আজ তাই সে অপেক্ষা করছিল বাদলরামের জন্যে। আজ এর একটা ব্যবস্থা করে তবে সে উঠবে।

লাড্ডু এসে বলল, ভিক্টর কৌড়সাব আপনার সঙ্গে কী একটা জরুরী কাজে দেখা করতে এসেছেন। পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

অনসূয়া উঠে দাঁড়াল। যেমন করে বৈদেহী সীতা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন রামচন্দ্রের কাছে অগ্নিপরীক্ষা দিতে। ধীর সংযত পায়ে দালান পার হয়ে সে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। লাড্ডু টেনে ধরল জালি দেওয়া স্প্রিংয়ের দরজা। ভিক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষেই অনসূয়া বুঝতে পারল যে, সে সুরা পান করে এসেছে। ভাবল, চলে যাবে বাইরে। পারল না কিছুতেই। পা তার মাটি থেকে উঠল না। কাছেই একটা সোফায় বসে পড়ল। অদূরে একটা মোড়ার উপর বসে ছিল ভিক্টর।

আরক্ত চোখে ভিক্টর সেকেণ্ড কয়েক অনসূয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বর্ষাকালের পাহাড়ে নদীর মত ফুলে ফেঁপে পাক খেয়ে বইতে লাগল তার বাক্যস্রোত। অভীষ্ট বস্তু না পাওয়ার নিরুদ্ধ অভিমানে সে যেন বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

বলল, এই এপ্রিলে আমার বত্রিশ বছর পূর্ণ হল। আজ পর্যন্ত কোন নারী কল্যাণী রূপে আমার জীবনে দেখা দিল না। মাধো পানওয়ালার মেয়ে—যে ছিল আমার জন্মদাত্রী, সে পর্যন্তও নয়।—প্রমত্ত হাস্যে বলল, সবাই চায় ছাঁচে ঢালা রেডিমেড যুধিষ্ঠির তাঁদের কাছে এলে, তখন তারা মহীয়সী মূর্তিতে আবির্ভূত হবে। মাস্টারসাব, সমস্ত জীবন আমার কেটেছে লক্ষ্যস্থির না করতে পারার অস্বস্তির মধ্যে। আজ অর্ধেক জীবন বরবাদ করে শিল্পসাধনাকে আমার অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে যখন স্থির করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি এলে আমায় বিভ্রান্ত করতে। প্রতিশ্রুতি দিলে আমায় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তারপর মোহিনী মায়াবিনী রূপে নিজেই দাঁড়ালে সেই লক্ষ্য আড়াল করে।—কণ্ঠে শ্লেষ দিয়ে বলল, মাস্টারসাব, ভাঙা ছুরি, লোহার টুকরো দিয়ে আমায় মডেল গড়তে দেখে তোমার দরদ যে উথলে উঠেছিল! কই, আমার স্ক্রেপার কই? আমায় যে স্ক্রেপার আনিয়ে দেবে বলেছিলে?—হা-হা করে হেসে বলল, আর ড্রইং-পেপার? অন্ততঃপক্ষে একটা ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ দিয়ে একটু সুড়সুড়িও তো দিতে পারতে!—তারপর গম্ভীর গলায় বলল, মাস্টারসাব, আজ পর্যন্ত এভাবে কেউ আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে নি। অত্যন্ত সাবধানী ছিলাম আমি। যার যাতে টান, যার যাতে ঝোঁক সে জিনিসের প্রতি কেউ দরদ দেখালে অতিবড় বুদ্ধিমানও বোকা বনে যায়। তাই আমার শিল্পানুরাগের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ কোনদিন টের পায় নি।

মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অনসূয়ার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে নাটকীয় ভঙ্গীতে ভিক্টর বলল, আর তুমি! তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে, তোমার ছলাকলায় বুদ্ধি হারিয়ে, আমার জীবনের সবচাইতে গোপন কথা আমি তোমার কাছে প্রকাশ করে ফেলেছি।

ভিক্টরের কণ্ঠস্বর কখনও অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, কখনও রোষে গর্জন করে উঠছিল, কখনও বা কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল।

অনসূয়া পড়াতে পড়াতে উঠে এসেছিল। হাতে তার ছিল একটি পেনসিল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে মাথা নীচু করে পেনসিল দিয়ে বাঁ হাতের চেটোর উপর সে অনবরত আঁকজোক কেটে যাচ্ছিল। ভিক্টরের কথার প্রতিবাদ করবার শক্তি তার নেই। চেঁচিয়ে ওঠার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

উন্মত্ত ভিক্টর বকে যেতে লাগল। বলল, বুঝেছি। সেদিন চাচা যখন একলা তোমায় আমার কাছে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, পাছে আমি তোমায় দংশন করি সেই ভয়ে আর্টের মন্ত্র আউড়ে তুমি আমায় সম্মোহিত করে রেখে দিলে। সঙ্গিনীদের কাছে বাহাদুরি করেছ তো যে, ভিক্টর সিংয়ের মত নামী বদমাশকে কী বেয়াকুফই না বানিয়েছ! একটা কথা তোমার বন্ধুদের হয়তো বলতে ভুলে গেছ যে, যে সাপ নিয়ে তুমি খেলা করেছ তার বিষ-দাঁত ছিল না। বিষোদ্গীরণ শিল্পসাধনার প্রতিবন্ধক জেনে পাথরে ছোবল মেরে মেরে নিজেই সে নিজের বিষ-দাঁত ভেঙে ফেলেছিল। তুমি আর এক বছর আগেও যদি আমার সংস্পর্শে আসতে, বিষের জ্বালায় ছটফট করে বেড়াতে সমস্ত জীবন। জিজ্ঞাসা কর, তোমার আগের ব্যাচের মেয়েদের। তারা এখন কেউ বা শেঠনী, কেউ বা সাহুকারণী, কেউ বা রানী কেউ বা কৌরানী। তারা

দংশন আজও ভোলে নি। তোমায় ছোবল বলেই আমায় নিয়ে খেলতে সাহস করলে।

ভমান-ভরা কম্পিত কণ্ঠে ভিক্টর বলল, কাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে ছলাম। 'তরুই কী' শাক আর 'ঘিয়া কী কড়ী' রেঁধেছিলাম। মাস্টারসাব, পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষই এমনি করে কারও জন্যে প্রতীক্ষা করেছে। ষই আসুক, মনে হচ্ছিল তুমি আসছ। পথে যেই নে হচ্ছিল তুমি যাচ্ছ।

ত্তজিত হয়ে ভিক্টর বলে যেতে লাগল, মাস্টারসাব, তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি। তুমি আমায় যেমন দুঃখ ঠিক তেমনি দুঃখই তুমি যেন পাও। তোমার কোনও সুন্দর পুরুষকে যখন ভালবাসবে, আর য়ে সে যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে অবহেলা করে এড়িয়ে যাবে, সেদিন মনে করো সিংকেও তুমি ঠিক এমনি দুঃখই দিয়েছিলে।

লার স্বর নামিয়ে ভিক্টর বলল, আমি জানি, এ শ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে তুমি একজন হবেই। ঢেউয়ের লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে মান সম্মান খ্যাতি। কিন্তু আমার সঙ্গে এই ডার্টি ট্রিক খেলবার র কী প্রয়োজন ছিল? কী দরকার ছিল আমাকে দেখাবার? শিল্পানুরাগ দেখিয়ে তুমি আমায় অভিভূত করে ফেললে যে, ভুলেই গেলাম ন হতে। আজ এই সুরাপানের মূলেও রয়েছে কোথায় ভেবেছিলাম তুমি আমায় উপরে তুলবে, য়ার করবে, এলিভেট করবে—তার জায়গায় ভিক্টর মদ খেয়ে আবার বেঢংগী রপ্তার শুরু করল। কিষণ-লজী যে আলোর প্রদীপ জেলে আমার তমসাচ্ছন্ন উদ্ভাসিত করলেন, তোমার আঁচলের সামান্য য় সে প্রদীপ গেল নিভে।

াছে এগিয়ে গিয়ে অনসূয়ার বাঁ হাত চেপে ধরে নি দিয়ে ভিক্টর বলল, আছে আর কিছু তোমার ?

ত জোরে তার হাত চেপে ধরেছিল ভিক্টরের সে নে নেই। তবে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা যে অনসূয়া ন সে কথা তার মনে আছে।

খুব আস্তে আস্তে মাথা তুলে ভিক্টরের মুখের দিকে চেয়ে অনসূয়া বলল, নহি, কুছ নহি।

গ্যায়রসী দাসী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জালির দরজার বাইরে থেকে বলল, মাস্টারনীজী, আপনি বাইরে আসুন, বাঈজী ডাকছেন।

অনসূয়ার হাত ছেড়ে দিল ভিক্টর। বেরিয়ে এল বাইরে। এতক্ষণ মত্ত প্রলাপের পর তার মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। দেখল, পর্দার আড়ালে মেয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে তার সব কথা শুনছিল। ফটক পার হয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল সে। সাক্ষানের দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল আজমেরী দরজায়। রামনিবাস বাগিচায় ঢুকে শুয়ে পড়ল রেলিঙের ধারে কেয়ারি-করা গাছের সারির নীচে—খোলস-ছাড়া সাপের মত নির্জীব হয়ে। চিন্তাশক্তি চলৎশক্তি হারিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে সে পড়ে রইল।

সাবেকি দরবার হলে বসে বাবুলাল গুলজারীলাল আর তারাচান্দ আড্ডা দিচ্ছিল। নতুন ড্রইংরুমে ভিক্টরের কাণ্ডকারখানা তারা কিছুই টের পায় নি। এ মহলের প্রবেশপথ ছিল ফটকের পাশে গলির ভিতর দিয়ে। বাদলরামের জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা।

তারাচান্দ বলল, আজকাল শেঠ সাহেবের দর্শন পাওয়া ভার। আপিস থেকে ফিরেই মাস্টারনীর কাছে গিয়ে বসবেন।

গুলজারীলাল বলল, হ্যাঁ, আজকাল মাস্টারনীর ঠাট কি রকম! নমস্তে করলে শুধু একটু ঘাড় হেলান।

বাবুলাল বলল, ও আর নতুন কথা কী?—হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে 'সের' আওড়ালে—

"গার গাধীসে ক্যায়হুঁ মৈঁ হুঁ তুঝ্ পর ফিদা
একিন হ্যায় ক্যায়া উয়ো ঘাস চরনাই ছোড় দে!"

(রাসভীরে তুমি রসের আলাপে ঘটালে সর্বনাশ,
আপনারে জানি শ্রেষ্ঠ রূপসী, ছাড়িল সে জল ঘাস।)

তারাচান্দ আর গুলজারীলাল একসঙ্গে দুজনে চিৎকার করে উঠল: আ-হা-হা-হা-হা-হা! খুব শুনায়ে দোস্ত!—কায়দামাফিক বাবুলাল পুনরাবৃত্তি করল সেরটি। ব্যাখ্যা করে বলল, খোতী, ইয়ানে (অর্থাৎ) গাধীকে কেউ যদি অনুরাগ জ্ঞাপন করে, তা হলে ওই মাস্টারনীর মতন সে।

খোলা দরজা দিয়ে তারা দেখতে পেল বাদলরাম আসছে। স্থূলকায় গুলজারীলালের পিছনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে বাবুলাল বলল, বাস, মেঁ্য তো খরগোশ বন গয়া!

বাদলরাম ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের নিরীক্ষণ করে বলল, আমি বেরুবার পর থেকে তোমরা কি এখানেই আছ?

গুলজারীলাল বলল, হাঁ সাব, 'রামী' খেলছিলাম আমরা।

বাদলরাম বলল, তা হলে ড্রইংরুমের দিকে যাও নি কেউ? একটা সারকুলেশনের ফাইল আসবার কথা ছিল ই. এম-এর কাছ থেকে, সেটার সম্বন্ধে কিছু জান না তা হলে? বিষণপ্রসাদ আজ নেই কিনা!

বাবুলাল বলল, গুস্তাখী মাফ কিজীয়ে! আপনার পি. এ. সাহেবের নামটা মেহেরবানি করে পালটে দিন। বিষণপ্রসাদ না রেখে ভীষণপ্রসাদ করে দিন। আপনার আপিস-ঘরে একদিন একখানা কাগজ চাইতে গিয়ে যা তাড়া খেয়েছি! সেই থেকে ও-মহলে ঢোকাই বন্ধ করে দিয়েছি। এই গলি দিয়ে আসি—শেঠ সাহাবকে দর্শন করি। চুপচাপ ফিরে যাই। ওসব ফাইল-টাইলের দিকে আমরা আর ঘেঁষি না।

বাদলরাম বলল, ঠিক আছে। আমি এখন ক্লাবে যাচ্ছি। কয়েকদিন আমি একটু ব্যস্ত থাকব। তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় দেখা হবে না।

বাদলরাম লাইব্রেরির দিকে চলে গেল। বাবুলালরাও বিদায় নিল।

ভিক্টরের এই মত্ত বিক্ষোভের কথা সেক্রেটারিয়েট থেকে ফিরেই সে ভৃত্য ভৌরিলালের কাছে প্রথম জানতে পারে। কিন্তু পাছে এ নিয়ে চাকরবাকরেরা আলাপ-আলোচনা কথা চালাচালি করে, তাই উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য দমন করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, এ আর এমন কি নতুন ব্যাপার। ভিক্টর তো চিরকালই ওই রকম। ভিক্টরকে একদিন ভাল সরাব খাওয়াব। খোঁজ করিস দিকিন আমাদের ভাণ্ডারে ভাল সরাব কি আছে! এবারে একদিন ককটেল পার্টি দেব। মহারাজাও কদিনের জন্যে এসেছেন, তাঁকেও নিমন্ত্রণ করব। বাড়িতে না দিয়ে ভাবছি পার্টিটা দুর্গাপুরার বাগিচায় দেব।—পোশাক পরিবর্তনের পর বলল, বাবুলালরা আছে নাকি দরবার-হলে?

ভৌরিলাল বলল, হ্যাঁ, তাঁরা দুপুর থেকেই আছেন।

বাদলরাম বলল, ডিসুজাকে কফি দিয়ে যেতে বল লাইব্রেরিতে, আমি এক্ষুণি আসছি।—দরবার-হলে সে কেবল জানতে গিয়েছিল যে, ভিক্টরের এই বিশ্রী কাণ্ডর সময় তারা ড্রইংরুমের আশেপাশে কোথাও ছিল কিনা। অশিক্ষিত চাকরবাকরের চেয়ে এই শিক্ষিত চাটুকারদের সে ভয় পেত বেশী।

কফি খাবার সময় জানকী ঘরে এল। বলল, শুনেছ, আজ কী হয়েছে? তোমার পেয়ারের মাস্টারনীকে দিয়েছে ভিক্টর ঠাণ্ডা করে। চেনে না তো ঈশাই ভিক্টরকে! নখরা করতে গেছে তার সঙ্গে। আমি গ্যায়রমীকে দিয়ে ডাকিয়ে না পাঠালে একটা তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত। তার বাঁ হাতখানা বোধ হয় ভেঙেই দিয়েছে! যা জোরে চেপে ধরেছিল!

নীরবে কফি খাওয়া শেষ করে ট্রের উপর পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে গুরুগম্ভীর গলায় বাদলরাম বলল, পরের কুৎসা থাক জানকী। দাসী চাকরই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমি জানতে চাই, তোমার দিল্লী যাওয়া প্রতিদিন পোস্টপোণ্ড হচ্ছে কেন? ট্রেনে অ্যাকোমোডেশন পাচ্ছ না বুঝি?—বলে উঠে গেল যে টেবিলে টেলিফোন ছিল। ট্রাফিক-সুপারিনটেনডেন্টের বাংলোয় টেলিফোন করল। আজ রাত্রের 'ওয়ান আপ' মেলে যেন দুটো ফার্স্ট ক্লাস লোয়ার বার্থ রিজার্ভড থাকে। ধন্যবাদ দিয়ে টেলিফোন রেখে জানকীকে বলল, বিষণপ্রসাদও দিল্লী যাচ্ছে। তাই দুটো বার্থ রিজার্ভড করালাম।

চোখের জল মুছতে মুছতে জানকী অন্দরমহলে চলে গেল জিনিসপত্তর গোছগাছ করবার জন্যে।

শান্তভাবে জানকীর সঙ্গে কথা বললেও আগুন জলছিল যেন তার মাথায়। ভিক্টর এতটা অমানুষ হবে সে আশা করে নি। জানকী বলল—বাঁ হাতখানা বোধ হয় ভেঙেই দিয়েছে! ছি ছি ছি! হি ইজ এ ব্রুট! সে যদি আজ থাকত সেই সময়, হয়তো রিভলভার দিয়ে গুলি করে মারত ভিক্টরকে। আশ্চর্য, আজই তার আসতে একটু দেরি হয়েছে আর অমনি ভিক্টর এসে হাজির! অনসূয়ার কিন্তু বরাবরই একটা আতঙ্ক ছিল ভিক্টর সম্বন্ধে। এটা তার ছেলেমানুষি ভেবেই এ নিয়ে সে মাথা ঘামায় নি। এখন দেখছে ভুল করেছে। ভিক্টরকে এবার শায়েস্তা করা দরকার। এখনি আই. জি. পি-কে টেলিফোন করে তাকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে পারে। স্থানান্তরিত করতে পারে অন্য প্রদেশের জেলে। Attempt to murder! Attempt to rape! পিষে ফেলতে পারে ভিক্টরকে। ডান হাতখানা থাবার মত এগিয়ে জোরে জোরে পায়চারি করতে লাগল বাদলরাম।

চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। না, সে পারে না! কিন্তু কেন পারে না? অদ্ভুত একটা অনুভূতি হঠাৎ জেগে উঠল তার মনে। ভিক্টর বলে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সে খুঁজে পেল না। যেন তারই মনের উগ্র দুর্দমনীয় একটা আকাঙ্ক্ষা ভিক্টরের রূপ ধরে তাকেই চমকে দিচ্ছে থেকে থেকে। ভিক্টর আরশিতে দেখা তার নিজেরই প্রতিচ্ছায়া। মুখ সে যত বিকৃত করবে

ৃত হবে তার প্রতিবিম্ব। তাই তাকে শান্ত
ব, সংযত হতে হবে, সুন্দর হতে হবে। তখনই
র-সমস্যার সমাধান।

অনুভূতি বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না তার মনে।
অপমানের প্রতিকারের জন্য স্পর্ধিত হয়ে উঠল
ৗরুষ। ভাবল মোটর নিয়ে বেরিয়ে যাবে
খুঁজে আনবে মাতাল ভিক্টরকে। পশুর মত
করে তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে অনসূয়ার
তলায়—ভীম যেমন করে নিয়ে গিয়েছিল
। তার ঔদার্য-প্রণোদিত অনুভূতি বা ঈর্ষা-
পৌরুষ কোনটাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল না।
কের সহজাত স্থৈর্য অবলম্বন করে বিচক্ষণতার
বাজারে তেজিমন্দি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।
এবং অনসূয়া দুজনের বক্তব্য না শুনে সে কোনও
করবে না। না বীরত্বের, না মহত্বের। কাল
পড়াতে এলে আগে তার কাছ থেকে সব কথা
মেয়েমানুষের লোকলজ্জা! অনসূয়া নাও
পারে কাল! তা হলে পাঁচটা পর্যন্ত দেখে সে
যাবে তাদের বাড়ি। তারপর বোঝাপড়া হবে
সঙ্গে। সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে স্বস্তি বোধ করল
রি হওয়া সত্ত্বেও ক্লাবে চলে গেল—উত্তেজিত
ীকে নাটকীয় বিরতি দেবার জন্য।

দিন উৎকণ্ঠিত মনে বাদলরাম অনসূয়ার আসার
বসে ছিল ছেলেদের পড়বার ঘরে। সাড়ে চারটে
গছে। পাঁচটা পর্যন্ত দেখে তারপর সে যাবে
বাড়ি। গুরুচরণের সঙ্গে বোম্বে যাওয়া সম্বন্ধে
আলোচনা করবে। তারপর সুযোগ বুঝে
ক জিজ্ঞাসা করবে কালকের ব্যাপার। বুদ্ধিমতী
রুচরণ উর্মিলাকে নিশ্চয়ই এসব কথা বলবে না
।, পাঁচটা বাজে, এল না। বারান্দায় জুতোর
। লঘুপদধ্বনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল
। জালির দরজা টেনে অনসূয়া ঘরে ঢুকল।
াস্তে নমস্কার করল বাদলরামকে। অবাক হয়ে
ল বাদলরাম। কালকের ঝড়ের কোনও চিহ্নই
র মুখে। তা হলে ভিক্টর এমন কিছু কাণ্ড
কাল যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন।
হল বাদলরাম। জিজ্ঞাসা করল, কাল কী
বল তো? লোকের কথায় আমি বিশ্বাস করি
য়ো। তোমার মুখ থেকে আমি যথার্থ কথা
ই।

য়ো জিজ্ঞাসা করল, কিসের কথা?

রাম বলল, আমার বাড়িতে এসে ভিক্টর
তোমাকে অপমান করে যায়, তার এতদূর স্পর্ধা! সে
সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, কী করতাম বলতে
পারি না। এতক্ষণে অনসূয়ার বাঁ হাতের ব্লাউজের নীচে
কালসিটের দাগটায় চোখ পড়ল তার। উত্তেজিত হয়ে
বলল, ব্রুট! তোমায় মেরেছে?

শান্ত কণ্ঠে অনসূয়া বলল, কী হয়েছিল আমার ঠিক
মনে নেই। তিনি কী সব বলেছিলেন তাও আমার মনে
নেই। একজন সহজ মানুষকে হঠাৎ ওই রকম দেখে আমি
বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোনও কিছুই আমি
মনে করতে পারছি না। আমার প্রতি যদি আপনার
কোনও মমতা থাকে তা হলে কালকের কথা আমাকে আর
জিজ্ঞাসা করবেন না।

বাদলরাম বুঝল, ভিক্টর তাকে চরম অপমান করেছে
কাল। বলল, বেশ, কালকের কথা আমি আর তুলব
না। কিন্তু এর প্রতিকার তুমি নিশ্চয়ই চাও? দুর্জনকে
প্রশ্রয় দিতে কখনও তুমি চাইবে না? অন্যায়ের শাস্তি
এবার তাকে আমি দেবই। বাবুলালের কাছে শুনলাম
মদ খেয়ে পথে পথে মাতলামি করে বেড়াচ্ছে ভিক্টর।
সুযোগ পেলে সে আবার তোমায় বিরক্ত করতে পারে।

অনসূয়া বলল, অন্যায় যদি তিনি করে থাকেন,
নিজেই ধ্বংস হবেন। আমরা কেউ শাস্তি না দিলেও
শাস্তি পাবেন। তা ছাড়া মানুষকে বিচার করার
অধিকার বোধ হয় আমাদের কারও নেই। কালকের
কথা আমি ভুলে যেতে চাই শেঠজী।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বাদলরাম চেয়ে রইল অনসূয়ার
মুখের দিকে। ভেদ করতে পারল না রহস্য। ভিক্টরের
কথা আর সে তুলল না। পরের সপ্তাহে বোম্বে যাওয়ার
কথাবার্তাই তারা বলতে লাগল। মোটরে পৌঁছে দিয়ে
এল অনসূয়াকে বাড়ি পর্যন্ত। বিদায়কালে হেসে বলল,
পড়াবার জন্যে আর তোমায় আসতে হবে না। রোজ
বিকেলে মোটর আসবে তোমাদের বাড়িতে, উর্মিলাকে
নিয়ে বেড়াতে যেয়ো। কিছু প্রয়োজন হলে ড্রাইভারের
হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ো। বাবাকে বলো, মাঝে মাঝে
আসব আমি তোমাদের বাড়িতে, বোম্বে যাওয়ার সমস্ত
ব্যবস্থা করবার জন্যে। উর্মিলা আমাকে দেখে অমন
আড়ষ্ট হয়ে থাকে কেন? ওকে সহজ হতে বলো। শালীর
সঙ্গে যে পরিহাসের সম্পর্ক!

হেসে বিদায় নিল বাদলরাম।

গৌরবময় ভবিষ্যৎ-জীবনের স্বপ্ন কিছুক্ষণের জন্য
অনসূয়াকে ভুলিয়ে দিল তার দোটানা মনের দুঃসহ
বেদনার কথা। বাড়ি ঢুকে উর্মিলার সঙ্গে হাস্যপরিহাসে
মেতে রইল সে।

[আগামীবারে সমাপ্য]

বাংলা ছোটগল্পের আকাশ

দ্বিতীয় প্রস্তাব

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হল প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী দশকে। এই পর্বটিকে আমাদের কালের পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম পর্বের সূচনা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় পর্বের ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম পর্বের অধিনেতা রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)—এসব কথা আগেই আলোচিত হয়েছে (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ৩৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পর্বে বাংলা গল্পের রূপান্তরসাধনের কৃতিত্ব কেবল কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-গোষ্ঠীর গল্পকারদের নয়, এই সঙ্গে দাবিদার আছেন প্রবাসী-বিচিত্রা-শনিবারের চিঠি-বঙ্গশ্রী-ভারতবর্ষ-অলকা পত্রিকার লেখকরা। বস্তুতঃ তিরিশের দশকে বাংলা গল্পের আকাশে নব নব রঙের খেলা দেখতে হলে শেষোক্ত পত্রগোষ্ঠীর লেখকদের কাছে আমাদের যেতেই হয়। এখানে তাঁদের কথাই আলোচনা করব। বিশেষ করে প্রবাসী-বিচিত্রা-শনিবারের চিঠি-বঙ্গশ্রী পত্রিকার সেই পর্বের সংখ্যাগুলি পড়লে এ সত্যই প্রতিভাত হয়, কল্লোলের সাতটি তারা-ই (অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-শৈলজানন্দ-প্রবোধ-মণীশ-জগদীশ) নয়, সেদিনের গল্পাকাশে আরও অনেক দ্যুতিময় তারার অভ্যুদয় হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অবশ্য-স্মর্তব্য নাম হল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমাঙ্কুর আতর্থী, মণীন্দ্রলাল বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অমলা দেবী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সমুদ্ধ, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামী। এই দুই ডজন গল্পকার কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত নন, কিন্তু তিরিশের দশকে বাংলা গল্পে এঁদের বাদ দিলে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। অবশ্য কয়েকজনের সঙ্গে 'কল্লোলে'র অল্প-বিস্তর সম্পর্ক ছিল।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা সমরোত্তর যুগের দুনিয়া-জোড়া সংশয় নৈরাশ্য ও আশাভঙ্গের বেদনাকে গল্পে শিল্পরূপ দিয়েছেন। পশ্চিমী দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির আলোকে তাঁরা সংসারকে নবরূপে দেখে-ছিলেন। জীবনের সনাতন প্রত্যয়গুলির অপঘাত মৃত্যু ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা স্কাণ্ডিনেভীয়, ফরাসি, রুশ ও ইংরেজী গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হলেন ও বোহেমীয় জীবনের দিকে ঝুঁকলেন। সেই সঙ্গে নাগরিক জীবন ও নগর-নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের তিক্ত নির্মম বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করলেন; আর সমাজের নীচুতলার শ্রমজীবী মানুষকে বন্দরে-খামারে-কয়লাখনিতে-কারখানায় আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কার ও নবমানবিকতার কৃতিত্ব তাঁদের অবশ্য-প্রাপ্য। কিন্তু এর মধ্যে নেতিবাচক দিকটি প্রবল হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম' জীবনের সমগ্র রূপদর্শনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

এই অভাববোধ পূরণ করলেন প্রবাসী-বিচিত্রা-শনিবারের চিঠি-বঙ্গশ্রী পত্রগোষ্ঠীর লেখকরা। পশ্চিমী জীবনের ছবি পাওয়া গেল অন্নদাশংকর রায় ও মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে; প্রকৃতির পরিবেশে মানুষের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ রূপটি দেখা গেল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্পে; বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনের বিশ্লেষণ-চিত্র পাওয়া গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে; গার্হস্থ্য-জীবনের মধুস্বাদী পরিবেশটি রূপ লাভ করল সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও মনোজ বসুর গল্পে; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে-

হাসিতে সাধারণ জীবন অসাধারণ হয়ে উঠল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, সম্বুদ্ধ, সজনীকান্ত দাস, অমলা দেবী, প্রমথনাথ বিশী ও পরিমল গোস্বামীর গল্পে। আর রোমান্টিক প্রেমের চিত্রাঙ্কনে এঁরা প্রত্যেকেই কৃতিত্ব দেখালেন।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা তাঁদের গল্পে পূর্ব-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন ও এক নতুন জীবনের আদর্শকে গল্পে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্যমান লেখকগোষ্ঠী তা করেন নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত যুগের গ্রামজীবনের সরলতা, ধর্মবিশ্বাস ও প্রকৃতিপ্রেমকে মূলধন করে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের ভেঙে-পড়া জমিদারকুলের দুর্মদ প্রাণাবেগ ও স্বেচ্ছাচারিতার এবং সমাজের অন্তে-বাসী বেদে-সাঁওতাল জীবনের সরলতা ও অলৌকিক বিশ্বাসের ছবি আঁকলেন। মনোজ বসুর সেকালের গল্পগুলির পটভূমি দক্ষিণ-বঙ্গের জনপদ, চরিত্রগুলি এই ভূমিরই মানুষ—শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা-মুক্ত। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্প রাঢ়-বঙ্গের বৈষ্ণবদের ধর্মবিশ্বাসের পটভূমিতে রচিত। নদীমাতৃক বাংলার বিভিন্ন রূপ তাই তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মনোজ বসু ও সরোজকুমারের গল্পে ধরা পড়েছে।

॥ ২ ॥

কল্লোল-গোষ্ঠীর কাছাকাছি গিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গল্পের সীমানাকে প্রসারিত করার অনেকটা কৃতিত্ব এঁরা দাবি করতে পারেন। মানিকের প্রতিষ্ঠা অতি-সচেতন নির্মোহ বিজ্ঞান-বুদ্ধির উপরে, তারাশংকরের প্রতিষ্ঠা রাঢ়-বঙ্গের জনপদ-জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায়।

"গল্প লেখার গল্পে" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'তখনও আমি বিশ্বাস করি নি, আজও বিশ্বাস করি না যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে।' বিজ্ঞানের কঠিন নির্মোহ বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর কাছে আদৃত হয় নি। আমাদের পরিচিত সংসার, প্রেম, যৌনাবেগ, পারিবারিক সম্পর্ক তিনি বিজ্ঞানী বিশ্লেষণের আলোকে দেখেছেন ও তাই গল্পে রূপ দিয়েছেন। তা দেখে আমরা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠি। জীবন-নাট্যের নিরাসক্ত অবিচলিত বিধাতা রূপে তিনি আমাদের আত্মদর্শন করিয়েছেন। যে নির্মম সত্য আমরা সহ্য করতে পারি না, অথচ অস্বীকার করতেও পারি না, মানিক তারই ভাষ্যকার। "আগন্তুক," "ফাঁসি," "প্রাগৈতিহাসিক," "সরীসৃপ," "নমুনা," "মুখে ভাত" এই নির্মম জীবনচিত্রণের পরিচয়স্থল। 'বিচিত্রা' ও 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে "অতসী মামী" ও "সরীসৃপ"।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে জীবনকে গ্রহণ করেছেন "ভাল-মন্দ সকলি মিলায়ে"। রাঢ়-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সমাজের ওপর-তলা থেকে নীচু-তলা পর্যন্ত তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'কল্লোল' ও 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর প্রথম গল্প যথাক্রমে "রসকলি" ও "শ্মশানঘাট" প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পে জীবনের পথ মানিকের গল্পের মত বক্রকুটিল গূঢ়চারী নয়, তা সরল ঋজু শরবৎ। জীবনের সহজ সরল বিকাশগুলির আবেগসমৃদ্ধ শিল্পরূপায়ণে তাঁর ঝোঁক। "জলসাঘর" গল্পে জমিদার-বংশের বৈভব ও পতন—দুই-ই তিনি দেখিয়েছেন। আবার "রসকলি" "জুয়াড়ী" "বেদেনী" গল্পে জনজীবনের বিচিত্র রূপ দেখেছেন। প্রবৃত্তি জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক, প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের উত্থান-পতন—এই বিশ্বাস তাঁর গল্পগুলিতে অনুস্যূত হয়ে আছে। আর "কামধেনু"র মত গল্পে ভারত-জীবনের ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।

'কল্লোলে'র সঙ্গে মানসিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন অন্নদাশংকর রায়, কিন্তু তিনি কখনও 'কল্লোলে' লেখেন নি, 'বিচিত্রা'য় তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'কল্লোলে'র তারুণ্য ও ইউরোপ-বন্দনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু 'কল্লোলে'র নৈরাশ্য, যৌনবিকার, বুদ্ধিজীবীর মানস-সংকট তথা বিকৃতি ও অবাস্তব রোমান্টিসিজমকে অন্নদাশংকর গ্রহণ করেন নি। তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বিশুদ্ধ মনন ও ইউরোপের ধ্যান—বুদ্ধি ও মনীষার সঙ্গে হৃদয়াবেগের হরগৌরীর মিলন হয়েছে তাঁর গল্পে। সমস্যার রূপায়ণে নয়, মননপ্রধান সমালোচনায় তাঁর আগ্রহ। তাঁর অধিকাংশ গল্পের পিছনে একটি ... জীবন-দর্শন থাকে। গল্পের জন্য গল্প লিখতে তাঁর অনীহা

অন্নদাশংকরের "স্ত্রীর দিদি," "উপযাচিকা," "রূপদর্শন," "যৌবনজ্বালা" ও "রানীপসন্দ" গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

গল্পের জন্য গল্প নয়—জীবনের একটি গভীর প্রত্যয়-জাত গল্প লেখায় অন্নদাশংকরের সঙ্গে আর যে কজনের নাম উল্লেখ্য তাঁদের অন্যতম হলেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনিও 'কল্লোলে'র সঙ্গে অল্প-বিস্তর সম্পর্কিত। 'কল্লোলে' তাঁর একটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হয় "পারুল" (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। ওই বছরেরই 'ভারতবর্ষে' চারজন তরুণ লেখকের গল্প প্রথম প্রকাশিত হল, তাঁরা হলেন—প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার ও ভবানী মুখোপাধ্যায়। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের গল্পটির নাম "মহাসাগরের নামহীন কূলে"। 'বিচিত্রা' ও 'অলকায়' তিনি বহু গল্প লিখেছেন। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত "দৃষ্টি" ('নির্জন গৃহকোণে' সংকলনভুক্ত) ও 'অলকা'য় প্রকাশিত "সাপ" ('সেই মেয়েটি' সংকলনভুক্ত) গল্প দুটি খ্যাতি লাভ করেছিল। এই দুটি সংকলন ছাড়া তাঁর আরও তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—"যথাপূর্বং", "বনহরিণী", "চন্দ্রমল্লিকা"। এই সংকলনগুলির গল্পে যে নিরাসক্ত জীবন-বিশ্লেষণ, মোহমুক্ত রূপ-অন্বেষণ ও মননশীল বিচারের দেখা মেলে তা প্রশংসার্হ। বাংলা গল্পকে বিশুদ্ধ গল্পরসে জারিত না করে মননের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে একালে যাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম ভবানী মুখোপাধ্যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রেমেন্দ্র, অন্নদাশংকর, মানিক, সুবোধ ঘোষ ও বনফুলের সহগামী। এঁদের গল্পে মননের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রভাতকুমারের গল্পে বাঙালী-জীবনের আনন্দময় কৈশোরের উচ্ছ্বাসপ্রবণ আবেগ ও সরলতার উজ্জ্বল ছবি পাই। তা আর কখনও ফিরে আসবে না। কেদারনাথের গল্পে তার অনুস্মৃতি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গল্পে এই আনন্দস্মিত সুরের মায়াজাল রচিত হয়েছে। সৌন্দর্যতন্ময়তা, কাব্যময় পরিবেশ, গীতিকবিতার স্বাদ, কোমল অনুভূতির কোমলতর আলেখ্য 'গল্পগুচ্ছে' পাই। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের ছোটগল্প সম্পূর্ণ ভিন্নতর শিল্পকর্ম। দেখা দিয়েছে সমাজ-সমস্যা ও তজ্জনিত সঙ্কট, প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বিরোধ ও সংঘর্ষ, প্রশ্নসংকুলতা, উগ্র বাস্তবচেতনা। "তিনসঙ্গী" এর পরিচয়স্থল। বাংলা গল্পে যে পালা-বদল হচ্ছে তার ইঙ্গিত এখানেই পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্রের ...ভারতী-গোষ্ঠীর গল্পের সমস্ত রোমান্টিক আবেদন ও ...কুলতাকে ছাপিয়ে উঠল প্রমথ চৌধুরীর সংশয়ী কণ্ঠস্বর। ...সঙ্গী"র বহুতর সঙ্গীর দেখা পাওয়া গেল। এল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর গল্প—প্রশ্নসংকুলতা, সমস্যার জটিল রূপায়ণ, ব... ...র দ্বন্দ্ব, নির্মম কঠিন অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা প্রাধান্য পেল। আর এই প্রবণতাকে যাঁরা তীক্ষ্ণাগ্র করে তুললেন, তাঁরা হলেন আলোচ্যমান গল্পকারবৃন্দ—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বনফুল, ভবানী মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর পর্বে আরও অনেকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নসংকুল, বাদ-প্রতিবাদে উষ্ণ, বিপরীত মতবাদের ঝটিকাক্ষুব্ধ পরিবেশে জীবনের অর্থ অন্বেষণ করলেন। বাংলা গল্পকে কাব্যপরিবেশ থেকে বাস্তবলোকে উত্তীর্ণ করার কৃতিত্বে এঁরাও অংশভাগী।

॥ ৩ ॥

আলোচ্যমান গল্পকারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অতিপ্রাকৃত রসের ব্যবহার। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নি; অচিন্ত্যকুমারের "ছায়া" গল্পটি ব্যতিক্রমস্বরূপেই সমুপস্থিত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশংকর, শরদিন্দু, বনফুল ও প্রমথ ... অতিপ্রাকৃত গল্পের সার্থক শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের হাতে অতিপ্রাকৃত রস যে রূপ লাভ করেছে তা একক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তা এই আলোচনার বাইরে।

অতিপ্রাকৃত রসের সৃজনে প্রয়োজন কল্পনার অবাধ বিস্তার ও কল্পরসের স্বেচ্ছাবিহার। উপরোক্ত গল্পকারবৃন্দ এই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এই শ্রেণীর গল্পে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মেঘমল্লার", "খুঁটিদেবতা", "বউচণ্ডীর মাঠ", "জলসত্র", "অভিশপ্ত", "হাসি", "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" এর সার্থক পরিচয়স্থল। "মেঘমল্লার" গল্পের পটভূমিতেই এর সার্থকতার রহস্য নিহিত। বৌদ্ধযুগের তান্ত্রিক ও বৌদ্ধাচার্য, বৌদ্ধবিহার ও পালি ভাষায় শাস্ত্রালোচনার রহস্যময় বাতাবরণে বন্দিনী সরস্বতীর বেদনা রূপায়িত হয়েছে। অনৈসর্গিক ও অতীন্দ্রিয় রহস্যে বিভূতিভূষণের কেবল সাহিত্যবিশ্বাস নয়, গভীর জীবন-প্রত্যয় ছিল—তার চমৎকার পরিচয় পাই "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পে"।

ক সৌন্দর্যধ্যান ও অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে বিশ্বাস মিলিত হয়েছে কাব্যস্বরভিময় বর্ণনার সঙ্গে।

রাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ডাইনী" গল্পটির কথা সঙ্গে মনে পড়ে। রুদ্র প্রকৃতির বর্ণনায় এখানে র আশ্চর্য সাফল্য দেখা গেছে। ছাতিফাটা মাঠের ঙ্কর তৃষার্ত বুকে জলরেখা মাত্র নেই, কেবল ও সৌরদাহ। গ্রামজীবনের কুসংস্কার ও অলৌকিক এই গল্পের মূলে আছে। অতিপ্রাকৃত রসের সার্থক ণ পাই মনোজ বসুর "বনমর্মর" ও "প্রেতিনী" "বনমর্মরে"র পরিবেশ কিংবদন্তীর দেশে, পটভূমি বাংলার গ্রামে অরণ্যাকীর্ণ ভগ্ন প্রাসাদ। টক প্রেমের অতীত কাহিনী বর্তমানের প্রতিনিধি ডপুটির সামনে লেখক কাব্যকৌশলে উদ্‌ঘাটিত ন। শঙ্করের স্মৃতিপথে অতীতের প্রহরগুলি হয়ে উঠেছে। অনেকটা 'ক্ষুধিত পাষাণে'র া লক্ষ্য করা যায়—চিত্ররূপে বর্ণালিম্পনে অতীত সের জীবন্ত আলেখ্য "বনমর্মরে" অঙ্কিত হয়েছে। প্রেতিনী" গল্পে অতি-পরিচিত পরিবেশের মাঝেই অতি-প্রাকৃত শিহরণ সঞ্চার করেছেন। রবীন্দ্র- "নিশীথে" গল্পের মনস্তত্ত্ব-কৌশলটি মনোজ বসু ভঙ্গীতে এখানে প্রয়োগ করেছেন। হরিচরণের ক পাপবোধই মৃতা প্রথমা পত্নীর রূপ ধরে তার আবির্ভূত হয়েছে। অতি-প্রাকৃত পরিবেশ রচনায় ও বিশেষ আয়োজন করতে হয় নি। হরিচরণ যে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রভাকে বলছে, প্রথমা পত্নী সরযূ— শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালবাসার ভাগ নে। ঠিক এমনি সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল— ডাঙায় এলাম মাঠাকরুণ—। কশাড় হোগলাবনের কিয়া হোগলার আগা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৌকা আসিয়া লাগিল। হরিচরণের মুখের হাসি া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে দিন ভালবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন কথাটা াশ কোনখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া া উঠিল। এ ঠিক সরযূরই কান্না, সুরের তীব্রতায় হস্রগুণ জোরে আসিয়া বুকে লাগিতেছে। বাতাস ছে। ঘাটের উপরে বাঁশঝাড়, নীরন্ধ্র অন্ধকার— সেখানে কটর-কটর-কট সে যে কি শব্দ উঠিতেছে, যেন কে সমস্ত চিবাইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে আর কি! সেই অন্ধকারে কিছু দূরে বাঁওড়ের কিনারায় হরিচরণ অকস্মাৎ যেন সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূকে সে কতকাল চোখে দেখে নাই, মন হইতে সে যেন মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল, তেমনি খুব ফরসা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা টকটক করিতেছে, পরনে লালপাড় শাড়ি, রঙ কাঁচা হলুদের ন্যায়—সে যে, তাহাতে কোন ভুল নাই।"

অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। শরদিন্দুর ভাষার এমন একটি জাদুকরী শক্তি আছে যা মুহূর্তেই বহু শতাব্দীর পারে আমাদের উত্তীর্ণ করে দেয়। রঙে রেখায় রোমাঞ্চকর পরিবেশ ও অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে শরদিন্দুর নৈপুণ্য বারবার স্বীকার্য। 'চুয়াচন্দন' গল্প-সংকলনটি এর প্রমাণ। ভারতে পর্তুগীজ আক্রমণ, ভাস্কো-ডা-গামার দস্যুতা, নির্মম হত্যা, নির্মমতর প্রতিহিংসা, আরব-সমুদ্রের শিহরণময় পরিবেশ—সব কিছু মিলিয়ে "রক্তমেঘ" গল্পে এমন একটি uncanny বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যা কোলরিজের 'অ্যান্‌সেণ্ট ম্যারিনার' কবিতার মধ্য-সমুদ্রের ভয়ঙ্কর পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৌদ্ধযুগ ও মুসলিমযুগের ভারতে শরদিন্দু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন জাদুকরের মোহ-দণ্ডটি হাতে নিয়ে। অতীত ইতিহাসে অতিপ্রাকৃত রস ও রোমান্স-সৃজনে শরদিন্দু দ্বিতীয়রহিত।

অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে অবশ্য-স্মর্তব্য আর একটি নাম 'বনফুল'। বনফুলের গল্পে বিধাতার সৃষ্টির প্রাচুর্য, জীবনের অজস্র সহস্রবিধ বৈচিত্র্য-সমারোহ। বলতে ইচ্ছে করে, 'Here is God's plenty'। তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত রসও একটি। 'লক্ষ্মীর আগমন' উপন্যাসে বনফুল অতিপ্রাকৃতকে উপস্থিত করেছেন জ্যোৎস্নারাত্রের মোহময় পরিবেশে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কয়েকটি মানব-চরিত্রের ই পর প্রতিক্রিয়ায়। অমর্ত্যলোকের রহস্যানুভূতির সার্থক শিল্প-রূপায়ণ বলে এই গ্রন্থকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বনফুলের গল্পেও এই শক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। "অধরা" ও "অবর্তমান" গল্প দুটি এর উদাহরণ। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে ক্রোশ দুই ভেঙে গেলে নির্জন

বালির চর পাওয়া যায়। সেখানেই সারাদিন গল্প-কথক চখা-শিকারের চেষ্টা করেছেন। দিনান্তে এল সন্ধ্যা, এল সচন্দ্র শর্বরী, চখা বার বার শিকারী-বক্তাকে প্রলুব্ধ করছে, কিছুতেই বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসছে না—কেবল তার 'কাঁআ' 'কাঁআ' ডাকটি শোনা যাচ্ছে। "অবর্তমান" গল্পটি জুড়ে এই রহস্যময় পরিবেশ বর্তমান ; এই পরিবেশই গল্পের মুখ্য চরিত্র। বনফুলের কবিত্বশক্তি ও রহস্যসৃজনক্ষমতার হরগৌরী মিলন হয়েছে উপরোক্ত উপন্যাসে ও এই গল্প দুটিতে।

অতিপ্রাকৃত রসের গল্প রচনায় অপর সার্থক শিল্পী প্রমথনাথ বিশী। সব্যসাচী প্রমথনাথের তুলিতে জীবনের নানা ছবি অঙ্কিত হয়েছে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যসৃষ্টি তার একটি। 'অশরীরী' গল্পসঙ্কলনে প্রমথনাথের এই ক্ষমতার পরিচায়ক আটটি গল্প আছে। সব কটি গল্পেই অতীন্দ্রিয় পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত সচেতনতা বিশ্লেষণবুদ্ধি ও সংস্কারমুক্তি সত্ত্বেও আধুনিক মানুষের উপরে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তার মনস্তত্ত্বসম্মত শিল্পোত্তীর্ণ পরিচয় গল্পগুলিতে পাই। মানুষের নির্জ্জন মনের অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস-প্রবণতার কাছে আধুনিক কালোচিত যুক্তি ও বুদ্ধি কি ভাবে পরাজিত হচ্ছে তার চমৎকার পরিচয় এখানে পাই। 'চাপাটি ও পদ্ম' সংকলনে সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত গল্প আছে। সেখানেও এই অশরীরী অনুভূতির পরিচয় পাই—নানাসাহেব-চরিত্র সম্পর্কে জনশ্রুতির ভিত্তিতে একটি শিহরণকারী পরিবেশ লেখক সৃষ্টি করেছেন।

॥ ৪ ॥

গল্পরাজ্যে বিধাতার সৃষ্টির প্রাচুর্য যাঁর লেখায় পাই, তিনি 'বনফুল'। আঙ্গিক-নৈপুণ্যে, নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মানবচরিত্রের মূল্যায়নে, তীক্ষ্ণ মননশীলতায়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনায়, উদ্ভাবনী কৌশলে বনফুল অদ্বিতীয়। ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদের যে ছুরি রয়েছে, তার নির্মম অথচ নিপুণ ব্যবহার হয়েছে মানবজীবনের বিশ্লেষণে। পরিচিত সংসারের পরিচিত মানুষের হীনতা-নীচতা তাঁর বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পড়েছে। বনফুলের সাহিত্যজীবনের হয় ব্যঙ্গকবিতায়—এ কথা মনে রাখতে হবে। 'শনি চিঠি'র পাতায় তাঁর কুণ্ঠাহীন আবির্ভাব। আজ আগমনের দুঃসাহসিকতা বর্তমান। কেবল অভি রসসৃজনে বা মানুষের নীচতা-হীনতার নির্মম বি নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-দৃষ্টির সার্থক প্রয়োগ বনফুলে লক্ষ্য করা যায়। লেখকের কৌতূহল যে কত ব্যা গভীর, সুদূরপ্রসারী ও সদা-অসন্তুষ্ট তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বনফুলের ক্ষমতা কেবল 'to open the soul of little and familiar things' নয়, সঙ্গে ব্যঙ্গের দর্পণে আমাদের কর্মাবলীর প্রতিফলনেও নিযুক্ত হয়েছে। বনফুলের গল্পগুলি উপভোগ্য ও আকর্ষক যে দু-একটিকে বেছে নিয়ে করা অসম্ভব।

একটিমাত্র গল্পের সংক্ষিপ্তসার এখানে দিচ্ছি। নাম "পরিবর্তন"। দাম্পত্য-জীবনের চরম ট্র্যাজেডির বর্ণনা এখানে পাই। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত স্বামী হরিমো স্ত্রী সরমার পতিসেবা ত্রুটিহীন। কিন্তু সেবাযত্ন হরিমোহন মৃত্যুর দিকে ধীর নিশ্চিত গতিতে চলেছে। সরমা যেদিন বুঝতে পারল হরিমো জীবনের আশা কম, সেদিন সরমার এক অদ্ভুত ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ে গেল। সরমা গো মোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ খেয়েছে। তার যুক্তি—যদি স্ব বাঁচেন, তবে তারই বা বেঁচে লাভ কি ? এর ফলে দুটো লাংস্‌ই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হল এবং তার মৃত্যু এদিকে হরিমোহন কিন্তু মরল না। ধনী হরি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে রোগমুক্ত হল। ফিরে সে আর একটি বিয়ে করল। অবশ্য পা সরমাকে সে ভুলে যায় নি—ততটা হৃদয়হীন হরি নয়। তাই বেছে বেছে সরমা নামধেয়া একটি মে সে বিবাহ করেছে।

পতিব্রতার জীবনদানের কী পুরস্কার!

এই সংক্ষিপ্তসার থেকেই বনফুলের মানবজীবন ও জীবন-দর্শনের পরিচয় পাই।

এ কালের বাংলা গল্পে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পী 'বনফুল' সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী বলে মনে করতে হয় যাঁদের

-'প্রবাসী'-'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার লেখকবর্গ—
পাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর
থ বিশী, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত
নাথ মৈত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলা
খাপাধ্যায়।

খোপাধ্যায়ের "নরকের কীট", "শিরাজীর
নাথ মৈত্রের "হরিকুমারের বাণী", "চটক
ন সমাদ্দার" ('ত্রিলোচন কবিরাজ' ও
ভুর্ক্ত), পরিমল গোস্বামীর "মারকে লেঙ্গে",
, "অভিনন্দন", প্রমথ বিশীর 'ধনেপাতা'
কান্ত দাসের 'কলিকাল' সংকলন, ভবানী
যথাপূর্বং' সংকলন উল্লেখযোগ্য।

সু ওরফে 'পরশুরাম' স্বতন্ত্র লেখক, নিজেই
বং তাঁর গল্পগুলি অনন্যসাধারণ 'হিউমর'-
ন্ত, তা আমাদের আলোচনার বাইরে।

॥ ৫ ॥

র লেখকদের গল্পের অন্যতম আকর্ষণ
আলেখ্য। বস্তুতঃ এইখানে সদ্য-অতীত
যোগসূত্রটি রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ,
রৎচন্দ্র, কেদারনাথ, উপেন্দ্রনাথ বাঙালীর
গল্পরসে পরিণত করেছিলেন। তারপর
লেখকরা ইয়োরোপকে এবং নীচুতলার
রিচিত জনজীবনের প্রতিনিধিকে গল্পের
দিলেন, তাঁদের কাছে ঘরের মানুষ
। সেই উপেক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর
আলেখ্য অঙ্কন করলেন আলোচ্যমান
ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল সমাজচেতনা
র আলোকে মধ্যবিত্তের নীচতা-হীনতা
নিষ্ঠুর ছবি আঁকলেন। আর বিভূতি
বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার
নাজ বসু, অমলা দেবী, পাঁচুগোপাল
তা দেবী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়,
ত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপদ
জেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, সীতা
বী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ লেখকরা
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের ছোট সুখ ছোট ব্যথার শিল্পরূপ
দিলেন। দাম্পত্য রস ও বাৎসল্য রসের রূপকার
হিসেবে দেখা দিলেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি
মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,
মনোজ বসু ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালীর পারিবারিক জীবনের
স্নেহমধুর সহানুভূতিশীল আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।
"উমারাণী," "উপেক্ষিতা", "মৌরীফুল", "কিন্নরদল" গল্প-
গুলি এক্ষেত্রে উদাহরণ-স্বরূপ উপস্থিত করা চলে। বিভূতি
মুখোপাধ্যায় শিশুমনের কল্পনা-বিহার ও বাৎসল্য রসের
চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। "রাণুর প্রথম ভাগ", "বাদল",
"স্বয়ংবরা", "দাঁতের আলো" প্রভৃতি গল্প এর পরিচয়স্থল।
আবার "মেঘদূত", "বিপন্ন", "বসন্তে" গল্প দাম্পত্যরসের
ছবি। মনোজ বসু দাম্পত্যরসের আলেখ্যকাররূপে একদা
খ্যাতি লাভ করেছিলেন। "রাত্রির রোমান্স", "ফার্স্ট বুক
ও চিত্রাঙ্গদা" এর প্রমাণ। আবার প্রেমের মধুর রোমান্সও
তাঁর গল্পে লক্ষ্য করা যায়—যেমন, "পোস্টমাস্টার" ও
"স্বয়ম্বরা"; "শান্তি" গল্পটি প্রেমের রোমান্স ও বাৎসল্যের
স্নেহ—দুয়েরই পরিচয়স্থল। দাম্পত্যরসের গল্প সজনীকান্ত
দাসের 'কলিকাল' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে
"এক আনার ডাক-টিকিট" ও "পান্নালাল" অবশ্য-উল্লেখ্য।
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভল্লু সর্দার", ভবানী
মুখোপাধ্যায়ের "বাতায়ন" শিশু-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ।

এই সকল গল্পে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন-
বিকার বা যৌনাবেগের আকস্মিক প্রকাশ অবিষ্কার করা
হয় নি; গল্পের পরিকল্পনা খুব অভিনব বা চমকপ্রদ
নয়; ঘটনার আকস্মিকতাও অনুপস্থিত। তথাপি শিল্প-
কর্মরূপে এগুলির সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য। এর থেকে
এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম সমরোত্তর কালের বাংলা
গল্পে কেবল লালসার অসংযম বা দারিদ্র্যের আস্ফালনই
বড় কথা নয়, আমাদের পরিচিত গার্হস্থ্যজীবনের মাঝেও
যে শান্তির উৎস আছে তা সহানুভূতিশীল গল্পকারের
দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

॥ ৬ ॥

আলোচ্যমান গোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য গল্পে লক্ষ্য
করা যায়—তা হল গল্পে ইয়োরোপের উপস্থিতি।

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা সচেতনভাবে ইয়োরোপকে বাংলা কথা-সাহিত্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর পর এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব তাঁদেরই। স্কাণ্ডিনেভীয়, রুশ ও ইংরেজী গল্পের মধ্যে যৌবনের উল্লাস ও অ্যাডভেঞ্চারের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তা-ই বিশেষ করে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ইয়োরোপের মননপ্রধান ধ্যানের দিকটি, রোমান্টিক ভাবমুখ্য যৌবনের ছবিটি ধরা পড়ল আলোচ্যমান কয়েক-জন লেখকের গল্পে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মণীন্দ্রলাল বসু ও অন্নদাশংকর রায়।

বাংলা গল্পে ইয়োরোপ প্রথম এল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থে। তারপর 'বীরবল'। প্রমথ চৌধুরী ইয়োরোপের পটভূমিতে বাঙালী তরুণের প্রেমাভিজ্ঞতা ও তার শোচনীয় ব্যঙ্গপ্রধান পরিণতি দেখিয়েছেন। তথাপি ইয়োরোপের তারুণ্য বাঙালী তরুণকে কি ভাবে প্রভাবিত করে, তার সুন্দর পরিচয় এখানে পাই। আর মণীন্দ্রলাল বসু ইয়োরোপকে রোমান্টিক অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখেছেন, ইয়োরোপের শিল্প-সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, তিনি তার ভক্ত। এই ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয়স্থল 'পদ্মরাগ'।

অন্নদাশংকর রায়ের গল্পে ইয়োরোপের যৌবন ভাবমূর্তিতে নয়, বাস্তবমূর্তিতে ও মননে ধরা দিল। 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণকথায় অন্নদাশংকর মন্তব্য করেছিলেন, "ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভারকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মত ছোট করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।" 'আগুন নিয়ে খেলা' এই অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ইয়োরোপের রিক্ত-হৃতশ্বাস জীবনে প্রণয় কত ক্ষণস্থায়ী ও চটুল, তারই করুণ-মধুর আলেখ্য এটি।

অবশ্য ইদানীংকালে সৈয়দ মুজতবা আলী, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, রঞ্জন ইয়োরোপের পটভূমিতে উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করেছেন, সে কথা বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত নয়।

॥ ৭ ॥

শেষ যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার ছেদ টানছি, তা হল প্রকৃতি-রস। বাস্তব-চিত্রণের অত্যুৎসাহে বা মানবজীবনে অর্থনীতির প্রভাব নির্ণয়ে আলোচ্যমান লেখকরা সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি, এজন্য এঁদের গল্পে প্রকৃতি উপেক্ষিত নয়। শহরকে নিয়ে গল্পরচনায় এঁরা সার্থকতা অন্বেষণ করেন নি বলেই প্রকৃতির অবগুণ্ঠন এঁদের গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। নাগরিক-জীবন ও কারখানা-জীবন—এই দুয়ের পটভূমিতে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা গল্প রচনা করেছিলেন। আলোচ্যমান গল্পকারবৃন্দ গ্রামজীবনের পটভূমিতে গল্প রচনা করেছেন। প্রকৃতিকে জীবন্ত চরিত্ররূপে এঁদের গল্পে উপস্থিত হতে দেখা গেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইছামতী-নদীতীরবর্তী অরণ্য ও গ্রাম এঁর গল্পে আশ্চর্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম কাব্যসুরভিময় অনুভূতি তাঁর গল্পে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে আছে। প্রকৃতি-প্রেম বিভূতিভূষণের কাছে সাহিত্য-বিশ্বাস মাত্র নয়, তা গভীর প্রত্যয়-জাত। 'মেঘমল্লার' ও 'মৌরীফুল' সঙ্কলনের সকল গল্পেই এর পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্পে রাঢ়-বঙ্গের—বিশেষ করে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের গৈরিক প্রকৃতির দেখা পাই। আবার মনোজ বসুর গল্পে দক্ষিণ-বঙ্গের বিল-জঙ্গল-বেষ্টিত প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গল্পে বিহার-উত্তরপ্রদেশের গ্রাম ও শহরের সুন্দর ছবি দেখি। আবার প্রমথনাথ বিশীর গল্পে উত্তরবঙ্গের রাজসাহী অঞ্চলের পদ্মালালিত ভূমির বর্ণনা পাই।

তারাশংকরের "ডাইনী" ও "বেদেনী" গল্পে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুঁইমাচা" ও "তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্পে", মনোজ বসুর "ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা" ও "বনমর্মর" গল্পে গ্রাম-প্রকৃতি জীবন্ত চরিত্ররূপে উপস্থিত হয়েছে। এই সব গল্পে প্রকৃতি গল্প-সংলগ্ন ফ্রেম না হয়ে গল্পের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, নায়ক-নায়িকার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, গল্পের ঘটনাকে বেগ ও পরিণতিকে ব্যঞ্জনা দান করেছে। গ্রাম-বাংলার মোহিনী প্রকৃতি ও প্রকৃতি-সংলগ্ন মানুষগুলি এঁদের সাহিত্যসাধনার প্রেরণাস্থল। তাই গ্রাম-প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়েই এঁরা সাহিত্যসাধনার রহস্যটিকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। সম্প্রতিকালের বাংলা গল্প থেকে প্রকৃতি প্রায় নির্বাসিত বলেই হয়তো এই প্রকৃতিনির্ভর গল্পগুলি এত বেশী করে পাঠকের মনকে টানে।
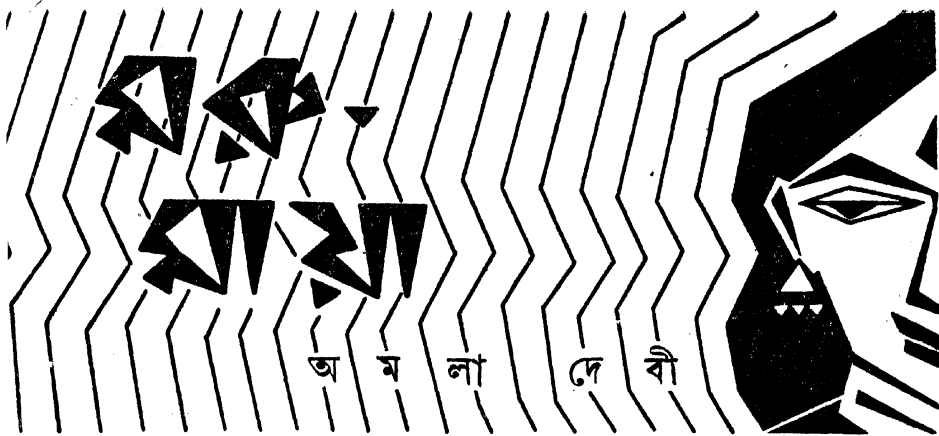
৯

কয়েক কেটে গেল। এর মধ্যে রাখালবাবুর চেষ্টায় বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। রাখালবাবু ও বিশ্ব-সঙ্গে রাধাকে শহরে যেতে হয়েছিল বাড়ি বিক্রির সই করার জন্যে। রাখালবাবু দেনা শোধের ব্যবস্থা ন। বাকী টাকা ব্যাঙ্কে বিশ্বনাথের নামে জমা।

ꣻদিন সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ এসে বলল, ডাক্তার দাসের ক্তার আদিত্য রায়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। আমাদের যেতে লিখেছেন। কাল যাওয়া যাবে।

রর দিন বিশ্বনাথের মোটরে ওরা গেল। সামনের দিয়ে আগে শহরে যেতে হল। শহর পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। সেই রাস্তা ধরে প্রায় পঞ্চাশ গিয়ে গ্রামে পৌঁছল। বড় গ্রাম। গ্রামের মধ্যে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। অনেকটা জায়গা াড়ির হাতা। চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একটা ফটক। দরজা নেই। ওরা দুজনে গাড়ি নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কতকটা গিয়ে একটা। বাড়ি। সামনে বারান্দা। অনেক লোকের বাড়িটার গায়ে একটা কাষ্ঠ-ফলকে লেখা রয়েছে—নী দাতব্য ঔষধালয়'। বিশ্বনাথ রাধাকে বলল, দাসের মায়ের নামে এই দাতব্য ঔষধালয়। ওঁর মাকে আপনি দেখেছিলেন?—রাধা বলল, খুব ছেলে-বেলায় দেখেছিলাম। ভাল মনে নেই।

খবর দিতেই ডাক্তারবাবু এলেন। লম্বা, দোহারা গঠন, শ্যামবর্ণ। বয়স চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি। মুখ দেখলেই মনে হয়, সদাশয় প্রকৃতির মানুষ। মাথার চুল পাতলা, সামনেটায় টাকের আক্রমণ শুরু হয়েছে। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে। পায়ে সাধারণ জুতো। এদের দেখেই দূর থেকে মুখে আপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কাছে এসেই নমস্কার করে বিশ্বনাথকে বললেন, আপনিই বিশ্বনাথবাবু তো?

বিশ্বনাথ ও রাধা নমস্কার করল। বিশ্বনাথ বলল, আপনার চিঠি কাল পেয়েছি। ইনি খুবই ব্যস্ত হয়েছেন, তাড়াতাড়ি চলে আসতে চান।

আদিত্যবাবু বললেন, চাকরির ব্যবস্থা তো হয়েই গেছে। উনি পরের মাস থেকে কাজে যোগ দিতে পারেন। এ মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর সাত-আটদিন বাকী। এর মধ্যে যে কোন দিন চলে আসবেন।

বিশ্বনাথ বলল, থাকবার ব্যবস্থা?

আদিত্যবাবু বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। বসবেন চলুন। আমি সব বলছি।

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমলঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঁঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দ্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দ্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দ্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর
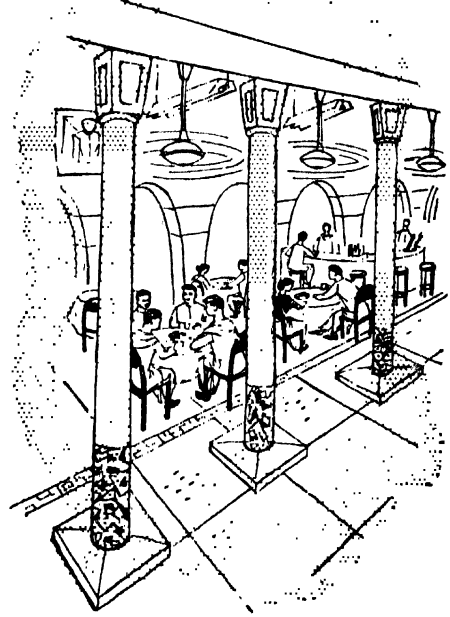
বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম
রা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও
নক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

তাদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা
টা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।
ল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল।
জায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে
ড়েন।

নয়: কি ব্যাপার?

তাদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে!
ত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।

মল: বলুনই না কি করলে?
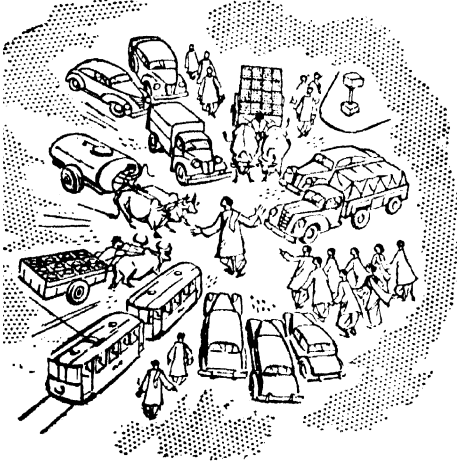
তোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী যেই 'ডালডার'
ন হাতাটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি
াক ঠকাবার জায়গা পাওনি? 'ডালডা' তো পাওয়া
য় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ
ামায়?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো
াই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে
নিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও
লা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

নয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা?

তোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে
লাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা।
মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো
আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে।
বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু।
কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি
বসে" বলে গট্‌গট্ করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি)
বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার
হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করছেন
ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা
কি ডায়েট—হাঃ হাঃ

ভুতোদা: হাসির কি হোল?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা'
কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে):
তবে মধুপুরে আমরা কি খাই? বিনয়: ভদ্রলোক যা
বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা
অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস? বিমল:
আপনি এই রেষ্টুরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করুন।
বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁ, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই
তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা
বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার
মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন
"খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিসফায়ার
হয়ে গেল।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

বাড়িটার পিছন দিকে নিয়ে গেলেন তাদের। পিছনে যেতেই সামনে বেশ খানিকটা জুড়ে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটা চোখে পড়ল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, এটাই তো আসল বাড়ি? এ বাড়িটায় কী হত?

আদিত্যবাবু বললেন, যতদূর শুনেছি, এটা কাছারি বাড়ি ছিল। বেশ বড় জমিদার ছিলেন তো। অনেক কর্মচারী সেরেস্তায় কাজ করত। এখানেই থাকত সব। হাত বাড়িয়ে একটু দূরে একসারি ছোট ছোট ঘর দেখিয়ে বললেন, ওখানটায় রান্না হত আর চাকর-বামুনরা থাকত। এখন আফিসটাতে হয়েছে দাতব্য ঔষধালয়। ম্যানেজারবাবুর জায়গায় আমি থাকি, আর কেরানী-বাবুদের জায়গায় কম্পাউণ্ডারবাবুরা থাকেন। ওই ঘরগুলোতে আগেও যা হত, এখনও তাই হচ্ছে।

বিশ্বনাথ বলল, দোতলা বাড়িটায় কি স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছে?

আদিত্যবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। দোতলায় হাই-স্কুল, নীচের তলায় ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্কুল। পাশের একতলা বাড়িটায় খানকয়েক ঘর আছে। ওখানে মেয়ে-স্কুলের কয়েকজন থাকেন। শিক্ষয়িত্রী এঁরও সম্প্রতি ওখানেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিশ্বনাথ বলল, উনি তো একা নন। ওঁর সঙ্গে আরও দুজন আত্মীয় আছেন।

আদিত্যবাবু বললেন, তাই নাকি? কই, অচিন্ত্য আমায় তা তো লেখে নি!—একটু ভেবে বললেন, আত্মীয়দের বয়স কত?

বিশ্বনাথ বলল, একজন প্রায় আপনার বয়সী, আর একটি আট-ন বছরের ছেলে।

আদিত্যবাবু বললেন, তা হোক। ওতে অসুবিধা হবে না। সাময়িক ব্যবস্থা তো—এক রকম করে চলে যাবে।

নিজের বসবার ঘরে বসালেন তাদের। মাঝারি গোছের ঘর। একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার ও বেঞ্চি রয়েছে। টেবিলের উপরে লেখার সাজ-সরঞ্জাম। একপাশে একটা বড় আলমারি—ডাক্তারী বইয়ে ভর্তি। একটা তেপায়ার উপরে অনেকগুলো ডাক্তারী মাসিকপত্র। জানলার সামনে একটা ঈজিচেয়ার।

বিশ্বনাথ ও রাধা চেয়ারে বসল। আদিত্যবাবু বললেন, আপনারা কি স্নানাহার করে বেরিয়েছেন?

বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁ, আমরা সব সেরে বেরিয়েছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আদিত্যবাবু বললেন, তা হোক, এতদূর এসেছেন, একটু মুখ-হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। তারপর কী ব্যবস্থা হয়েছে আমি জানাচ্ছি।—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বনাথ রাধাকে বলল, বেশ ভাল লোক। এঁর কাছে আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবেন।

হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা হল অবিলম্বে। ওরা হাতমুখ ধুয়ে এসে বসতে না বসতে চাকরের হাতে এল খাবার। খাওয়ার পর আদিত্যবাবু বিশ্বনাথকে বললেন, চা খান তো?

বিশ্বনাথ বলল, আমি খাই, উনি খান না।

বিশ্বনাথের চা এল। আদিত্যবাবু এবার টেবিলের ওপাশে গিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, ওঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে অচিন্ত্যদের নিজের বাড়িতে। বাড়িটা খুব বড় নয়—তিন-চারখানা ঘর। পুরনো হয়েছে, ভেঙে-চুরে গেছে। অচিন্ত্যরা তো বহুদিন দেশ-ছাড়া। বহুদিন দেখাশোনা হয় নি। তবে মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাসখানেকের মধ্যে বাসের যোগ্য হয়ে উঠবে।

একটু চুপ করে থেকে আদিত্যবাবু বললেন, ওই বাড়িটা অচিন্ত্য রীতিমত আইনসঙ্গত ভাবে এঁকে দান করে দিয়েছে। আর লিখেছে:—ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন—আমার নিজের বোনের চেয়েও বেশী। আমি এখানে থাকলে সানন্দে ওর সমস্ত ভার বহন করতাম। কিন্তু আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তুমি আমার নিজের ভাইয়ের মত। তোমার হাতেই ওর ভার দিয়ে গেলাম। ওকে তুমি নিজের বোনের মতই কাছে টেনে নিয়ো। যতদিন বাঁচবে কাছে কাছে রেখ। ওর কোন অসুবিধা, কোন কষ্ট না হয় লক্ষ্য রেখ। বিদেশে গিয়েও নানা চিন্তার মধ্যে ওর চিন্তাও আমার অবশ্য-কর্তব্য হয়ে থাকবে।

রাধা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনছিল। তার কানের মধ্যে মনের মধ্যে অমৃতসিঞ্চন হচ্ছিল।

একটা কথা মনে পড়ল রাধার।…

। রান্না করছেন। অচিন্ত্যদা কাছে বসে গল্প

। বললেন, হ্যাঁ বাবা অচিন্ত্য, জামাইবাবুর তো
ক কিছু খেয়াল নেই। রাধার বিয়ের কী হবে?
কম হল না।
্যদা বললেন, কত বয়স হল ওর?
। বললেন, ষোলয় পা দিয়েছে বোধ হয়।
ই সে দাঁড়িয়ে ছিল। হাসি-হাসি মুখে তার
কয়ে অচিন্ত্যদা বললেন, ষোলয় পা দিয়েছে!
মনে হয় না!
। ক্ষোভের স্বরে বললেন, ওই রকমই ওর গড়ন।
হ আর মাথায় বাড়ছে, গায়ে মাংস নেই।
াল?—বলেই মাসীমা কী কাজে উঠে গেলেন।
দিকে তাকিয়ে অচিন্ত্যদা ধমকের সুরে বললেন,
নেই কেন? ওপর দিকে না বেড়ে পাশে
ার না? হাতির মত দেখতে হবে, তবে তো
হবে। বরের দল ভিড় করে দাঁড়াবে কাছে এসে।
ল, আমি তো ভিড় চাই না।
না?—বলে অচিন্ত্যদা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন
দিকে।
চোখ মিলতেই বুকের ভিতরে তার কাঁপন
দার করে কণ্ঠস্বর স্থির রেখে সে বলল, না।
ও?
নে, যান।

*   *

্যবাবু রাধাকে বললেন, আমি আপনার দাদার
ার কাছে কোন লজ্জা সঙ্কোচ করবেন না।
ল আসুন এখানে যত শীগগির পারেন। আমি
চ থাকব, আপনার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হতে

নানা গল্প হল। আদিত্যবাবু নিজের
া-ইতিহাস বলতে লাগলেন। পূর্ববঙ্গে বাড়ি।
পড়তেন। সেই সময় অচিন্ত্যর সঙ্গে আলাপ
মেডিকেল কলেজে একই ক্লাসের ছাত্র ছিলেন
একই হোস্টেলে একই ঘরে সাত-আট বছর
ন। পাস করে দুজনেই মেডিকেল কলেজে
হাউস-সার্জেন হয়েছিলেন। বরাবর কংগ্রেসের সঙ্গে
যোগাযোগ ছিল তাঁর। মহাত্মার 'লবণ আন্দোলনে'র
সময় স্কুলে পড়তেন। তখনই মাস ছয় জেলে ছিলেন।
১৯৪২-এর আন্দোলনেও যোগ দিলেন। এক বছরের জন্য
জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের শহরে গিয়ে
প্র্যাকটিশ শুরু করলেন। প্র্যাকটিশ জমে উঠল খুব অল্প
দিনের মধ্যেই। মাসিক আয় হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেল।
বঙ্গবিভাগের পরও অনেক দিন কাটিয়েছিলেন সেখানে।
তারপর আর থাকা গেল না। অচিন্ত্য বিলেত চলে
গেল। বছর পাঁচ পরে ফিরে এল মেমসাহেব বিয়ে
করে। কলকাতায় মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হল।
তখন থেকে আবার ওঁদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ—যা
নানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে
স্থাপিত হল। দেশে মুসলমানদের অত্যাচার ক্রমে বাড়তে
লাগল। হিন্দুদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের দেশ থেকে
তাড়াবার নিত্য নতুন উপায় বেরোতে লাগল। তিনি
চলে আসবার সঙ্কল্প করলেন।

তিনি আসবার পর একে একে এই প্রতিষ্ঠানগুলির
স্থাপনা হল। অচিন্ত্য তার উপার্জনের অর্ধেকের উপর
এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খরচ করেছে। যাবার আগেও
সে এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অনেক টাকা ব্যাঙ্কে রেখে
গেছে।

বিশ্বনাথ রাধা দুজনেই বলে উঠল, উনি কি চলে
গেছেন?

আদিত্যবাবু বললেন, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি যেতে
হল। ওর মেয়ের অসুখের খবর পেয়েছিল। আমাকে
খবর দিয়েছিল। আমি গিয়ে দেখা করে এলাম। যাবার
আগে মেয়েটির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

চোখে জল এল রাধার। এত স্নেহ করতেন অথচ কাছে
থাকলে বোঝা যেত না। প্রায় এক বছর তো কাছে কাছে
ছিল। স্নেহ করতেন বুঝতে পারত, কিন্তু স্নেহ এত শান্ত
এত স্নিগ্ধ ছিল যে তাঁর স্পর্শমাত্র তার অন্তর পরিতৃপ্ত
হয়ে উঠত। স্নেহের বিস্তার ও গভীরতা সম্বন্ধে খোঁজ
করবার কথা মনে থাকত না।

আদিত্যবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্বনাথ ও
রাধা চলে এল।

১০

পরদিন। রবিবার—বেলা নটা। রাধা গৌরদাসের ওখানে গেল। গিয়ে দেখল, গৌরদাসের স্নানাহ্নিক হয়ে গেছে। রান্না করছে। ভাত হচ্ছে আর গৌরদাস একখানা বই চোখের কাছে এনে পড়বার চেষ্টা করছে। রাধার পায়ের শব্দে মুখ তুলে বলল, খোকা এসেছিস? কোথায় গিয়েছিলি?

রাধা বলল, কী পড়া হচ্ছে?

গৌর বলল, ও, আপনি! কী আর পড়ব বলুন! খোকা একটা বই এনেছে কার কাছ থেকে চেয়ে। পড়ব পড়ব বলে অস্থির করে দিয়েছে।

রাধা জিজ্ঞেস করল, সকালে কিছু খেয়েছে?

গৌরদাস বলল, রাত্রে যে খাবার আসে তার কিছুটা থাকে—তাই-ই সকালে খায়।—একটু হেসে বলল, আগে সারাদিন মুড়ি খেত। আজকাল দিনের বেলায় ভাত, রাত্রে লুচি-সন্দেশ। মেজাজটা বিগড়ে গেছে খোকার।

মুচকি হেসে রাধা বলল, কী করছে?

গৌরদাস বলল, বাড়িতে থাকতেই চায় না। কোন কাজ করতে চায় না। বলে মায়ের সঙ্গে গেলে তো এ সব কিছু করতে হবে না। স্কুলে পড়তে যাব, স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে যাব। গাঁয়ের ছেলেরা স্কুলে পড়তে যায়, ও তাদের পিছু পিছু যায়, স্কুলের কাছে ঘোরাঘুরি করে। ফিরে আসে দুপুর পার করে। আবার বিকেলে বেরোয়। গাঁয়ের ছেলেরা খেলা করে, তাদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করে। ওরা আমল দেয় না। ভিখিরীর ছেলে—বাপ-বেটা দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে দেখেছে তো! নতুন প্যাণ্ট-গেঞ্জি পরলে কী হবে?

চুপ করে ভাবছিল রাধা।

ভিখিরী কে করেছে? সে, না, ভগবান করেছেন? বন্যা হল। ধান হল না। ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে গেল, খোকার অসুখ হল। চলে গেল তার মার কোল ছেড়ে। সে কী করবে? যা করবার ভগবান করেছেন। যে রাধামাধবের ও আজীবন পুজো করেছে তিনিই পথে বসিয়েছেন ওকে। সে যদি ওর কাছেই থাকত বরাবর, চন্দ্রার খোকা হয়তো তারই কোলে আসত। সে হয়তো চন্দ্রার মত রোগে ভুগে একদিন মরে যেত।

রাধা বলল, দিনের বেলাতেও চোখে ভাল দেখতে পাও না?

সাদা সাদা চোখের মণি দুটো তার মুখের দিকে তুলে ম্লান হেসে গৌরদাস বলল, না, খুব ঝাপসা দেখি। এই যে আপনি—

রাধা ধমক দিল, আবার আপনি।

গৌরদাস বলে উঠল, না না—তুমি। এই যে তুমি বসে আছ, বুঝতে পারছি কেউ রয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

রাধা বলল, রান্না কর কী করে?

গৌরদাস বলল, অভ্যেস হয়ে গেছে যে।

রাধা বলল, আগে কখনও রান্না করেছিলে?

গৌরদাস বলল, বিয়ের আগে করতাম। বিয়ের পর রাধাই করত। চমৎকার হাতের রান্না ছিল।—একটু চুপ করে থেকে বলল, শহরে মানুষ। পড়ে গেল পাড়াগাঁয়ে বৈরেগীর হাতে। অনেক কষ্ট পেল। মুখ ফুটে কিছু বলত না কোনদিন। খোকা এল কোলে। চলেও গেল একদিন। সেদিন থেকে তার মুখে নামল শ্রাবণের মেঘ, চোখে নামল জল। সে জল শুকোতে দেখি নি।—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, দুর্ভাগিনী, অনেক কষ্ট পেয়ে গেল।—একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার ভায়রাভাই রতন যে কোথায় তাকে নিয়ে গেল, জানে! অনেকদিন পরে কে লিখেছিল যেন রাধা রতন দুজনই মরে গেছে।

রাধা বলল, তারপরই বুঝি তুমি চন্দ্রাকে বিয়ে করে ফেললে?—কণ্ঠস্বরে শ্লেষের সুর বাজল।

গৌর বলল, না, তখন করি নি। চন্দ্রা ছিল রাধার বোন। ছেলেবেলা থেকে দুজন দুজনকে জানতাম। বিয়ের কথাও হয়েছিল দুজনের, হয় নি। ওর মায়ের আপত্তি ছিল। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল না। চন্দ্রাকে নিজের বোনের মত দেখতাম। ওকে স্ত্রী বলে নিতে মন রাজী ছিল না। ওর বিয়ে হল রতনের সঙ্গে। রাধা, রতন চলে যাবার পরে চন্দ্রাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হল।

রাধা বলল, তারপরই বুঝি মন রাজী হল?

গৌরদাস ম্লান হেসে বলল, না রাজী হয়ে উপায় ছিল না।

খোকার ডাক শোনা গেল। বাবার কাছে ছুটে আসতে আসতে রাধাকে দেখতে পেয়ে একমুখ হেসে বলে উঠল, মা এসেছেন!—কাছে এসে কোল ঘেঁষে বসে পড়ল। বলল, কখন এলেন মা?

রাধা বলল, কোথায় গিয়েছিলে? তোমার বাবা খুঁজছিলেন তোমাকে।

খোকা বলল, জান বাবা, গাঁয়ের ছেলেরা খেলতে দিল আজ। আমি বুঝিয়ে বললাম, আমরা আর ভিক্ষে করি না। আমার এক মাসীমা আছেন খুব বড়লোক, আমাদের ভিক্ষে করতে দেবেন না বলেছেন।

সস্নেহে খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে রাধা বলল, পাগল ছেলে।

খুব কাজ হয়েছে। ওদের যে মোড়ল, সে বলল—আমাকে দেখাবি তোর মাসীকে?

বললাম, দেখাব। আমার মাসীমা খুব সুন্দর। মা দুর্গার মত দেখতে, খুব ভাল বাড়ি আছে।—খোকা মাথা নেড়ে নেড়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল।

রাধা বলল, আমার ভাল বাড়ি আছে জানলে কী করে?

খোকা বলল, আমি একদিন গিয়েছিলাম ওদিকে। আপনি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখলাম—

রাধা বলল, তুমি ভেতরে গেলে না কেন?

খোকা চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, হ্যাঁ মা, কবে আমরা এখান থেকে যাব? ওই বাড়িটাতে থাকব তো?

রাধা বলল, না বাবা। ও বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে।

মনটা দমে গেল খোকার। বলল, তবে যে বললাম ওদের ওই বাড়িটা আমাদের হবে—

রাধা বলল, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো এখানে থাকব না। অন্য জায়গায় যাব। সেখানে আমাদের বাড়ি আছে, অনেক ছেলেমেয়ে আছে—তাদের সঙ্গে পড়বে, খেলবে।

খোকা সাগ্রহে বলল, কবে যাব আমরা?

রাধা বলল, দু-তিন দিন পরে।

খোকা বলল, ওই যে ডাক্তারবাবু আছেন না—ওঁর ছেলে পড়তে যায় রোজ। সুন্দর দেখতে।

রাধা বলল, তোমার চেয়ে সুন্দর?

খোকা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, খু-উ-ব সুন্দর। এমন চমৎকার জামা পরে! কত রকম আঁকা আছে—গাছ মাছ—কত রকম জিনিস! পায়ে জুতো পরে—চকচকে কালো জুতো। খুব ভাল লেখাপড়া করে নাকি স্কুলে! বলছিল, ও ওর বাবার মত ডাক্তার হবে, জানেন মা?—হ্যাঁ মা, আমিও ডাক্তার হতে পারব তো?

রাধা বলল, পারবে বইকি বাবা। খুব বড় ডাক্তার হবে।—মনে মনে বলল, অচিন্ত্যদার মত।

গৌরদাস বসে বসে শুনছিল। বলল, আমার বিশ্বাস হয় না। কোথাও একটি চিরদিনের মত আশ্রয় পাব, খোকা বড় হবে, লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবে—বিশ্বাস হয় না।

রাধা বলল, রাধামাধবকে বল দুঃখের সমুদ্রে আর কত দিন ভাসাবে! আশ্রয় দাও। দুদিন সুখের মুখ যেন দেখে যেতে পারি।

গৌরদাস বলল, সুখের মধ্যে তো তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই যাদের ভালবাসেন, তাদের দুঃখ দেন। দুঃখের মধ্যেই তাদের ধরা দেন। যতদিন ঘরে ছিলাম, ক আচার-বিচার করে কত আরাধনা করে ওঁর পুজো করেছি। কোনদিন ওঁকে বুকের মধ্যে পাই নি। পথে নেমে দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তে ওঁকে বুকের মধ্যে পেয়েছি। যে কোন অবস্থায় চোখ বুজলেই আমার মনের পটে ফুটে ওঠে রাধামাধবের যুগল মূর্তি। ঘরে গেলে হয়তো আবার হারিয়ে যাবে। তাই পথ ছেড়ে ঘরে যেতে ইচ্ছে হয় না আমার।

শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল রাধা, সে কি! আমার সঙ্গে যাবে না?

গৌরদাস বলল, যাব—খোকার জন্যে। ওকে তোমার কোলে বেশ করে বসিয়ে দিয়ে আবার চলে যাব।

রাধা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

গৌরদাস হেসে বলল, আমার মাধবের কাছে—কদমতলায়। যেখানে অবিরাম বাঁশী বাজিয়ে তিনি আমায় ডাকছেন।

লল, ও সব বুদ্ধি ছাড়। মাধব ঘরেও থাকেন। ডাকতে পারলে ঘরেই ধরা দেন। খোকাকে তে হবে এটা মনে রেখ। এটা তোমারই আমি সাহায্য করব মাত্র। যদি কোথাও চলে দায়িত্ব নেব না।—কলহের সুর বাজল রাধার

দাস ভাবল, ঠিক রাধার মত সুর। রাধাই দুই বন্ধু একই ছাঁচে ঢালা! একই রকম দেখতে ভাবতেই চোখে জল এল গৌরদাসের। রাধাকে র কাউকে ভালবাসে নি সে। ভালবাসতে না। তার অন্তরের মধ্যে বসে আছে রাধা। কোন আবিলতা তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে, পারবে না।

। উথলে পড়ল হাঁড়ি থেকে। রাধা খোকাকে ছাড়, বাবা, হাঁড়িতে একটু জল ঢেলে দিয়ে

ড়তে জল ঢেলে খুন্তি দিয়ে দুটো ভাত দখল সেদ্ধ হয়ে গেছে। ফেন গেলে ভাত নামিয়ে পাতায় ঢালল। আর একটা পাতা দিয়ে ভাতটা দিয়ে বলল, তরকারি রান্না করতে হবে না। রি এনেছি আমি।

কা বলল, কই মা?

কপাশে একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে তরকারি ছিল। দখাল।

ফিন-ক্যারিয়ারের পাশে আর একটি থলের দিকে ড়ল খোকার। বলে উঠল, ওটা কি মা?

ধা থলেটার মুখ খুলে দেখাল—কয়েকটা লেবু, দুটো ল রয়েছে। বলল, তোমার বাবার কাল একাদশী, নিয়ে এসেছি।—থলের ভিতর থেকে আর একটা বার করে খোকার সামনে ধরতেই খোকা বলে বিজলী আলো! দেখেছিলাম জমিদারবাবুর ত। ওঁর ছেলে জ্বালাচ্ছিল। ওটা কার মা?

াধা বলল, তোমার।

ানন্দে খোকা চিৎকার করে উঠল, বাবা, মা বিজলী এনেছেন আমার জন্যে।

গৌরদাস বলল, সে কী জিনিস?

খোকা বলল, ওই যে—টিপলেই আলো জ্বলে।

রাধা বলল, টর্চ বলে ওকে। খোকার জন্যে নিয়ে এলাম। সাপ-খোপ বেরোয় বলছিল—

খোকাকে বলল, অন্ধকারে আর বিনা আলোতে যেয়ো না।

ফেরবার আগে রাধা গৌরদাসকে বলল, ও-বেলা খাবার পাঠিয়ে দেব। কাল তোমার একাদশী। সকালে এসে রান্না করে দিয়ে যাব। আর একটা কথা, পরশু এখান থেকে চলে যাব। মনকে প্রস্তুত করে রেখ।

১১

সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথ এল। জিজ্ঞাসা করল, পরশু যাওয়াই ঠিক তো?

রাধা বলল, হ্যাঁ ভাই।

বিশ্বনাথ বলল, আজ আমি আদিত্যবাবুকে লিখে দিয়েছি। সেখানে সংসার পাতবার জন্য সাজ-সরঞ্জাম কিছু কিছু কিনতে হবে তো?

রাধা বলল, এখান থেকে পাওয়া যাবে অনেক কিছু। কিছু কিনতেও হবে। ওদের কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র।—একটু চুপ করে বলল, শিউশরণ আর মদনের ব্যবস্থা কী হবে?

বিশ্বনাথ বলল, সে ব্যবস্থা হয়েছে। যে ভদ্রলোক কাঠের গোলা কিনেছেন, তিনিই তো বাড়িটা কিনেছেন। আপনি গেলে তিনি এখানেই থাকবেন। আমি ওদের কথা বলতে তিনি বললেন, তাঁর তো ঠাকুর-চাকরের দরকার হবে—ওদেরই রাখবেন।

রাধা জিজ্ঞেস করল, ওদিকের খবর কী?

বিশ্বনাথ বলল, ওদিকের মানে—কমলা আর ব্রজলালের ব্যাপারটার? বিয়ের আয়োজন চলছে। খুব শীগগির বিয়েটা হয়ে যাবে। ব্রজলাল এসেছে কিনা জানতে পারি নি। এলে তো কাছাকাছি থাকবে না। দূরের কোন কলিয়ারীতে আড্ডা গাড়বে।

রাধা বলল, ও আসবার আগে ভালয় ভালয় বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি ভাই।

বিশ্বনাথ বলল, কাল তা হলে একবার শহরে যাওয়া যাবে। আপনার টাকাটা তুলতে হবে, জিনিসপত্র যা যা দরকার কেনা যাবে।

পরের দিন ওরা দুজনে শহরে গেল। বিশ্বনাথ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলল। নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিসপত্র কিনল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। বিশ্বনাথ বলল, চলুন, একটু কিছু খাওয়া যাক।

একটা হোটেলে ঢুকল। পাঞ্জাবী হোটেল। শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল। আগে নাকি কোন এক বিলিতী সাহেবের ছিল। দেশে স্বাধীনতা আসার পর সাহেব হোটেলটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের দেশে চলে গেছে। এখন একজন পাঞ্জাবী এর মালিক। দেশী ও বিলিতী দু রকমের খাদ্য ও পানীয় এখানে সরবরাহ করা হয়। নানা রকমের আনন্দোপভোগের ব্যবস্থাও আছে। দেশী-বিলিতী দুই শ্রেণীর পয়সাওয়ালা লোকের এখানে সমাবেশ ঘটে।

একটা হলঘরে গিয়ে বসল ওরা। বেশ লম্বা-চওড়া হলঘর। প্রায় এক শো জন লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এই ঘরে। ঘরের দু পাশে সারিবন্দী অনেক ছোট ছোট টেবিল। এক-একটি টেবিলের চারপাশে চারখানা করে চেয়ার। সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি টেবিলে সুন্দর সুন্দর ফুলদানিতে ফুল। দেওয়ালে দামী ফ্রেমে আঁটা দেশী-বিলিতী সুন্দর সুন্দর ছবি। বিদ্যুতালোকে সাজ-সরঞ্জাম সমেত সমস্ত ঘরটা ঝলমল করছে।

যাঁরা খাচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশেরই পোশাক-পরিচ্ছদ বিলিতী। দামী ও ঝকঝকে। চুপচাপ খেয়ে চলেছেন সব। মাঝে মাঝে মৃদু আলাপের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

এক পাশে একটা ছোট টেবিলে বসল ওরা। বেয়ারা এসে সঙ্গে সঙ্গে সেলাম জানাল। বিশ্বনাথ ওদের প্রয়োজনীয় খাবারের হুকুম দিল।

খেতে খেতে রাধাকে বিশ্বনাথ বলল, ওই পাশে তাকিয়ে দেখুন।

একটু দূরে একটা টেবিলে চারজন বসে ছিল। একজন যুবতী রূপবতী মেয়ে। অত্যুগ্র আধুনিকা বাঙালী মহিলার মত বেশ-ভূষা। কিন্তু চেহারায় অবাঙালী। সঙ্গে তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। দুজনের পোশাক খাঁটি বিলিতী। একজনের খাঁটি দেশী।

রাধা মেয়েটিকে চিনল। কমলা। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পেরেছেন?

রাধা বলল, কিছুটা পেরেছি।

বিশ্বনাথ বলল, কমলা। সামনের ছেলেটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। আর একজন খুব সম্ভব ছেলেটির কোন বন্ধু। প্রৌঢ় লোকটি কমলার বাবা।

খাওয়ার পর যাবার সময় দূরের একটি টেবিল থেকে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বিশ্বনাথকে বলল, সেলাম বাবুজী।

বিশ্বনাথ তার দিকে একবার তাকিয়ে সেলাম জানাল। সারা মুখ গোঁফদাড়িতে ঢাকা। চোখে চশমা। চেনা কণ্ঠস্বর মনে হল। মুখের ডৌলও চেনা মনে হল। ভাল ভাবে চিনতে পারল না। ভাবল, কোন পুরনো রোগী হবে বোধ হয়।

গাড়িতে উঠে রাধা বলল, মেয়েটি একেবারে বাঙালীর মত হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ বলল, পাঞ্জাবী আধুনিকারা বাঙালী মেয়েদের মত সাজ-পোশাক করতে ভালবাসে।

রাধা বলল, মেয়েটি সত্যিই রূপসী। ব্রজলাল যে পাগল হয়ে গেছে—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিশ্বনাথ বলল, এখন না হোক, ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার খবর পেলে ব্রজলাল সত্যি পাগল হবে। তখন সবাই মিলে ধরাধরি করে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বিশ্বনাথ বলল, টাকাটা আপনার কাছেই রাখুন। ব্রজলাল যদিও এখানে আসে, আমার কাছে বা বাবার কাছে টাকাটা আছে এটা সে নিশ্চয়ই ভাববে। কাজেই দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে ঢুঁ মারতে পারে। আপনার কাছে টাকা আছে এটা সে কিছুতেই ভাববে না।—কিছুক্ষণ পরে বলল, আপনারা ওখানে যাবার পরে আমি আদিত্যবাবুকে বুঝিয়ে চিঠি দেব। উনি টাকাটা দিয়ে আপনার নামে সরকারী-কাগজ কিনে দেবেন।

রাধা বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

বিশ্বনাথ বলল, আমার যাওয়া হবে না বোধ হয়। কয়েকটা কাজ আছে। আমার পরিচিত একজন ড্রাইভার

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু! আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপ
LIFEBUOY
SOAP
L/P. 3-X29 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত।

আমার গাড়িতে করে আপনাদের পৌঁছে দেবে। আমি পরে একদিন গিয়ে আপনাদের দেখে আসব।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। মদন ও শিউশরণ জিনিসপত্রগুলো একে একে ঘরে নিয়ে গেল। বিশ্বনাথও রাধার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে গেল। মদন শিউশরণ চলে যাবার পরে একটা প্যাকেট হাতে দিয়ে বলল, আপনার টাকাটা ট্রাঙ্কে কাপড়ের ভাঁজে রেখে দিন। আর কিছু টাকা আমার কাছে আছে, ফেরবার পথে দিয়ে যাব।

রাধা বলল, তুমি কি এখন আবার ডিসপেন্সারিতে যাবে?

হ্যাঁ, একবার ঘুরে আসি। কম্পাউণ্ডার খেতে যাবে। আমি না গেলে খেতে যেতে পারে না। ও খেয়ে ফিরে এলে তবে আমি ফিরব।

বিশ্বনাথ চলে গেল।

১২

রাত প্রায় নটা। বিশ্বনাথ বসে আছে তার ডিসপেন্সারিতে। সেদিনকার কাগজখানা পড়ছে। কম্পাউণ্ডার খেতে গেছে। তার বাড়ি মাইল দুই দূরে একটা গ্রামে। গেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে—এখনও ফিরছে না। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় রাধার সঙ্গে দেখা করে টাকাটা তাকে দিয়ে যেতে হবে—এই চিন্তাটা প্রায়ই মনের সামনে এসে একটু উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

জুতোর শব্দ শোনা গেল। মুখ তুলে চাইতেই বিশ্বনাথ দেখল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। জিজ্ঞাসা করল, কে?

লোকটি উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। বিশ্বনাথ বলল, কী দরকার আপনার?

কাছে এগিয়ে আসতেই বিশ্বনাথের মনে হল, যে লোকটি আজই শহরের হোটেলে তাকে সেলাম জানিয়েছিল—খুব সম্ভব সেই-ই। লোকটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টেনে টেনে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না?

মদের গন্ধ নাকে এল বিশ্বনাথের। চিনতে পারল সে। ব্রজলাল—চুল-দাড়ি-গোঁফ, হাতে বালা, এই সব দিয়ে চেহারাটা হুবহু পাঞ্জাবীদের মত করে তুলেছে। চেনা কষ্টকর। ভাবল, কী মতলবে এসেছে! মাতাল হয়ে এসেছে—টাকার খবরটা পেয়েছে নাকি! ভয় হল মনে। রাধার কথাটা মনে হল—ভালয়-ভালয় বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি ভাই।

বিশ্বনাথ বলল, বস।

ব্রজলাল কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, বসবার সময় নেই। জরুরী দরকারে এসেছি আমি। বাড়ি বিক্রির টাকাটা আমাকে দিয়ে দাও।

বিশ্বনাথ বলল, সে টাকাটা তোমার প্রাপ্য নয়। যার প্রাপ্য তাকে দেওয়া হয়েছে।

ব্রজলাল উঁচু গলায় বলল, কার প্রাপ্য? ওই চাকরানীটার? ওই মেয়েটার? যাকে নিয়ে শহরে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ? হোটেলে খানা খাওয়াচ্ছ?

বিশ্বনাথ ধমকের সুরে বলল, চুপ কর ব্রজলাল। যা-তা বলো না।

ব্রজলাল বলল, ধমকাচ্ছ? মেজাজ খুব চড়ে উঠেছে দেখছি যে! দু পয়সা রোজগার হচ্ছে বুঝি? তবে পরের টাকায় লোভ কেন?

বিশ্বনাথ বলল, পরের টাকার ওপর লোভ আমার নেই। তুমিই তার লোভে ছুটে এসেছ।

ব্রজলাল বলল, পরের টাকা? আমার ন্যায্য পাওনা টাকা।

বিশ্বনাথ বলল, তুমি তো তেওয়ারীর উত্তরাধিকারী নও। তবে তুমি যদি নিজের সন্তানের মত ব্যবহার করতে তোমাকেই দিতেন। তা তো কর নি। তিনি মরতে বসেছেন দেখেও তুমি তাঁকে ফেলে চলে গেলে। আর দিদি নিজের মেয়ের মত শেষ পর্যন্ত তাঁর সেবা করল। সেই তো আপনার লোক। কাজেই তাকেই বাড়িটা উইল করে দিলেন।

ব্রজলাল মারমুখো হয়ে উঠে বলল, এ তোমার কারসাজি। মেয়েটাকে হাত করে টাকাটা মেরে দেবার চেষ্টা। কিন্তু আমি ছাড়ব না। একেবারে প্রাণে মেরে দিয়ে যাব।—বলেই এগিয়ে যেতেই বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়ারটা খুলতেই ব্রজলাল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। তাকে জাপটে ধরে একেবারে ঠেলে নিয়ে

দওয়ালে চেপে ধরল। এমন সময়ে আর একটা ়টে এসে বিশ্বনাথের পিঠে ছুরি মারল। বিশ্বনাথ ং করে টলতে টলতে পড়ে গেল। ব্রজলাল ড্রয়ার কাকড়ি যা ছিল সব বার করে নিয়ে ঘর থেকে এল। তারপর বিশ্বনাথের গাড়িতে উঠে গাড়িটা লে গেল।

ড়ির সামনের বারান্দায় বসে রাধা বিশ্বনাথের পেক্ষা করছিল। ভাবছিল, এ বাড়িতে কতদিন গেল! ক্রীতদাসীর জীবন! আনন্দ ছিল না, ল না, সম্মান ছিল না। ছিল মনিবদের মর্জিমাফিক ঃ বা নিগ্রহ। ভেবেছিল এমনই করেই আমরণ । ভাগ্যবিধাতার হঠাৎ করুণা হল। দাসীত্বের থেকে মুক্তি দিলেন। হারানো স্বামীকে হাতের এনে দিলেন। কেড়ে-নেওয়া সন্তানের বদলে দিলেন। যে ঘর তার ভেঙে গিয়েছিল সে ঘর তোলবার সুযোগ দিলেন। এ সুযোগ সে ছাড়বে না। ক ও খোকাকে ঘিরে সে প্রাণপণ চেষ্টায় আবার র একটি সংসার গড়ে তুলবে। স্বামীর সেবা করবে, খোকাকে মানুষ করবে। খোকা বড় হবে, শিক্ষিত হবে, রোজগার করবে। তার বিয়ে দিয়ে মনের মত বউ নিয়ে আসবে ঘরে। তারপর ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা আসবে। তাদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করবে সে। তারপর একদিন—যেদিন মরণ আসবে, সবাইয়ের চোখের জলটুকু সম্বল করে এ জীবন থেকে বিদায় নেবে সে।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শব্দ শুনে মনে হল বিশ্বনাথের গাড়ি। রাধা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যে আসছে, তাকে দেখে তো বিশ্বনাথ বলে মনে হল না। বিশ্বনাথের চেয়ে আরও লম্বা রোগা। রাধার ভয় হল—কে তা হলে! লোকটি কাছে আসতেই রাধা বুঝতে পারল, বিশ্বনাথ নয়—একজন পাঞ্জাবী শিখ। রাধা ঘরের মধ্যে চলে যাবার উপক্রম করতেই লোকটা চিৎকার করে উঠল, দাঁড়াও।—গলার স্বর শুনে রাধার বুঝতে বাকী রইল না, এ ব্রজলাল। তার মাতাল অবস্থার কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হবার কথা নয় তার।

ব্রজলাল কাছে এসে তার হাত চেপে ধরে বলল, চল আমার সঙ্গে।
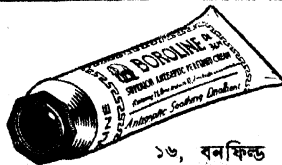
ভয়ে সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল তার। বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। একবার ডাকবার চেষ্টা করল—মদন! শিউশরণ! কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

আর একটা লোক এসে হাজির হল। তাকে ব্রজলাল ঘরে জিনিসপত্র যা আছে গাড়িতে তোলবার জন্য আদেশ দিল। ব্রজলাল রাধাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই রাধা প্রাণপণ শক্তিতে একবার বলল, আমি যাব না, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

ব্রজলাল বলল, যাবি না? বিশ্বনাথের সঙ্গে ফুর্তি করবার জন্যে থাকতে হবে, না?—বলেই ওর ঘাড় ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিতেই রাধা বারান্দা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে একটা তীব্র আর্তনাদ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্রজলাল তার সংজ্ঞাহীন দেহটা দু হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠাল। সঙ্গের লোকটা জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে যথাস্থানে রাখল। মদন ও শিউশরণ ছুটে এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল। এগিয়ে এসে সাহায্য করতে সাহস করল না।

ব্রজলাল গাড়ির সামনে বসল। সঙ্গের লোকটা গাড়ি চালিয়ে দিল।

চেতনা ফিরে আসতেই রাধা বুঝতে পারল গাড়ির একটা কোণ ঘেঁষে সে পড়ে আছে। গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, আর একটি মেয়ে ওদিকে বসে আছে—কমলা বোধ হয়। ওকেও ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তা হলে! ভাবল রাধা। আবার চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়িটা প্রচণ্ড শব্দ করে থেমে গেল। রাধার দেহটা সামনে পড়ে যাবার উপক্রম হল। কোন রকমে সামলে দেখল, গাড়িটাকে ঘিরে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে। লোকগুলো ব্রজলালকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে মারতে শুরু করল। একজন গাড়িতে উঠে কমলাকে বার করে নিয়ে গেল। সঙ্গের লোকটাকেও খুব মারল। তারপর তারা একটা ট্রাকে চেপে সব চলে গেল। রাধা চুপ করে পড়ে রইল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রাধা। যখন ঘুম ভাঙল, গাড়ি তখন চলছে। পাশে ব্রজলাল একটা কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। তার জামা-পাতলুন ছিঁড়ে গেছে, রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

দুদিন পরে ব্রজলালের কর্মস্থানে পৌঁছল। যখন পৌঁছল ব্রজলাল তখন জ্বরে অচৈতন্য। সঙ্গের লোকটি জখম হলেও একেবারে কাবু হয় নি।

কাঠের বেড়া দেওয়া খানিকটা জায়গা। তার মাঝখানে একটা টিনের ঘর। দুটো কুঠরি। তারই একটাতে ব্রজলালকে ধরাধরি করে ঢোকানো হল।

সঙ্গের লোকটির নাম লছমনপ্রসাদ। ব্রজলালের দেশের লোক—সম্পর্কে ভাই। ব্রজলাল তাকে ব্যবসায়ে সহকারী হিসাবে আনিয়েছিল। লোকটি ব্রজলালের মত রুক্ষ প্রকৃতির নয়। ব্রজলালকে ভালবাসে।

সে কতকটা দূরে একটা শহর থেকে ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।

রাধার টাকাটা অবশ্য লছমনপ্রসাদই হস্তগত করল। সেই টাকাতেই সে কাঠের গোলাটা চালু করবার চেষ্টা করতে লাগল, চিকিৎসা ও সংসার খরচ চালাতে লাগল। ব্রজলালের সেবার ভার রাধার উপরে পড়ল।

আততায়ীরা একটা বর্শা দিয়ে ব্রজলালের একটা পা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছিল। বিষাক্ত ঘা হয়ে উঠল সেখানে। ডাক্তারবাবু হাসপাতালে গিয়ে পাটা কাটিয়ে ফেলবার পরামর্শ দিলেন। ব্রজলাল রাজী হল না। ভুগতে লাগল।

শেষটা ব্রজলাল রাধার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে লাগল। রাধা সেবার ত্রুটি করত না মোটেই। ব্রজলাল তার সর্বনাশ করেছে—সেটা সর্বদা মনে কাঁটার মত বিঁধে থাকলেও সেবায় সে তিলমাত্র অবহেলা করত না। ব্রজলাল তা মর্মে মর্মে বুঝেছিল। শেষে তার হাত ধরে ক্ষমা চাইল একদিন। বলল, খুব অন্যায় করেছি। মাপ কর আমাকে। যদি ভাল হই, নিজে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।

ব্রজলাল হাসপাতালে যেতে রাজী হল শেষে। শরীরটা তার অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল। রক্ত ছিল না দেহে। যাবার আগে কাঁদতে লাগল। বলল, আর ফিরব না।—রাধাকে বলল, আমি যতদিন থাকি, এখানে থেকো। এক-একবার দেখতে যেয়ো। যদি ফিরে আসি, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। আর যদি না ফিরি, লছমন তোমার ফেরার ব্যবস্থা করবে।

মাস-দুই ভুগে মারা গেল ব্রজলাল।

১৩

প্রায় আট মাস পরে রাধা তার সেই পুরনো বাড়ির সামনে একটা বাস থেকে নামল। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। রঙটা আরও মলিন হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো রুখু। মাথার সামনের কুচো চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে। পরনে মলিন শাড়ি ও সেমিজ। হাতে একটা পুঁটলি। লছমনপ্রসাদ ভাল ব্যবহার করলেও তার টাকা বা জিনিসপত্র কিছুই তাকে ফেরত দেয় নি।

বাসটা চলে গেলে রাধা অনেকক্ষণ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ পথ এসে ক্লান্তিতে কোথাও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। খিদে পেয়েছিল খুব। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? এক বিশ্বনাথের বাড়ি আছে। সেখানে গেলে দু-চারদিনের জন্যে আশ্রয় পাওয়া যাবে নিশ্চয়। সেখান থেকে সে গৌরদাস আর খোকার খোঁজ করবে। জমিদারবাবুরা তাড়িয়ে দিলেও বিশ্বনাথ নিশ্চয় তাদের কিছু ব্যবস্থা করেছে। গৌরদাস ও খোকাকে নিয়ে সে আদিত্যবাবুর কাছে চলে যাবে। আদিত্যবাবুকে তার দেরি হবার কারণটা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না। এখন সে একেবারে নিঃস্ব হলেও অচিন্ত্যদা যে বাড়ি তাকে দিয়ে গেছেন, তা সে নিশ্চয় পাবে। সেখানেই স্বামী-সন্তান নিয়ে বাস করবে। চাকরির সামান্য টাকাতে কোন রকমে তিনজনের চালিয়ে নেবে।

একটি লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তাকে রাধা জিজ্ঞেস করল, এখানে মদন বলে কেউ আছে?

লোকটি বলল, আছে।

একবার ডেকে দিতে পার তাকে?

লোকটি মদনকে ডেকে দিতে গেল।

মদন এল। রাধার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল, আপনি! দিদিমণি, আপনি বেঁচে আছেন? আমরা ভেবেছিলাম—

রাধা বলল, মলেই তো বাঁচতাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হল কই!

মদন চুপ করে রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, বিশ্বনাথের খবর রাখিস তো? কেমন আছে?

মদন বলল, আপনি জানেন না? আর জানবেনই বা কী করে! বিশ্বনাথবাবুর ডিসপেন্সারিতে ডাকাতি হয়েছিল। যে রাত্রে এখানে হয়েছিল—ঠিক সেই রাত্রে। ওঁকে ছুরি মেরে ঘায়েল করে ওঁর সব টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছিল। হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল মাস তিনেক। বাড়ি ফিরে ওখানকার ডিসপেন্সারি তুলে দিলেন। কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। ওঁর বাবা তো মারা গেছেন মাস দুই আগে। তারপর ওঁর মা বউ ছেলে সব ওঁর কাছে চলে গেছেন। ওঁদের বাড়ি এখন খালি পড়ে আছে।

রাধার মুখ শুকিয়ে গেল। কোথায় যাবে তা হলে!

রাধা জিজ্ঞাসা করল, সেই অন্ধ ভিখিরী এখনও তোদের গাঁয়ে থাকে?

মদন বলল, আজ্ঞে না। আপনার যাওয়ার মাস দুই পরে ছেলেটার জ্বর হল। কে চিকিৎসা করাবে? বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা গেল। তারপর সেই কা[illegible] ভিখিরীটা একদিন কোথায় চলে গেল।

রাধার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করতে লাগল।

সামনের দিকে তাকাল। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। রাধার মনে হল, মাঠ নয়, মরুভূমি—পথহীন জনহীন অন্তহীন। এরই বুকের উপর দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়েছে সেই কিশোরী অবস্থা থেকে। চলেছে সারা যৌবন ধরে—চলবে বার্ধক্যশেষে মৃত্যু পর্যন্ত।

এই মরুভূমির বুকে একটি সুন্দর জীবনের মনোহর ছবি ক্ষণেকের জন্য ফুটে উঠেছিল। কাছে আসতে না আসতেই তা মিলিয়ে গেল।

॥ সমাপ্ত ॥

গল্প

আবছায়া

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

তি নিশ্চয়ই—এতই সাচ্চা ব্রাহ্মণ সে যে অভিশাপ দিয়ে জলজ্যান্ত একটি মানুষকে সে তে পারে। কেদার-তুঙ্গনাথের দেশে যে কোন রোহিতের কাছেই লোভনীয় হবার কথা। কিন্তু র করে বসল পান্নালাল পাণ্ডা। ছদ্ম বিনয় নয়, ল অস্বীকৃতি। কৌতূহলী তপনের পুনঃপুনঃ র উত্তরে শেষ পর্যন্ত সে রীতিমত বিরক্ত হয়েই া বাবুজী, না। আমার অভিশাপে মরে নি গড়ুর ঙ্গ, সত্যিকারের সাপেই কেটেছিল তাকে। নইলে কি আমাকে ছেড়ে দিত।

ল কিছুক্ষণ যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইল পান্নালাল। র হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে আবার বলল, তবে , সে সাপ কেবল তাকেই কাটে নি, সঙ্গে সঙ্গে বুকেও ছোবল মেরেছিল। দু বছর ধরে সেই হলে মরছি আমি।

ংকার রূপক! একটানে যেন একখানি ছবিই তোলে চোখের সামনে। কিন্তু অর্থ কি কথাটার? র মুখেচোখে বিহ্বল ভাবটুকু লক্ষ্য করেই যেন াল আঙুল দিয়ে সীতাকে দেখিয়ে আবার বলল, ও লছে তার দ্বিগুণ জ্বালা আমার বুকে। ও তো ই মেয়ে।

ম্বলের উপর শুয়ে আছে মেয়েটি। মুখখানি মনে হয় ত একটি স্থলপদ্ম। কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। যেন আচ্ছন্ন ভাব তাতে। সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে র আগেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

সের জ্বালায় যে জ্বলছে মেয়েটি তা না জানলেও আগেই তার জ্বালা কিছু কিছু দেখেছে তপনেরা।

টনা নয়, অঘটন। উত্তরাখণ্ডেও অপ্রত্যাশিত।

কদার-তুঙ্গনাথের দেশ, প্রকৃতি ও অপ্রাকৃতের ভূমি। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সুরলোক ওখানে। রা বলেন যে সেখানে দেবতারা নিত্য বিহার করেন। সঙ্গে পার্বতীই কেবল নন, নন্দী-ভৃঙ্গী, ভৈরব-ী এবং অন্যান্য অনুচরেরাও। বরফ-ঢাকা কেদারনাথ শ্রেণীর ঝকঝকে শিখরগুলির দিকে তাকালে মোটেই ব মনে হয় না। নীচেও যত রূপ ততই যেন রহস্য। পদে আলো-ছায়ার লুকোচুরি। চারিদিকেই পাহাড়; ড় হয়ে তার ছায়া নেমেছে পায়ে-চলা পথের উপর। নেই; তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লাগলে খানিকটা এগিয়েই রূঢ় বাধা পায় বাঁকের মুখে। মনের প্রত্যাশা তাই আরও উন্মুখ, আরও ব্যাকুল। রাঙা মাটির পথ অবশ্য নয়, মোটে মাটিই নেই ওপথে। পাঁশুটে রঙের পাথর। কিন্তু তেমনি মন ভোলায় ওই পথও। অত খোরাক পেয়েও পরিতৃপ্তি নেই কৌতূহলের।

ঠিক ওই সময়টাতে তপনের প্রত্যাশা তুলনায় একটু ভোঁতা ছিল বলেই ধাক্কাটা অত জোরে লাগল তার মনে।

বেনিয়াকুণ্ড থেকে তুঙ্গনাথের পথ। আগের দিন বেনিয়াকুণ্ড পর্যন্ত সাত-আট মাইল অসাধারণ পথ পার হয়ে এসেছে তারা। কেবল খাড়া চড়াই নয়, নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে সে পথ। এত নিবিড় যে চনচনে রোদ থাকলেও ডালপালা ভেদ করে পথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না সে রোদ। আর সূর্য যদি মেঘে ঢাকা পড়ে তবে দুপুরবেলাতেও মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গায়ে গায়ে লাগা গাছ পথের দু-ধারেই। আর প্রত্যেকটি গাছই যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের। বনভূমি বলেই বৃষ্টিও বেশী এখানে। অনবরত বৃষ্টিতে পুরু হয়ে শেওলা জমেছে গাছের গায়ে। আর শুধু লেগে থাকাই নয়। উপরের বাঁকা ডাল থেকে ঘনীভূত শৈবাল-দল অশ্বত্থের মোটা মোটা ঝুরির মত ঝুলে রয়েছে। আবছা আলোতে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন জটাজুটধারী সন্ন্যাসীরা সারি সারি বসে ধ্যান করছেন।

অনেক রকম অঘটনই ঘটতে পারত সেই বনের পথে। কিন্তু ঘটে নি কিছুই। ভূতপ্রেত দূরে থাক্, সাপ-বাঘও তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নি—একটি শিয়াল পর্যন্ত নয়।

আগামী সম্ভাবনা তুঙ্গনাথের শিখরে। পঞ্চকেদারের অন্যতম তুঙ্গনাথ। কেদারের মতই নাকি উঁচু তার পীঠ, কিন্তু সমৃদ্ধি কম। শ্মশানচারীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত পরিবেশ সেখানে। কেদারে যে সাধ মেটে নি, তুঙ্গনাথের বেদী পর্যন্ত উঠে যেতে পারলে মিটতেও পারে তা।

কিন্তু আরও প্রায় দু মাইল হাঁটতে হবে তুঙ্গনাথের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছতেই। সেখান থেকে আবার খাড়া চড়াই। কিন্তু এ পথটুকু ব্যতিক্রম। বন আর নেই। দু পাশের পাহাড়ই অনেক দূরে সরে গিয়েছে। বাঁ দিকে অনেক দূরে দেখা যায় বরফ-ঢাকা কেদারনাথ পর্বতশ্রেণী। সকালের রোদে ঝকঝক করছে। কিন্তু চলার পথের তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মোটেই দুর্গম নয়।

লোকালয়ের ভিতর দিয়েই পথ। এ পথে প্রত্যাশা স্বভাবতঃই তেমন তীব্র ছিল না। তবুও দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে তপনের মনে একটু চাঞ্চল্য হল।

পার্বতী ঠিকই, তবে উমা নয়। কোনও কিন্নরীও নয়। এমন অনেক মেয়ের সঙ্গেই পথে দেখা হয়েছে তার, তারা নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে পাই-পয়সা চায়, পেলে খুশীতে ঝলমল করে ওঠে তাদের মুখ। দূর থেকেই তপন দেখতে পেল যে আর সব পার্বতীর মতই ও মেয়েটির পিঠেও মাঝারি আকারের ঘাসের বোঝা আছে একটি। আরও মনে হল তপনের সে মেয়েটি বোধ হয় খোঁড়া।

রোজ যেমন হয় আজও তেমনই তপন তার সঙ্গীদের পিছনে ফেলে একা একা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি খুব ধীরে ধীরে আসছে বুঝে সে আরও একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। আর একটু পরেই দুজনে মুখোমুখি।

মুগ্ধ হয়ে গেল তপন। উমা না হোক, গৌরী নিশ্চয়ই। সুন্দরী তরুণী। একেই তো স্বাভাবিক দুধে-আলতা রঙ। তার উপর বুঝি বিদেশী পুরুষ সামনে দেখে লজ্জায় আরও লাল হয়েছে তার মুখখানি।

কথা বলবার লোভ সামলাতে পারল না তপন। হেসে সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নামটি কি মা?

আরও বুঝি বেশী লজ্জা পেল মেয়েটি। মাথায় কাপড় নেই। টানবে কি—আরক্ত মুখ নত করে খোঁড়া পা নিয়েও দ্রুতবেগে পাশ কাটিয়ে তপনের পিছনে চলে গেল সে। কিন্তু পরক্ষণেই মিষ্টি আওয়াজ কানে এল তপনের: সীতা।

তার প্রশ্নেরই উত্তর। শুনেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল তপনের মন। কেবল ফিরে তাকানোই নয়, ছুটে গিয়ে প্রায় মেয়েটির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে সহাস্য কণ্ঠে সে বলল, বা, বেশ নাম তো! বাড়ি কোথায় তোমার?

আর ঠিক তখনই ঘটল ওই কাণ্ডটা। চোখ তুলে তপনের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সীতা। পড়েও গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর কেবল গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঁজলা উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থির আক্ষেপ।

চিৎকার করে উঠল তপন নিজেও। তবে অবস্থা অন্য সকল দিক থেকেই অনুকূল। তার দলের লোক ততক্ষণে এখানে এসে গিয়েছে। মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দল তার। কুলি তো আছেই, তা ছাড়া তাদেরই আরও চারজন। দুজন মহিলা আছেন দলে—তার মা আর বোন। ভগ্নীপতি প্রবীণ লোক, ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্ত আধা-ডাক্তার, মানে মেডিকেল কলেজের উপরের ক্লাশের ছাত্র।

মেয়েটির জন্য যত, নিজের জন্য তার চেয়েও বেশী উদ্বিগ্ন হয়েছিল তপন। কে যে কী দুরভিসন্ধি বা অসদাচরণ আরোপ করবে তার উপর কে জানে! জয়ন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতই গম্ভীর মুখে তার রায় প্রকাশ করে হিস্টিরিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করবার পরেও উদ্বেগ দূর হয় নি তার। কিন্তু সোরগোল শুনে স্থানীয় লোক যারা ছুটে এসেছিল ওখানে, তারা অভয় দিল তপনকে। কোন সন্দেহ করে নি তারা। বিস্মিতও হয় নি। অমন প্রায়ই হয় মেয়েটির—যখনই ভূতে পায় তাকে।

তাদেরই একজন অযাচিতভাবে কারণটাও শুনিয়ে দিল তপন আর তার সঙ্গীদের। সীতার বাবা পান্নালাল পাণ্ডা ব্রহ্মশাপে ভস্ম করেছিল ভ্রষ্ট সাধু গড্ডুর মহারাজকে। কিন্তু মরেও মেয়েটিকে ছাড়ে নি সেই গড্ডুর।

ব্যাখ্যাটা মানে পাণ্ডা পান্নালাল, কিন্তু অভিযোগ নয়। খ্যাতি তার বিড়ম্বনা। তপনদের চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখে সে বিরক্ত হয়েই বলল, বিশ্বাস কর বাবুজী, সেদিন আমি তাকে শুধু এই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলাম। অভিশাপের কথা বলেছিলাম ভয় দেখাতে, কিন্তু শাপ আমি দিই নি।

থেমে থেমে সম্পূর্ণ কাহিনীই বলল পান্নালাল। শোনবার মতই সে কাহিনী।

চেলা গড্ডুরজীকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসী চোপতাচটির একটি ঘরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল নাকি যে, সংসারাশ্রমে স্ত্রী-পুত্র যেমন, সন্ন্যাসাশ্রমে চেলাও তেমনই সাধনভজনের বিঘ্ন। সন্ন্যাসীর সেই বিঘ্ন দূর করবার জন্যই শ্রীকেদারনাথ চেলা গড্ডুরের দেহে ওই রোগ ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এত বড় তত্ত্বকথা গাঁয়ের সংসারী লোকেরা দূরে থাক্, দোকানদার চটিওয়ালারাও হজম করতে পারে নি। বছর পঁচিশ বয়সের সুঠাম সুদর্শন যুবক সেই গড্ডুরজী। এই গাড়োয়াল জেলারই লোক। সন্ন্যাসের পথে নতুন যাত্রী। জটা হবে কি, চুলই তেমন বড় হয় নি! বৈরাগ্যের যা কিছু নিদর্শন তা কেবল তার কটিতে কৌপীন ও অঙ্গের ভস্মরাগে। প্রবল জ্বরে তখন সে সংজ্ঞাহীন। সুতরাং স্থানীয় লোকেরাই তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার নিয়েছিল। পান্নালালের উৎসাহই ছিল যেন সবচেয়ে বেশী।

দায়সারা কাজ নয়, আন্তরিক সেবা। শুধু রোগীর সেবাই নয়, সাধুসেবাও—গৃহীর পক্ষে মহাপুণ্যের কাজ। খবর পেয়ে অনেকেই সাগ্রহে ছুটে এসেছিল। গ্রামের বৈদ্য বিনামূল্যে দিয়েছে তার বিদ্যা ও ওষুধ। পুরুষেরা রোগীর মাথা ধুইয়ে হাত-পা টিপে দিয়েছে। গ্রামের মেয়েরা দুধ ফল হাতে নিয়ে এসেছে তাকে দর্শন করতে, কেউ কেউ নিজের হাতে পথ্য তৈরি করে দিয়েছে। পান্নালালের স্ত্রী শঙ্করী ও কন্যা সীতাও।

াকদিন নয়, প্রায় এক মাস। রোগ সারবার
রাগী নিশ্চিন্ত আরামে কয়েকদিন ওখানে বিশ্রাম
। ততদিনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কত কথাবার্তা
তার, কত ছোঁয়াছুঁয়ি—কিছু রঙ্গ-কৌতুকও।
চার খোঁড়া পা-খানা যোগবলে সারিয়ে দিতে পার
?

ঃ পারে। নিজের জ্বর সারাতে পারে না, সে
—

। ধরনের কথাও হয়েছে। শঙ্করী তার কঠোর
শাস্ত্রজ্ঞ স্বামীর ধমক উপেক্ষা করেও জেরা করে
চেষ্টা করেছে নবীন সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের

নই ভাবে ধীরে ধীরে সকলের সঙ্গেই বেশ একটু
সম্বন্ধই গড়ে উঠেছিল গড়ুর মহারাজের। সুতরাং
ওঠবার পর কেদার পর্যন্ত গিয়েও তার দীক্ষাগুরু
কে আর খুঁজে না পেয়ে গড়ুরজী আবার যখন
খে ওই চোপতাচটিতেই ফিরে এল তখন গাঁয়ের
আবার সাদরেই গ্রহণ করেছিল তাকে। স্থানীয়
তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারা।
ঃ প্রধান উদ্যোক্তা পান্নালাল।

ন্দিরের সামনে সদররাস্তার ধারে দিনের বেলায়
পেতে বসত গড়ুর মহারাজ। যাত্রীর চলাচল
কম থাকত, প্রণামী যেদিন তেমন পড়ত না সেদিন
পরে বা নীচে কোন গাঁয়ে চলে যেত গৃহস্থদের
ত ভিক্ষা করতে। যেত পান্নালালের বাড়িতেও।
াই গড়ুরজী—

লতে বলতে থেমে গেল পান্নালাল; উত্তেজনায় যেন
হয়ে উঠল তার মুখ। দূরের পাহাড়টার দিকে
ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে চেয়ে থাকবার পর ফিরে তপনের
দিকে চেয়ে সে বলল, সেই গড়ুরজী একদিন বেশ
একটি ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে
। আমাদের এই উঠোনে এসে উপস্থিত হল।
কন ?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল তপন।
সই প্রশ্ন তো আমার মনেও।—উত্তর দিল পান্নালাল,
সা করলাম গড়ুরজীকে। সে হেসে উত্তর দিল যে
ভারী বোঝা নিয়ে চড়াই ভেঙে উঠতে আমার মেয়ের
চ্ছিল বুঝে সেদিনের বোঝাটা সীতার পিঠ থেকে
ই কেড়ে নিয়েছে সে।
বস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেল তপনের মুখের উপর
। সে হেসে বলল, বা, বেশ তো!
াসলেন তার মা জাহ্নবীও। স্মিতমুখে তিনি বললেন,
মতই তো কাজ করেছিলেন সেই গড়ুর মহারাজ।
বাধ করি এমন উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না পান্নালালের
সে বিভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ জাহ্নবীর মুখের দিকে
চেয়ে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ঈষৎ যেন গাঢ়স্বরেই
বলল, কিন্তু মাতাজী, সবাই সে কথা মানবে কেন?
বাজারের চটিওয়ালারা, আমার প্রতিবেশীরা যারা ও দৃশ্য
দেখেছিল তাদের ভাল লাগে নি ব্যাপারটা। হাসাহাসিও
করেছিল তাদের কেউ কেউ।

একটু থেমে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে
পান্নালাল আবার বলল, তাদের দোষ কি। আমার
নিজের স্ত্রীও তো তাই ভেবেছিল।

ছি!—প্রায় গর্জন করে উঠল পান্নালালের স্ত্রী শঙ্করী।
মেয়ের শয্যা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীকে ধমক দিল সে,
কী যা-তা বলছ তুমি পরদেশী যাত্রীর কাছে!

তারপর জাহ্নবীর প্রায় গা ঘেঁষে বসে তারই মুখের
দিকে চেয়ে সে বলল, আমি মাতাজী, শুধু বলেছিলাম
যে মায়া যখন একটু পড়েছে দেখা যাচ্ছে তখন বেশ হত
ওই গড়ুরের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিতে পারলে।

শুনে প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জাহ্নবীর
মুখমণ্ডল, শঙ্করীর একখানা হাত নিজের কোলের উপর
টেনে এনে পান্নালালের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন,
তাতে আর কি দোষ হয়েছে ঠাকুরমশায়? তখন এখানে
থাকলে আমিও ওই কথাই বলতাম।

সহানুভূতির স্পর্শে শঙ্করীর মনে অবরুদ্ধ আবেগ
উদ্বেলিত হয়ে উঠল যেন। সে জাহ্নবীকে প্রায় জড়িয়ে
ধরে বলল, কত সহজে মাতাজী তুমি বুঝলে কথাটা।
আর ইনি? শুনে কী বললেন জান?

স্বামীর দিকে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফিরে
জাহ্নবীর দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করল সে। বলল, ইনি
বললেন যে, যে মেয়ের নাম সীতা সে কেন উর্বশী হবে!

চমকে উঠল তপন; চমক লাগল জাহ্নবীরও।
তাদের দু জোড়া চোখই একসঙ্গেই গিয়ে পড়ল পান্নালালের
মুখের উপর। পাথরের মত কঠিন সে মুখ।

ঘাড় কাত করে স্বীকার করল পান্নালাল। মুখেও সে
বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলেছিলাম; এখনও তাই বলি আমি।

পরক্ষণেই উত্তেজিত হয়ে উঠল পান্নালাল। দৃপ্তভঙ্গিতে
মাথা তুলে বেশ জোর গলায় সে বলল, আমার সীতার
কোন দোষ ছিল না, বাবুজী। মূল দোষ আমার পুত্রের—
কুলাঙ্গার, চণ্ডাল সে।

থেমে থেমে কখনও উত্তেজিত, কখনও করুণ স্বরে সে-
কাহিনীও শোনাল পান্নালাল। কি কুক্ষণেই যে পুত্র
অযোধ্যানাথকে সে চামোলির ইংরেজী স্কুলে পড়তে
দিয়েছিল। তার সব আশায় ছাই দিয়েছে সে পুত্র।
সীতার একেবারে বিপরীত সে। কি বিদ্যা যে সে অর্জন
করছে তা জানে না পান্নালাল, তবে তার অবিদ্যার
সম্ভার নিজের চোখেই দেখছে সে। ব্রাহ্মণোচিত আচার-

আচরণ আর তার নেই। বাবাকে সে সাফ বলে দিয়েছে যে যাজনের কাজ সে কিছুতেই করবে না। সংসারের আর কোন কাজেও লাগে না সে। চাষ-আবাদের কাজ করবে কি, ক্ষেত বা গোয়ালের ধার দিয়েও যায় না অযোধ্যানাথ। বোর্ডিং থেকে বাড়িতে যখন আসে তখন বিজাতীয় সজ্জায় সেজে চোখে চশমা লাগিয়ে কব্জিতে হাত-ঘড়ি বেঁধে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়।

সেই অযোধ্যানাথ একদিন গড়ুরজীকে ভিক্ষা করতে দেখে তাদেরই বাড়ির উঠোনে পান্নালালের সামনে দাঁড়িয়েই তাকে বলেছিল, শরীরটা তো সাধুবাবা, বেশ শক্তই আছে তোমার। তবে ভিক্ষে না করে খেটে খাও না কেন?

পান্নালালের মত সীতাও শুনেছিল সে কথা। তোতা-পাখির মত সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল সে দিনকয়েক পর নিজেদের ক্ষেতে কাজ করতে যাবার পথে মন্দিরের সামনে গড়ুরজীর ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

জেরা করতে করতে সীতার মুখেই পান্নালাল শুনেছিল তার স্বীকারোক্তি, আর গড়ুরজী যে উত্তর দিয়েছিল তাও।

ভাইয়া তো ঠিক কথাই বলেছে তোমাকে সাধুবাবা। তুমি ভিক্ষে না করে কাজ কর না কেন?

কাজ করতে চাইলেই কাজ আমাকে দেবে কে?

আমিই দেব। চল না আমাদের ক্ষেতে ঘাস কাটতে।

মজুরি কী দেবে?

মজুরি আবার কি! খেতে দেব পেট ভরে।

এমনি করেই ধীরে ধীরে গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। ওর পরিণতিটা নিজের চোখে দেখবার পর হয়তো পান্নালাল বন্ধ করতে পারত ওর অগ্রগতি। কিন্তু শঙ্করীর মুখের কথায় তার মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ হয়ে পড়বার পর আর ওকে উপেক্ষা করতে পারে নি সে। পরদিনই গড়ুরজীকে একান্তে ডেকে নিয়ে কর্তৃত্বের কঠোরস্বরে তাকে সে বলেছিল অবিলম্বে ওই এলাকা ছেড়ে যেতে।

বিশ্বাস কর বাবুজী: পান্নালাল সনির্বন্ধকণ্ঠে বলল, উপবীত আমি স্পর্শও করি নি। শুধু মুখে বলেছিলাম যে ত্রিরাত্রি পার হবার পূর্বেই সে যদি চোপতাচটি ছেড়ে না যায় তবে ব্রহ্মশাপ লাগবে তার ওপর।

তারপর বুঝি তৃতীয় রাত্রেই ঘটল সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি। এখন স্বপ্নের মত মনে পড়ে পান্নালালের, আর তখনও স্বপ্নই মনে হয়েছিল তার। ঘুমের মধ্যেই তার কানে গিয়েছিল সংক্ষিপ্ত কথাবার্তাটুকু।

তোমার বাবা আমাকে এ এলাকা ছেড়ে যেতে বলেছে।—যেন গড়ুরজীর কণ্ঠস্বর।

উত্তরে যেন সীতা বলল, তবে চলেই যাও তুমি, সাধুবাবা। আমার বাবা যে রকম রাগী মানুষ!

তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

না, ছি! লোকে মন্দ বলবে।

তবে চলি আমি। ভোর হয়ে এল।

তারপর ভিজে ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে চলার ছপছপ শব্দ যেন। কিন্তু একটু পরেই ছোট্ট তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, ওঃ!

কী হল?—সীতার গলা।

সাপে কাটল বুঝি!—গড়ুরজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা তখন পান্নালালের। গা-মোড়া দিয়েছিল সে। আর সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ ভেঙে গেল তার ঘুম।

সাপ সাপ।—এবার আর অস্ফুট নয়, স্পষ্ট সীতার কণ্ঠ-স্বর। কথা নয়, আর্তনাদ। লাফিয়ে উঠে পড়ল পান্নালাল। ছুটে গিয়ে দেখে যে ঘরের পিছন দিকে সবজিবাগানের আলের উপর পড়ে ছটফট করছে সীতা। গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঁজলা উঠছে, প্রতি অঙ্গে আক্ষেপ—সেই দিন সকালে তপনেরা যেমন দেখেছে প্রায় তেমনি।

সাপে কেটেছে, সাপে কেটেছে সীতাকে—চিৎকার করে বলল পান্নালাল। শুনে শঙ্করী ও প্রতিবেশী যারা ছুটে এল তাদেরও সেই সন্দেহ। কান্নাকাটি পড়ে গেল।

কিন্তু না, ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরে এল সীতার। তখনও অত্যন্ত দুর্বল সে। কিন্তু বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই নেই তার দেহে। তা স্পষ্ট দেখা গেল বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে নীচে যাত্রী-সড়কের উপর নবীন সন্ন্যাসী গড়ুর মহারাজের মৃতদেহে।

ঠিক ওই জায়গাটাতেই বাবুজী: পান্নালাল তার কাহিনী শেষ করল: আজ যেখানে সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল গড়ুর মহারাজের লাশ। সেই থেকে প্রায়ই এমন হচ্ছে সীতার।

একটু থেমে স্বপ্নাবিষ্টের মত পান্নালাল আবার বলল, কারণও আছে। আসক্তি তো ছিলই, তার উপর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, আত্মার তো সদ্‌গতি হয় নি। অতৃপ্ত কামনা নিয়ে তার প্রেতাত্মা এখনও এদিকে বিচরণ করে, সুযোগ পেলেই ভর করে এসে সীতার উপর।

সেই আধা-ডাক্তার জয়ন্ত এতক্ষণ পর কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল, মেয়ের বিয়ে দেন না কেন ঠাকুরমশায়?

বিয়ে!—পান্নালাল যেন প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তারপরেই সশব্দে হেসে উঠল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসতে হাসতে সে বলল, কে বিয়ে করবে ওকে! এই পাহাড়ের দেশে শক্ত মেহনত করতে না পারলে কি মেয়ের বিয়ে হয়! সীতা খোঁড়া বলেই তো সময়মত ওর বিয়ে হয় নি। তার উপর এই কলঙ্ক।

জয়ন্ত নির্বাক, আর সকলেও তাই। সীতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

—

সঙ্গ বিহঙ্গ : বাণী রায়। মুখার্জী বুক হাউস, ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সাড়ে তিন টাকা।

-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখিকা বাণী নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' দেশ ও বিদেশের বিখ্যাত লেখকদের র্নি ও তাঁদের রচনার সরস আলোচনা। ভূমিকায় বলেছেন, "লেখকদের 'Profiles' জাতীয় রচনার করেছি। Profile মানে পাশ থেকে মুখের সীমানা-খা, সম্পূর্ণ দর্শন নয়। অতএব সম্পূর্ণ বিচার নয়, টি ছবি আঁকা। সাহিত্যবিচারে আমি ্যককে জড়িত করে Profile-এর প্রথায় নতুন বাংলায় আনবার চেষ্টা করছি।"

প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। জনপ্রিয় দর জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা, তাঁদের শিল্পীমনের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে এমন কাব্যময় ও বিদগ্ধ চনা কেউ করেছেন বলে মনে পড়ছে না।

ন্ধগুলিকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ধ্যায়ে তিনি কবি জীবনানন্দ থেকে শুরু করে লাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, । দেবী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মানিক াধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল ইত্যাদি প্রখ্যাত দর ব্যক্তিগত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের রচনার করেছেন।

ল্পী তাঁর সৃষ্টির ভেতরে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ কখনও পারেন না; তাঁর মনের নেপথ্যে এমন চিন্তার প্রবাহ বয়ে চলেছে যা তাঁর রচনায় হয়তো নই প্রতিফলিত হয় না। লেখকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও নিবিড় আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়েই তাঁর র্শন ও সাহিত্যের বক্তব্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট ঠে। কবি জীবনানন্দ জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মানকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে মনে করতেন; ইংরেজী গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কন্টিনেন্টাল গল্প-উপন্যাস বেশী পছন্দ করতেন। জনপ্রিয় কবির সম্বন্ধে এই তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু কবির টমাস মান-প্রীতির খবর জানার পরই মনে হয়, সুদূর স্বপ্নচারী কবি জীবনানন্দের ভাল তো লাগবেই—শিল্পীসত্তায় জন্মরোমান্টিক, তত্ত্বাশ্রয়ী ও রূপকধর্মী লেখক টমাস মানকে। প্রশংসায়-নিন্দায় অবিচল ও আত্মমগ্ন এই সাধকের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণের মাধ্যমে তাঁর কবিসত্তার উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন লেখিকা।

মোহিতলাল মজুমদার-সম্পর্কিত প্রবন্ধে তিনি অভাবে শোকে জর্জরিত রুক্ষভাষী কবির কথা যেমন নিবিড় বেদনার সঙ্গে বলেছেন তেমনি আবেগমুখর ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর অপরাজেয় কবিসত্তার ইতিবৃত্ত। দেশব্যাপী দুর্নীতি ও সাহিত্যে নানাবিধ ব্যভিচারে ক্লিষ্ট কবি যখন কবিতার খাতা খুললেন, তখনই তাঁর মুখের চেহারা যেন বদলে গেল। জানলার বাইরে উজ্জ্বল রাত্রির দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বাতাবি লেবুর মিষ্টি গন্ধে ভারী বাতাসে বুক ভরে আঘ্রাণ নিয়ে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

> আমারে তোমরা ভুলে যেও ভাই
> এসেছিনু পথভুলে।
> পান করিবারে জাহ্নবী বারি
> কীর্তিনাশার কূলে।

'জলকল্লোলে'র প্রবোধকুমার সান্যাল, 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ, 'রাণু'র মেজকা বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির জীবনেরও নানা টুকরো টুকরো ঘটনা লেখিকার শক্তিশালী লেখনীর প্রভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিধর্মী কোন শিল্পী যদি

জীবনীকার হন, তা হলে সে জীবনী কত প্রাণবন্ত হতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাস-লেখক ষ্টিফেন জাইগের লেখা 'Three Master's (Dickens, Balzac Dostoevosky-র জীবনী ও সাহিত্যের আলোচনা)।

হাতকাটা সার্ট, পায়ে কেডস, হাতে একখানা গাছের ডাল, ধূলিধূসরিত বিভূতিভূষণের তাদের বাড়ির বারান্দায় এসে ধপ করে বসে পড়া, কোন তরুণীর স্বামী নন, সন্তানের পিতা নন অথচ শিশুর মনস্তত্ত্বে ও দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার নিপুণ শিল্পী বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের মনের বিশ্লেষণে, রাজনীতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া 'পদ্মানদীর মাঝি'র সত্যসন্ধানী স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ইতিবৃত্তে, 'প্রিয় বান্ধবী' ও 'মহাপ্রস্থানের পথে'র শক্তিমান শিল্পীর 'শ্যামলীর স্বপ্নে'র এবং 'বনহংসী'র অপরিণত জীবনবোধের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া ও 'মন্ত্রশক্তি'র উদ্গাতা অনুরূপা দেবীর শুচিস্নিগ্ধ কঠোর জীবনাদর্শ এবং অতীত ঐতিহ্যবাহী মনের বিবরণে লেখিকার অন্তরের আবেগ, ছন্দময় ভাষার মাধুর্য যুক্ত হয়ে মৌলিক রচনার স্বাদ এনে দিয়েছে। তাই ছোট ছোট এই নিবন্ধগুলি পড়তে পড়তে বারে বারেই আমার মনে হয়েছে বাণী রায় মূলতঃ গল্প ও উপন্যাস লেখিকা বলেই লেখকদের প্রোফাইল রচনা এমন সার্থক হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখিকা বিদেশের লেখক-লেখিকাদের জীবনের প্রেমকে উপজীব্য করেই তাঁদের রচনার ও স্বভাবের নানা বৈচিত্র্যের আলোচনা করেছেন। এ কথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁদের রচনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিদেশী অধিকাংশ সাহিত্যিকের জীবনের নানা চমকপ্রদ বৈচিত্র্যের ছাপ রয়েছে তাঁদের রচনায় এবং অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যকে তাঁদের জীবন থেকে আলাদা করে ভাবাই যায় না। তাই বাণী রায় আলোচ্য লেখক-লেখিকাদের ব্যর্থ প্রেমকে কেন্দ্র করে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তাতে তাঁদের জীবনবোধ ও সাহিত্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। আমার বিশ্বাস 'Sonnets of death' পড়ে আমেরিকার দুঃখবাদী মহিলা-কবি গাব্রিয়েলা মিষ্ট্রালের কবিমনের যে পরিচয় পাওয়া যাবে তার চেয়ে অনেক বেশী জানা যাবে মিষ্ট্রালের শোকার্ত ও আশাহত জীবনের তথ্য সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে। ঠিক এই রকমই জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের যুগের অন্যতম কবি, সাদের বিষাদস্নিগ্ধ প্রেমের করুণ কাব্য Thalaba লেখার প্রেরণার উৎস ক্যারোলিনের প্রতি তাঁর অন্তহীন ভালবাসা। চার্লস ডিকেন্স, ল্যাম্ব, কনগ্রীভ, গ্যেটে ও উইলিয়ম হ্যাজলিট ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের বিচিত্র জীবন ও তাঁদের রচনার চিত্তাকর্ষক ও কাব্যময় বিশ্লেষণ করেছেন লেখিকা। দিকপাল এইসব সাহিত্যিকের জীবনের নানা ঘটনা ও তাঁদের রচনাবৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা ছোট ছোট এই নকশাগুলো পড়লে তাঁদের জীবনী ও সাহিত্য পাঠের জন্য পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই আগ্রহ হবে। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর নতুন আঙ্গিকে সাহিত্যিকদের প্রোফাইল রচনার সার্থকতা এইখানে। আশা করি এই ধরনের আরও লেখা তাঁর কাছ থেকে পাব।

বইটির ছাপা বেশ ঝরঝরে। কিন্তু প্রচ্ছদপটের ছবিটি বিষয়বস্তুর তুলনায় খুবই হালকা।

সুভাষ সমাজদার

এক অঙ্গে এত রূপ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নাভানা। তিন টাকা।

চিররূপা। সন্তোষকুমার ঘোষ। নাভানা। তিন টাকা।

মেলন বক্তৃতামালায় মারিতঁ্যা বলেছিলেন, প্রজ্ঞার ভূমিকায় মননের ক্রিয়াকর্ম থেকেই কবিতার জন্ম। কথাটা ছোটগল্পের, বিশেষতঃ গীতিধর্মী ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বহুলাংশে প্রযোজ্য।

অথচ সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের, বিশেষত বাংলা উপন্যাসের নিশ্চিন্ত লেখককুল হৃদয়ের কারবারে যতটা উৎসাহী, মননের চর্চায় ততটাই পরাঙ্মুখ। মননের মূলধন না থাকলে হৃদয়ের কারবার যে অচিরাৎ ফেল মারে, এ কঠিন সারাৎসার এখনও তাঁদের অনুপলব্ধ মনে হয়। ফলতঃ, বাংলা কথাসাহিত্যের শতকরা ন[illegible] ভাগ রচনা যদি কোনও শিক্ষিত মননশীল ব্যক্তি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য বলে মনে করেন, তবে পাঠক হিসাবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? বাংলা উপন্যাসের ভূগোল বাড়ছে, বিষয়বৈচিত্র্যে বাংলা উপন্যাস মনোজ্ঞ হয়ে উঠছে, এ ধরনের কিছু আত্মপ্রসন্ন উক্তি অধুনাতন সাহিত্যের বাজারে শোনা যায়, কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্যের মনোহারিত্ব সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস যে এখনও মূলতঃ অগভীর রমণীমোহন রচনার পর্যায়েই অবস্থিত, এ সত্য অস্বীকার করি কী করে?

এই ধরনের আর একটি আত্মপ্রসন্ন উক্তি শুনি বাংলা ছোটগল্প ও কবিতা-প্রসঙ্গে। বাংলা ছোটগল্প ও কবিতা নাকি পূর্ণতার সামীপ্য লাভ করেছে, সাহিত্যের ও-দুটি বিভাগে নাকি নতুনতর সৃষ্টির অবকাশ অনুপস্থিত। এর উত্তরে এটুকুই বলা বোধ করি যথেষ্ট যে সাহিত্যে শেষ নাই;—যে শেষ কথা কে বলবে! নতুন প্রতিভার আবির্ভাবে ও-দুটি বিভাগেই যখন নতুন ফসল ফলতে শুরু করবে, তখন আজকের রায় নতুন করে পালটাতে হবে।

। কথা; বাংলা কবিতা ও ছোটগল্প মোটামুটি-টা প্রীতিকর শিল্পসিদ্ধির সান্নিধ্য লাভ করেছে, ছোটগল্পকারগণ নতুন কিছু ভাবতে পারছেন না দের মনে হচ্ছে নতুন কিছু করার নেই। কিংবা তাঁরা কিছু ভাবছেন না বলেই কিছু করতে না, ভাবের ও ভাবনার ঘরে ঘাটতি আছে দের পক্ষে মহৎ কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। নকে যত বড় মনে করেন, জীবন তার চেয়েও ড়—সে জীবন ভৌগোলিক পরিধিকে ছাড়িয়ে আকাশকে ছুঁয়ে আছে, চোখের দেখায় তাকে া যায় না, তাকে পেতে হ'লে দেখার চোখ ই।

সেই দেখার চোখ থাকলে জীবনের নানা াদ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, দৈনন্দিনের অজস্র চিত্র তর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়, ভৌগোলিক বা চত্র্যের মনোরঞ্জনী প্রলেপ তখন অনাবশ্যক হয়ে এই দেখবার চোখ ও সেই সঙ্গে ভাববার মন য কী আশ্চর্য স্মরণীয় গল্প সৃষ্টি করা যায়, বাংলা তার মহত্তম প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ।

ন্দ্রনাথের পরে একক লেখনীর না হলেও বিভিন্ন াক্ষিণ্যে কিছু কিছু অনিন্দ্য ছোটগল্পের সাক্ষাৎ পেয়েছি। রবীন্দ্র-শাসিত সময়-সীমাতেই র প্রবীণ-প্রতিষ্ঠ অনেক লেখক স্মরণযোগ্য গল্প রে খ্যাতি-চিহ্নিত হয়েছিলেন। এই প্রবীণ-লের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ন্ত্যকুমার নিঃসন্দেহেই আধুনিক বাংলা ছোট-দের মধ্যে অগ্রণী এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে বীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে ছোটগল্প বলার (ভিন্ন ভাষায়) আর্টে তাঁর তুল্য শিল্পী দু-একজনের বেশী নেই। প্রতিকতম গল্পসংগ্রহ 'এক অঙ্গে এত রূপ' গ্রন্থে এ র একবার সপ্রমাণ হল।

তঃই, এই গ্রন্থ নারী ও পুরুষের চিরায়ত সম্পর্কের টা বিচিত্র তারের ঝঙ্কারে ব্যঞ্জিত। যাদের মনের দেবতারাও পান না, বিচিত্ররূপিণী সেই নারীদের একটু ব্যাপকভাবে তাদের জীবনের কয়েকটি দিগন্ত । করেছেন অচিন্ত্যকুমার। ফলতঃ, একটি স্থায়ী সুরের সূত্রে গ্রথিত সাতটি গল্পের মাধ্যমে বর্তমান সংগ্রহের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

সাতটি গল্পের সাতটি নায়িকা রমলা, তোষিণী, পূরবী, কেতকী, সুকণ্ঠী, দেবলা, মহুয়া—চিরন্তন নারীত্বের প্রতিনিধি। কিন্তু চরিত্রে, বৈশিষ্ট্যে, মনোভঙ্গীতে একের সঙ্গে অন্যের কত তফাত; একই সূর্যালোক যেমন সাতটি রঙে বিশিষ্ট হয়ে ধরা পড়ে বিজ্ঞানীর ত্রিশির কাঁচে, তেমনি একই নারীত্ব বিভিন্ন রূপে বিভাসিত হয় দৃষ্টিমান গল্পকারের বিশ্লেষী কলমে। সে নারীত্ব কোথাও ছলনাময়ী, কোথাও শান্তিময় নীড়-সন্ধানী, কোথাও-বা প্রেমে মহিমময়ী।

কিন্তু সেই রূপের একটি বড় অংশ জ্যোৎস্নানিভ, যে জ্যোৎস্নার পেছনে আছে সূর্যের অকৃপণ দান। সে সূর্য কী? প্রেম, ভালবাসা সেই সূর্য। হতে পারে প্রেমের কিছুটা দৈব আর কিছুটা জৈব। কিন্তু দৈব কি শেষ পর্যন্ত জৈবকে ছাড়িয়ে যায় না?

'এক অঙ্গে এত রূপ' পড়লে তাই মনে হয়, প্রেমের জৈব দিকটা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি কঠিন-সুন্দর সত্য তার দৈব অর্থাৎ বিশুদ্ধ মহত্তর দিক। জৈবের অধীন ভালবাসা বা পারস্পরিক আকর্ষণ স্বল্পায়ু, তার স্মৃতিও ক্ষণিকের। মহুয়া-অমলেশের পারস্পরিক আকর্ষণের মূলেও ছিল তারুণ্যের উন্মাদনা—যে উন্মাদনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। বিজ্ঞানমনস্ক সোমনাথ তাই মহুয়াকে ভুল বোঝে নি, স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিল মহুয়ার পূর্ব প্রণয়।

কিন্তু শতেক উন্মাদনা সত্ত্বেও প্রেম যেখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, বিশুদ্ধতায় মহনীয়, সেখানে সে কালজয়ী। অমলেশ আদ্যন্ত ভালবেসেছিল মহুয়াকে, তার প্রেমে খাদ ছিল না, প্রেমের জন্যই সে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। অমলেশের মৃত্যুর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তার প্রেমের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু মৃত্যুহীন কান্নায় সে প্রেম চিরঞ্জীব হয়ে থাকে যার মনে, সে মহুয়া। তাই: 'সোমনাথের মনে হ'ল সবই মরে। দিন মরে রাত মরে রূপ মরে যৌবন মরে কাম মরে প্রেম মরে, কিন্তু কান্না মরে না।'

না, কান্না মরে না; কান্নাই বোধ হয় সকল প্রেমের শেষ ফল। প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক জীবনাহুতি দিলে

যে কান্না জন্ম নেয়, তার সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই সেই কান্নার যে-কান্না কাঁদে মানুষ তার নিজের জন্য। এবং এও তো লোকায়ত প্রেমেরই প্রকরণবিশেষ। মানুষ মাত্রেই যে মূলতঃ নার্সিসিস্ট, এ তো বৈজ্ঞানিক সত্য। এবং নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রেমিক ও প্রেমিকার পরস্পরের চিরন্তন অভীপ্সাই কি সিদ্ধ হয় না? "শোক" নামীয় গল্পে তারই সাক্ষ্য মেলে।

"শোক" গল্পের রচয়িতা অচিন্ত্যকুমার নন, তাঁর চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ কথাশিল্পী সন্তোষকুমার ঘোষ। 'চিররূপা' নামে গল্পসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত "শোক" আমার মতে, সন্তোষকুমারের লেখা গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম, হয়তো-বা সর্বশ্রেষ্ঠ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী-কুশলী কথাকার অচিন্ত্যকুমারও হয়তো এই গল্পটির স্বয়ং-প্রকাশ হার্দ্যগুণে ঈর্ষান্বিত বোধ করবেন।

"শোক" গল্পের উপাদান সামান্য। জরাগ্রস্ত এক মহিলার সন্তানেরা তাঁর সমবয়সী নিত্যসঙ্গী সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যু গোপন করে। পরে বৃদ্ধা জানতে পেরে কাঁদতে থাকেন। তাঁর 'সে-কান্না শুধু বিচ্ছেদের শোকে নয়। সেই বয়সে প্রতিটি সমবয়সীর মরণ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদেরও যাবার দিন এল ব'লে। পরের পালা তারও হ'তে পারে।' তাই তিনি বলেন, 'আমার ছেলে, ছেলের বউ ভুল বুঝেছে। ভাবছে আমি কাঁদছি সিতেশ ঠাকুরপোর শোকে। তা তো নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই মৃত্যু-শোকে।'

'এক অঙ্গে এত রূপ'-এর মত 'চিররূপা'র গল্পগুলিও নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের, একটু অন্যভাবে প্রেম ও ভালবাসার ভিত্তিতে রচিত। এদিক থেকে 'চিররূপা'র গল্পগুলির মধ্যেও একটা সুরের ঐক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, বক্ষ্যমাণ সংগ্রহের গল্পগুলিতে প্রেমের প্রকাশ একটু সূক্ষ্ম, একটু নীরব, অনুচ্চ; অন্যভাবে বলা যায়, এই সব গল্পে প্রেম একটু জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে, অচিন্ত্যকুমারের তুলনায় সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পগুলি কম ঘটনাপ্রধান, সম্বিৎ-প্রবাহের পটভূমিকায় ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণই গল্পগুলিতে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

অর্থাৎ সন্তোষকুমার অন্তর্মুখী লেখক, গল্পের পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এবং এই কারণেই উত্তমপুরুষে তিনি অধিকাংশ গল্প রচনা করেছেন। আর এই কারণে খুঁটিনাটি ডিটেলস-বিষয়ে তিনি সচেতন।

প্রেমের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ সন্তোষকুমারের গল্পেও পরিলক্ষিত হয়। এখানেও নারীর বিভিন্নরূপ—"মনসিজা"র নায়িকা, "নেপথ্য"র মল্লিকা ও অতসী, "কোন কুলবধূর কথা"র কুলবধূ, "জীয়নকাঠি"র মণিকা ও প্রীতিলতা একই নারীর বিভিন্ন রূপ। তাদের প্রেম কোথাও গোপন, কোথাও স্বপ্রকাশ, কোথাও বৈধ, কোথাও অবৈধ। মানুষ ও মানুষীর চিরন্তন হৃদয়ানুভূতির প্রকাশে কত জটিল বৈষম্য! ধরা যাক মল্লিকা নয়নমোহনের কথা। মল্লিকা ও নয়নমোহনের আকর্ষণের ভিত্তি বৈধ ছিল না, নয়নমোহনের স্ত্রী অতসী তাদের দুজনের মাঝখানে যে ব্যবধান রচনা করেছিল, সে ব্যবধান সরে যাওয়ার পরেও মল্লিকা ও নয়নমোহনের মিলন সম্ভব হল না। স্বামীর প্রতি অতসীর "অটল বিশ্বাসটুকু" কঠোর সতর্ক পাহারার জন্যই কি প্রেমের মর্যাদা অক্ষুন্ন অটুট রাখতে পেরেছিল? অতসীর স্মৃতি অতসীর আত্মিক উপস্থিতিই কি নয়নমোহনের কামনাকে প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে নয়নমোহনকে নবজন্ম দেয় নি?

প্রেম ও ভালবাসার এই ধরনের প্রকাশ দেখি 'চিররূপা'র গল্পগুলিতে। গল্পগুলি সুলিখিত, অর্থাৎ গঠন-কারুতায় বা গ্রন্থন-চারুতায় গল্পগুলি মর্মস্পর্শী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, অচিন্ত্যকুমারের মত সন্তোষকুমার ঘোষও কুশলী কথাশিল্পী, ছোটগল্প বলার আর্টে তাঁর দক্ষতা আছে। পাত্র-পাত্রীর মনের ছবি তিনি একেবারে সোজাসুজি পাঠকের মনের দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে পারেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও সন্তোষকুমার ঘোষ প্রায় দুই দশকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে প্রবীণ ও তরুণ দুই ছোটগল্প রচয়িতা—তাঁদের সাম্প্রতিকতম দুটি গল্প-সংগ্রহের মাধ্যমে কোনরূপ বহিরাঙ্গিক বৈচিত্র্যের আশ্রয় না নিয়ে নর-নারীর চিরন্তন সম্পর্কের বিচিত্রবর্ণিল অনুভাবনা প্রকাশে যে সহজ ও হার্দ্য কথনকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহেই যে-কোনও ছোটগল্প-লোভীর প্রশংসা উদ্রেক করবে। তাঁদের দুজনেরই গল্পসংগ্রহে হৃদয়-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মনন-চর্চাও পরিলক্ষিত হয়। মননের মূলধন ছাড়া হৃদয়ের কারবার বেশীদিন টেঁকে না—এ সার সত্যোপলব্ধি প্রবীণ অচিন্ত্যকুমারের কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও তরুণ সন্তোষকুমারের পক্ষে নিঃসন্দেহেই শ্লাঘনীয় বলে পরিগণ্য।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৫-২৮৩৮

৩২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
পৌষ, ১৩৬৬
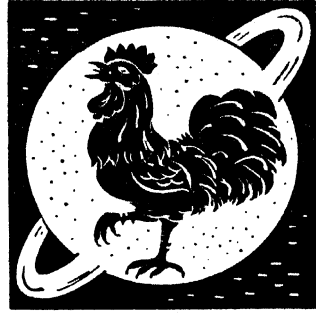
সংবাদ-সাহিত্য

সংবাদ-সাহিত্য" নয়, সাহিত্য-সংবাদ

মাসে আমাদের আর "সংবাদ-সাহিত্য" হাতড়াইয়া রিতে হয় নাই, সাহিত্য-সংবাদই এত প্রচুর ছে যে আমরা হালকা মনে তাহাই পরিবেশন কর্তব্য সমাধা করিতেছি।

ম সংবাদ দুইটি বৈদেশিক—একটি বিশেষ আনন্দের, অতিশয় শোকের সংবাদ। ইতালির কবি তার কোয়াসিমোদো ১৯৫৯ সনের জন্য সাহিত্যে পুরস্কার পাইলেন। ইনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ১৯০১ সনে সিসিলির এক ক্ষুদ্র শহর, মোদিকায় ণ করেন। কুড়ি বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে উত্তরমুখী তিনি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টির প্রত্যাশায় শহরে ঘর বাঁধিয়া সরস্বতীর সেবায় আত্মনিয়োগ লেখাপড়া মোটামুটি নিজের চেষ্টাতেই শিখিয়া-। শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্—সাহিত্য-ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র এবং এই মন্ত্রই তাঁহাকে ল্পসংখ্যক ইউরোপীয় কবিদের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত ছ। তিনি বর্তমানে মিলান মিউজিক অ্যাকাডেমির ্যর-ইতিহাস-অধ্যাপক। তিনি প্রধানতঃ গীতি-কিন্তু তাঁহার রচনা ভূরিপরিমাণ নহে। তাঁহার ই সুবিতো সেরা" পর্যায়ের কবিতাগুলিই তাঁহাকে ্র রাতারাতি বিশ্বখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে। "The came in acknowledgement of his l poetry which with classical fire and ation expresses the tragic experience of life in our own times." ('Bi-Peninsular Magazine' December, 1959) অর্থাৎ কোয়াসিমোদো কবিধর্মে টি. এস. এলিয়টের সমগোত্রজ, Waste Land ও Hollow Man-এর কবি।

তাঁহাকে যে মাতৃঅঙ্কচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে তজ্জন্য কবির মনে একটা গভীর বেদনা আছে। এই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার "Lettera Alla Madre" "মাকে লেখা চিঠি" কবিতাটিতে। কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাংলা ভাবানুবাদ এই—

মাকে লেখা চিঠি

মধুরভাষিণী মাগো, নামে ওই কুয়াশার জাল,
খালে ভয়ত্রস্ত পোত সঘনে আঘাত হানে পাড়ে ;
উদ্বেল জলের ঢেউয়ে গাছপালা হতেছে নাকাল,
পুড়িছে তুষারপাতে। আমি এ উত্তরে দুঃখভারে
নহি তো কাতর মোটে, তবু চিত্তে শান্তি নাই মোর।
কারো ক্ষমাপ্রার্থী নই, বহু জনে দিয়েছি বেদনা,
জমিয়াছে বহু অশ্রু-ঋণ। জানি, মাগো মনে তোর
সুখ নাই ; সব কবি-জননীর মত দিন গনা
ভাগ্য তব দারিদ্র্যের মাঝে, যত মাতৃক্রোড়হারা
সন্তানেরে ভালবেসে। আজ আমি লিখি তোরে চিঠি—
একদা নিশীথরাতে যে বালক হ'ল দেশছাড়া
খাটো কোট গায়ে, নিয়ে পকেটে কবিতা দু'চারিটি,
ব্যাকুল ভাবের বশে যে দুর্ভাগা ছুটিল সে দিন
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, সে তোমারে জানায় প্রণতি।

স্পষ্ট মনে পড়ে সেই ইমারা নদীর তীরলীন
বন্দরের ঘাটে আনে মালবাহী ট্রেন শ্লথগতি
বাদাম-কমলালেবু, ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে ম্যাগপাই,
সাগরের লোনা গন্ধে ইউক্যালিপটাস-গন্ধ ভাসে—
আজ এতকাল পরে কৃতজ্ঞতা তোমারে জানাই
নীরবে সহিতে সবি শিখেছিনু তোমার সকাশে।
সব-সহা হাসি তব মোরে দিয়ে বাঁচায়েছ তুমি
কান্না আর দুঃখ হতে; এক বিন্দু অশ্রু আজ তাই
তোরে নিবেদন করি দুঃখিনী জননী জন্মভূমি,
মোর আশাপথ চেয়ে আছে যারা—তাদেরো জানাই।

ওগো সহৃদয় মৃত্যু, স্পর্শ তুমি করো না সহসা
দেয়ালে রান্নার ঘরে যে ঘড়ি চলেছে টিক্ টিক্—
কেটেছে শৈশব মোর দেখে সেই এনামেল-খসা
মুখখানি, মুছে গেছে তবু আছে ফুল-আঁকা ঠিক।
করো না ও কাঁটা বন্ধ, জরাজীর্ণ হৃদয়-স্পন্দন
হঠাৎ করো না স্তব্ধ। হায়, মৃত্যু দেয় না উত্তর!
করুণার মৃত্যু হবে, তার সাথে লজ্জার মরণ?
মধুরভাষিণী মাগো, বিদায় জানাই এর পর॥

দ্বিতীয় শোকাবহ বৈদেশিক সংবাদটিও একজন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী কথাসাহিত্যিক-সংক্রান্ত। প্যারিসের গত ৪ঠা জানুয়ারির রয়টারের সংবাদে প্রকাশ—"নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী গ্রন্থকার অ্যালবার্ট কামু (Camus) আজ প্যারিসের দক্ষিণ-পূর্বস্থিত সেন্‌সের নিকট একটি মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।" কামু ১৯৫৭ সনে নোবেল-পুরস্কার পান—"for his important literary work, which with clear-sighted earnestness, illumines the problems of human conscience in our time." দুইটি মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় ফ্রান্সের একদল সাহিত্যিকের মধ্যে এক্সিস্টেন্‌সিয়ালিজ্‌ম্‌-নামক যে নব সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব হয় কামু সেই দলভুক্ত ছিলেন। প্যারিস হইতে প্রকাশিত বামপন্থী 'কম্‌ব্যাট' (Combat) পত্রিকা পরিচালনায় জাঁ-পল সার্তরে ও মাদাম সিমোন দ্য বোভুয়ার সঙ্গে কামুও যুক্ত ছিলেন। উপন্যাস ও নাটক রচনাতেই তাঁহার বিশেষ স্ফূর্তি ছিল। 'দি প্লেগ' উপন্যাস তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। কামুর অপঘাত-মৃত্যু পৃথিবীর সাহিত্য-জগতের নিদারুণ ক্ষতি সাধন করিল।

বাঙালী "সাহিত্যামোদী"দের পৌষ মাস

জীবিত কাহারও সর্বনাশ না ঘটাইয়া যে পৌষমাসের আনন্দ উপভোগ করা যায় রথদর্শনেচ্ছু কলাবেচা বাঙালী সাহিত্যামোদীরা তাহা ইদানীং প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন; সিঙ্গলফেয়ার ডবলজানি সাহিত্য-সম্মেলন-তীর্থে যাত্রী-সমাগমের ভিড় দেখিয়া তাই আনন্দই হয়। হুতোম প্যাঁচার আমল হইতেই বেওয়ারিশ বাংলাসাহিত্য আজও পর্যন্ত ময়দার তালের পর্যায়েই আছে—যে যখন খুশি হাতের সুখে তালটাকে ঠাসিয়া-ঠুসিয়া গেলেও আপত্তি করিবার কিছুই নাই। সুতরাং বাৎসরিক পৌষ-পার্বণে তাহার অধিকতর সর্বনাশের আশঙ্কা নাই। আশা ও আনন্দের কথা এই যে, ময়দার তালটা মাত্র এক হাতেই দীর্ঘকাল ধরিয়া ঠাসিত হইয়া আসিতেছে। এক হাতে চালিত মোটর গাড়ির মত বাংলাসাহিত্য তাই নিরাপদেই আছে মনে করিতে হইবে—একা রাবণ রাজার বন্দিনী অশোক বনে সীতার মত অন্য দিঙ্‌নাগেরও রূঢ় হস্তাবলেপে লাঞ্ছিত হইবার ভয় আপাততঃ নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্যের নাই।

বিগত ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর—এবার এ তিনদিনব্যাপী অধিবেশন বসিয়াছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য-নিকেতন বাঙ্গালোরে। অতীতে কোনও কালে এই নগরী বাঙ্গালার ওর বা শেষ প্রান্ত ছিল কিনা জানি না; গোপালদা সম্মেলন-প্রাক্কালে বাঙ্গালোর-প্রবাসী বঙ্গ-ভাষীদের উদ্দেশে যে কবিতাটি প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি "বাঙ্গালার প্রান্ত" অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কবিতাটি এই—

বাঙ্গালার অন্তে বসি কর সেবা বঙ্গভারতীর—
আমিও সেবক এক, প্রাণ খুলে করি আশীর্বাদ।
মাতৃক্রোড়-ছিন্ন তবু ভালবাসা যাদের গভীর
দূরে থেকে নিত্য তারা লভে জানি মায়ের প্রসাদ।
মানুষ যেখানে থাক্, উৎস তার প্রাণতটিনীর
না রহিলে মাতৃভাষা, ঘটে তার বিষম প্রমাদ।
জননীর স্তন্যে শিশু পায় যথা জীবন-রুধির—
মাতৃভাষা-সাহিত্যেও ঘুচে তথা সর্ব অবসাদ।

ায়সেবায় জেনো, ঘটে নিত্য আত্মার বিকাশ,
ও জাতির উর্ধ্বে চিরন্তন মানুষের স্থান।
দেশ-নিরপেক্ষ মানুষের শাশ্বত-আবাস
করিয়া দেয়—সাহিত্যের সেই শ্রেষ্ঠ দান।
ানন এনে দিক সীমাহীন জগৎ-আভাস,
় মহৎ করি, দিক পরমাত্মার সন্ধান॥

সাহিত্য

ালদার কবিতার সুরের সঙ্গে সম্মেলনের মূল শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তীর সুরের মিল ঘটিয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, দিবাকর সকলেই ছিলেন, প্রেম-দাক্ষিণ্য ালের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল কিন্তু দক্ষের ালিকাবহির্ভূত যজ্ঞনাশী ফণিভূষণ ভোলানাথই ্য-সতীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। র্ঘকাল, গণেশ উলটাইয়া নাম পরিবর্তনের আগে এই কোম্পানির কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া , কিন্তু মূল সভাপতির মুখে ইতিপূর্বে কখনই রগর্ভ সাহিত্যকথা শুনি নাই—যদিও তিনি ্ই বলিয়া অযোগ্য প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন— ক নিজের চিঠিপত্রে ছাড়া জীবনে কখনও ংলা লেখে নি, সে গিয়ে নিখিল ভারত বঙ্গ-সম্মেলনের সাধারণ সভাপতির আসনে া" করিলে নিশ্চয়ই গমিষ্যতি উপহাস্যতাম্। "সাহিত্যামোদী" শব্দটাও তাঁহারই প্রয়োগ। উপলব্ধি সম্পর্কে তিনি একটু ব্যক্তিগত ভূমিকা ।—

। জীবনে সাহিত্যের কি রূপ দেখেছিলাম, তা লে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে একটু ফিরে । আমার সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ীবনে এবং সে ঘটনা রবীন্দ্র-কাব্য আবিষ্কার। াম ছেড়ে সহরে পড়তে যাওয়ার আগেই ত 'গোরা' উপন্যাসের প্রকাশ সম্পূর্ণ হ'য়ে এবং কিছু বুঝি বা না বুঝি, সেই অপূর্ব রচনাটি ৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিলনা। ত তাঁর অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হ'ত, কেন যে কবিতা প্রায় নয়, এবং পূর্ববর্তী 'প্রদীপে'ও 'সময় হয়েচে নিকট, এবার বাধন ছিঁড়িতে হবে', 'প্রিয়তম আমি তোমারেই ভালো বেসেছি, দয়া ক'রে কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা' ইত্যাদি অল্প কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে রচিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিতাগুলিও দেখবার কোন সুযোগ না হওয়াতে রবীন্দ্র কাব্য প্রায় আমার অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু স্কুলে তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে ওঠ্‌বার সময় চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত 'চয়নিকা'র এক খণ্ড পুরস্কার পেয়ে অকস্মাৎ যেন অযুতমণিমাণিক্যখচিত এক বিচিত্র মায়াপুরীর অপরূপ-দীপ্তিতে একেবারে দিশাহারা হ'য়ে গেলাম। টি, এস্, এলিয়টের গদ্যরচনার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা স্মরণ করবেন যে চৌদ্দবৎসর বয়সে হঠাৎ ফিটজেরাল্ডের অনূদিত 'রুবিয়াৎ' এবং টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ হাতে পড়াতে কিভাবে যে তাঁর কিশোরমনে রূপরসগন্ধের একটা উদ্দাম উৎসব আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা তিনি একাধিক স্থানে দিয়েচেন এবং মন্তব্য করেচেন যে বালকই হোক্, বৃদ্ধই হোক্, অপরিণত মন নিয়ে যদি কোন শক্তিশালী লেখকের লেখা কেউ পড়ে, তাহ'লে সেই লেখার প্রভাব তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং তারপর সে যখন যে লেখকের লেখা পড়ে, তখন একমাত্র সেই লেখকই তার সমগ্র চিত্ত অধিকার ক'রে থাকেন। মোটামুটিভাবে কথাটা খুবই সত্য, তবে এইটুকু বিকল্পের কথা যোগ ক'রে দেওয়া সঙ্গত মনে করি যে রবীন্দ্রনাথের মত শক্তিশালী লেখকের লেখা যদি একবার কারো চিত্ত অধিকার করে, তবে তারপর আর আর সহস্র লেখকের লেখার সহিত সংঘাতেও সে তার অধিকার থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হয়না। আমার ক্ষেত্রে যে হয়নি তা আমি জানি।...

যে সময়টার কথা বলচি, সেটা বাংলা সাহিত্যেরও একটা স্বচ্ছন্দ পরিপূর্ণতার যুগ। রবি মধ্যগগনে স্থির হ'য়ে আছেন এবং দ্যুতিতে শুধু বাংলা দেশ নয়, সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত ক'রে ফেলেও তার কিরণ বিকিরণের শেষ নেই। শরৎচন্দ্রও কৌমুদীজাল বিস্তার করতে আরম্ভ করেচেন, প্রখর সূর্যালোকের সম্মুখে প'ড়েও তাঁর চন্দ্রালোক নিষ্প্রভ নয়। সত্যেন্দ্রনাথের বিচিত্র বীণায়

অহরহ ঝঙ্কার উঠচে এবং আরো অনেক যন্ত্রী এসে নানা রাগিণীতে স্বর তুলেচেন "অনেক যন্ত্র আনি"। সে যেন এক মহামহোৎসব। আর যুগের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েচে কৃষ্ণবর্ণতালপত্রলাঞ্ছিত সবুজ মলাটের অঙ্কধৃত হ'য়ে এক পরম বিস্ময়—'সবুজপত্র'। তার মর্মরধ্বনিতে অশান্ত যৌবনের জয়সঙ্গীত শুনে বাংলার মন প্রথমে চমকিত হ'য়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সঙ্গীতের গভীরতর সুরটা অন্তরে প্রবেশ করাতে সে শান্ত হ'য়ে যায় এবং পরে নবাগত পত্রিকাটির দিকে ভালো ক'রে দৃষ্টি দিয়ে তার চিন্তার বৈদগ্ধ্য, ভাবের চমৎকারিত্ব এবং ভাষার বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে একেবারে বিমুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

ইংরেজী বাংলা এই যে সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটেছিল সেটা বিশ্বাসী মনের সৃষ্ট সাহিত্যধর্মে বিশ্বাসী, মঙ্গলে বিশ্বাসী, মানবাত্মার অমৃতত্বলাভের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, সমাজ-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী, ক্ষুদ্রতমেরও অপরিমেয় মূল্যে বিশ্বাসী এবং মানুষের অন্তরে দুঃখকষ্ট দৈববিড়ম্বনাকে পরাভূত ক'রে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হ'বার এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্বে ও সার্থকতায় বিশ্বাসী। সে সাহিত্যটার ইউরোপীয় অংশের প্রাচীনতম ভাগে কিছুটা অন্ধ নিয়তির কথা ছিল—এমনই প্রবলা এবং সর্বশাসিকা নিয়তি যে তার বন্ধনে দেবতারাও বন্দী এবং মানুষ তার দয়াহীন হস্তে অসহায় ক্রীড়নকমাত্র, কিন্তু ও জীবদর্শন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তার পরবর্তী সাহিত্য মানুষকে যে শুধু নিয়তির বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিল তা নয়, তাকে অমৃতপিপাসু, ঊর্ধ্বমুখী এবং বীর্যবান আত্মার অধিকারী ব'লে ঘোষণা করেছিল। সে বীর্য সব সময়ে জয়ী হ'তনা, কিন্তু তার জয়েচ্ছাটাকেই ছিল ঐ সাহিত্যের বন্দনা এবং মানুষ যখন পরাভূত হ'ত, সাহিত্য দেখাতো যে তখনও সে গভীর বিশ্বাসে ভাবচে যে এই পরাভবটাই তার জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা নয়। আর মানবাত্মার অপরাভবের চিত্র যখন আঁকতে পারতো, তখন ঐ সাহিত্য সেই জয়গৌরবের প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতো। তার প্রধান প্রয়াসই ছিল প্রতিপন্ন করা যে মানুষের প্রাণশক্তির মধ্যে এমন একটা প্রাচুর্য আছে যে সে প্রয়োজনের দাবী মিটিয়েই নিঃশেষ হ'য়ে যায়না, নিষ্প্রয়োজন কাজে অথবা রূপসৃষ্টিতে সে নিয়তই উচ্ছ্বলিত হ'য়ে পড়ে—কেবলমাত্র আরামে তার তৃপ্তি নেই, সে চায় আনন্দ—সেই আনন্দের সন্ধানে সে চারিদিকের বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে কেবলই নিজেকে ঊর্ধ্বলোকের দিকে উৎসারিত ক'রে দিতে থাকে এবং আপাতদৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের পরিবেশ যতই প্রতিকূল মনে হোক্ না কেন, আনন্দ তার লভ্য। বিশ্ববিধানের এই অর্থ করেছিল ব'লেই ঐ সাহিত্যের শেষ কথা ছিল শান্তির কথা, সুন্দরের কথা, মঙ্গলের কথা এবং মুগ্ধ নিরুদ্বেগ মনের সৃষ্ট ব'লে সে সাহিত্যে অলঙ্করণের প্রাচুর্য ছিল। দুঃখের চিত্রণ যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে দুঃখ ছিল ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জীবনের পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত দুঃখ, মানুষের পাপে অথবা বিধাতার বিধানে সৃষ্ট কোন জগৎজোড়া দুঃখভার নয়। তেমি, সমাজের বিশেষ বিশেষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও ছিল, কিন্তু সেটাও ছিল শুধু ক্ষণস্থায়ীন বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—সামাজিক শাসন ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনে কোন অনাস্থা তাতে প্রকাশ পায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধটার সংঘাতে বহুদিনের গড়া অনেক কিছু বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল সত্য, তবুও মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের মূল ভিত্তিটা বিশেষ কম্পিত হয়নি—যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত কয়েক-জন সর্বহারা সৈনিকের অন্তস্তল থেকে কিছুটা হাহাকার উঠেছিল মাত্র। তাঁরা শুধু যুদ্ধের ভয়াল রূপ এবং অগণিতযুবজনসংহারের মর্মান্তিক বেদনাটা নিয়ে কয়েক-খানা গ্রন্থরচনা করেছিলেন—পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ ব্যবস্থাটাকে আক্রমণ করেননি, প্রচলিত মূল্যমানগুলিকেও অস্বীকার করেননি, কোন চরম সর্বনাশের আশঙ্কাও জাগ্রত করেননি। ফলে সাহিত্যের সাধারণ রূপটা অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছিল। আজ জগৎ সে সাহিত্যের যে মূল্যই দিক্, একথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে যে তার পাঠ মনকে উদ্দীপ্ত করতো, আত্মাকে বলীয়ান করতো, কখনো কখনো বেদনায় হৃদয় মথিত করলেও পরিশেষে একটা প্রশান্তির অবলেপে অন্তর স্নিগ্ধ ক'রে দিত, মনে অতৃপ্তি সৃষ্টি করতো না, জ্বালা জন্মাত না। সে যে গভীর ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করতো তার আরো একটা কারণ এই ছিল যে ঐ সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, লোকে জানতো যে তাঁরা স্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পী, কেবলমাত্র অন্তরের উপলব্ধি প্রকাশের প্রয়াসেই তাঁদের সাহিত্যের জন্ম, এবং

সাহিত্য একটা সত্যের উজ্জ্বলমহিমা বহন

াাহিত্য পড়তে পড়তেই আমি আলোক থেকে
প্রবেশ করি, অর্থাৎ আইনব্যবসায় লিপ্ত হই।
ার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন যে
্যাপৃত থাকা অবস্থায় ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে
াাওয়া যায় শুধু কার্যবিধি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি
ও সেই মূলের বিচারকগণকৃত ভাষ্য এবং বাংলা
র মধ্যে পাওয়া যায় আরজী, জবাব এবং দরখাস্ত
চনা। দীর্ঘকাল আমার কেবলমাত্র ঐ সাহিত্য
ঃখে কেটেচে, অবশেষে নিজেকেও একজন
হ'তে হয়েছিল। সেই দুঃখের দিনে সাহিত্য-
দিশীবিলেতি পত্রিকাগুলি দেখতে পেতুম, তাদের
পাতায় খবর থাকতো যে পশ্চিমে প্রচণ্ড কলরব
টা নূতন সাহিত্য গ'ড়ে উঠচে এবং বঙ্গসরস্বতীর
নিত্যই নব নব পূজারীর সমাগম হচ্চে, কিন্তু
হ'ত যে ঐ নবীন সাহিত্যের একখানা বইও
পারিনি, তখন অস্বস্তিতে মন অস্থির হ'য়ে উঠতো
বলই ভাবতুম যে 'আপনারে আমি বৃথা করিলাম
তার পর যখন অসহনীয় বোধ হ'তে লাগলো,
ইচ্ছায়ই ও-জীবনের আরো বিস্তৃতি গ্রহণ করতে
ক'রে তার মেয়াদ শেষ ক'রে দিলুম। ততদিনে
মতে পেরেছিলুম যে আইনের আঙিনা বুদ্ধিবৃত্তির
হ'তে পারে, কিন্তু আত্মার আশ্রয়স্থল কখনো

পর ভয়ে ভয়ে সাহিত্যপাঠে ফিরে এসে পশ্চিমের
দ্ধোত্তর সাহিত্যজগতটাতে প্রবেশের ইচ্ছায়
প্রথম পদক্ষেপ ক'রেই একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে
মনে হ'তে লাগলো, এ কোন জগতে এলুম,
র অনেক কিছুই যে চিনিনে! এখানকার মানুষ
ভাষা অজানা, মানুষের চাউনিটাও যেন অন্যরকম!
সাহিত্যের রূপ বদলেচে, বিষয়বস্তু বদলেচে,
াান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী, বাগ্‌ভঙ্গী সব বদলেচে,
কের ভূমিকাও বদলেচে—কোন কিছুই যেন আর
মত নেই। যে বাহুশ্রীতে সাহিত্যিক তাঁর
সৃষ্টিকে গভীর সমাদরে মণ্ডিত করতেন, এই
মধ্যে সেই পরমা শ্রী কোথায় গেল! যে ভাবনা
কে প্রতিদিনের দুঃখকষ্ট, নীচতা, কুশ্রীতার প্রতি
না ক'রেও সর্বক্ষণ তাকে তার ঊর্ধ্বে তুলে
সেই ধ্যানধর্মী, মঙ্গলসন্ধানী বৃহৎ ভাবনার স্পন্দন
ভব করতে পারলুম না। যে দৃষ্টি দিয়ে একদিন
কে জগতের আলো অন্ধকার নিরীক্ষণ করতে
ুম মনে হ'ল যেন সেই পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত দৃষ্টি
হ'য়ে গেছে।"...

এইটুকু ভূমিকার পর বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার ধীরস্থির চিত্তের সুচিন্তিত অভিমত তিনি এই ভাবে দিয়াছেন—

"আজ যখন মানুষ একটা সর্বগ্রাসী ধ্বংসমত্ততার অবসানে তার পুরাতন জীবনের খণ্ড খণ্ড ভগ্নাবশেষ নিয়ে নানা সমস্যার যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ঘুরছে, তখন সেই অশান্তির ঘূর্ণির মধ্যে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক তাঁর পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করবেন, তা সম্ভব নয়। যুগমানসের আলোড়ন তার সাহিত্যে সঞ্চারিত হবেই, সেই আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত আবর্জনা কর্দমাদির আলেখ্যও চিত্রিত হবে। কিন্তু সমসাময়িক জনমানসের প্রতিফলন এবং বাস্তবের যথাযথ চিত্রণই কি সাহিত্যের সব? তার কি বাস্তবকে বৃহত্তর, ঊর্দ্ধতর কিছুর সহিত যুক্ত ক'রে দেবার কোন কর্তব্য নেই? সাহিত্যের কণ্ঠে কি আমরা বিবরণই শুনবো, বাণী শুনবো না? পাশ্চাত্যের এবং বাংলারও নূতন সাহিত্যে শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট, এত সুস্পষ্ট যে এই সাহিত্যকে উপেক্ষা করা যায় না, পড়তে গেলেও অবহেলার ভাব নিয়ে পড়া যায় না, এর শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই পড়তে হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা নিয়ে পড়তে পড়তেও আমার বারবার মনে হয়েছে যে এই সাহিত্যের মুখে অতি উচ্চস্বরে যে কথা, সেটা সংবাদ মাত্র, সন্ধানী পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতায় আদ্যন্ত পরিপূরিত সংবাদ, নিপুণবচনে বিবৃত সংবাদ, তবু সংবাদই। সে অনেক কথা জানায়, কিন্তু যা জানায় তার নিগূঢ় তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করার কোন চেষ্টা করে না, বর্তমানের নানা অনিত্য ব্যাপারগুলির অবিকল চিত্র এঁকে দিয়েই সে সন্তুষ্ট—সেগুলিকে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আলোকিত ক'রে কোন গভীরতর রূপ প্রকাশিত করার কোন প্রয়াস তার নেই। এই সাহিত্যের কথা তাই সংবাদপত্রে নিত্যই প্রকাশিত নানা ঘটনার সুলিখিত কাহিনীর মত ক্ষণকালের জন্য মনকে অধিকার করে মাত্র, চিত্তকে কোন বৃহৎ ভাবনায় ভাবিত ক'রে তোলে না, হৃদয়কে রসে প্লাবিতও করে না, আসলে সে সংবাদ-প্রকাশ মাত্র, প্রকৃত সাহিত্য নয়। নাট্যরসোত্তীর্ণ জীবনবৈচিত্র্যের অনির্বচনীয়তায় মণ্ডিত কোন সার্থক চিত্রনাট্য এবং যে কোন উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফিসমৃদ্ধ documentary film-এর মধ্যে যে প্রভেদ, প্রকৃত সাহিত্য এবং অধুনাকালের সাহিত্যের মধ্যেও সেই প্রভেদ। প্রচুর বর্ণনাশক্তি এবং পর্যবেক্ষণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে যেন বিশিষ্ট সংবাদদাতার পত্রজাতীয়ই র'য়ে গিয়েছে, সাহিত্যের নিত্যসত্যোদ্ভাসিত ঊর্দ্ধলোকে উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি। সংবাদপত্রের প্রচারপরায়ণতা থেকেও সে মুক্ত নয়। তাই তাতে যে দীপ্তি দেখতে পাই মনে হয় সেটা রংএর নয়, জৌলুষের। যে সাহিত্য মানবচিত্তের অসীমতাকে জাগ্রত ক'রে বিশ্বের অনন্ততার সহিত তার

সাহচর্য ঘটায়, যার স্বচ্ছ দৃষ্টি অলক্ষ্মীর পদচিহ্নে আকীর্ণ পৃথিবীতেও লক্ষ্মীর চরণপাতের কল্যাণচিহ্ন দেখতে পায়, যে চরম দুঃখের দিনেও মানুষকে অমৃতের অভয়বাণী শোনায়, যে শতবিপর্যয়ের মধ্যেও বিভ্রান্ত না হ'য়ে অহরহ বলে, 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক', সে সাহিত্যের লক্ষণ যেন এতে মেলে না। বর্তমান কালের সাহিত্য সম্বন্ধে এইটেই সব চাইতে বড় দুঃখ।

তবে একথার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে আজ যদি সাহিত্য সংবাদধর্মী এবং চিত্রসর্বস্ব হ'য়ে উঠে থাকে, তার একটা কারণ বোধ হয় একটা নূতন শ্রেণীর পাঠকসমাজের অভ্যুদয়। শিক্ষার প্রসারের ফলে পাঠক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এমন একটা পাঠকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা প্রকৃতপক্ষে অর্ধশিক্ষিত। তারা পড়তে চায়, কিন্তু স্থূল উত্তেজনাতেই তাদের বিলাস, অল্পবুদ্ধিগ্রাহ্য হাল্কা জিনিষেই তাদের আনন্দ, গভীর অনুভূতি তাদের আয়ত্তের বহির্ভূত। অতিরিক্ত সিনেমাদর্শন তাদের রুচিকে আরো বিকৃত করেছে। কোন দেশের সাহিত্যপাঠকদের অধিকাংশ যদি এই শ্রেণীর মানুষ হয়, তবে সে দেশের সাহিত্যের উন্নত মানরক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশেরই এক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিকে, তিনি সদ্য প্রকাশিত একখানা কথাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট বই পড়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুনেছি যে তিনি বইটা পড়া প্রয়োজন মনে করেন না, ওটা সিনেমা হ'লে দেখে নেবেন। সাহিত্যিককে যদি তাঁর রচনার গ্রাহক সংগ্রহের জন্য সিনেমায় রূপান্তরের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তাঁর ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে প্রথম থেকেই রচনাটাকে এমন রূপ দেবেন যে ওটাতে সাধারণ সিনেমাদর্শকদের তৃপ্তিকর অনেক ঘটনা সংস্থান থাকবে এবং সহজেই ওটা সিনেমাব্যবসায়ীদের চিত্তে লোভের উদ্রেক করবে। কোন আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিক অবশ্য এমন গর্হিত কর্ম ক'রে স্বধর্মভ্রষ্ট হবেন না, তবে যেখানে পাঠকসমাজের রুচি মার্জিত নয় এবং রসবোধশক্তির দীনতা গভীর, সেখানে সকলের পক্ষে আদর্শ রক্ষা করা কঠিন। সাহিত্যিককেও তো বাঁচতে হবে। কিন্তু তবু এই কামনা করবো যে সাহিত্যিকেরা শুধু গল্পই বলবেন না বা শুধু চিত্রই আঁকবেন না, বাস্তবকে অন্তরের রস দিয়ে নিষিক্ত ক'রে তাকে মাধুর্যে অবলিপ্তও করবেন এবং জীবনের মহিমাও প্রকাশ করবেন।

একথাটা যে এত বিশেষ ক'রে বলছি তার কারণ এই যে সাহিত্যিকের দায়িত্ব অপরিসীম। মানুষকে নিত্যসত্যের সন্ধান দিতে, তাকে জীবনের গৌরবে বিশ্বাস দিতে, তার মানসলোকে জ্যোতির্ময় আদর্শের আলো জ্বালিয়ে রাখতে এবং তার হৃদয়কে কল্যাণের অভিমুখী করতে একমাত্র সাহিত্যই পারে। আবার সে মানুষকে বিভ্রান্তও করতে পারে। সাধারণ মানুষ দর্শন পড়ে না, সে সাহিত্য পড়ে। সাহিত্যপাঠেই তার মন গঠিত হয়, সাহিত্যের প্রভাবেই তার মন শান্তির অথবা সংঘাতের, মঙ্গলের অথবা অমঙ্গলের অনুরক্ত হয়, কোন গভীর সমস্যার সম্মুখীন হ'লে সাহিত্যের মধ্যেই তার সমাধান খোঁজে। এই সাহিত্য সৃষ্টি করবার ক্ষমতার যিনি অধিকারী, সংসারে সেই জনমানসনেতা সাহিত্যিকের মহৎ ভূমিকা। তাঁর দায়িত্ব সমসাময়িক মানুষের মন চালিত করবার গুরুভার গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মাধ্যমে সেই মনকে সত্যের পথে, শান্তির পথে, কল্যাণের পথে চালিত করা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহিত্যের সেই মহৎ দায়িত্ব মহত্তর হ'য়ে উঠেছে। আজ এই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষের মনের অবস্থা আর সহজ নেই। পুরাতন সব আদর্শ আজ তার কাছে মিথ্যা হ'য়ে গেছে, মনের তার কোন আশ্রয় নেই, অন্তরে আজ সে হৃতসর্বস্ব, নিতান্ত কাঙাল। সে যেন এলিয়টের বর্ণিত Hollow Man—অন্তঃসার-রিক্ত, ফোঁপরা—খড়কুটো দিয়ে ভিতরের বিরাট শূন্যতার গহ্বরটাকে পূর্ণ ক'রে কোন মতে মানুষের মূর্তিটা বজায় রেখে খাড়া হ'য়ে আছে। নানাদিক থেকে এলোমেলো হাওয়ার ঝটকা এসে তাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও দিচ্ছে না—কিসে যে স্বস্তি পাবে সে জানে না। পৃথিবী আজ সেই অস্থির দিশাহারা মানুষের পৃথিবী। সে মানুষকেও দুই মন্দিরের পূজারীপাণ্ডারা দুই দিক থেকে টানাটানি করছে—একদল দিতে চায় তার কানে জাতীয়তার মন্ত্র, অন্যদল সর্বজাতীয়তার; একদল বলে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে মিলে এখনো সর্বনাশ এড়াবার চেষ্টা পেতে, অন্যদল মিলনের ভরসা বিশেষ করে না; একদল চায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অন্যদল চায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব—এই দুই দলের বিরোধে সমগ্র মানবসমাজ দ্বিধা হ'য়ে গেছে। যুদ্ধ নেই, অথচ শান্তিও নেই। একদিকে মানুষের বুকে জীবনে যা কিছু শোভনসুন্দর ছিল এবং এতদিন শাশ্বত ব'লে মনে হয়েছিল, তা ভস্মসাৎ হয়ে যাবার দাবদাহ—অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে আজ কোন নূতন আদর্শকে সত্য ব'লে মানবে এবং দুই মতবাদ নিয়ে যে দুই গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে, তার কোন গোষ্ঠীতে যোগ দেবে, এই নিয়ে মনে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা। আবার উভয় গোষ্ঠীই সর্বনাশী মারণাস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে এবং "বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি" "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে"।

এই পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ সাহিত্যিক, তার অন্তরে সেই পুরাতন প্রশ্ন—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? সে মঙ্গলের দেবতারই অর্চনা করবে, জগতের প্রত্যাশা যে, তাই তার উত্তর হোক্, কিন্তু তার সে উত্তর দেওয়ার

ছু বিঘ্ন ঘটছে। আজ সাহিত্যিকের নিভৃত-আশ্রমেও অনেক দূতের, অনেক চরের না—কারণ আজ সকলেরই জ্ঞান হয়েছে যে শক্তি অপরিসীম এবং তাই সবাই বাক্যের সাহিত্যিককে ডাকাডাকি করছে নানা দিক রাষ্ট্র বলচে, তুমি আমার স্বপক্ষে সাহিত্য রচনা মার আনুকূল্য কর, রাজনৈতিক দলেরা বলচে, াদের মতবাদের বাহন হও, এমন কি শিল্পপতি বসায়ীরাও বলচে, তুমি কৌশলে আমাদের য কর। সাহিত্যে এইসব সাহায্যভিক্ষুর মধ্যে ভয় রাষ্ট্রকে। আজ সে শুধু মানুষের বাইরের উপর প্রভুত্ব করে সন্তুষ্ট নয়, তার মনও অধিকার ায় এবং এই মনোরাজ্য বিজয়ের অভিযানে কে সেনানী নিযুক্ত করতে তার প্রবল আগ্রহ। ত্যের সহায়তা দুই উপায়ে সংগ্রহ করে—হয় ন করে, নিজের অভিপ্রেত মত ছাড়া আর সব কাশ কঠিন শাসনে বন্ধ করে দেয় এবং সাহিত্যের ক কেবলই নিজের স্তুতিগানে ঐকতান তোলায়; নানা গভীর কৌশলে প্রলোভনের দ্বারা কে নিজের স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করে। ালোই সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক; কারণ শুধু য়ে শাসনে নয়, বেতন দিয়ে পোষণ এবং পুরস্কার াষণেও সাহিত্যিকের মনের স্বাতন্ত্র্য খর্ব করা াষ্ট্রের ডাক তাই সাহিত্যিকের কানে প্রবলতম কিন্তু রাজনৈতিক দলের এবং শিল্পপতিদের নিতান্ত ক্ষীণ নয়। এই সব ডাকাডাকি র এবং এই সব ডাকে সাড়া দেওয়া কের স্বধর্ম-পালনের পরিপন্থী, তবে এই সব ডাক বী মানুষের হিসাবে সাহিত্যিকের মূল্যবৃদ্ধির য়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিকের গতের বাইরে অকস্মাৎ তার এই চাহিদাবৃদ্ধি এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে—রাষ্ট্র কর্তৃক শাসনের া তোষণের মোহ এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে বিধালাভের লোভ জয় করা তার এখন এক নূতন কিন্তু তার বৃহত্তর দায়িত্ব নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বের রা। তার অধুনাসৃষ্ট সাহিত্য প'ড়ে মনে হয় যে এখনো তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত করছে; সে স্থির রছে না যে অসত্য অমঙ্গল দিকে দিকে অভ্রভেদী আলোকের পথ রুদ্ধ করবে, তারাই চিরন্তন, । মানুষ যে সত্যসুন্দরে বিশ্বাস করতো, তাই নয়। তাই সে আজ নিজেও বিভ্রান্ত, অস্থির-ীর অনুভূতি দিয়ে সমসাময়িক জীবনকে উপলব্ধি । অব্যক্ত রহস্য ব্যক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব জীবনটাকে যেন জ্বালা বলেই সে জেনেছে। বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মানুষের যখন সাহিত্যের কল্যাণবাণীর বড় প্রয়োজন ছিল, তখন সে বাণী তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হ'ল না।

কিন্তু আমি আশাবাদী। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের কথা বলবার আমার প্রয়োজন নেই, বাংলার সাহিত্যিকদের কথায় বলতে পারি যে তাদের সৃজনী-শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি। তাদের শক্তিতে বিশ্বাস না করলে, তাদের কাছ থেকে বৃহৎ কিছুর প্রত্যাশা না থাকলে, এই সম্মেলনে আমার এত কথা বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিঃস্বের কাছে কেউ দান প্রার্থনা করে না। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে বাংলা সাহিত্যিকেরা আজ যেমন সমসাময়িক জীবনের অবিকল আলেখ্য চিত্রিত করছেন এবং তার অশান্তি অস্থিরতাটাকেই প্রধান ক'রে প্রকাশ করছেন, অনতিকাল পরে তাঁরাই এই জীবনটার রহস্য সন্ধানে এবং স্বরূপব্যাখ্যায় রত হবেন। তাঁদের কাছে আজ প্রার্থনা জানাবো যে তাঁরা আর বিলম্ব না ক'রে বর্তমানের মানুষজীবনের সমগ্রটার উপর দৃষ্টিপাত করুন এবং তার খণ্ড খণ্ড মন্দত্ব অথবা বাহ্যিক রূপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ না ক'রে ও-জীবনের পশ্চাতেও তাঁরা যে মহিমা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন, তাকে প্রকাশিত করুন। আজ পৃথিবী জুড়ে যেন সমুদ্র-মন্থন চলেছে—সেই বিমথিত জলধির ঘূর্ণিত অতল থেকে বাংলার সাহিত্যিকেরা অমৃতভাণ্ডহস্তা লক্ষ্মীকে আবাহন ক'রে তুলুন—সেই অমৃতের পুণ্যপ্রভাবে বাসুকীর বিষ-শ্বাসের গরল দূর হ'য়ে গিয়ে পৃথিবীর বায়ু নির্মল হোক্—মানুষের অতৃপ্তি যাক্, জ্বালা জুড়াক—আবির্ভূত হোক্ নিত্যকালের শান্ত শিব সুন্দর।"

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের এই বিনা-টিকিটের-যাত্রীর কথাগুলি সাহিত্যসেবীদের নিত্যস্মরণীয় বলিয়া এখানে ধরিয়া রাখিলাম।

সূপকার সম্মেলন

পশ্চিমঘাটে প্রস্তুতীকৃত অন্নব্যঞ্জনের সমাবেশ-সমারোহের সপ্তাহকাল পূর্বে ১৫ই ডিসেম্বর হইতে পূর্বঘাটে অর্থাৎ মাদ্রাজে বাছাবাছা সূপকারদের জমায়েৎ হইয়াছিল। সাহিত্যভোজের আগেই রসুয়ে লেখকদের পরস্পর মুলাকাত সমীচীনই হইয়াছে। সর্বভারতীয় লেখক-সম্মেলনের সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিচারক' উপন্যাসের স্রষ্টা হইলেও শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তীর মত আসল বিচারক নন। তাঁহার কবি-কল্পনার আবেগ যুক্তি-প্রধান হইতে পারে নাই, তবে তিনি পঞ্চশীল ও ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের দোহাই দিয়া ভাবগদগদ কণ্ঠে বিজাতীয় ভাষায় (প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের মতে "in a slovenly English version...delivered with

every conceivable error of accent, pronunciation and punctuation."—Hindusthan Standard—15th Jan. '60) যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার মুলুক-রাজগিরি সমর্থন করি না বলিয়াই মাতৃভাষায় তাঁহার মূল রচনাই উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই ভারত-ধর্মের বীজ অবিনশ্বর। দেশ-দেশান্তরের অভিযানের সঙ্গে সেই সব দেশের সংস্কৃতির জলধারা আসিয়া ভারতের মানস-সরোবরের প্লাবন আনিয়া ভারত সংস্কৃতির পদ্ম দলের উপর বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। পদ্মগুলি মরিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বিশ্বের বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন বীজ হইতে একটি অম্লান শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পঞ্চশীলের পদ্ম। একমাত্র এই পদ্মপুষ্পের অর্ঘ্যে আজ পৃথিবীর মানবজাতি, মৃত্যুকে অমৃতে পরিণত করিতে পারে। মহারুদ্রের ক্রুদ্ধ-বাম-মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটিতে পারে। অন্য জাতির কাছে ইহা মাত্র Policy ; ভারতের জীবনে ইহা Principle. ইহাই ভারত-সংস্কৃতির জীবনধর্ম। যাঁহারা হিংসার বিরুদ্ধে হিংসায় প্রতিশোধের পক্ষপাতী তাঁহাদের বলি বীর্যবান অহিংসাই এ শতদলের প্রাণমধু। যাঁহারা বিপরীত মতবাদী, যাঁহারা ছলনার জন্য, মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের বলি—সত্য এই পঞ্চ-শীল পদ্মের বৃন্ত, সত্যকে ছিন্ন করিয়া মিথ্যার বৃন্তে তাহাকে স্থাপন করিলে তাহা শুকাইয়া যাইবে।"

আমাদের আনন্দ এই যে সূপকার-ব্যঞ্জন উভয় সম্মেলনেই বাংলার দুই মহাদেব বাঙালীর মান রক্ষা করিয়াছেন।

স্টপ প্রেস

সাহিত্য-সংবাদ প্রেসে চড়িবার মুখে সর্বশেষ সংব যাহা পাইয়াছি তাহা হইতেছে আগামী বৎসরে আকাদামি-পুরস্কার-সংক্রান্ত। এখানেও দেবাদিদে মহাদেব প্রমথনাথ। বাজারের খবর এই যে আগা বৎসরে 'কেরী সাহেবের মুন্‌শী' আকাদামি পুরস্কা পাইবে। 'জব চার্নকের ব্রাহ্মণী' গ্রন্থটিকে অগ্রাধিকা দিলে আমরা আরও খুশী হইতাম। সত্য বটে, কের সাহেবের মুন্‌শী রামরাম বসু বাংলা গদ্যে প্রথম মৌলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট-বন্দনার প্রথম বাংলা গা রচিয়াছিলেন, 'লিপিমালা'য় এক পরমেশ্বরের জয়গা করিয়াছিলেন কিন্তু স্বামীর চিতানিষ্ক্রান্তা যে বিধবা ব্রাহ্ম মহামান্য জব চার্নকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়াছিলেন তাঁহা কৃতিত্ব আরও অধিক। তিনিই নূতন করিয়া সংসা পাতিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই সৌধনগরী কলিকাতার পত্তন হইয়াছিল এবং আমরা মাতৃভূতে আজ এখানে গতর খাটাইয়া অথবা লোক ঠকাই অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিতে পারিতেছি। উক্ত ব্রাহ্মণীর কারণেই কলিকাতায় রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদনের সমাগম সম্ভব হইয়াছে এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের মত অমন একটা মহীরুহ পৌত্তলিকতা ও একেশ্বরবাদ, এই দ্বিদল বীজ ফাটাই বাহির হইয়া অভ্রংলিহ-মহিমায় সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। 'জব চার্নকের ব্রাহ্মণী' গ্রন্থটি আমরা আগ্রহ সহকারে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিশেষ করিয়া যে অধ্যায়ে ব্রাহ্মণী জবকে বাংলা বুলিতে প্রেমের পাঠ দিতেছেন এবং অনভ্যস্ত জিহ্বায় জব অলপ্পেয়ে, বরাখুরো, মিন্‌সে, ড্যাকরা, খালভরা, পোড়ার-মুখো প্রভৃতি ভাল ভাল প্রেম-সম্বোধনগুলির বিকৃত উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে হাসিয়া গড়াগড়ি দেওয়াইতেছেন, সেই অধ্যায়টি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। লেখকের নামটা কিন্তু মনে পড়িতেছে না।

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ত্যের সামনে বৃহত্তর বা মহত্তর কোন ভবিষ্যৎ াছে, না সাহিত্য আস্তে আস্তে প্রয়োজনের রিণত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতার ভিন্ন হয়ে যাবে, এই প্রশ্ন ত্রিশ বছর আগে ন চেষ্টারটন। তখন এ জিজ্ঞাসা নিরর্থক াছিল অনেকেরই, কেন না উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সাহিত্যস্রষ্টারা অনেকেই জীবিত খন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ছিলেন টমাস মান, গোর্কি, রমা রলাঁ, বার্নার্ড শ'। ত্রিশ বৎসরের আজ যখন সবাই তাঁরা লোকান্তরিত এবং শ শতাব্দীর সময়-সীমার মধ্যে যাঁদের জন্ম, তাঁদের ান একজনকেও পাওয়া যাচ্ছে না পূর্বোক্তদের ত্তরাধিকারীরূপে, তখন প্রশ্নটা অনিবার্যরূপেই াথা তুলেছে।

াই পৃথিবীতে আজ মহৎ পদবীর সাহিত্য রচিত কোন দেশেই। রাশিয়ায় সাহিত্য হয়েছে হাইস্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের পরিপূরক, বা রাজনৈতিক প্রচারণার মাধ্যম। ফেদিয়েভ ও অস্ত্রোভস্কীর সুবৃহৎ উপন্যাসগুলি কেউ ্যবসায় সহকারে পড়ে শেষ করতে পারেন, ই এ কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন। ফ্রান্সে ্যাসের এবং বৃটেনে কবিতার যে কদর মাত্র ছিল, আজ তা রীতিমত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সার্তর কামু সার্গা নিঃসংশয়ে রলাঁ আনাতোল ফ্রাঁস বা আঁদ্রে জিদের সমস্তরের লেখক নন। শ' য়েটস হাক্সলে গালসওয়ার্দীর পর অডেন স্পেণ্ডার ইশারউডও খুব বড় গণনীয় নাম নিশ্চয় নন। কিন্তু তাঁরাও দম রাখতে পারলেন কই বেশীদিন? ফ্রান্সে ও বৃটেনে সাহিত্য অবশ্য রাশিয়ার মত ষোল আনা প্রয়োজনের বাহন হয়ে ওঠে নি, কিন্তু মহৎ প্রাণধর্মের অভিব্যক্তি রূপেও আজ তার গরিমার কিছু নেই। সাহিত্যে একটা অবক্ষয় শুরু হয়েছে তাঁদেরও।

দেশের প্রসঙ্গও উত্থাপন করা দরকার এই সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের পর একক স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হবার মত নাম আমাদের মাত্র দুটি—প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র। (প্রমথ চৌধুরীর অবশ্য স্রষ্টা-সাহিত্যিক হিসাবে অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল না কোনদিন এবং শরৎচন্দ্র অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হলেও, ব্যাপ্তিহীন একমুখিতার আবর্ত ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি কোনদিন)। তবু দুজনেই এঁরা নিজস্ব ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত দুই সাহিত্য-নায়ক ছিলেন। কিন্তু তারপর? তারপর we are a composite fraternity of writers, each in his or her own way a tolerable individual, আমাদের কারও বই ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়, কারও বই নির্বাচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে, কেউ বা পাই কোন নামী পুরস্কার, কেউ বা কোন দামী

পদ। কিন্তু অবিস্মরণীয় বা কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করি নি, করতে পারি নি কেউই—এ আমরা নিজেরাই বুঝি। আর এও সবিস্ময়ে দেখি যে গরম পিঠার মত যেসব বই হু হু করে আজ বাজারে কাটে, কোনটাই তার সাহিত্য হিসাবে উঁচুতলার বস্তু নয়। অর্থাৎ সাহিত্যের অবক্ষয় শুরু হয়েছে এদেশেও।

কিন্তু কি কারণ এই দুনিয়াব্যাপী সাহিত্যিক ক্ষয়দশার? কারণ অনেক দেখানো যায় এবং কতকগুলি তার বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কথা, এটা একান্তভাবে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান গতি ও উৎপাদনের রাজ্যে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার ফলে মানুষ সহসা আজ অসামান্য শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে পড়েছে এবং এই শক্তি ও ঐশ্বর্যের লালসাই আকর্ষণ করেছে বেশীর ভাগ মেধাবী ও কল্পনাকুশলী মানুষকে বিজ্ঞানের অভিমুখে। তা ছাড়া পাইকারি উৎপাদন ও আহরণের যুগে এই রাজ্যে শ্রম-নিয়োগের দক্ষিণা বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীত হারে—যা হয় নি অন্যান্য দিকে। তার আকর্ষণেও বিজ্ঞান ও কারিগরী কর্মের দিকে ঝুঁকেছেন দলে দলে বুদ্ধিমান মানুষেরা। ফলে সাহিত্যের রাজ্যে হয়েছে প্রথম শ্রেণীর সৃজনী-প্রতিভার একান্ত অভাব, কেন না সেই প্রতিভাই নিয়োজিত হয়েছে ক্ষেত্রান্তরে এবং এই শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশক থেকেই শুরু হয়েছে এটা। আজ হয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ।

দ্বিতীয় কথা, বিজ্ঞানের যুগ বলেই এটা ব্যস্ততারও যুগ। মানুষের সময় নেই। কলের ভেঁপু দিয়ে আমাদের দিন শুরু হয় এবং ট্রামে-বাসে লোকাল ট্রেনে সেই দিন হু হু করে অবিশ্রাম ছুটতে ছুটতে যেখানে এসে থামে, সেখানে মানুষের আর থাকে না এমন সামর্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য যা দিয়ে সে গভীর কোন বস্তুর চর্চা ও অনুশীলন করতে পারে। অর্থাৎ সময়াভাব হয়েছে আজ লেখকেরও, হয়েছে পাঠকেরও। অথচ মানুষের বলার কথাও বেড়েছে, বেড়েছে জানার আগ্রহও। তার থেকেই জন্মেছে ছোট গল্প, ছোট প্রবন্ধ, ছোট কবিতা—যা এ যুগের প্রধান সাহিত্য। যাঁরা একটু বেশী সময় দিতে পারেন, তাঁরা খোঁজ করেন বই-পুঁথির, না হলে পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের সাহিত্য-বিভাগই আজ হয়েছে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে চলতি সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন।

আসলে এটা শুধু পাইকারি উৎপাদনের যুগ নয়, পাইকারি লভ্য আহরণেরও যুগ এবং যা প্রচুর অর্জনের সহায়ক নয় এমন জিনিসের প্রতি আস্থা থাকতে পারে না আজ কোন লোকেরই। সেই জন্যই বিশুদ্ধ শিল্পের সব বিভাগেই আজ বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতার পথ উন্মুক্ত করার উদ্যম চলেছে। অভিনয় সঙ্গীত ও চিত্রের মত সাহিত্যও এই বাণিজ্যায়ন থেকে রক্ষা পায় নি। তাই সাহিত্যকে আজ ছায়াচিত্র, বেতার, টেলিভিসন ও সংবাদপত্রের উপর তার স্থিতি এবং পুষ্টির জন্য নির্ভর করতে হয়। আর যে জিনিসকে এই সব জনপ্রিয় মাধ্যমের সাহায্যে সর্বজনের মধ্যে ছড়ানো হয়, তার জাত খুব কুলীন এবং ধাত খুব বনিয়াদী হতে পারে না সঙ্গত কারণেই। সমাজের সবচেয়ে নীচু ধাপের মননশক্তি ও উপভোগ-ক্ষমতার হিসাব করেই খাঁটি জিনিসকে জল মিশিয়ে বেশ কিছুটা তরল ও ঢিলে করে নিতে হয়। এই সাংবাদিক ও বেতারাশ্রিত রচনা যখন ভব্য মলাটে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে দেখা দেয় গ্রন্থরূপে, তখন তাতে পাওয়া যায় বেশী করে জলের অংশটাই এবং আজ সব দেশেই চলতি সাহিত্যের খুব বড় একটা অংশ এই পর্যায়ের।

বলা বাহুল্য, এ হতেই হবে। নিছক রসসৃষ্টির জন্য সাহিত্যসেবা আজ কেউ করেন না, নিছক রসাস্বাদের জন্য সাহিত্য পড়ার মানুষও দুর্লভ হয়েছে। লেখক সাহিত্যের আশ্রয় নেন তাকে জীবিকা হিসাবে লাভজনক করে তোলার জন্য। কাজেই বাজারী চাহিদার খাতিরে তাঁকে সরবরাহ করতে হয় সেই সব পণ্য, যার নগদ খরিদ্দার অধিক। পাঠক সাহিত্যের সন্ধান করেন হয় তা থেকে কিছু প্রমোদ সংগ্রহের জন্য, নয় কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি আহরণের আশায়—যা তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে অল্প সময়ের মধ্যে এবং মাত্র দু-চার কথায়, অথচ যা খুব জটিল গভীর বা বুদ্ধি-আলোড়নকারী হবে না। এমন সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে রঙচঙে সাংবাদিকতা ছাড়া আর কী? সারা পৃথিবীতেই তাই এই জাতীয় ঢিলে রচনার ব্যাপক আবাদ

গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ নানা খণ্ড-আকারে
ান হলেও, অখণ্ড ভাবে তা হল সাময়িকতা-
এক রকম সাংবাদিক সাহিত্যই। সেই কারণেই
কালোত্তীর্ণ নয়, কেন না আজকের সময় পার হয়ে
ার তার অনেকটুকুরই অর্থ এবং সার্থকতা যাবে
া হারিয়ে। সাংবাদিকতা মানেই সাময়িকতা!
সাহিত্যের বৃহৎ আকাশ থেকে আমাদের ঘরের
নেমে এলেও, একই অবস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।
াযায় আজ ছোট-বড় ভাল-মন্দ-নির্বিশেষে সব
লেখেন গল্প-উপন্যাস এবং বলতে গেলে, এই দুটো
আজ সত্যিকার সাহিত্য। খাঁটি গল্প-উপন্যাস
াখা হয়-ই, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা,
তত্ত্ব-জল্পনা, এ সবও এখন লেখা হয় উপন্যাসের
এই পাঁচমিশেলী জাতের লেখার একটা সস্তা নাম
রম্যরচনা—যা নাম হিসাবে সার্থকও নয়, রম্যও
কিন্তু আজকের সমাজ সংস্কৃতি ও মানসিকতার
াকে এই শ্রেণীর লেখার ব্যাপক উৎপাদন এবং
প্রমাণ করে যে কুলীন-পদবীর সাহিত্যে আমাদের
ফুরিয়েছে, চলতি দিনের বেলোয়ারী লেখাই
া চাই এবং যা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য শ্রোতব্য
, তা এই রকম একটা কোন সুলভ বাহনের মধ্যে
রবেশিত হোক, এই আমরা চাই।

দেখবেন, পুরনো কলকাতার কাহিনী হোক,
ার ভিতরকার বিবরণ হোক, তীর্থযাত্রার স্মৃতি
াধু-মোহান্তের চরিত হোক, আপন ছেলেবেলার
াক, সবকিছুই আজ লেখা হয় উপন্যাসের ঢঙে।
তাতে না থাকে প্রবন্ধের মজবুত মেরুদণ্ড, না
পন্যাসের পূর্ণাঙ্গতা। কাজেই শিল্প হিসাবে তা
তর। কিন্তু এই যখন সর্বাধিক স্বীকৃত ও সমাদৃত
খন বুঝতে হবে মানুষের মানসিক প্রবণতাই মোড়
আজ এই দিকে। আর তার কারণ হল এখনকার
ক পটভূমি—যা বিশুদ্ধ কলার পরিপোষক নয়।
ায়াচিত্র ও সংবাদপত্রের দিকে চোখ রেখে যে
চরি করতে হয়, তা তথাকথিত মহৎ সাহিত্য হবে
? দুঃখের বিষয়, প্রাণগত মহত্ত্ব যখন অন্তর্হিত
সাহিত্য থেকে, তখন প্রচারযন্ত্র হয়ে উঠেছে
অতিশয় শক্তিশালী এবং তার মারফত এই সাহিত্যই
উচ্চাঙ্গের রচনারূপে বাজার মাত করে ফেলেছে এবং এজন্য
যশ ও অর্থলাভেরও অসুবিধা হচ্ছে না। এই ভাবে
নিয়মিত জল-মেশানো পথ্যই যখন সুপথ্যরূপে সার্বভৌম
স্বীকৃতি পাচ্ছে, তখন জনসাধারণের রুচি কতদিন আর
তথাকথিত ধ্রুব সাহিত্যের জন্য হাত পেতে বসে
থাকবে?

তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে কি? চেস্টারটন ত্রিশ বছর
আগে যা বলেছিলেন, তাই কি? সত্যিকার সাহিত্য কি
বাস্তবিকই একটা বকেয়া দিনের শিল্প হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক
অনুসন্ধানের বিষয় হবে এবং সাম্প্রতিক কালে যা সাহিত্য
নামে বাজারে চলছে, তার এক হাত থাকবে সাংবাদিকতার
সঙ্গে যুক্ত, অন্য হাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে? বলা দরকার
যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রামাণ্য এবং পূর্ণায়তন বই-
পুঁথি ইদানীং রচিত ও প্রচলিত হচ্ছে সব দেশেই। আর
হচ্ছেও বহুল পরিমাণে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,
তার প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটো—প্রথমতঃ, এখন একক পাণ্ডিত্য
ও মনীষার ফল হিসাবে বৃহৎ বই বড় বেশী লেখা হয় না।
নানা পণ্ডিতের বিভাগীয় রচনা একত্র করে একজন সাধারণ
সম্পাদক প্রকাশ করেন একটি পুস্তক এবং প্রায়শঃ তা
প্রকাশ করেন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাকাডেমি বা শিক্ষায়তন।
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষ সে সব বই-পুঁথি বড়-একটা
পড়েনও না, তার খবরও রাখেন না। তাঁদের জন্য এই
সব মহাগ্রন্থের সারমর্ম হ্যাণ্ডবুক বা পকেটবুক আকারে
বের হয় এবং বেশীর ভাগ লোকই তা নাড়াচাড়া করে
সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে ওঠেন। ফলে সাধারণ মানুষের
বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের বনিয়াদও অধিকাংশ স্থলেই হয় বেশ
ফাঁপা। আগেই বলেছি, মানুষ আজ ব্যস্ত, তার সময়
নেই, অথচ তার ক্ষুধা বেড়েছে। সেই ক্ষুধার চরিতার্থতা
বিশেষজ্ঞদের কাছে যতই উপহাসের বস্তু হোক, এই হল
যুগধর্ম।

এই যে হ্যাণ্ডবুকের বিশ্বব্যাপী প্রচার, এও ওই
সাংবাদিকতারই আর এক রূপ এবং এ কথা আশা করি
সবাই জানেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওয়েলস যখন
'Outline of World's History' লেখেন, তখন থেকেই

এ শর্টকাটের পালা শুরু হয়। শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, কোন্ বিষয়ে না এই রকম সংক্ষিপ্তসার ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাবে? একদিকে পূর্ব-বর্ণিত রম্যসাহিত্য, অন্যদিকে এই আউটলাইন সাহিত্য—এই হল আজ বেশীর ভাগ দেশের সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের ভালত্ব ও মন্দত্ব নিয়ে যত তর্ক হয়, তা হয় এই দুই পর্বের বই নিয়েই। রাশিয়ার কাছে সমস্যাটা সহজ হয়ে গেছে, তাঁরা প্রাণধর্মী বা রসধর্মী সাহিত্যকে প্রায় বাতিল করে ফেলেছেন এবং প্রয়োজনের সাহিত্যকেই সাহিত্যরূপে অনুমোদন দিয়েছেন। অন্যান্য দেশ এখনও মনস্থির করতে পারেন নি, তাই এখনও তাঁরা ছদ্মবেশটা জীইয়ে রেখেছেন সাহিত্যের, যদিও তাঁদের চোখের সামনেই পুরনো দিনে যাকে সাহিত্য বলা হত, তা একটু একটু করে দেউলে হয়ে যাচ্ছে।

এমন দিনে মন ঠিক করে ফেলার সময় এসেছে। আজ যখন কলাত্মক শিল্প বা liberal education-এর স্থান পিছনের সারিতে গিয়ে পড়েছে এবং সামনের পর্দায় এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, আর তাতে আমরা কোনই অসঙ্গতি দেখছি না, তখন চলতি বাজারের সাহিত্যকেই বা কেন আমরা নিতে পারব না প্রসন্ন চিত্তে? সঙ্কট হয়েছে দুনিয়ার স্বীকৃত ক্ল্যাসিক সাহিত্য নিয়ে। সেগুলোর কি হবে? কি আর হবে? দিদিমার গায়ের গহনার মতই তা মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। কিন্তু দিদিমার গহনা যেমন আজ কোন তরুণীর দেহে শোভা-বর্ধন করে না, ক্ল্যাসিক পদবীর সাহিত্যও তেমনই প্রতিদিনের প্রীতিভোজে আর পাঙ্‌ক্তেয় থাকবে না। কি আর উপায়? যুগের বিরুদ্ধে আমরা যা-ই কেন না বলি, তার অমোঘ নিয়মকে না মেনে আমাদের উপায় কী?

নন্ কো-অপরেশন

(অথবা 'না' বলিবার নৈতিক শক্তি)

অসিতকুমার

এক যে ছিল তপসে মাছ
হচ্ছিল সে ভাজা
পাতে যখন পড়ল তখন
দিব্যি দেখি তাজা
ব্যাপার দেখে সর্বনেশে
ভাবছি বুঝি গেলাম ফেঁসে
তপসে বলে মুচকি হেসে
'পাচ্ছ কেমন সাজা?
যতই ভাজ আমায় তুমি,
হচ্ছি নাকো ভাজা।'

কাটবে তুমি কুটবে তুমি
মারবে বঁটির ঘায়
আমি তবু আমি-ই রবো
আমার চেতনায়
তুচ্ছ এবং দরকারীতে
মসলা এবং তরকারীতে
নাড়বে তুমি, ঘাঁটবে তুমি
কি রস, রসনায়!
আমি তবু আমিই রবো
আমার চেতনায়!

ফিরায়ে লহ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

[...]তির যে ভাঙনে ভেঙে ভেসে গেছে বীরভূমি,
[...]য় ও ময়ূরাক্ষী, ভাল ছিল তাদের প্লাবন—
প্রচণ্ড প্রলোভনে ঘরছাড়া আজ আমি—তুমি,
স্বৈরিণী নগরীর সর্বনাশা সেই আকর্ষণ
[...]রে এনেছে টেনে, পড়ে আছি শ্রীচরণ চুমি
[...]্যতার ডাস্টবিন হতে খাদ্য করি আহরণ।
[...]নায়ে অবোধ শিশু বাজায় মধুর ঝুমঝুমি
[...]মাহিনী পসারিণী, যাপি মোরা নগরী-জীবন।

[...]বার ফিরায়ে লহ, কাটো এই মায়ামোহ-পাশ
[...]ক্ষ, রুক্ষ, তবু স্নিগ্ধ, নিরমল তব ক্রোড়খানি;
[...]তনা রাক্ষসী এ যে, বিষদানে করে সর্বনাশ;
[...]ন্তানে কর মা ত্রাণ মাতৃস্তন্য-স্নেহসুধা দানি।
[...]ষাণে নির্মিত এই নব-কংস-শমন-আবাস—
[...]ক্ষা কর বীরভূমি, সন্তানে আপন বক্ষে টানি॥

* * *

[...]রি সারি দীর্ঘদেহ তালশোভী আদিগন্ত মাঠে
[...]রে বহে শীর্ণা নদী খোয়াই রচিয়া দুই তীরে,
[...]র্য ওঠে মাটি ফুঁড়ে, মাটি ফুঁড়ে সূর্য নামে পাটে,
[...]ক্ত-গোধূলির মায়া লাগে দগ্ধ শালবনশিরে,
[...]ঙা ধূলি-ধূসরিত চক্রবাল-ছোঁয়া দূর বাটে
[...]রুর গাড়ির চাকা কাঁদে স্তব্ধতার বুক চিরে,
[...]াঁওতাল-দম্পতি দ্রুত হেঁটে চলে—বেলা গেল হাটে
[...]বে যায় মাঠ বাট তাল শাল তরল তিমিরে।

ইট-লোহা-পাথরের দৈত্যপুরে হেরি সেই ছবি,
এ তুমুল কোলাহলে শুনি ঝিল্লি-ক্ষুব্ধ নীরবতা—
ব্যাকুল হৃদয় জুড়ে কেঁদে মরে চিরন্তন কবি,
বিষনীল এ জীবন নিঙাড়িয়া ঝরে মূঢ় ব্যথা;
দূষিত এ পঙ্ককুণ্ডে রুদ্ধশ্বাস প্রাণ মুক্তিলোভী
চায় মুক্ত প্রকৃতির শুনিবারে প্রসন্ন বারতা॥

* * *

সন্তানে ফিরায়ে লহ, উদাসিনী জননী মোদের,
মরিতে দিয়ো না মাগো, বিলাসের এই কারাগারে—
ঐশ্বর্য-লালসা মাঝে জন্ম দাও সহজ বোধের।
আলো-বায়ু-ধারাস্নানে ধুয়ে দাও মনের বিকারে।
শরতে কাশের বনে লুকোচুরি ছায়া ও রোদের—
কুয়াশার স্বপ্নমায়া বিজড়িত জ্যোৎস্নাসুধাধারে
অবগাহি, সুদক্ষিণা প্রকৃতির সে ঋণ শোধের
নাই কোনো দাবিদাওয়া, উপভোগে তুষ্ট করি তাঁরে।

উদার আশ্রয়ে তব জীবনের পরম আস্বাদ
পথভ্রান্ত সন্তানেরে দাও পুনঃ তাহার সন্ধান—
বিষের জ্বালায় জ্বলি হারাইয়া মায়ের প্রসাদ
এ ঘোর যন্ত্রণা মাঝে কোলে টেনে শান্তি কর দান,
তব বরাভয়ে আছে দেবতার পূর্ণ আশীর্বাদ,
তুমি ধর্ম, তুমি স্বর্গ, তুমি সর্বকল্যাণনিদান॥

গল্প

বাহির দুয়ার

বাণী রায়

সোনালী সূর্যমুখী সুনীল ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতে রাখতে মঞ্জুলেখা নিজের মনে গান গাইছিল মৃদু কণ্ঠে—

"বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে,
হৃদয়দুয়ার খোলা"—

কলকাতায় বাসা বাঁধবার পরে কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে দুজনেই স্কুলে পড়ছে। সারাদিন ছুটি মঞ্জুলেখার। স্বামীর আয় বেড়েছে, নোট লেখা, পরীক্ষার খাতা দেখা, ছাত্র পড়ানোর পন্থায় বাড়তি আয়ের স্বর্ণভাণ্ড আবিষ্কার করছেন বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক প্রবোধ সরকার। সুতরাং মঞ্জুলেখারও গৃহে কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড ও ঠিকে-ঝি। কাজকর্ম অনেকটা হালকা হয়েছে। তবে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকবার সাধনা যার, তেমন মঞ্জুলেখার দিবস একেবারে অলস হয় না।

ঘরের দরজায় ফুল ফেরি করে গেল। বসবার ঘরটার শ্রী খুলে গেল সামান্য একটু ফুলের ছোঁয়ায়। কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনেছে মঞ্জু, মা-বাবাও দিয়েছেন দু-একটা নতুন ঘর-বাঁধবার সময়ে। বাবা আর নেই। মা দাদার চাকরিস্থলে প্রবাসিনী। কলকাতায় মঞ্জুর পিত্রালয় উঠে গেছে। জীবনের একটা দিক শূন্য।

শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে শাশুড়ী গেছেন। পাকিস্তান হয়ে সুদূরে চলে গেছে সেই স্নিগ্ধ শান্ত গ্রামটি। দেওর কলকাতায় চাকরি করছে তাদের বাড়িতে থেকে। ছোট জা ছেলেপিলে নিয়ে দেশে আছে। জমিজমার আর ভরসা নেই। দেওরের উন্নতি হলেই চলে আসবে তারা।

দেওর থাকায় সুবিধে হয়েছে বহু। ছোটরা দেওরের কাছে সময়ে সময়ে থাকে। মঞ্জুর হাতে প্রচুর সময়।

সেই তো জ্বালা! এত সময় নিয়ে মঞ্জু কি করে? অনেক দিন আগে মঞ্জুর অনেক কাজ ছিল, স্বামী তাকে খুঁজে ফিরতেন। তারপরে এখন মঞ্জুর খুঁজে ফেরার দিন। সর্বদা-ব্যস্ত স্বামীর সময় নেই।

সংসার থেকে সময় কেড়ে আদর্শ পত্নী সেজেছিল মঞ্জু। সেই প্রয়াসের মধ্যেই তার মন প্রেমে উন্মীলিত কমলের মত স্বামীর প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছিল। স্বামীর ক্ষণবসন্ত তারও দেহমনে বসন্ত জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু অধ্যাপকের ক্ষণবসন্ত নোটের খাতায় মুখ ঢাকল। জাগ্রত মন মেলে মঞ্জুলেখাকে খুঁজে বেড়াতে হয় অবসর-বিনোদনের উপায়। ফিরে ফিরে ঘর সাজায় সে, আসবাবের ধুলো ঝাড়ে, জানলা-দরজায় পরদা সেলাই করে দেয়। খাবার তৈরি করে নানারকম। ছেলেমেয়ের জন্য নতুন কায়দায় উল বোনে। পল্লীগ্রামের জীবনকে সম্পূর্ণ শহুরে ছাঁচে ফেলেছে সে। ছেলেমেয়েকে মনের মত করে মানুষ করার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়েছে তার। তার শহুরে চালচলন দেখে গেঁয়ো দেওর হাঁ করে থাকে।

কিন্তু নিজেকে নিয়ে আর কিছুই করা গেল না। গান ভালবাসত, গান শিখেও ছিল। গুনগুন করে গান গেয়ে এখনও আনন্দ পায়। কিন্তু পুরোপুরি গানের রেওয়াজ করা চলে না। বয়স হয়ে গেছে, গলা বসে গেছে। লজ্জাও করে। লেখাপড়ার অবশ্য বয়স বাঁধা নেই। গোপনে বইখাতা খুলে বসে দেখেছে মঞ্জু যতটা সময় দিতে হয়, ঠিক ততটা সময় তার হাতে নেই। স্মৃতিশক্তি বয়সে হ্রাস হয়ে গেছে, চর্চার অভাবে এত পেছিয়ে গেছে সে, যার ফলে পড়াশোনা নতুন করে ঝালাতে হলে আর কিছুই চলবে না। তার ছেলেমেয়ে ময়লা জামা পরবে, ঘরে ঝুল ঝুলবে, রান্নায় নুন কম হবে, এমন খোঁড়া গৃহস্থালি মঞ্জুর সহ্য হবে না। অতএব যে সাধ পূর্ণ হল না—সে সাধ রুপোলী ফিতেয় বাঁধা থাক্ মেয়ের উদ্দেশ্যে। নিজে যে সুযোগ পায় নি, সেই সুযোগ ছেলেমেয়েকে দিতেই হবে। সাধারণের মত সে থাকতে পারবে না সংসারস্রোতে গা ভাসিয়ে। স্রোতের উর্ধ্বে দৃঢ় মৃত্তিকায় পদক্ষেপ তার কাম্য।

হৃদয়-দুয়ার খুলেছে স্বামীর প্রতি, সংসারের ঘর-কন্নার পরিধি থেকে বাহির হয়ে এসেছে সে। কিন্তু—

াধ সরকার পোর্টফোলিওটা আছড়ে ফেলে চেয়ারে
। অসময়ে স্বামীসমাগমপুলকিতা মঞ্জুলেখা আনন্দে
ল, এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে ?
লরা সব পিকেট করছে। ক্লাস হল না। একটু
াও।
ফুলদানি সাজিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করল। ভালই
চা খেয়ে তারা আজ সিনেমায় যাবে।
কাটা পেয়ালায় চা, ঘরে তৈরি নিমকি ছানার
াজিয়ে আনল মঞ্জু চক্ষের পলকে। খুকুমণির
র স্কুল থেকে ফেরার সময় হল। দেওরও আফিস
ফিরে আসবে। তাকে বাড়ির চার্জে রেখে মঞ্জুলেখা
দ আজ পলাতকা।
তের বালা ঘোরাতে ঘোরাতে নতচক্ষে মঞ্জু প্রস্তাব
আজ চল সিনেমায় যাওয়া যাক। কতদিন তোমার
সে সিনেমা দেখি নি!
ন্যমনস্ক স্বামী একখানা চিঠি দেখতে দেখতে
, হুঁ।
হলে তৈরি হইগে, যাই।—মঞ্জু পুলকিতা হল।
ধ্যাপক এতক্ষণে বিস্মিত মুখ তুললেন : কি বলছ ?
দছি আজ সন্ধ্যায় সিনেমায় চল।
স্ত প্রতিবাদ জানালেন প্রবোধ : না না, আমার
কোথায় ? রাত্রের টিউশানটা এখন সেরে নেব।
এসে বইখানায় হাত দিতে হবে। পাব্লিশার
াড়ি করছে।
ায়ের কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।
ণা পত্নীর দিকে চেয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন,
া হয়, কি বলে, সুবোধকে নিয়ে সিনেমায় যাও।
তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাড়িতে থাকব।
ঞ্জুর কান্না পেল। দেওর ক্ষেতী-গৃহস্থ মানুষ, সিনেমা
। না। ওকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি ? স্বামীর এখন
াড় লোকের বাড়ি ছাত্র পড়াবার জন্য যাতায়াত
ছ। তাদেরই একজনকে ধরে দেওরকে কণ্ট্রাক্টরের
স ঢুকিয়ে দিয়েছেন। উন্নতির আশা আছে।
াজটুকু আর ছুটিতে দেশে যাওয়া ভিন্ন দেওর
ধ কিছুই বোঝে না।
ানে পড়ল মঞ্জুর, আগে স্বামী তার জন্য এমনি ব্যাকুল
হতেন। তার কাজ থাকত। আজ সে ব্যাকুল, স্বামী
ব্যস্ত। সংসারকে গড়ে তোলার দিকে হাতে হাত
মিলিয়েছেন স্বামী। রসদ যোগাবার কাজে নিজেকে যন্ত্র
বানিয়ে তবেই নিরস্ত হয়েছেন। সুন্দর সংসার গড়তে হলে
আয় চাই ভাল, কিন্তু মানুষ পথের মোড়ে সুন্দরের স্বপ্নকে
ফেলে রেখে তবেই পথে এগিয়ে আসে।

উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জুলেখা শূন্য ঘরে। আবার মন তার ছটফট করে উঠল। সীমার উর্ধ্বে অসীমকে সে চায়। সেই অসীম কী ?

ধ্যানস্বপ্ন ভেঙে গেল দুরন্ত ছেলে জয়দেবের আবির্ভাবে। নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল জয়দেব, বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিল কোণে।

আঃ, ওকি করছ ? বাবা ফিরে এলে বকবেন যে।—স্বামী সর্বদা মঞ্জুকে শোনান—আদর দিয়ে সে ছেলেটির মাথা খাচ্ছে। গরীবের ছেলে, রোজগার করে তবেই খেতে পাবে। অত প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

ছেলের ক্ষেত্রে স্বামীর মতবাদ মানতে বাধ্য হলেও মেয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জু তিলমাত্র হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। তার মেয়ে যে তারই দ্বিতীয় সত্তা।

জয়দেব মায়ের কথা গ্রাহ্য করল না। বাবা নেই, মা তাকে কিছু বলবেন না, জানে সে। পোষা বিড়ালটাকে খুঁজে ফিরতে লাগল সে।

মঞ্জু বইখাতাগুলো গুছিয়ে রাখতে না রাখতে রোরুদ্যমানা খুকুমণি ঘরে প্রবেশ করল : মেরেছে, আমায় মেরেছে।

কে মেরেছে সোনাকে ?—মঞ্জু খুকুমণিকে কোলে তুলে নিল। হাত তুলে দেখাল খুকুমণি : ওই।

মঞ্জুর নতুন কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড জগমোহন বাস থেকে অবতীর্ণা খুকুমণিকে কোলে তুলে এগিয়ে আনতে যাওয়ায় এই বিপত্তি।

মেয়েকে শান্ত করে খাইয়ে, ছেলেকে খাইয়ে জামা-কাপড় ছাড়াতে না ছাড়াতে দেওর এসে গেল। কিছুক্ষণ কাজের আবর্তে উড়ু উড়ু মন বাঁধা পড়ল মঞ্জুর। ঠিকে-ঝি এসে কাজকর্মে হাত লাগাল। জগমোহন ছেলেমেয়েকে নিয়ে পার্কে গেল। দেওর বেরিয়ে গেল। মঞ্জু আবার একা। এখন সে করে কি ?

কেন এমন লাগে? কি যেন করতে চায় মঞ্জু? সংসারে যতই না কেন শক্তি দেওয়া যাক, ঐশ্বর্যশালী মঞ্জুলেখার সংসার হবে না। রাজবালা সেনশর্মার বিরাট বাড়ি মোড়ের মাথায়। মার্বেল-মোজেকে ঝকমক করছে। জীবনে অমন বাড়ি চেয়ে চেয়ে দেখা ভিন্ন মঞ্জু কখনও বাস করতে পারবে না। মণিকাদির বাড়ির সামনে সর্বদা গাড়ি। মঞ্জু বাস-ট্রামের চিরযাত্রী। কদাচিৎ ট্যাক্সি মেলে। শীলার মেম-বউদি হীরের গয়না পরে বেড়ায়। হীরার ঝলকানি মঞ্জুর কম-সোনার গহনাকে যেন বিদ্রূপ করে। জীবনে কখনও এদের ধারেকাছে পৌঁছবে না মঞ্জু—যতই না কেন ছুটে চলুক।

পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করেছে মঞ্জু সংসারের বাইরে বেরিয়ে। সব থেকে ভাল লাগে চারুকে তার। পাঁচ বছর আগে নববধূ হয়ে পাড়ায় এসেছিল চারু। মঞ্জু তার আদর্শ। সহজ মেয়েটি মঞ্জুর কাছ থেকে নানা উপদেশ নেয়।

সোনালী ফুলের পাশে গালে হাত দিয়ে বসল মঞ্জু। সে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। সুন্দরকে খুঁজে পায় না সে, হয়তো খুঁজতে চায়ও না। সংসারের পথে পথে সম্পদের মোহে সুন্দরকে ভাসিয়ে দিল নাকি সে—সুন্দরী মঞ্জুলেখা?

মঞ্জুদি, দেখুন কারা এসেছেন?—চারুর হর্ষিত কণ্ঠে মঞ্জু চমকে উঠল।

শীলা, মিসেস পাকড়াশী, এমন কি শীলার মেম-বউদি জেন পর্যন্ত এসেছে চারুর সঙ্গে। শশব্যস্ত হয়ে উঠল মঞ্জু। মিসেস পাকড়াশী পাড়ার পাণ্ডা।

বসুন, বসুন।

না মিসেস সরকার, বসতে আসি নি। একটা কাজে এসেছি। বন্যায় দেশ ভেসে গেল। আমরা কি চুপ করে বসে থাকব?—নাটকীয় ভঙ্গিতে কয়েকটি কথা বলে মঞ্জুর মুখের দিকে মিসেস পাকড়াশী শিবনেত্র হয়ে চাইলেন।

না, মোটেই না। মঞ্জু এ ছাড়া ভাষা খুঁজে পেল না। এই কথাটাই যেন তার কাছে আশা করা হচ্ছিল।

প্রসন্ন হয়ে মিসেস পাকড়াশী জানালেন, আমরা পাড়ার মেয়েরা একটা কমিটি খুলেছি। দোর দোরে ভিক্ষে করে টাকা চাল কাপড় তুলব। তারপরে কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির হাতে পাঠাব। আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।—কৃতার্থ হল মঞ্জু, ধন্য হল মঞ্জু। এমন সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাকে দলে নিচ্ছেন! এতদিনে একটা বড়দরের কাজ করে বাঁচবে সে ব্যর্থতার হাত থেকে। তার অনুগতা বন্ধু চারু এঁদের তার কাছে এনেছে, নইলে হয়তো সে দূরেই থেকে যেত।

চায়ের আমন্ত্রণ সবিনয়ে অস্বীকার করে ওঁরা চলে গেলেন। শুধু চারুকে ধরে রাখল মঞ্জু: তুমি এককাপ চা খেয়ে যাও।

চা ছাঁকতে ছাঁকতে ভাবল মঞ্জু, আচ্ছা, জেন যেন কেমন অবাক হয়ে ফরাশে বসল? শীলার মুখে যেন অবজ্ঞার চিহ্ন দেখা দিল। বসবার ঘরে কি কেউ ফরাশ রাখে? টেবিল-চেয়ার যথেষ্ট। না, যথেষ্ট নয়—চাই সোফা, অন্ততঃ একখানা সোফা। মিসেস পাকড়াশী যে দৃষ্টি মেলে তার আপাদমস্তক দেখলেন, সে দৃষ্টির মধ্যে প্রশংসা নেই। অথচ সে এখনও সুন্দরী। সবাই বলে, তার আয়নাও বলে দেয়। কিন্তু পালিশ কোথায়?

শীলার পরিচ্ছদ কী রুচিসম্পন্ন, জেন আধুনিক শাড়িখানা কী চমৎকার পরেছে! কে বলবে বিদেশিনী? আর মঞ্জুলেখা বর্তমানে বসে পাড়াগেঁয়ে হয়ে গেল নাকি? এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে তাকে এদের মতই হতে হবে। নইলে এই সমাজে তার মুখ থাকবে না, ছেলেমেয়ে উচ্চতর সমাজে ছাড়পত্র পাবে না।

চায়ের পাত্র চারুর হাতে দিয়ে মঞ্জু বলল, ভাই চারু, বড় লজ্জা পেলাম। একটা সোফা নেই।

তাতে কি হয়েছে, মঞ্জুদি?

না, সকলের ঘরেই আছে ভাই, আমার ছাড়া। ভদ্রসমাজে মিশতে হলে উপকরণের দরকার হয়। উনি মোটে সময় পান না, তা ছাড়া এসব দিকে মনও নেই। দেওর গ্রামের লোক। শহুরে হালচাল বোঝে না। নতুন জিনিস কেনার সামর্থ্য নেই। পুরনো নাকি পাওয়া যায় কিনতে? কুঞ্জবাবুকে একটু জিজ্ঞেস করো না।

গভর্মেণ্ট অফিসার কুঞ্জ লাহিড়ী অনেক খবর রাখেন। চারু আশ্বাস দিল, আমি কালকের মধ্যে আপনাকে সমস্ত জানিয়ে দেব। তাই তো, আপনিই যা ওদের চেয়ে কম

রামগিরি

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শৃঙ্গে তরঙ্গিয়া আদিগন্ত জাগে তুঙ্গশির
বন সমাচ্ছন্ন গিরিমালা নির্জন গম্ভীর
শাল বিন্ধ্যারণ্যে। কোমল পল্লবশ্যামলিমা
শ্রী মণ্ডিত করে প্রকৃতির দুঃসহ মহিমা :
বর্ণ পুষ্পপর্ণ ঢাকে রুক্ষ বন্ধুর প্রস্তরে
মায়াবলেপে। ধূম্রনীল গিরি স্তরে স্তরে—
ক দিকে প্রসারিত মহাদ্রির শাখাপ্রশাখায়—
শত শৈলশীর্ষে আজও মেঘ কাজল মাখায়
ঢ়-প্রথমদিনে; শ্বাপদসঙ্কুল সানুদেশে
ড়ামত্ত গজসম আজও তারা খেলা করে এসে
বর্ষে বর্ষাগমে: আনে বাণী নীরব নির্ঝরে,
ঘনিৰ্জিতবনে আনে প্রাণ নব পত্রস্তরে।
চিররহস্যরাজ্যে সত্য আর স্বপ্নের সীমায়
জে অম্বরচুম্বী রামগিরি নিজ মহিমায়
জ্জ্বল যুগে যুগে। একদিন ত্রেতার প্রভাতে
এসেছিল নাকি প্রিয়া জায়া প্রিয় ভ্রাতা সাথে
চাবৃত নির্বাসনে মহাসত্ত্ব মনুজেন্দ্র রাম।

রামগড়—একি সেই রামগিরি? সেই পুণ্যধাম
বর্ণিত পুরাণে কাব্যে? হাসিমুখে অভিষেকক্ষণে
ত্যজি' পিতৃসিংহাসন ভারতের হৃদিসিংহাসনে
আরোহিল যে রাজেন্দ্র,—যার নিত্য-অভিষেক চলে
যুগে যুগান্তরে,—তারি স্মৃতি জাগে এই মহাচলে?
সত্যমিথ্যা কে বলিবে? এ কথা ভাবিতে ভালো লাগে
রাজপুত্র রাজ্যবালা দুজনে দোঁহার অনুরাগে
একদা এ ছায়াস্নিগ্ধ শৈলগাত্রে পল্লবকুটিরে
তুচ্ছ বলি মেনেছিল রাজ্যসুখ,—নির্ঝরিণীনীরে
করি স্নান,—যাপি' দিন ধূলিতলে পর্ণশয্যা'পরে!
অবশেষে একদিন গেল চলি তারা বনান্তরে
দূর দক্ষিণের পথে। গিরিসানুবাসী মুনিজন
তাহাদের ভুলিল না, তপঃক্ষেত্র করিল সৃজন
মিলি সবে শ্রদ্ধাভরে সে পর্ণশালার চারিপাশে:
বেদমন্ত্রধ্বনিসনে হোমধূম উঠিল আকাশে।
দিন যায়। একদিন সেথা ক্ষীণ বনপথ ধরি
আসিলেন বৃদ্ধ ঋষি রামের পদাঙ্ক অনুসরি

সে? একটু আধুনিক ভাবে এবার চলাফেরা এমন রূপ আপনার! কিন্তু পাঁচ বছর ধরে রনে সাজ করছেন। কত কী সাজগোজের জিনিস পড় বেরিয়েছে। এক-একটা পার্টিতে যাবার দের সাজ দেখে মরে যাই।

বিদায় নেবার পর মঞ্জু তিনখানি ঘরের ফ্ল্যাটে মনে মনে সাজাল তাকে হাল-ফ্যাশনের কায়দায়। ঘরে খাবার টেবিলে পেতেছে সে জ্যাঠামশায়ের টেবিল স্মরণ করে। কিন্তু বসার ঘরে সোফা-সেটি এই মাসেই কিনে ফেলবে। আবদার ধরলে শুই টাকা দেবেন।

র বড়লোক ছাত্রছাত্রীর বাড়ি পার্টিতে এতদিন সে। এবার থেকে যাবে। আধুনিক সমাজে বিলিয়ে দিয়ে আধুনিকী সে সাজবে।

চোখ বন্ধ করে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল সে। না, শান্ত পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য স্বপ্ন নয়। শিল্পসংস্কৃতিমণ্ডিত জীবনের স্বপ্ন নয়। আধুনিক উপকরণে সজ্জিত সম্পন্ন সংসারের স্বপ্ন দেখতে লাগল সে।

সেখানে সোফা-সেটি থাকবে। সেখানে কী করবে সে? সে চা-পার্টি দেবে, হ্যাঁ, চা-পার্টিই দেবে সে একটা—অসংখ্য। আধুনিক তরুণীর পরিমণ্ডলে মিশে গেল আজ স্বতন্ত্র মঞ্জুলেখা। আকাশের স্বপ্ন তার শেষ হয়ে গেল ঘরের চার দেওয়ালের বেষ্টনে। আর তার গলার গান শেষ হয়ে গেল।

সোনালী ফুলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মঞ্জুলেখা চা-পার্টির স্বপ্ন দেখতে লাগল।

তীর্থপরিক্রমাছলে। চাহি জীর্ণ পর্ণশালা পানে
করুণ অন্তরে তাঁর কি রাগিণী বাজিল কে জানে
সেদিন এ শৈলপ্রস্থে! মোরা শুধু জানি তারপর
বাল্মীকি অনিন্দ্য ছন্দে রামচন্দ্রে করিলা অমর
মহাকাব্য রামায়ণে : সে কাব্যের অপূর্ব সুরভি
ভরিল ভারত : ক'টি মহাজীবনের পুণ্যছবি
মহা-সম্ভাবনা লয়ে দিল দেখা মানবমঙ্গলে।
এক নরদেবতার পূজামন্ত্রে সিন্ধুহিমাচলে
বেঁধে দিল : নরনারী-চিত্তলোকে রামরাজ্যস্মৃতি
নব নব মহিমায় দিনে দিনে উদ্ভাসিল নিতি
রাঘবের জীবনান্তে। এ গিরির মাটি হল সোনা,
অরণ্য হইল তীর্থ। পুণ্যকামীদের আনাগোনা
হল শুরু এ দুর্গমে। কত ক্লেশে, কত না উপায়ে
পথহীন বনভূমে কত পথ রচি পায়ে পায়ে
দিক্ দিগন্তর হতে এল তীর্থপথিকের দল ;
এল রথ, অশ্ব, গজ ; পর্বদিনে উৎসব চঞ্চল
পণ্যবীথি-কোলাহলে ধ্যানভঙ্গ হল বনানীর :
শঙ্খঘণ্টামুখরিত শৈলশিরে উঠিল মন্দির।
মঠে চৈত্যে গেল ভরি শান্ত স্থির মুনি-তপোবন ;—
জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদক গিরিপ্রস্রবণ।

দিন যায়, যুগ যায়, সহস্র সহস্র বর্ষ যায় ;
সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ,—কত বংশ ফুরাল ধরায় :
তুচ্ছ করি শত রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন
রামরাজ্য জেগে আছে শুধু ধ্রুবতারার মতন
ভক্তচিত্তে। এ আশ্রমে জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপে
শ্বাপদসঙ্কুল বনে পূজারতি চলে কোনরূপে।
ক্বচিৎ কখনো আসে যাত্রী হেথা রাম-অনুরাগে :
অবশেষে একদিন সার্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ আগে
অকস্মাৎ দিল দেখা পুণ্যলোভী মহাশ্রেষ্ঠী কেহ ;
চাহিল আশ্রয় দিতে সাধুজনে রচি গুহাগেহ—
ভিত্তিচিত্রে সুশোভিত অকৃত্রিম কন্দরেরে কাটি
গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে : মন্দির নির্মিতে পরিপাটি
শৈলশীর্ষে রামসীতালক্ষ্মণের বিগ্রহে শোভিত।
দেশদেশান্তর হতে অর্থলোভে হয়ে প্রলোভিত
এল বহু গুণী শিল্পী এ অরণ্যে আহ্বানেতে তাঁর
রচিতে মন্দির মূর্তি,—লয়ে গুহাগেহসৃষ্টিভার।
মিলি তাহাদের সাথে হেথা এসেছিল একদিন
এ বিজন বনপ্রান্তে তরুণ ভাস্কর দেবদীন
দূর বারাণসী হতে ; কাশীরাজদণ্ডে নির্বাসিত ;
অল্পভাষী অমায়িক। লোকে বলে ভাল সে বাসিত
অকাম্যা নারীরে কোন—অনিন্দ্যসুন্দরী সেই নারী
দেবোদ্দেশে নিবেদিতা,—হয়ে তার প্রণয়ভিখারী
করেছে যে অপরাধ—প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তার
এল সে কঠিন শ্রমে,—নিষ্ঠুর অতনু দেবতার
মূক বলি! রূপদক্ষ অতীত ভুলিতে পারে না যে,
তাই চাহে বর্তমানে ডুবাইতে রন্ধ্রহীন কাজে।
অতন্দ্র যন্ত্রের মত দৃঢ়হস্তে দীর্ঘদিনমান
নব নব রূপসৃষ্টি করিত সে কাটিয়া পাষাণ।
ক্বচিৎ বারেক কভু ভুলিয়া ছেদনী করধৃত
সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে ঊর্ধ্বাকাশে হয়তো দেখিত
অর্থহীন কলালাপে সচকি আরণ্য নীরবতা
দলে দলে কলহংস উড়ে চলে! সেদিন কি ব্যথা
ব্যাকুল করিত তারে কে বলিবে? কর্মঅন্তে তার
গুহাগৃহদ্বারে বসি দিনশেষে দিগন্ত বিস্তার
হেরিয়া কান্তারকান্তি অন্তর কি হইত উদাস
গৃহ লাগি! বর্ষাগমে নবমেঘে ভরিলে আকাশ
কাঁদিত প্রবাসী চিত্ত? মেঘপানে চাহি অন্যমনে
হেরিত মানসনেত্রে বিশ্বনাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণে
সুপ্রশস্ত নাট্যশালে চলে নৃত্য। মুগ্ধ নরনারী
বিচিত্র উৎসব সাজে দেখিতেছে বসি সারি সারি
অপরূপলাস্যভঙ্গে তরঙ্গিত তনুর সুষমা
তন্বী দেবদাসীদের! তারি মাঝে তার প্রিয়তমা
ছিল এক বরাঙ্গনা! যৌবনপুষ্পিত দিব্যতনু—
পুষ্পসাজে অপরূপা! নারীদেহ ধরি পুষ্পধনু
বুঝি সে যুবতীদেহে চোখে তার রেখেছিল চোখ!
মর্মে তার কামনার কি অদৃশ্য শাণিতশায়ক
বিঁধেছিল সেই জানে। সেই হতে স্বর্গে মর্তে আর
সুতনুকা ছাড়া কেহ রহিল না : মূঢ় শিল্পী তার
সঙ্গসুধাকামনায় বিসর্জন দিল লজ্জা ভয়
পাপ পুণ্য বোধ : ক্রমে দিনে দিনে করিল সে জয়
কনকচম্পককান্তি অমিতলাবণ্যা রমণীর

র্ভ হৃদয়রাজ্য : যে সুন্দরী মুকুটমণির
প্রান্তে আপনারে নিঃশেষে করিয়া নিবেদন
য় হল। তারপর এল কত শঙ্কিত মিলন
ত অন্ধকার রাত্রে, পুরপ্রান্তে কত অভিসার ;
ন্দরীর দেহে মনে নিত্য নব কত আবিষ্কার ;
ত আশা, কত স্বপ্ন! অবশেষে সব অবসান!
হসা ঘিরিল আসি উল্কালোকে উন্মুক্ত কৃপাণ
ক্ষীদল মধ্যরাত্রে বেণুকুঞ্জে বরুণার তীরে!
দৃশ্য কী ভোলা যায়? দেবদীনে বাহুপাশে ঘিরে
ার্তকণ্ঠে সুতনুকা বলেছিল, "মৃত্যু যদি হয়
ামি তব সঙ্গী হব সে মরণে : যদি প্রাণ রয়
দখা হবে একদিন। জনমে মরণে আমি তব
্নেহাধীন, যেথা থাকি চিরদিন পথ চেয়ে রব।"
ছন্ন করি বাহুপাশ বলে ধরি লয়ে গেল তারে
কাথা জানি পুরপাল। পরদিন রাজার বিচারে
র্বিস্বান্ত দেবদীন ত্যজিয়া আসিল বারাণসী।
মাজ কোথা সুতনুকা? কারাকক্ষ-অন্ধকারে বসি
মাজও কী সে স্মরিতেছে হতভাগ্য প্রণয়ীরে তার?
মথবা পেয়েছে ক্ষমা? প্রায়শ্চিত্ত শেষে দেবতার
ন্দিরের নৃত্যোৎসবে আবার আহ্বান লভিয়াছে?
তদীপদীপ্ত কক্ষে কুহকিনী তেমনি কী নাচে
কৌষেয় বসনে সাজি? ঝলে আলো কিরীটে কুণ্ডলে?
আজও দোলে পুষ্পমালা পেলবপীবর বক্ষতলে?
রূপমুগ্ধ আর কোনও পাপিষ্ঠের প্রলোভনে পড়ি
হয় নি তো পথভ্রষ্টা প্রিয়া তার? আপনা পাসরি
কেঁপে ওঠে দেবদীন। সারারাত না পারে ঘুমাতে,
বনমল্লিকার গন্ধে অন্ধকারে বসি অর্ধরাতে
দিগন্তে চাহিয়া থাকে ; সুখসুপ্ত সঙ্গীগণ তার
ন্ধান রাখে না সেই অন্তহীন নিশীথচিন্তার।
সারাদিন ভিত্তিগাত্রে আঁকে ছবি শিল্পী শুভঙ্কর,
মৃগয়া, উৎসবদৃশ্য, মঠ, চৈত্য, মালঞ্চ, মকর।
পার্শ্বে সীতাস্মৃতিপূত অন্য এক গুহায় সুষেণ
স্বচ্ছন্দে 'স্বভাবগুরু কবি'র প্রশস্তি লিখিছেন
বসন্তের দোলোৎসব-আনন্দের বর্ণনা মিশায়ে।
দেবদীন দেখে শুধু : কর্ম-অন্তে হরিতকী ছায়ে
বসে থাকে অন্যমনে। গুহানিম্নে অর্ধ বৃত্তাকার
পাষাণ সোপানশ্রেণী. সেথা বসি সঙ্গীরা তাহার
করে হাস্যপরিহাস, গাহে গান দিবা-অবসানে।
দেবদীন বনপথে একা ফিরে মগ্ন নিজধ্যানে।
বর্ষ যায়, বর্ষ আসে। মন্দির সম্পূর্ণ হয় ক্রমে,
সাজ বহু গুহাগৃহ। কদাহারে সুকঠিন শ্রমে
শীর্ণ রুগ্ন দেবদীন। দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণোপম
অযত্নে মলিন, ভালে বলিরেখা, শিরে বৃদ্ধসম
শুক্লকেশ! সদ্যোলব্ধ সুচিরদিনের উপার্জন
লয়ে ভাবে, কী করিবে? মাতৃহীন গৃহে আকর্ষণ
কিছু নাই, তবু তারে রাত্রিদিন ডাকে বারাণসী—
ডাকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গাতীরে সোপানেতে বসি,—
সহস্র মন্দিরে ডাকে, দীপোজ্জ্বল শত সরণিতে
প্রাণোচ্ছল জনারণ্যে, নদীবক্ষে লক্ষ তরণীতে।
তারি মাঝে একজন ডাকে তারে—যার ডাক শুনে
ডরে না সে হাসিমুখে প্রাণ দিতে জ্বলন্ত আগুনে,
রাজরোষে খর খড়্গে। তবু আজ চিত্তে জাগে ভয়
মৃত্যু হতে ভয়ঙ্কর, স্বপ্ন যদি সত্য নাহি হয়?
যার তরে এত দুঃখ, সে যদি চিনিতে'নারে, তবে?
সে যদি ফিরায় মুখ অনাদরে—তখন কী হবে?
ব্যর্থ এ সঞ্চয় লয়ে কোথা তবে লজ্জা লুকাবে সে?
তার চেয়ে স্বপ্নঘোরে দূরে থাকা ভাল ভালবেসে।
সঙ্গীদের ঘরে ঘরে প্রিয়জন অপেক্ষিয়া আছে ;
আনন্দে উৎফুল্ল তারা যাত্রা-আয়োজনে মাতিয়াছে ;
কারও মনে নাই দ্বিধা ছেড়ে যেতে এ অরণ্যপুরী—
নিষ্ঠুর প্রবাসবাস। শুধু যার সব গেছে চুরি,
অতীতের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেছে যার ঢাকি,
তার যেতে পা ওঠে না। সবে গেলে সে রহি একাকী
সুনিশ্চিন্ত অবসরে কঠিন পাষাণ কাটি শেষে
লিখে গেল ভিত্তিগাত্রে নাহি জানি কাহার উদ্দেশে
গোপন প্রাণের কথা : "সুতনুকা নামে দেবদাসী,
কামনা করিল তারে দেবদীন বারাণসীবাসী
রূপদক্ষ।" ব্যথাভারে বাক্য আর যোগাল না তার।
আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে আকাশ তখনও অন্ধকার
উষারাত্রে ; হতভাগ্য গেল চলি কোথায় কে জানে,
কোন তীর্থে অকৃতার্থ জীবনের সান্ত্বনাসন্ধানে?
শুধু আছে লোকশ্রুতি, দীর্ঘদিন পরে তারপর

দীর্ঘশ্মশ্রুজটা এক যোগী সেই শূন্য গুহাঘর
আশ্রয় করিয়াছিল কিছুকাল। রহিত সে একা;
হাসিত কাঁদিত কভু মাঝে মাঝে গিরিগাত্রে লেখা
লিপি হেরি; বহুদিন রহিত সম্পূর্ণ উপবাসী:
তাপসী করুণাময়ী কেহ কভু মাঝে মাঝে আসি
দিয়া যেত ফলজল। একদিন তাহাদেরি কেহ
রাত্রিশেষে আসি দেখি তপস্বীর রক্তাপ্লুত দেহ
দাঁড়াইল শিহরিয়া। কেহ তারে হত্যা করিয়াছে
অথবা সে আত্মঘাতী—আজও প্রহেলিকা হয়ে আছে।
কে সে নামাইল বোঝা দীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার
যোগীমারা গুহাগর্ভে কেহ তথ্য নাহি জানে তার।

তারপর একদিন বহু শতাব্দীর ব্যবধানে
একদা দাঁড়াল আসি গিরিসানুদেশে এইখানে
সে এক মরমী কবি: অনুচরগণে দূরে রাখি,
দূরে রাখি রথ অশ্ব পদব্রজে আসিল একাকী
এ-পুণ্য আশ্রমে। ঘন নীলমেঘে সেদিন সুন্দর
মেদুর অম্বরতল, ছায়াচ্ছন্ন বনবনান্তর
আষাঢ়ের স্নেহস্নিগ্ধ। অরণ্য উঠিছে গান গাহি
নির্ঝরকল্লোলরবে। মুগ্ধচক্ষে রহিল সে চাহি
ক্ষণকাল। তারপরে সৌম্য মূর্তি হেরি তপস্বীরে
বনপথে শুধাইল করপুটে নমি নতশিরে,
"ভগবন্, এই পথে গিরিশীর্ষে পারিব কি যেতে?
বিদেশী যাত্রীর কোথা আশ্রয় মিলিবে নিকটেতে
কহ মোরে দয়া করি। পান্থ আমি, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর।"
সাধু কহিলেন হাসি, "বৎস, আগে তৃষ্ণা কর দূর;
দক্ষিণের ঐ পথে অদূরে মিলিবে প্রস্রবণ।
সেথা হতে উর্ধ্বে গিয়া শ্রীমন্দিরে করিও গ্রহণ
প্রসাদান্ন; তারপর অবতরি পাবে গুহাগৃহ
সুরঙ্গপথের পারে: রাত্রে কিন্তু সতর্ক রহিও।
ভূতযোনিগ্রস্ত গুহা; ভিত্তিগাত্রে অজ্ঞাত অক্ষরে
আছে লিপি—অপ্রস্তুত পথিকের অমঙ্গল করে।"
হাসিয়া বিদায় লয়ে গেল কবি। তীর্থস্নান সারি
আনন্দে করিয়া পান নির্ঝরের স্বাদু স্নিগ্ধবারি—
গিরিশীর্ষে আরোহিয়া দিয়া পূজা রাঘবমন্দিরে—
লভিয়া প্রসাদ-অন্ন অপরাহ্ণে নামি এল ফিরে
উপলচিহ্নিত পথে। কোথা মৃগশিশু কুতূহলী
বসন আঘ্রাণ করি চকিতে ছুটিয়া গেল চলি;
কোথাও নীবারক্ষেত্র; কোথাও অরণ্য-অন্তরালে
দু-চারিটি পর্ণগেহ: কোনখানে তরু-আলবালে
মৃন্ময় কলসকক্ষে ঢালে জল তাপসললনা:
হাসিয়া চাহিল কেহ আঁখি তুলি, কথা কহিল না।
কোনখানে বটবিল্ব আমলক পনস রসাল
হোমধূমসুরভিত বেদী'পরে রচি ছায়াজাল
নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছে: কোনখানে কৃষ্ণাজিন 'পরে
ধ্যানমগ্ন ঋষি কেহ,—পুণ্যতনু সন্ধ্যাসূর্যকরে
জ্বলিছে গলিত স্বর্ণে! ক্রমে সুরঙ্গেতে পশিল সে—
দ্বারে যার গিরিগাত্রে ঝরিতেছে গম্ভীর নির্ঘোষে
জলধারা উর্ধ্ব হতে। পান করি সে অমৃতবৎ
তুহিনশীতল বারি,—পার হয়ে সে সুরঙ্গপথ
ক্রমে উত্তরিল যাত্রী যেথায় পর্বতবক্ষে রাজে
পল্লবপ্রচ্ছন্ন গুহা। ভিত্তিচিত্র ছিল কক্ষমাঝে—
বিকৃত তা কালবশে—বহু স্থূলহস্তাবলেপনে।
সোপানশোভিত গৃহ দেখিতে দেখিতে অন্যমনে
চমকি উঠিল কবি। ব্রাহ্মীলেখে শিলালিপিখানি
সহসা পড়িয়া চক্ষে সহস্রাব্দ পারে নিল টানি
যেন তারে আচম্বিতে: "সুতনুকা নামে দেবদাসী,
তারে চেয়েছিল শিল্পী দেবদীন বারাণসীবাসী।"
অতি অল্প কটি কথা, কিন্তু তার কী গূঢ় ব্যঞ্জনা!
চেয়েছিল, পায় নাই। না পাওয়ার সে তীব্র যন্ত্রণা
রেখেছে অক্ষয় করি রক্তক্ষরা এ কটি অক্ষরে
কোন স্বল্পবাক শিল্পী কবে কোন বিস্মৃত বৎসরে
এই বনবাসে বসি? অন্তর্গূঢ় তার হাহাকার—
দূর অতীতের দুঃখ দ্বার ভেঙে এল বক্ষে তার।
পাষাণ-গলানো বাণী পাষাণের বক্ষে ছিল জাগি
কতদিন কতরাত্রি সমবেদনার অশ্রু মাগি,
আজি সে সার্থক হল। মূর্তি ধরি মানস নয়নে
দেখা দিল দেবদীন প্রিয়া তার সুতনুকাসনে
মাঝে লয়ে বিরহের অশ্রুনদী, ভাষাহীন শোকে
চাহিল কবির চোখে যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোকে!
উড়িয়া সহস্র বর্ষ শ্রান্তপক্ষ কুলায় প্রত্যাশী
দুটি নিরাশ্রয় পাখী অকস্মাৎ উত্তরিল আসি

। পরিচিত নীড়ে সান্ত্বনার স্নেহস্পর্শলোভে।
হয়া রহিল কবি জর্জরিত নিরুপায় ক্ষোভে।
র্ হতে ছিদ্রপথে দিনান্তের রক্তরশ্মি এসে
ড়ল প্রশস্ত ভালে: যেন সে বলিল ভালবেসে,
রা পেল নাকো তারা চলে গেছে, ফিরিবে না তারা;
মার করুণ শ্লোকে তাদের বিচ্ছেদ-অশ্রুধারা
ক্ষয় করিয়া রাখ, ওগো কবি।" নিস্তব্ধ-কাকলি
ন্তের তরুশীর্ষে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে জ্বলি।
ম পাতি তৃণশয্যা, বেণুবেষ্টনীতে রুদ্ধ করি
প্রশস্ত গুহামুখ শ্রান্তদেহে যাপিতে শর্বরী
ন করিল কবি। যেমনি মুদিল চক্ষু দুটি
। যুগান্তের যত অশরীরী এল যেন ছুটি
ড় করি। দেবদীন দেখা দিল লয়ে তারি মত
ত শতাব্দীর যত বিচ্ছেদ ব্যথিতে ভাগ্যহত।
য় বক্ষচ্যুতা নারী—প্রিয়াবাহুবল্লীচ্যুত নর—
রবে দাঁড়াল ঘিরি দলে দলে। ব্যাকুল অন্তর
ঠয়া বসিল কবি অশ্রুর অতীত কী যে শোক
থিল চিত্ত তার জানিল না ধরণীর লোক।
হয়া সুদীর্ঘ রাত্রি শিলাগৃহে সে চিত্তদহন—
দনার শিলাস্তূপ বক্ষোমাঝে করিয়া বহন—
ফুটিতে উষালোক গেল চলি বনবীথি দিয়া
লপাদমূলে যেথা সঙ্গিদল ছিল প্রতীক্ষিয়া
াবারে; গেল চলি স্বগৃহ-উদ্দেশে সেথা হতে
মালবের পথে—রাজদত্ত স্বর্ণচূড় রথে।

ল, কিন্তু ভুলিল না। শিপ্রাতীরে নিকুঞ্জ ভবনে
ত বর্ষে মেঘোদয়ে রামগিরি পড়ে তার মনে,
ন পড়ে দেবদীনে: সহসা গভীর দীর্ঘশ্বাসে
য়সীর কণ্ঠলগ্ন বাহুডোর শ্লথ হয়ে আসে।

ভুলিল না কালিদাস। তার বহু বহুদিন পরে
আষাঢ় প্রথম দিনে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ শিখরে
একদা কবির কণ্ঠ ধ্বনিল অপূর্ব ছন্দে কোন!
পুলকিত পুরবাসী অশ্রুনেত্রে করিল শ্রবণ
'মেঘদূত'। অতীতের রামগিরিশীর্ষ হতে আসি
বর্ষার মেঘের সাথে বিরহী যক্ষের অশ্রুরাশি
নিমেষে ভাসায়ে দিল রাজসভা করুণা-বন্যায়;
নির্বাসিত পেল ভাষা, লজ্জা পেল দর্পিত অন্যায়।
সে কাব্য সেদিন হতে যুগ যুগান্তের ব্যবধানে
আজও সহৃদয় চক্ষে সমবেদনার অশ্রু আনে।
সহস্র বিরহিচিত্ত স্নিগ্ধ হয় করি তাহে স্নান।
সাগরসঙ্গমে আসি গঙ্গোত্রীর কে করে সন্ধান?
যার চিত্তব্যথা কবি চেয়েছিল অক্ষয় করিতে
তারে কেহ নাহি জানে; মন্দাক্রান্তা ছন্দের তরীতে
শুধু চলিয়াছে ভাসি চিরবিরহের পূজা তার
কালসিন্ধু পার হয়ে মন্দির উদ্দেশে বাঞ্ছিতার।
দেশে দেশে ঘরে ঘরে চলেছে সে মহাগীতখানি
বুলায়ে বিরহিবক্ষে সমবেদনার স্নিগ্ধ পাণি।

---

* মহাকবি কালিদাসবর্ণিত 'রামগিরি' কোথায়—সে প্রশ্নের শেষ মীমাংসা আজও হয় নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক ডাঃ ব্লক মধ্যপ্রদেশের 'রামটের'কে রামগিরি বলেন, সুপণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রভৃতি সুরগুজার 'রামগড়'কে রামগিরি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ডাঃ ব্লক রামগড়ের শিলালিপিতে দেবদাসীর উল্লেখ পাইয়া এবং সোপানশ্রেণী দেখিয়া (সেখানে বসিয়া অভিনয় দেখা অসম্ভব) সেখানকার যোগীমারা গুহাকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাট্যশালা বলিয়া অনুমান করিলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা সে কথা বিশ্বাস করেন না। এখানে রামগড় পর্বতই 'রামগিরি' বলিয়া ধরিয়া লইয়া কালিদাসের মেঘদূত রচনার প্রেরণা লাভ সম্বন্ধে একটি সম্ভাব্য নূতন দিক আলোচিত হইয়াছে।—(লেখক)

সন্ধ্যা রাত্রি ভোর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সন্ধ্যা রাত্রি ভোর
আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে বছরে বছরে।
আশঙ্কাও বাড়ে;
নতুন চৈতন্যে আমি লীন হতে গিয়ে দেখি
এখনও কপট বন্ধু আমাকেই ডাকে,
সিন্ধবাদী বোঝা চাপে ঘাড়ে।
সৃষ্টিতে নির্মাণে গানে প্রতিশ্রুত বহুদিন থেকে;
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তের গোপন সভায়
শীত কিংবা বসন্তের ভিন্ন ব্যঞ্জনায়
শারদ স্বর্ণাভ রোদে নীল মহিমায়
শান্ত সুস্থ জীবনের উত্তরাধিকার
বলিষ্ঠ সংহতরূপে কোন্ ক্ষণে উন্মোচিত হবে
এই ভেবে আজীবন অপেক্ষায় আছি।
এই ভেবে হতাশার গ্লানিকে তাড়িয়ে
আড়ালে আশার বাহু সর্বত্র বাড়িয়ে
গোপন গ্রন্থির জট খুলে খুলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মরি আর বাঁচি।

আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে বছরে বছরে।
কর্মী আর প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি বুকে বয়ে নিয়ে
বৃষ্টিতে রৌদ্রতে আর হাওয়াতেই পরিশুদ্ধ হয়ে
দুর্গম মোহানাগামী নদীর মতই
অবারিত হতে চায় ক্ষয়ক্ষতি গঞ্জনাকে সয়ে।
শুধুমাত্র বাঁচবার তাগিদেই নয়
শুধু স্বপ্ন দেখবার আনন্দেই নয়,
ভাঙনের মুখে অন্য প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনায়
অভিভূত হয়ে
সুবর্ণরেখায় নব চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে
কপট বন্ধুর ভান চূর্ণ ক'রে কঠিন পেষণে
তৃপ্ত হবে এই ক্ষোভ, এই প্রতিশ্রুতি!

আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে বছরে বছরে
আশঙ্কাও বাড়ে;
কখনও কখনও
যে-আমাকে দূর থেকে হাসায় কাঁদায়
এবং বিভ্রান্তি আনে ম্লান লঘুস্বরে
সে আমার শত্রু তবু নয়,
সুমিত জীবনবোধে নব উদ্বোধনে
সে আমার নিভৃত প্রত্যয়।
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তের গোপন সভায়
তীব্র শীতে বসন্তের বর্ণব্যঞ্জনায়
শারদ স্বর্ণাভ রোদে নীল মহিমায়
শান্ত সুস্থ জীবনের উত্তরাধিকার
এখনও গভীর কোণে খেদহীন প্রস্তুতির পথে
কী এক-বিরল ঢেউ তোলে চেতনায়।

হঠাৎ চমকে উঠি অন্য এক লুপ্তিহীন স্বরে,
টান লাগে সাড়া জাগে অদৃশ্য শিকড়ে।
বৃষ্টি রৌদ্র হাওয়াতেই অহরহ পরিশুদ্ধ হয়ে
দুর্গম মোহানাগামী স্ফীতবেগ নদীর মতই
কর্মী আর প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি বুকে করে নিয়ে
আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে বছরে বছরে॥

উইলিয়ম হিকি (২)

'জেন্টলম্যান অ্যাটর্নি'

মি যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছলাম, তখন এখানকার ইংরেজরা নানারকমের লেস-ঝালর । খুব জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বাইরের চলাফেরা করতেন। আমার নিজের বরাবরই ঝোঁক ছিল বাবুগিরির দিকে। সহজেই তাই ফ্যাশানের স্রোতে আমি গা ভাসিয়ে দিলাম। র দামী-দামী লেস ভেলভেটের সাজগোজ দেখে । রীতিমত অবাক হয়ে যেতেন। এ ছাড়া, একজোড়া র সুন্দর একটি ফিটনগাড়ি, এবং পিঠে চড়ার জন্য ার একজোড়া আরবী ঘোড়াও আমার ছিল। র পোশাক ও চালচলনের সঙ্গে কেউ টেক্কা দিয়ে সাহস পেতেন না। কলকাতা শহরে আমার তাই হয়ে গেল 'জেন্টলম্যান অ্যাটর্নি'। অ্যাটর্নিদের ও আমি একটা ফারাক রেখে চলতাম, দু-চারজন অ্যাটর্নি ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা াম না। সপ্তাহে একটা করে ডিনারপার্টি দিতাম তে, এবং তাতে বেশ হৈ-হল্লা করে খানিকটা সময় ত। আমার সঙ্গী ক্লিভল্যাণ্ড এসব ব্যাপারে বিশেষ দিতেন না, তাড়াতাড়ি ছুটো কোনরকমে খেয়ে র ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। তাঁর ধারণা ছিল এসব ন তিনি একেবারে বয়ে যাবেন।

মদ্যপান ও রাত্রিযাপনের ব্যাপারে ক্রমেই আমি বেশ বাড়াবাড়ি করতে লাগলাম। ঠিক আমার মতন এতটা উচ্ছৃঙ্খল হতে আর কাউকে দেখি নি। সকাল সাতটার আগে কাজের জন্য আমি আমার ডেস্কে বসতাম, এবং আধঘণ্টা ব্রেকফাস্টের জন্য কাটিয়ে একটানা ডিনারের সময় পর্যন্ত কাজ করতাম। তারপর, খুব জরুরী কোন কাজ না থাকলে আর আমি সহজে কাগজকলম নিয়ে বসতাম না। আমার মক্কেলের অভাব হয় নি কোনদিন, বরং দিনদিন তার সংখ্যা বেড়েই গেছে। টাকাপয়সাও যথেষ্ট রোজগার করেছি, কোনদিন কিছুর অভাব বোধ করি নি। জিনিসপত্র কেনাকাটা সম্বন্ধে আমার সেইজন্য কোন চেতনাই ছিল না। যা প্রাণে চাইত, তাই কিনতাম। যে-কোন দোকান থেকে নয়, সেই জিনিসের সবচেয়ে বড় দোকানে অর্ডার দিতাম। মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই বাজারের ধার-দেনা সব শোধ করে দিতাম। কাজকর্মের প্রবল চাপের জন্য তিনজন 'নেটিব' ক্লার্কও আমাকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল।

যত কাজই থাক্, সপ্তাহে অন্তত একবার করে কর্নেল ওয়াটসনের ডকইয়ার্ডে আমাকে যেতেই হত। একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে দেখলাম, মজুররা মাটি পরীক্ষার জন্য জমির নানা স্থানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে। মাটির তলা থেকে প্রায় তিন ফুট পুরু সব কাঠের বড় বড় টুকরো পাওয়া গেল। এগুলি কিসের কাঠ, কোথা থেকে এল, আমরা কেউ তা বুঝতে পারলাম না। ফেব্রুয়ারি মাসে

(১৭৭৯) আমার বন্ধু বব(পট) ইংলণ্ডে চলে গেল। মাসের শেষদিকে ড্যানিয়েল বারওয়েলও যাত্রা করলেন, কিন্তু পথে এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের ফলে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর এক আধপাগলী কুমারী বোন তাই নিয়ে যথেষ্ট হেস্তনেস্ত করবার চেষ্টা করলেন, কোম্পানির ডিরেক্টরদের পর্যন্ত চিঠিপত্র লিখলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলেন না। যে-কোন কারণেই হোক, মিস্ বারওয়েলের ধারণা হয়েছিল যে তাঁর ভাইকে ডাচরা সম্পত্তির লোভে খুন করেছে। এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু ডাচদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয় নি। বারওয়েলের পর কোম্পানির অ্যাটর্নি জ্যারেটও ইংলণ্ড যাত্রা করেন, এবং তাঁর স্থানে ইম্পের প্রস্তাবে নেলর কোম্পানির অ্যাটর্নি নিযুক্ত হন।

'কর্নেলের উইণ্ডমিল ও ছাদ নির্মাণ

আমার বন্ধু কর্নেল ওয়াটসন খুব মনোযোগ দিয়ে ডক নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর ডকের কাজের জন্য দুটি বড় বড় বায়ুযন্ত্র (Windmill) স্থাপন করেন। আমার মনে হয় এ দেশে ওয়াটসনই প্রথম এই যন্ত্র আমদানি করেন। যন্ত্র দেখে নেটিবদের মনে বিপুল বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল। যন্ত্র দুটি দেখতে একরকম, প্রায় ১১৪ ফুট উঁচু, পাঁচটি তলাবিশিষ্ট (floors)। উপরের তলা শস্য-পেষাইয়ের জন্য, এবং নীচের তলা কাঠ-চেরাইয়ের জন্য। বায়ুচালিত বড় বড় জাঁতায় ও করাতে পেষাই-চেরাই করা হয়। এরকম আশ্চর্য যন্ত্র এ দেশের লোক আগে কখনও চোখে দেখে নি। তখন ইউরোপের লোকের কাছেও এর যথেষ্ট নতুনত্ব ছিল।

আমার কাছেও ওয়াটসনের 'উইণ্ডমিল' কম বিস্ময়কর মনে হয় নি। প্রতিদিন আমি ডকে যেতাম, এবং যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম তার বিচিত্র কর্মশক্তি ও কর্মপদ্ধতি। এ দেশের নেটিবরা কিছুতেই যন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারত না। যখন তাদের বলা হত যে উপরের পালে বাতাস লাগলে যন্ত্র চলতে আরম্ভ করবে, এবং বড় বড় জাঁতাগুলি গুমগুম করে শস্য পিষতে থাকবে, তখন তারা তা আজগুবী গল্প মনে করে মুখের দিকে চেয়ে হাসত। একদিন তাদের এই অবিশ্বাস দূর করার জন্য সকলের সামনেই যন্ত্র চালানো হবে ঠিক হল। সেইদিন যখন যন্ত্র চলতে আরম্ভ করল, এবং তার প্রতিশব্দে পাঁচটি তলা কাঁপতে থাকল, তখন উপরতলায় প্রায় ১০০ মজুর কাজ করছিল। বড় বড় চাকা জাঁতা পাটাতন ইত্যাদি ঠকঠক করে কাঁপছে নড়ছে ও ঘুরছে দেখে ভয় পেয়ে তারা হুড়মুড় করে দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করল। ভাবল, কোন জাদুকর কিছু তুকতাক করে এই কাণ্ড করেছে। একটা ভয়ংকর ভূত যেন ভর করেছে বাড়িটাকে, তাই সব এমনভাবে কাঁপছে আর ঘুরছে। সেই ভূত যদি তাদের ঘাড়েও চেপে বসে, তা হলে তাদেরও এই দশা হবে, অর্থাৎ ঘুরতে হবে ও কাঁপতে হবে। এই চিন্তাতেই তারা কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়, পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করে ও আছাড় খেয়ে প্রায় অর্ধেক জখম হয়ে গেল। চারিদিকে কেবল 'ওরে বাবা, ওরে বাবা' শব্দে একটা চিৎকার শোনা যেতে লাগল। এরকম বিচিত্র দৃশ্য ও অসহায় করুণ আর্তনাদ আমি দেখি নি বা শুনি নি কখনও।

ওয়াটসন সাহেব প্রথম শ্রেণীর একখানি জাহাজ তৈরি করবেন বলে বিরাট একটি কাঠাম তৈরি করেছিলেন। অর্ধেক তৈরি হবার পর তাঁর সেগুনকাঠে ঘাটতি পড়ল, উপরের 'ফ্ল্যাট টেরাস' তৈরি করা সম্ভব হল না। তখন তিনি স্থির করলেন, এ দেশের ঘরের চালের মতন ঢালু চাল দিয়ে ছেয়ে দেবেন। কিন্তু কাঠামটি এত চওড়া হয়ে গিয়েছিল যে তার উপর ঢালু চাল দেওয়া (pitched roof) সম্ভব হল না। উপরের অংশ বেশ খানিকটা সংকুচিত করতে হল। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্রেসি ইট গেঁথে তা করতে রাজী হলেন না, গড়ন টিকবে না বলে। ওয়াটসন কিন্তু নাছোড়বান্দা, করবেনই প্রতিজ্ঞা করলেন। আমাকেও একদিন সে কথা তিনি বললেন। পরদিনই তিনি বিখ্যাত স্থপতি টমাস লায়নকে (Thomas Lyon) ডেকে পাঠালেন। লায়ন সবকিছু দেখেশুনে বললেন যে, ঐভাবে ছাদ করা সম্ভব হবে না, যে-কোন একদিকের দেয়াল তার ভারে ফেটে ফাঁক হয়ে যাবে।

'bulge' কথাটি ব্যবহার করলেন, এবং কর্নেল তার জ্ঞাসা করতে বললেন, "Give way and fall"। গুলি যদি আগাগোড়া সমান চওড়া হত, এবং র টানাগুলি যদি আরও ঢালু হত, তা হলে এরকম রার অসুবিধা হত না।

নারে ক্রেসির সঙ্গে দেখা হল। মিঃ লায়নের মতন র খ্যাতনামা 'আর্কিটেক্ট' তাঁর মত সমর্থন করেছেন তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন, "আমি জানতাম হবে মার কথাই ঠিক হল তো?" কর্নেল ক্রুদ্ধ হয়ে ন, "আপনারা একেবারে অজ্ঞ, কিছুই জানেন না। ক না হয় দেখবেন, আমি ঐ ছাদ করব, তবে ।" ক্রেসি বললেন, "আপনার ছাদ আপনি ই করতে পারেন, কিন্তু তা আপনার নাকের সামনে পড়বে।" "যদি পড়ে তা হলে আবার নাকের সামনে গড়ে তুলব," কর্নেল উত্তর দিলেন।

এই কথাবার্তার কিছুদিন পরে আমি ওয়াটসনের গেলাম একদিন, খাবার নেমন্তন্ন ছিল। জিত হয়ে তিনি বললেন, "বুঝলেন হিকি সাহেব, নিয়ারদের বুদ্ধি ধরা পড়ে গেছে। তাঁদের হুঁশিয়ারী ও আমি ছাদ গড়তে আরম্ভ করেছি, এবং অর্ধেক হয়েও গেছে। দেয়ালের তো কিছুই হয় নি।" ন বললেন, "আর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেয়াল ধসে ব।" কর্নেল বললেন, "কখখনও না। একশতে জার গিনি বাজি রইল।" "রইল বাজি, আছে," ক্রেসি জবাব দিলেন। তখন কর্নেল কথা য়ে বললেন, "বাজিটাজি আমি যে ফেলি না, তা তো নেই।" ক্রেসি বললেন, "খুব ভাল, কারণ এক্ষেত্রে বাজি ফেলতেন, তা হলে আপনার একহাজার গিনি ড়ি দুই-ই যেত।"

দিন পরে ওয়াটসন এসে আমাকে তাঁর বগি-তে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন ডিনার খাবার জন্ম। র দিকে যেতে যেতে তিনি আমাকে বললেন যে লে তিনি দেখে এসেছেন, প্রায় সমস্ত ছাদটা তৈরি গেছে। তাঁর বিশ্বাস, ছাদ ধসে পড়বে না। কথা বলতে বগিতে চড়ে আমরা তাঁর বাড়ির আধ রের মধ্যে এসেছি, এমন সময় প্রচণ্ড জোরে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হল। "হে হে হে হিকি, আওয়াজটা কিসের বলুন তো?" কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "শুনে তো মনে হল, বজ্রপাতের আওয়াজ।" "হে হে হে বজ্র হে, তা নয়, বোধ হয় ছাদটাই ধসে পড়ল হিকি সাহেব। ক্রেসি ঠিক কথাই বলেছিলেন। যাই হোক, তর্কের পয়েন্ট কিন্তু আমার ঠিক ছিল।"

দূর থেকে দেখলাম, ধুলোয় ভরে গেছে বাতাস, ধোঁয়ার মতন ধুলো উড়ছে আকাশের দিকে। গেটের ভিতর দিয়ে কর্নেলের বাড়ি ঢুকতেই দেখা গেল, সামনে তাঁর সেই বিরাট ছাদখানি ধরণীতলে ভেঙে পড়ে রয়েছে। খুব ব্যস্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মজুররা নিরাপদে আছে কি না। কিছুক্ষণ আগে জলযোগ ও বিশ্রামের জন্য মজুররা সকলেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তা না হলে প্রায় দুশো মজুর—যারা ছাদ পিটছিল—তাদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না। ছাদসুদ্ধ তারাও তলায় পড়ত।

ওয়াটসন-বারওয়েল-বিরোধ

আগেই বলেছি, বারওয়েলের সঙ্গে ওয়াটসনের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। কর্নেল ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে লোক। তিনি ভেবেছিলেন, বারওয়েলের সাহায্য ছাড়াই তিনি ডক তৈরি করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু বারওয়েলও ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক, তাঁর প্রতি ওয়াটসনের বিরূপ মনোভাবের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনিও বদ্ধপরিকর হলেন। কর্নেলের কাজে তিনি পদে পদে বাধা দিতে লাগলেন।

ডক তৈরি করার জন্য গবর্নমেণ্ট যখন প্রথম ক্যাম্বেল সাহেবকে জমি দান করেছিলেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, স্থানীয় নেটিব বাসিন্দাদের টাকা পয়সা বা অন্য কোন বাসের জমি ন্যায্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়ে জমি দখল করতে। কিন্তু জমির প্রতি ভারতীয়দের মমতা এত বেশী যে কেউ বসবাসের ভিটে প্রাণ থাকতে ছাড়তে চায় না, কোন লোভ দেখিয়েই তাদের বশ করা যায় না। এ ব্যাপারে উঁচু-নীচু ভেদ নেই বিশেষ। ক্যাম্বেল সাহেব কিছুতেই তাদের ভিটে ছাড়ার জন্য রাজী

করাতে পারেন নি। ঘরবাড়ি বলতে কতকগুলি ভাঙাচোরা পর্ণকুটীর ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তার প্রতি কী প্রচণ্ড আসক্তিই না ছিল! ক্ষতি-পূরণের কোন লোভ দেখিয়েই তাদের তোলা গেল না। অবশেষে ওয়াটসন সাহেব একদিন একদল সেপাই পাঠিয়ে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন। তারপর রাতারাতি সেই জায়গা চষে একেবারে মাটির সঙ্গে এমনভাবে সমান করে দিলেন যে দেখে সেখানে কোনদিন লোকের বসবাস ছিল বলে চেনাই যেত না।

উদ্বাস্তু লোকেরা কয়েকদিন পরে দল বেঁধে কৌন্সিল হাউসে গেল, এবং সেখানে চিৎকার করে তাদের দাবি জানাতে লাগল। ক্যাম্বেলকে উৎখাত করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে ঘরবাড়ির ন্যায্য দামের পাঁচগুণ এবং অন্য ভাল জমিজমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের স্বেচ্ছায় স্থান থেকে সরানো সম্ভব হয় নি। তাতে জন-কল্যাণকর কাজে নিশ্চয় বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। এই অবস্থায় বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ না করে উপায় ছিল না। এই কথা শুনে গবর্নমেণ্ট চারজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন, ক্ষতিপূরণের দাবিদাওয়া বিচারের জন্য। দশ মাস ধরে কমিটির বৈঠক বসল অন্তত বিশবার, আলোচনা হল অনেক, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হল না। চারজনের চাররকম মত হল, এবং শেষ পর্যন্ত মতের মিল হল না। যারা উৎখাত হয়েছিল, তারা আর পৈতৃক ভিটেতে ফিরে আসতে পারে নি, এই পর্যন্ত জানি। ক্ষতিপূরণ কী তারা পেয়েছিল, অথবা আদৌ পেয়েছিল কি না, তা জানি না।

ক্যাম্বেলের সঙ্গে ওয়াটসন পরে এই ডক নির্মাণ পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছিলেন। বড় বড় ইমারত অনেক তৈরি করা হয়েছিল ডকের কাজের জন্য, এবং তার সঙ্গে বেশ লম্বা লম্বা ব্যারাকবাড়িও মজুরদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। ওয়াটসন ঠিক করেছিলেন, ডক এলাকায় মজুরের কাজের জন্য মোজাম্বিক ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস আমদানি করবেন। ডকের জন্য তাঁরা এত টাকা খরচ করেছিলেন যে কোম্পানির কাছ থেকে কোন পাকাপোক্ত পাট্টা না পেলে তাঁরা আর কাজে এগুতে সাহস করছিলেন না।

খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল

গোকুল ঘোষাল নামে খিদিরপুর অঞ্চলে একজন ধনী ব্যক্তি ডকের কাজের জন্য তাঁর নিজের অনেকখানি জায়গা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ওয়াটসন আসার পর তাঁর সঙ্গে তিনি কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন এবং জমির ব্যাপার নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও হয়। দু-একবার কথাবার্তার সময় আমি নিজে উপস্থিতও ছিলাম। কর্নেলকে তিনি সাদর অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে তাঁর ডক নির্মাণের পরিকল্পনা সফল হলে তিনি খুব খুশী হবেন। দেখা-সাক্ষাতের সময় গোকুল ঘোষাল নিজের জমি সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করলেন না, বরং এ ব্যাপারে তাঁকে তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েও দিলেন যে, প্রয়োজন হলে যে-কোন সময় তিনি কর্নেলকে তিন-চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধারও দিতে পারেন। কর্নেলের সঙ্গে যাঁর এতদূর কথাবার্তা হল, সেই গোকুল ঘোষাল শেষে তাঁর সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধাচারী হয়ে দাঁড়ালেন। বারওয়েল সাহেবই যে তাঁকে এ কাজে প্ররোচিত করেছিলেন, তা আমাদের বুঝতে দেরি হয় নি।

গোকুল ঘোষালের একখণ্ড জমি ওয়াটসন তাঁর ডকের জন্য অধিকার করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বারওয়েলের পরামর্শে ঘোষাল তাঁর জমির দখল দাবি করে কর্নেলকে একখানি চিঠি লিখলেন। ওয়াটসন তার জবাবে জানালেন, বিষয়টি গবর্নর-জেনারেল ও কৌন্সিলের কাছে পেশ করলে ভাল হয়। গোকুল ঘোষাল লিখলেন যে গবর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর জমির কোন সম্পর্ক নেই। জমির মালিক তিনি এবং কর্নেল ওয়াটসন সেই জমি জবরদস্তি দখল করেছেন। অতএব নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমির দখল যদি তিনি ফিরে না পান, তা হলে তার জন্য সুপ্রিমকোর্টে তাঁকে মামলা রুজু করতে হবে। ঘোষালের মনোভাবে কর্নেল একটু চিন্তিত হলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে একখানি চিঠি লিখলেন। গোকুলবাবু বারবার কথা দিয়েও দেখা করতে এলেন না। অবশেষে কর্নেল নিজেই তাঁর বাড়িতে যাবেন ঠিক করলেন, এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। গোকুলবাবু সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করে বললেন যে তাঁর অসুস্থতার জন্য তিনি যেতে পারেন নি। সেইজন্য তিনি সত্যিই

ও লজ্জিত। কর্নেল বললেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু যা করেছেন তা নিশ্চয় অসুস্থ বলে করেন নি। ল সাহেবের পরামর্শেই তো আপনি এই জমি রেছেন ?" কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে এবং অত্যন্ত কাঁচুমাচু করে ঘোষাল বললেন, "হ্যাঁ, তা টই, বারওয়েল সাহেব মস্তবড় লোক, আমার রক্ষকও বলা চলে। তাঁর কথা আমি কি অমান্য পারি ?" কর্নেল খানিকটা উত্তেজিত হয়েই তাঁকে "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। যেমন আপনি, আপনার রক্ষক বারওয়েল—দুজনেই রাস্কেল।" বলে কর্নেল তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ি ছেড়ে চলে

লা আরম্ভ হবার দিন তিনেক পরে কর্নেল গবর্নর-জেনারেল হেস্টিংস, ফ্রান্সিস ও হুইলার, জনের সঙ্গে দেখা করে জমির ব্যাপার তাঁদের । সকলেই একবাক্যে বারওয়েলের নিন্দা এবং হেস্টিংস নিজে কথা দিলেন যে ব্যাপারটা করে ফেলার জন্য তিনি বারওয়েলকে অনুরোধ গোকুল ঘোষালকে যে তিনি কোন পরামর্শ এ কথা অবশ্য হেস্টিংসের কাছে বারওয়েল অস্বীকার করেন। আপসে মামলা নিষ্পত্তির ন সম্ভাবনা নেই দেখে ওয়াটসন মামলা লড়ার ত হতে থাকেন।

জমির জন্য গোকুল ঘোষাল মামলা করেছিলেন, র পরিকল্পনার দিক থেকে তার গুরুত্ব অত্যন্ত গঙ্গাতীরের লম্বা একখণ্ড জমি, তার উপর দিয়ে রিবারের লোকজন স্নানাদি নিত্যকর্মের জন্য করতেন। এই জমির উপরেই কর্নেল তাঁর windmill) বসিয়েছিলেন, এবং এ জমি বাদ র 'wet' বা 'dry' কোন ডকই নির্মাণ করা চলে রাং গোকুল ঘোষাল মামলায় জিতলে কর্নেলের রকল্পনা ত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

ল ঘোষাল তখনকার কলকাতার একজন ও প্রবল প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি। র সলিসিটার নর্থ নেলারকেই (North তিনি অ্যাটর্নি নিযুক্ত করলেন। এ কাজেও যে বারওয়েল সাহেব তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কর্নেল আমাকেই অনুরোধ করলেন তাঁর মামলা চালাবার জন্য। আমি রাজী হলাম, এবং প্রথমেই কোম্পানি যে জমির দানপত্র কর্নেলকে দিয়েছিলেন তা ভাল করে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম দানপত্রের মধ্যে কোন গলদ নেই, এবং জমির কোন গণ্ডগোলের জন্য তিনি দায়ী নন, গবর্নমেণ্টই দায়ী। অতএব মামলা চালাবার সমস্ত দায়িত্ব গবর্নমেণ্টের, কর্নেলের নয়। এ কথা গবর্নমেণ্টকে জানাবার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। অ্যাডভোকেট-জেনারেল জন ডে আমার যুক্তি মেনে নিলেন। কোম্পানির সেক্রেটারি অবশেষে নেলারকে জানালেন যে ওয়াটসনের মামলার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। তার আগেই নেলার ঘোষালের পক্ষে মামলার ভার নিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর পার্টনার আর-একজন অ্যাটর্নি স্যামুয়েল টলফ্রের উপর মামলার ভার দেন। সেক্রেটারি শেষে আমাকেই অনুরোধ করেন মামলা চালাতে, এবং জানিয়ে দেন যে নতুন ল কমিশনার সর্ব-ব্যাপারে আমাকে যখনই প্রয়োজন হবে সাহায্য করবেন। সুতরাং কর্নেলের মামলা নিয়ে আমি বেশ জড়িয়ে পড়লাম।

কর্নেলের পক্ষে মামলার দায়িত্ব গবর্নমেণ্টই নিচ্ছেন দেখে গোকুল ঘোষাল রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে গবর্নমেণ্টের সুনজরে থাকা এ দেশের অবস্থাপন্ন লোকদের বিশেষ কাম্য ছিল। তাই গবর্নমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হতে পারেন মনে করে ঘোষাল বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, সরকারের বিপক্ষে মামলা তিনি জিতবেন কি না সে-বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু বারওয়েল তাঁকে মামলা চালাতে ক্রমাগত উসকানি দিতেন বলে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপসে মিটমাট করেন নি।

মামলার শুনানি আরম্ভ হল একদিন সকাল নটায়, এবং শেষ হল রাত আটটায়। গোকুল ঘোষালই মামলায় জয়ী হলেন। সার্ এলিজা ইম্পে ঘোষালের সপক্ষে দীর্ঘ রায় দিয়ে বললেন যে এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে এরকম বিবাদের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। গবর্নমেণ্টের উচিত ছিল আপসে এর মীমাংসা করে নেওয়া।

এই ঘটনার পর ওয়াটসন তাঁর ডক নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। যদি তা তাঁকে না করতে হত, এবং যদি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ডক তৈরি করতে পারতেন, তা হলে তা নিঃসন্দেহে এ দেশের একটি স্মরণীয় কীর্তি হয়ে থাকত।

গোকুল ঘোষালের জমি দখলের ব্যাপারে ওয়াটসনের কোন দোষ ছিল না, অথচ তিনি সেই জমির জন্য রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। ভবিষ্যতে আরও এরকম জমিদখলের মামলা হতে পারে মনে করে তিনি তাঁর ডকের পরিকল্পনা একরকম বাতিল করারই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু যে আর্থিক ক্ষতি তাঁকে এর জন্য স্বীকার করতে হল তা পূরণ করার জন্য তিনি গবর্নমেণ্টকে নোটিশ জারি করলেন। বিলেতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানকেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য নোটিশ জারি করা হল। ওয়াটসন হয়তো চাকরিও ছেড়ে দিতেন, কিন্তু কোম্পানির চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি তখন এত বেশী ছিল যে হঠাৎ তিনি তা ছাড়তে চাইলেন না। তিনি স্থির করলেন, বাংলাদেশে কিছুদিন থাকবেন, এবং ডক ও জাহাজ নির্মাণের জন্য যে প্রচুর জিনিসপত্র বিদেশ থেকে আমদানি করেছেন, তা অন্তত কিছু বিক্রি করে দেবেন বা কাজে লাগাবেন। ইংলণ্ড থেকে তিনি জাহাজ তৈরির জন্য কারিগর ও যন্ত্রপাতিও এনেছিলেন অনেক। তাই দিয়ে দু একটি জাহাজ না তৈরি করে তিনি কাজে ইস্তফা দেবেন না ঠিক করলেন। দু বছরের মধ্যে তিনখানি জাহাজও তিনি তৈরি করে ফেললেন, সব দিক দিয়েই বিলেতের তৈরি জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রথমটির নাম Surprise, দ্বিতীয়টির নাম Nonsuch, তৃতীয়টির নাম Laurel। প্রায় ৩০০ টনের জাহাজ 'সারপ্রাইজ', ইউরোপে মালপত্র চালান দেবার জন্য গবর্নমেণ্টই কিনে নিলেন। 'ননসাচ' ও 'লরেল' প্রথমে চীনের বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, পরে ইউরোপেও পাঠানো হয়। কলকাতায় তৈরি এই জাহাজ তিনখানি দেখে ইউরোপের ব্যবসায়ীরা সকলেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি

ফেব্রুয়ারি মাসে (১৭৭৯) ক্যাপ্টেন সাটন ইউরোপ যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন ব্যারিস্টার ফ্যারোর। আমাদের এই ব্যারিস্টার বন্ধুটি মাত্র বছর তিনেক প্র্যাকটিশ করে প্রায় ৮০ হাজার পাউণ্ড সঞ্চয় করেছিলেন। এই বিপুল অর্থের অধিকাংশই তিনি রোজগার করেছিলেন, মহারাজা নন্দকুমারের বিচারের সময় তাঁর কাউন্সেল নিযুক্ত হয়ে। নন্দকুমারকে জালিয়াতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর মতন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজাকে এই অপরাধের জন্য ফাঁসি দেওয়া, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের মতন হয়ে আছে।

গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে জেনারেল ক্লেভারিঙের ভয়ানক শত্রুতা ছিল। ক্লেভারিং ছিলেন কৌন্সিলের প্রথম সদস্য এবং প্রধান সেনাপতি। একবার হঠাৎ গুজব রটে গেল যে হেস্টিংস গবর্নর-জেনারেলের পদ ত্যাগ করছেন। সেই সময় ক্লেভারিং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে গবর্নমেণ্ট ও ফোর্ট উইলিয়ম দখল করে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। হেস্টিংসের বন্ধুবান্ধবরা সতর্ক থাকার জন্য তাঁর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। হেস্টিংসের সবচে বড় সমর্থক ছিলেন বারওয়েল, এবং ক্লেভারিঙের পক্ষে ছিলেন কর্নেল মনসন ও ফ্রান্সিস। দুই দলের বিবাদ যখন চরমে পৌঁছয়, ঠিক সেই সময় মনসন হঠাৎ অসুখে মারা যান। তার ফলে হেস্টিংস তাঁর অতিরিক্ত ভোট দিয়ে কৌন্সিলে নিজের দল ভারি করে ফেলেন।

দুই দলে বিবাদ যখন আরম্ভ হত তখন সারা শহরময় রীতিমত সাড়া পড়ে যেত। প্রত্যেক মুহূর্তে একটা সশস্ত্র সামরিক বিদ্রোহের আতঙ্কে সকলে শঙ্কিত হয়ে থাকত। থাকারই কথা, কারণ বিরোধটা যখন গবর্নর-জেনারেলের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষের, তখন বিদ্রোহ প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। অবশেষে নিরপেক্ষরা প্রস্তাব করলেন যে দুই দলের ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার সুপ্রিম-কোর্টের বিচারকদের উপর দেওয়া হোক। হেস্টিংস ও ক্লেভারিং উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। দুজনেই লিখিত বিবৃতি দাখিল করলেন বিচারকদের কাছে। বিচারকরা দুই পক্ষের বক্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে

লেন এই মর্মে যে হেস্টিংসের গবর্নমেণ্টই থাকা । ক্লেভারিং বিচারকদের রায় মেনে নিলেন। ব একটা ভয়াবহ বিরোধের মীমাংসা হল, যা না দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব বজায় রাখা ন হত।

ই দলের যখন বিচার চলতে থাকে তখন উভয়ের ভাকেট ও সমর্থকদের মধ্যেও প্রবল ঝগড়াবিবাদ এই হেস্টিংস-ক্লেভারিং বিবাদ উপলক্ষ করে তা শহরে তখন কত যে 'ডুয়েল' লড়া হয় তার ঠিক তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ডুয়েল হয় হেস্টিংসের ফ্রান্সিসের। আর-একটি ডুয়েল হয় আমার বন্ধু পটের সঙ্গে জেমস গ্রাণ্টের। পট ছিল গোঁড়া সপন্থী, গ্রাণ্ট ছিলেন ক্লেভারিংপন্থী। দুই পন্থী সম্মুখসমরে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করলেন। পটের সঙ্গে র বেশ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু গবর্নমেণ্টের মধ্যে দুই যখন প্রকাশ্য বিবাদ আরম্ভ হল, তখন পট হঠাৎ ন গ্রাণ্টকে বিশ্বাসঘাতক ও ক্লেভারিঙের গুপ্তচর বসল। পটের অভিযোগ হল, গ্রাণ্ট তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব সমস্ত গোপন খবর বার করে নিয়ে হেস্টিংস-ধীদের জানিয়েছেন। গ্রাণ্ট এই অভিযোগ কার করেন, এবং চ্যালেঞ্জ করে বসেন পটকে। তখন লঞ্জ বলতে ডুয়েলই বোঝাত। ডুয়েলের সময় দুজনের বহু গুলি-বিনিময় হল এবং শেষে গ্রাণ্টকে জখম করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হল। ব্যাপারটা ঐখানেই মিটে গেল কিন্তু গ্রাণ্টের 'গুপ্তচর' বদনাম সহজে দূর হল না।

মহারাজা নন্দকুমার জেনারেল ক্লেভারিঙের একজন সমর্থক ছিলেন। অনেকে মনে করেন সেই কারণেই কুমারের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কথাটা একেবারে া বলে মনে হয় না ; কারণ চীফ জাস্টিস এলিজা ইম্পে দের কাছে মামলাটি পেশ করার সময় পরিষ্কার কুমারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেছিলেন। রা কয়েক ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করার পর শেষে নন্দকুমারকে অপরাধী বলে রায় দেন। পরে দের কয়েকজনের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার আলোচনা । তাঁরা অনেকেই নন্দকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত তে রাজী ছিলেন না। কেউ কেউ বললেন যে এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড হবে জানলে তাঁরা কখনই এই রায় দিতেন না। ফাঁসির হুকুমে অনেকেই বেশ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। যেদিন মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, সেদিন কলকাতা শহরের অধিকাংশ হিন্দু ভোরবেলা উঠে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে শহর ছেড়ে চলে যান। বিচারকদের মধ্যে স্যার্ রবার্ট চেম্বার্স নন্দকুমার সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর মতে নন্দকুমার এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেন নি, যার জন্য তাঁকে কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত। কিন্তু চেম্বার্স এত ভালমানুষ ছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে বিশেষ কিছু ছিল না। স্যার্ ইম্পে সহজেই তাঁকে কাবু করে ফেললেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধে চেম্বার্স নন্দকুমারের মৃত্যু-পরওয়ানাতে সই করতেও বাধ্য হলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ক্লেভারিঙের মৃত্যু হল। তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রীর তিনটি কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কেরোলিন দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। এমনিতে বেশ চৌকস মেয়ে হলেও, কেরোলিন বিবাহিত জীবনে সুগৃহিণী হয়েছিলেন শুনেছি। তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে এক অ্যাড-মিরালকে বিবাহ করেন।

বাংলার কালবৈশাখী

ক্লিভল্যাণ্ড ও আমি এপ্রিল ১৭৭৮ পর্যন্ত বেশ একত্রে ঘরসংসার পাতিয়ে ছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে একত্রে থাকতে আমারই সংকোচ হল। কারণ আমাদের যা খরচ হত তা আমরা দুজনেই সমান ভাগে দিতাম, অথচ ক্লিভল্যাণ্ড দিনে দু গ্লাসের বেশী মদ্যপান করতেন না, এবং বন্ধুবান্ধবদেরও বিশেষ খাওয়াদাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন না। এদিকে মদ্যপান ও ভোজসভা দুই-ই আমি পুরোদমে চালাতাম, এবং তার ফলে স্বভাবতঃই আমার জন্য খরচ হত অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও তিনি অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করবেন এবং আমি তা গ্রহণ করব এটা আমার শোভন বা সঙ্গত বলে মনে হল না। আমি তাই আলাদা বাসা করে থাকার সিদ্ধান্ত করলাম। একটি নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, পয়লা মে থেকে সেটি নেব স্থির করলাম। আমরা দুজনে যে বাড়িটিতে

ছিলাম, আগেই বলেছি, সেটি কাঁচা-গাঁথনির বাড়ি, চুনসুরকির গাঁথনি নয়। দক্ষিণ দিকে সূর্যের তাপ লাগত বেশী, এবং তাতে বাড়ি খুব গরম হয়ে যেত। আমি তাই এদেশী একজন মিস্ত্রী ডেকে একটি বারান্দা করে নেব ঠিক করলাম। আমার মতলব শুনে বাড়িওয়ালী মিসেস ওগডেন ছুটে এলেন একদিন, এবং বললেন যে দেয়ালের গা দিয়ে বারান্দা ঠেলে বার করলে বাড়িটা ধসে পড়ে যাবে। আমি তখন মালপত্তর কিনে ফেলেছি, সুতরাং এ বিষয়ে মিঃ লায়নের (আর্কিটেক্ট) সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটা সেরে ফেলব ঠিক করলাম। লায়নের নির্দেশ অনুযায়ী বারান্দা তৈরি হয়ে গেল।

মার্চ, এপ্রিল, মে—বাংলাদেশে এই তিনমাস হল চৈতালি ঘূর্ণি ও কালবৈশাখী ঝড়ের সময়। কিন্তু ঝড়জল খুব প্রবল ও ভয়ংকর হলেও, ঝড়ের পর বাইরের আবহাওয়া বেশ শান্ত শীতল ও উপভোগ্য হত। সপ্তাহে শনি রবিবার আমি সার্ রবার্ট চেম্বার্সের বাড়িতে না গিয়ে, কলকাতার চার মাইল উত্তরে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে ক্যাপ্টেন থর্নহিলের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। ক্যাপ্টেনের এই বিশাল বাগানবাড়িটিতে অনেকেই তখন স্ফূর্তি করার জন্য যেতেন। ক্যাপ্টেনও ছিলেন দিলদরিয়া লোক, সকলকে আদর-আপ্যায়নের জন্য দু'হাতে অর্থব্যয় করতেন। একবার এপ্রিল মাসের শেষে বোধ হয় কাশীপুরে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গেছি, সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। এরকম প্রচণ্ড ঝড় অনেক দিন দেখি নি। ঈশান কোণ থেকে ঝড় উত্তর-পূর্ব কোণে সরে গেল এবং আরও প্রচণ্ডতর বেগে বইতে থাকল। আমার নিজের বাড়িটি উত্তর-পূর্ব দিকে খোলা বলে আমি রীতিমত চিন্তিত হলাম। বার বার আমার তৈরি নতুন বারান্দাটির কথা মনে হতে লাগল। ভাবলাম, ঝড়ের দাপটে হয়তো ফিরে গিয়ে দেখব বারান্দাটি ভেঙে পড়েছে, এবং তার সঙ্গে বাড়ির দেয়ালটিও।

ক্যাপ্টেনের বাড়ি থেকে বেরোতে রাত প্রায় ১২টা হয়ে গেল। ফিটনে করে স্বগৃহাভিমুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে যাত্রা করলাম। বাড়ির কাছে রাস্তায় এসে মধ্যরাতের আবছায়ায় মনে হল যেন আমার জীর্ণ বাড়ির কংকালটা সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে আছে—ভেঙে পড়ে নি। আরও একটু এগিয়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে দেখলাম, আমার সাধের বারান্দা ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, উঠোনের উপর তার ভগ্নস্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। যাই হোক, তবু আমার অদৃষ্ট ভালই বলতে হবে, কারণ গোটা বাড়িটা অন্তত ঝড়ে ধসে পড়ে নি।

তরুণী ইহুদী শিল্পী ইসাক

আমি ও ক্লিভল্যাণ্ড যখন একসঙ্গে থাকতাম তখন কলকাতায় একজন তরুণী চিত্রশিল্পী এসে হাজির হলেন। ক্লিভল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডেই তাঁর আলাপ হয়েছিল। সেইজন্য তিনি তাঁর চিত্রাঙ্কনের ব্যবসার সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। আমাকে একদিন অনুরোধ করলেন আমার প্রতিকৃতির জন্য শিল্পীর কাছে 'সিটিং' দিতে হবে। আমি রাজী হলাম, কারণ আমার একখানি ছবি আমার বোনকে পাঠাবার জন্য দরকার ছিল। প্রথম দিন যখন শিল্পীর স্টুডিওতে হাজরি দিলাম, তখন ক্লিভল্যাণ্ডও আমার সঙ্গে ছিলেন। ইহুদিনী শিল্পীর সামনে আমি বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ তিনি বললেন যে, কুশ্রী চেহারা যাদের তারা যে কি করে শিল্পীর কাছে নিজের ছবি আঁকাতে আসে তা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তাঁর অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে রীতিমত চমকে গিয়ে আমি বললাম, "এখানে অবশ্য আমি নিজে ইচ্ছে করে আসি নি, আপনার অনুরোধেই এসেছি। তা ছাড়া, আপনার এই মন্তব্যের অর্থ কি তাও আমি জানি না।" শিল্পী ইসাক তাঁর স্বভাবসুলভ সরল ভঙ্গিতে বললেন, "বন্ধু ক্লিভল্যাণ্ডের পক্ষে এই ধরনের উক্তি করা খুবই অশোভন হয়েছে। আর আমাকে যদি কলকাতা শহরে কেবল সুন্দর লোকদের ছবি আঁকতে হয়, তা হলে তো আমাকে এখনই পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে, ব্যবসা করা আর চলবে না।" বছর দুই পরে এই ইহুদিনী শিল্পী মহিলা হিগিনসন নামে কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ ধনিক কর্মচারীকে বিবাহ করেন।

ফ্রান্সিসের প্রেমের কাহিনী

মিঃ ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় যে বিশেষ প্রীতিকর হয় নি, তা আগেই বলেছি। আমি

র্কর পরিচয়পত্র তাঁকে দিয়েছিলাম তখন
র সম্বন্ধে তিনি যে দম্ভোক্তি করেছিলেন, তা
ালবার নয়। তিনি নিজেকে এত উচ্চস্তরের
করতেন যে সেখান থেকে অ্যাটর্নিদের তাঁর
জীব বলে মনে হত। কিন্তু অদৃষ্টচক্রে এমনই
যে তাঁকে সাংঘাতিকভাবে শেষ পর্যন্ত সেই
রই শরণাপন্ন হতে হল। যে জন্য তাঁকে
দ্বারস্থ হতে হল, সেই ঘটনাটি এই :

ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড নামে কোম্পানির একজন পদস্থ
একটি সুন্দরী ফরাসী তরুণীকে বিবাহ
ন। ফিলিপ ফ্রান্সিস ঘটনাচক্রে প্রায় উন্মাদের
র প্রেমে পড়লেন। এরকম উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন
রাচর দেখা যায় না। প্রেমের তাড়নায় তিনি
একটি বেআইনী কাজ করে একেবারে ফেঁসে
আমি বাংলাদেশে আসার কয়েক মাস পরেই
টি ঘটল। পাকেচক্রে এমনই হল যে মিঃ গ্রাণ্ড
ই তাঁর অ্যাটর্নি মনোনীত করবেন স্থির
প্রস্তাব নিয়ে যখন তিনি আমার কাছে
খন আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার পক্ষে
মলা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফ্রান্সিসের
কোন বিশেষ অনুরাগবশত আমি এ কথা
ম, তা নয়। ব্যাপারটা নিতান্ত ব্যক্তিগত
ন্ত লজ্জাকর বলে, এবং ফ্রান্সিস মিঃ বার্কের
আমি সংকোচবোধ করলাম। মিঃ গ্রাণ্ড আমার
দৌ সঙ্গত নয় বলে আমাকে খুবই অনুরোধ
াগলেন। প্রতিদিন তিনি আমার আফিসে
, এবং মামলার দায়িত্ব নেবার জন্য আমাকে
করতেন। তাঁর অনুরোধ এড়ানো সম্ভব নয়
মি অবশেষে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে
ম।

ন আমি পালালাম, সেইদিন সকালেই গ্রাণ্ড
এসে আমার ক্লার্ক টলফ্রেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে
ভার চাপিয়ে গিয়েছিলেন। টলফ্রের কাছ
ই খবর পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, কিন্তু
র রাগ করতে পারলাম না। খবর পেয়েই
কলকাতায় ফিরে এলাম, এবং আদালতে গিয়ে
আমার মামলার দায়িত্ব নাকচ করে দিলাম। গ্রাণ্ডের
সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমার অনুপস্থিতিতে আমার
ক্লার্ককে মামলা রুজু করতে বলে তিনি অন্যায় করেছেন।
গ্রাণ্ড খুবই লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন, অন্যায়ের জন্য ক্ষমা
চাইলেন, কিন্তু তবু আবার আমাকে অনুরোধ করলেন
মামলার ভার নেবার জন্য। আমি তা প্রত্যাখ্যান করে
চলে এলাম। তিনি বাধ্য হয়ে শেষে অন্য একজন অ্যাটর্নি
নিযুক্ত করলেন।

এদিকে ফিলিপ ফ্রান্সিস আমার নোটিশ পেয়ে আমার
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনিও আমাকে অনুরোধ
করলেন তাঁর মামলার দায়িত্ব নেবার জন্য। তাঁকেও
আমি 'না' বলে দিলাম, এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে
এ ব্যাপারে কারও পক্ষ সমর্থন করতে আমি রাজী নই।

যথাসময়ে মামলার বিচার আরম্ভ হল আদালতে।
সাক্ষীসাবুদ ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে ফ্রান্সিসের একটি
আচরণই অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হল। তিনি নাকি
গ্রাণ্ডের অনুপস্থিতিকালে প্রায়ই লুকিয়ে ছদ্মবেশে শ্রীমতী
গ্রাণ্ডের কাছে যেতেন। যদি সাধারণভাবে যেতেন, তা
হলেও হয়তো বলবার কিছু থাকত না। কিন্তু প্রাচীর-
ঘেরা বাড়ির ফটকও বন্ধ থাকত বলে, তিনি রাত্রিবেলা
একখানি মই কাঁধে করে, কালো পোশাক পরে, চুপিসাড়ে
যেতেন, এবং প্রাচীর টপকে বাড়িতে ঢুকে শ্রীমতী গ্রাণ্ডের
ঘর পর্যন্ত হাজির হতেন। গ্রাণ্ডের ভৃত্যরা তাঁকে একাধিক
রাত্রে শ্রীমতী গ্রাণ্ডের শয়নকক্ষ থেকে বেরুতে দেখেছে।
ফ্রান্সিসের পক্ষে তাঁর আত্মীয় টিল্‌ঘম্যান আদালতে
বিচারকদের সামনে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ তর্ক করলেন, এবং
এই ধরনের অন্যান্য মামলার নজীর দেখিয়ে ফ্রান্সিসের
অপরাধ লঘু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে
বিশেষ কিছু ফল হল না।

বিচারের দিন দেখা গেল যে বিচারকদের মধ্যে
ফ্রান্সিসের অবৈধ প্রেমের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ
আছে। জুনিয়র জজ হিসেবে জাস্টিস হাইড প্রথমে রায়
দেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি বাইরে থেকে যত লঘুই মনে
হোক, তিনি মনে করেন ফ্রান্সিস অপরাধ করেছেন, এবং
সেজন্য তাঁকে দণ্ড দেওয়া উচিত। হাইডের পরে বলেন
স্যার রবার্ট চেম্বার্স। তিনি আইনের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে

বলেন যে ফ্রান্সিস-মিসেস গ্রাণ্ডের অবৈধ প্রেম আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। অবশেষে চীফ জাস্টিস সার্ এলিজা ইম্পে রায় দেন। চেম্বার্সের আইনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তার অধিকাংশই বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এই অপরাধ বিচারের জন্য সার্ রবার্টের মতন আইনবিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। জাস্টিস হাইডের সঙ্গে তিনিও একমত, এবং ফ্রান্সিসের দণ্ড পাওয়া উচিত বলে তিনিও মনে করেন। তাঁর দণ্ড হল, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। হাইড সেই সময় ইম্পের কানে-কানে বলে দিলেন, "বলুন, সিক্কা টাকা।" "হ্যাঁ হ্যাঁ, সিক্কা টাকা", ইম্পে বললেন। আদালতকক্ষের শ্রোতারা সকলে হেসে উঠলেন।

বিচারের সাতদিনের মধ্যে টিল্‌ঘম্যান ইংলণ্ডে আপীল করার জন্য আদালতে এসে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সার্ রবার্ট যে-সব আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, টিল্‌ঘম্যানও তাই করলেন। চীফ জাস্টিস মন্তব্য করলেন, "এ যুক্তি তো আগেই সার্ রবার্টের কাছ থেকে শুনেছি।" এই সময় ফ্রান্সিসের কাছ থেকে তিন লাইন লেখা এক-টুকরো কাগজ এল টিল্‌ঘম্যানের কাছে। আমি আদালতে তাঁর পাশে বসে থাকলেও, তাতে কি লেখা ছিল দেখতে পেলাম না। দেখলাম, আপীলের আবেদন আর পেশ করা হল না। পরেও আর কোনদিন হয় নি। জানা গেল, গ্রাণ্ড সাহেব জরিমানাটা আধাআধিতে রফা করে ব্যাপারটা ফ্রান্সিসের সঙ্গে আপসে মিটিয়ে ফেলেছেন। কারণ এ দেশে যা হবার তা হল, আবার ইংলণ্ডে যদি এই নিয়ে হৈচৈ হয়, তা হলে গ্রাণ্ড সাহেবই আর স্বদেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না। যা ঘটেছে তাতে কলঙ্ক ও লজ্জা তাঁর, প্রেমিক ফ্রান্সিসের নয়। সেইজন্যই তিনি ব্যাপারটা ফ্রান্সিসের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলবেন। ফ্রান্সিসও দেখলেন সুবর্ণ সুযোগ, অতএব গররাজি হলেন না।

মিঃ ফিলিপ ফ্রান্সিসের এই রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপার নিয়ে কলকাতার সাহেব-সমাজে বেশ শোরগোল পড়ে গেল। ব্রেকফাস্টে ডিনারে, ট্যাভার্নে কফিহাউসে, হোটেলে বাড়িতে, পাল্কিতে ফিটনে, পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে বেড়াতে বেড়াতে, সর্বত্র সর্বদা ফ্রান্সিসের দুঃসাহসিক রোমান্স সকলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। ফুটন্ত ও আধফোটা কবিরা ঘটনাটি থেকে কাব্যিক প্রেরণা সঞ্চয় করে বেশ কিছু কবিতাও লিখে ফেললেন। তার মধ্যে একটি কবিতা এই :

"Psha ! What a Fuss, 'twixt SHEE, and 'twixt her !
What abuse of a dear little creature,
A GRAND and a mighty affair to be sure,
Just to give a light PHILIP (fillip) to nature.
How can you, ye prudes, blame a luscious young wench,
Who so fond is of Love and romances,
Whose customs and manners are tout a fait French,
For admiring whatever from FRANCE-IS

ফ্রান্স, ফ্রান্সিস ও গ্রাণ্ডের তরুণী ফরাসী পত্নীকে নিয়ে কবিরা এ রকম অনেক কৌতুককাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সবাসিনীর রোমান্সের নটেগাছটি কলকাতা শহরে ফ্রান্স-ইসের কেলেঙ্কারিতে শুকিয়ে গেল না। ফরাসী প্রেমের বীজ আবার ফরাসী দেশের মাটিতে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠল। মনের দুঃখে শ্রীমতী গ্রাণ্ড কলকাতা শহর ছেড়ে প্যারিসে চলে গেলেন। সেখানে প্রসিদ্ধ তালিরান্দ তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়লেন, এবং বিবাহও করে ফেললেন। সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিসের রোমান্টিক প্রেমকথার সেইখানেই শেষ হল।

[ক্রমশ]

টেক্কার তুরুপ

অমরেন্দ্র ঘোষ

অর্জুন মোড়লের একটি মেয়ে আছে পরীর মত।

একবার চেষ্টা করলে বোধ হয় ইন্দ্রের পারিজাত মাটির বাগিচায় আনা যায়।

একটু ভাল করে অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে নেন কুবের। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। চোর-ডাকাত সরকারী হট-হুজ্জুতের ভয়ে এ পাতাল-গোলার সৃষ্টি। এক একটা মটকি যেন এক একটা হাঙরের পেট। কমসে কম কুড়ি মণ খেতে পারে চাল। এগুলো চাল গেলার আগে মাসখানেক বসে তেল খেয়েছে প্রায় পাঁচ পাঁচ সের। নইলে এমন কাঁচা জেল্লা থাকে পুরনো চালে! দশ বছরেও এ চেকনাই যাওয়ার নয়। সাধে মনে হয় সোনার দানা!

কুবের ঘরটা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাইরে বলতে সদর নয়, অন্দরেরই একাংশ। বর্ষাকাল, বড় বউয়ের চোখের রোশনাই কম। তবু বসে বসে শীতের কাঁথায় জোড়াতালি দিতে হচ্ছে। মেজো বউ বাঁদীর মত একপাঁজা থালা-বাসন নিয়ে পিছল ঘাটে গেছেন। আর ছোটবউ কাঁদছেন ভিজে কাঠের ধোঁয়ায়।

জাহাজের শিকলের মত পাক-দেওয়া কলাপাতার বেড়া বাড়ির চারিদিকে, তারপর সুপুরি, নারকেল, জাম গাছের পেট্রির মত আব্রু। এর মধ্যে তিনটি তিন বয়সের বউ। কারুর ঠিক যৌবন নেই। তবু এই হুঁশিয়ারি।

ইদানীং পাতাল-গোলা যত বাড়ছে খবরদারী তত কঠোর হচ্ছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পর্দা। ঘোমটা তার প্রমাণ।

বাড়ির সীমানার বেড়া ফাঁক করতেই কুবেরের নজর পড়ে তার ছেলে ঘুর-ঘুর করছে বাগানে।

সুপুরি আম জাম ও নারকেল গাছের ঠাস বুনট। তা ভেদ করে সামন্তর দৃষ্টি চলে যায় মোড়লদের সীমানার পুকুরঘাটে। এক ঝলক আলো যেন ডানা ঝাপটায় মিলিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে মদনও হাওয়া।

চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে কুবের অস্ফুট

তো নয় যেন এক এক গোটা সোনার দানা!
:প্রৌঢ় কুবের সামন্ত রোজ একবার করে এই আঁধার
ঢোকেন। ভাঙা জোত-জোয়াল, যত রাজ্যের
লো সরিয়ে পিটপিট করে তাকান প্রথম। তারপর
ন পরিষ্কার হয়ে আসে। মাটির তলায় বেমালুম
নেক চালের মটকি পোঁতা। একেবারে পাকা—
য়, তবু ইটের চাইতেও যেন শক্ত। নদীর পারের
কালো মাটি চটকে পোড়ানো। এক একটার
স এক একটা পারিবারিক দুর্ভিক্ষ। শেষেরটা
বাড়ির। অর্জুন মোড়ল গোপনে বেচেছেন।
বরং আধমণ চাল বেশী দিয়েই রেখেছেন কিনে।
ক্ষিত ছেলে মদনের চোখ টাটিয়ে ওঠে।
কি বাবা!
ই চুপ কর্, মান-মর্যাদা বুঝিস না মোড়লদের।
াঁকে পড়েছে, এখন খোঁচাতে নেই।
বার মুখের ওপর আর কোনও জবাব দেয় না
। বইপত্তর গুছিয়ে রেখে একটা বন্দুক নিয়ে
র বেরিয়ে পড়ে। কোথায় ঘুঘু, হরিয়াল, জল-
সে গৃহস্থ বাড়ির আনাচে-কানাচে শুধু উঁকিঝুঁকি
এক একটা গানের কলিতে যা টান দেয় তাতে
:তা ছার, গরীব-গৃহস্থের সোমত্ত মেয়ের বুকের রক্ত
হিম হয়ে আসে। লোকে বলে, রক্তের দোষ যাবে
:র?
লে শিকার পায় না, কিন্তু বাপ তাক করেন অব্যর্থ।
র উঁচু পর্দায় ওঠার জন্যে অনেককাল ধরে চেষ্টা
ন কুবের। এতদিন মোড়লরা পাত্তা দেয় নি।
যেন তালগাছ ঝড়ে ভেঙেছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ,
ল যেন অনুগ্রহ করে এসেছে ড্যাড্যাং ড্যাং করে
হাত মিলিয়ে। এবার শুধু পাড়া-প্রতিবেশীর
 খালি নয়, অনেক জায়গায় সরকারী গুদামগুলিও
কাছে বায়েন নেই, তবু একটা টাকুডুম টাকুডুম
নতে পান সামন্ত আকাশে বাতাসে।

মন্তব্য করেন, হুঁ! তারপর সীমানার বেড়ার পাতাগুলো গুছিয়ে রাখেন সম্মান এবং শাস্ত্রমত।

কুবের তেল-কুচকুচে ভিজে গামছাটা মাথার ওপর ছড়িয়ে দেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন বুক খালি করে—হা ঈশ্বর, এ হল কি!

কাছে জনপ্রাণী নেই। থাকলে হয়তো দেখতে পেত তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও নিষ্ঠা যেন ব্যর্থ হয়েছে এই মুহূর্তে। তিনি সদরে বেরিয়ে আসেন চোখমুখ কালি করে।

একখানা লম্বা ঢঙের কাছারি। গোলপাতার ছাউনি। বাঁশের বেড়া। টেবিল, আলমারি লোক-দেখানো পুঁথি-পুস্তক, অয়েল পেন্টিঙের বালাই নেই। দু পাশে দুখানা বেঢপ খাট, আর ছোট ছোট পিঁড়ি। এখানে-সেখানে হাল লাঙল জোয়াল বীজধান ইত্যাদি। একটা হুঁকো আছে রুপো বাঁধানো। বাকি কয়েকটা খেলো। প্রথমটা বাড়ির মালিকের, শেষেরগুলো ঠিকা কৃষাণদের জন্যে।

মালিকের বকলমে কে যেন দিব্যি আরামে তামাক টানছিল রুপোর হুঁকোটায়, কুবেরকে দেখে সে চমকে ওঠে। হুঁকোটা জায়গামত রেখে বলে, দণ্ডবৎ সামন্ত।

ঠিকা কৃষাণেরা কেউ বীজধান সাজাচ্ছিল, কেউ বা লাঙল জোয়ালের দড়িদড়া। তারাও সন্ত্রস্ত হয়ে তাকায়। কথাবার্তা হৈ-হল্লা সব বন্ধ হয়ে যায় নিমিষে—যেন গৌড়ের কোন এক অধীশ্বর ঢুকলেন দরবারে।

একজন পণ্ডিত আছেন—কাছে পাঠশালা। এ বাড়ির তিনি জায়গীরভোগী। কুবের তলব করেন, পণ্ডিত!

সুবল সবিনয়ে বলে, আহ্নিক করতে গেছেন, সন্ধ্যে হয়েছে।

সামান্য একটি কথা, তবু যেন ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠেন কুবের। সত্যিই কি বেলা নেই—সন্ধ্যে হয়েছে? অন্তর্দ্বন্দ্বের ছুরিতে তাঁর বুকটা ফালাফালা হয়ে যায়। তিনি আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন, আষাঢ় মাসের মেঘলা বেলা—সত্যিই দারুণ ঘোর হয়ে এসেছে। তিনিও আহ্নিক করতে যান। কৃষাণেরাও ওঠে। আলো জ্বলে গোটা দুই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুকুরঘাটে দেখা যায় কুবেরকে। হাতে আহ্নিকের মালা। মনে অপরূপ এক নারীর রোশনাই। তিনি বারবার ইষ্টমন্ত্র ভুলে যান।

কুবের ফিরে আসেন কাছারিতে। সঙ্গে পণ্ডিত। সন্ধ্যা প্রায় উতরে গেছে। দিনের কাজ সারা, তবু কৃষাণেরা শেষ করতে সাহস পায় না হাতের কাজ। যে যার জায়গামত ব্যস্ত হয়ে বসে। হুঁকোয় টাটকা জল ভরে একজন তামাক সেজে আনে। বলে, ইচ্ছা করেন মহারাজ।—সকলে ভাবে এবার পণ্ডিত মশাইকে এক হাত নেবেন কুবের। নইলে অমন করে তলব করার অর্থ কি? ভয়ে ঔৎসুক্যে কান খাড়া করে থাকে ঠিকা কৃষাণেরা, কিন্তু তাদের হাত জিরোয় না। যে যার চরকায় তুলো করে তেল দেয়। কারণ খেয়ালের ঘুড়ি উলটোমুখী ঘুরতে কতক্ষণ!

বাইরের বাগানে পোকামাকড় ঐকতান জুড়ে দিয়েছে। ফলবাগিচায় ডানা ঝাপটাচ্ছে উৎসাহী বাদুড়। অন্যদিন হলে নিজেই দুর-দুর করে তেড়ে যেতেন কুবের। আজ তাঁর বেলাশেষের মনে একটা শুধু জ্বালা। ঠিক জ্বালা নয়, নিষ্ফলতা। তার পাকে পাকে হিংসা, হয়তো ঈর্ষাও আছে মোচড়ে মোচড়ে।

কুবের তামাক টানেন, বিরক্তির মুখে মুখে সকলে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু বলেন না গৌড়েশ্বর। আবার গুড়ুক গুড়ুক—তার পর সব চুপচাপ। এমনি ভাবেই রাত বাড়ে। কারুকে শূলে চড়াবার হুকুম হয় না। এ এক অসহ্য পরিস্থিতি—সকলের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

জল নামে। ঝাপটা আসে তেরছা হয়ে। লণ্ঠনের আলো দুটো নাচে।

তোমরা রাত করো না, খেতে যাও। ওই জলের ভেতরেও কেউ ইতস্তত: করতে সাহস পায় না। পণ্ডিত মশাইও কাপড় গুটিয়ে অন্দরের দিকে রওনা দেন। ভাতের অভাবেই তিনি সুদূর বাবুইপুর থেকে এই গণ্ডগ্রামে এসে ঢুকেছেন পুঁথি-পুস্তক বগলে! এখন সেই ভাতই নাকি প্রস্তুত।

বৃষ্টির শব্দে কান পেতে থাকেন কুবের একা। কিন্তু নিঃশব্দে তাঁর মন হেঁটে চলে যায় যেন চোরের মত সেই মোড়লদের পুকুরপারে। মেঘ-ভাঙা চাঁদের সঙ্গে যেন

। হল—কি যে লাবণ্য বর্ণনা করা যায় না! চোখে মুখে যেন টাটকা মাখন। পাকা করমচার মত য় উঠল চোখাচোখি হওয়া মাত্র। অভাব স্বাস্থ্যে ভাব বস্ত্রে।

:রের ঘরে এলে কি তার কোন চিন্তা আছে? কুলীন কন্যার জন্য একখানা না হয় আব্রু-মহল । কিন্তু কি উপায়ে আনা যায়?

কারে পথ দেখা যায় না। যেন কালো মোটা ঠেলেও ফেলা যায় না। কুবের ভিজে হাওয়ায় :য় স্তব্ধ হয়ে থাকেন। হিসেব কষে দেখেন এত ।ও পংক্তিতে ওঠার সিঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। :ার ঐশ্বর্যের খড়্গ দিয়ে আঘাত হানবেন। এ চাদর তখন কি ছিঁড়ে পড়বে না? নিশ্চয়। ড়ে পড়বে কোন্ দুঃখে? রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে। দর অন্তঃপুরে শোনা যাবে কান্না। ছুটে আসবে :র পরী এ বাড়ির আঙিনায়। তখন তাকে :ক করে রাখবেন কুবের।

: অন্তরায় হচ্ছে বিভীষণ ছেলেটা। একটু :রেন কুবের। ইতিহাস না পড়লেও ঐতিহাসিক :তে থাকে তাঁর ভিতরে।

:বের টগবাগানি বাইরে প্রকাশ পায় না। :তের হাঁড়ির সরার মত ঠোঁট দুখানা একটু একটু নিজ হাতে তামাক সেজে নিতে চেষ্টা করেন শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে ওঠে না।

:ণেরা ফিরে এলে কুবের আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বলেন, :লে?

:জন দাঁত বের করে জবাব দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ।

:ত কোথায়?

:য় এগিয়ে আসেন পণ্ডিত মশাই।

:ছা, পরের মেয়ের দিকে কুনজরে চাইলে কি হয়?

:রতর পাপ।

:।?

হলে শূলে চড়ানো।

:দর ছেলে হলে?

:ত কেঁপে ওঠেন। তিনি চট্ করে কোন জবাব :রেন না। হঠাৎ তাঁর জিভ যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কি, চুপ করে রইলেন যে?—কুবের তাঁর চোখজোড়া মুখের ওপর ধরতেই গরীব পণ্ডিতের পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। তিনি যেন সমস্ত নৈতিক পাপপুণ্যের বিধান ভুলে যান।

কুবেরের একখানা হাত ধরে বলেন, আমি কি জানি। আমি আপনাদের সামান্য অন্নদাস। কুট্টিল পাড়ার তর্কালঙ্কার এসব বিধান দিতে পারেন। আমি অজ্ঞান, বেদ-বিধানশাস্ত্র জানি নে।

তবে এত কাল আমার মিছামিছি ভাত নষ্ট হয়েছে!

পণ্ডিত বিপদে পড়েন। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভিতরটা বেচারার থরথর করে। বলেন, তা হলে কি করতে চান?

পণ্ডিত হয়ে আপনি বলবেন, না, আমি বিধান দেব?

তবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিন।

একটু হাসেন কি হাসেন না কুবের। বলেন, এত দরদ! বড় নরম হল সাজা পণ্ডিত মশাই। যাক, তাই হবে। কিন্তু ও আমার ত্যাজ্যপুত্র। ওর পাপ ক্ষমা করা যায় না।

দায়ে ঠেকে সবিশেষ কিছু না জেনেই পণ্ডিত বলেন, যা বলেছেন, এ সব নিতান্তই অন্যায়।

তা হলে সংবাদটা আপনিই বলে দেবেন মদনকে। এ বিষয়ে আপনার চাইতে আর কেউ উপযুক্ত নেই। আমি উঠি এখন।

আচ্ছা।

সংবাদ পৌঁছবার দরকার হয় না পণ্ডিত মশাইয়ের। অন্দরে ঢুকে কুবের দেখেন ঘটনা ঘটেছে ভিন্ন একটা। কুবেরের মত মানুষও এ সব কল্পনা করতে পারেন নি।

আটচালা বসতঘর। মানুষ সমান উঁচু পোতার উপর যেন টিনের শিরোপা। দিনে ঝকমক করে। রাত্রেও একেবারে জেল্লা হারায় না। তেলমাজা চৌকাঠগুলো মনে হয় যেন মালিকের মনের বাঁধন। খুনে-ঝালে, রাগে-রঙে কটকটে।

ভিতরের বারান্দায় পা দিয়ে বড় বউয়ের সঙ্গে দেখা। বড় বউ জিজ্ঞাসা করেন, কে?

ছেলে তোমার লায়েক হয়েছে বড় বউ!

বড় বউ কাপড় সামলে মাথার ওপর টেনে দেন কচি বউয়ের মত আঁচল। বলেন, এখন বিয়ে দিলেই হয়।

ছাঁত করে ওঠে কুবেরের মন। তিনি একটু দম নিয়ে বলেন, কথাবার্তা চালাও না মোড়লদের সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে তো খুব দহরম-মহরম দেখি ও-বাড়ির!

সত্যি?

হুঁ। একজীবন আমার সঙ্গে কাটিয়েও কি আমাকে চিনতে পারলে না?

আপসোস করে লাভ নেই। মেয়েলোকের কিবা বুদ্ধি! ঈশ্বরও সব চেনেন কিনা সন্দেহ।

কি বললে?

তারিফ করলাম স্বামীর।

কুবের মনে মনে একটা গাল দেন। মুখে বলেন, বয়সের লঙ্কার তেজ বেশী। দাড়িগোঁফের জঙ্গল চিরে মুখের ভাব দেখতে না পেলেও অনেক দিন বাদে বড় বউ তুষ্ট হন একটু।

খাবে না?

তুমি খেয়েছ?

না। এখন পর্যন্ত যে মদন এসে খায় নি, সে কথা আর বলেন না বড় বউ।

ওরা দুই বউ?

খেয়ে শুয়েছে। এখন ওদের মাঝরাত।

ভাল হয়েছে। আজ তোমার এখানে আমি শোব।

অনেক দিন বাদে এ প্রস্তাব। গ্রীষ্মের সূর্য অস্ত গেলেও তার দাহ একেবারে যায় নি। পাকা তরমুজের কাটা টুকরোর মত বড় বউয়ের মন টকটকে হয়ে ওঠে। তিনি ভাত বাড়েন আর হাত কাঁপে।

কুবের লক্ষ্য করেন দৃষ্টি ভেরছা করে। নিষ্ফল হয় নি তাঁর সন্ধান। এঁকে দিয়েই কাজ হাসিল করাতে হবে ধীরেসুস্থে। ইনিই ঠিক বুঝবেন কী করে বাড়াতে হবে সামন্তবাড়ির সম্মান। তবে ছেলের বদলে ভিন্ন কারুর সঙ্গে যখন হবে শুভদৃষ্টি তখন একটা ওলটপালট হতে পারে। কিন্তু সে পাশাও উলটে যাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে। শুধু আর একবার তাকে বুদ্ধির হাতিয়ারে শান দিতে হবে—বাস্!

একখানা বড় পিঁড়ি। তার সুমুখে ভাত মাছ তরকারি জলের গ্লাস। অত্যন্ত পরিপাটি করে সমস্ত সাজানো। নুনও আছে একটা খোরায়। গন্ধ আসছে ঝাল-মসলার।

ওকি, গ্লাসে যে জল নেই!

বড় বউ লজ্জা পান। মুখ তাঁর রাঙা হয়ে ওঠে। বলেন, ভুল হয়েছে আমার। তিনি একটা ঘটি থেকে জল ঢেলে দেন। ঝোলের বাটিতে তাঁর আঁচল পড়ে যায়। তিনি লক্ষ্য রাখতে পারেন না।

কুবের আঁচলখানা ধরেন। ঠাণ্ডা গলায় বলেন, লঙ্কার ঝাল, ধুয়ে ফেল, না হলে সারারাত পোড়াবে।

এবার আর বড় বউ যেন দাঁড়াতে পারেন না। কুবের অল্প খান, বেশী ভাবেন। বড় বউ পরিবেশন করেন সযত্নে। কিন্তু সে দিকে তাঁর খেয়াল নেই। তিনি খেয়েদেয়ে উঠে একেবারে নিজের খোপে যান। সর্বনাশ! তাঁর হাতবাক্সটা ভাঙা! ভিতরে কাগজপত্র কৌটো সুতো ছড়ানো।

তিনি বারুদের মত জ্বলে ওঠেন, কার কাজ তা এক লহমায় বুঝে ফেলেন। ডাকেন, মদনের মা, মদনের মা!

বড় বউ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। হাতে তাঁর এঁটো বাসন। জিজ্ঞাসা করেন, কেন? কি হয়েছে?

খাওয়া হল?—ইতিমধ্যেই কুবের একরকম গুছিয়ে ফেলেছেন বাক্সটা। সঙ্গে সঙ্গে ছড়ানো টাকা পয়সা সিকি আধুলি। তিনি কাউকে কিছু জানতে দেবেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো খাওয়া হল?

না। এখনও মদন আসে নি।

সে আর আসবে না। জেলায় পাঠিয়েছি, পরীক্ষা সামনে।

বড় বউয়ের বুকটা পুড়ে ওঠে। আমাকে না বলে কয়ে গেল?

আহা আমি তো জানি। ছেলের সম্বন্ধ দেখ, নইলে মুখ দেখানো যায় না, বুঝলে তো?

সব বুঝেও কী যেন বুঝতে বাকি থাকে। বড় বউ একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন, বলেন, হাজার দুশ্চরিত্র হলেও ছেলে।—তাঁর দৃঢ় ধারণা ছেলের এ দুর্নাম উঠতি বয়সের দোষ। বিয়ে দিলেই অনায়াসে ঘুচে যাবে। লেখাপড়া

মিছিমিছি সময় নষ্ট করা। এই ফ্যাশানেই
ধে যত গণ্ডগোল!
ারবেলা শয্যাত্যাগ করতে ভুল হয় না কুবেরের।
াহ্নিক সেরে কাছারিতে এসে কুবের পণ্ডিতকে
আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।
ণ্ডিত বিস্মিত হয়ে থাকেন—কৃষাণেরাও। পণ্ডিত
া করেন, কেন?
তামরা পান্তা খেয়ে মাঠে যাও। হাঁ করে থেকো না।
কৌতূহলী মুখগুলো চুন হয়ে যায়। যে যার কাজের
গুলো গুছিয়ে নিয়ে কাদায় নামে। একজন তামাক
ার অছিলায় গড়িমসি করে।
ারামজাদা ফড়িং, তুমি আমাকে চেন না!—কুবের
য়ে উঠতেই সে পগারপার। কিন্তু পণ্ডিতের আবার
কিয়ে যায়। তিনি মনে মনে ভগবানকে ডাকেন।
নতান্ত তুচ্ছ ঘটনা ছেড়ে দিলে কুবের আজ পর্যন্ত
ক মেরেছেন কিনা সন্দেহ। তিনি ধমক দিয়েই
াদারীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তিনি হেসে
ন্দর চোখে বলেন, শালা মুর্খ, এখনও আদবকায়দা
নি।
পণ্ডিত মন্তব্য করেন, আপনার কদর বোঝা ওসব
কর্ম নয়। কী যেন বললেন?
শোনেন নি?
না, বুঝি নি ভাল করে।
ও!—একটু মনে মনে বুদ্ধিতে শান দেন কুবের।
া, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না। মদন নেই।
মুখ আমসি হয়ে যায় পণ্ডিতের: কত কি যে আশঙ্কা
। ওঠে, বলেন কি মহারাজ?
পরীক্ষা কাছে, বোডিঙে পাঠিয়েছি পড়তে।
তাই বলুন! ভালই করেছেন। এই হল বাপের
কাজ। শিক্ষাও হল, শাসনও হল।
কুবের একটা স্নেহ-মেদুর চাউনি মেলে ধরেন পণ্ডিতের
ন: আপনি কি ভেবেছিলেন?
সে আর বলে লাভ নেই। ভগবান!
কুবের হাসেন। এবারও স্নেহ যেন উথলে উথলে
। বলেন, যাওয়ার সময় আমার পায়ে ধরে বলে গেছে,
না করে আর আসবে না।

শুনে খুশী হলাম। হাতে ধরে লেখাপড়া শিখিয়েছি। কত আশা ভরসা রাখি। বিদ্বান চরিত্রবান হয়ে দেশের দশের মঙ্গল করবে।

কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, গোপনে বললাম।

দূর দূর, আপনি কি আমাকে গাধা ঠাউরেছেন! আমি কি বেইমান?

বড় বউ ওর বিয়ে দেবার জন্য পাগল। ও কি এখন বিয়ে করবে? এখনও লেখাপড়া শিখতে কত বাকি! বিয়ে কি এখন সম্ভব?

কিছুতেই না।

কুবের ভারি খুশী হন। হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলে ঘন ঘন। বলেন, দেখুন, আমি বাপ। আমি ছেলের মর্জি অন্যের চেয়ে ভাল বুঝি। বড় বউ কেঁদে হাত ধরে টানলেও আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না। বড় বউ তো জানে না—মরদ্ কা বাত্, হাতী কা দাঁত। সে পাস করবেই পরীক্ষায়।

পণ্ডিত রোমাঞ্চিত হতে থাকেন।

যাক, দু-একটা মনের কথা আপনার কাছেই শুধু বলি। ভুলে ফাঁস করবেন না।

দাঁতে জিভ কেটে পণ্ডিত বলেন, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

ভিতর-বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকেন কুবের। বড় বউ ফেরেন না। আশার তারে কুবের সার্কাসের কৃতী খেলোয়াড়ের মত টলে টলে দণ্ড পল গুনতে থাকেন।

অবশেষে সীমানার বেড়া ফাঁক হয়। একটা কচি পাঁঠা।

কুবেরের মন যেন বলির খড়্গ নিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

পিছনে বড় বউ।

তিনি বালকের মত উৎসুক হয়ে থাকেন। পাঁঠাটাকে বেঁধে বড় বউ পা ধুয়ে ভিতরে আসেন। বাগিচার পথে যেটুকু ঘোমটা ছিল তা দ্বিগুণ করে দেন ভিতরে এসে।

কি বললে?

অর্জুন মোড়ল বড় কড়া। জরেকাশে মরতে বসেছে, তবু গোঁ ছাড়ে না। ভিক্ষে করে খাবে, তবু বংশ বেচে খাবে না।

তারপর—

গেলাম রাঙাদির কাছে। অনেক বোঝাতে বোঝাতে সে নিমরাজী হল।

নিম-টিম বুঝি নে। একেবারে পাকা রাজী করাতে হবে। অভাবের সংসার, কখনও খালি হাতে যেয়ো না। চিকন চাল নারকেল সুপুরি, সময়েতে দু-দশটা হাঁসের ডিম নিয়ে যাবে। অর্জুন মোড়লের কাশির ব্যামো, রোজ একটু ছাগলের দুধ দাও না কেন?

বড় বউ একটু বিস্মিত হল। এমন দিল-দরিয়া ভাব তো কখনও দেখেন নি সামন্তের পোর। স্বামী তার শুধু বুদ্ধিমান নন, জ্ঞানী এবং বিবেচক। বউয়েদের যৌবনে শাড়ি-গয়নায় ফালতু পয়সা না ঢেলে, এখন ছেলের জন্য মুক্তহস্ত হতে চাইছেন। একেই বলে কায়েমী কাজ। ঈশ্বর ওঁকে শতায়ু করুন। বড় বউয়ের সরল মনটা অল্পতেই মোমের মত গলতে চায়।

কি, অমন করে রইলে যে?

তুমি যে এত বড় তা এতকাল বুঝি নি।

কুবের এ প্রশংসা শুনেও যেন শুনতে পান না। এমন একটা উদাসীন ভাব নিয়ে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ের কন্যা দেখলে?

মেয়েকে? রোজ দেখি। রোজই যেন চাঁদের মত বাড়ছে। এখন একেবারে ভরা পুন্নিমে!

কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে কুবের ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেন, এ ঘরে মানাবে তো?

এখন আর তুমিই বা কমতি কিসে? তবে সত্যি বললে বলতে হয়, আমার ছেলে ওর যোগ্য নয়। কি যে রূপ মেয়ের!

এ কথাটারও ভাল করে আস্বাদ নেন কুবের। বলেন, আমার সাধ কি আজকের! শোন, ওরা যা চায় তাই কবুল করবে। টাকা পয়সায় ফেরাবে না। জোর-জুলুমীর কুটুম্বিতা কিন্তু টেঁকে না।

এ ধম্মের রাজত্বে তা চলেও না কোনদিন। টাকা হলে বনের বাঘেরও চোখে লজ্জা হয়। আজ হোক, কাল হোক রাঙাদি মাথা নোয়াবেই। তখন অর্জুন মোড়ল আর যাবে কোথায়?

দেখ, জুলুমী না হয়। এখন বয়স হয়েছে, তুমি আমি আর কদিন?

এ'টা বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কুবের একটু শঙ্কিত হন। কেন এ কারচুপি, কেন এ শঠতা— তিনি ঠিক বুঝে উঠতে চান না। তিনি বড় বউকে বিদায় দিয়ে যেন মনের মালা টিপতে আরম্ভ করেন। এ প্রসন্ন ধ্যান-গম্ভীর চতুর মূর্তিটি এক পরম করুণাময় ছাড়া আর কেউ দেখেন না।

শীতের যাবতীয় কাঁথা-কাপড় স্তূপীকৃত হয়ে থাকে। বড় বউ তাঁতির মাকুর মত এ-বাড়ি ও-বাড়ি করেন। পাঁকে থেয়ে তাঁর পা দুখানা প্রায় ঝাঁজরা করেছে।

একটু জিরান দাও বড় বউ। অত গরজ দেখানো কি ভাল?

বল কি? রাঙাদি পুরো রাজী, এখন কেবল—

তুমি রামায়ণের সীতা। তোমার ধৈর্যের কাছে মাথা নোয়াই। তা হলে দু-একদিনের মধ্যে সুখবরটা পাব নিশ্চয়ই?

কৃষ্ণ জানেন! আমি শুধু খাটতে পারি।

চালের কি জেল্লা! একদিন কৌলীন্যের দার্ঢ্য ভেঙে পড়ে। খবর শুনে কুবের বলেন, আর দেরি করো না মদনের মা খাবার কিছু সঙ্গে নাও, মানত করে নায়ে ওঠ।

কোথায় যাব?

জেলায়।

তুমি যাও।

আমি গেলে কাজ হবে না। ফল হবে উলটো, শত হলেও তুমি মা। তোমার কথা এড়াতে পারবে না।

মানত করে কিছু ফলমূল সঙ্গে নিয়ে বড় বউ নায়ে ওঠেন। সঙ্গে যান পণ্ডিত ও একজন প্রবীণ। ডুলকি চালে নাও চলে, পালে বৈঠায় হেলে দুলে। ছোট খাল, বড় খাল তারপর ধুধু খোলা গাঙ।

কুবের একখানা চিঠি লিখে আরও ঘুলিয়ে দিয়েছেন গাঙের জল।

তিনি গাঁয়ের ছোট-বড় উত্তম-মধ্যমকে ডেকে আনেন, খবরটা রটিয়ে দেন পান-বাতাসা বিলিয়ে। দেখতে না দেখতে সাত গাঁয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। নিমন্ত্রণের আশায় লোক আসে দলে দলে।

আশীর্বাদ শুভেচ্ছার আর অন্ত নেই।

মহারাজ, কবে শুভকর্ম?

আগামী মাসের প্রথম।

দিন হাল বন্ধ যায়। কৃষাণেরা তেলের বাটির
ড়-ঘর কাছারি-বাগান পরিষ্কার করে। কুডুল
ঝাপ।
ড় ডেকচি গামলা পরাত হুঁকো চক্‌চকে হয়।
রসি শতরঞ্চি আসে মাথায় মাথায়। শামিয়ানার
া নেই। মোড়ল-বাড়ি আছে। এবার অযাচিত
উপদেশ। খাসী পাঁঠার ফিরিস্তি। কোথায়
যাবে ভাল মাছ? কোথায় দই-সরবেশ?
পোড়ে আড়াই সের। তবু কুবের হুঁ-হাঁ করেন
িনি প্রথম শুভ কাজের পত্তন করেন হাটে-বন্দরে
জানী কাপড় ও গয়না কিনে। নীল ডুরে,
ড়, হাঁসুলী কিছু বাদ যায় না।
একখানা শাড়ি ও গয়না মেজো বউ ও ছোট বউ
র প্রশংসায় জ্বালায় পঞ্চমুখ।
র মিটিমিটি হাসেন।
দনের জায়গায় প্রায় এক সপ্তাহ কেটে যায়।
য়ে ওঠেন কুবের। বড় বউয়ের জন্যে আশঙ্কা নয়।
মদন রাজী হল? না না, এ কিছুতেই হতে
। তাঁর চিঠির চাপা বিষ কি মদনকে কাবু
?
রবেশলোভীরা বলে, লোক পাঠানো উচিত।
বউ না এলে তো কিছু নির্দিষ্ট হচ্ছে না। যা
ঝটপট করাই ভাল।
। বলেন, সবুর।
দনই বড় বউ ফিরে আসেন। মাঝি পণ্ডিত
ণের মুখ শুকনো।
এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলেন, তুমি আর কেঁদে
দিয়ো না বউ। ও তো ছেলে নয়, শত্তুর।

য় শোকের রোল গড়িয়ে যায়। মেজ বউ ও
চেপে চেপে নাকের জল চোখের জল ফেলেন।
ময় শুব্ধতা। অর্জুন মোড়ল একটানা কাশতে
রাঙাদির মুখে ভাত ওঠে না।
নির্বিকার। এ যেন তাঁর জানা গৎ। তিনি
র্পণে দেখতে পান এ জীব-জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ-

পণ্ডিতমশাই, কি বললে পাষণ্ড?

সে নাকি একটা ভাল চাকরি পেয়েছে। এখন আর মোড়লদের অশিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করবে না। বিলেত যাবে। ফেরার মুখে মেমসাহেব নিয়ে আসবে। আর তার মুখ দিয়ে এসেছে নাকি একটা কিসের যেন দুর্গন্ধ।

কুবের কানে আঙুল দেন।

এ সব শোনায় বুঝি তাঁর অনিচ্ছা নেই, কানের সুড়ঙ্গে কান-ময়লা যেন বাধা জন্মাচ্ছে।

পণ্ডিত সখেদে বলেন, একেই বলে কুশিক্ষা। নিশ্চয়ই অসৎসঙ্গে মিশেছে।

কুবের বলেন, ধরুন, আশার লাউ পচে গেছে, এখন কি করা যায়? এখন আমাদের দু বাড়ির কি করে মান বাঁচানো যায়? আর তো লায়েক ছেলে নেই আমার।

ভাবনার বিষয়।

সময় কোথায়?—কুবের বার বার বুদ্ধির জাঁতায় ফেলে যেন গম পিষতে থাকেন।

পণ্ডিত বলেন, এক কাজ করা যায়, আপনি গাঁয়ের পাঁচজন মাতব্বরকে ডাকুন, আর কুটিল পাড়ার তর্কালঙ্কারকে।

এক্ষেত্রে পণ্ডিতের পরামর্শ নিতে আর দেরি করেন না কুবের। আদর-আপ্যায়ন, খাওয়া দাওয়ার একটা কূটচক্র ঘুরপাক খায় রাজসিক মেরুদণ্ডে। দরাজহস্তে বিদায়-আদায়ের আভাস পান তর্কালঙ্কার। তিনি বলেন, সামন্তের রাজী হওয়া ছাড়া গতি নেই।—কুবের দাঁতে জিভ কাটেন: লোকে বলবে কি!

আর তো উপায় দেখি না ভাল। আর এ তো কোনও দোষের কিছু নয়। শাস্ত্রে বিধান আছে ভূরি ভূরি।

বড় বউ কি বলবে পণ্ডিত?

তিক্ত বিরক্ত হয়েছেন ছেলের ওপর।

মেজো আর ছোট দুজন?

তাদের বুঝি মান-সম্মানের বালাই নেই?

তবে আমি রাজী—যখন আর উপায় নেই। পণ্ডিত আপনি উঠুন। এখনই বড় বউকে নিয়ে মোড়লবাড়ি যান।

সেদিনের সভা ভেঙে যায়। তর্কালঙ্কার বিদায় হন কুটিলপাড়ার নায়ে। মাতব্বরেরা বাড়ির দিকে।

একটা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে অন্দরের দিকে চলে যান পণ্ডিত। একটু আগে কৃষাণেরাও খেতে গেছে। শূন্য কাছারিটায় আবার কুবের একা। এমনি নির্জনতা তাঁর বড় প্রিয়। শুধু মূক মরা খুঁটিগুলো তাঁর সঙ্গী। ওরা বাধা দেবে না, নিমন্ত্রণ চাইবে না—নির্ঝঞ্ঝাট আনুগত্য। হ্যাঁ না যা বলবেন তিনি, তাতেই ওরা রাজী।

ওখানে বসেই তিনি বড় বউয়ের মনের গহনে নেমে যান। এবার উঠবেন বড় বউ।

সব জলের মত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু তবু খচখচ করে কেন মনটা? তিনি আকাশপাতাল চক্কর দিয়ে আসেন যেন ঘোড়ায় চড়ে। সবাই তাঁর সপক্ষে—শাস্ত্র পুরাণ সমস্ত গাঁয়ের জনমত পর্যন্ত। তবু খচখচানি কেন?

কৃষাণেরা এসে পড়ে। ঘণ্টা দেড়েক বাদে আসেন পণ্ডিত।

কিন্তু ভোরবেলা শোনা যায় বিয়ের কন্যা নাকি জলে ডুবেছে।

কুবের বিশ্বাস করেন না। মন্তব্য করেন, যতসব বজ্জাতি!

সংবাদ পেয়েই কুবের পুকুরঘাটে গেলেন, মোড়ল-বাড়ি লোকে লোকে ঠাসা। ঘাটে নয়—ডুবেছে নাকি খালে। ছৈলা গাছটার দক্ষিণে।

কুবের গিয়ে দেখেন একখানা শাড়ি ভাসছে জলের স্রোতে। আরও দাগ কেটে মনে বসল তাঁর সন্দেহ। খবর পাঠালেন থানায়। পুলিস এল, জেরার মুখে শাড়িখানাও সনাক্ত করা হল না। ডুবুরী নামিয়ে জাল ফেলে তোলপাড় করা হল খাড়িখালের জল। কোথায় নারী? শুধু রয়ে গেল একখানা হালকা শাড়ি।

লোকে বুঝল ঝামেলার ভয়ে সনাক্ত করলেন না হাভাদি মেয়ের কাপড়, সামন্ত বুঝলেন কুলীন কন্যা একটা রঙের টেক্কার তুরুপ কষেছে। এতে জয়ী হওয়া দুষ্কর।

এর পর কাঠফাটা সাতটা বছর পেরিয়ে গেছে। সে কি খোঁজা! সে কি হয়রানী!

ঝলসে গেছেন পণ্ডিতমশাই। বুড়িয়ে গেছে মাধব পাইক। শোকে দুঃখে মরে গেছে অর্জুন মোড়ল। হাট-বাজার গঞ্জ সদর বারবার সন্ধান করা হয়েছে। বলতে গেলে এখন শুধু গয়াকাশী বাকি। মদন বিলেত যায় নি। কাছে কোন্ টাউনে আছে। তার পিছনেও ঘুরেছে অনেক সন্ধানী। এ তল্লাটের লোক বিশ্বাস করেছে জলডুবি। শুধু কুবের মত বদলান নি।

বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে স্বর্গের অপ্সরী। শুধু তাই নয়—রূপে রঙে হয়েছে জলে ডুবে ওঠা সোনালী চাঁদের মত। এ চাঁদ পূর্ণিমার নয়। ঢেউয়ে ঢেউয়ে খানিক ক্ষয়েছে।

তবু সাত সাতটা বছর পর্যন্ত হাল ছাড়েন নি কুবের। বলতে গেলে আকাশপাতাল খুঁড়েছেন। ছেলে বাপের সম্পর্ক না রাখলেও কুবের তা পারেন নি। যখনই যেখানে বদলি হয়েছে মদন, সেখানে গুপ্তচর পাঠিয়েছেন। কোন পাত্তা পান নি আজ পর্যন্ত।

খালপাড়ের ঘাটে বছর বছর ফসল ফলেছে, ছৈলা গাছে ফুল। কেউ কেউ নাকি দেখেছে সবুজ ঘাসের শিরে বিয়ের কন্যাকে। নিশাচর মুসাফির নাকি হাসি কান্না শোনে। কিন্তু কুবেরের মন টলে না।

শুধু টলে বয়স।

বড় বউয়ের চোখের রোশনাই আরও কমেছে। একদিন ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করেন, একটু তীর্থধর্ম করতে চল।

কুবেরের চোখ জ্বলে ওঠে: কি যেন বললে?

তীর্থে যেতে চাই।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এক এক দিন এ কথা কুবেরও ভেবেছেন। দেশদেশান্তর দেখা যাবে। পাহাড় পর্বত আর বাকি থাকে কেন? তীর্থে যেতে রাজী হন তিনি।

একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুণ্য সঞ্চয়ের। বাড়ি-ঘর তদারকীর ভার দেওয়া হয় পণ্ডিত মশাইয়ের ওপর। তিনি একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। আত্মীয় অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষ আসে। আসে পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুজন—খালের দু পারে আর ঠাঁই নেই বিদায়ের দিনে।

কুবের ভাবেন এমনি মূর্খের ভিড় হয়েছিল সেবার পুলিস এলে। তাঁরা কি আর ফিরবেন না? মিথ্যা যত ফোঁপানি।

কেবল একজনের চোখের জল সত্য। সে ওই

। সত্যিই তিনি তীর্থপিপাসু। কিন্তু কে
তাঁর রাহাখরচ ? তিনি তো একগাদা আগাম
ন কাঁদছেন।
ক্ত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নেন কুবের।
ভুরে শাড়িখানা দোলে যেন আকাশে-বাতাসে,
ান পিছল হয় কড়া পাষাণ। বদর বদর করে
ধালে বদন মাঝি।

া ছেড়ে স্টীমার। পুরো পাঁচটা ঘণ্টা ডানা ঝাপটে
তারপর হাওড়া স্টেশন। এখান থেকে আবার
কিন্তু একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে প্ল্যাটফর্মে।
তীর্থযাত্রা। কিছু কেনাকাটা বাকি, পথ তো
।
বউয়ের জন্য একটা কোণ বেছে ঠিক করেন কুবের।
বেশীক্ষণ লোক-ঘিচঘিচে প্ল্যাটফর্মে থাকতে ভাল
া। যত সব নখদন্তহীন তীর্থযাত্রী। এতদিন
াচুরি মিথ্যা ফেরব্বাজি করে এখন চলেছে
ণ্য সঞ্চয়ে! এখনও টাকা সিকি, পরের জায়গা
গায়েব করতে অনেকে ভোলে নি। কুবের
র্ক এড়িয়ে বাইরে বাইরে পায়চারি করেন।
দন রাত প্রায় আটটা।
ীচু বাড়িঘর, দোকানপসারে অজস্র আলো, একটু
ব ভাগীরথী-তরঙ্গ। হাওয়া দিচ্ছে মিঠে মিঠে।
মন মেঘলা ঘোলাটে।
র, তসবির কিনবেন ?
?
ম আপনার গোলাম। একটা বুসসার্ট ও পায়জামা-
াকরা। মাথায় টুপির বদলে রুমাল। হাতে টর্চ।
লো জ্বলতেই অন্ধকারের বুকটা যেমন চিরে যায়
চিরে যায় কুবেরের এতকালের শক্ত কলিজাটা।
ছবিটা কেড়ে নিয়ে বলেন, এ ছবি তুমি কোথায়

রজান বাইজীর। দেখা করবেন ?
াও।
ার প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তীর্থযাত্রার যা কিছু মাসুল রাহা-
য়ে আসেন কোমরে বেঁধে। বলেন, চল।

এই ভাবে ? জোলার কাপড়, গেঞ্জি গায়ে ?
একটু লজ্জিত হন কুবের। তিনি ক্ষিপ্ত মনের রাশ টানেন সজোরে।
তা হলে কী করতে বল ?
পয়সা খরচা।
হিসাব করে বল। তার ওপর কিন্তু বকশিশ।
আমি বুরবক না হুজুর। পঁচিশটা টাকা দিন।
তুমি যদি পালিয়ে যাও।
তসবিরখানা তো রইল।
ওর আর কি দাম ?
তবে কেটে পড়ুন হুজুর। আমরা ঠেলাগাড়ির কুলি নই। গহরজান বাইজীর দরবারে এ ভাবে যাওয়া যায় না। আপনার গা দিয়ে বোটকা গন্ধ আসে।
একেবারে খাস কলকাতা, তার ওপর এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। কুবের টাকা বার করে দেন পঁচিশটাই। প্রায় আধমণ চালের দাম।
হাসালেন হুজুর। দেখতে মোটা, কিন্তু কলিজাটা এতটুকু!
অর্ধেক অন্ধকার, বাকিটা আলো, তার ভিতর দাঁড়িয়ে থাকেন তীর্থযাত্রী। আকাশ ও পৃথিবী একটু একটু টলছে যেন। টলছে ট্রাম, বাস, হাওড়ার পোল। তা হলে কি বিয়ের কন্যা এখনও জীবিত ?
চোখে না দেখা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস নেই। কুবেরেরও মনে হয়, এও বুঝি ভোজবাজি, জালিয়াতের কারসাজি।
সবই যেন শলা-পরামর্শ করা। সবই যেন প্রস্তুত। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একখানা ফিটন আসে। সেই ছোকরার হাতে গিলে-করা ফুল-তোলা একটা পাঞ্জাবি ও পায়জামা একটা। দামী আতরের খোসবুতে মাতাল করেছে হাওয়া। একটা টুপিও এনেছে কাশ্মীরী।
এক রাত্তিরের ভাড়া কুড়ি টাকা। ধরুন হুজুর।
কুবের জিনিসগুলো হাত পেতে নেন। গাড়িতে উঠে সাজ বদলে আমিরী চালে বসতে প্রয়াস পান। আজ তাঁর জীবনে একটা পালাবদল।
একটা ফুলের তোড়া ছোকরা তাঁর হাতে দেয়। এটা বাইজীকে পয়লা দেবেন। এর দাম আর ফিটন ভাড়া আরও পঁচিশ।

এবার কুবের মশগুল হন একটু। কিন্তু টাকা বার করেন না। ছোকরা আবার দাগা দিয়ে কথা বলে। তখন বাকি টাকা বার হয়।

ফিটন এগিয়ে চলে শহরের বুক চিরে। আলো-ছায়ায় ছবিখানার দিকে চেয়ে থাকেন কুবের। এ তিনি কোথায় চলেছেন। স্বর্গে না নরকে—সে প্রশ্ন তাঁর মনে ওঠে না। সমস্ত তন্ত্রীগুলো কি যেন উত্তেজনায় থরথর করে।

ফিটন আরও এগিয়ে চলে শহরতলীর একটা পথ ধরে। এখনও দেরি আছে। কুবের অনুমান হারান না। এ পথ যেন তাঁর চেনা, কতকাল ধরে যেন আনাগোনা করেছেন। এমনি ভাবে বসে থাকেন গাড়ির গদিতে। কেবল মাঝে মাঝে অভিশাপ দেন সুদীর্ঘ রাস্তাটাকে। ফুল আতরের গন্ধে তিনি একটু বেসামাল হলেও তাঁর জীবনের ধর্ম ভিন্ন। তিনি ভাঙলেও মচকাতে পারেন না।

ফিটন আরও এগিয়ে চলে।

একটা মিশ্র সংগত শোনা যায়। সারেঙ্গী তবলা হারমনিয়মের সুর চলছে একত্রে। বাগানের ভিতর একখানি একতলা বাড়ি। আলো পড়েছে জানলা দিয়ে। ফিটন থামে সিঁড়ির কাছে গিয়ে। ঝোপ বুঝে কোপ মারে ছোকরা: বকশিশ?

এখন আর দর কষাকষির সময় নেই, কত একবারে বল?

পঞ্চাশ।

টাকা বার করেন কুবের।

ছোকরা গুনে গুনে পকেটে ভরে।

চল এবার।

সবুর করুন হুজুর।

ফাঁকিবাজি নাকি?

না না, আপনিই তো সেই ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে চান অন্দরে।

এবার কুবেরের প্রাণটা টনটন করে ওঠে—এতগুলো টাকা কি জলে গেল? আবারও কি দিতে হবে টাকা? এ কি সর্বনাশা খাঁই।

একখানা গানের কলি ভেসে আসে ভিতর থেকে—

(মেরে) জাগাকে যৌবন লুট লিয়া—

ছোকরা বলে, বাইজীর সেলামী?—কুবের একটা রূঢ় ধাক্কা দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েন।

থ মেরে চেয়ে থাকে ছোকরা। এমন রঙ্গিলা প্রজাপতি সে কখনও দেখে নি। সত্যিই স্বর্গের উর্বশী নাচছে। পায়ে ঘুঙুর, গায়ে মাকড়সার জালের মত রঙিন ওড়না। মদালস চাহনিতে জগৎ-পাগল-করা ভঙ্গিমা। ঝাড়লণ্ঠন বাতিদান কার্পেটে চোখে ধাঁধা দেখেন কুবের।

বাইজী খাস হিন্দীতে আপ্যায়ন করে, বৈঠিয়ে জনাব।

হঠাৎ তাল ভঙ্গ হওয়ায় পূর্বের খদ্দেরকটি একটু বিরক্ত হয়। তারাও বেসামাল। ঢুলছিল কার্পেটে শুয়ে বসে। ক্ষমা চেয়ে বাইজী আবার নেচে নেচে গান ধরে—

(মেরে) জাগাকে যৌবন লুট লিয়া...

হাতে পর কঙ্কন গলে পর মালা টুট গয়া...

কুবের সমস্ত কিছুর হিসাব হারিয়ে হাঁ করে থাকেন। গান শোনেন, না নাচ দেখেন বোঝা যায় না। ফুলের তোড়াটা তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে। বাইজী গান বন্ধ করে। কী যেন মনে পড়েছে তার—সে এগিয়ে আসে।

তার বাহুতে লোল লাস্য। কুবেরকে কুর্নিশ করে একেবারে গেঁয়ো ভাষায় বলে, সেলাম সামন্তের পো! বড় কষ্ট করে এসেছেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে আজ রাত্রে আপনার এখানে থাকা কি উচিত হবে?

অস্ফুটে কুবের প্রশ্ন করে, কেন?

বাইজী মুখে একখানা বাঁকা হাসি টেনে অপূর্ব ভঙ্গিমায় একটু এগিয়ে আসে। তার অলক্তরঞ্জিত আঙুলের ছোঁয়ায় কার দুটি রক্তিম-নিমীলিত চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

সহসা যেন বারুদখানায় আগুন লাগে, কুবের চেঁচিয়ে ওঠেন: কুত্তা তুই!

তারপর অনেক দিন—

দূর তীর্থপথ থেকে যারা ফেরে, তারা কেউ কেউ নাকি রূপসী গহরজানকে একবস্ত্রে দেখেছে, হাতে তার রুদ্রাক্ষের মালা, চোখে জল, মুখে একটিই ভজনের কলি—

"মঁয় দাস হুঁ তোমহারা প্রভুজী..."

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রথম খণ্ড : উপন্যাস

দি ব্রাদার্স কারামাজোভ

o not bow to you personally, but to suffering humanity in your person."

...টি কথায় যা বলা যায় না এই কটি কথায় তাই বলে দিয়েছেন দস্তয়ভস্কি।

...োনিয়ার পায়ের কাছে আসীন রাসকোলনিকভের ...বসানো এই কটি কথাই দস্তয়ভস্কির সাহিত্য ও ...র প্রথম ও শেষ কথা। রাসকোলনিকভের মুখ দিয়ে, ...তিত কিন্তু আত্মত্যাগের দুশ্চর তপস্যায় জ্বলে ওঠা ...ণ এক অগ্নিশিখার ছিটকে-পড়া জ্যোতির্ময়ী স্ফুলিঙ্গ ...য়াকে যে কটি কথা শুনিয়েছেন তারই পুনরাবৃত্তিতে ...স্কির সাহিত্যজীবন বারংবার বাণীমুখর। এ কথা ...e and Punishment'-এর হতভাগ্য নায়কের এ কথা কেবলমাত্র ভাগ্যহত এক নারীর জন্যও দস্তয়ভস্কির সৃষ্টি-গঙ্গার উৎস এবং পরিণতি দুই-ই ...গাপন করে আছে মাত্র ওই কটি কথার মধ্যে। এবং ...টি কথার শ্রোতা কেবলমাত্র সোনিয়া নয়—কিছুতেই ...সোনিয়ার মধ্যে দিয়ে যুগে-যুগান্তরে, দেশে-দেশান্তরে ...দিলে সব কিন্তু পেলে না কিছুই' সেই অগণিত ...ত্র পরিচয়পত্রহারা চলিষ্ণু জীবনের যাত্রাপথ থেকে ...-পড়া দলছাড়া লক্ষ্যহারা তপোভ্রষ্টের প্রতি ...লের জন্য উৎসর্গীকৃত। এই পৃথিবীর পৌষ-...নর পালায় যারা আজন্ম চরমবঞ্চিত, সেই সবহারাদের ...য় নিজের জীবনপাত্র থেকে উচ্ছলিত যে মাধুরী ছড়িয়ে দিয়েছেন সুগভীর সহানুভূতিতে সজল ওই ...ীন সান্ত্বনায় সর্বাঙ্গে, তা-ই উদ্‌ঘাটিত করেছে মুহূর্তের মধ্যে দস্তয়ভস্কির সাহিত্যের হৃৎপদ্ম। সেই সহস্রদল পদ্মগন্ধে আজও মাতাল বিশ্বসাহিত্যের নিকুঞ্জবন; আর তার প্রবেশ ও প্রস্থানপথের ধারে অভ্যর্থনার অঞ্জলি নিয়ে চিরকালের রসপিপাসুদের নিরন্তর গুঞ্জরণের অন্ত নেই আজও।

দস্তয়ভস্কির সৃষ্টির রহস্যলোকের অর্গল-মুক্তির চাবি-কাঠি রয়েছে যেমন রাসকোলনিকভের ওই কটি কথার মধ্যে, তেমনই সেই তীর্থপর্যটনের প্রান্তে পৌঁছেও যে কথা বারংবার ধ্বনিত গুঞ্জরিত হবে পাঠক-হৃদয়ে তাও সোনিয়ার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের সকল যুগের শাপভ্রষ্ট দেব-শিশুদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সামান্য কিন্তু অসামান্য ওই কটি কথাই। রাসকোলনিকভের মুখ দিয়ে স্বয়ং তার স্রষ্টা বলেছেন যে কথা তা-ই হচ্ছে দস্তয়ভস্কির সাহিত্যে জীবন-নিঙড়ানো নির্যাস।

রাসকোলনিকভের মুখ দিয়ে দস্তয়ভস্কি আমাদের যা শুনিয়েছেন শুধু তারই জন্যে তাঁর সারস্বত সাধনা যুগোত্তীর্ণ সিদ্ধিতে সার্থক। নিন্দা এবং প্রশংসার, সমালোচনা এবং স্তুতির, ঈর্ষা এবং উচ্ছ্বাসের সীমাহীন ঊর্ধ্বে এই চিরন্তন বাণীর সাধনার দিকে তাকিয়ে আমাদের যে বিস্ময়ের শেষ নেই আজও—এই কথা জানিয়ে অতঃপর প্রবেশ করা যাক বিশ্বসাহিত্যের দস্তয়ভস্কি-সৌধে যার প্রথম তোরণের নাম—'Crime and Punishment', দ্বিতীয় তোরণের—'The Idiot' এবং যার অদ্বিতীয় শিখরদেশ হচ্ছে নিঃসংশয়ে—'The Brothers Karamazov'!

মূলের চেয়েও বাঙালীর কাছে হৃদয়গ্রাহ্য মনে হয়েছে যে দুটি অনুবাদ তারই একটির ভাষান্তরকার [কাশীরাম দাস বলেছেন, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। যে শুনতে

পেয়েছে এই অমৃতসমান কথা, সে নিঃসন্দেহে পুণ্যবান পুরুষ। দস্তয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' মহাজীবনের কথা—শুধু পুণ্যবানের কানে যাবার জন্যে বিরচিত নয়। পাপের গ্লানিবোধে আচ্ছন্ন যে মানুষ উর্ধ্ব আকাশের দিকে অসহায় চোখ তুলে খুঁজতে চেয়েছে স্রষ্টাকে, প্রশ্ন করেছে যদি স্রষ্টা বলে সত্যিই কেউ থাকেন তবে কেন তাঁর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে অশুভের অমঙ্গলের এবং অসুন্দরের এমন সমারোহ, পৃথিবী কেন নয় তবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উৎসবলোক? জানতে চেয়েছে কিন্তু আজও জবাব পায় নি যার—দস্তয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' সেই চিরন্তন জীবনজিজ্ঞাসার প্রথম উত্তর নয়—সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণ।

দস্তয়ভস্কির সাহিত্য-সৌধে প্রবেশ করবার আগে যে দুটি তোরণের তলা দিয়ে যাবার প্রয়োজন অপরিহার্য সেই 'Crime and Punishment' এবং 'The Idiot' দস্তয়ভস্কির সাহিত্যের যথাক্রমে বর্ণপরিচয় এবং বোধোদয়; আর 'The Brothers Karamazov' সেই সৃষ্টির Magnum opus।

দস্তয়ভস্কির 'Crime and Punishment'-এর ইংরেজী অনুবাদের Introduction-অংশে লরেন্স আর্ভিং যে তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হচ্ছে: "1866, Publication of Crime and Punishment, its prodigious success."

এবং এর আগেই:

"1849-57. Four years spent in a Siberian convict prison, living side by side (the cellular system was then not known in Russia and is but little used now) with criminals of the most autrocious type: the very offscourings of Russian humanity. Four more as a private soldier."

দস্তয়ভস্কির জীবনীকারেরা প্রায় সবাই সাইবেরিয়ায় কাটানো বছরগুলোকে নির্বাসনকাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ইতিহাস-সম্মত কিন্তু জীবন-অসঙ্গত উক্তি করেছেন। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন নয়, 'জীবনে'র সঙ্গে একাত্ম হয়ে বসবাসের দুর্লভতম সুযোগ পেয়েছিলেন দস্তয়ভস্কি। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' রাসকোলনিকভকে তিনি সম্ভবত জুয়ার আড্ডায় খুঁ[জে] পেয়েছিলেন। কিন্তু সোনিয়ার মারফত পৃথিবী[কে] শোনাবার মত যে বাণী তিনি তুলে দিয়েছেন রাসকো[ল]নিকভের কণ্ঠে তা তিনি তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আবিষ্ক[ার] করে থেকে থাকেন যদি কোথাও, তা নিঃসংশয়ে [ম]নুষ্যত্বের ব্যঙ্গচিত্রশালা সাইবেরিয়ার রুদ্ধদ্বার রাত্রি দুঃসহ অন্ধকারের দুর্জয় আলোকে।

সাইবেরিয়ায় পৌঁছতে না পারলে জীবন-পর্যট[ক] দস্তয়ভস্কির মানব-তীর্থভ্রমণ হত অসমাপ্ত।

দস্তয়ভস্কির সাহিত্য-সৌধের প্রথম বিজয়তোরণ- 'Crime and Punishment' জীবনের চলচ্চিত্র দস্তয়ভস্কির সাহিত্যসাধনা আকাশ এবং মৃত্তিকার মধ্যে মানুষের জন্য অবিনশ্বর এক সেতু-নির্মাণের মৃত্যুঞ্জয় সাধনা। মানবজীবনের মহৎ রূপকার দস্তয়ভস্কি জানতে[ন] মানুষের পায়ের তলায় যেমন কঠিন মাটি, তেমনই তা[র] মাথার ওপর নিঃসীম নীল আকাশ। দুয়েরই প্রয়োজ[ন] যার জীবনে সমান তারই নাম মানুষ—যার জীবনে তাঁর স্রষ্টা দুঃসাধ্য করেছেন কারণ 'মহৎ জীবনে তা[র] অধিকার'। 'Crime and Punishment' মানবজীবনে[র] এই সুগভীর ট্র্যাজেডি একই সঙ্গে আবরণ উন্মোচ[ন] করেছে যেমন সত্যের তেমনই সম্ভব করেছে সে স্বপ্ন—যে স্বপ্ন ছাড়া মানুষের জীবন থেকে অসম্ভব হ[ত] সাহিত্যের জন্ম—যেমন মানুষের পায়ের তলার কঠি[ন] মৃত্তিকা তার মাথার ওপর নিঃসীম নীলাকাশ না হ[লে] হত অর্থহীন। 'Crime and Punishment' মহ[ৎ] সাহিত্য—কারণ তা কেবলই কঠিন মৃত্তিকায় দাঁড়ি[য়ে] অশ্রুবর্ষণে মাটিকে কাদা করা নয়, 'Crime an[d] Punisment' মহৎ সাহিত্য—কারণ তা পায়ের তলা[র] কঠিন মৃত্তিকাকে অস্বীকার করে কেবলই আকাশকুসু[ম] রচনার ব্যর্থ বিলাস নয়। 'Crime and Punishmen[t]' মহৎ সাহিত্য—কারণ তা মানবজীবনের 'রূপহীন মরণে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজ'। মানবজীবন কী—এই প্রশ্নে[র] উত্তরে দস্তয়ভস্কি যা বলতে চেয়েছেন, তাঁর বইয়ে[র] বিশ্ববিখ্যাত নামেই তা মৃত্যুহীন দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল— 'Crime and Punishment'। এই বইয়ের ভাগ্য

য়ক একটি হত্যার পর আর একটি হত্যা করতে
বার পর স্বেচ্ছায় আর একদিন তার অপরাধ স্বীকার
াট বছরের জন্যে সাইবেরিয়ায় প্রায়-নির্বাসন দণ্ড
নেয় মাথায়। এই স্বীকৃতির জন্যে কেউ তাকে
করে নি। হত্যা করবার পর এবং স্বীকৃতির
র্তে পর্যন্ত হতভাগ্য রাসকোলনিকভের মনের মধ্যে
ধ করার এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে না পারার যে
দনা তারই নিপুণতম উদ্ঘাটন হচ্ছে দস্তয়ভস্কির
ie and Punishment'। সৃষ্টির প্রথমে প্রত্যুষে
ও একজন মানুষ এমন কোনও এক অপরাধ
ল আজও যার প্রায়শ্চিত্ত করতে না পারার
ত সমস্ত মানুষ প্রতি মুহূর্তে বিবেকের রুধিরস্রাবী
ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। যেদিন সকলে সমবেত হয়ে
লনিকভের মত স্বেচ্ছায় স্বীকার করবে তাদের
নের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, সেদিনই সম্ভব
সৃষ্টির আর এক প্রত্যুষে মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোক
। দস্তয়ভস্কির জীবনই হচ্ছে দস্তয়ভস্কির এই
।।

াসকোলনিকভের স্বেচ্ছায় হত্যাপরাধের স্বীকৃতির
ানা গেছে যে যার জন্যে সে হত্যা করতে বাধ্য
একটি নয় দুটি—সেই অর্থ সে হাত দিয়ে স্পর্শ
নি। অথচ রাসকোলনিকভের নির্দেশানুযায়ী সেই
র থলে যখন তুলে আনা হয়েছে পাথরের তলা
, তার মধ্যে পাওয়া গেছে :"...three hundred
seventy roubles in notes, and a few
er pieces ;..."। রাসকোলনিকভ বলতেই পারে
ত টাকা অথবা কি কি জিনিস সে লুকিয়ে রেখেছিল।

বিচার চলাকালীন আরও যে একটি প্রমাণ
র্তব্যবিমূঢ় করেছে আদালতের সকলকে তা হচ্ছে—
man commit two murders, and at the
e time to forget that the door is wide
ı !"

াসকোলনিকভের এই বিস্ময়কর আচরণের উত্তর
ত হলে আমাদের যাঁর অন্তরের অন্তস্তলে অনুপ্রবেশ
ত হবে তিনি ওই বিস্ময়কর চরিত্রের স্রষ্টা আরও
র্ণ চরিত্রের মানুষ ফিয়োদোর মিকেলোয়িচ
দস্তয়ভস্কি স্বয়ং। এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে
হবে দস্তয়ভস্কি সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর অভিজ্ঞতা : "...and
then I realized that he was no ordinary
gambler....He did not gamble to win, but
because he needed to lose..."। শুধু এইটুকু
মনে রাখলে চলবে না, এই প্রসঙ্গে আরও যা মনে রাখতে
হবে তাও এর আগে একবার বলা হয়েছে : "One
needs to commit a crime not for the sake
of the crime but for the sake of the punishment that follows."

রাসকোলনিকভের এই হত্যার উদ্দেশ্য সোনিয়ার
কাছেও স্পষ্ট হয় নি। রাসকোলনিকভই যে দুটি
হত্যাকাণ্ডের অবধারিত নায়ক সে কথা সোনিয়ার চোখে
ধরা পড়বার পর সোনিয়াকে সে এই হত্যার যে ব্যাখ্যা
দিয়েছে তা একমাত্র দস্তয়ভস্কির জীবন দিয়েই বোঝা
সম্ভব। রাসকোলনিকভের কণ্ঠে দস্তয়ভস্কি বলছেন :

"I am not jesting, Sonia ; I am not, indeed. I know that it was Satan who was tempting me....When I asked myself if a human creature was so much vermin, I comprehended that it was not so for me, but for some audacious individual who would not have questioned such an idea, and would have gone on his way without vexing himself about such a thing. Why, the very fact of asking myself : 'Would Napoleon have murdered this woman ?' was sufficient proof that I was no Napoleon. At last I gave up looking for subtle justifications. I wished to commit murder without casuistic argument—to do so only for myself, and nothing else !"

দস্তয়ভস্কি না হলে কারুর পক্ষে রাসকোলনিকভের
মুখে "Listen ! Upon going to the house of
the old woman, I only wished to make an
experiment—Don't forget that !—" এই
সংলাপ বসানো অসম্ভব হত। কারণ দস্তয়ভস্কি ছাড়া

আর কার পক্ষে এই জীবন্ত প্রত্যয় সম্ভব ?—'Man is saved only because the Devil exists. For only through the Devil does he earn a conscience.'

বিশ্বসংসারে বিশ্বাসের অযোগ্য আত্মোপলব্ধির কারণে, পর পর দুটি হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান-পরবর্তী পটভূমিকায় 'Crime and Punishment'-নাট্যের চরম দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলিত হয় দর্শকের চোখের সামনে [Crime and Punishment-এর এই অংশ পড়তে পড়তে আত্মবিস্মৃত হতে হয় পাঠককে। তার চোখের সামনে মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ মুহূর্তের মধ্যে অবারিত হয় ; হর্ষ, বিষাদ, অনুকম্পা, ক্রোধ, গভীর আনন্দ ও সুগভীর বেদনায় মুহুর্মুহু বিপরীত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় সে ; এই মহৎ মানবজীবন-নাট্যের পাঠক নয়, দর্শক নয়—তখন অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে সে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে]। রহস্যোপন্যাসে হত্যাকারী কে তা জানতে না পারা পর্যন্তই উত্তেজনা ; 'Crime and Punishment'-এ হত্যাকারী কে পাঠকের তা অজানা নয়, তবুও রাসকোলনিকভের স্বেচ্ছা-স্বীকৃতির মুহূর্ত পর্যন্ত পাঠককে এই উপন্যাস যেভাবে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় উন্মত্তের মত টেনে নিয়ে যায়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্যোপন্যাসও কদাচ তার কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। দস্তয়ভস্কি যে কত নিপুণ ঔপন্যাসিক ছিলেন 'Crime and Punishment'-এর এই কটি পাতাতেই তা চিরকালের অক্ষরে লেখা থাকবে।

কিন্তু 'Crime and Punishment' এক অবিস্মরণীয় শিল্পীর স্মরণীয় রচনা—সে কেবলমাত্র এ কারণে নয়। দস্তয়ভস্কি যে শুধু একজন নিপুণ ঔপন্যাসিক নন, নির্ভীক জীবনজিজ্ঞাসু—তার পরিচয় পেতে হলে আমাদের অবধারিত উপস্থিত হতে হয় রাসকোলনিকভের সশ্রম কারাজীবন আরম্ভ হবার এবং 'Crime and Punishment'-এর শেষ অধ্যায়ে। পৃষ্ঠাসংখ্যার দিক দিয়ে সামান্য কিন্তু এই অসামান্য পুস্তকের এই অংশটুকুর জন্যই দস্তয়ভস্কি—দস্তয়ভস্কি এবং 'Crime and Punishment'—'Crime and Punishment'।

উপন্যাসের সমাপ্তির চরম মুহূর্তে আমরা দেখছি সোনিয়াকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকার করে নেবার পর রাসকোলনিকভের কারাজীবনের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে উদিত হয়েছে জাগ্রত বিশ্বাসের জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর :

"Life—full, real, earnest life, was coming, and had driven away his cogitations. Under his pillow lay the New Testament. He took it up mechanically. The book belonged to Sonia ; it was that same from which she had read to him of the raising of Lazarus.…He did not open it now, but one thought burned within him : Her faith, her feelings, may not mine become like them ?…"

এবং শেষ কটি লাইনে দস্তয়ভস্কি আবার বলছেন :

"But now a new history commences : a story of the gradual renewing of a man, of his slow progressive regenaration, and change from one world to another—an introduction to the hither to unknown realities of life. This may well form the theme of a new tale ; the one we wished to offer the reader is ended."

দস্তয়ভস্কি বলেছেন new tale ; না। New tale নয়, New Testament। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'—দস্তয়ভস্কির সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে আমরা দেখেছি New Testament-এর থিম তাঁর কাছে কখনও পুরনো হয় নি।

কিন্তু 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'-পর্বে পা দেবার আগে দস্তয়ভস্কির বিশালায়তন সাহিত্য-অবয়বের অপর আজানুলম্বিত বাহু 'The Idiot'-এর সঙ্গে পরিচিত না হলে তার স্রষ্টার জীবনব্যাখ্যার মর্মগ্রহণ অসম্ভব হবে।

দস্তয়ভস্কি যখন 'দি ইডিয়ট' লিখছেন তখন নিজের দেশ থেকে তিনি অনেক দূরে। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত ফিয়োদোর মিকেলোয়িচ দস্তয়ভস্কি খেপা কুকুরের মত সেদিন রাশিয়া ত্যাগ করে আশ্রয় এবং অন্নের চিন্তায় দরজা থেকে দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে ফিরছেন। ১৮৬৭

প্রিল মাস। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সংঘটিত হয়েছে তাঁর স্টেনোগ্রাফার Anna Snitkin-এর সঙ্গে। পাওনাদার ছিনে জোঁকের মত তাঁর রক্ত শুষছে ; থাচ্ছে জেলে দেবে বলে। এই অবস্থায় দেশত্যাগী য় হলেন দস্তয়ভস্কি। ১৮৭১ সনের ৮ই জুলাইয়ের দেশে ফিরে আসা সম্ভব হয় নি দস্তয়ভস্কির। শরৎকালে 'The Idiot'-এর প্রথম খসড়া তৈরি স্তু ১৮৬৯-এর জানুয়ারি মাসের আগে সম্পূর্ণ

ই মার্চ ফ্লোরেন্স থেকে দস্তয়ভস্কি Strakhov-কে চিঠিতে লিখছেন : "I have my own idea lity in art ; and what most people will most fantastic and an exception some- constitutes for me the very essence lity."

: এই চিঠির শেষে তাঁর আর একটি মন্তব্য নযোগ্য : "It is not my novel but my hat I stand up for."...

ideaটি কি ? দস্তয়ভস্কির নিজের কথায় :

lready as a child he thought : I shall gher than everyone. A Christian and e same time he does not believe in dichotomy of a deep character."

বন-অন্বেষু দস্তয়ভস্কি তাঁর এই আশ্চর্য চরিত্র 'The -এর রূপ দিতে গিয়ে বারংবার বিড়ম্বিত কিংকর্তব্য- হয়েছেন। সেই সময়ে তিনি দেশ থেকে পলাতক সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত। তিনি বহুবার বহু লোককে জানিয়েছেন তাঁর সুবিপুল ব্যর্থ প্রচেষ্টার মর্মান্তিক ঃ। এমন কি বহু পরিবর্তন, বহুতর সংশোধন নের পরও উপন্যাসের ত্রুটি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী চ ছিলেন তিনি নিজেই এবং সেকথা স্বীকার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি তাঁর একাধিক পত্রের ও। তাঁর দাবি—কেবল 'দি ইডিয়ট' মারফত তিনি কাশ করতে চেয়েছিলেন সেই মহত্তম বক্তব্যের আজও দাঁড়িয়ে আছে সমান দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর প্রায় শতাব্দীকাল পার হবার পরেও।

মহৎ সাহিত্য মাথা তুলে দাঁড়ায় বৃহৎ বক্তব্যের শক্ত ভিতেরই ওপর কেবল ; না হলে তা দাঁড়ায় না। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' দস্তয়ভস্কির সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প অথবা একেবারেই নেই। কিন্তু দস্তয়ভস্কির মহত্তম বক্তব্য যে গ্রন্থে উচ্চারিত যে চরিত্রের মুখে, সেই মহৎ গ্রন্থের নাম—'দি ইডিয়ট'। 'দি ইডিয়ট'—বিশ্বাসের বাণীমূর্তি।

'Crime and Punishment'-এর অন্তিম পর্বে রাসকোলনিকভের অন্তহীন অপেক্ষা যার জন্যে—সোনিয়া যার আগমনের সুর শুনিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে তার, 'The Idiot' সেই প্রান্তিহীন অপেক্ষার অবিনশ্বর উত্তর। 'Crime and Punishment' এবং 'The Brothers Karamazov'—দুই-ই শেষ পর্যন্ত কথাসাহিত্য। 'The Idiot' সাহিত্যের কথা নয়—দস্তয়ভস্কির অগ্নিবীণা। এতে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন দস্তয়ভস্কি তা নামে যাই হোক, মূলে তা দস্তয়ভস্কির জীবনবেদ।

দস্তয়ভস্কিকে কেউ তুলনা করেছেন ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে। কেউ তাঁকে বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টির প্রতিভায় জ্ঞান করেছেন সেক্সপীয়রের সমকক্ষ বলে। কোনটিই সত্য নয়। 'The Idiot'-এ যারা জারকে হটিয়ে জনতাকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছে জারের পরিত্যক্ত সিংহাসনে হিংসার জয়তিলক লেপন করে, তাদের উদ্দেশে দস্তয়ভস্কি বলেছিলেন : "Stay, children. What we need in order to regenarate the world is not an act of violence but a great deed, a great revolution from within."

প্রতিবাদ করে উঠেছে মেহনতী মানুষের নামে নূতন তত্ত্বের প্রবক্তারা : "But how can you bring all men to the inspiration of that great deed, that revolution from within, as you call it ?"

দস্তয়ভস্কি স্বীকার করেন নি এই প্রতিবাদকে। গর্জে উঠেছেন তৎক্ষণাৎ : "Why do you need to summon all men ? Do you not realize how powerful one right man might be ? Let there appear one right man and all will follow him..."

'দি ইডিয়টই' সেই "right man"।

এই ইডিয়টের স্রষ্টা যে মহৎ বক্তব্য বলবার জন্তে এসেছিলেন তা হচ্ছে: "Children, let us not long for a future life of eternity. Children, if we do not reach eternity in this world we shall never attain it. Eternity is here and now. There are moments we must reach, moments of the highest existence when time stands still and all the life of all mankind is absorbed into your life. These are the moments of eternity...".

দস্তয়ভস্কির জীবনের ভাষ্যকার দস্তয়ভস্কির এই বক্তব্যের আলোয় উপসংহার করেছেন এই বলে: "Life is a constant reaching upward from the lower to the higher levels of consciousness—until the highest moment of the saint becomes the eternal faith of the sinner. 'And all creation spreads from darkness into light'."

দস্তয়ভস্কির প্রজ্জ্বলন্ত এই বিশ্বাসের অংশীদার পশ্চিমে আর একজনও নেই। যিনি ছিলেন তিনি পূর্ব প্রান্তের অপূর্ব জীবনদ্রষ্টা—রবীন্দ্রনাথ। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই মৃত্যুহীন বাণীর যিনি ছিলেন প্রাণ—সেই রবীন্দ্রনাথ।

দস্তয়ভস্কি 'The Idiot'-এ যার কথা বলতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ "শিশুতীর্থে" তারই জয়গান করেছেন—সেই চিরজীবিতের। দস্তয়ভস্কি বলতে চেয়েছিলেন—বলতে পারেন নি, কারণ গদ্যে তা বলা যায় না, মহত্তম গদ্যেও নয়। গদ্যের পদক্ষেপ যেখানে থেমে গেছে, কবিতার নিরুদ্দেশ যাত্রারম্ভ সেইখান থেকে। কবিতার যেখানে শেষ, গানের জন্ম সেইখানে। কবিতা এবং গান দুই-ই যাঁর রচনায় পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করে একাকার হয়ে মিশে গেছে তিনিই রবীন্দ্রনাথ। কবিতার গায়ক এবং গানের কবি রবীন্দ্রনাথের "শিশুতীর্থ" হচ্ছে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে মানুষের চলার বিরাম নেই! যার প্রতীক্ষায় মধুময় এই মর্ত্যলোক আকাশপ্রদীপে করেছে অমর্ত্যলোকের আরতি। সেই চিরজীবিতের জয় গেয়েছেন দস্তয়ভস্কি 'The Idiot'-এ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিশুতীর্থে":

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়িতে নাড়িতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে,—
"জয় হ'ক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"
সকলে জানু পেতে বসল রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, জয় হ'ক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

দস্তয়ভস্কি যাকে অভিহিত করেছেন নির্বোধ এই ছদ্মনামে, রবীন্দ্রনাথ তারই নাম দিয়েছেন—নবজাতক।

[ক্রমশঃ]

বিদ্রোহ

পবিত্রকুমার ঘোষ

'দ্রোহ মানবত্বের অভিজ্ঞান; বিদ্রোহ মানবভাগ্যের চরম অভিশাপ। যে প্রাকৃতিক জগতে আদিমতম -মানবীর জন্ম, সেই জগৎকে পুরোপুরি মেনে নিতে নি তারা; সেই বোবা কিন্তু বাণীস্পন্দিত, নির্মম ঐশ্বর্যভূষিতা, রুক্ষকুটিল কিন্তু লাস্যময়ী ধরিত্রী র কাছে প্রতীত হয়েছিল একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। চারদিক থেকে প্রাকৃতিক জগৎ তাদের আচ্ছন্ন করে ছে—দুরন্ত প্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র তখন পৃথিবী—আর । ক্রমাগত ভয় দেখাচ্ছে। অসহায় নবাগত মানব-ীর কাছে একটি পথ তখন খোলা ছিল—সেই প্রচলিত স্থিতিকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে র পথ, জড় ও জান্তব প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে ন্ন হয়ে যাবার পথ। সেই পথ বেছে নিলে তার পক্ষে আরও সহজ হত, সমস্যা সব যেত কমে। কিন্তু সে স বেছে নিতে রাজী হয় নি। কেন না, তা হলে যে ন অর্থহীন হয়ে যেত, পৃথিবীর নাটমঞ্চে জীবন-শের নিগূঢ় লীলায় মানুষের আবির্ভাব হত না কোন ।তির স্মারক, প্রগতি মিথ্যা হয়ে যেত। যে বিধাতার দনির্দেশে মানুষের জন্ম, তার জন্মলগ্নেই সেই বিধাতা হৃদয়ের মধ্যে পুঁতে দিয়েছে এমন এক তাড়কমন্ত্র যার যে পরিস্থিতি ও যে শর্তের মধ্যে তার জন্ম সেই স্থিতি আর সেই শর্ত সে কিছুতেই মানতে পারবে না পুরি। তাকে সে অমান্য করবে, তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবে, প্রতিবাদ করবে এবং অবশেষে বিদ্রোহ া করবে। এই বিদ্রোহের ফলে সেই পরিস্থিতি, সাজানো সব শর্ত এবং শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে, কিন্তু ু আবার ভাঙবেও না। যা ভাঙবে না—সেই উপাদান ই তাকে আবার সৃষ্টি করতে হবে নতুন পরিস্থিতি, করতে হবে নতুন সব শর্ত, সাজাতে হবে নতুন ার প্যাটার্ন। এই হবে তার নিত্যকর্ম চিরন্তন কাল এই ভাবেই একদিন প্রকৃতি ও প্রাণজগতের মাঝখানে সে গড়েছিল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব এক মানবজগৎ, মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জগৎ। আর তার পর থেকে ক্রমাগত সে প্রকৃতি ও প্রাণজগৎকে কেবলই নতুন করে অধ্যয়ন করছে, তাদের মধ্যে নতুন সব সত্য এবং সৌন্দর্য আবিষ্কার করছে ও নতুন শাসনে বাঁধছে তাদের; এবং আর একদিকে স্বরচিত মানবজগৎকে কেবলই সে ভাঙছে গড়ছে বদলাচ্ছে, নতুন নতুন শৃঙ্খলার প্যাটার্ন দিয়ে সাজাচ্ছে। আর এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মূলে আছে তার সেই আদিম বিদ্রোহপ্রবৃত্তি। কিন্তু বিদ্রোহ নয় শুধু ওইটুকুতেই, ওই বহিরঙ্গ জীবনেই সীমাবদ্ধ। তার বিদ্রোহ যে তার নিজেরই বিরুদ্ধে। তার জীবনের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা তার বাইরে নয়, তার ভিতরে—তার নিজেরই সত্তার গোপন অন্তর্দেশে। বাইরের জগৎকে বরং সে বোঝে, তার নিয়মশৃঙ্খলার পারিপাট্যকে সে অধিগত করে, কিন্তু তার সত্তার মাঝে নিহিত সব রহস্য তার অজানা। যে দুরধিগম্য অন্ধকারে ঢাকা তার সত্তা, সেখানে তার দৃষ্টি প্রবেশ-অক্ষম; তার কোন দখল সে রাজ্যে খাটে না—অথচ সেইখানেই তার জীবনের মর্মমূল প্রোথিত, সেইখানেই জন্ম নেয় যত তার অমৃত অভীপ্সা, যত তার পাপ। জীবন সেখানেই মিশে যায় মৃত্যুতে এবং মৃত্যু ফুটে ওঠে জীবনের ফুল হয়ে, মানুষের আপনারই সত্তার সেই গোপন আড়ালে ঝরে ঝরে পড়ছে ভ্রূকুটিকুটিল নিয়তির নির্লাজ হাসি। সেখানেই প্রথম বাজে তার বিজয়ের উৎসব, পরাজয়ের বিষণ্ন সঙ্গীত—অথচ সেখানে তার দৃষ্টি পৌছয় না পর্যন্ত। তাই নিজেরই সঙ্গে নিজেরই দ্বন্দ্ব তার অহর্নিশি, সতত আত্মবিরোধিতাই যেন তার জীবনের স্বরূপ। সে চলে, কিন্তু চলার প্রেরণা কোথা থেকে আসে সে জানে না, তার সমস্ত কীর্তি ও উত্থান-পতনের মর্মরহস্য নয় তার অধিগত। এই দুঃসহ পরিস্থিতি তাকে নিয়ত সংক্ষুব্ধ করে তোলে। এই সমস্যার একটা সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত তার কোন রকম সোয়াস্তি সম্ভব

নয়—অথচ যতই সে খোঁজে, সমাধানও ততই পালিয়ে যায় দুয়ার হতে অদূরে। তাই মানুষকে তার নিজেরই সত্তার বিরুদ্ধে মাততে হয়েছে বিদ্রোহে—নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে পেতে চায় সে নিজের স্বীকৃতি, তার আত্মহনন থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ আত্মাকেই বার বার বিদ্ধ করতে পারায়।

কিন্তু দু দিকের এই দুই বিদ্রোহের অভিঘাতে যে মানুষ চঞ্চল সে আবার নর-মানুষ। মানুষ নিয়ে আমরা অনেক রঞ্জিত কথা বলে থাকি, কিন্তু বাস্তব সংসারে সে মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। বাস্তব মানুষ ছোট একটু দেহে সীমিত, তার ক্ষুদ্র প্রাণ একদিন ঝিমিয়ে আসে, তার মন শুধু সংকীর্ণ ই নয়—তামসিকও। সে বিদ্রোহী ঠিকই, কিন্তু বিদ্রোহী না হতে হলেই যেন তার ভাল হত। তাই বার বার এই ব্যথিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি সংসারে ঘটে চলে। আজ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কাল সে তার নিজের বিদ্রোহকেই অপমানিত করে, আজ যে প্রগতির জয় ঘোষণা করে, কাল সে লোভে পাপে চরম প্রতিক্রিয়াশীলতায় নেয় আশ্রয়। এই অসম্ভব অসহনীয় সংশোধনাতীত আত্মবিরোধমগ্ন পরিস্থিতির দরুনই প্রথম যে বাক্য দিয়ে এই প্রবন্ধ করেছি শুরু তার উদ্ভব। বিদ্রোহ না থাকলে মানুষের বিজয়যাত্রা হত অসম্ভব; বিদ্রোহ আছে বলেই মানুষের ক্রমাগত বিজয় অবাস্তব, অলীক। বিদ্রোহ আছে বলে তার অগ্রগতির বাধা সব হয় চূর্ণ; বিদ্রোহেরই পাষাণচাপে তাকে কেবলই পিছিয়ে আসতে হয়, প্রতিক্রিয়ার মূল্যে কেনা শান্তি ও নিরাপত্তার বিবরাশ্রয়ে ঢুকে তাকে মৌজ করে বসতে হয় অসাড় হয়ে। এই আমার প্রবন্ধের মূল সমস্যা।

১

আমি জানি, গল্প ও উদ্ধৃতিবহুলতা প্রবন্ধে অনেকেরই অপছন্দ, কিন্তু আপাততঃ গল্প ও উদ্ধৃতি দিয়েই না হয় শুরু করা যাক? সে গল্পও আমার তৈরি নয়, অন্যের; এবং নতুনও নয়, পুরনো। বোরিস পাস্তারনাকের ডক্টর ঝিভাগোর কথা বলছি। আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় মানবিক বিদ্রোহের স্বরূপ সম্প্রতিকালে তাঁর মত নিপুণ ভাবে আঁকেন নি কেউ। একটি সমগ্র জাতি একসঙ্গে যখন প্রচলিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেই বিদ্রোহের শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছতে রাজী থাকে, তখন যে আশ্চর্য অবস্থার উদ্ভব হয় তার বিশদ ও অর্থময় চিত্র তিনি এঁকেছেন। তাই তাঁর আঁকা সেই চিত্র এবং তাঁর উপলব্ধি সব আমাদের কাজে আসবে মনে হয়।

বহুদিন পর লারার সঙ্গে দেখা হয়েছে ডক্টর ঝিভাগোর—লারার বাড়িতে। বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বাস করে এবং নিজেদের জীবন বিপ্লবের রথচক্রে পিষ্ট হবার পর দুজনের দেখা হলে বিপ্লবের কথা আসবেই। ঝিভাগো বলছেন: আজ স্পষ্টই মনে হয় বিপ্লবের উদ্গাতারা পরিবর্তন এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুতেই সোয়াস্তি পায় না, তাদের সত্তার মধ্যে আছে ওই জিনিস। তারা মনে করে ক্রান্তিকাল, নতুন দুনিয়া এ সব যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস—এর অতিরিক্ত আর কিছু চাওয়ার নেই। আর কোন কিছুতে তাদের স্পৃহা নেই, যোগ্যতা নেই—এ সব ছাড়া আর কিছু যেন তারা জানেই না। আর তুমি কি জান, কেন তাদের এই অবিরত সমাপ্তিহীন প্রস্তুতির ঘূর্ণাবর্ত? তার কারণ তারা বঞ্চিত প্রতিভা থেকে, সৃজনীশক্তি তাদের কিছুই নেই। মানুষ বাঁচবার জন্য জন্মেছে, জীবনের প্রস্তুতির জন্য নয়। জীবন নিজেই—এই যে জীবন আমরা পেয়েছি—এরই মূল্য কত অসীম। তার বদলে কিনা এই সব বুড়ো খোকাদের মন ভোলাবার রূপকথা, এই সব ছেলেমানুষী, কেন? (পৃঃ ২৬৭)

এবারও উদ্ধৃত করছি ডক্টর ঝিভাগোর উক্তিই। কিন্তু এই কথাগুলি ঘরে বসে প্রেমিকার সামনে বলা হয় নি। ঝিভাগোকে পথ থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে—সেখানে একজন ডাক্তারের দরকার বলে। সীমান্তের এক সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে বাস করছেন ঝিভাগো। সেই সৈন্য-বাহিনীর তরুণ উগ্র ও উদ্ধত নায়কের সঙ্গে কথাবার্তা হতে হতে ঝিভাগো বলছেন: প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সমাজের মঙ্গল করা সম্পর্কে যত কথা বলা হয়েছে তাতে আমি কোন উৎসাহ খুঁজে পাই নি। দ্বিতীয়তঃ, সে সব কথা এখনও বাস্তবে প্রয়োগ করার অনেক দেরি, অথচ সেই কথাগুলি মাত্র আওড়াতে গিয়েই এই রক্তের বন্যা বয়ে গেল। তাই আজ আমার সন্দেহ হয় ভাল ফলের

কোনও পথ ও কৌশল অবলম্বন করা উচিত
এবং শেষতঃ, আর সবচেয়ে জরুরী কথা এই যে,
মি শুনি লোকে জীবনকে নতুন করে গড়ার কথা
ন আমি খেপে যাই, মরিয়া হয়ে উঠি।
নকে নতুন করে গড়া! যে সব লোক ওই কথা
রা জীবন সম্পর্কে জানে না কিছুই। তারা হয়তো
কিছু দেখেছে, করেছেও অনেক—কিন্তু জীবনের
নেয় নি তারা বুক ভরে, শোনে নি তার মর্ম-
তারা জীবনকে দেখে যেন একতাল কাঁচা মাল—
পরিশ্রুত করে, নিজেদের চেষ্টার দ্বারা মহীয়ান
যন তাদের কাজ। কিন্তু জীবন তো একটা তেমন
ার্থ নয়—তাকে একটা ছাঁচে ফেলাও যায় না। যদি
হয় তবে বলব, জীবন এমন একটা প্রবাহ, যা
কেবলই নতুন করে তুলছে, নিজেকে সৃষ্টি করছে,
চত করছে, কেবলই রূপান্তরিত করে চলেছে।
সম্পর্কে তোমার আমার মনগড়া যত তত্ত্ব আর
ার চেয়ে জীবন অনেক অনেক বড়। (পৃ: ৩০৫-৬)
ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছেন ঝিভাগো লারার
লারার সেবায়-যত্নে মৃত্যুর দুয়ার থেকে জীবন
ঝিভাগো সুস্থ হয়ে উঠছেন। লারা তার জীবনের
ক ট্রাজেডির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলছে বিপ্লবের
। সম্পর্কে: সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সুনিশ্চিত ব্যবস্থা ভেঙে
, পারিবারিক জীবন, শৃঙ্খলা, দৈনন্দিন কর্মধারা,
ভঙে ধুলোয় গেছে মিশে, এই বিরাট ভাঙাগড়া
মাজের পুনর্গঠনের এই চেষ্টায় সবই চূর্ণ হল।
। সমগ্র জীবন-পদ্ধতি আজ বিধ্বস্ত এবং বিনষ্ট
। আর যা রয়েছে অবশিষ্ট সে হচ্ছে এক নগ্ন
আত্মা, তার শেষ বসনটুকু পর্যন্ত খুলে পড়ে
—আছে শুধু মানুষের অন্তরাত্মার নগ্ন শক্তিটুকু…
ার আমি যেন পৃথিবীর সেই আদিমতম পুরুষ
ারী, সভ্যতার সূচনারও আগে তারা ছিল, তাদের
কবার মত ছিল না কোনও কাপড়। আজ সভ্যতার
য নগ্নেও আমরা ঠিক তেমনই নির্বাস, গৃহহীন।
াই আদিকাল আর আজকের মাঝে যে হাজার
বছর চলে গেল, তখন যে অপরিসীম মহিমা আর
সৃষ্টি করেছিল মানুষ, তার স্মৃতিটুকুমাত্র নিয়ে
বেঁচে আছি আমরা দুজন, আর বিগত বিলুপ্ত সেই
গৌরবচ্যুতির স্মৃতিতেই আমরা বাঁচব, ভালবাসব, কাঁদব
এবং দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরব। (পৃ. ৩৬২)

সর্বশেষ উদ্ধৃতি করব ঝিভাগোর আর একটি কথা। তখনও ঝিভাগো বাস করছেন ভেরিকিনোয়। সেখানে এবার তাঁর দ্বিতীয়বারের বাস, তাও এখন শেষের দিনগুলো এসে পৌঁছেছে। লারা কোমারোভস্কির করাল লোভের গহ্বরে শেষবারের মত ঢুকে পড়েছে, ঝিভাগোকে ছেড়ে সে চলে গিয়েছে। পাশা এসে তখনও পৌঁছয় নি ভেরিকিনোয়। সেই সুবিশাল নির্জনতায় নিঃসঙ্গ ঝিভাগোর স্বগতোক্তি থেকে তুলে দিচ্ছি এই কথা: বিপ্লব করে কিছু গোঁড়া কর্মী মানুষ, তাদের মন একরোখা, সঙ্কীর্ণ…কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পুরনো সব ব্যবস্থাকে ফেলে ভেঙেচুরে; বিপুল এই ভাঙাগড়ার খেলা হয়তো চলে কয়েক সপ্তাহ বা খুব বেশী হলে কয়েক মাস; কিন্তু তারপর দশকের পর দশক এমন কি কয়েক শতাব্দী ধরে যে সঙ্কীর্ণতার প্রবণতার ফলে এসেছিল বিপ্লব, সেই প্রবণতাকে, সেই সঙ্কীর্ণতাকে পবিত্র আদর্শ বলে পূজা করা হয়। (পৃ. ৪০৬)

বিপ্লব যে মানুষের জীবনে কী বিভীষিকা, কী মর্মান্তিক অপঘাত আনতে পারে তা পাস্তারনাকের এই বইয়ের ডক্টর ঝিভাগো-চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও চরমতম সর্বনাশ এসেছে লারার জীবনে। এবং কারই বা নয়? পাশা, টোনিয়া, বৃদ্ধ শিশু, শহরের নাগরিক, গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের মর্মযন্ত্রণা এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে ভরে দিয়েছে কান্নায়। সমস্ত সমাজের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত দেখিয়েছেন পাস্তারনাক এবং দেখিয়েছেন বিপ্লব মানুষকে এনে দিতে পারে শুধু একটিই জিনিস—সে তার চরম সর্বনাশ। বিপ্লবের এই মূল্যায়ন যখন বিপ্লবের সন্তান পাস্তারনাকের কাছ থেকে পাই, তখন একে এড়িয়ে যেতে পারি না।

বিদ্রোহ ও বিপ্লব মানুষের সমাজে চিরকাল ছিল, কিন্তু এ যুগের মত এমন ছিল না। আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে মানুষের এক পরম মহিমাদীপ্ত বিদ্রোহ দিয়ে—রেনেসাঁসে। রেনেসাঁসের মানুষ বিদ্রোহী মানুষ। রামমোহন বিদ্যাসাগর শান্তশিষ্ট মেনে-নেওয়া মানিয়ে-

নেওয়া জীবন যাপন করে যান নি, অযুত সংগ্রামে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছেন এবং বিদ্রোহের সাধনায় যুগকে দিয়েছেন মুক্তি। তারপর থেকে ও-দেশের রেনেসাঁস-পরবর্তী সমাজে যেমন, আমাদের এই নিতান্ত শ্লথ সমাজেও তেমনি সংগ্রাম বিদ্রোহ বিপ্লব যেন আর ফুরোল না। ফেরারী ফৌজদের প্রতি এখনও নিয়ত আহ্বান উচ্চারিত হচ্ছে প্রতি ঘর থেকে, প্রতি মন থেকে। সেই সব বিদ্রোহী ফেরারী-ফৌজরা প্রকৃতই সূর্যসেনা কিনা সে খবর কেউ রেখেছেন কি? তারা কি নয় শুধুই ফেরারী?

বিদ্রোহীর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণাম মৃত্যু; এবং বিদ্রোহীরও মৃত্যুভয় আছে। ওই ভয়টি মানুষমাত্রেরই সহজাত। যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জনৈক মানুষের সত্তাকে দেয় জ্বালিয়ে, যে সুউচ্চ আদর্শ তাকে দেয় দুরন্ত উল্লাসে ঝঞ্ঝার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা এবং দুইয়ে মিলে তাকে করে তোলে বিদ্রোহী—প্রাথমিক সাফল্যই সেই বিক্ষোভকে শান্ত ও আদর্শকে নিরীহ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আর তারপর পূর্বতন বিদ্রোহীর সামনে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে একটি হিসাব—বিপদে ঝাঁপ দিয়ে কী সে হারিয়েছে, কী সে পেতে পারে তার হিসাব। এই হিসাব যখনই তার মাথায় এল তখন তাকে ভাবতেই হবে, কী করে সেই তার হারিয়ে-যাওয়া স্বাভাবিক সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে যেতে পারে সে ফিরে। ঘটনার তরঙ্গক্ষুব্ধ উত্তালতা থেকে দূরে গিয়ে কী করে পেতে পারে সে শান্তির ছোট নীড় একটু। না, তাও নয়। এতদিন ধরে যা কিছু সে হারিয়েছে মানুষেরই ভাল করতে গিয়ে, যা কিছু সাধারণ মানুষ যারা এতদিন শুধু খেয়েছে, আরামে ঘুমিয়েছে, হাসি-তামাশা করেছে তারা পেয়েছে কিন্তু সে পায় নি, এখন জীবনের বাকি কটা দিনের স্বল্প সীমার মধ্যেই সে সমস্তই পূরণ করে নিতে হবে তাকে। সাধারণ মানুষ যদি খেয়ে থাকে তাকে এবার দ্বিগুণ করে খেতে হবে, সাধারণ মানুষ যদি ভোগ করে থাকে তাকে এবার দ্বিগুণ করে ভোগ করতে হবে। আর সে ক্ষমতাও তো এসে গেছে তার হাতের মুঠোয়, তার প্রাথমিক সাফল্যের জোরে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম, আর তার সঙ্গে ক্ষমতা ও সুযোগ আছে পূর্ণমাত্রায়, সেখানে বন্ধ্যা ভোগের অতল গহ্বরে বিদ্রোহীর দ্রুত পতন রোখবার সাধ্য কারও নেই।

যে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে একদিন সে ফিরে এসেছে, ঈশ্বরের করুণায় আজ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সেই মানুষই মৃত্যুর চেয়েও গাঢ় তমিস্রাময় বন্ধ্যাত্বে নিজেকে নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত নয়। একদা তার জীবনের মূল প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা ছিল এই: প্রচলিত পরিস্থিতি ধারণা কল্পনা ও আদর্শ সে মানবে না—কেন না, তার মাঝে সত্য নেই। বর্তমান বাস্তবকে সে চতুর্দিক থেকে আঘাত করবে তাকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এবং তারপর সেই ধ্বংসের মধ্যে সে গড়ে তুলবে নতুন পরিস্থিতি, নতুন ধারণা কল্পনা আদর্শ। কোন্ অধিকারে সে করবে এসব? শুধু এই অধিকারে যে বর্তমান বাস্তবকে যুগে যুগে নতুন করে প্রশ্ন করতে চ্যালেঞ্জ করতে হয়—নতুবা প্রগতি অসম্ভব হয়। এই প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাই যে-কোনও বিদ্রোহীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু তার প্রাথমিক সাফল্যের পর এই ধারণা তাকে পেয়ে বসে যে, এইবার যে নতুন বাস্তব গড়ে উঠেছে এর মধ্যেই আছে চরম সত্য—একে কোনমতেই করা চলবে না কোনও প্রশ্ন, এর সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া যাবে না এবং একে চ্যালেঞ্জ করা হবে গর্হিত অপরাধ। এই নির্দেশ যারা মানবে না তারা সবাই বিশ্বাসঘাতক, মতলববাজ, প্রতিক্রিয়াশক্তির দালাল। একদা যে নিজেই বিদ্রোহ করেছে, আজ নিজের কর্তৃত্ব (তা যত ছোট বা বড় আকারেই হোক) প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে-কোনও বিদ্রোহ প্রচেষ্টাকেই সে চরম অসম্মানে লাঞ্ছিত করতে উদগ্রীব ও উদ্যত।

শুধু ব্যক্তির বেলাই এ কথা সত্য নয়, একটি সমগ্র জাতি ও সমাজের পক্ষেও এই একই জিনিস সম্ভব ও স্বাভাবিক। একদা বিদ্রোহী ইহুদী জাতির বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এলে পর যে বন্ধ্যাত্ব তাকে পেয়ে বসল, আজ পর্যন্ত তা তার ঘোচে নি। এই বন্ধ্যাত্ব আমাদের নিজেদের দেশেই আমরা চূড়ান্তভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। পাশাপাশি দুটি জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানে বাস করল কিন্তু তারা একত্র থাকতে পারল না। এই যে নিজেরই মধ্যে চরম সত্য আছে বলে মনে করা ও নিজের চরম শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া—প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক
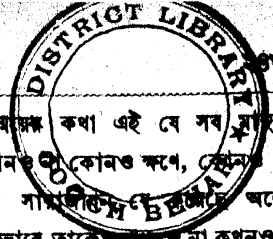
মধ্যেই আছে এ প্রবণতা। কোনও কিছুকে না পারা ও সবকিছুর সম্পর্কেই নিরন্তর প্রশ্ন যে বিদ্রোহী মনোবৃত্তি, তারই পাশাপাশি এই বিরোধী রক্ষণশীল মনোবৃত্তি রয়েছে একই মানুষের াশাপাশি ঘুমিয়ে। একটা যখন জেগে ওঠে, তখন াগে আর একটাও জেগে ওঠে এবং দুই মনোবৃত্তির ংঘাত বাধে। বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নতা ও বন্ধ্যাত্বের পুনর্জাগরণ ও বিজয়। বিদ্রোহ মাগ্রগতি, নিরন্তর প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। মানুষের চোখে নিয়ে আসে কেবলই এগিয়ে স্বপ্ন, এবং সেই স্বপ্ন চূর্ণ করে দিতেও তার ক্ষমতার নেই। মানুষের জীবনে ও সমাজে বিদ্রোহ তাই বিভ্রান্তি, আনে জয়ের আশা কিন্তু পরাজয়ের তা, সত্যের ব্যাকুলতা কিন্তু মিথ্যার রাজত্ব।

জীবনে ও সমাজে নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও। র চর্চা পর্যন্ত ক্রমাগ্রগতির সাক্ষ্য দেয় না। পরই সেখানে আসে পিছুটান, একটু এগিয়েই যেন ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা থেকে রক্ষা নেই। আর্থার র লিখেছেন: The progress of science is ally regarded as a kind of clean, al advance along a straight ascending in fact it has followed a zig-zag course, es almost more bewildering than the ion of political thought. (Arthur ler: The Sleepwalkers 1959, p. 15)

২

ী দূরে যেতে হবে না, বিশ শতকের যাবতীয় বিদ্রোহগুলি ও তাদের পরিণতি যদি লক্ষ্য করা বে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, দের হাতে যেমন বুদ্ধদেব, কমিউনিস্টদের হাতে কমিউনিজম এবং কলাব্যবসায়ীদের হাতে যেমন া লাঞ্ছিত হয়েছে, একদা বিদ্রোহীরাই তেমনি কে করেছে ধিকৃত লাঞ্ছিত। তার কারণ, আগেই বিদ্রোহের পাষাণ-চাপ বহন করার ক্ষমতা মানুষের ং বিদ্রোহীরাও মানুষ।

অথচ সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে সব মানুষই বিদ্রোহী—জীবনের কোনও না কোনও ক্ষণে, কোনও না কোনও পরিস্থিতিতে। সা[illegible] যে [illegible] অন্যের দাসত্ব মেষের মত নিরীহভাবে, তাকেও কখনও না কখনও—অন্ততঃ একবারের জন্যও বলতে হয়, না। অনেক হয়েছে, করেছি অনেক ঘৃণিত কাজ, কিন্তু আর না। ‘অন্ততঃ একবারের জন্যও’—কেন না, এই ‘না’ বলার পরিণাম মৃত্যুও হতে পারে এবং সেই দাস সে কথা জানেও। জানা সত্ত্বেও ‘না’ তাকে বলতেই হয়। কেন না, জগতের প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তার নিজস্ব মূল্যবোধে বিশ্বাস অটুট রাখতে চায়—রাখতে তাকে হয়। কয়েকটি মূল্যের প্রতি অনবরতই তাকে বলতে হচ্ছে: হ্যাঁ। এই বিশ্বস্ততা না থাকলে তার নিজের কাছেই তার বেঁচে থাকা অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় মনে হয় এবং তার নিজের সত্তার কাছেই কোনও কৈফিয়ত দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব যখন কেউ সেই মূল্যগুলির উপর কুৎসিতভাবে আঘাত করে তখন সে প্রভু বা ঈশ্বর যেই হোক, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না-করে উপায় থাকে না। দৃষ্টান্ত দিতে পারলে খুশী হতাম আমি, কিন্তু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে যাওয়া এখানে বিপজ্জনক হবে।

একজন মানুষ যে আর একজন মানুষের কাছে বোধগম্য হয় তার কারণ তাদের মধ্যে কোথাও একটি মিল থাকে, একটি পরম অর্থ তাদের দুজনকেই সমভাবে মহিমাদীপ্ত করে রাখে। সেই মিল মূল্যের মিল, সেই অর্থমূল্যে বিশ্বাস। এই মূল্যে বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে মনুষ্যত্ববোধ। এই মনুষ্যত্ববোধ আছে বলেই মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে, অন্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে বিশ্বজনের সঙ্গে নিজের মিল ও সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। এই মনুষ্যত্ববোধে যখন লাঞ্ছনাময় আঘাত আসে তখন সে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই সে সমগ্র বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করতে পারে, কেন না সে তখন মনুষ্যত্বের সপক্ষে, বিশ্বমানবের সপক্ষে বিপদ বরণ করেও সংগ্রাম করতে উদ্যত হয়েছে। বিদ্রোহের ভিত্তির ওপরেই তাই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়েছে সম্ভব—মানুষের ইতিহাসে মানুষের জীবনে বিদ্রোহের তাই এত প্রয়োজন।

বিদ্রোহ যে পছন্দ করে না, সমস্ত বিদ্রোহপ্রচেষ্টা থেকে যে থাকতে চায় দূরে, সে কী চায় তা হলে? সে চায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন ছোট ছোট সুখদুঃখের ঢেউ দিয়ে গড়া শান্তস্নিগ্ধ ধীরপ্রবাহিত জীবনধারা। সে জানে জীবনে উত্থান-পতন আছে, কিন্তু উত্থান-পতন বিশাল রূপ নেয় তখন যখন অস্বাভাবিকতার দিকে মানুষ ঝোঁকে—সাধারণ প্রচলিত বিধিসম্মত ও সংস্কার-অনুমোদিত জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মানুষ যখন অস্বাভাবিক মহত্ত্ব বা অস্বাভাবিক নীচুতা চায় তখনই। অতএব সে রকম কামনাকে যদি সপ্রযত্নে বাদ দেওয়া যায় এবং সব সময় স্বাভাবিক হয়ে উঠবার ও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করা যায় তা হলে নিজেকে বাঁচানো যায় সর্বনাশ থেকে, সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব হয়।

নিয়তির নিষ্ঠুর বিদ্রূপে স্বাভাবিকতাকামী ও শান্তিপ্রিয় মানুষের এই পরিকল্পনাও কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হয় না। সারাজীবন যে মানুষ আর কিছু নয় শুধু স্বাভাবিক হতে চেয়েছে, যে-কোনও মূল্য দিয়ে যে কিনতে চেয়েছে শুধু শান্তস্নিগ্ধ ও মৃদু জীবনযাপনের অবকাশ, একদিন সে দেখে কোনও চরম মুহূর্তে তার সব প্রচেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ, সব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত। দেখে, সে এসে দাঁড়িয়েছে এমন এক অতল গহ্বরের সীমানায় যেখানে তাকে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হতেই হবে—অথচ যে গহ্বরকে এড়িয়ে যেতেই সে চেয়েছিল প্রাণপণ।

আবার আমি গল্প ও উক্তির সাহায্য নেব। আলবার্তো মোরাভিয়ার উপন্যাস Conformist-এর নামেই প্রকাশ যে এ বইয়ের নায়ক জীবনে চেয়েছে শুধু প্রচলিত বিধিব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিতে। বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে সে অপছন্দ করত, অবিশ্বাস করত, কোনদিন সে তাই তার বিদ্রোহকামনাকে প্রশ্রয় দেয় নি। সমাজের সমস্ত ধারণা, আচার আচরণ, সমাজসমর্থিত উচ্চাশা, প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি—এ সবের সঙ্গেই নিজেকে নিয়েছে সে মানিয়ে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য ছিল স্বাভাবিক থাকা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে সমস্ত গুছিয়েছে, প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদ জোগাড় করেছে। এবং করতে গিয়ে সে দেখেছে প্রতিপদেই তাকে অস্বাভাবিক হতে হয়েছে, মিথ্যাচার ও খুনের মধ্যেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে তাকে। যখন সে মনে করেছে এইবার স্বাভাবিক জীবন সে ফিরে পেল, তখনই আবিষ্কার করেছে চরম অসহ্য ও গ্লানিময় অস্বাভাবিকতা ঘিরে ধরেছে তাকে এবং অজানা অতল খাদের মধ্যে সে ছিটকে পড়েছে। অবশেষে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এই মানুষটি—মার্সেলো যার নাম, সে অনুভব করছে: বিধাতার দণ্ড নেমে এসেছে তার পরিবারের ওপর, যদিও তার পরিবার আর দশটি পরিবারের মতই একই স্নেহ-মমতা, একই নিবিড়তা, একই রকম স্বাভাবিকতায় ভরা। এই স্বাভাবিকতাই সে এত যুগ ধরে চেয়ে এসেছে আগ্রহ আর নিষ্ঠার সঙ্গে। অথচ আজ এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই স্বাভাবিকতা একটি সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ জিনিস, আর এর গভীরে রয়েছে পরিপূর্ণ অস্বাভাবিকতার রাজত্ব। (পৃ. ২৮৭, সিগনেট বুক সংস্করণ)

অত্যন্ত করুণভাবে মার্সেলোর জীবনের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল, এবং অস্বাভাবিক অপঘাতের মধ্য দিয়ে মৃত্যু তাকে গ্রাস করে ফেলল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবন ও পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা প্রতিপদে আমাদের স্বাভাবিকতা-কামনাকে ডুবিয়ে দেয়, আমাদের ঘরের কোণের আড়ালকে চূর্ণ করে দেয় এবং বিপদ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা পর্যুদস্ত করে দেয়। সুতরাং পথ কি?

৩

মানুষের জীবনের দুটি দ্বন্দ্বের কথা আমি বলেছি। চিরন্তন কাল ধরেই এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে। তবে সম্ভবতঃ আধুনিক কালে এই দ্বন্দ্ব প্রকটতর হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ তাকে করতেই হবে, না হলে তার মনুষ্যত্ব বানচাল হয়ে যায়, প্রগতি অসম্ভব হয়। অথচ বিদ্রোহ যে সংঘাত সৃষ্টি করে, তা সহ্য করার ক্ষমতাও তার নেই এবং তাই আজকের বিদ্রোহী আগামীকাল মনুষ্যত্বকে, বিদ্রোহের মহিমাকে লাঞ্ছিত করে ও প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই কারণে কেউ যদি প্রথম থেকেই বিদ্রোহের পথ বাদ

সংগ্রাম

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ধরার সময় এসেছে, রঙীন স্বপ্ন নয়,
কাশে ঘন হয়ে আসে যুদ্ধের কালো মেঘ,
কে জানে ভেসে আসবে সে পোড়া বারুদের ঘ্রাণ
কি কেউ ভাবের রাজ্যে মিল করে সন্ধান ?

কলমের কাজ নেই, ক'ষে হাতিয়ারে শান দাও ;
জাগাও বাহুতে স্নায়ুতে, সাহস জাগাও মনে ;
র স্বার্থ নিঃসংশয়ে আজ ভুলে যেও ভাই,
উপরে দেশের স্বার্থ, তাহার উপরে নাই ।

কোটি মানুষের মনোবলে হবে নূতন আয়ুধ গড়া,
জন্মভূমির জন্যে করব জীবনমরণ পণ ।
শত সূর্যের শৌর্যে বীর্যে যে জাতি সমুজ্জ্বল,
সে জাতি কি আজ লেহন করবে বিদেশীর পদতল !

ছুঁচের ডগায় কেউ যদি নেয় আমার দেশের মাটি,
সংগ্রাম হবে নিশ্চয়, জেনো এ কথা সত্য খাঁটি ।

সতর্কভাবে স্বাভাবিক ও শান্ত জীবন লাভের জন্য
রকম যত্ন করে, তবু একদিন তাকে উপলব্ধি
ত হয়, এই যত্ন করতে গিয়ে এমন মূল্য তাকে দিতে
ছ, নিজের সত্তাকেই করতে হয়েছে এতদূর অপমানিত
াভাবিকতার বদলে বিশাল অস্বাভাবিকতা সমুদ্রের
দর মত ছুটে এসে গ্রাস করছে তাকে। পথ কোন
াই খোলা নেই। চারিদিক দিয়ে এক অন্ধ দেয়াল
যকে ঘিরে ধরেছে এবং আলোর রশ্মি কোনও ছিদ্র
প্রবেশ করতে পারছে না। বিশ্বাস ও আশাবাদ
যকে খুশী করে, কিন্তু মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা
াবাদের চেয়ে প্রবঞ্চনা আর কিসে? অথচ এই
ঞ্চনার মধ্যে মাথা গুঁজে একটি কোনও রকমের
াস ও আশাবাদের আশ্রয়ও মানুষের দরকার, না
তার বেঁচে থাকাই হয়ে পড়ে অসম্ভব, অবাস্তব।
সত্য নয়—মিথ্যার মধ্যেই বাঁচতে হবে মানুষকে এবং
মিথ্যার মধ্যেই সে বেঁচে আছে।

অথচ এমন সব মুহূর্ত আসে মানুষের জীবনে যখন মিথ্যার মধ্যে নিমজ্জিত সত্তা তার যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে, মুক্তির জন্য করুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে বারবার। অথচ মিথ্যা ছেড়ে, মিথ্যা আশা আর বিশ্বাস ছেড়ে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয় মানুষের, আর তাই নিজের সত্তারই বিরুদ্ধে এক হিংস্র ষড়যন্ত্রে সতত লিপ্ত হতে হয় তাকে। বিদ্রোহী মানুষেরই উলটোপিঠ হচ্ছে এই আপন সত্তার লাঞ্ছনার চক্রান্তে রত চক্রী মানুষ। কথাটা হয়তো নতুন, কিন্তু এই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে চিরন্তন কালের সত্য বিবৃতি। মানুষ সম্পর্কে এর চেয়ে মহীয়ান্ কোনও বিশ্বাস অন্ততঃ আমার নেই এবং কারও কি থাকা সম্ভব?

পালাই যদি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

যে-গানে আকাশ গাঙে বেড়ায় ভেসে
সুরের খেলা
যে-সুরে কথার পাখি অচিন দেশে
ভাসায় ভেলা,
যে-পথে রবির আলো চাঁদের হাসি
ঝিলিক হানে,
কে জানে কোন্ দরদী বাজায় বাঁশী
আকুল তানে!
যেন সে আপন মনে সে কোন্ ক্ষণে
নীলের নেশায়
সুরের এই সাতটি ছবি দিগঙ্গনে
রঙে মেশায়!
জাগে কী মূর্চ্ছনাতে বিশ্বভুবন
স্বপ্ন ভরা,
ভুলিতে অতীত দিনের দুখের বেদন
অশ্রুঝরা!
উজানে আকাশ গাঙে ঢেউ বয়ে যায়
নিরবধি—
আমি কী নাগাল পাব তার কোনও, হায়,
পালাই যদি!

বল তো কী ফল হবে ভুলের ফসল
তুলতে গিয়ে,
নিজেরে রুদ্ধ করি নীরস কঠিন
পাষাণ দিয়ে,
যেখানে যায় না দেখা তাজা আলোর
রঙীন দেশা,
বিরাজে সংশয়েরি নিকষ কালোর
অন্ধ-নিশা
মেটাতে কেউ কী পারে সেই জগতে
ব্যথার দাবি,
বিয়োগে কে পায় বল, যোগের পথে
প্রেমের চাবি?
চাহিয়া অসীম আলোর সাধা সুরে
গান যদি গাই—
ক্ষতি কী নিখিল ধরা সসীম মনে
পায় যদি ঠাঁই?—
বহিছে অকূল পানে কূলে কূলে
প্রাণের নদী—
আমি কী নাগাল পাব, মনের ভুলে
পালাই যদি?

জানি না হারিয়ে যাওয়া খুঁজে পাওয়া
সুখের রাতি—
মানি না কী কথা কয় পাগল হাওয়া
দুখের সাথী;
যেন এ মনের দুয়ার যায় রে খুলি
ভালবাসায়—
গাঁথিয়া মুক্ত মনের মুক্তাগুলি
রঙীন আশায়,
যদি বা সবার মাঝে সবকে নিয়ে
চলতে পারি,
যদি বা প্রাণের কথা ঢেলে দিয়ে
বলতে পারি—
জগতে যা কিছু সব একই সুরের
প্রতিধ্বনি—
খুঁজে নাও তারই মাঝে স্বপনপুরের
সোনার খনি!
যে-রূপে মনের আশা মিটিতে না চায়
নিরবধি—
বেঁচে কী মরেই রব সব ফেলে, হায়
পালাই যদি।

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্টরের আচ্ছন্ন ভাব যখন কাটল, রামনিবাস বাগিচা তখন জনশূন্য। ভূমিশয্যা ছেড়ে ধীরে ধীরে সে কর দিকে অগ্রসর হল। তেষ্টা পেয়েছে তার ভীষণ। কর বাঁ দিকে ইলেকট্রিক সাবস্টেশনে আলো জ্বলছে। টির মিস্ত্রী পাথরের চৌকিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। লোকটার ার শিয়রে কাঠামোর উপর ভিক্টর দেখল জলের কলসি ছে। হাতল লাগানো পিতলের গেলাসও রয়েছে ়ে টাঙানো। আকণ্ঠ জল পান করে মুখে মাথায় দিল নর ঝাপটা। রুক্ষ হাওয়ায় মেটে কলসির জল হয়েছে ফের মত ঠাণ্ডা। শীত শীত করতে লাগল তার। খুলে ওয়া 'শাফা'টা জড়িয়ে নিল মাথায়। রেলিঙ ডিঙিয়ে ইরে এল। আজমেরী গেট দিয়ে প্রবেশ করল ঘুমন্ত রে। দু পাশে 'পটরি'র চবুতারার উপর লোক শুয়ে। াতোয়ালী চৌপড়ের পাথরের রেলিঙের ওপর এসে ল সে। উত্তর-আকাশ খুঁজতে লাগল যদি সপ্তর্ষি-ণ্ডল দেখতে পায়। হয়তো অস্ত গেছে, কিংবা াড়াল পড়েছে নাহারগড়ের পিছনে। দেখল লাল লো জ্বলছে কেল্লার মাথায়। হয়তো ধসে যাওয়া জবংশের কেউ এসেছেন জয়পুরে। কিন্তু তার কেবলই ন হতে লাগল এটা নাহারগড়ের কেল্লা নয়। চিৎপাত য় শুয়ে আছে বিরাট দেহ কুম্ভকর্ণ। আর রাবণের ুমে তার নাকের ডগায় জেলে দেওয়া হয়েছে লাল লো। কী একটা ঘটেছে কালকে সেটা ঠিক মনে করতে পারল না। সারাদিন মদ খাচ্ছিল এইটুকুই কেবল তার মনে আছে। অনেকদিন পরে খাওয়ার জন্যে নেশাটা তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করেছিল। এখন কি সে সুস্থ হয়েছে? নেশা কি তার কেটেছে? বুঝতে পারল না ভিক্টর। উঠে হাঁটতে আরম্ভ করল ত্রিপোলিয়া বাজারের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় চৌপড়ের দিকে। বুঝতে পারছে না কিছু। এ তো বড় বিপদ হল। নেশার ঝোঁকে কাউকে খুন করি নি তো কাল? নিজের হাত দুটো তুলে রাস্তার আলোয় দেখল টকটক করছে লাল। শিউরে উঠল সে। পরের ইলেকট্রিক পোস্টের নীচে এসে আবার ভাল করে হাত দুখানা দেখল। না, রক্ত নয়। সুরার প্রতিক্রিয়ায় এই সব আতঙ্ক দেখছে সে। খুনই যদি করে থাকে তাতেই বা কী? জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করল ভিক্টর। সকাল হচ্ছে না কেন? ভাল লাগছে না তার এই আকাশজোড়া অন্ধকারের নীচে ইলেকট্রিকের কটা আলো। সন্দেহ অবিশ্বাস আর ভয়! পৃথিবীর গোটা চার-পাঁচ আলোর কী শক্তি আছে এই অনন্ত অন্ধকার দূর করে! না, সূর্য আজ আর উঠবে না। শুকতারারও দেখা নেই। কটা বেজেছে? জহুরী-বাজার হয়ে সাঙ্গানের গেটের দিকে চলতে লাগল সে। বিটের পুলিস কাছে এসে তার মুখ দেখল। জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে আসছ?—ভিক্টর প্রথমটা চমকে উঠেছিল। তারপর সংঘাতে সজাগ হয়ে, মুহূর্তের মধ্যে আলগা হয়ে খসে পড়া বুদ্ধির রাশটা বাগিয়ে নিল।

বিদ্রূপহাস্যে বলল, যাক, জয়পুর শহরে তবু একজন সেপাইও ডিউটিতে জেগে আছে। আমি তো আজমেরী দরওয়াজা থেকে আসছি। একটিরও সাড়া পেলাম না কোথাও।—পুলিসটা তাকে অফিসার ভেবে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বলল, আমি তো প্রত্যেক দিন ঠিকই ডিউটি দিই।—হেসে ভিক্টর বলল, ভয় নেই, আমি ইন্সপেক্টার নই। দারু খেয়ে একটু মৌজ করছিলাম।—পুলিস নিজ-মূর্তি ধারণ করবার এত বড় সুযোগ পরিত্যাগ করবে কি না চিন্তা করবার আগেই ভিক্টর বলল, তোমাদের সার্কেল ইন্সপেক্টার আজকাল মুকুটবিহারী, না ফুল সিং, কে?—একটু ঝুঁকে দেখবার ভান করল তার বুকের নম্বরটা। তরুণ কনস্টেবল প্রমাদ গনল। অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, জী, ফুলসিংজী।—এই লোকটা যে একজন পুলিস অফিসার তাতে আর সন্দেহ রইল না তার। ঠিক হ্যায়।—বলে ভিক্টর এগিয়ে চলল বুদ্ধির বাগানো রাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। চলুক ঘোড়া যেদিকে খুশি! কী একটা চিন্তা করছিল পুলিসের সঙ্গে দেখা হবার আগে। ধর্ম-কথা? তত্ত্ব-কথা? গীতা, বাইবেল, আলো-অন্ধকারের কথা? কই মনে পড়ছে না তো কিছু। দুর্যোগে দুর্দিনে যদি ভাল কথাগুলো মনেই না পড়ে, তবে সেগুলোর সার্থকতা কী? আর দুর্যোগই বা কোথায় যে, সে ভাল কথা ভাববার চেষ্টা করছে? না, আর একটু পান না করলে তার মাথা পরিষ্কার হচ্ছে না। দেখল সকাল হয়ে গেছে। লোকজন, লরি মোটর ছুটোছুটি করছে। আর সে দাঁড়িয়ে আছে সাঙ্গানের দরজার চৌমাথায়। তা হলে মদ্য পান করবার জন্যে এখন তার কিছু অর্থের প্রয়োজন। মনে হল মহা সত্য যেন একটা আবিষ্কার করেছে সে। কথাটা লিখে রেখে দেবার মত। মোড়ে মোড়ে অ্যামপ্লিফায়ার ফিট করে লোককে শোনাবার মত। সংসারে টাকার প্রয়োজন একমাত্র মদ খাওয়ার জন্যে। হুইস্কি, শ্যামপেন, শেরী জিন, সাকী, ভোডকা, দুবারা, দশমূল—যত রকমের মদ আছে এই পৃথিবীতে সেগুলো গেলবার জন্যে শুধু টাকার দরকার। ভাবল ভোরের মাতালের একটা ভাষণ রেডিওতে দিলে কী রকম হয়? আকাশবাণীর ডাইরেক্টার রামাদিত্যমল তো তার ইয়ারদোস্ত। রোদ্দুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনটা তার বেশ হালকা ফুরফুরে হয়ে গেছে। ঠোলিয়ার পেট্রলপাম্পে এসে, অনুগত ভক্ত ভেড়িয়ামীনাকে বলল, ঠেকায় চল। রাত কী খুমার উৎরায়েঙ্গে। সঙ্গানেরী দরওয়াজার দারুখানায় দুজনে গিয়ে ঢুকল। জয়পুরে দিবারাত্র যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত ভেড়িয়ামীনা তাদের মধ্যে একজন। পেট্রলপাম্পে নানা উপায়ে অর্থ উপার্জনও হয় তার প্রচুর। দুজনেই তারা নামকরা মাতাল। শখের মাতালদের মত সোডা বরফ চাট পকৌড়ি সাজিয়ে মহা আড়ম্বরে দশজনে মিলে এক বোতল মদ তারা খায় না। একসেরের শিলকরা নারঙ্গির সরাবের একটি বোতল নিয়ে প্রকাণ্ড দুটো গেলাসে ঢালল ভেড়িয়া। জয় মাতাজী কী—বলে দুজনে গেলাস তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে পান করে ফেলল। সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। হাত জোড় করে ভেড়িয়া ভিক্টরকে বলল, আউর কুছ হুকুম ফরমাও।—ভিক্টর বলল, না, আর কিছু প্রয়োজন নেই, তুমি যাও ডিউটিতে।—ভেড়িয়া বলল, ডিউটি আমার চারটের পর। চন্দরদেওর বাড়িতে 'পাত্তি' হচ্ছে (তাস খেলা)। কাল বড্ড হেরেছি। তুলে দেবে আমার টাকাটা?—ভিক্টর জিজ্ঞাসা করল, কে কে খেলছে? মালদার কেউ আছে? না, ফকির আর কেরানীর ভিড়?—ভেড়িয়া বলল, আছে। অরোরার ছেলে আছে, কেবলচান্দ সুনার আছে, বাঙালীবাবুও আছে একজন—কলকাত্তা থেকে এসেছে।—তিন শো টাকা ভিক্টরের হাতে দিয়ে ভেড়িয়া বলল, ক্যাশের পাঁচ শো টাকা ছিল। দু শো কাল হেরে গেছি। শেঠের কাছে সমস্ত টাকাটা চারটের মধ্যে জমা দিতে হবে।—ভিক্টর বলল, ফিকর মৎ কর।

আড্ডায় গিয়ে দেখল, খেলা হচ্ছে পাঁচ টাকা লিমিটে। খেলতে বসল ভিক্টর। চন্দরদেও বলল, ভিক্টর কৌড়সাব খেলো, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই। চন্দরদেওর চাকরকে দিয়ে ভিক্টর আরও এক বোতল নারঙ্গির সরাব আনাল। আমন্ত্রণ জানাল সবাইকে পান করবার জন্যে। চন্দরদেও ছাড়া আর কেউ খেলে না। বাঙালীবাবু বললেন, হুইস্কি ছাড়া তিনি আর কিছু পান করেন না। এ সব তো রঙ করা জল।—মাটিতে খানিকটা

্লে, দেশলাইয়ের একটি কাঠি জেলে ভিক্টর ধরল
্পর। সবুজ শিখা ধক করে জলে উঠে নিবে গেল।
ালা শুরু হল। নেশার ঝোঁকে উলটোপালটা চাল
লাগল ভিক্টর। বোগাস চাল তার ধরা পড়ে যেতে
শো করাতেই। কয়েক দানেই বাঙালীবাবু তার
থেকে পঞ্চাশ-ষাট টাকা জিতে নিলেন। জয়ের
। মশগুল হয়ে হঠাৎ বাঙালীবাবু বললেন, লিমিট
আমি আর খেলব না। হাজার মাইল দূর থেকে
এই পঞ্চাশ-ষাট টাকা নিয়ে ছেলেখেলা আমি পছন্দ
না। দেবও যেমন নেবও তেমনি। হঠাৎ তিনি
ং' ধরলেন একসঙ্গে পঞ্চাশ টাকা ফেলে। অন্য
য়াড়েরা তাস ফেলে দিল। নিজের তাস তুলে নিয়ে
। এক শো টাকার চাল দিল। রেগে আগুন হয়ে
ীবাবুও এক শো টাকার চাল দিলেন। এ-পকেট
কট হাতড়ে ভিক্টরও দিল এক শো টাকার চাল।
় করে মাতালটার দিকে চেয়ে, তিনখানা এক
াকার নোট বার করে ফেলে দিলেন। বাঙালীবাবু
বললেন, মালকড়ি আর আছে কিছু?—এক-
তাস টেনে ভিক্টর বলল, আমারও রইল তিন শো।—
বললেন, ক্যাশ রাখুন।—বোতল থেকে খানিকটা
পান করে শার্টের খুঁট দিয়ে ঠোঁটটা মুছে, সিগারেট
। ভিক্টর বলল, খেলা এখনও শেষ হয় নি। এখানকার
বোধ হয় আপনার জানা নেই। যাই হোক,
ন অতিথি। বেইজ্জত আপনাকে করব না।—
াচান্দকে বলল, টাকা দিতে। কেবলচান্দ তাস
ত চাওয়ায়, হুংকার দিয়ে ভিক্টর বলল, ডাল্
।।—চন্দরদেওর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বলল, কত
র চাল ফেঁসেছে, আমি দিচ্ছি।—তিন শো টাকা বার
দিল তখনই। ঘাবড়ে গিয়ে বাঙালীবাবু চন্দরদেওকেই
দেখালেন। চন্দরদেও ফিসফিস করে বলল, মাতাল
, ঠিক বুঝতে পারছি না। তাস আপনারও খুব
রাইণ্ডের খেলা, চাল আর একটা হয়।—বাঙালীবাবু
ন, না, শো-ই করিয়ে নিই।—চন্দরদেও বলল,
়ক তাস বেচে দিতে পারেন।—বাঙালীবাবু রাজী
না। তিনখানা গোলাম দেখিয়ে টাকা গুছিয়ে
পড়ল ভিক্টর। চন্দরদেওকে দিল পঞ্চাশ টাকা সুদ।

বেরিয়ে এসে পেট্রোলপাম্পে গেল ভেড়িয়ামীনাকে
টাকা দিতে। তারপর গেল সহদেব হালওয়াইয়ের ঋণ
শোধ করতে। তার দোকানে কয়েকখানা সামোসা খেয়ে
আবার ফিরে এল জুয়ার আড্ডায়। বাঙালীবাবু হেরে
চলে গেছেন। খেলছে জন পাঁচেক সিন্ধী আর পাঞ্জাবী
কনট্রাক্টার। আড্ডার মালিক চন্দরদেও স্নান আহার
করতে গেল। তার হয়ে খেলতে লাগল ভিক্টর। দিন
গেল। রাত্রিও প্রায় শেষ হল। খেলা সমানে চলছেই।
আগের লোকেরা নিঃস্ব হয়ে উঠে যায়। নতুন উৎসাহ
নিয়ে আসে নতুন খেলোয়াড়। আগের লোকদের খেলার
ত্রুটি, জিতের মুখে বেপরোয়া চাল দেবার দোষ, হারের
মুখে মাথা গরম করার বোকামির কথা নিয়ে হাসাহাসি
করে তারা। পরাজিত খেলোয়াড়দের মত তারা তো
নির্বোধ নয়! জয় তাদের অনিবার্য! নিমীলিতনেত্রে
ভিক্টর দেখে, আগের লোকগুলোর প্রতিটি ভুল প্রতিটি
পদস্খলন অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে পরের লোকেরাও।
আড্ডার মালিকের হাত-সাফাই ধরবার মত চোখ একটি
খেলোয়াড়েরও নেই। হঠাৎ তাস টাকাকড়ি ফেলে উঠে
পড়ল ভিক্টর। কিরকম একটা অস্বস্তি বোধ করছিল
সে। বেলা তখন প্রায় দুটো। ভাবল, চমুবাগিচায় গিয়ে
শুয়ে থাকবে নিজের পুরনো আড্ডায়। কাল থেকে কী
কী করেছে একবার চিন্তা করে দেখবে। এতক্ষণ যেন সে
নিজের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মনে
পড়ল কাল না পরশু রাত্রে সে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। মনে
হয়েছিল সে যেন খুন করেছে কাউকে। ইলেকট্রিকের
আলোয় নিজের হাত দুখানা দেখেছিল রক্তে লাল।
হঠাৎ অস্কার ওয়াইল্ডের 'ব্যালাডস অফ রিডিং জেলে'র
কয়েকটা লাইন তার মনে পড়ল। বিড়বিড় করে
আওড়াতে লাগল—

He did not wear his scarlet coat,
For blood and wine are red,
And blood and wine were on his hands
When they found him with the dead,
The poor dead woman whom he loved,
And murdered in her bed.

…　　…　　…

When a voice behind me whispered low,
'That fellow's got to swing.'

(সুরা ও শোণিত রক্তবরণ রক্তিম আলো চোখে,
সুরা ও শোণিতে পড়েছে সে ধরা আঁধারে নেশার
ঝোঁকে।
সব দিয়ে যারে বেসেছিল ভাল, তাহারে জড়ায়ে ধরে,
আবরণহীন বক্ষে হেনেছে তীক্ষ্ণ ছুরিকা জোরে।
পুন সে নারীর চরণ ধরিয়া ক্ষমা চেয়েছিল বুঝি ?
পুলিস-রিপোর্টে বাহুল্য কথা কভু না মিলিবে খুঁজি।

... ...

তর্জে সকলে তর্জনী তুলি, ওই সে পড়েছে ধরা !
খুনের আসামী, শাস্তি যে ওর ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরা।)

তার পরের লাইনগুলো আর মনে করতে পারল না। নবাবসাহেবের বাগিচার কাছে এসে আরও কয়েকটা লাইন মনে পড়ল তার—

Yet each man kills the thing he loves,
By each let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word.

... ...

Some kill their love when they
are young,
And some when they are old ;
Some strangle with the hands of Lust,
Some with the hands of Gold.
The kindest use a knife, because
The dead so soon grow cold.

... ...

Some love too little, some too long,
Some sell, and others buy ;
Some do the deed with many tears,
And some without a sigh :
For each man kills the thing he loves,
Yet each man does not die.

(জ্ঞানী, বিজ্ঞানী পণ্ডিত মূঢ় শোন দেখি কান খুলি,
প্রতিজনে মোরা খুনের আসামী, ফাঁসিতে কজন ঝুলি ?
কয়েদী হেনেছে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, মরণ ঘনায় দ্রুত,
আদরের ধনে হত্যা করিতে মোরা খুঁজি নানা ছুতো !
কেহ করে খুন কটু কটাক্ষে, কেহ বা চটুল হাস্যে,
কেহ বা কামের পঙ্কিল হাতে কেহ বা গীতার ভাষ্যে।
সোনা দিয়ে কিনে খুন করে কেহ কৃতজ্ঞতায় বাঁধি,
বিক্রয় করে কেহ করে খুন চক্ষের জলে কাঁদি।
কেহ করে খুন তরুণ বয়সে কেহ বা বৃদ্ধকালে,
বেসুরে বেতালে কেহ করে খুন কেহ বা ছন্দে তালে।
কেহ করে খুন প্রতিমা সাজায়ে, কেহ করি ক্রীতদাসী,
পলকে মৃত্যু অস্ত্রের ঘায় তাই বুঝি ওর ফাঁসি ?)

লাইনগুলো উলটো-পালটা হয়ে গুলিয়ে যেতে লাগল তার।

স্টেট হোটেলের কাছে এসে চমুবাগিচার দিকে আর যেতে ইচ্ছে হল না তার। ভাবল, সেনজীদের বাগিচা ঘুরে হাথরোই গির্জার পাশের রাস্তাটা দিয়ে ফিরে যাবে চাচার কোয়ার্টারে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, ঘুমন্ত ভীমের মত থমথম করছে আকাশ। কখন গর্জন করে জেগে ওঠে তার ঠিক নেই। আঁধি এল বলে।

'The kindest use a knife, because
The dead so soon grow cold !'

এই লাইন দুটি আওড়াতে আওড়াতে সে চলতে লাগল সংশপ্তক যোদ্ধার মত বুক ফুলিয়ে। উত্তপ্ত বালুকণা বর্ষণ করে লু চলতে শুরু হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘোলাটে হয়ে গেছে ধুলোয়। আঁধি এল ! আসুক। নারঙ্গি সরাবের পাক্কা এক সেরের একটি বোতল আর ভুনিহুই মাস। ব্যর্থ করে দেবে সে বিধাতার বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত।

রাজস্থান সকল ঋতুতেই অনন্যা সুন্দরী। কিন্তু বৈশাখী মধ্যাহ্নে তার যে রূপ ফুটে ওঠে সেদিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। রুষ্ট রুদ্রের খরদৃষ্টির সম্মুখে ঝিলমিলিয়ে কাঁপতে থাকে তার দুর্গ, প্রাসাদ, তোরণ-স্তম্ভগুলো। নিরেট পাথরের তৈরি বলে মনেই হয় না। স্বর্গাশূলি, হাওয়া মহল, নাহারগড়, মোতিডুংরী—গলানো ধাতুর মত সব যেন টলটল করতে থাকে। গরম ভাপ উঠতে থাকে তাদের গা থেকে। প্রান্তর, পর্বত, জনপদ,

উপর দিয়ে বইতে থাকে অবিশ্রান্ত অগ্নিপ্রবাহ। প্রতিমা রাজস্থানের বিষাদ-অশ্রু বাষ্পে পরিণত আকাশে যায় মিলিয়ে। ভাট কথক গীতিকারেরা সতীত্ব জহরব্রত নিয়েই গান গেয়ে গেলেন চিরকাল। অনন্ত বেদনা, অনন্ত জ্বালার কথা ভাষা পেল না র গানে। তাই উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পাষাণী দাঁড়িয়ে রইল রাজস্থান। বিধাতার ইচ্ছা নয় তার পৃথিবীর কেউ জানুক।

অকস্মাৎ ময়ূর ডেকে উঠল উচ্চকণ্ঠে। ক্লান্ত তীক্ষ্ণ স্বত লয়ে। ব্যর্থ হল বিধিলিপি। ছেদ পড়ল গুর অগ্নিবর্ষণে। কেকাধ্বনি বায়ুস্তরে ক্রমবর্ধনশীল সৃষ্টি করতে করতে নিমেষে ছেয়ে ফেলল সসাগরা। মূক পাষাণীর অন্তর্বেদনা পক্ষীকণ্ঠে প্রচারিত হল রাচরে। চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে, রাশিতে, সুদূর নীহারিকাপুঞ্জে। তবু অতৃপ্ত রইল তৃষ্ণা।

ালতা পাহাড়ে ধারাশূন্য গোমুখী-নির্ঝরের উপর ার ঝাঁক উড়ে উড়ে বসে—পাশের গর্তে জমা ড়-চোঁয়া জলটুকু পান করবার আশায়। নীচের র জল গেছে তলিয়ে। সিঁড়ির ধাপগুলো চৈত্রের ই গেছে শুকিয়ে। পাথর-কাটা খাড়া দেওয়ালে ও অবলম্বন রাখে নি মানুষ যা নির্ভর করে তারা ঠোঁট ঠেকাতে পারে। পাণ্ডা-পুরোহিতেরা পাথর-জলপাত্রে 'কবুতর কামেড়ি'র জন্যে জল রাখলেও সে তাদের রোচে না। গোমুখীর পাহাড়-চোঁয়া জলেই র তৃপ্তি।

আরাবল্লীর কোলে আধুনিক জয়পুরের জনকোলাহল াখের জলন্ত দ্বিপ্রহরে শাসিত শিশুর চাপা কান্নার মনে হয়।

দুপুরে দরজা-জানলা বন্ধ করে দোতলার ঘরে বসে চন্দের একখানা উপন্যাস পড়ছিল অনসূয়া। সেই ঘয়ে গল্প। সর্বগুণধর নায়ক আর অপরূপ সুন্দরী কা। নানা বাধা-বিপত্তির পর মিলন। এই মিথ্যা গল্পগুলো লেখকেরা কেন যে লেখে! আর করাই বা কি বলে পড়ে? জীবনের ভুল ব্যাখ্যা, দর্শন, ভুল বিশ্লেষণ। হঠাৎ তার মনে হল এগুলো তো ভুল নয়। লেখক ঠিকই লিখেছে। নায়ক-নায়িকা মনশ্চক্ষেই তো দুজনে দুজনকে দেখে। আর লেখক তাদেরই মনের কথা লিপিবদ্ধ করে। সত্যিই তো ভিক্টরের রূপ-গুণের তুলনা হয় না! আর সে? ভিক্টর তো তাকে অপরূপ সুন্দরী বলেই জানে। না, প্রেমচন্দ খুব ভাল লেখক।

হঠাৎ ভিক্টরের জন্যে তার ভীষণ মন কেমন করে উঠল। কোথায় আছে, কী করছে—কিছুই সে জানে না। হয়তো মদ খেয়ে পড়ে আছে। বাদলরাম তো সেই কথাই বলল সেদিন। তাকে যে ভিক্টরের প্রয়োজন। সে পাশে না দাঁড়ালে ভিক্টরের শিল্পপ্রতিভা কী করে ফুটে উঠবে! সে যে তার ইনস্পিরেশন। কী হবে মান সম্মান অর্থ প্রতিষ্ঠা নিয়ে? কী হবে গালের দাগ তুলে যদি ভিক্টরের জীবনই ব্যর্থ হয়ে যায়? কেন সে রাজী হল বাদলরামের প্রস্তাবে? ভিক্টরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে কেন খেপিয়ে তুলল তাকে? কী দরকার ছিল তার এই সব ফন্দি-ফিকিরের? তার সৎসাহস থাকা উচিত—বাদলরামের কাছে সব কথা অকপটে স্বীকার করার। এভাবে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। আশ্চর্য, বাবা উর্মিলা পিসীমা ভিক্টরের কথা এরা কেউই জানে না। বাদলরামই বা কতটুকু জানে? না, কেউ কোনও দিন জানবে না তার মনের কথা। যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব, তারপর বার্ধক্য, তারপর বুড়ি থুড়থুড়ি হয়ে সে মরে যাবে। রাজস্থানের বালির সঙ্গে মিশে যাবে তার দেহভস্ম। তখনও কেউ জানবে না তার এই গোপন কথা। চোখের জল মুছে ফেলল অনসূয়া। উঠে জানলা খুলে তাকিয়ে রইল বাইরে। বিশ্ব জুড়ে নিঃশব্দে তখন অগ্নিকাণ্ড চলেছে। সূর্যদেব যেন আজ পণ করেছেন পৃথিবীর সমস্ত রস শুষে নিয়ে সমস্ত শ্যামলিমা দগ্ধ করে তবে অস্তে নামবেন। আঁধি একটা উঠবেই! এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে পৃথিবী কখনও জ্বলতে পারে না, এত উত্তাপ স্থায়ী হতে পারে না। আসবে—ঝড় একটা আসবেই আজ। তারপর ঠাণ্ডা হবে এই দাবাগ্নি। নিজেকে অস্বাভাবিক স্ত্রীলোক বলে মনে হল তার। নইলে অপমানিতা হয়েও সে উল্লাস বোধ করে? ভিক্টরের সেদিনকার দুর্ব্যবহারে বাদলরামের রোষ বিদ্বেষ

উৎকণ্ঠার কথা মনে করে হাসি আসতে লাগল তার। বাদলরাম যদি জানত ভিক্টরের ওই একটি দিনের মত প্রলাপে নারীজন্ম সার্থক হয়েছে তার! সপত্নী কলালক্ষ্মীর দর্প একটি দিনের জন্তও চূর্ণ করেছে সে। দুর্ধর্ষ দাম্ভিক ভিক্টরকে লুটোপুটি খাইয়েছে তার পায়ের তলায়। পেয়েছে তাকে নাগালের মধ্যে। বিজয়িনী সে। তবু কেন কান্না গুমরে উঠছে তার বুকে? সমর-বিজয়ী পাণ্ডবদের মত হাহাকার করছে তার অন্তর। না না, তাকে কঠিন হতে হবে, নির্মম হতে হবে। ভিক্টরকে পথভ্রষ্ট হতে সে দেবে না। পৌরুষ বিসর্জন দিতে দেবে না তাকে কিছুতেই। আমৃত্যু সে নিজেই জলবে। ভিক্টর কোনও দিন জানতে পারবে না কী সে তাকে দিয়েছে। অভিমানে আক্রোশে হয়তো সে বিকৃত ছবি আঁকবে তার। জগতের লোক তার সেই বিকৃত ছবিই দেখবে চিরকাল। জানবে ডাকন চুড়েল পথভ্রষ্ট করেছে এক সাধককে। আঁকুক—ভিক্টর তার বীভৎস ছবিই আঁকুক। ঈর্ষা জাগিয়ে আঘাত হেনে মোহ-অঞ্জন আজ মুছে দেবে তার চোখ থেকে। যাবে সে ভিক্টরের বাড়ি। হাথরোই হয়ে তারপর যাবে স্টেশনের কোয়ার্টারে। তার মন বলছে, ভিক্টরের সঙ্গে আজ দেখা হবেই। হয়তো শেষ দেখা। উন্মত্ত ভিক্টর হয়তো তার পা ধরে ক্ষমা চাইবে। কিংবা নির্মম ভাবে প্রহার করবে তাকে। যাই করুক তবু সে আজ কঠোর হয়ে থাকবে। মেষপালিত সিংহশাবককে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়ে আজ তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবে। উঃ, একটি দিনের ঘটনায় ভিক্টর কোথা থেকে কোথায় নেমে এল! অথচ এইটেই সে কামনা করেছিল সর্বান্তঃকরণে। সুস্থ প্রকৃতিস্থ ভিক্টরের কাছে গেলেই তার মনে হত যেন অগাধ জলে গিয়ে পড়েছে। যেন ঝড়ের সময় উঠেছে স্বর্গাশূলির চূড়ায়। আর পাথরের রেলিংগুলো কে দিয়েছে ভেঙে। এই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে ফেলে তাকে ত্রিপোলিয়া বাজারের ফুটপাতে, কিংবা 'আতিশ তাবেলা'র ঘোড়াশূন্য আস্তাবলে। হয়তো বা চন্দ্রমহলের উপর দিয়ে গোবিন্দজীর মন্দিরেই উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। তবু ভিক্টর পূর্ণ করেছে তার বাসনা। জ্ঞানবুদ্ধিরহিত সাধারণ মানুষের অধিকারবোধের অভিমান নিয়ে ছোট্ট খাঁচায় ধরা দিয়েছে তার মনের মতন হয়ে। আজ তাকে মুক্তি দেবে সে। নির্মাল্য নিবেদনে জাগ্রত দেবতা পড়েছে ঘুমিয়ে। কণ্টক অভ্যর্থনায় আজ ভাঙিয়ে দেবে তার ঘুম। লাগাম ধরে কশে দেবে টান।

জানলা থেকে সরে এল অনসূয়া। চম্পা রঙের শাড়িখানা রংরেজ দিয়ে গেছে আজ সকালে। সেইখানা পরে বেণীবন্ধ খুলে চুল এলিয়ে দিল সে। রাজস্থানে এত চুল আর কোন মেয়ের আছে? আর এই আয়ত চক্ষু? জুতো পরে ভ্যানিটিব্যাগ হাতে সে বেরিয়ে এল রাস্তায়। চাঁদপোল গেটের বাইরে এসে সংসারচন্দ্র সেন রোড ধরে হাথরোইয়ের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। মোড়ের মাথায় কাওড়া কাঠির জাফরি ঘেরে দেশী মদের দোকান। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে ভিতরের খানিকটা। অনসূয়া দেখল, এই দুপুরের রোদেও গোটাকতক লোক মদ খাচ্ছে। দেখল, মাটিতে বসে সারেঙ্গীওয়ালা "যুগী" মাণ্ড সুরে রাজপুত গাথা গেয়ে শোনাচ্ছে। সারেঙ্গীর ছড়িতে বাঁধা ঘুঙুরের গুচ্ছ টানে টানে ঝংকার দিয়ে উঠছে। মাণ্ডরাগিণী শুনলেই তার যেন কি রকম ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় সব। মনে হয় কোথাও কিছু নেই। সব শূন্য—সব হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সামনের কংক্রিটের পথে চিক চিক করে উঠল জল। কেউ জল ঢেলেছে বুঝি রাস্তায়—ওই ইলেকট্রিক পোস্টটার কাছে। সেখানে পৌঁছে দেখল জায়গাটা শুকনো। জলটা তার পরের পোস্টটার কাছে ঝিকমিক করছে। উঃ, কী রোদ্দুর! হাত মুখ তার ঝলসে যাচ্ছে। এসে গেছে সেনজীদের বাগিচা। অনসূয়া ভাবল, গির্জাটার পাশের রাস্তা দিয়েই সে যাবে। জনশূন্য ছোট্ট রাস্তাটি তার বড় ভাল লাগে। যেন আজমীর রোড আর মির্জা ইসমাইল রোড দূর যাত্রার আগে শেষ বারের মত দুজনে দুজনকে স্পর্শ করে নিচ্ছে। মির্জা ইসমাইল রোডের দৌড় স্টেশন পর্যন্ত। আর আজমীর রোড হুহু আজমীর পার হয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে? হঠাৎ ময়ূর ডেকে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনসূয়া। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল অসহ্য যন্ত্রণায়। তার পরেই উঠল আঁধি।

:সেনজীদের সংসারভিলা পার হতেই ভিক্টর দেখল, ল পাষাণপ্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে অনসূয়া। ন্দে আত্মহারা হয়ে দ্রুতপদে সে এগিয়ে গেল তার হ। অনসূয়া কিন্তু তাকাল না তার মুখের দিকে— দেখতেই পায় নি তাকে। পরমুহূর্তে সে াকোটির রাস্তা ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল সোজা। রও পাশে পাশে যাবার জন্যে গতিবেগ বাড়াল। কী আশ্চর্য, কিছুতেই তার সঙ্গে তাল রেখে ত পারল না। মনে হল সে যেন ছুটছে অনসূয়ার পিছু। তবু তাকে ধরতে পারছে না। কণ্ঠে তার ়া এসে গেছে। যা বলতে চাইছে মুখ দিয়ে তা স্পষ্ট চ্ছে না। অসংলগ্ন গোটাকতক কথা সে বহু চেষ্টায় । নিজের কানেই সেগুলো অর্থহীন বলে মনে হল । বলল, কেন আমার কথা ভাবছিলে? আমি কষ্ট পাই, কাজে মন যায় না। তথাগতের ছবি, মার ছবি—আমার উপর রাগ এখনও তোমার পড়ল আমি কিন্তু আঁকব।—কংক্রিটের রাস্তায় অনসূয়ার হিলের খট খট শব্দ যেন তার সমস্ত কথা ডুবিয়ে হল। অনসূয়াও থামে না, শব্দও বন্ধ হয় না।

খাসাকোঠি ঝুমরবাগের নতুন বাড়িগুলো প্রায় সমস্তই দরাম গোলচার। কোনটায় মোটরের শো-রুম, নটায় সরকারী আপিস। কোনটা বা সৌখিন না বাড়ি। বাদলরাম গোলচার শোরুমের সিঁড়িতে কাঁচের দরজার ঝকঝকে হাতল ধরে অপূর্ব ভঙ্গীতে র্তর জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াল অনসূয়া। প্রথম দিনের ভরা জলভরা মমতাভরা চোখে ভিক্টরের মুখের চেয়ে বলল, এখানেই আমি যাচ্ছি।—দরজা ভিতরে চলে গেল সে।

অনসূয়াকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বাদলরাম বলল, এই ম আঁধির মধ্যে কোথা থেকে আসছ? কাউকে দিয়ে ায় খবর পাঠালেই পারতে।

নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে প্রকাণ্ড শো-রুমের শে ঘষা-কাঁচের-ফ্রেম-ঘেরা তার ছোট্ট আপিস-ঘরে। জারেটার খুলে ঠাণ্ডা জল নিজে হাতে এনে দিল ক। জিজ্ঞাসা করল কার সঙ্গে এলে?—অনসূয়া , ভিক্টর আমাকে ফলো করছিল তাই আপনার কাছে এলাম আশ্রয় নিতে।—উত্তেজিত হয়ে বাদলরাম বলল, ভিক্টর আবার তোমায় বিরক্ত করছে? দাঁড়াও, আমি দেখছি তাকে। কতদূর আর পালাবে? মোটর নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।—দরজা খুলে বীরদর্পে বেরিয়ে এল শো-রুমে। দেখল হলের ঠিক মাঝখানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্টর—যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকত খেলার মাঠে। দুজনে তাকাল দুজনের মুখের দিকে। ঈর্ষায় আক্রোশে দুজনের মুখই বুভিক্ষুক্ষ।

বাদলরাম ইঙ্গিতে কর্মচারীদের হলের বাইরে যেতে বলল। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সকলে। গর্জন করে বাদলরাম জিজ্ঞাসা করল, কি চাই তোমার এখানে?—নিমেষে প্রতিধ্বনিত হল তার আপন কণ্ঠস্বর। গর্জে উঠে ভিক্টর বলল, মাস্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাদলরাম বলল, ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

ভিক্টর বলল, একটু আগেও তো আমার সঙ্গে ও কথা বলেছে।

বাদলরাম বলল, তখন সে অসহায় অবস্থায় রাস্তায় ছিল। এখন সে আমার আশ্রিতা।

ভিক্টরের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়ল। বলল, Who the hell you are?

ক্রোধে বিদীর্ণ হয়ে বাদলরাম বলল, আমি ওর গার্জেন।

ভিক্টর বলল, ওর বাবা রয়েছেন জীবিত। তোমার অভিভাবকত্ব আমি স্বীকার করি না।

বাদলরাম বলল, যাও এখান থেকে। মাতলামি করবার জায়গা এটা নয়। If you stay here for another minute, I will hand you over to the police!

মত্ত হাস্যে ভিক্টর বলল, damsel in distress-কে পুলিস দিয়ে উদ্ধার করে chivalry দেখাতে চাও? Before that, I will punch you into a lump of clay! And make a model out of it. A fool's model! For the posterity to see and laugh at it. তারপর বলল, রাজস্থানের সমস্ত

আর্মড ফোর্স এসেও আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আমি দেখা করব মাস্টারসাবের সঙ্গে।

বীরত্বের মুখোশ খুলে উঁকি দিল বণিক বাদলরাম।

নম্র হয়ে বলল, সে তুমি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর ভাই। কিন্তু অনসূয়াকে এবার নিষ্কৃতি দাও। একলা পেয়ে তাকে তুমি অপমান করলে—প্রহার পর্যন্ত করলে। আর তাকে কী করতে চাও ভাই? বাঁ হাতখানা এখনও তার আড়ষ্ট হয়ে আছে।

দু দিন ধরে মদ খেয়ে জুয়া খেলে যে ব্যথাটা সে ভোলবার চেষ্টা করছিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সেই ক্ষতের উপর যেন সজোরে লাথি মারল বাদলরাম। ঝন করে উঠল ভিক্টরের মাথাটা। নারঙ্গির নেশা গেল ছুটে। তবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলল, কে বলেছে তোমায় যে আমি মাস্টারসাবকে অপমান করেছি?

বাদলরাম বলল, বলবে আবার কে? বাড়িসুদ্ধ সবাই জানে। জান্‌কী বলেছে, ভৌরীলাল বলেছে।

চিৎকার করে ভিক্টর বলল, জান্‌কী মিথ্যে কথা বলেছে। ভৌরীলাল আমার কথা বুঝতেই পারে নি।

বাদলরাম বলল, জান্‌কীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তা ছাড়াও তো আমি জানতে পেরেছি।

অগ্নিমূর্তি হয়ে ভিক্টর বলল, কী করে তুমি জানতে পারলে? কে বলেছে তোমায়? মাস্টারসাব বলেছে?

চুপ করে রইল বাদলরাম।

অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ভিক্টর: মাস্টারসাব, তুমি বলেছ বাদলকে যে আমি তোমায় অপমান করেছি? আমি তোমায় মেরেছি? উত্তর দাও মাস্টারসাব। দেখা আমি তোমার সঙ্গে করব না। শুধু তুমি ঘরের ভিতর থেকে বল, আমি তোমায় অপমান করেছি কি না? চুপ করে থেকো না মাস্টারসাব—উত্তর দাও।

আপিস-ঘরের ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ভিক্টর। তারপর সমস্ত শক্তি একত্র করে সোজা হয়ে দাঁড়াল উন্নত শিরে। বলল, বেশ, তবে তাই হোক। হ্যাঁ, আমি অনসূয়াকে একলা পেয়ে অপমান করেছি।

কাঁচের প্রকাণ্ড দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে গেল ভিক্টর।

আপিসে ঢুকে বাদলরাম দেখল চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আছে অনসূয়া। বলল, চলে গেছে ভিক্টর। এখন তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।

অনসূয়া বলল, হ্যাঁ, এখন আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

বাদলরাম বলল, ভয় পেয়ে তুমি যদি ভিতর থেকে কথা বলে উঠতে, তা হলে আর ওকে ঠেকানো যেত না।

অনসূয়া বলল, হ্যাঁ, ভয় পেয়ে আমি যদি ভিতর থেকে কথা বলে উঠতাম, তা হলে আর ওকে ঠেকানো যেত না।

বাদলরাম বলল, এই প্রথম বোধ হয় ও তোমার নাম উচ্চারণ করল?

অনসূয়া বলল, হ্যাঁ, এই প্রথম ও আমার নাম উচ্চারণ করল।

বাদলরাম দেখল, চেয়ারের উপর অনসূয়া চোখ বুজে বসে আছে। ডাকল, অনসূয়া!—আবার ডাকল, অনসূয়া! অনসূয়া!—দেখল অজ্ঞান হয়ে গেছে সে।

আঁধি উঠেছিল প্রচণ্ড বেগে। পৃথিবীর ধুলোবালি আবর্জনারাশি আঁধির নেতৃত্বে মহা আস্ফালনে বহু উচ্চে শূন্যে উঠেছিল আবিলতার জয় ঘোষণা করে স্বর্গ অব[illegible] করতে। হঠাৎ নামল মুষলধারে বৃষ্টি। কিছুটা নাম, কিছুটা বাহবা নিয়ে নিজের গা বাঁচিয়ে গা-ঢাকা দিল আঁধি। ভিজে হাওয়ায় ভারী হয়ে প্রতিটি ধূলিকণা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পরিচ্ছন্ন হল ঘোলাটে আকাশ। নাহারগড়, গণেশগড়, মোতিডুংরি, আরাবল্লি শৈলশাখার উপর ফুটে উঠল, লাল হলুদে মেশানো সদ্য আঁকা ছবির মত। বাগবাগিচা তরুশ্রেণী রসস্পর্শে সজীব হয়ে উঠল। বৃষ্টিধোয়া গাছের পাতায় ঝিকমিকিয়ে উঠল অস্তরবির আলো।

বাদলরামের শো-রুম থেকে সোজা চাচার কোয়ার্টারে ফিরে এল ভিক্টর।

অফ-ডিউটিতে কোয়ার্টারেই ছিল শ্যাম সিং। দেখল বোম্বে হাউস থেকে সেলাই করানো তার সাধের মাখন জিনের গলাবন্ধ কোটটি পানের পিকে মাৎসর্য ঝোল[illegible]

শরাবের ছোপ আর ধুলোবালি লেগে লোকো
। ক্লিনারদের জামার দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। মাথা
আপসোস করে বলল, হায় রাম! আমার কোটটা
করে দিয়েছ একেবারে!

ভক্টর বলল, কাচিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

াম সিং বলল, আজ দুদিন থেকে তো গায়েব?
কোথায়?

ভক্টর বলল, ফুর্তি করছিলাম।

াম সিং জিজ্ঞাসা করল, এখন কী করবে?

ভক্টর বলল, ছবি আঁকব, কিংবা মূর্তি গড়ব। চাচী
ন না আসে।

াম সিং বলল, তোমার চাচী আসবে জ্যৈষ্ঠের শেষে।
তুমি যে শেঠ সাহুকারদের সঙ্গে 'পতঙ্গবাজী'
ী ধরে ঘুড়ি ওড়ানো) শুরু করেছ—পারবে কি
ত? ওদের সুতোয় মাঞ্জা বড় কড়া। ওরা বড়
নাক আদমি' (ভয়ঙ্কর মানুষ)।

ভক্টর বলল, তুমি কি ভাবছ তোমার ঈশাই ভতিজা
ন ভোলাভালা শরিফ আদমি?

শ্যাম সিং বলল, তা নয়। বাবুলাল মাথুর এসে
ার সম্বন্ধে নানা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করে গেছে।
বাদলরামের সে তো একজন পেটোয়া। আমার
হয় 'জাসুস' পুলিসের (ডিটেকটিভ) মত ও তোমার
বিধি লক্ষ্য করে। ঘোরে তোমার পিছুপিছু।

ভিক্টর বলল, তা হলে অভিমন্যুর মত ডেঁপোমি করার
ওকে একদিন ভুগতে হবে। দ্রোণাচার্যের ব্যূহ ভেদ
বেরিয়ে আসার কৌশল তো ওর জানা নেই।

তারপর বলল, চুলোয় যাক বাবুলাল। শোন চাচা,
ার রান্না এখন আর আমি করব না। আমার
দিন নিশ্চিন্ত অবকাশের দরকার। ফুলা গুজরকে
দিয়েছি কাল থেকে সে বাড়ির কাজকর্ম করবে।

মুখ শুকিয়ে শ্যাম সিং বলল, ফুলার খরচা-খোরাকি?

হেসে ভিক্টর বলল, আমি না হয় ঈশাই। কিন্তু
তো কাছাওয়াট রাজপুতের ছেলে। কাছাওয়াট
পুত কি কোনদিন খরচা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে?
ার রঘুনাথজী বজরংজী যদি ফেল করেন, তা হলে
না হয় বলে দেব আমার ইস্প-এঞ্জেলদের খরচার ব্যবস্থা
করতে।

ভিক্টর উঠে গেল স্নান করতে। স্নান সেরে চাচার
আলমারি থেকে বার করল ধপধপে পায়জামা আর
কামিজ। অনেকখানি দই আর পুদিনার চাটনি খেয়ে
প্রতিষেধ করবার চেষ্টা করল সুরার বিষক্রিয়া।
স্নায়ুমণ্ডলী স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে লাগবে তার দিন
তিনেক। ঘুম কিছুতেই আসবে না আজ। তবু
কোয়ার্টারের উঠনে খাট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সে।
রাত্রে আরও দুবার স্নান করল। ভোরের দিকে
পড়ল ঘুমিয়ে। বেলায় উঠে ফুলার মুখে শুনল শ্যাম সিং
গেছে শহরে, নিমোরিয়া ঠাকুরসাহেবের বাড়ি। সেইখানেই
খাওয়াদাওয়া করে রাত্রে যাবে ডিউটিতে। দেহমনের
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে মনে করে ভিক্টর ছবি
আঁকতে বসল। সমস্ত দিন ধরে এঁকে সকাল সকাল
খেয়ে শুয়ে পড়ল সে। বিশ্রামের তার প্রয়োজন।

পরদিন ডিউটি থেকে ফিরে শ্যাম সিং দেখল, তন্ময়
হয়ে ভিক্টর ছবি আঁকছে।

খাবার সময় ভিক্টর বলল, চাচা, আমি যদি না হাসি
বা কথা না বলি, তুমি যেন ঘাবড়ে যেয়ো না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্যাম সিং বলল, আমার হাতে
যতক্ষণ না হাতকড়ি পরাচ্ছ, ততক্ষণ আমি ঘাবড়াব না
ভাইয়া।

বিকেলবেলা নিজের অসম্পূর্ণ ছবিখানার দিকে চেয়ে
চমকে উঠল ভিক্টর! এ সব কী এঁকেছে সে!
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহা ভয়ঙ্কর জীবজন্তু, বাদুড়,
সরীসৃপ চতুর্দিক থেকে তেড়ে আসছে। উত্তুঙ্গ পর্বত-
শ্রেণীর অন্ধকার ছায়ায় ধক্‌ধকিয়ে জ্বলছে আলেয়ার
আলো। লক্ষ ফণা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে দাবাগ্নি।
উল্কা ধূমকেতু রক্তনক্ষত্রে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আকাশ।
আর তারই মাঝখানে বসে আছে আতঙ্কবিহ্বল একটি
মানুষ দু হাতে মুখ ঢেকে। উলঙ্গ নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ একটি
মানুষ।

ছেঁড়া শাফার টুকরোখানা দিয়ে ছবিটা ঢেকে ফেলল
সে। বিষণ্ণমনে শুয়ে রইল খাটে। বুঝল, জোর করে
বসলেই ছবি আঁকা যায় না। নিজেকে তার ছবির

মানুষটার মতই অসহায় দুর্বল বলে মনে হল। দেহের অণুপরমাণু তার গুমরে উঠল কান্নায়। বৃথাই সে মানুষকে এতদিন ব্যথা দিয়ে বেড়াল। বৃথাই দুঃখ পেল নিজে। কিষণগোপাল মিথ্যাই তাকে উৎসাহ দিলেন। অযোগ্যকে প্রশংসা করে কেবল তার দম্ভই বাড়িয়ে তুললেন। ভেঙে গেছে সে। আর উঠতে পারবে না কোনদিন। তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ মন্থন করে উঠল কেবল আতঙ্ক আর নৈরাশ্য।

তারপর সাতদিন ধরে ভিক্টর কেবল এঁকেই চলেছে। আঁকছে, মুছছে, আবার আঁকছে।

অষ্টম দিনে শ্যাম সিং ডিউটি থেকে ফিরে দেখল, তুলি রেখে দূরে দাঁড়িয়ে ভিক্টর দেখছে নিজের আঁকা ছবি। শ্যাম সিংও তাকিয়ে রইল ছবিখানার দিকে। দেখল, প্রথম দিনের বীভৎস জন্তু-জানোয়ারগুলো মাছি টিকটিকির মত ছোট্ট হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে দূরে। পৃথিবী হয়েছে সুন্দর সবুজ। আকাশ হয়েছে নির্মল নীল। অসহায় মুখ-ঢাকা মানুষটার জায়গায় বসে আছেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। আর তাঁর সামনে অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে একটি রমণী—হাতে কী একটা পাত্র নিয়ে। কার জ্যোতিতে যে কে উদ্ভাসিত বলা কঠিন।

হঠাৎ শ্যাম সিং সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভিক্টর হেসে তাকাল তার মুখের দিকে। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, চাচা, ছবি আমি এঁকেছি।

শ্যাম সিং বলল, চোখো বানায়েও খে (খাসা এঁকেছ তুমি)!

ভিক্টর বলল, চললুম আমি কিষণগোপালজীর কাছে।

ছুটল সে কিষণগোপালের স্টুডিওতে। পথে উদয়রাম ফোটোগ্রাফারের কাছে পিচবোর্ডে মাউণ্ট করিয়ে নিল ছবিখানা।

স্টুডিওর ওপরে উঠে এসে একটা খালি ইজেলের ওপর ছবি রেখে প্রণাম করল কিষণগোপালকে। বলল, ওস্তাদজী, ছবি এঁকেছি। কিন্তু বড় দুর্যোগ গেছে। আঁধি আর তুফান উঠেছিল আকাশ ছেয়ে।

হেসে কিষণগোপাল বললেন, আঁধি তুফানের মধ্যে যদি ছবি আঁকতে না পার তবে তুমি কিসের আর্টিস্ট?—তারপর তাকিয়ে রইলেন ছবিখানার দিকে। বললেন, ছবিখানা কি কাউকে দেবে? আমি এটা একজিবিশনে পাঠাতে চাই।

ভিক্টর বলল, বুঝি না আমি একজিবিশন। বুঝি না আমি অভিজ্ঞদের মাপজোখ, বিচার-বিশ্লেষণ। আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই এর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা।

ভিক্টরের কাঁধে হাত রেখে কিষণগোপাল বললেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে এতে যথেষ্ট। কিন্তু প্রাণশক্তি আছে তার চেয়ে ঢের বেশী। বেশ হয়েছে তোমার ছবি।

ভিক্টর বলল, ছবিখানা আপনার কাছেই রইল। আমি এবার বেরুব ওস্তাদজী কিছুদিনের জন্য জয়পুর ছেড়ে। দেশবিদেশের শিল্পী-ভাস্করদের আঁকা-গড়ার বিধি-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আর জগৎটাকেও দেখতে চাই শিল্পীর চোখে। এতদিন খেলোয়াড়ের মন নিয়ে চলেছিলাম বলে দুয়ো হাততালি হার-জিতের মধ্যে কেবল হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। আপ... প্রথম দিনের উপদেশ স্মরণ করে একাই এবার বল নিয়ে গোলের দিকে ছুটব। নতুন কিছু সৃষ্টি করলে আবার আসব আপনার কাছে।

প্রণাম করে চলে গেল ভিক্টর। বুদ্ধ-সুজাতার ছবিখানির সামনে বসে চিন্তা করতে লাগলেন কিষণগোপাল। শ্যাম সিংয়ের মত সাধারণ মানুষের চিন্তা—কার আলোতে কে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এ প্রশ্নের উত্তর পৃথিবী আজও দিতে পারে নি।

সমাপ্ত

বকুলগন্ধ

জগদীশ মোদক

ও নির্মল এল। বিকেলের রৌদ্রটা যখন একটু স্তিমিত হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় ও এল। তার আগে বীথি ফিরেছে। ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে ক্লান্তিটুকু দূর করছে।

আজ ফিরতে তার একটু দেরিই হয়েছে। স্কুলের পর আজ নীলিমা তাকে ওদের বাড়ি টেনে নিয়ে গেল। সেখানেই বেশ দেরি হয়ে গেল। তারপর সময় আর এক যন্ত্রণা। বেলা একটু পড়ে এলে বাসায় যে কী দারুণ ভিড় হয় তা তো নীলিমা বোঝে শ্যামবাজার থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত সারাটা পথ বীথিকে ঠায় দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে। তাই কি শুধু থাকার কষ্ট—ভিড়ের চাপে বীথির যেন দম বন্ধ হবার মত অবস্থা হয়েছিল।

তাই বীথি আজ বাড়িতে এসেই ক্লান্তিতে দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে। শাড়িটাও পাল্টায় নি।

বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার পর তন্দ্রার মত একটা ক্লান্তিকর আমেজ যখন তার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছিল, ঠিক সেই সময় নির্মল এল।

দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে বীথিকে শুয়ে থাকতে দেখে নির্মল বলল, এ কি, এই অসময়ে শুয়ে আছ যে!

এমনই।—আড়মোড়া ভেঙে উঠতে উঠতে বীথি জবাব দিল। তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

না, এমনই নয়।—নির্মল যেন কথাটা সহজে বিশ্বাস করতে চাইল না। বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে যেন আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে?
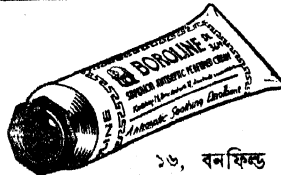
ও কিছু নয়।—বলে বীথি আলনা থেকে তোয়ালে আর শাড়িটা নিয়ে কাঁধে ফেলল। তারপর নির্মলের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল, একটু বসুন। আমি আসছি—কেমন?

বীথির বলার ভঙ্গীতে নির্মলও একটু মুখ টিপে হাসল।

বীথি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্মল চুপচাপ বসে রইল। বীথির হাসি এবং কথা বলার ভঙ্গীটা যেন তাকে কিছুক্ষণ অভিভূত করে রাখল।

ইদানীং বীথির আকর্ষণ তার কাছে বড়ই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিদিনের দেখাশোনা আলাপ-অন্তরঙ্গতাই এই আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে। বীথিকে ছাড়া যেন কিছু ভাবতেই পারছে না।

কিন্তু আজ নির্মলের মনে একটা ঝড় উঠেছে। তাকে হয়তো আবার কলকাতা ছেড়ে ডালটনগঞ্জেই ফিরে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষের ওপর রাগ করে সেখানকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মাস দুই আগে নির্মল কলকাতায় চলে এসেছিল। কর্তৃপক্ষ এখন আবার তাকে অনুরোধ করছে চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্যে। মাও তাকে যেতে বলছেন। কিন্তু এই বীথির আকর্ষণই আজ তাকে বড় বিচলিত করে তুলেছে। কিছু স্থির করতে পারছে না। বড় সংকটে পড়েছে। নির্মল ভাবল, আজই এর একটা সমাধান করবে। আর বেশীদিন এমনই দোটানায় পড়ে থাকা যাবে না।

বড় দেরি হয়ে গেল!

বীথির গলার স্বরে নির্মলের চমক ভাঙল। নির্মল তাকিয়ে দেখল, বীথির এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে একটি প্লেটে কিছু খাবার।

আচ্ছা, তোমার রোজ এ সব কি কাণ্ড বল তো!—নির্মল আপত্তির সুরে বলল।

কী আবার। নিন, খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি। তা না হলে চা-টা আবার জুড়িয়ে যাবে।

টিপয়ের ওপর চায়ের কাপ আর প্লেটটা রেখে বীথি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই আবার ফিরে এল নিজের জন্যে এক কাপ চা নিয়ে। একটু দূরে খাটের বাজুটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে চা খেতে লাগল।

চা খেতে খেতে নির্মল ফিরে ফিরে বীথিকে দেখতে লাগল। ওকে যেন এখন বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখে-মুখে এখন আর একটুও ক্লান্তির ছিটেফোঁটা নেই। কিছুক্ষণ আগেই গা ধুয়েছে। সাবানের মিষ্টি গন্ধটা যেন এখনও গায়ে লেগে রয়েছে। প্রসাধন-সারা মুখে এখন বেশ একটা ঢলঢল লাবণ্য। আর ওর কমনীয় চেহারার সঙ্গে আকাশী রঙের শাড়িটারও যেন অদ্ভুত সামঞ্জস্য। বীথির এই রূপটা নির্মলের চোখে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিল।

আপনার চাকরির কি ঠিক হল?—চা খেতে খেতে গ্রীবা হেলিয়ে বীথি প্রশ্ন করল।

শেষ পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক করলুম।—শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে নির্মল বলল, কিন্তু—

আরও কী যেন বলতে গিয়ে নির্মল থেমে গেল।

কিন্তু কী?—বীথি জিজ্ঞাসু চোখে নির্মলের দিকে তাকাল।

নির্মল ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, কিন্তু তোমায় ছেড়ে যাই কী করে। এ ভাবে যেতে যে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

নির্মলের কথা শুনে বীথি একটু হাসল। বড় করুণ সে হাসি। বিকেলের ম্লান আলোর মতই সে হাসি বীথির চোখেমুখে লেগে রইল।

নির্মল এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বীথির দিকে এগিয়ে এসে বলল, তুমি অমন চুপ করে রইলে কেন বীথি? তুমি কি আমার মনের কথা বোঝ না? বল—জবাব দাও। আমি যে তোমায় আরও কাছে পেতে চাই। একান্ত আপন করে নিতে চাই।

প্রস্তাবটা যদিও অপ্রত্যাশিত নয়, তবু বীথি যেন একটু চমকে উঠল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। মনে হল যেন কণ্ঠনালিটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে কাঁপা কাঁপা গলায় কোন রকমে বলল, তা কেমন করে হয়!

একটা আবেগে নির্মল তার হাতটা চেপে ধরে বলল, হয় বীথি—তুমি ইচ্ছে করলেই হয়।

এবার বীথি যেন একটা কঠিন সমস্যায় পড়ল। এর কী জবাব দেবে!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে সে বলল, আমায় ় ভাববার সময় দিন।

বেশ, তোমায় সময় দিলুম। কিন্তু মাত্র এই একটি । কাল সকালেই আমি আসছি। তখনই তোমার ং শুনব।—বলে নির্মল বেরিয়ে গেল।

বীথি ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে সাতপাঁচ ভাবতে ।

সন্ধ্যে গেল, রাত হল, কিন্তু ওর ভাবনার বুঝি আর নেই। আজ যেন ও একটা কঠিন সমস্যায় পড়েছে। সমস্যায় বুঝি জীবনে আর কখনও পড়ে নি। রাত র হল। তবু তার চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে তে থাকে—এই বৈধব্যজীবনের নিঃসঙ্গতাকে মেনে ়, না, ফুলে-ফলে-ভরা একটি স্বপ্নময় ভবিষ্যৎকে রচনা ব!

হ্যাঁ, নিজের ভবিষ্যৎ তো সে নিজেই গড়ে তুলতে পারে। ই ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের সুখ- । শুধু নিজের নয়, নির্মলেরও ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ তার হাতে। তাকে পেলে নির্মলের জীবন সুখ- ন্দতে ভরে ওঠে, না পেলে দুর্বিষহ হয়। এ কথা তো ল আজ স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে।

অবশ্য অনেকদিন আগেই বীথি ব্যাপারটা জানতে রছে। জেনেছে নির্মলের আচরণে, তার চোখের ায়। আর জেনে অবধি আশঙ্কায় তার বুকটা দুরু কেঁপে উঠেছে।

তবু বীথি নিজেকে গুটিয়ে নেয় নি। নিতে পারে নি। লের এই মিষ্টি ব্যবহার আর তার চোখের মোহময়তার নে নিজেকে মেলে ধরেছে। ভাল লেগেছে। একটা । আবেশে সমস্ত হৃদয় বিগলিত হয়ে গেছে।

বীথির স্বামী মণিময়ের বন্ধু এই নির্মল। মণিময়ের র পর যখন চারদিকে কালো যবনিকা নেমে এসেছে, নহীন জীবনে বেঁচে থাকার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছে শোকেদুঃখে জীবন জর্জরিত—সেই দুঃসময়ে বিচলিত সবার আগে ছুটে এসেছিল এই নির্মল। খবর ওয়া মাত্র সুদূর কর্মস্থান থেকে সে ছুটে এসেছিল। কদিনের ছুটির ব্যবস্থা করে ওর মাকেও সঙ্গে করে এনেছিল। যদিও দর্জিপাড়ায় ওদের নিজেদের বাড়ি আছে তবু কটা দিন ওরা এই বাড়িতেই ছিল। সেই কদিনে ওরা এক গভীর আন্তরিকতায় বীথিকে আপন করে নিয়েছিল। নির্মলের মা সুনলিনী দেবীও বীথিকে বড় স্নেহ করতেন। মণিময়ের শোকে বীথি যদি কখনও কাঁদত তখন তিনি গভীর স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিতেন—সান্ত্বনা দিতেন। কটা দিন সান্ত্বনায় আলাপে অন্তরঙ্গতায় বীথির বৈধব্যজীবনের দুঃখকষ্টকে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তারপর নির্মলের ছুটি ফুরলে যখন যাওয়ার তাগিদ পড়ল তখন বীথিকে ফেলে যাওয়াই তাঁদের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নির্মল বললে—চলুন, আমাদের সঙ্গে ডাল্টনগঞ্জে চলুন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে এলে মনটা হালকা হবে, শরীরটাও সেরে উঠবে।

বীথি প্রথমে কোনও জবাব দিতে পারে নি। একটু ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু সুনলিনী দেবীও যখন যাবার জন্যে বার বার বলতে লাগলেন তখন বীথি রাজী হল। ওদের সঙ্গে বীথি ডাল্টনগঞ্জে গেল।

সেই ডাল্টনগঞ্জে যাওয়াটাই বুঝি বীথির জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াল।

প্রায় দু মাস বীথি ওখানে ছিল। বেশ ছিল দুটি মাস। জায়গাটাও যেন বড় ভাল লেগে গিয়েছিল বীথির কাছে। শহরের প্রান্তে মনোরম পরিবেশে ছিল নির্মলের বাংলোটি। মা আর ছেলের সুখের সংসার। দু মাসে সেই সুখের সংসারের মাধুর্য যেন বীথির মনকেও স্পর্শ করেছিল। বেশ ছিল দুটি মাস। এক একদিন মা আর ছেলের ভেতর যখন কপট কলহ হত তখন বীথিও সে কলহ উপভোগ করত। কোনও কোনও দিন সুনলিনী দেবীর পক্ষ নিয়ে সেও নির্মলকে একটু রাগাবার চেষ্টা করত।

কোনদিন হয়তো তারা তিনজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত। কোনদিন বা সান্ধ্যভ্রমণে। কোন কারণে সুনলিনী দেবী বেরুতে না পারলে সেদিন শুধু সে আর নির্মল যেত। এমনি কতদিন তারা দুজনে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে, মেলামেশা করেছে, অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বেতের চেয়ারে দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করেছে। তাতে সুনলিনী দেবী কোনদিন কিছু মনে করেন নি। এসব ব্যাপারে তাঁর মনটা বড় উদার ছিল।

এই অবাধ মেলামেশার ভেতর দিয়েই দুটি হৃদয় যেন কোন্ অজানুতে পরস্পরের একান্ত সন্নিহিত হয়ে এসেছে। বীথি উপলব্ধি করেছে, কিন্তু তবু কেন যেন নিজেকে গুটিয়ে নেয় নি। তার প্রাণোচ্ছলতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, প্রাণোচ্ছলতা আছে বটে নির্মলের। এমনটা বীথি অন্য কোনও পুরুষের ভেতর দেখে নি। প্রাণের প্রবাহ অবশ্য সকলের ভেতরেই আছে। মণিময়ের মধ্যে কি ছিল না? ছিল। তবে মণিময়ের প্রাণে ছিল শীতের শীর্ণ স্রোতোধারার কাচস্বচ্ছ জলের তিরতিরে প্রবাহ। আর নির্মলের প্রাণের প্রবাহে যেন বর্ষার খর নদীর উচ্ছলতা। ঢেউগুলো উচ্ছ্বাসে ভেঙে ভেঙে পড়ে। জলরাশিকে ফেনায়িত করে রাখে।

মণিময়ে নির্মলে প্রভেদ এইটুকু। তবু বীথির কাছে নির্মলের চরিত্রটা যেন বড়ই অনাস্বাদিত।

তাই বীথি ভাবছে, নিজের প্রাণে যে উচ্ছলতা মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাকে নির্মলের প্রাণের স্রোতোধারায় মিশিয়ে দেবে, না, এই বৈধব্যজীবনের নিঃসঙ্গতাকে মেনে নেবে?

আজ এই রাতের ভেতরেই তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাল সকালেই তো নির্মল আসবে—বীথিকে জবাব দিতে হবে।

তাই বীথির চোখে আজ ঘুম নেই। মনের মধ্যে নানা সংশয়, নানা দ্বিধা। সহজে কিছু স্থির করতে পারছে না।

প্রায় সারারাত ধরে নানারকম ভেবেচিন্তে বীথি শেষ পর্যন্ত স্থির করল, না, সে নির্মলকে বিয়েই করবে। এই একাকীত্ব সে সহ্য করতে পারবে না। পারবে না যৌবনের জ্বালা বুকের মধ্যে পুষে রাখতে।

মন থেকে সব সংশয় সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বীথি তার সঙ্কল্পে অটুট হয়ে রইল। মনটা হাল্কা হয়ে যেতে শেষ রাতে তার মনে একটা স্বপ্ন নেমে এল। সেই স্বপ্নঘোরে বীথি ভাবতে লাগল:

...সে আর নির্মল ঘর বাঁধবে। সুখের ঘর। ডাল্টনগঞ্জের চাকরিটা নির্মল হয়তো আবার পেয়ে যাবে। সে-চাকরি যদি পায় তবে সেই সুন্দর বাংলোটিও নিশ্চয় পাবে—যে বাংলোয় বীথি দুটো মাস কাটিয়ে [illegible]। যে বাংলোর চারপাশ ঘিরে ছিল শুধু মর[illegible] ফুলের বাহার। সেই বাংলোর জীবনে খুব [illegible] হয়তো পাখির কাকলিতে বীথির ঘুম ভাঙবে। ভোরে উঠে বীথি সেই ফুলবাগানে পায়চারি করবে, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মাখবে। নিজেই ফুলগাছগুলোর পরিচর্যা করবে। তারপর একসময় আবার শোবার ঘরে ঢুকবে। হয়তো দেখবে তখনও নির্মল অকাতরে ঘুমো[illegible]। বীথি তাকে ডাকবে। ডেকে ডেকে যখন ঘুম ভাঙা[illegible]রবে না তখন তার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি [illegible]বে; নির্মলের কানে বা নাকের ভেতর কিছু একটা [illegible] সুড়সুড়ি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু পা[illegible] পারবে কি! তার আগেই হয়তো নির্মলের বজ্রমু[illegible] ভেতর তার হাতটা ধরা পড়বে। তারপর হয়তো এক[illegible] আকাঙ্ক্ষিত নিষ্পেষণে তাকে বিপর্যস্ত হতে হবে। তার[illegible] আসবে চায়ের পর্ব। সকালে চায়ের পেয়ালা নিয়ে দুজ[illegible] মুখোমুখি বসে গল্প করবে। তারপর নির্মল এক[illegible] কাজে বেরিয়ে পড়বে। এরপর দীর্ঘ সময়ের একাকী[illegible] মুহূর্তগুলো যেন আর কাটতে চাইবে না। তবে ম[illegible] যা দিতে পারে নি, নির্মল যদি তা দিতে পারে তবে তাকে নিয়ে অলস মুহূর্তগুলো মন্দ কাটবে না। তার হাসি-কান্না-দুষ্টুমিতে হয়তো সারা বাড়িটা মুখর হয়ে থাকবে। তা না হলে অলস দুপুরগুলো ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক শুনেই কাটবে।...তারপর আসবে বিকেল। মনোরম বিকেল। লনের ওপর গাছের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে বিলম্বিত হবে। তারপর ক্রমে মিলিয়ে যাবে সবুজ ঘাসের বুকে। শেষ বেলার প্রকৃতিতে যখন লজ্জারুণ গালের ছোপ ধরবে তখন সেই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বীথির নিজেকেও বাসকসজ্জায় সাজিয়ে নিতে ইচ্ছে হবে। একটি দামী সাবান দিয়ে বীথি গা ধোবে—যে সাবানের গন্ধ বেশ কয়েক ঘণ্টা দেহকে সুবাসিত করে রাখবে। দেহের সেই গন্ধে বীথির নিজের মনেও যেমন স্নিগ্ধতা আসবে, অন্যকেও তেমনই স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেবে। তারপর প্রসাধন সেরে বীথি এসে দাঁড়াবে বাংলোর বারান্দায়—এক অপরূপ ভঙ্গী নিয়ে—একজনের প্রতীক্ষায়। শেষবিকেলে কনে-দেখা-

। নির্মল এসে তাকে দেখবে। দেখে মুগ্ধ হবে। দেহের স্নিগ্ধ সুবাসে চেতনা আবেশে বিহ্বল াবে। এরপর আসবে মুখোমুখি বসে চা খাওয়ার চা শেষ হলেও গল্প তাদের ফুরবে না। লনের বেতের চেয়ারে, কোনদিন বা নরম ঘাসের ওপর ন্টার পর ঘণ্টা গল্পে মেতে থাকবে। সময় তখন চঞ্চলা স্রোতস্বিনী নয়। যেন ঘন ছায়ায় ঘেরা শান্ত কুর। কালো নিটোল জলের বুকে এতটুকু কাঁপন শুধু মাঝে মাঝে দু-একটি ঝরাপাতা পড়ে ক্রম-ী বৃত্ত আঁকার মৃদু কাঁপন। বিকেলের এই শান্ত গুলিতে মাঝে মাঝে বলা দু-একটি কথা এমনই বৃত্ত র কাঁপন তুলবে বীথির বুকে।

ীথি আর ভাবতে পারছে না। তার চোখে আস্তে ক্লান্তি নেমে আসছে। ক্লান্তিতে তার চোখ দুটি জড়িয়ে আসছে তেমনই জড়িয়ে যাচ্ছে তার াগুলো। তারপর একসময় সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে —একটা গাঢ় নিদ্রায়।

সকালে বুঝি অদ্ভুত বাতাসটাই গায়ে লেগে ঘুম ভেঙে থাকবে। ঘুম ভাঙার আগে তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনাতে বীথি যেন এই বাতাসটাই অনুভব করছিল। বাইরে গাছের পাতাতেও যেন একটা অদ্ভুত মুখরতা শুনতে পাচ্ছিল। তাই ঘুমঘোরে সে ভাবছিল আজকে বাতাসটা হঠাৎ এমন উতলা হয়ে উঠল কেন! তবে কি বসন্ত এসে গেছে! তা আসবে বইকি—মার্চ মাস যখন এসে গেল।

ঘুম থেকে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নতুন বসন্তের এই বাতাসটা খানিকক্ষণ গায়ে লাগানোর ইচ্ছে ছিল বীথির, কিন্তু বাইরে রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ নির্মলের আসবার কথা আছে। এখনই হয়তো সে এসে পড়বে। সহসা বীথির মন একটা পুলকে ভরে উঠল। গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দরজার খিল খুলে সে বাইরে বেরুল। আর বাইরে বেরিয়ে উঠোনের বকুল গাছটায় চোখ পড়ামাত্রই সে অবাক হয়ে গেল।

কী আশ্চর্য, বকুল গাছটায় ফুল ফুটেছে! অজস্র ফুলে ছেয়ে গেছে ডালপালা!

বীথি অবাকচোখে বকুলগাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী যে হল—তার দু চোখ বেয়ে হঠাৎ অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

মনে পড়ে গেল, দশ বছর আগে এক বর্ষার বিকেলে তারা দুজন এক স্বপ্ন নিয়ে এই বকুলগাছটাকে পুঁতেছিল।

বকুলের গন্ধ মণিময়ের কাছে খুব প্রিয় ছিল। বকুল ফোটার মরসুমে সে প্রতিদিন কোত্থেকে পকেটভর্তি বকুল ফুল নিয়ে আসত। তারপর সেই ফুলগুলিকে একটা কাচের প্লেটে করে ঘরের টেবিলের ওপর সযত্নে রেখে দিত। একটা স্নিগ্ধ গন্ধে ঘরের বাতাস আমোদিত হয়ে থাকত। গন্ধটা বীথির কাছেও খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে মণিময়ের যদি ফুল আনায় ভুল হত তখন বীথিই তাকে মনে করিয়ে দিত।

তারপর একদিন মণিময় কোত্থেকে এক বকুলচারা এনে হাজির। বকুলচারাটা দেখে বীথি খুব খুশী হয়েছিল।

সেই বকুলগাছ দুজনের আনন্দ আর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। গাছটার প্রতি দুজনেরই অপরিসীম যত্ন। মণিময় বলত—জান বীথি, এই গাছ যখন বড় হয়ে ছায়া দেবে তখন এর সুরভিত ছায়ায় ডেকচেয়ার পেতে আমরা বসে গল্প করব, চা খাব, কোনদিন বা কাব্য পড়ে পরস্পরকে শোনাব। বিকেলের ভীরু বাতাসে টুপটাপ করে দু-একটি বকুল ঝরে পড়বে আর মনে হবে সময়ের বৃন্ত থেকে এক-একটি মুহূর্ত যেন এই বকুলের মতই ঝরে পড়ছে।

স্বপ্ন দেখত বীথিও। সে ভাবত—এই গাছ যখন বড় হবে, অজস্র ফুলে এর ডালপালা ছেয়ে যাবে, তখন সারা বাড়িটা বকুলের গন্ধে না জানি কেমন ভুরভুর করবে। এক একদিন হয়তো বকুলের গন্ধে ঘুম আসবে না, সারারাত ফুলের গন্ধ বুকে নিয়ে জেগে থাকবে। চৈত্র-দুপুরের বাউল বাতাস যখন বকুলের গন্ধ বুকে নিয়ে সারা বাড়ি মাতামাতি করবে তখন কাজ করতে করতে হয়তো তার মনটা হঠাৎ উন্মনা হয়ে যাবে।···

কিন্তু গাছে আর ফুল ধরে কই। দেখতে দেখতে ডালপালা ছেয়ে গাছ বেশ বড় হয়ে উঠেছে। মণিময় দু বেলা পরিচর্যা করেছে আর ভেবেছে, এইবার হয়তো গাছটায় ফুল ধরবে। এই ভেবে একটা ব্যাকুল প্রত্যাশায় থেকেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সে হতাশ হয়েছে। গাছে আর ফুল ধরে নি।

গতবার মৃত্যুশয্যায় শুয়েও মণিময় একবার গাছটার কথা স্মরণ করেছে। ম্লান হেসে বীথিকে একদিন বলেছে—কী আশ্চর্য বীথি, এবারেও গাছটায় ফুল ধরল না!

শিয়রে বসে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বীথি সান্ত্বনার সুরে বলেছে—ফুটবে বইকি। সময় হলে নিশ্চয় ফুটবে।

কিন্তু সেই সময়টি এমনই দিনে এল যেদিন আর মণিময় নেই। আজ বকুলগাছটা কী নিষ্ঠুরভাবেই না পরিহাস করছে! গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বীথির চোখ বেয়ে তাই জল এল।

বীথি সেই ছলছলে চোখেই বকুলগাছটার দিকে তাকিয়ে রইল।

নতুন বসন্তে হুহু করে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে সমস্ত গাছটা মুখরিত হয়ে উঠেছে। বকুলের গন্ধ বুকে নিয়ে অশান্ত বাতাস যেন সারা বাড়িময় ছুটোছুটি করছে। বাতাসে দু-একটা ফুলও মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে। উঠোনে বেশ কিছু ঝরা ফুল পড়ে আছে। আর সেই ঝরা ফুলের মধু খাওয়ার লোভে কয়েকটি মৌমাছিও কোত্থেকে এসে জুটেছে।

বীথি দেখছে—সব কিছু অবাক চোখে দেখছে। আজ বাড়িটায় যেন একটা নতুন হাওয়া, নতুন পরিবেশ। বীথির মনে হচ্ছে, মণিময়ের সেই হাসিটা যেন আজ বকুলের শাখায় শাখায় খুশীর বাতাস হয়ে দেখা দিয়েছে। এই গন্ধটা যেন তার সেই সুন্দর মন আর স্নিগ্ধ ছায়াটা যেন তার সেই নিবিড় সান্নিধ্য।

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে গেল বীথি। উঠোনের মাঝে বকুলগাছটার ছায়ায় এসে বসল। নিবিড় ছায়ায় বসে আবেশে বীথির চোখ দুটো বুজে এল। বীথি ভাবল, এই উতলা বাতাসে আজ সারাক্ষণ এই সুরভিত ছায়ায় বসে কাটিয়ে দেবে।

নির্মল যখন এল তখনও বীথি বকুলের ছায়ায় বসে।

নির্মল এসে দরজার কড়া নাড়ল। বীথির নাম ধরে ডাকলও কয়েকবার। বীথি কি শুনতে পায় নি! পেয়েছে। কিন্তু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতে পারছে না। উতলা বাতাসে আর বকুলের গন্ধে তার চেতনায় যেন কেমন একটা রিমঝিম আবেশ নেমে এসেছে। কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে সে। আচ্ছন্নতায় গলার স্বর বুজে এসেছে। ওঠার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে।

নির্মল ডাকল। আরও কয়েকবার ডাকল। অবশেষে ফিরে গেল।

বীথি শুনতে পেল, নির্মলের জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শিখণ্ডী

শীতাংশু মৈত্র

[অফিস ঘর। টিফিনের সময়। কোনও চেয়ারে
। বসে নেই।

ঘরে সবশুদ্ধ চারখানা চেয়ার এবং চারখানা টেবিল।
টেবিলেই ফাইল এবং কাগজপত্র স্তূপীকৃত। সেই
যে কোনও কালে আয়তনে কমবে, দেখে এমন মনে
না।

মাথার ওপর একখানা ফ্যান—এখন বন্ধ। একটি
লে একখানা ফাইল এমনভাবে খোলা রয়েছে যে,
ত বাকি থাকে না, এই টেবিলের অধিকারীর ঘাড়ে
ই এখন চেপে বসেছেন।

সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন সাহেবী পোশাকপরা এক
ক। তাঁর চোখেমুখে শুধু আশঙ্কা এবং সন্দেহ। ঘরে
ই তিনি চারিদিকে তাকিয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে নিলেন
কেউ কোথাও নেই।

চারটি টেবিলে চারটি কাঁচের গেলাস, তার মধ্যে
টিতে জল ভরাই ছিল। সাহেব সেই গেলাসের জল
শেষে পান করতে করতে হাতঘড়ি দেখে যেন চমকে
লেন। গেলাস সাবধানে সেইখানেই রেখে দিয়ে
য়ার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে যে টেবিলে একখানি
ল খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল সেইখানির সামনে গিয়ে,
রে বসে নিবিষ্টচিত্তে ফাইলের পাতা উলটে উলটে
যেন খুঁজতে লাগলেন। একখানা কাগজ সাগ্রহে
তে শুরু করে একটু পরেই বিরক্তিভরে সেখানা
টালেন। সমস্ত ফাইলখানা খুঁজেও বাঞ্ছিত কাগজখানি
পেয়ে অন্যান্য ফাইল স্তূপ থেকে নামিয়ে দেখতে
কন একে একে, আর হাতঘড়ির দিকে তাকান।

মুখের বিরক্তির ভাব ত্রাসে পরিণত হয়। দেরাজ
টান দেন উদ্বেগের আতিশয্যে। দেরাজ বেরিয়ে
তেই চোখে পড়ে অনেক কাগজের টুকরো। ক্ষিপ্র
ত সেগুলি তুলে তুলে দেখে নিরাশ হয়ে অন্য দেরাজটি
লেন। সেটিতে অন্বেষণ করেও নিরাশ হন।

নিরুপায় চোখে তাকান আবার ঘরের চারিদিকে;
দাঁড়ান দুই কোমরে হাত দিয়ে ক্ষণেকের জন্য। ঠোঁটের
উপর আঙুলের টোকা দিতে দিতে কর্তব্য-নির্ধারণের
চেষ্টা করতে করতে কিসের শব্দে চমকে উঠে বাইরের
দিকে তাকিয়ে, আশ্বস্ত হয়ে, কপালের ঘাম মোছেন
ক্যালিকোর রেশমী রুমাল দিয়ে।

হঠাৎ চোখে পড়ে টেবিলের ওপরের বনাত এক
জায়গায় ছেঁড়া এবং সেই ছিন্ন অংশের সন্নিহিত স্থানটি
ভেতর থেকে কেমন একটু উঁচু হয়ে উঠেছে।

শিকারী পাখির মত ছোঁ মেরে বনাতের তলা থেকে
বের করে আনেন একটি ছোট পত্রখণ্ড। ব্যগ্র আঙুলে
পাট খুলে পড়তে পড়তে তাঁর মুখ আনন্দে ঝলমল করে
ওঠে। তাড়াতাড়ি সেখানা প্যাণ্টের পকেটে পুরে তিনি
ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

*   *   *

টিফিনের অবকাশ-শেষে চারজন কেরানী ঘরে প্রবেশ
করে যে যাঁর টেবিলে বসেন। একজন বসবার আগে
পাখাটি চালিয়ে দেন। অনুসন্ধানে বিপর্যস্ত টেবিলের
কাগজপত্র, টেবিলের অধিকারী ভাল করে চেয়ারে বসবার
আগেই পাখার হাওয়ায় উড়ে ছত্রাকার হয়ে যেতে শুরু
করতেই তিনি হাঁ হাঁ করে গিয়ে পাখাটি বন্ধ করে দিয়ে
কাগজপত্রগুলি কুড়িয়ে টেবিলে ফিরে এসে কেমন যেন
সন্দিগ্ধ চোখে তাকান ফাইলপত্রের দিকে। হঠাৎ
বনাতের সেই ছিন্ন অংশের তলায় হাত ঢুকিয়ে অনেক
দূর পর্যন্ত হাত চালিয়ে আঁতিপাঁতি করে খোঁজেন। উড়ে
কোথাও গিয়েছে মনে করে টেবিল ইত্যাদির তলায়
আবার অনুসন্ধান করেন। না পেয়ে হতাশ হয়ে দুই
হাতে মাথা রেখে চেয়ারে এসে বসেন। বাকি তিনজন
কৌতূহলে তাকান তাঁর দিকে। কিন্তু তাঁরা কিছু
বলবার আগেই উনি একটি একটি করে ফাইল নামিয়ে

দেখতে শুরু করেন। মেঝেতে জমে ফাইলের স্তূপ। ক্লান্ত হয়ে তিনি বলে ওঠেন]

মল্লিক। কালকেই বুঝেছিলুম। এখন উপায়!

চক্রবর্তী। ওই ফাইলের গন্ধমাদন কাঁধে করে নাচ। বলি, হল কি?

ঘোষ। মল্লিক তোমাকে বলব আর কি!

বোস। এ দিকে যে গরমে সেদ্ধ হয়ে গেলুম, বাবা। ও মল্লিক!

[মল্লিক পাখা খুলে দিয়ে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর বসবার ভঙ্গী দেখে সকলেই অঘটন আশংকা করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন কলম গুটিয়ে]

মল্লিক। (মাথা তুলে এঁদের দিকে তাকিয়ে) যে হেলে ধরতে পারে না তার আবার কেউটে ধরতে যাওয়া কেন? বেশ হয়েছে।

কিন্তু উপায়!

চক্রবর্তী। না হয় আমাদের বললেই পেটের কথাটা। ঢাকে ঢোলে কাঠি, কথা বলতে মানা।

মল্লিক। ঢাকে-ঢোলে যখন কাঠি তখন আমার বলিটা সেরে ফেল। এই বুড়ো বয়েসে রোখ দেখাতে গিয়ে পথে বসলুম হে! একেবারে পথে!

ঘোষ। সেক্রেটারি সাহেবের গোপন কিছু হারিয়েছ এই তো?

মল্লিক। (লাফিয়ে উঠে) কি করে জানলে? বল বল, কি করে জানলে?

ঘোষ। তোমার হা-হুতাশ দেখে। তা এমন কি হারালে? ও সবের মধ্যে যাও কেন?

মল্লিক। (একেবারে দাঁত খিঁচিয়ে) যাও কেন মানে? না গিয়ে উপায়? এগলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছলেও ভেড়ের ভেড়ে। যখন দেখল যে এনকোয়ারির রিপোর্ট অন্য রকম তখন দরখাস্তের ওপর নিজে কিছু না লিখে আমাকে লিখে পাঠালে যে মহিলাটি বোনাফাইড রেফিউজি—এনকোয়ারির রিপোর্ট ভুল। অতএব ওই রিপোর্ট বাতিল করে দিতে হবে এবং স্পেশ্যাল লোন পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে ওই মহিলাটির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুলের জন্যে।

আমার কি? আমি হুকুম মত সব করে দিলুম। কিন্তু নিজের আখেরের কথা ভেবে ওই পার্সন্যাল চিঠিটি রেখে দিলুম। লোন হয়ে গেল। মহিলাটি যেদিন লোনের কাগজপত্র নিতে এলেন সেদিন আমি তো তাজ্জব। খুলনা থেকে আরম্ভ করে চাটগাঁ পর্যন্ত কোন জায়গার টানই তাঁর কথায় নেই। 'গেলুম' বলেন, এবং কইলকাতা বা ক্যালকাটা কিছুই না বলে কলকাতাই বলে থাকেন। খাসা দেখতে। পরিপাটি ব্যবহার। আমার আর কি বল? সেক্রেটারি থেকে উপমন্ত্রী সবাই যখন দিতে চায় তখন আমার কি? উনি না পেলে তো আর আমি পাচ্ছি না যে বাগড়া দিতে যাব। মহিলাটি হাসিমুখে আমায় নমস্কার করে সেক্রেটারির ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ভাবলুম চুকে গেল। এমন তো কতই চুকেছে। সত্যিকার রেফিউজি আর কজন লোন পেয়েছে? ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি দরকার। আর ঘামালে তো ওঁর (সেক্রেটারির ঘরের দিকে দেখিয়ে) কোপ থেকে রেহাই পাব না। ভাবলুম বুড়ো বয়েসে আর কটা দিন চোখ বুজে কাটিয়ে দিই।

কিন্তু বিপদ বাধাল ওই সাপ্তাহিকখানা (একখানা সাপ্তাহিকের নাম ইঙ্গিত করলেন)। নাম, ধাম, টাকার অঙ্ক, মায় সেক্রেটারির চিঠির পর্যন্ত উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত বললে যে ওই মহিলাটি অন্যান্য ছদ্মনামে আরও কয়েকবার টাকা নিয়েছেন—উনি পশ্চিমবঙ্গের অমুক জেলার অমুক শহরের অমুকের বিধবা এবং ওঁর কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুল নেই।

তখন কেন্দ্রের লোক কলকাতায়। এনকোয়ারির হুকুম হল। জানতে চাওয়া হল কেন আমি আইনত দণ্ডনীয় হব না। আমি সেক্রেটারির চিঠির উল্লেখ করে উত্তর দিলুম। উত্তর পাঠিয়ে দিয়ে ফাইলটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বাইরে চা খেতে গিয়েছি। এর মধ্যেই চিঠি লোপাট। এখন আমার উপায়!

ঘোষ। তা মরতে ওই রাক্ষসীর প্রাণ চিঠিখানা টেবিলে ফেলে গিয়েছিলে কেন? মতিচ্ছন্ন হয়েছিল?

মল্লিক। মতিচ্ছন্নই বটে! নইলে—। এখন উপায়? ও তো আমাকে এইবার চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

চক্রবর্তী। তুমি যা বলেছ তাই ধরে থাক। ওরও-প্রাণে ভয় আছে। বলি বাবারও তো বাবা আছে—কি ?

মল্লিক। প্রমাণ করব কি দিয়ে ? আমাকে তো কেউ স্থির বলে ছেড়ে দেবে না।···কি করে বার করলে তো ওখান থেকে ? সব বেয়ারা কটাকে ঘুষ খাইয়ে রে রাখিয়েছিল। (মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাতে) উঃ, স্কাউণ্ড্রেল ! শয়তান ! তোমায় দেখাচ্ছি ! ওই সাপ্তাহিকে তোমার কেলেঙ্কারি আমি সব স করে দিচ্ছি। (দাঁড়িয়ে উঠলেন)

ঘোষ। অত আগুন-ঝাঁপা হও কেন ? কেলেঙ্কারি র কার নেই শুনি ? একজনের কেলেঙ্কারি প্রকাশ লে বাকিরা তাঁকে টেনে ডাঙায় তোলার জন্যেই উঠি-ড় করে লাগবে। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে য়া না।

মল্লিক। তবে কি দাঁড়িয়ে মার খাব ?

কলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে বসে আছেন। বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা। (মল্লিককে) সাহেব সেলাম দিয়া।

[বেয়ারার প্রস্থান]

মল্লিক। তোর সাহেবের নিকুচি করেচে ! (যেতে ত)

চক্রবর্তী। রাগের মাথায় কিছু করে বস না যেন। চা বয়সে চাকরিটি খুইয়ো না।

ঘোষ। খুব সামলে কিন্তু মল্লিক।

মল্লিকের কোট গায়ে দিয়ে প্রস্থান। এঁদের সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন]

মঞ্চ ঘুরে গেল

[সেক্রেটারির ঘর। পদস্থ কর্মচারীর অফিসঘরে খানে যে আসবাব থাকা দরকার সেখানেই সেটি আছে। চাণ্ড কক্ষের চার কোণে চারটি কিউবিকল্, পার্সন্যাল নো, পার্সন্যাল টাইপিস্ট, রিফ্রেশমেণ্ট এবং লাউঞ্জ। ফ্রেশমেণ্ট কিউবিকলের মাথায় লাল আলো জ্বলছে—াৎ সেক্রেটারি এখন ওই ঘরে আছেন, অন্যের প্রবেশ ষেধ। সারা ঘরেই দামী কার্পেট পাতা ঘরে ইলেকট্রিক আলোর মৃদু ঔজ্জ্বল্য, কিন্তু ফিটিংস সব দেয়ালের ভেতর দিয়ে।

একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘরের ঠিক মাঝখানে। তার একদিকে একখানি অতি মূল্যবান মেহগনি কাঠের হাফ-ব্যাক্ড্ কেদারা—ডানলোপিলো দেওয়া। অন্য দিকে খানছয়েক সাধারণ সেগুন কাঠের চেয়ার, কিন্তু সেগুলিও এমন চকচকে যে সাধারণ কাপড়চোপড় পরে বসতে মায়া হয়। মনে হয় চেয়ারখানাই নোংরা হয়ে যাবে।

মল্লিক ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে চেয়ারে বসতে যাবেন এমন সময় রিফ্রেশমেণ্ট থেকে ভারি গলায় আওয়াজ এল : কাম ইন, মল্লিক।

চকিত হয়ে মল্লিক সেই দিকে চললেন।]

মঞ্চ ঘুরে গেল

*　　*　　*

[রিফ্রেশমেণ্ট কিউবিকল্। কিছুক্ষণ আগে যাঁকে কেরানীদের ঘরে একা দেখা গিয়েছিল সেই সেক্রেটারি আর মল্লিক মুখোমুখি উপবিষ্ট। সেক্রেটারি ভোজনরত। মল্লিকের সামনে এক ডিস খাবার। মল্লিক কিন্তু হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে আছেন।]

সেক্রেটারি। কি হে, হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন ? খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। ও যা দেখছ সব বাড়ির তৈরি। খেলে অসুখের কোন ভয় নেই। শ্রীহস্তের তৈরি হে। খেলে ডিসপেপসিয়া সেরে যাবে।

[মল্লিক তবু স্থির হয়ে বসে রইল]

তা হলে বল, দোকান থেকে চপ্ কাটলেট আনিয়ে দিই। আমি খাব আর তুমি বসে দেখবে, সে হবে না।

মল্লিক। তাতে কি হয়েছে সার্ ? আমি তো এখনই জল খেয়ে এলুম।

সেক্রেটারি। সে তো রোজই খাও। আজ না হয় আমার খাতিরে একটু বদলালেই।

মল্লিক। (অতি সন্তর্পণে সিঙাড়ার কোণ ভেঙে মুখে পুরে একটু একটু করে চিবোতে থাকেন, কিন্তু কথা আরম্ভ করার কোন আগ্রহ দেখান না)

সেক্রেটারি। (খেতে খেতে প্রায়ই মল্লিকের অলক্ষিতে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন। কথা বলেন না)

[কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা]

সেক্রেটারি। তুমি যে গতিতে গল্পের কচ্ছপকেও হার মানালে হে! সিঙাড়া গরম গরম খেতে হয়। অমন জুড়িয়ে খাচ্ছ কেন? দাঁতে পোকা আছে নাকি?

মল্লিক। না সার্, আমি গরম খেতে পারি না।

সেক্রেটারি। হুঁ, অনেকে পারে না। আর তুমি এমনিতেই যে ঠাণ্ডা মানুষ! সাত চড়ে রা কাড়ো না। গরম সিঙাড়া তোমার না সওয়াই উচিত। তা এইবার সন্দেশগুলো শেষ কর। চা ঢালব?

মল্লিক। এত কখনও এখন খাওয়া যায়?

সেক্রেটারি। আমি খেলুম কী করে?

মল্লিক। অভ্যাস নেই যে সার্।

সেক্রেটারি। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) অনেক জিনিসই তুমি অভ্যাস না করে খোয়াচ্ছ। এই যেমন তোমাকে টপকে ত্রিগুণা সরকার হেড-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ তুমিই তো সিনিয়ারমোস্ট।

[মল্লিক সেক্রেটারির দিকে তাকান না। কিন্তু আপনা আপনিই তাঁর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কেমন মনোবৈক্লব্যে কাটে। কিছুই ঠিক না করতে পেরে হঠাৎ তিনি 'সার্' বলে ডেকেই লজ্জিত হয়ে আবার সন্দেশে মন দেন। সেক্রেটারি অতি সদয়কণ্ঠে 'এই যে' বলে কিউবিক্‌লের এক কোণ থেকে চায়ের ফ্লাস্ক হাতে করে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে, চা ঢালতে লাগলেন দুটি কাপে]

তুমি একবার মুখ ফুটে আমাকে বলতেও তো পারতে। মানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। এই আজ তোমাকে ডেকেছি বলে কথাটা মনে পড়ল।

[মল্লিককে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলেন]

তোমার সার্ভিসে কোন ব্রেক আছে না কি?

মল্লিক। উইদাউট পে-তে ছ মাস ছুটি ছাড়া আর তো কোন কিছু নেই আমার রেকর্ডে। সরকারের চেয়ে আমি প্রায় এগারো মাসের সিনিয়ার।

সেক্রেটারি। (চোখ কপালে তুলে) বল কী! এ-গা-রো মাস! অথচ সরকার বললে তোমাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট একই সময়ে। আমি অবশ্য কাগজপত্র না দেখে কিছুই রেকমেণ্ড করতুম না।

মল্লিক। (ম্লান হেসে) একই বছরে, এ কথা ঠিক সার্। আমার জানুয়ারিতে ওর ডিসেম্বরে।

সেক্রেটারি। (অত্যন্ত মনোবেদনায়) কত সামান্য কারণে মানুষ মিথ্যে কথা বলে দেখেছ? আশ্চর্য! (উন্মনা হয়ে গেলেন)

[স্তব্ধতা]

অথচ সে মিথ্যে তো ধরা পড়ে যাবে।

[মল্লিক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কথা বলতে গিয়ে গলায় চা বাধিয়ে, বিষম খেলেন। সেক্রেটারি ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মল্লিক সামলে নিয়ে আরও কুণ্ঠিত হয়ে বসলেন চেয়ারে]

এই যেমন দেখ, এই শর্মিলা চৌধুরীর রেফিউজী লোনের ব্যাপারটা। চেপে রাখতে তো পারল না।

[বলে চা খেতে খেতে সিগারেট ধরালেন এবং কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করতে লাগলেন। মল্লিকের মুখের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না বাকি চা কাপে জুড়িয়ে গেল। তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। মল্লিক বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন সেক্রেটারির মুখের দিকে। তারপর বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটলে মল্লিক নিজের অজ্ঞাতেই সেক্রেটারির মুখোৎক্ষিপ্ত ধোঁয়ার চক্রাকারে ঊর্ধ্বগমন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, যেন ওই তাঁর কাজ।]

মিথ্যে কখনও চেপে রাখা যায় না মল্লিক।

[আকস্মিক ও গম্ভীর আওয়াজে চমকে ওঠেন মল্লিক। অভিনয় বলে তো মনে হচ্ছে না! তবে কি উনি সেই অপরাধপ্রমাণক্ষম লিপিখানি সরান নি? সেখানা এমনিই হারিয়েছে! উনি কী অনুতপ্ত? সব স্বীকার করবেন? তাই যদি করেন তবে মল্লিককে ডাকা কেন? স্বীকার করবার আগে মল্লিককে জানাতে চান যে তিনি সত্যিই ওই মহিলার সঙ্গে জুয়াচুরির ব্যবসায়ে অংশীদার নন—শুধু সরল বিশ্বাসে দুঃস্থকে সাহায্য করেছিলেন। মুখ নীচু করে রেখেই চোখ উপরে তুলে মল্লিক সেক্রেটারির

র্বেক্ষণ করার চেষ্টা করেন। সেক্রেটারি সেই মুখ উঁচু করে সিগারেটই খেয়ে যাচ্ছেন।]

াই দেখলুম মল্লিক। অথচ ভাবিও নি যে ওই ্টি, কি যেন নাম—

ল্লিক। শর্মিলা চৌধুরী।

েক্রেটারি। হ্যাঁ, ওই শর্মিলা দেবী, বিবেক জলাঞ্জলি আমাদের ডাহা ঠকাবেন। একবার ভাবলেন না যে চুয়াচুরির ফলে আমরা ভবিষ্যতে প্রত্যেককেই সন্দেহ কত সত্যিকারের বাস্তহারা এর ফলে সাহায্য বাঞ্চত হবে!—ছিঃ ছিঃ!

ক্রটারি উঠে পদচারণা করতে লাগলেন অস্থির গ। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আধ-খাওয়া সিগারেট। নন এসে মল্লিকের চেয়ারের পেছনে, হাত রাখলেন ার পিঠে।

ল্লিক দাঁড়িয়ে উঠতেই তিনি সরে গেলেন ঘরের প্রান্তে—মাথা নীচু করে। মল্লিক দাঁড়িয়েই]

েক্রেটারি। (মল্লিকের একেবারে কাছে এসে, কণ্ঠে) জান মল্লিক, মহিলাটির এত বড় স্পর্ধা যে আজ সকালে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত! কি—উঃ—

ল্লিক। (আগ্রহাতিশয্যে) কী বললেন?

েক্রেটারি। (মল্লিকের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে য়, চোখ বিস্ফারিত করে, হঠাৎ তাঁর দুই কাঁধে দুই রেখে) ঘুষ নিতে—পাঁচ হাজার টাকা! (বলেই য়ে চেয়ারে এসে বসলেন দুই হাতের মধ্যে মাথা)

[মল্লিক একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়]

েক্রেটারি। (অবিশ্বাসের আতিশয্যে) আ-মা-কে তে বললেন! কী করে মহিলাটি ভাবতে পারলেন মি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হব? কী করে? আমার ী তিনি দেখলেন? (হঠাৎ সোজা মল্লিকের দিকে) আচ্ছা, তোমরাও তো আমাকে জান! আমি ্যায়ান্বেষী, দোষ পেলে ছাড়ি না, এ সব ঠিক। কিন্তু এত নীচ যে একটা সাধারণ নষ্ট স্ত্রীলোকের থেকে—উঃ! হাউ কুড সি থিঙ্ক! (মল্লিকের হাত ধরে) বল, বল! কি দেখ তোমরা আমার মধ্যে! তুমি একা কেন, আরও তো অনেকে আছেন। সকলকে ডাক। আজ আমি শুনব, শুনতে চাই, কী আছে আমার মধ্যে যাতে এক ভ্রষ্টা নারী আমার কাছে ঘুষ দেবার প্রস্তাব করতে পারে! ডাক, মল্লিক!

মল্লিক। (আস্তে আস্তে হাত মুক্ত করে নিয়ে) উত্তেজিত হবেন না সার্।

সেক্রেটারি। উত্তেজিত! (বলে উদাস হাসি হাসলেন) এর পরে আর জীবনে উত্তেজনা ঘটাবার মত কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।

[স্তব্ধতায় মল্লিক দিশা হারিয়ে ফেলেন। ব্যাপার কি? চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক সন্ন্যাসী হবে না কি? একেবারে পাপ স্বীকারের মত করে সব বলে যাচ্ছে—এতটুকু ভয়, দ্বিধা করছে না!]

ঘুষ নিতে বলে শর্মিলা চৌধুরী অন্যায় তো কিছু করে নি। সে যে পন্থায় জীবনে দু পয়সা করার সুযোগ পেয়েছে সেই পন্থাতেই আমাকেও দু পয়সা করে নিতে বলেছে। আমাকেও সে যে তারই পথের পথিক ভেবেছে তাতে সে এতটুকু অন্যায় করে নি।

মল্লিক। আপনি আমাকে পার্সন্যাল নোটটা দেবার আগে কি মিসেস চৌধুরীর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুল সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নেন নি সার্?

সেক্রেটারি। কি করে আর নিলুম। আমি তো এইখানে বসেই নোট দিয়েছি আর তুমি তো তারই জোরে কাজ করেছ। আমরা কে আর কবে এনকোয়ারি করি বল? (চেয়ারে এসে বসে, যেন গোপন কথা বলছেন এমনি ঘনিষ্টতার সঙ্গে) এনকোয়ারি করেই বা কি হত? (বলে ড্রয়ার থেকে মন্ত্রীর একখানি ছোট চিঠি বের করে মল্লিকের হাতে দেন)

মল্লিক। (হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে চোখ কপালে তুলে) বলেন কি সার্!

[চিঠিখানি সেক্রেটারির হাতে ফেরত দিলেন]

সেক্রেটারি। বলার কিছু নেই মল্লিক। আমাকে লিখেছেন উনি, আমি লিখেছি তোমাকে আর তুমি দিয়েছ টাকা।

[চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর]

কাকে দোষ দেব মল্লিক? তুমিই বল?

[আবার স্তব্ধতা]

তোমাকে আমি দোষ দিই না, তোমার আর কি উপায় ছিল? বাঁচতে হলে তোমাকে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতেই হবে; দোষ আমি করেওছি। কিন্তু আমি কাকে দোষ দেব মল্লিক? আমরা চাকরি করি মন্ত্রীদের আর মন্ত্রীরা চাকরি দেন। তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। তোমার আমার নাগালের বাইরে এই জনতার গণেশদের শুঁড়ে কে খোঁচা দেবে বল? ফলে যাব আমি। মন্ত্রীও থাকবেন, শর্মিলা চৌধুরীর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুলেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে। মাঝখান থেকে মরব আমরা। (দার্শনিক নির্বেদের সঙ্গে) তবে সেটা নতুন কিছু নয়। মধ্যবর্তীরা চিরদিনই এমনি করে উপরের আর তলার চাপে মরে আসছে এবং মরণ এড়াবার দায়ে তলায় চাপ দিয়ে তলাকার মানুষদেরও এমন চটাচ্ছে যে, কোথাও আর তার দাঁড়াবার জায়গা কিছু থাকছে না। My case will only repeat the story of the middle who are pushed up and down but can never get a footing। জনকল্যাণ রাষ্ট্রের অনেক বলির মধ্যে আমিও একটি সংখ্যা হব আর কি!

[আস্তে আস্তে উঠে টি-পট থেকে চা ঢাললেন দু কাপ—এক কাপ এগিয়ে দিলেন মল্লিকের দিকে।

মল্লিক বিহ্বলতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না কিন্তু এটুকু বুঝছেন যে সেক্রেটারির ঘাড়ে সব দোষ চাপাতে তিনি অন্ততঃ পারেন না। বিবেক বলে একটা জিনিস আছে তো। সেটাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে এখনও মন সরে না। অথচ লোকটা মন্ত্রীকে এক্সপোজ করে দিচ্ছে না কেন?

খুব সহজ উত্তর। মন্ত্রীর চরিত্র সবাই জানে বলে তাঁর আর উদ্ঘাটনের কিছু নেই। তিনি তো ও রকম করবেনই; সামলাতে হবে নীচের লোকেদের। তাঁকে সরাতে গেলে যে জনগণের ভোটাধিকারকে অপমান করা হয়। তাই stricture আসবে সেক্রেটারির ওপর। তিনি প্রতিবাদে মন্ত্রীর চিঠিখানি তুলে ধরলে এই বুড়ো বয়সে নিজেই রেফিউজী হয়ে পড়বেন।

মল্লিক একবার আড়চোখে দেখে নেন সেক্রেটারির মুখ—হতাশায় একেবারে চুপসে গেছে। মল্লিকদের ওপর অনেক অত্যাচারের ফল আজ বুড়ো ভোগ করছে। ভুগুক না।

মল্লিক আবার তাকিয়ে দেখেন ওঁর মুখখানা—ঠিক তেমনি চোপসানো। সেক্রেটারি যে এত অসহায় হয়ে উঠতে পারেন তা মল্লিকের কল্পনাতীত ছিল। যেন একেবারে মল্লিকের পায়ের কাছে লুটোচ্ছেন ভদ্রলোক। পা দুখানা ধরতে যা বাকি।

তা হলে কি চিঠিখানি সত্যিই উনি সরান নি? আবার মল্লিক চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে দেখে নেন সেক্রেটারির মুখখানা। মুখখানা একেবারে কালি হয়ে গেছে। চিঠিখানা তা হলে গেল কোথায়? দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন মল্লিক এবং মেয়েদের ভাবী শ্বশুরদের ঘোল না খাওয়ালেও নিজে অন্ততঃ ঘোল খান নি—আজ কিন্তু পরিষ্কার নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন।

মরুক গে ছাই! তাঁর কি? তাঁকে তো বাঁচতে হবে। আবার তাকান ওঁর মুখপানে। মনে হচ্ছে যেন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠবেন ভদ্রলোক। ৬৭৮০ মল্লিকের সিনিয়রিটি যে আর একজন টপকে যাচ্ছে এ কথাটা মল্লিককে সেক্রেটারি না বললেও তো পারতেন। টোপ দিয়েছেন? দিলেও মল্লিকের তো উপকার বই অপকার হবে না। সেক্রেটারির অতি দীর্ঘশ্বাসে চমকে তাকালেন মল্লিক]

মল্লিক। কিছু কি করা যায় না সার্?

সেক্রেটারি। করা—

মল্লিক। হ্যাঁ, মানে যদি আমি আমার এক্সপ্লানেশনে আপনার চিঠির কথা উল্লেখ না করি।

সেক্রেটারি। তখন তোমার অবস্থা কি হবে?

মল্লিক। আপনি একবার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

সেক্রেটারি। করেছিলুম। তিনি বললেন, এনকোয়ারি তিনি চেপে দেবেন, শুধু তোমাকে ওই এক্সপ্লানেশনটা ফিরিয়ে নিয়ে বলতে হবে যে ওভারসাইট হয়েছে। কিন্তু

তোমাকে সে অনুরোধ করতে পারব না।···তবে একটা গ্যারান্টি আছে। যদি তুমি দেখ কোয়ারি হচ্ছে এবং পরিস্থিতি তোমার বিরুদ্ধে তখন তুমি বিনা সঙ্কোচে আমার চিঠিটা দাখিল পারবে।

: আবার পড়েন সাতহাত জলের তলায়। এখন নি বলেন যে, চিঠিখানা হারিয়েছে তা হলে তাঁর কে সেক্রেটারি একেবারে বেরিয়ে যাবেন। আবার ও বিশ্বাস হচ্ছে না যে চিঠিখানি উনিই সরিয়েছেন। ক এত অভিনয় করতে পারে? এত অনুতাপ, এত দগ্ধানি—সব ভান? অসম্ভব।]

াক। তা হলে সার্ উইথড্রই করি।

ক্রটারি। ভেবে দেখে কর। আমি কিছুই ।

াা কাগজ নিয়ে মল্লিক লিখলেন এবং রি তাঁর ফাইল থেকে মল্লিকের এক্সপ্লানেশন রে তাঁর হাতে দিয়ে, মল্লিকের নোটটা রেখে । তারপর মল্লিক নতুন এক্সপ্লানেশন লেখেন। দেখে সেক্রেটারির হাতে দিলেন। সেক্রেটারি রিসিট লিখে সেই নতুন কৈফিয়ত ফাইলে রাখলেন কাইল ড্রয়ারে তুলে চাবি দিলেন। মল্লিক মুখ তাকালেন এইবার—কেমন যেন খটকা লাগল এতটা করা কি বিবেচনার কাজ হল?]

ক। (চেয়ার থেকে উঠে) তা হলে সার্, াসি।

ক্রটারি। (চেয়ারে হেলান দিয়ে সদ্য-ধরানো টটি খেতে খেতে) এস।

[মল্লিক প্রায় বেরিয়ে গিয়েছেন ঘর থেকে এমন সময়]

আপাতত কিন্তু তোমার সাসপেনশন হবে, মানে এনকোয়ারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

[সেইভাবে সিগারেট খেতে লাগলেন]

মল্লিক। (চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে) সাসপেনশন!

সেক্রেটারি। আপাতত:।

মল্লিক। (বেগে এগিয়ে এসে, টেবিলে কিল মেরে) ছেলেখেলা পেয়েছেন আপনি?

সেক্রেটারি। ছেলেখেলা নয় বলেই তো তুমি সাসপেনডেড হবে। কারণ তোমার ওভারসাইটের জন্যেই সরকারের এতগুলো টাকা নষ্ট হয়েছে। (উদার হেসে) তোমার কোনও ভয় নেই। আমার সেই পার্সন্যাল নোটটি আমার কাছেই আছে। আমাকে একটা অ্যাক্‌শন তো নিতে হবে।

মল্লিক। (রাগে ফেটে পড়ে) চোর!

সেক্রেটারি। নিজের জিনিস নিলে চুরি করা হয় না।

মল্লিক। (আর সহ্য করতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে সেক্রেটারির জামার কলার চেপে ধরে) শালা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি!

সেক্রেটারি। Help! Help!

[বেয়ারাদের সঙ্গে অন্যান্য কেরানীদের হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ। মল্লিক তখনও সেক্রেটারির কলার চেপে ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছেন উন্মত্তের মত। এরা প্রবেশ করতে এদের দিকে তাকিয়ে তিনি সেক্রেটারিকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন চিৎকার করে]

চোর! শালা চোর!

[বলেই দু হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়লেন। সকলে বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

যবনিকা

হাওয়া

মায়া বসু

বৃষ্টি পড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরে, একঘেয়ে টিপ টিপ করে। না জোরে, না আস্তে।

মাত্র সন্ধ্যা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক রাত এখন। বিরক্তিকর বিষণ্ণ আবহাওয়ার যন্ত্রণাদায়ক অবসন্নতা যেন পৃথিবীর ওপরে একটা নিরানন্দ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যেন থামবে না এই বৃষ্টি। অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরবে আর ঝরবে।

জল জমার মত বৃষ্টির সময় নয় এটা। তবুও সংকীর্ণ গলিটায় পায়ের পাতা ডোবার মত জল হয়েছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস সোঁ-সোঁ করে আসছে, আর সঙ্গে করে আনছে বৃষ্টিকণার গুঁড়ো গুঁড়ো কুচিগুলোকে।

জনবিরল সরু গলিটার দু পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে জীর্ণ পুরনো বাড়িগুলি রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো লোক অশরীরী প্রেতের মত চলাফেরা করছে এরই ভিতরে। নিস্তব্ধ গলিটা যেন ঘুমের সমাধিতে মগ্ন।

গলিটা প্রায় যেখানে এসে শেষ হয়েছে, তারই শেষ বাড়িটার একতলার একখানা ঘরের মেঝেতে ম্লান একটা লণ্ঠন জ্বলছে। মাঝে মাঝে ভেজানো দরজা দিয়ে হাওয়া আসছে—দপ দপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে তার শিখাটা। পলতেটার আয়ুও বুঝি শেষ হয়ে এসেছে। তবু এখনও নিবে যায় নি। জ্বলছে তবুও।

বালি-ঝরানো দেওয়াল। চটা-ওঠা মেঝে। এখানে ওখানে চুনবালি খসা। গোটা দুই তিন কুলুঙ্গি বোঝাই কৌটোবাটা, জিনিসপত্র। গোটাকতক তাকও বোঝাই হয়ে রয়েছে সংসারের নানারকম খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে। একপাশে একটা জীর্ণ আলনায় ঝুলছে গোটাকয়েক জামা-কাপড়।

আর একপাশে একটা তক্তাপোশে বিছানা পাতা। তোশকের অস্তিত্ব বোঝা কঠিন। মাথার দিকের দেওয়ালে লক্ষ্মীর ছবি আঁকা একটা ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় এধারে ওধারে দুলছে।

তক্তাপোশের ওপর শুয়ে আছেন মা। বৃষ্টি আর শীত-শীত হাওয়ায় জ্বরটা বেড়েছে। একটা চাদর গায়ে চাপা। মেঝেতে লণ্ঠনটাকে ঘিরে বসে আছে অন্তু সন্তু ইলু মিলু। যাদের বয়স দশ থেকে চারের মধ্যে।

এক এক সময় তারা কথা বলছে। এক এক সময় চুপ করে আছে। তাদের সমস্ত মনোযোগ ওই দরজাটার দিকে। মাঝে মাঝে সেটা হাওয়ার ধাক্কায় খুলে যাচ্ছে—চমকে উঠছে ওরা, প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে ওদের অবসন্ন ক্ষুধার্ত মুখগুলো। কিন্তু কেউ নয়। শুধুই হাওয়া।

আবার হয়তো কেউ উঠছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিতে গিয়ে পুরো খুলে মুখ বার করে গলিটা দেখছে। বাকি তিনজোড়া চোখ উৎকণ্ঠ হয়ে চেয়ে রয়েছে সেদিকে। কেউ আসছে না। আবার সে এসে বাকি তিনজনের কাছে বসে পড়ছে। চারটি শিশুর প্রতীক্ষারত চেহারার ছায়াগুলো নোনাধরা দেওয়ালের ওপরে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয়।

লণ্ঠনটার চারদিকে গোটাকতক বাদলাপোকা লাফাচ্ছে। লক্ষ্য পলতেটার আগুন। কিন্তু বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাঁচের চিমনির ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছে মেঝেতে। দেওয়ালে একটা টিকটিকি নিশ্চিত শিকারের ওপর লাফ দেবার ভঙ্গীতে একটু একটু করে এগুচ্ছে সেদিকে। হঠাৎ একবার লাফ দিয়ে একটাকে মুখে করে ধরে নিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়।

সবচেয়ে বড় অন্তু অবাক হয়ে বলল, দেখ্ দেখ টিকটিকি কি রকম শিকার ধরে। ওরা পোকা খায় কেন বল তো সন্তু? পোকা খেতে ভারী বিশ্রী।

বয়সে দাদার চেয়ে ছোট হলেও সন্তুর জ্ঞান কিছু কম নয়। উত্তর দিল, কী করবে? খিদে পায় যে তোমার পায় না?

াস্তীর মুখে অন্তু চুপ করে রইল।

ার ছোট ইলু মিলু নেকড়ার পুতুল নিয়ে খেলছিল। । পুরনো জুতোর বাক্সে পুতুলগুলিকে শুইয়ে ঘুম ছিল তাদের। মিলু বলল, দিদি এখনও আসছে ন? আমার যে ঘুম পাচ্ছে।

ছর দুয়েকের বড় ইলু তাড়াতাড়ি বলল, দিদি এখুনি ব। আয়, ততক্ষণে আমরা পুতুলদের রান্নাবাড়া করে নি।

াজী হল মিলু: কি রান্না করব?

কাথা থেকে গোটাকতক ভাঙাচোরা কৌটো, রেটের কৌটোর ঢাকা যোগাড় করে নিয়ে এল ইলু। মিলুর হাতে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে নে কুচো—এই দিয়ে ভাত হবে।

মিলু কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, শুধু ভাত? কই? তরকারি কই? দুধ কই?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল অন্তু সন্তু ইলু—একসঙ্গে। মাঝে এমন বোকার মত কথা বলে ছোট্ট মিলুটা াসি চেপে রাখা দায় হয়ে তাদের। বড় অবুঝ।

দের হাসির সঙ্গে তাল দিল একঝলক হাওয়া। করে হাসল। ঘরের এদিক থেকে ওদিক কী যেন । এটা-ওটা নাড়ল। তাকের ওপরের চাল-ডাল টিনের কৌটোগুলো বাজিয়ে দেখল ঢন-ঢন-ঢন। ার সব নেড়েচেড়ে ছেলেমেয়েগুলোর মুখের ওপরে বুলিয়ে, মায়ের শিয়রের লক্ষ্মী-আঁকা ক্যালেণ্ডারটাকে দিয়ে ভেজানো দরজা ফাঁক করে বাইরে বেরিয়ে গেল। সন্তু ডাকল, মা, ওঠ। দিদির আসবার সময় হয়েছে। া জেগেই ছিলেন। এবার তক্তাপোশ থেকে নেমে লেন। রোগজীর্ণ নৈর্ব্যক্তিক একটি পাথরের মূর্তি হঠাৎ সচল হয়ে উঠল।

াইরে হাওয়া আর বৃষ্টি। পুরনো স্টোভটাকে পোশের তলা থেকে বার করে নেড়ে দেখলেন। আছে। সেটাকে জেলে একটা এনামেলের হাঁড়ি য় দিয়ে জল ঢেলে দিলেন। বাইরে সোঁ-সোঁ হাওয়ার র সঙ্গে স্টোভের শব্দ মিশে এক হয়ে গেল।

ারটি শিশুর কচি-কচি মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল উঠল।

দরজা খুলে গেল। এবারে কিন্তু হাওয়া নয়—লীলা। অন্তু সন্তু ইলু মিলুর দিদি। ছেঁড়া চটিজুটো হাতে ঝুলছিল। দরজার পাশে ফেলে দিল। তাকাল না কারও দিকে। শীতল জমাট ভাবলেশহীন মুখে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির কণা ওর মুখে গালে। মনে হচ্ছে যেন জলগুলি বৃষ্টির নয়—ওরই চোখের। চুল ভিজেছে, কাপড় ভিজেছে—অথচ এতটুকু খেয়ালও নেই ওর সেদিকে।

মা তাকালেন লীলার দিকে। কথা বললেন না। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিলেন। এবারে চোখ তুলল লীলা। ভাই-বোনেদের উৎকণ্ঠ ব্যাকুল মুখগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল মায়ের দিকে। মায়ের চোখে চোখ মেলাল। তারপর আবার মুখ নীচু করল।

মা আস্তে আস্তে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, হাওয়া আসছে। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। স্টোভ নিবে যাবে।

লীলা তাই করল।

নিশিকান্ত বাবুর কাছে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। আগের টাকা শোধ না হলে আর দেবেন না।

গদাধর বাবুর কাছে?

তিনিও একই কথা বললেন।

নলিনী দিদির কাছে?

দরজা বন্ধ ছিল। চাকর মুখ বাড়িয়ে বললে, কেউ বাড়ি নেই।—এক মুহূর্ত থেমে বলল, এমন ভাবে আর চলবে না, এমন করে আমাকে আর যেতে বলো না মা।

হাওয়া নেই। সব হাওয়া ফুরিয়ে গেছে। মা জোরে একটা নিঃশ্বাস টানলেন। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ হল। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন, স্টোভটা নিভিয়ে দাও। আর কোনও দিকে তাকালেন না। প্রায় টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

হাওয়ার মতই ছটফট করে লীলা তাকে আর কুলুঙ্গিতে কী খুঁজতে লাগল। হাতড়াতে লাগল এ টিন ও টিন, এ কৌটো সে কৌটো। একটু আগেই হাওয়া যেগুলোকে বাজিয়ে চলে গিয়েছিল, সেগুলোই আবার লীলার হাতে বেজে উঠল ঢন-ঢন-ঢন।

সে শব্দে ফিরে তাকিয়ে মা বললেন, মিথ্যে খুঁজছ। কোথা থেকে আসবে? পরশু দিনই তো দেখেছ সব খালি।

খালি, খালি, সব খালি। সব শূন্য। ঘর শূন্য। শূন্য টিন, কৌটো, হাঁড়ি, বাক্স। মায়ের হাত গলা খালি। লীলারও সব খালি। কাঁচের চুড়িও অবশিষ্ট নেই খোলবার মত। এই অতল শূন্যতা দিয়ে বাজারের আকাশছোঁয়া দামের চালকে কী করে ছোঁবে লীলা? ছেলেমেয়েগুলো হঠাৎ কী যেন বুঝতে পেরেছে। কেউ একটা কথাও বলল না। মিলু মাদুরের ওপর আগেই শুয়ে পড়েছিল, ইলুও শুয়ে পড়ল তার পাশে চুপচাপ।

আবার ছটফটিয়ে উঠল লীলা। মার কাছে এসে বসল: মা!

মা উত্তর দিলেন না।

লীলা আবার মার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, মা, কী খাবে ওরা? কী করব?

মা এবার চাদরটা টেনে গায়ের ওপর দিলেন। তাকালেন না মেয়ের দিকে। বালিশে মুখ গুঁজে ফিসফিস করে বললেন, রজনীবাবুর কাছে গেলেই কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে।

মার মুখে হাত চাপা দিয়ে লীলা প্রায় চিৎকার করে উঠল: মা, তুমি কী বলছ? ওখানে কিছুতেই যেতে পারব না—পারব না আমি।

কিন্তু তখনি চমকে উঠল সে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মার।

অন্তু উঠে এল মাদুর থেকে: দিদি, কখন রান্না হবে? ওরা যে ঘুমিয়ে পড়ল।

তীব্র কণ্ঠে লীলা বলল, তুমিও ঘুমোও। রান্না হবে না।

চিৎকার করে উঠল অন্তু: হ্যাঁ, রান্না হবে। তুই বাইরে গিয়ে নিশ্চয় পেট ভরে খেয়ে এসেছিস, তাই রান্না করবি না। আমরাও খাব, আমরা ঘুমোব না, কিছুতেই না, কিছুতেই না।—বলতে বলতে লীলার কোলের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল অন্তু: না খেলে আমার যে কিছুতেই ঘুম আসে না দিদি।

অন্তুকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল লীলা। মার দিকে তাকাল। সাড়া নেই। দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাল। দেওয়ালে টাঙানো বাবার ছবিটার দিকে তাকাল। অস্পষ্ট অন্ধকারে ফ্রেমটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। মাদুরের ওপরে অভুক্ত শিশুকটির দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে দরজা দিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ভাত না খেলে ঘুম আসে না—অন্তু জেগে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে একটা লোক একটা ধামা মাথায় করে দরজা দিয়ে ঢুকল। ধামাটা ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে তাকাল এদিক ওদিক। তারপর একমাত্র জাগ্রত অন্তুকে উদ্দেশ করে বলল, খোকা, তোমার দিদি চাল পাঠিয়ে দিলেন। উনি একটু বাদেই আসবেন।

দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে লোকটা অন্ধকার গলির মধ্যে মিশে গেল।

মা জেগে কি ঘুমিয়ে—ওর কথাগুলো কানে গেল কি গেল না, বোঝা গেল না।

অচেতন অসাড় একটা মূর্তি চাদরের তলায় আগেকার মতই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল।

আর দিদির প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে একসময় অন্তুও—ভাত না খেলে কিছুতেই যার ঘুম আসে না—খিদে ভুলে মাদুরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। একা একা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাওয়া।

আস্তে আস্তে চোরের মত আবার ঢুকল সে সেই ভেজানো দরজাটাকে আর একটু ফাঁক করে।

অভুক্ত অসহায় ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকটির শরীরে আবার বুলিয়ে দিল তার শীতল হাতটা—আরও একবার থমকে থেমে দাঁড়াল তক্তাপোশের ওপরে মায়ের অসাড় দেহটার পাশে।

তারপর ঘরের মাঝখানে বসানো চাল-ভর্তি ধামাটাকে ঠেলে ফেলে দিতে গেল তার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

কিন্তু পারল না। হাওয়ার জোর নেই। তার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

ভারী ধামাটাকে একচুল নাড়াতে না পেরে মাথা নীচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল হাওয়া।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের কথা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলিতে সংস্কৃত ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস বুঝায়। ন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, ইতিহাস কি বস্তু? সাহিত্যই াহাকে বলে? সংস্কৃত ভাষাই বা কোন্ ভাষা? তিনটি প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান কী, তাহা একে আলোচিত হইতেছে।

ইতিহাস' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের অনুসন্ধান ল দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে 'ইতি', 'হ' ও '—এই তিনটি কথা রহিয়াছে। এই তিনটি কথার –"এইরূপ ছিল বলিয়া শোনা যায়।" রূপকথার গল্প ত আরম্ভ করিলে যেমন বলিতে হয়—"এক যে ছিল ", ঈশপের নীতিকথার (Æsop's Fables) যে কোন। আরম্ভ যেমন—"Once upon a time—", যে। বৌদ্ধ-জাতকের আরম্ভে যেমন দেখা যায়—"আসীৎ বারাণস্যাং ব্রহ্মদত্তো নাম নৃপতিঃ", সেইরূপ যে কোনও ীন কাহিনী বা জনশ্রুতি বর্ণনা করিবার সময়ে সেকালে ক "ইতি হ আস" এই কথা কয়টি ব্যবহার করিত। ভাবে যে কোনও প্রাচীন কাহিনীর সহিত "ইতি হ " বা "ইতিহাস" কথাটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। রই ফলে "প্রাচীন কাহিনী" বা "জনশ্রুতি-মূলক ়নী"—"ইতিহাস" শব্দের অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে ।। বর্তমান কালে এইজন্য ইতিহাস বলিতে প্রাচীন ও কাহিনীকেই বুঝায়।

বিদ্যালয়ে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংলণ্ডের হাস, গ্রীসের ইতিহাস ও রোমের ইতিহাস পাঠ তে হয়। এই ইতিহাস উক্ত দেশগুলির ইতিহাস। ইতিহাসগুলিতে প্রধানতঃ উক্ত দেশসমূহে যে রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের রাজনৈতিক হাসই স্থান পাইয়াছে। সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও হাস হইতে পারে। মানবজাতির ইতিহাস, মানব-তার ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস, ানের ইতিহাস, ব্যাকরণের ইতিহাস, বিভিন্ন শাস্ত্রের ইতিহাস, এমন কি বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসও আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাস জানিতে হইলে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে—সাহিত্য কী? এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধানে যুগে যুগে মনীষিগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। কোন্ বস্তু সাহিত্যপদবাচ্য—ইহা নির্ণয় করা, এক কথায় 'সাহিত্য' পদের সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্দেশ করা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। ইহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষায় বহু অলংকার শাস্ত্র বা সমালোচনা গ্রন্থ (Poetics, Rhetoric বা Criticism) রচিত হইয়াছে। আজিও এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হয় নাই।

বৈয়াকরণগণ 'সহিত' শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ্ প্রত্যয়' যুক্ত করিয়া 'সাহিত্য' শব্দটি নিষ্পন্ন করেন। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ নৈকট্য (proximity)—লেখক ও পাঠকের মধ্যে নৈকট্য। যাহার সাহায্যে লেখকের সহিত পাঠকের মানসিক সংযোগ সাধিত হয় তাহারই নাম সাহিত্য। যে রচনার ভিতর দিয়া পাঠকগণ কবি, সাহিত্যিক বা লেখকের মনের পরিচয় পাইয়া থাকেন, সাহিত্য তাহাকেই বলে। সাহিত্য লেখক ও পাঠকের মধ্যে মানসিক যোগসূত্র রচনা করিয়া থাকে।

অথবা, মানব-মনের সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহারই নাম সাহিত্য। বাস্তবিক, মানব-মন ও মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি যাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম সাহিত্য—ইহাই অনেক সমালোচক মনে করেন। ইউরোপীয় সমালোচক-সমাজেও সাহিত্যকে 'মানব-জীবন-সমালোচনা' বা 'Criticism of Life' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

'সাহিত্য' শব্দের অন্য অর্থও করা যাইতে পারে। হিতের সহিত বর্তমান যাহা, তাহার নাম 'স-হিত'। সহিতের ভাব সাহিত্য। অর্থাৎ মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য যে রচনা রচিত হয়, তাহারই নাম সাহিত্য। সেইজন্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ও জনহিত-সাধন। আলংকারিকের ভাষায়—'শিবেতর-ক্ষতি'।

কিন্তু এই মতবাদের সহিত সকলে একমত নহেন। লোকশিক্ষার সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া লেখকগণ যে সাহিত্য রচনা করেন, তাহাও 'সাহিত্য' বটে, কিন্তু সকল সাহিত্যই যে ওই একই উদ্দেশ্যে রচিত হইবে—এমন নহে। শুধু সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য রচনা বা Art for Art's Sake—এই মতবাদ একদল সাহিত্যিক ও সমালোচকের মনে ধীরে ধীরে সংক্রামিত হইয়াছে। ইহার ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক-মহলে লোকশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া, পাঠককে কেবলমাত্র আনন্দদান করিবার উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-রচনা করিবার আগ্রহ দেখা দিয়াছে। লোকশিক্ষার জন্য তো ধর্মশাস্ত্র রহিয়াছে, নীতিশাস্ত্র রহিয়াছে। সাহিত্যও যদি শুধু লোকশিক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে ধর্ম ও নীতির সহিত সাহিত্যের পার্থক্য কোথায়? সেকালের ভারতীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যেও এইরূপ মতবাদের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালেও একদল সাহিত্যিক মনে করিতেন, সাহিত্য রচিত হইবে "সদ্যঃ পর-নির্বৃতয়ে" অর্থাৎ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মনে অপার আনন্দ পরিবেশন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই সাহিত্য রচনা করা উচিত। পাঠকগণকে শিক্ষাদান উদ্দেশ্য নহে, পাঠক-মন আনন্দে ভরাইয়া তোলাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

প্রসিদ্ধ আলংকারিক জগন্নাথ পণ্ডিত 'রসগঙ্গাধরে' বলিয়াছেন—

"আনন্দ-বিশেষ-জনক-বাক্যং কাব্যম্।"—অর্থাৎ যে বাক্য দ্বারা মনে আনন্দ-বিশেষের উদ্রেক হয়, তাহাই কাব্য। কৌস্তুভও বলেন—

"কবি-বাঙ্-নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্। সা চ মনোহর-চমৎকারিণী রচনা॥"—অর্থাৎ যে মনোহারিণী ও চমৎকারিণী রচনা কবি-বাক্য দ্বারা রচিত হয়, তাহাকেই কাব্য বলে। বলা বাহুল্য, 'কাব্য' এখানে 'সাহিত্য' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

অবশ্য অন্য একদল সাহিত্যিক স্বীকার করিতেন, উপদেশ-দান সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু পাঠকগণকে উপদেশ দিতে হইবে সুকৌশলে—পাঠকগণ যেন জানিতে না পারেন যে তাঁহাদের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উপদেশ তো কত ভাবে দেওয়া যায়। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন, আবার প্রিয়তমা স্ত্রীও তাঁহার প্রিয়তম স্বামীকে উপদেশ দেন। ইহাদের উপদেশ দিবার প্রণালী কি একই প্রকার? সাহিত্যিক পাঠককে উপদেশ দিবেন এই শেষোক্ত পদ্ধতিতে—চিকিৎসক যেমন রোগীকে শর্করাবৃত করিয়া তিক্ত ঔষধ (sugar-coated pills) সেবন করান। তাঁহাদের মতে তাই সাহিত্য-রচনা করিতে হইবে "কান্তা-সম্মিততয়া উপদেশযুজে"।

সাহিত্য সম্বন্ধে অন্য আলংকারিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা বলেন, কবিগণের সার্থক-রচনাই সাহিত্য। কিন্তু রচনার সার্থকতা কিরূপে নির্ণীত হইবে? কেহ বলেন, অলংকার-বাহুল্যই রচনাকে সার্থক করিয়া তুলে। অন্যেরা বলেন, না, তাহা নহে। রীতিই (style) সাহিত্যের প্রাণ। রচনার রীতিই যদি হৃদয়গ্রাহিণী না হইল, তবে সেরূপ রচনার সার্থকতা কোথায়? অপরে বলেন, ইহাও ঠিক নহে। ধ্বনিই সাহিত্যের প্রাণ। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গার্থ না থাকিলে কোন রচনাই 'সাহিত্য' হইয়া উঠে না। কেহ কেহ 'বক্রোক্তি'কে (crooked sayings) সাহিত্যের প্রাণ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে বক্রোক্তি-হীন সাহিত্য সাহিত্যই নহে।

কিন্তু নব্য আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের বিচারে 'রস' প্রধান স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রসই সাহিত্যের প্রাণ। তাঁহারা বলেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" তাঁহারা সাহিত্যকে মানবের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দণ্ডী-বর্ণিত 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী' বা ঈপ্সিত-অর্থ-বিশিষ্ট পদ-সমষ্টি হইল সাহিত্যের দেহ, অনুপ্রাস-উপমাদি অলঙ্কার (Figures of speech) হইল ইহার আভরণ, রীতি ইহার দেহের গঠন-ভঙ্গি এবং রস ইহার প্রাণ। অলঙ্কার, গুণ ও রীতি না থাকিলেও কোনও রচনার 'সাহিত্য' হইয়া উঠিতে বাধা নাই। কিন্তু রস না থাকিলে তাহা সাহিত্যই নহে। রসাত্মকতাই সাহিত্যের সাহিত্যত্ব। রচনা রসোত্তীর্ণ না হইলে তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না।

কিন্তু রসই বা কী বস্তু এবং রচনা রসোত্তীর্ণ হইল কিনা—তাহা জানা যাইবেই বা কিরূপে? এ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

আমরা জানি, প্রত্যেক মানবের মনের মধ্যে বিভিন্ন র অনুভূতি-শক্তি বর্তমান। কোনও রচনা পাঠ ল পাঠকের মনে যদি বিশেষ কোনও প্রকার অনুভূতি ত হইয়া উঠে, তবেই সেই রচনা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে ত হইবে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে ত হয়—কোনও রচনা-পাঠে পাঠকের মনের বিবিধ ভাবগুলির কোন একটি ভাব যখন কোনও বিশেষ ঃ রসে পরিণত হয়, তখনই আমরা বুঝিব—সেই র রস পরিবেশন করিবার ক্ষমতা আছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে বলে, মানব-দেহে রোগের বীজাণু ান থাকা সত্ত্বেও যতক্ষণ জীবনীশক্তি (vitality) ়, ততক্ষণ মানব সুস্থ থাকে। কিন্তু বাহিরের কোন ণু যদি কোনও দুর্বল মানব-দেহে সংক্রামিত ected) হয়, তখনই দেহে রোগ দেখা দেয়। বের মনেও সেইরূপ সর্বদাই রতি, দুঃখ, বিস্ময়, ধ, ভয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থায়িভাব বর্তমান রহিয়াছে। কোনও বিশেষ রচনা পাঠ করিলে সেই রচনা-স্থিত পাঠক-মনে সংক্রামিত হইয়া সেই স্থায়িভাবগুলির কোনও একটিকে উদ্রিক্ত করে। ইহার ফলে কের অন্তর সেই বিশেষ রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া । যে রস পাঠকের মনে সৃষ্ট হয়, তাহার মূল উক্ত ার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অতএব উক্ত রচনা ঃ বিশেষ রসের আধার—বুঝিতে হইবে। যদি কোনও া পাঠক-মনে কোনও রসের সঞ্চার করিতে সমর্থ না , তাহা হইলে সেই রচনা ব্যর্থ। কিন্তু কোনও রচনা পাঠক-মনে একটি বিশেষ রস সঞ্চারিত করিতে সমর্থ , তাহা হইলে সেই রচনা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে—বুঝিতে বে। এইরূপ রসোত্তীর্ণ রচনাই লেখকের সার্থক সৃষ্টি ঃ এইরূপ রচনাই সাহিত্য-পদবাচ্য।

আমাদের প্রত্যেকেরই মনে যে স্থায়িভাবগুলি নিহিত ছে তাহারা সংখ্যায় দশ। তাহাদের নাম—(১) রতি,) হাস, (৩) শোক, (৪) ক্রোধ, (৫) উৎসাহ,) ভয়, (৭) জুগুপ্সা, (৮) বিস্ময়, (৯) শম, (১০) হ বা বাৎসল্য। এই দশটি স্থায়িভাবের প্রত্যেকটি এক টি রসে পরিণত হইতে পারে। সেই রসও সংখ্যায় টি। তাহাদের নাম যথাক্রমে—(১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, (৫) বীর, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, (৮) অদ্ভুত, (৯) শান্ত, (১০) বৎসল।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ॥
শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতাঃ॥
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥"

(সাহিত্য দর্পণ)

সাহিত্যিক রস কাহারও মতে আটটি, কাহারও মতে নয়টি, কাহারও বা মতে দশটি। সাহিত্যদর্পণ-রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রথমে আটটি রসের উল্লেখ করিয়া 'শান্ত' রসকে নবম রস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে পুনরায় 'বৎসল'-রসকে দশম রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অভিধানকার অমর সিংহ 'অমরকোষে' আটটি রসেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রে চ রসাঃ— ॥"

টীকাকার ভরত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'শান্ত' ও 'বৎসল' রসকেও রসের মধ্যে ধরিয়াছেন। ["চ-শব্দাৎ শান্ত-বৎসলৌ অপি সংগৃহীতৌ ইতি কেচিৎ"।] টীকাকার মুকুট কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে 'বৎসল'-রস শৃঙ্গার-রসের অন্তর্গত এবং 'শান্ত'-রস লৌকিক রস নহে। ["বৎসলঃ পুত্রাদিস্নেহাৎ রতিভেদ এব। শান্তস্ত্বলৌকিকত্বান্নোক্তঃ।"]

'রত্নকোষ' নামক গ্রন্থে কিন্তু নয়টি রসের কথা আছে। যথা—

"শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুত-শান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

টীকাকার মুকুট "নাম-নিদান" হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দশটি রসেরই উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এই—

"শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানকাঃ।
বীভৎস-রৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসা দশ॥"

মানব-মনের স্থায়িভাবগুলি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব (বা ব্যভিচারি-ভাব)—এই ত্রিবিধ ভাবের

সহযোগে বিভিন্ন রসে পরিণত হয়—ইহাই আলংকারিক-গণের মত। ইহাদের মধ্যে বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইবে। সকল মাতা-পিতার মনেই সন্তানের জন্য বাৎসল্য বা স্নেহ বর্তমান আছে। কিন্তু সন্তানকে দেখিলেই তাঁহাদের সেই স্নেহ বৎসল-রসে পরিণত হইয়া থাকে। সকল মানুষের মনেই শোক, দয়া, মায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি অল্প-বিস্তর থাকে। কিন্তু কোনও ভিক্ষুক, অভাবগ্রস্ত বা দরিদ্রকে দেখিলেই সেই দয়া করুণ-রসে রূপান্তরিত হয়। সেইরূপ, কোনও রচনা পাঠ করিলে বা কোনও নাটকের অভিনয় দেখিলে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলি আমাদের মনের স্থায়িভাবগুলিকে বিভিন্ন রসে রূপান্তরিত করে। পুত্র, ভিক্ষুক, নায়ক-নায়িকা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মনের স্থায়িভাব রসে পরিণত হয় বলিয়া এই-গুলির নাম আলম্বন-বিভাব। সন্তানের বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য, বীরত্ব, খ্যাতি প্রভৃতি, ভিক্ষুকের প্রার্থনা, বিলাপধ্বনি প্রভৃতি ও নায়ক-নায়িকাদির হাব-ভাব, ভাব-ভঙ্গি, কার্য-কলাপ প্রভৃতি—যাহা দেখিয়া আমাদের মনের স্থায়িভাব রসে রূপান্তরিত হয়—তাহাদের নাম উদ্দীপন-বিভাব। আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবগুলি চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত সংক্রমণ বা ইনফেকশনের কাজ করে। কারণ স্থায়ি-ভাবগুলি তো আমাদের মনে সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-পদবাচ্য রচনার সান্নিধ্যে না আসিলে তো আর উহারা রসে পরিণত হইতে পারে না। আলংকারিক-গণ ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য দুগ্ধ ও দধির উপমা দিয়াছেন। দুগ্ধ যেমন অম্ল পদার্থ-সহযোগে দধিতে পরিণত হয়, স্থায়িভাবগুলিও সেইরূপ আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের সাহায্যে রসে পরিণত হয়।

আমাদের মনে রস সঞ্চারিত হইলে শরীরে কতকগুলি বাহ্য বিকার প্রকাশ পায়। এই সব বাহ্য বিকার হইতে মনের ভিতরকার রসের অনুভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে "অনুভাব" বলে। অতএব স্থায়িভাবগুলি রসের কারণ এবং রস অনুভাবগুলির কারণ। অনুভাবের মধ্যে যেগুলি সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের নাম সাত্ত্বিক অনুভাব। সাত্ত্বিক অনুভাব আটটি, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

এই অনুভাবের সহিত আরও কতকগুলি মানসিক ও শারীরিক বিকার সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়। তাহাদের নাম সঞ্চারি-ভাব বা ব্যভিচারি-ভাব। সঞ্চারি-ভাব সংখ্যায় তেত্রিশটি। তাহাদের নাম—নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ, বিরোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব, মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, আশঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারি-ভাব—এই ত্রিবিধ ভাবই মানব-মনের স্থায়িভাবকে রসে পরিণত করিতে সাহায্য করে।

'সাহিত্য' কাহাকে বলে—এ বিষয়ে বিভিন্ন আলংকারিক ও সমালোচকের মতামত সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এই প্রকার সাহিত্য-পদবাচ্য রসোত্তীর্ণ সার্থক সাহিত্য—যাহা সমগ্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে—তাহার ইতিহাস আমাদের জানিতে হইবে। অতএব আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন—"সংস্কৃত ভাষা" কাহাকে বলে? এক্ষণে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সংস্কৃত ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া প্রাচীন আলংকারিক দণ্ডী বলিয়াছেন, যে ভাষায় দেবতাগণ কথা কহেন, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। "সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্ অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।" ইহাকে দেবভাষা, দৈবী বাক্, সুর-ভারতী প্রভৃতি নামে পরিচিত করা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে মানব-সমাজে ভাষা প্রবর্তিত হইবার সময় হইতে মর্ত্যের মানবগণ স্বর্গের দেবগণের এই ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সকল ভাষা অপেক্ষা প্রাচীনতম। ভারতীয় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ এই মতবাদ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত ভাষা অতি পবিত্র ভাষা। এই জন্য এই ভাষায় ভারতীয় আর্যগণের ধর্ম-কর্ম-বিষয়ক মন্ত্র-তন্ত্র, প্রার্থনা, ধ্যান ও স্তব-স্তুতি উপনিবদ্ধ। আর্যগণ এই ভাষার সাহায্যেই দেবতাগণের উদ্দেশে প্রার্থনা ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম-কর্ম, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম এই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা শুধু যে আর্যগণের ধর্মজীবনের ভাষা, তাহা নহে—ইহা তাঁহাদের

স্থ্য ও সামাজিক জীবনেরও ভাষা। এই ভাষা
াদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় তাঁহারা কথোপকথন
য়া পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান-প্রদান
তেন।

সংস্কৃত ভাষা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা—এ কথা কিন্তু নিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিতে চাহেন না। ারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার তুলনা- ; আলোচনা করিয়া এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য য়াছেন। পৃথিবীর নানা দেশের ভাষাগুলির একই াচক শব্দসমূহের মধ্যে বর্ণগত ও উচ্চারণগত অদ্ভুত শ্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত াছেন যে, সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক, াণীয়, প্রাচীন স্লাভিক, প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন ানিক, প্রাচীন কেলটিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি মূল-ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বীর বর্তমান মানবজাতির আদিমতম পূর্বপুরুষগণ সেই ভাষায় কথা বলিতেন। সেই মূল-ভাষা কিরূপ ছিল, ার কোনও নিদর্শন বর্তমানে নাই। তবে ভাষা- বিদগণ প্রাচীন ভাষাগুলির সাহায্যে মূল-ভাষার একটা ানিক রূপ অনুমান করিয়া লইয়াছেন। সেই মূল- াকে বলা হয় "ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা" (Indo- ropean Language)। সেই মূল ভাষা হইতেই গ্রীক, টিন প্রভৃতি ভাষার মত সংস্কৃত ভাষাও উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, সমগ্র মানবজাতির দ পূর্বপুরুষ মধ্য-এসিয়ার কোনও স্থানে অথবা উত্তর- বেরিয়ায় অথবা মধ্য-ইউরোপে বাস করিত ও উক্ত -ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলিত। পরবর্তী যুগে, তঃ আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দের কাছাকাছি নানা কারণে তাহারা আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ- ক বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু দিন করার ফলে ভৌগোলিক কারণে তাহাদের ভাষা ঃই পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এই ভাবে ইউরোপে শাখা বাস করিতে লাগিল, কালক্রমে তাহাদের রূপান্তরিত হইতে হইতে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ায় পরিণত হইল। ইরাণ বা পারস্য দেশে যে শাখা করিতে লাগিল, তাহাদের ভাষা আবেস্তীয় ও প্রাচীন স্য ভাষায় রূপান্তর লাভ করিল। এবং ভারতবর্ষে াখা প্রবেশ করিল তাহারা প্রাচীন ভারতীয় আর্য- বা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন রূপ "বৈদিক ভাষা" ব্যবহার তে লাগিল। ভারতীয় আর্যগণ ভারতে আসিয়া র-ভারতে কাশ্মীর, গান্ধার (বা বর্তমান আফগানিস্থান), াব প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল। (সেকালে গানিস্থান, বেলুচিস্থান, কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ ভারতের অন্তর্গত ছিল।) আর্যগণ দেবতাগণের উদ্দেশে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত ও সেই যাগ-যজ্ঞে বৈদিকমন্ত্র বা ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিত। মন্ত্রের সেই ভাষাকে "সংস্কৃত ভাষা" না বলিয়া "বৈদিক ভাষা" বলা হইত। বেদের মন্ত্র যে ভাষায় উচ্চারিত হইত, তাহারই নাম বৈদিক ভাষা। আর্যগণের বৈদিক ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রথম রূপ। বৈদিক ভাষাতেই যাবতীয় বৈদিক মন্ত্র বা সূক্ত ও ঋক্ উপনিবদ্ধ। বৈদিক ভাষায় রচিত মন্ত্রগুলির মধ্যে অতি সুন্দর সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে বৈদিক মন্ত্রের বিভিন্ন পাঠভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বৈদিক ঋষি মন্ত্রপাঠের বিভিন্ন ধারার প্রবর্তন করেন। এইরূপে বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বৈদিক ভাষায় এই প্রকারভেদ এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হয় যে, বৈদিক ভাষাকে সংস্কৃত বা সংশোধিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শিষ্টজনের এই সংশোধিত ভাষাই 'সংস্কৃত ভাষা' নামে পরিচিত হয়। মহর্ষি পাণিনি এই শিষ্টগণের ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিখ্যাত ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেন। এই সংস্কৃত ভাষায় পাণিনির আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন কবি সাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পাণিনির পরবর্তী যুগে এই ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা ফুলে ফলে পল্লবে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করে। সেই সাহিত্য-পুষ্পের সৌগন্ধে রসিক জনমণ্ডলীর চিত্ত আমোদিত হইয়া উঠে।

এক্ষণে কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষা বলিতে এখন শুধু তথাকথিত শিষ্টগণের ভাষাকেই বুঝায় না—বৈদিক ভাষাকেও বুঝায়। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত ভাষার দুইটি রূপ— বৈদিক ও লৌকিক। বৈদিক ভাষায় বেদ-মন্ত্র বা সংহিতা, মন্ত্র-ব্যাখ্যা বা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ বা বেদান্ত এবং শ্রৌত-সূত্র, গৃহ্য-সূত্র প্রভৃতি সূত্র-সাহিত্য গ্রথিত। এক কথায় শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র বৈদিক ভাষায় রচিত। লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় পরবর্তী যুগের সাহিত্য রচিত হইয়াছে।

বৈদিক যুগে আর্যগণ বৈদিক ভাষায় মন্ত্র-পাঠ ও ধর্ম- কর্ম, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি সম্পাদন করিলেও, সে সময়ে তাহারা অপর একটি কথ্য ভাষা দৈনন্দিন ভাষারূপে ব্যবহার করিত বলিয়া মনে হয়। এই অনুমানের কারণ বলিতেছি। বৈদিক ভাষায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিন প্রকার স্বরের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল স্বর-সংযোগে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত। কোনও একটি পদের বিভিন্ন অংশে বা syllable-এ বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগ করিতে হইত। স্বর প্রয়োগের পার্থক্যের উপর শব্দের অর্থের পরিবর্তন নির্ভর করিত। অনেক সময় সামান্য

একটিমাত্র কথার একটি অংশের বা syllable-এর একটি স্বর ভিন্নভাবে উচ্চারণ করার ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ পাইত। এইজন্য বৈদিক মন্ত্র অতি সাবধানে বিশেষ মনোযোগ-সহকারে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে হইত। একটিমাত্র স্বর ভুল করিয়া উচ্চারণ করার ফলে অনেক সময় যজ্ঞ পণ্ড হইত। যজমান বা যজ্ঞকারীকে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াও ভুলের মাসুল শোধ করিতে হইত। শোনা যায়, বৃত্রাসুর একবার ইন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবার সময় "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" মন্ত্রটিতে ভুল করিয়া স্বর উচ্চারণ করায় ইন্দ্রকে বধ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়।

এই সকল ব্যাপার হইতে মনে হয়, বৈদিক যুগে বৈদিক ভাষা আর্যগণের গার্হস্থ্য বা সামাজিক জীবনের ভাষা ছিল না। সর্বসাধারণে এই ত্রিবিধ-স্বরযুক্ত কঠিন ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত না। এমন কি, শিক্ষিত জন-সমাজের পক্ষেও এরূপ কঠিন ভাষায় দৈনন্দিন জীবনে ভাবের আদান-প্রদান করা সহজসাধ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এইজন্য ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, বৈদিক ভাষা ভিন্ন অপর একটি ভাষা তাহারা কথিত ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিত। সেই কথিত ভাষার রূপ যদিও এখন বিরল, তথাপি এরূপ অনুমান করা অসমীচীন নহে যে, এই কথিত ভাষাই পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই ভাষাকে আমরা "ঋষিগণের ভাষা" বা "আর্যভাষা" নামে অভিহিত করিতে পারি। এই আর্যভাষা জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা ছিল। সেইজন্য এই ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহা এত সহজ, সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল হইতে পারিয়াছিল।

আর্যভাষায় লিখিত রামায়ণ, মহাভারত ও অধিকাংশ পুরাণ-গ্রন্থ পাণিনির আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেইজন্য এই সকল আর্যগ্রন্থে পাণিনির ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন বহু স্থানেই অনুসরণ করা সম্ভবপর ছিল না। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ। ভাষাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্যই ব্যাকরণের প্রয়োজন। ব্যাকরণের জন্য ভাষা নহে। এই সকল কারণে আর্যগ্রন্থের পাণিনি-বিরুদ্ধ প্রয়োগগুলিকে ভুল বলা যায় না। ইহাদের "আর্যপ্রয়োগ" বলা হইয়া থাকে।

এই আর্যভাষাই পরবর্তী যুগে প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাকৃত ভাষার অপর নাম মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতি বা প্রজাসাধারণের ভাষা ছিল। শিষ্টগণের সংস্কৃত ভাষা পাণিনির ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন আয়ত্ত করা সম্ভবপর ছিল না; তাই জনসাধারণ প্রাকৃত ভাষায় তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে মনোভাবের আদান-প্রদান করিত। মূল-প্রকৃতি (বা কারণ) সংস্কৃত ভাষা হইতে আগত বলিয়াও ইহার নাম প্রাকৃতভাষা। বাস্তবিক, প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ভাষারই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রাকৃত ভাষা কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হইলেও এই ভাষায় বহু সাহিত্যও রচিত হইয়াছিল। প্রাকৃত ভাষার তিনটি প্রধান ভাগ—মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, সৌরসেনী প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত। মহারাষ্ট্র দেশে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। এই ভাষায় পদ্য-সাহিত্য রচিত হয়। সুরসেন বা মথুরার ভাষার নাম সৌরসেনী-প্রাকৃত। সৌরসেনী-প্রাকৃত ভাষায় গদ্য-সাহিত্য রচিত হয়। মগধ (বা আধুনিক কালের দক্ষিণ বিহার) নামক দেশের ভাষার নাম মাগধী প্রাকৃত। এই ভাষায় সমাজের অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত জনসাধারণ কথা বলিত। স্ত্রীলোকগণও সাধারণতঃ তখনকার দিনে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিত। ইহার প্রমাণ যে কোনও সংস্কৃত নাটকেই পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাকৃত ভাষার সমান্তরালভাবে আর একটি ভাষা বৌদ্ধযুগে এ দেশে প্রচলিত ছিল। তাহার নাম পালি ভাষা। এই ভাষায় সমগ্র হীনযান বৌদ্ধ-সাহিত্য ও জৈন-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা বা প্রাকৃত ভাষা পরবর্তী যুগে নব্যভারতীয়-আর্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এই নব্যভারতীয়-আর্য ভাষাই বর্তমান কালে প্রচলিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক ভাষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাগধী প্রাকৃত ভাষাই মিথিলা-(বা বর্তমান-কালের উত্তর-বিহার) প্রদেশের মৈথিলী ভাষা ও প্রাচীন বঙ্গ-ভাষার জননী। মৈথিলী ভাষার কবি বিদ্যাপতি ও বঙ্গ-ভাষার কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী-সাহিত্যের ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্যও এই দুই সহোদরা-ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। প্রাকৃত ভাষা বঙ্গ-ভাষার জননী হইলে, সংস্কৃত ভাষা বঙ্গ-ভাষার মাতামহী-স্থানীয়—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, বঙ্গ-ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ—যাহা তৎসম ও তদ্ভব নামে পরিচিত—তাহার মূল উৎস সংস্কৃত ভাষা।

এক্ষণে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি যে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলিতে শুধু সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ সাহিত্যের কাহিনীই বুঝাইতেছে না। সংস্কৃত ভাষা এখানে ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হইতেছে। অতএব বৈদিক-সাহিত্য, আর্য-সাহিত্য, সংস্কৃত-সাহিত্য, প্রাকৃত-সাহিত্য ও পালি-সাহিত্য—একাধারে এই পঞ্চ প্রকার সাহিত্যের কাহিনীই সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।
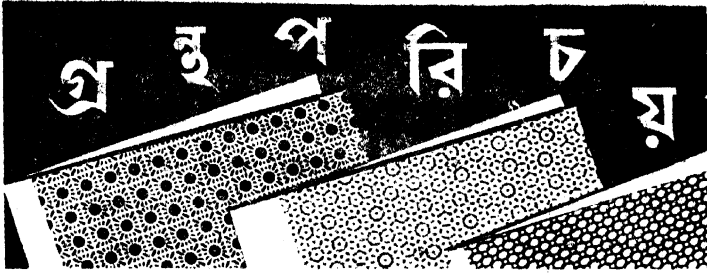
শ্রীবিনয় ঘোষের তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'বিদ্যাসাগর ও
ালী সমাজ' নামক প্রায় নয় শো পাতার সুবৃহৎ
ানিতে লেখকের গবেষণা, সমাজ-সচেতনতা ও
ত্যবুদ্ধির এমন অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে যে ইহাকে
ংশয়ে বাংলা-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন
ত পারি। বইটিকে যুগ-অন্তকারী না বলিয়া অতীত
় নবরূপায়ণ বলা যায়। রামতনু লাহিড়ীর জীবনকে
করিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের
আঁকিয়াছিলেন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর
ষ্ট মানুষদের কাছ হইতে শোনা কথার সাহায্য লইয়া।
সাগরের কালের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া বিনয় ঘোষের
রনের সুযোগসুবিধা বিন্দুমাত্র ছিল না। বিদ্যাসাগর-
াদর শম্ভুচন্দ্রের, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বিহারীলাল
ারের, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং ইংরেজীতে
চন্দ্র মিত্রের জীবনী এবং তাহার সহিত বিদ্যাসাগর
শয়ের আত্মচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ মিলাইয়া পড়িয়া
রা মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিলাম। এমন লিখিত-জীবনী-
্য বাংলাদেশের উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কোনও
ীর হয় নাই। ইহার উপরে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের
ন ও চরিত্রের এমন অপূর্ব নির্যাস তাঁহার 'বিদ্যাসাগর
ত' পরিবেশন করিয়াছিলেন যে বাংলাদেশের পড়িয়ে
ষ-মাত্রেই বলিতে পারিতেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
াদের খুবই জানা।

অনেক দূরকালের মানুষ বিনয় ঘোষকে তাই
াসাগর ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া
ানা কথার সন্ধান করিতে হইয়াছে প্রচুর পরিশ্রম ও
ন্ধান করিয়া—সমসাময়িক সাময়িক পত্র, দিল্লী-
াকাতার মহাফেজখানা, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন
পত্র এবং বহু পুরাতন বই ঘাঁটিয়া। এই কাজ তিনি
অতিশয় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত যে করিয়াছেন এই বই তিন খণ্ডের পাঠক তাহার সাক্ষী দিবেন। ইহাতে আমরা শুধু জীবনীগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার মত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতেছি না, দেখিতেছি সমগ্রভাবে সেকালের আচার-আচরণ—মানুষ ও সমাজের নিখুঁত পরিবেশের মধ্যে। মুছিয়া যাওয়া ফটোগ্রাফ হইতে তেলরঙে যথাযথ মানুষটিকে ফুটাইয়া তোলার গৌরব বিনয় ঘোষ অর্জন করিয়াছেন।

বইখানির প্রথম খণ্ডটি হইতেছে পটভূমিকা, নিছক মনন-নিদিধ্যাসনের ফল। ছয়টি অধ্যায়—নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর, তাঁহার চরিত্রের রূপায়ণ, হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, তাঁহার শিক্ষাদর্শ, এবং বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ দুই ভাগে। বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব কেন সম্ভব হইয়াছে পটভূমিকায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে আলেখ্য শুরু হইয়াছে এবং পূর্বপুরুষদের সমাচার, বিদ্যাসাগরের জন্ম হইতে ১৮৪৩ সনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্ম পর্যন্ত কাহিনী চৌদ্দ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে আলেখ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে আরও চৌদ্দ অধ্যায়ে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে, বাঙালী ছাত্র সমাজ, বাঙালীর সমাজজীবন এবং সমাজজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত যাঁহারা জানিতে চান তাঁহারা দ্বিতীয়খণ্ডের "ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১", ও "সমাজ-জীবনের খরস্রোত ১৮৪১-৫০" এবং তৃতীয়খণ্ডের "সমাজ-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত ১৮৫০-৯০" —এই তিনটি অধ্যায় পড়িলে একটা পরিষ্কার ছবি পাইবেন।

এই বইখানির বিশেষত্ব—পরিশিষ্টে সংযোজিত ইহার নজিরগুলি। আজ আগের মত ছাপার অক্ষরমাত্রেরই সত্য-মর্যাদা নাই, এখন পাঠকেরা বাজাইয়া, যাচাই করিয়া

নজির দেখিয়া গ্রহণ-বর্জন করিতে শিখিয়াছেন। বিনয় ঘোষ নজিরের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

সবশেষ কথা—এত নজির সত্ত্বেও বইখানি বিশুদ্ধ গবেষণার বই নয়; কেবলমাত্র তথ্য ও স্ট্যাটিস্টিকসের সঙ্কলন নয়; লেখক আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া কঠোর ইতিহাসকেও সরস সাহিত্য করিতে পারিয়াছেন। চিত্রগুলি বইয়ের সরসতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই বইয়ের তিনখণ্ডেরই প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল কার্তিক ১৩৬৪, দাম তিন টাকা; দ্বিতীয় খণ্ডের মাঘ ১৩৬৪, দাম সাত টাকা এবং তৃতীয় খণ্ডের ভাদ্র ১৩৬৬, দাম বারো টাকা।

'ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' কবি ও কথাশিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নতুনতম বই—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত অন্তরঙ্গ কথা। ইংলণ্ডের সাহিত্য-সম্রাট স্যামুয়েল জনসনের জীবনেতিহাস যে কোনও নিষ্ঠাবান গবেষক রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রতিভায় সাধারণত্বে মহত্ত্বে সঙ্কীর্ণতায় ক্রোধে ব্যঙ্গে হাস্যে স্যামুয়েল জনসনের সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য একজন বসওয়েলের দরকার ছিল, যিনি চাতকের মত জনসন-বাক্য-সুধা পান করিবার আশায় তাঁহার আশেপাশে থাকিতেন এবং সর্বদা উন্মুখ থাকিতেন। অধিকন্তু বসওয়েল ছিলেন সাহিত্যিক। ফলে বসওয়েলের জনসন-জীবনী পৃথিবীর সাহিত্যের সম্পদ হইতে পারিয়াছে। বাংলাসাহিত্যে ধীরেন্দ্রনারায়ণের রামেন্দ্র-জীবনী অনুরূপ কারণেই সম্পদরূপে গণ্য হইবে। শুধু আশৈশব-কৌমার-যৌবন রামেন্দ্রসুন্দরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার দরুনই নয়, ইহার সহিত দেখিবার দৃষ্টি, উপলব্ধি করিবার মন এবং প্রকাশ করিবার ভাষা আয়ত্তে ছিল বলিয়াই 'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন বেদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে যিনি মাতৃভাষায় সাহিত্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে প্রেরণা ও শক্তি পাইয়াছিলেন, স্বদেশ ও স্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রেম কত গভীর ছিল, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার হৃদয়মনের কতখানি ঠাঁই জুড়িয়া ছিল, তাঁহার সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়া ধীরেন্দ্রনারায়ণ সেই ইতিহাসই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আড়াইশো পাতার এই বইয়ের দশটি পংক্তিতে লেখক যে উপসংহার করিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরের সৌন্দর্য তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

"যুগে যুগে মহামানব আসে আবার চলে যায়। তিনিও এসেছিলেন আমাদের মধ্যে; দিয়ে গেছেন তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি আর সাধনার আলো, রেখে গেছেন তারই পরিচয় তাঁর অতল গভীর অপূর্ব রচনাবলীর মধ্যে। স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিকে রূপ দেবার জন্যে বুকের রক্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—বাঙালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয় রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কথা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হয়ে থাকবে। সৃষ্টিই কষ্টিপাথর, জনপ্রিয়তার হঠাৎ ফিকে জৌলুস নয়। অবাক হয়ে ভাবি, নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখা এই রামেন্দ্রসুন্দরকে। ...আজ বাঙালী ও বাংলাকে চিনতে গেলে, জানতে হবে রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনালব্ধ এই সুন্দর জীবনটিকেও।"

বইটি প্রকাশ করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সাম্প্রতিক সাহিত্যচিন্তা **'সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি'** গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এগারোটি প্রবন্ধ লইয়া এই সঙ্কলন। ইহাদের অধিকাংশই তথাকথিত অতিআধুনিক সাহিত্য লইয়া। এ বিষয়ে যাঁহারাই গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই নিত্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ক্ষতির দুশ্চিন্তায় স্থৈর্য হারাইয়া উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সমালোচনায় এই উগ্রতা দেখিতে পাই। নারায়ণ চৌধুরীও আধুনিক সাহিত্যের অনাবশ্যক দেহবাদের উপর মারমুখী হইয়াছেন। তাঁহার মতে অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাষা যতই মার্জিত ও শাণিত হইয়া উঠিতেছে তাহার বিষয়বস্তু ততই পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। তাঁহার মতে "গল্পে উপন্যাসে আর কোন বিষয়ই যেন গণনীয় নয়, শুধু একজোড়া নায়ক-নায়িকার মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের পারস্পরিক আকর্ষণ প্রায়শঃ স্থূল জৈব আকর্ষণে পর্যবসিত হয়। এ বস্তু রুচিশীল পাঠকদের

ক্লেদাক্ত অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতিরই । করতে পারে বলে মনে করি না।...[এর] মানে তাকে vulgarize করা; বর্তমানে সেই প্রক্রিয়াই । সাহিত্যে বাধাবন্ধহীনভাবে চলেছে।"

সাহিত্যের উপর সাংবাদিকতার আক্রমণ নারায়ণ রী বরদাস্ত করিতে রাজী নন। একমাত্র গল্প উপন্যাস আধুনিক ধাঁধা কবিতাকে যে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য া ধরা হয়, সমালোচনা ও প্রবন্ধকে সাহিত্যের নিম্ন য় স্থান দেওয়া হয়, এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে য়ণ চৌধুরী জোরাল যুক্তি প্রয়োগে তাহার প্রতিবাদ াইয়াছেন। উষ্মা ও উগ্রতার জন্য প্রবন্ধগুলি সুষম ও দ্ধ হওয়ার অবকাশ পায় নাই কিন্তু তাঁহার বক্তব্য ই নিত্য ও শাশ্বত সাহিত্যের সমর্থন করিয়াছে। রা স্বদেশ ও স্ব-সাহিত্যের কল্যাণকামী, এই গ্রন্থ পাঠে ারা আমাদের বর্তমান সাহিত্যসঙ্কট সম্পর্কে অবহিত ত পারিবেন।

প্রকাশক শান্তি লাইব্রেরী, দাম সওয়া তিন টাকা।

স.

চা মাটি মানুষ: শ্রীবীরেশ্বর বসু। কথামালা াশনী। ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। টাকা।

নতুন দেশ আবিষ্কারের চেয়ে নতুন লেখক আবিষ্কার ায় কম আনন্দ নেই। 'চা মাটি মানুষে'র লেখককে ৎ একদিন আবিষ্কার করে সত্যি খুশী হয়েছি। তাই ন্ধ নিতে জানা গেল লেখক শ্রীবীরেশ্বর বসুকে সাহিত্যে নবাগত বলা চলে না। তাঁর সাহিত্য-সাধনা কালের। রচয়িতা হিসাবে তিনি যে বাংলা সাহিত্যে -অভ্যর্থনার যোগ্য এটুকু অসংকোচে বলা যায়। চায়ের জ্যই তাঁর বেশীর ভাগ জীবন কেটেছে। চা-বাগান থেকে ষ্ঠ জীবিকা শুধু নয় তার চেয়ে আশ্চর্য কিছুও আহরণ র এনেছেন। সে আশ্চর্য কিছু হল জীবনের অফুরন্ত চিত্র্যের একটি নতুন স্বাদ। সেই স্বাদই তিনি বাংলা হত্যে যুক্ত করে দিলেন। তাঁর 'চা মাটি মানুষে' য়র নির্দোষ মাধুর্য, মাটির স্নিগ্ধ সরসতা আর মানুষের স্তজটিলতার ইঙ্গিত—সবই বর্তমান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রাত্রির বয়স: গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। গ্রন্থ-ভবন, , মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। সাড়ে তিন কা।

'রাত্রির বয়স' গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের নবতম গল্প-কলন। মোট আটটি গল্প রয়েছে এই গ্রন্থে। প্রতিটি ল্পই লেখকের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট। প্রথম গল্পের নামেই ইটির নাম। লেখকের মননশীলতার স্বাক্ষর তাঁর সব ল্পেই রয়েছে। অবাধ কল্পনা বা উচ্ছল আবেগ কোথাও নেই। লেখক যেন থেমে থেমে ভেবে ভেবে ধীরে ধীরে গল্পগুলি রচনা করেছেন। তার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ মাঝে মাঝে যে আবর্তের সৃষ্টি করেছে তা একদিকে যেমন পাঠককে ভাবিত করে, অন্যদিকে তেমনই লেখকের রুচি ও রীতির স্পষ্ট পরিচয় দেয়। প্রত্যেকটি গল্পের শেষেই হয় একটা বিচিত্র উপলব্ধি, না হয় কোন বিচিত্রতর আবিষ্কার বর্তমান আলোচকের মনে বিস্ময়ের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

"রাত্রির বয়স" গল্পের নায়ক নিলয়েন্দ্র এক সঙ্গীতের জলসায় গিয়ে পাশে আবিষ্কার করল একটি মেয়েকে—যার "পাশ থেকে আয়ত-ভ্রূর বঙ্কিম সীমান্ত-রেখাটি এসে মিশেছে গালের মসৃণ মনোহর পটভূমিতে।" একদিকে আনোয়ারী বাই, শঙ্কর সরনায়েক প্রভৃতির গান, অন্যদিকে মেয়েটির রূপের টান সারারাত্রি নিলয়ের কানে এবং প্রাণে অপরূপ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করল। পরদিন প্রভাতেই হল তার স্বপ্নভঙ্গ। রাত্রিতে যাকে মোহিনী মনে হয়েছিল, প্রভাতে দেখা গেল সে এক স্খলিত-যৌবনা রমণী। পাউডার কসমেটিকসের চুনকালি তার সারামুখে। এই আবিষ্কারে নায়কের মনে যে বিস্ময় ও বেদনার সৃষ্টি হল, সেখানেই গল্পটির শেষ।

"নুড়ির দুর্গ" গল্পের নায়ক উদয় তার বন্ধুর বিয়ের খবর পেয়ে বন্ধুর "পেয়ারের মেয়েমানুষ" বেলারাণীর দুঃখমোচন করতে গিয়ে বুঝতে পারল যে, এতক্ষণ নিজের কল্পনায় যেটা দুঃখ বলে মনে হয়েছে, বেলারাণীর কাছে সেটা দুঃখই নয়। একটা তীব্র এবং তিক্ত সত্যের আঘাতের মধ্যে গল্পের সমাপ্তি।

"নীড়" গল্পের সুচিত্রা-দি, কাকাতুয়া, বেড়াল, কুকুর, ময়না, চন্দনা, কোকিল প্রভৃতি নিয়ে যে মমতাপূর্ণ নীড় গড়ে তুলেছিল, পরে দেখা গেল সেটা নীড় নয়, আসলে লোহার একটা খাঁচা।

"জবাব" গল্পে দেখলাম, বেড়ালের দুধ চুরি করে খাওয়ার মধ্যে যে লোভী মনোবৃত্তি—আমাদের আপাত-ভব্যতার তলদেশেও সেই প্রবৃত্তির লীলা। গল্পের নায়িকা এই সত্যটি হঠাৎ আবিষ্কার করে নায়ককে প্রশ্ন করেছে—"ঢেকে চলার নামই মনুষ্যত্ব, তাই না?" নায়ক কোন জবাব খুঁজে পায় নি।

"ছক" গল্পে রয়েছে সিনেমা-অভিনেতা সম্পর্কে মেয়েদের সর্বনাশা মোহের পরিচয়। অনার্সে প্রথম মালবিকা "সব-সব-সব উড়িয়ে দিয়ে একটা লোফার সিনেমার নোটোকে নিয়ে" বাড়ি থেকে পালাতে দ্বিধা করে না। আর অবলম্বনহীন অসীম শূন্যতার মধ্যে নায়কের সমস্ত চেতনা লীন হয়ে যায়।

আরও তিনটি গল্প আছে—"ধ্রুপদী-খেয়াল", "আহ্বান", ও "স্বতঃসিদ্ধ"। সবকটি গল্পেই এইভাবে লেখক

হয় আমাদের মনের নগ্ন সত্যকে, না হয় আমাদের স্বভাবের কোন অলক্ষ্য বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণীয় স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

প্রকাশকও গ্রন্থটিকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রকাশ করতে প্রয়াসের ত্রুটি করেন নি। আজকের প্রচ্ছদসর্বস্ব গ্রন্থমালায় নিপুণ ব্যতিক্রমরূপে 'রাত্রির বয়স' দীর্ঘস্থায়ী হোক।

অরুণকুমার মিত্র

চন্দ্রমল্লিকাঃ ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

অশেষ গল্পঃ হরপ্রসাদ মিত্র। ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দুই টাকা।

এক এক সময় ভাবি, বাংলা কথাসাহিত্য কি বয়স্ক ও পরিণত হয়েছে? তা কি কেবল শিশুমনের উপযোগী হয়ে আছে, না আরও চিন্তাশীল জিজ্ঞাসু মনের খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর থেকে প্রায় এক শো বছর হল বাংলা উপন্যাস নানা বিচিত্র পথে এগিয়ে চলেছে; আর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মাবক্ষে 'গল্পগুচ্ছ'-রচনার সময় থেকে বাংলা গল্পের অমেয় ঐশ্বর্যও প্রকাশলাভ করেছে। এখানে বিশেষ করে গল্প আমাদের আলোচ্য।

সম্প্রতিকালে বাংলা গল্পে যে দায়িত্বহীনতা ও অবাস্তবতা মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে উঠছে তা পরিণত দায়িত্বশীল সাহিত্যকর্মকেও রাহুগ্রস্ত করছে। রমণীমোহন ও শিশুসেব্য গল্পের প্রাচুর্য দেখে তাই মনে হয়, দায়িত্বশীল রসগাঢ় পরিণত মানসিকতা বুঝি বা গল্পরাজ্য থেকে বিদায় নিল।

আজকের পাঠককে কেবল সহজ সরল গল্পের আকর্ষণে বা উত্তেজক মদনানন্দ মোদক সেবনে তৃপ্ত রাখা যায় না, এই সত্যটি অনেক গল্পলেখক স্বীকার করেছেন, আবার অনেকে তা মেনে নিতে রাজী নন। মুশকিল এখানে যে উত্তেজক বা মিষ্টি রমণীমোহন গল্পের বাজার-দর চড়া ও সুলভ জনপ্রিয়তা তার আয়ত্তে। কিন্তু তা ঋতুর ফসল মাত্র, স্থায়ী বৃক্ষ নয়।

পরিণত পরিপক্ব রসবিদগ্ধ চিন্তাশীল গল্পপাঠকের উপযোগী সাহিত্যকর্মের লক্ষ্য সুলভ জনপ্রিয়তার প্রতি নয়, স্থায়িত্বের প্রতি। এ ধরনের আশ্বাস ইদানীং যে-সকল গল্পকারদের (যেমন তারাশংকর, বনফুল, অন্নদাশংকর, সুবোধ ঘোষ, দীপক চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ী, অচিন্ত্যকুমার, প্রমথ বিশী, প্রভৃতি) কাছ থেকে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একটি পুরনো নাম ও একটি নতুন নাম মননশীলতা চিন্তাসংযম ও রসবৈদগ্ধ্যের জন্য সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এ দুটি নাম হল—ভবানী মুখোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ মিত্র।

ভবানীবাবুর শেষতম গল্পগ্রন্থ 'চন্দ্রমল্লিকা'য় উপরোক্ত ভাবনার সমর্থন পাই। বাংলা গল্প যে পরিণতি ও চিন্তা-সমৃদ্ধির দিকে ঝুঁকেছে, তার সার্থক পরিচয় 'চন্দ্রমল্লিকা'। এই গ্রন্থে বারোটি গল্প আছে। কোথাও সুলভ উত্তেজনার আকর্ষণ নেই, রোমহর্ষক ঘটনা নেই, চটকদার পরিবেশ নেই; এ সব যাঁরা খোঁজেন, তাঁরা হতাশ হবেন। জীবনের কয়েকটি বিরল মুহূর্ত লেখক নির্বাচন করে নিয়েছেন—যেগুলি সচরাচর আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। জীবনের বর্ণবৈভব ও ঐশ্বর্য কেবল নয়, বর্ণবিরল ধূসরতা ও বৈরাগ্য এখানে লেখকের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রীর স্ত্রী যে স্বামীর সন্দেহের ঠেলায় অতিষ্ঠ, নার্সিং-হোমের রোগিণী যার মনে হয় পাশাপাশি শয্যায় রণক্ষেত্রের কাটা-সৈনিক শুয়ে আছে, লোভী সন্দেহগ্রস্ত স্বামী যে স্ত্রীর সতীত্ব প্রমাণিত হওয়ায় দুঃখিত—এরাই 'চন্দ্রমল্লিকা'র গল্পগুলির নায়ক-নায়িকা। জীবনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে ভবানীবাবু দেখেছেন। 'চন্দ্রমল্লিকা' সেই স্থিতধী উত্তেজনা-মুক্ত চাঞ্চল্যহীন জীবনবোধের ফল।

কবি হরপ্রসাদ মিত্র 'অশেষ গল্প' নিয়ে গল্পরাজ্যে এলেন এবং পরিণত মননশীল গল্পলেখকের দাবি জানালেন। আমরা এ দাবি স্বীকার করতে বাধ্য। হরপ্রসাদ বাবুও জীবনের ধীর পর্যবেক্ষক। চটকদার ও উত্তেজক ঘটনা-পরিস্থিতি রচনায় তাঁর আস্থা নেই। অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা তাঁর গল্পগুলিতে শোনা গেছে। 'অশেষ-গল্পে'র সাতটি গল্পেই জীবনের সেই মুহূর্তগুলির সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে যাদের পরিচয় সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যেমন, "অন্ধকার" গল্পটি; বাস-দুর্ঘটনায় পতিত দুটি পুরুষ ও নারীর আকস্মিক পুনঃসাক্ষাৎ এবং হাসপাতালে নায়কের পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন ও জীবন সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ; অথচ সে সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও ত্বরা বা ব্যস্ততা নেই। জীবন সম্পর্কে এই ধীর শিল্পসংযত দৃষ্টি সবকটি গল্পেই রয়েছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থের ভাষা সংযত সুন্দর ও কাব্যসুরভিপূর্ণ।

দ্বিধাহীন চিত্তে 'চন্দ্রমল্লিকা' ও 'অশেষ গল্প' পাঠক-সমাজের কাছে সুপারিশ করছি। এ দুটি গ্রন্থ প্রমাণ করে যে বাংলা গল্প আজ মননশীল পরিণতি লাভ করেছে।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৫-২৮৩৮
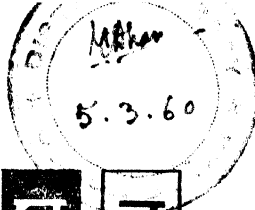
৩২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৬৬

সংবাদ-সাহিত্য

পেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বগত ৩০ জানুয়ারি দিবাবসানের দ্বিতীয় প্রহরে ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান টয়াছে। আশি বছর পূর্ণ হইতে তাঁহার আর কয়েক স মাত্র বাকি ছিল। পরিপূর্ণ জীবনযাপন করিয়া পক্ব ফলের মতই তিনি ইহলোকের আশ্রয় হইতে সিয়া পড়িলেন—অকালমৃত্যুর শোক তাঁহার জন্য নহে। ীন্দ্র-পরবর্তী এই সাহিত্যিক, অগ্রজের সুরে সুর লাইয়া স্বচ্ছন্দে গাহিতে পারিতেন—

'যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ॥'

তেত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯২৭ সনের গোড়ায় তিনি াইন-লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভিক্ষায় ইস্তফা দিয়া ভাগলপুর ইতে কলিকাতায় আসেন এবং বঙ্গভারতীর সেবায় রাপুরি আত্মনিয়োগ করেন। সেইদিন হইতে মৃত্যুর বদিন পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্যকর্মই করিয়া ায়াছেন; বহু উপন্যাস-গল্প-নাটক ও বৈঠকী কাহিনীর তিনি রচয়িতা। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ—প্রসন্ন নির্মল হাস্য ও সুস্থ অথচ প্রগতিশীল জীবনদর্শন।

বাঙালী সাহিত্যিকদের যাহা চরমতম দুর্ভাগ্য—জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া বিষণ্ণ ও অবসন্ন চিত্তে গাণ্ডীব-ত্যাগ এবং একান্তভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা—উপেন্দ্রনাথ নিজ বাহুবলে সে দুর্গতি এড়াইয়া গিয়াছেন। সহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতার সঙ্গে তাঁহার দরদভরা সঙ্গীত, পরিহাসরসিকতা, নিরভিমান মজলিশী-স্বভাব যুক্ত হইয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক কিশোর বালক সকলেরই সমবয়সী সুহৃদে পরিণত করিয়াছিল—এক কথায় তিনি সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের ক্ষতি তো হইলই, যাঁহারা তাঁহার স্নেহসান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহারা আত্মীয়-বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করিলেন।

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে বসিয়া একটি ব্যক্তিগত কথা স্মরণ হইতেছে। গত ২৬ আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর ১৯৫৯, তাঁহার জন্মদিনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীনির্মলকুমার বসু একটি স্মরণ-বহিতে (অটোগ্রাফ) তাঁহার সহি চাহিলে সই করিতে করিতে উপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন—এইটিই হয়তো আমার শেষ জন্মদিনের শেষ স্বাক্ষর হয়ে রইল। আমরাও

"বালাই ষাট" বলিয়া তাঁহার শতায়ু কামনা করিলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, উপেন্দ্রনাথই জয়ী হইলেন। আমাদের মত যাঁহারা সাহিত্য-জীবনের শুরুতেই 'রাজপথে' তাঁহার সঙ্গ ধরিয়া 'শেষ বৈঠক' পর্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা অনুজের শ্রদ্ধা লইয়াই চিরদিন অগ্রজকে স্মরণ করিবেন।

'সীমান্ত-হরণ'

গোপালদা লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, আজ হইতে পাঁচ কম একশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬৫ সনে কবিবর শ্রীমধুসূদন "ফরাসীস দেশস্থ ভরশেল্‌স নগরে" প্রবাস-বাসে 'সুভদ্রা-হরণ' নামক একটি কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া ৫৯ পংক্তি মাত্র লিখিয়াছিলেন। আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মহা-খেদে সুভদ্রাকে সম্বোধন করিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৩৮-সংখ্যক কবিতায় লিখিয়াছিলেন :

'দূরদৃষ্ট মোর চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান্তর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে ;
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত, তুষি বিজ্ঞজনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে।'

বলিলে অহমিকা মনে করিবে, কিন্তু ভায়া, বিশ্বাস কর, আমিই সেই "ভাগ্যবান্‌-তর কবি।" কালধর্মে মহাভারত-কাহিনী রূপকে পরিণত হইয়াছে। সুভদ্রার অঞ্চল এখন ভারতের সীমান্ত-অঞ্চল, শ্রীকৃষ্ণ—জওহরলাল এবং ফাল্গুনী অর্জুন—চৌ-এন-লাই। আমিও আজ এই প্রবাস-বাসে (কৌতূহল দমন কর, বৎস!) মধুসূদনের জবানিতে বলিতে পারি—

কেমনে ফাল্গুনী শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহা কাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গ-বাসিজনে,
বাগ্‌দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!

ভায়া হে, তোমার হয়তো মনে নাই, জওহরলাল চিন্ময় হইবার ঠিক প্রাক্কালে তুমি রবীন্দ্রনাথের গানের পংক্তিবিশেষের একটি হ্রস্ব ই কে দীর্ঘ করিয়া লিখিয়াছিলে—

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চীনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?

সেই নব ফাল্গুন আবার সমাগত। বহু লোকদেখানো হামলা-হামলি, কামড়া-কামড়ি, খেস্তাখিস্তির পরও অগ্রজ বলরাম ও অনুগত সাত্যকিদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া কৌশলী শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রা-লোভী ফাল্গুনীকে যদুপুরে আম[illegible] করিতেছেন। যাবতীয় যদুদের গাধু বানাইয়া অর্জুন কৃষ্ণসহায়তায় যে শেষ পর্যন্ত সুভদ্রার সবটা না হউক খানিকটা হরণ করিয়া হাওয়া হইবে, সন্দিগ্ধ-সংশয়ী লোকেরা এইরূপ সংশয়ই করিতেছেন। কাজেই বুঝিতেছ, আমার 'সীমান্ত-হরণ' কাব্যও লিখিত হইলে কম রোমাঞ্চকর হইবে না। শ্রীমধুসূদনের আশীর্বাদ লইয়া কাজে হাত দিয়াছি, বাগ্‌দেবী বীণাপাণি এইবার কৃপা করিলে কেল্লা ফতে করিব।"

অন্তর্জলির পর

বিহার অর্থাৎ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁবে যত শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানে খাস বাঙালী ছাত্রেরা এতকাল মাতৃভাষাকেই শিক্ষা-পরীক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহারের অধিকার পাইয়া আসিতেছিল। এই অধিকার

ড়িয়া লইবার হুমকি ও হুঙ্কার কয়েক বৎসর হইতে াতেও ছিল। বিহারপ্রবাসী খ্যাতনামা বাঙালীদের হ কেহ যথাসাধ্য প্রতিবাদও করিয়া আসিতেছেন। ধ্রতি বাংলাভাষাকে চিতায় তুলিবার হুকুমও জারি য়াছিল। কিন্তু সম্ভবত: উক্ত ভাষার প্রাণবহ্নি এখনও কিধিকি জ্বলিতেছে এই আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ পুরা বৎসরের অন্তর্জলির ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখন উপায়?

যুক্তি অনেক দেওয়া হইয়াছে, সংবিধানের দোহাই, ন্দ ভাষার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার দোহাই, ভয়-ভক্তি- লবাসার দোহাই বহুজনে বহু দিয়াছেন, এখনও অনেকে তেছেন। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করার সঙ্গে গা-জুরির কোনও সম্পর্ক নাই। চাকুরির খাতিরে যদি ধ্যতামূলক" হয়, ইংরেজীর মত হিন্দীও আমরা শিখিব ন্তু আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যশিক্ষার ব্যাপারে তৃস্তন্যক্ষরিত স্নেহসুধারস হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রবার অধিকার প্রতিবেশী রাজ্যকে কে দিয়াছে? যে ন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত আমাদের সকলের শেষ শ্রয়, এই বর্বর অত্যাচারের প্রতিবিধান তাঁহাদেরই র্ব্য। কিন্তু বরের ঘরের পিসী এবং কনের ঘরের সীরা থাকিতে ন্যায় বিচার সম্ভব নহে। বাংলা ভাষার দ্বিবৎসর-অন্তর্জলির মধ্যে আমাদিগকে এই কথাটাই নিধান করিতে হইবে যে প্রতিকার বঙ্গভাষাভাষীদের জেদেরই করিতে হইবে।

বুদ্ধিমানেরা বলিতেছেন, বিহার যাহা করিতেছে তাহা লিটিক্স, সুতরাং পাল্টা পলিটিক্স কর। বাঙালীর লিটিক্স করা সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মলাকান্তের জবানিতে ১৮৭৮ সনের এই ফেব্রুয়ারি সেই বলিয়াছিলেন—

"আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ লিটিক্স; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের তগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার ত, হিন্দুবিধবার স্বামি-প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে দিরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, স্পাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্সওয়ালা! আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো।' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।"

কমলাকান্ত চক্রবর্তী যদি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেন এবং বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' তৎকালেও জীবিত থাকিত তাহা হইলে কমলাকান্তের আর একখানি পত্র আমরা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইতাম—যাহার শিরোনামা হইত "সাবাস বাঙালীর ছেলে!" পলিটিক্স না করিয়াও যে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়, শক্তিশালী অত্যাচারী শাসকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ-প্রতি- বিধান-প্রতিকার করা যায়, বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালী যুবকেরা তাহার প্রমাণ দিয়াছিল। দেশের মাটির চাইতে মায়ের ভাষা বড়, সুতরাং বাঙালী, আবার বল— "বন্দেমাতরম্।"

মাটি তো শান-বাঁধানো
শুকিয়ে যে যায় জীবন-লতা

পর পর দুই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইট-সিমেন্ট- কংক্রীটের দানবীয় রোলার দেশের মাটির বুকে দুর্দান্ত বেগে চলিবার পর হঠাৎ সেদিন প্রাতে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিস্মিত দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম, কর্তা "হল্ট্" হাঁকিতেছেন, পাকা ইমারতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই অসম্ভব রকম বেশী হইয়া পড়িয়াছে, এখন থামিলে অথবা গতিবেগ শ্লথ করিলে ভাল হয়। আমরা এদিক-ওদিক রেল বা মোটর ভ্রমণে বাহির হইয়া জিলা-শহরের উপান্তে বা গ্রামের বুকে দেখিয়াছি সারি সারি সৌধশ্রেণী যেন আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে রাতারাতি মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। কোথাও হাসপাতাল, কোথাও যৌথ খামার, কোথাও স্কুল-কলেজ। দেখিয়া পুলক-মিশ্রিত গর্বও অনুভব করিয়াছি। ইরম্মদবাহী খুঁটিগুলি ইরম্মদ- গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্রেরও বা কী শোভা! দিগন্তবিস্তারী পীচায়িত

রাজপথগুলি খানাখন্দর ঝোপঝাড় অরণ্য ভেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে দূরদূরান্তে ছুটিয়াছে; শহর যেন আপনিই পল্লীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। এখানে চল্লিশ বেড, ওখানে পঞ্চাশ বেডের হাসপাতাল। বহু-মতলবী নবনির্মিত বিদ্যালয়গুলিরই বা বাহার কত।

ওদিকে এই আকস্মিক বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও সৌধ-কিরীটিনী আজব শহর কলিকাতার বিপুল ক্রমবিস্তার দেখিয়া আরও তাজ্জব বনিতেছি। মানুষের সংখ্যা এখানে জ্যামিতিক প্রগ্রেশনের হারে বাড়িতেছে। এখানে যত মানুষ, সকলের একত্র রাত্রিবাসের স্থান নাই, তাই পালা করিয়া একদল সিনেমা থিয়েটার দেখিয়া, একদল পার্কে-ফুটপাথে শুইয়া বসিয়া অন্যদলকে সে সুযোগ দিতেছে। কলিকাতার এই গুরুতর সমস্যার প্রতিও শ্রীমান অসিতকুমার এবারকার "প্রসঙ্গ কথা"য় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য জওহরলালের "Halt" লইয়া।

আমাদের এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য কোথায় তাহা আমরা নিজেরা সব সময় বুঝি না। অন্ততঃ উনবিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বুঝিতাম না। হ্যাভেল সাহেব আসিলেন, ভগিনী নিবেদিতা আসিলেন, কাউণ্ট ওকাকুরা আসিলেন, মাদাম ব্লাভাটস্কি, লেডবীটার, অ্যানি বেসাণ্ট আসিলেন—আমাদের শিল্পবল, সাহিত্যবল এবং যোগবল আমরা দেখিতে পাইলাম। অবশ্য জোন্‌স উইলকিন্স কোলব্রুক উইলসন মনিয়ার-উইলিয়ামস ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি তৎপূর্বেই জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন—ঘরেও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-রাজেন্দ্রলাল-হরপ্রসাদ ছিলেন। শিল্পসাহিত্যের দিক দিয়া আমাদের আশ্বস্ত হওয়ার অসুবিধা ঘটে নাই।

কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শহুরে লোকই তো আর ভারতবর্ষ নয়! যুগে যুগে এদেশে বৈদেশিক পর্যটকের দল আসিয়াছেন, নিজেরা দেখিয়াছেন এবং অপরকেও দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বরূপ কি তাহা বুঝাইবার জন্য খুব কম করিয়া দশ হাজার গ্রন্থ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। পত্র-পত্রিকাতেও স্বনামে বেনামে অনেকে ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। ইমারত সম্বন্ধে কর্তাদের সতর্কবাণী শুনিয়া ১৮৯৪ সনের 'জেণ্টলম্যানস ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত একজন অজ্ঞাতনামা ইংরেজের বৃত্তান্ত মনে পড়িল। প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি:

"ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের আচার-ব্যবহার স্বাভাবিক ও সরল, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অস্বাভাবিক উচ্চ আদর্শের বন্ধন ছিন্ন করিয়া এখানে আসিলে হৃদয় শান্তি পায়। ভারতবর্ষের কৃষকের সরল জীবনযাত্রা, পারিবারিক স্নেহ-সম্পর্কের মধুর ধারণা, ঈশ্বরের উপর তাহাদের একান্ত নির্ভরতা—মোটের উপর তাহাদের জীবনে এক মহান্‌ আদর্শের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখিতে পাই। অথচ কঠোর শ্রমে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। দাক্ষিণাত্যের প্রস্তরকঠিন ভূমির কর্ষণেই হউক, আর বঙ্গদেশের জলাভূমির গভীর পঙ্কে ধান্য রোপণেই হউক, কিংবা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বালুময় ভূমি শস্যশ্যামল করিবার জন্য গভীর কূপ হইতে বারি বহনেই হউক—ভারতবর্ষের কৃষকের মনুষ্যত্ব সর্বদা সমুজ্জ্বল, এমন কি, তাহার দৈনন্দিন সংসারের কাজেও তাহা নিত্য প্রকাশমান। যদি তাহার এই সুখ হরণ কর, তবে তাহার আর কিছুই থাকে না। মৃত্তিকানির্মিত পর্ণকুটিরে নিত্যব্যবহার্য সামান্য কয়েকটি দ্রব্য, খানদুই কম্বল ও কয়েকটি রাঁধিবার পাত্র ছাড়া অপর বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন তাহার হয় না।"

মাটির কুঁড়েঘরের বদলে সিমেণ্ট-কংক্রীটের পায়রার খোপ এবং মাটির হাঁড়িপাতিল ও শালপাতার ঠোঙার বদলে প্লাষ্টিক-অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসনের ব্যবহার শিখাইলেই যে ভারতবর্ষের কৃষক তাহাকে সুখসমৃদ্ধি মনে করিবে এমন মনে হয় না। সুতরাং "হল্ট্"ই ভাল। শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনী রায়কে বলিতে শুনিয়াছি, গোবরলেপা মাটির ঘরের মেঝে বা দাওয়ায় চালগুঁড়ির (চা-খড়ির নয়) আলপনা দিলে এবং ধানভর্তি মরাইয়ের ভিতর ধান-মাপা আড়া-সের-পাই-কুনকে রাখিলে মা-লক্ষ্মী সে গৃহস্থের আশ্রয়ে অধিষ্ঠান করেন। মার্বল-বাঁধানো প্রাসাদের মেঝেতে আলপনা দিলে অথবা

াকেতায় সাজানো ড্রইংরুমে টিপয়ের উপর আড়া-
-সের-পাই সাইজ অনুযায়ী থাক্ করিয়া সাজাইয়া
ন সে গৃহস্থই শুধু লক্ষ্মীছাড়া হয় না, সারা দেশের
হাড়িয়া যায়।

বদল

াণ্ডিস-প্রেইরী, উরাল-তুন্দ্রা, উত্তর ও দক্ষিণ
গরের আড়ালে-আবডালে কাকপক্ষীর অগোচরে
মাণবিক বোমার পরীক্ষা চলিতেছে সেই অণোর-
ই বলিতে পারেন, বেচারা ফ্রান্স সাহারার উদোম
মাঠে বোমা ফাটাইয়াছে বলিয়া বিশ্বের হাটে বড়
রবারীরা তাহার হাঁড়ি ভাঙিতেছে। আসলে সব
আপন-বাঁচাইবার কাজ গুছাইয়া লইয়াছেন।
মন্যপাতে বিশ্বসুদ্ধ সকলের চিন্তাধারা প্রবাহিত করিয়া
চ অন্যমনস্ক করার কৌশল চলিতেছে। প্রতিরক্ষার
পাকা করিয়া প্রতিরক্ষা-খাতের ব্যয় প্রেসিডেন্ট
ডলিগেশনের নামে অতিথিসৎকারের খাতে ব্যয়িত
ছ। ঢাল-নাই-তরোয়াল-নাই নিধিরাম সর্দার-
র্ষকে এই গুরু ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে।
নহাওয়ার আসিলেন, পিঠ পিঠ ভরশিলভ-ক্রুশ্চভ
া চলিয়া গেলেন, এখন ফেডারেল জার্মানীর পররাষ্ট্র-
ন ব্রেণ্টানো নয়াদিল্লীর সঙ্গে প্রাচীন পাণিপথের
নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। আবার দ্বিতীয়বার শহর-
াতার মহতী সভার ঢেউখেলানো শোভা অবলোকন
র জন্য রসিক ক্রুশ্চভ মহোদয় ফিরিয়া আসিতেছেন।
া পরেই চৌ-এন-লাই। সৈন্য ও বোমা লইয়া প্রস্তুত
ও এত খরচ হইত না। যাঁহারা জুয়াখেলার কিছু
ঃ জানেন তাঁহারা অবগত আছেন—অপেক্ষাকৃত অল্প
ার প্রতিপক্ষকে টেবিলছাড়া করিতে হইলে
পরি উচ্চ "স্টেকে" খেলিয়া যাইতে হয়। প্রতিপক্ষের
াইয়া আসে। সে মাথায় হাত দিয়া সরিয়া
া।

স্থার সদিচ্ছায় আমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করিতেছি
ন্তু মহাভারতের আমল হইতে এই জুয়া খেলাতেই
দের সর্বনাশ হইয়াছে বলিয়া ঘরপোড়া গরুর মত
া মেঘ দেখিয়াই ভয় পাইতেছি। ইতিমধ্যেই চীন
করিয়া চিনির দর আগুন হইয়াছে, কেরল-ফাইটের
রলার দাম পাঁচ আনা সেরের জায়গায় পাঁচসিকা
দাঁড়াইয়াছে—ইনসুলিন-রাষ্টিনন ছাড়িয়া যে
ডায়াবেটিসরোগী এই টোট্কার আশ্রয় লইয়াছিল
দের সমূহ বিপদ। ভয় হইতেছে পালাম-বিমান-
ঘাঁটিতে অতঃপর হেস্তনেস্ত একটা কিছু ঘটিলে পালংশাকে
আর হাত দেওয়া যাইবে না। তাই এক এক সময় মনে
হইতেছে, আমাদের ভীম-অর্জুন ঘটোৎকচ, ভীষ্ম দ্রোণ
কৃপাচার্য দুর্যোধন দুঃশাসনই ভাল; শ্রীকৃষ্ণ-বিদুর শকুনি-
কর্ণে আমাদের কাজ নাই।

'বর্ণপরিচয়'

মহামান্য ক্রুশ্চভ ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্সে ভারতবর্ষের
মানুষদের বিদ্যাসাগরীয় 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ হইতে
একটি এবং দ্বিতীয় ভাগ হইতে একটি—দুইটি মাত্র
পাঠ দিয়া গিয়াছেন। জহর-পণ্ডিতকে তিনি কিছু
শিখাইয়াছেন কি না, অথবা পণ্ডিতের নিকট নিজে কিছু
শিখিয়াছেন কি না, প্রকাশ নাই। ভিলাই ইস্পাত
কারখানা পরিদর্শন কালে কারখানার কর্মীদের নিকট
বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রথম ভাগের পাঠ এই (১৯ পাঠ,
গোপালের কথা দ্রষ্টব্য)—

তোমরা বাবা মাকে পূজা করিবে, ভালবাসিবে,
তাঁহারা যখন যাহা বলেন তাহাই করিবে। আপনার
ছোট ভাইবোনগুলিকে ভালবাসিবে, কখনও তাহাদের
সহিত ঝগড়া করিবে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলিবে না।

ক্রুশ্চভ মহোদয় দ্বিতীয় ভাগের পাঠ দিয়াছেন
সাংবাদিকদের সভায়। ইহা বিদ্যাসাগরীয় 'বর্ণপরিচয়ে'র
প্রথম পাঠের তৃতীয় প্যারা—

সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে
তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে
ভালবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তোমরা
কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

বুলেট-প্রসিদ্ধ দমদমে ভারতবর্ষের মাটি ত্যাগ করিবার
অব্যবহিত পরে ইন্দোনেশিয়ায় বসিয়াই নিকিতা ক্রুশ্চভ
নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন যে ভিলাই-ইস্পাত-
কারখানায় সাংঘাতিক হাঙ্গামা বাধিয়াছে; অন্তর্ঘাত এবং
আত্মঘাত এমনই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল যে
পুলিসকে গুলি চালাইতে হইয়াছে। সত্যকথনে উপদিষ্ট
সাংবাদিকেরা মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়াছেন ইহা
ভাবিতে পারিলে উপদেষ্টা মহোদয় অর্ধেক আশ্বস্ত হইতে
পারিবেন।

অনুমান করিতেছি পুনরাগমন করিয়া তিনি
কলিকাতার ময়দানে নিশ্চয়ই 'বর্ণপরিচয়' ত্যাগ করিয়া
যথাক্রমে 'বোধোদয়' ও 'কথামালা' হইতে এক একটি
পাঠ দিবেন। কি কি পাঠ দিবেন তাহা পূর্বেই প্রচার
করিয়া মাননীয় অতিথির অপমান করিতে চাহি না।

গোলদীঘির খেদ

গোপালদা হঠাৎ সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া গোলদীঘির উপর দরদ দেখাইতেছেন কেন তাহা বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। গোপালদার "গোলদীঘির খেদ" প্রকাশ করিয়াও আমরা তাঁহার সম্বন্ধে খেদিত হইতেছি।

বিশ্বভারতী ও যাদবপুর, তারো পরে ক্রমবর্ধমান,
বিশ্ববিদ্যা শেষতক রবে কল্যাণীতেই বর্তমান।
গুপ্তকবির সেই অভিশাপ,
দিনে মাছি রেতে মশা—বাপ্-বাপ্!
ক্রমে বেড়ে বেড়ে মানুষের চাপ
কাঁচরাপাড়ায় বয় উজান।
হালি-শহরেই ঠেকিবে কি এসে কলি-শহরের কৃষ্টি-মান!

আছি ভয়ে ভয়ে বিদায় ঘণ্টা কবে যে বাজিবে, তাড়িৎ ট্রেন
কবে যে ছুটিবে, মাথা ভেঙে মোর পাচার হইবে বাঙালী-ব্রেন
চৌচির হয়ে চারিটি মিনারে
শোভিবে বাণীর কবর কি, হা রে—
চন্দ্রভাতি-লোভে কাতারে কাতারে
নয়া-বাংলার ইয়ং মেন
যাবে চার পীঠে, শুকিয়ে শুকিয়ে আমি হব শেষে দূষিত ড্রেন!

বাদশা-বিধান কর অবধান, আমারে মেরো না এমন ক'রে
বঙ্কিম-হেম-কৃষ্ণকমল-ভস্ম এখনো এখানে ওড়ে।
হরপ্রসাদ আর রাসু ঘোষ,
হেথা গুরুদাস, সার্ আশুতোষ
সেবা করে মা'র পেল সন্তোষ,
প্রফুল্ল-জগদীশের জোড়ে
মিলিল আসিয়া মেঘনাদ-জ্ঞান-সত্যেন এই মায়েরি দোরে।

রবীন্দ্র হেথা বক্তৃতা দিয়ে ধন্য করিল মায়ের ভাষা,
এখানে মিলেছে কোটি বাঙালীর কামনা-বাসনা-ভরসা-
আশা।
শ্রীনীলরতন, তুমিও বিধান,
এ-হতভাগিনী জননীর দান;
মায়ের মহিমা ক'রে খানখান
দিও না হুকুম সর্বনাশা—
যা ছিল বঙ্গ-বাণী-মন্দির, কোরো না তাহারে কাকের বাসা॥

[সম্পাদকীয় মন্তব্য: গোপালদা "গোলদীঘির খেদে" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য সন্তান বাংলাদেশের প্রথম বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্সের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকার এম. ডি. ডি. এল মহোদয়ের নাম করিতে ভুলিয়াছেন। ১৮৯১ সনের ৭ জানুয়ারি বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্ট গবর্নর সার্ সি. এ. এলিয়টের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন হলে প্রদত্ত "Moral Influence of Physical Science" (জড়বিজ্ঞানের নৈতিক প্রভাব) শীর্ষক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—"Physical Science strengthens the faith that is in us in the uniformity of nature, which, being rightly interpreted means the faithfulness of the Creator to his creatures, by furnishing it with the evidence of things not seen, and thus Physical Science teaches that faith has been implanted in us to give us assurance of the realization of things hoped for." ডক্টর সরকারের বক্তৃতাশেষে সার্ সি. এ. এলিয়ট মন্তব্য করিয়াছিলেন—"It is often said that the effect of the introduction of Western Science to the Eastern mind is to shatter all existing beliefs and to leave behind only a bitter atheism or a sad agnosticism—but here we have a leading scientific man in Calcutta declaring to us that science leads to a firm belief in the Deity and a devout attitude of mind before the great First Cause."]

'মন্দিরময় ভারত'

শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী তাঁহার সমগ্র জীবনের ভারত-পরিভ্রমণ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার দ্বারা এই অপূর্ব 'মন্দিরময় ভারত' নির্মাণ করিতেছেন। ইহার প্রথম ভাগ দুই বৎসর পূর্বে ১৩৬৪ সালের আশ্বিন মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ বর্তমান বর্ষের পূজাবকাশের পর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরের এবং দ্বিতীয় ভাগে ভারতের সর্বত্র ছড়ানো প্রায় যাবতীয় গুহামন্দিরের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে নাগরপদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরগুলির কথা সন্নিবিষ্ট হইবে। আমরা সাগ্রহে এই শেষ ভাগের প্রতীক্ষায় আছি।

ভারতবর্ষের মন্দিরসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ ইংরেজী বাংলা ও অন্য ভারতীয় ভাষায় আছে। সেগুলির অধিকাংশই চিত্রপ্রধান এবং অনেকগুলি গাইডবুকের মত। 'মন্দিরময় ভারত' একটু স্বতন্ত্র; গ্রন্থকার প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্থাপত্য-

। ভিত্তির উপর সাহিত্যের মাধ্যমে কথার উপর
রাখিয়া মন্দিরগুলিকে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করিয়া
ছেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও কবির
। গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে তথ্যসম্বলিত
ও 'মন্দিরময় ভারত' সুপাঠ্য হইয়াছে।
রতবর্ষের মন্দিরগুলিতেই ভারতের অমর প্রাণসত্তার
। পাওয়া যায়, লেখক তাঁহার গ্রন্থে অতিশয় দরদ ও
সঙ্গে সেই অন্যান্য পরিচয় উদ্ঘাটিত করিতেছেন।
ভাগে প্রায় অর্ধশত মন্দির ও দ্বিতীয় ভাগে প্রায়
গুহামন্দিরের কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক
ভারতবর্ষকেই নবীন পাঠকের চোখের সামনে
ম গৌরবে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। যাঁহাদের
ন আছে, তাঁহারা উৎসাহিত হইবেন এবং যাঁহাদের
ন নাই তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। 'মন্দিরময় ভারত'
হউক, ইহাই কামনা করি। প্রকাশক এম. সি.
র অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা।

চিত কলিকাতা গেজেটের ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ড

শ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানা হইতে 'Selections
Calcutta Gazette 1824-1832' গ্রন্থের প্রকাশ
স্মরণীয় ঘটনা। ১৭৮৪ সনের মার্চ হইতে ১৮৩২
মার্চ পর্যন্ত সংবাদপত্ররূপে চালু থাকিয়া ১৮৩২
ন হইতে ইহা বর্তমান সরকারী রূপ পরিগ্রহ
কাজেই ১৭৮৪ হইতে ১৮৩২ এই আটচল্লিশ
রর কলিকাতা গেজেট এই কালের সমাজ শিক্ষা
ত্যধর্ম ইত্যাদির সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে
ন। অধুনা সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য এই ইতিহাস কয়েকটি
নর মধ্য দিয়া অংশতঃ বাঁচিয়া আছে। ডব্লু. এস.
কার যথাক্রমে ১৮৬৪, ১৮৬৫ ও ১৮৬৮ সনে প্রথম
য় তৃতীয় খণ্ড সঙ্কলনে ১৭৮৪ হইতে ১৮০৫ সন
সংবাদ-ইত্যাদি বাছাই করিয়া ছাপিয়াছিলেন।
হিউ স্যাণ্ডিম্যান ১৮৬৯ সনের মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম
সঙ্কলন প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন—শেষ খণ্ড
১৮২৪ জানুয়ারি হইতে ১৮৩২ মার্চ পর্যন্ত সংবাদ-
বাকি রহিল। এই শেষ অংশই কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের
ষ করিয়া বাঙালীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশ।
অত্যন্ত সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ নব্বই বৎসর
পরে সেটন-কারের আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করিলেন।
বাংলাদেশের তথা কলিকাতার তদানীন্তন ইতিহাস
সম্পর্কে এই সঙ্কলনটি রত্নখনি বিশেষ। যাঁহারা এই
সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়া এমন সুষ্ঠুভাবে ইহা প্রকাশ
করিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি
নাই।

'চিত্ত'

আমাদের দেশে চিত্তবিকারগ্রস্ত রোগী অপর্যাপ্ত, কিন্তু
এতাবদ্কাল বিকৃত মানুষ, বিকৃতির কারণ ও প্রতিকার
সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনা সামান্যই হইয়াছে। ডক্টর
গিরীন্দ্রশেখর বসুই বলিতে গেলে ইহার প্রবর্তন করেন
এবং ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, ডক্টর তরুণচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি
এই আলোচনা ও গবেষণা বজায় রাখিয়াছেন। লুম্বিনি
পার্ক নামক বিকৃত-মস্তিষ্ক রোগীদের একমাত্র বৈজ্ঞানিক
নিরাময়াগারের সহিত ইঁহারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন
ও আছেন। অর্থাৎ ইঁহারা প্রত্যেকেই হাতেকলমে
কাজ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের এতদিন কোনও ব্যবস্থা
ছিল না। সম্প্রতি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির পক্ষে
লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতাল হইতে 'চিত্ত' নামক
ত্রৈমাসিক পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের চিত্তের স্বরূপ কি,
তাহা বিকৃত হয় কেন এবং বিকার ঘটিলে প্রতিকারের
উপায় কি ইত্যাদি সম্পর্কে সহজবোধ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা
প্রকাশিত হওয়াতে বাংলাদেশের মানুষের প্রভূত কল্যাণ
হইতেছে। ডক্টর মিত্র ইহার সম্পাদক এবং ডক্টর সিংহ
অন্যতম পরিচালক। এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করিলে
অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাধি মধ্যপথেই নিরাকৃত হইবে এবং
দ্রুতবর্ধমান (আধুনিক সভ্যতার কারণে) মানসিক
ব্যাধি অন্ততঃ 'চিত্তে'র পাঠকদের মধ্যে দমিত হইবে।
১৩৬৬ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন এবং কার্তিক-
পৌষ এই তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ষিক চার
সংখ্যার মূল্য যৎসামান্য—মাত্র তিন টাকা, অথচ
পত্রিকাখানি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ।

গাগরিভরণ

শ্রীকালিদাস রায়

গাগরিভরণে এসেছিলে তুমি আমার জীবন-দীঘিতে,
গা ডুবায়ে জলে উদাসিনী হলে কি গীতে ?
শুনিতে শুনিতে তন্ময় হ'য়ে
ডুবি আকণ্ঠ গেলে তুমি র'য়ে
হ'ল নাক ফেরা সাঁঝের তপন ডুবিল দেখিতে দেখিতে।

তব মুখখানি কমল হইয়া ফুটে আছে দেখি প্রভাতে,
আলো করি দীঘি অপরূপ নব শোভাতে।

তব কেশপাশ হ'ল শৈবাল
গাগরি তোমার হয়েছে মরাল
দীঘির সলিল করে উত্তাল পাখার ঝাপট-আঘাতে।

একটি কমল সহস্রদল পরিমল অফুরন্ত,
মধু গলে তায় সে ধারার নেই অন্ত।
মধু হয়ে গেল এ দীঘির জল
বাসিত করিল তারে পরিমল
বাণীর বাহন হইয়া মরাল করে তারে প্রাণবন্ত।

বৃষ্টি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ ভরি ওই যে এল বাদল ঝরঝর
চরাচর চূর্ণ করি বিদীর্ণ খরতর
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
ধিম্ তারিকিতা ধিম্ তারিকিতা ধিম্ তারিকিতা ধিম্।
পাহাড় ফাটে জলের তোড়ে স্রোতের ধারা নামে
কলস্বনা পাগলাঝোরা আর বুঝি না থামে
ঘূর্ণী হাওয়ার বেদনাতে কাহার কাঁদন শুনি
পৃথ্বী ঘোরে চরকী যেন বঙ্কিমতায় বুনি
মৃদং বলে 'ধিক্কুহল এত্তুম সিথারি ঝিম্'
ধাম্ তারিকিতা ধিম্ ধিম্ তারিকিতা ধাম্ তারিকিতা ধিম্।
নভের পথে মেঘের লাফে বহ্নিরাজা জাগে
সাগর তাই মেঘলা বেলায় নবরাগ মাগে
সিংহ-সম গরজায় কেশর ফুলায়ে
মেঘডম্বরে ধ্বনি তার অম্বর কুলায়ে
পবন হয় মন্দ্র ব্যাকুল তড়িৎবধূর জালে
দিগন্তে যার রঙিন দীপন্ হাসির অন্তরালে
ভাঙল বুঝি দিকে দিকে ছায়ালোকের ছন্দ
সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টির যে আজ দুরন্ত আনন্দ
মাদলের রোল ওঠে ওই ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
ধাম্ তারিকিতা ধাম্ তারিকিতা ধোম্ ধিম্।
বিশ্ব জুড়ে কাঁপন লাগে বাসুকি বুঝি নড়ে
শেষনাগের ফণার পরে ধরিত্রী টলে পড়ে
সীমানাহারা সীমার তটে অদ্রিশিরে ফোটে
দেবতারা আকাশপটে অগ্নিরথে জোটে
পাগলাখেলার হারে-জিতে মগ্ন জীবন তাতে
নিত্যকালের ঋতুযাগে মহাকাল মাতে
বিদায় সুরে বৃষ্টি পড়ে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
বারি ঝরে তাতারিকিতা তিত্তোম্ তিম্।

[দক্ষিণের বিখ্যাত কবি সাধক শ্রীসুব্রহ্মণ্যভারতীর একটি সুপরিচিত পদ অনুসরণে। সম্পাদকের মতে "The Tamil original is a marvel conveying through the sound and movement of word the gladness and terror and tumult of far flung rain"—'The Voice of A Poet' p. 12]

কলকাতা ঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর সমস্যা

অসিতকুমার

'তালিয়ান আমি জানি নে। তবু ইংরেজীতেই যতবার *Inferno*-র প্রারম্ভে দান্তে আলিঘিয়েরির সেই াহ ঘোষণার সম্মুখীন হয়েছি—All hope abandon ose who enter here—ততবার আতঙ্কিত হলেও নবার্য জীবনসত্যের অনুভবে নিজের আত্মাকে স্পর্শ না র পারি নি। মধ্যযুগের বিবাদ-বিসম্বাদপীড়িত ালীর নাগরিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত কী অন্ধ উপায়-াতার বাতাবরণ রচনা করেছিল জানি না, কিন্তু এই শ শতকের মধ্যদশকে শহর-কলকাতায় বুদ্ধিজীবী বনযাপনের চেষ্টায় বার বার শুধু এই একটি অনুভবই মার চেতনায় সত্য থেকে সত্যতর এবং স্থির থেকে রতর হয়ে উঠেছে। নিজের চতুষ্পার্শ্ব সম্বন্ধে নিজের তন্যকে যদি কোনও মানসরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ াড় ও অচেতন করে রাখা যায় তা হলে হয়তো এখানেও শা করা সম্ভব, কারণ সর্বদেশের মত এ দেশেও Happy the Insensible—তা না হলে যদি সমগ্র সামাজিক নৈতিক পরিবেশকে কোন ভাবেও স্পর্শ করতে বা রণায় আনতে হয়, তা হলে শুধু চিন্তা করা নয়, বোধ রি জীবনযাপনই এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বলা যেতে পারে যে, উপরি-উক্ত বক্তব্য হতাশাবাদের রা পীড়িত। আশাবাদের আবেগে যে আমি উৎক্ষিপ্ত া তা সুনিশ্চিত। কিন্তু আমার ধারণা যাই হোক সেটা ানও মতবাদের বা দৃষ্টিকোণের সমর্থনকল্পে রচিত হয় নি। বস্তুতঃ এই সব ধারণা একজন ব্যক্তিমানুষের জীবনের ধারায়, পারিপার্শ্বিকের সংযোগ সংঘাতে, সচেতন সঙ্কল্পে জীবনকে একটা রূপ দেবার চেষ্টায় ও তার নৈতিক তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করবার প্রয়াসে, ক্রমশঃ নানা অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে। ফলে এগুলি সেই ব্যক্তির—এক্ষেত্রে আমার—অভিজ্ঞতার অনিবার্য সঙ্কীর্ণতা ও চিন্তার উপস্থিত দৈন্যবশতঃ বহুলাংশে অসম্পূর্ণ এবং অনেকের পক্ষে হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এবং সেই কারণে নিজের মতামতের বিস্তৃততর বিবরণে ক্ষান্তি দিয়ে এই সব মতামতের মূলে যে বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও তৎসম্বন্ধীয় ভাবনা রয়েছে তারই বিবরণ ও বিচারণ কর্তব্য।

আজকের পশ্চিম-বাংলায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী প্রায় অনিবার্য ভাবেই কলকাতা-কেন্দ্রিক। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর চেতনা কলকাতায় আসীন, দৃষ্টি কলকাতার ওপর নিবদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের অধিষ্ঠান কলকাতাতেই এবং রামমোহনের পর এ কথা কে না জানে যে মুদ্রাযন্ত্রেই মনীষার অধিষ্ঠান। বাংলাদেশের সমস্ত দৈনিকপত্র ও সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। শান্তি-নিকেতনে স্বাধীন বিদ্যা বা কলার চর্চা বর্তমানে কতটা হয় তা আমি জানি নে, কিন্তু শান্তিনিকেতন এবং হিজলীর সর্বভারতীয় যন্ত্রবিদ্যালয়টি বাদ দিলে বাংলাদেশের সমস্ত উচ্চতর শিক্ষাসংস্থা ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কলকাতাতেই

সীমাবদ্ধ। এমন কি প্রথাগত বা আধুনিক যে দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক, বর্তমান বাংলার তিনটি তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে দুটি (কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর) এই কলকাতার সংলগ্ন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে রামমোহন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত মনীষীর কর্মক্ষেত্র কলকাতা। ব্রাহ্ম-সভাই হোক (রাজা রামমোহন রায়) আর হিন্দুসভাই হোক (রাজা রাধাকান্ত দেব), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয় দত্ত) অথবা বঙ্গদর্শন আদি ও নবপর্যায় (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), কি সবুজপত্র (প্রমথ চৌধুরী), ইংরেজী অমৃত-বাজার পত্রিকা (শিশিরকুমার ঘোষ), The Bengalee (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), কিংবা আজকের যুগান্তর, আনন্দবাজার, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (চিত্তরঞ্জন দাশ, কলকাতা কর্পোরেশন এবং Bengal Pact ১৯২৩) অথবা সন্ত্রাসবাদ (মাণিকতলা বোমার মামলা, ১৯০৮), উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু) অথবা জাতীয় শিক্ষা ও আধুনিক রাসায়নিক শিল্প (রাজা সুবোধ মল্লিক ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়), কুলীনকুলসর্বস্ব (রাম-নারায়ণ তর্করত্ন) কিংবা চলচ্চিত্র—বাঙালীর মনীষা ও ভেদবুদ্ধি যে দিকেই কার্যকরী হয়েছে তার উৎস ও কেন্দ্র হয়েছে কলকাতা। বাংলাদেশ যে কী পরিমাণ কলকাতা-কেন্দ্রিক তা অন্য যে কোনও প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলেও বোঝা যাবে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই কলকাতারই মত ইংরেজের আওতায় বেড়ে ওঠে। তবু মহারাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র পুণা—ঠিক বোম্বাই নয়। মাদ্রাজে তামিল সংস্কৃতির পীঠস্থান বহুলাংশে মাদুরাই—মাদ্রাজ নয়। আর উত্তর-প্রদেশে প্রত্যেকটি শহরেরই তো নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা আছে। তুলনায় বাংলাদেশে কলকাতা ব্যতীত কোন নগর ও নাগরিক সংস্কৃতি বর্তমান নেই।

তাই আজকের বাঙালী-সমাজের সমস্যাকে বুঝতে হলে কলকাতা ও তার জীবনকে সর্বাগ্রে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। কারণ এই শহরের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙালী বুদ্ধিজীবী জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে ও বুঝতে চাইছেন। সাঁইত্রিশ বর্গমাইলের এই শহরে মোট আবাসিকের সংখ্যা প্রায় সাতাশ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি চৌকো মাইলে প্রায় পঁচাত্তর হাজার লোক এখানে ঠাসাঠাসি করে বাস করার চেষ্টা করছে। টালিগঞ্জ বাদ দিলে শহরের প্রতি একরে ১৩৫ জন লোকের বাস। তবু এ হল খাস কলকাতার কথা। যদি কলকাতার শহরতলী ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলের কথা হিসেবে এনে বৃহত্তর কলকাতার কথা ভাবা যায় তা হলে মোট জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের কম দাঁড়াবে না। এবং বৃহত্তর কলকাতা থেকে বহু লোক-ই প্রতিদিন জীবিকা ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনে কলকাতায় পা দিতে বাধ্য হন। কাজেই শুধু আবাসিকের সংখ্যা থেকেই যা পাওয়া যায়, কলকাতার ওপর জনসংখ্যার চাপ তার চেয়ে অনেক বেশী। তারই মধ্যে এখানে বস্তীর সংখ্যা সহস্রাধিক। আর খাস কলকাতার প্রতি চারজন থেকে পাঁচজনের মধ্যে একজন বস্তীর লোক। এবং যদিও ১৯৩১ থেকে ১৯৫১-র মধ্যে জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হয়েছে তবু নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই প্রায় স্থাণু রয়ে গেছে—অন্ততঃ প্রয়োজনানুরূপ বাড়ে নি। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এসেছে বিশৃঙ্খলা, সৃষ্টি হয়েছে অজস্র ছোট-বড় অসুবিধে এবং এই সবকিছুর সমবায়ে অসন্তোষ।

কলকাতার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অসুবিধে ও বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হতে হয় তা হয়তো এত প্রচণ্ড হত না যদি এ শহরের গঠনটাও একটু স্বতন্ত্র হত। অন্ততঃ যাতায়াতের সমস্যা অনেক সহজ হত যদি কলকাতা ক্রমাগত শুধু উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত না হয়ে পূর্বে ও পশ্চিমে সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পেত। কিন্তু পূর্বদিকে জব চার্নকের আমলের জলা আর পশ্চিমে গঙ্গা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চল সে পথ রুদ্ধ করেছে। এর প্রতিকারের কথা মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হলেও কার্যতঃ কতটুকু দৃষ্টিগোচর তা আমরা সকলেই জানি। অথচ এ কিছু নতুন তথ্য নয় যে একটি শহর যতটা বৃত্তাকার হয় ততই ভাল, কারণ সেক্ষেত্রে শহরের সম্প্রসারণের সমস্যা তত সহজ এবং যাতায়াতের সমস্যা তত সরল হয়। বর্তমানে কলকাতার বৃদ্ধি আদর্শের বিপরীতমুখী—

শহরের বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র ও তীব্রতা ক্রমবর্ধমান। শুধু যাতায়াতই নাগরিক জীবনে একটা সুকঠিন মরূপে প্রতিভাত।

াশ্চর্য লাগে যে এলোমেলো ভাবে বেড়ে-ওঠা হরে মানুষের সংখ্যা ছাড়া কিছুই আর বাড়ল না। সনে যে বিখ্যাত টালার ট্যাঙ্ক তৈরি হয়েছিল ার কারোর পক্ষেই পরিশ্রুত জল সরবরাহের আর া কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। ছ লাখেরও বস্তীর মানুষকে তাই আজও ঘোলা গঙ্গার জলের নির্ভর করতে হয়, জীবনের ধোয়া-কাচা এমন কি ান্না পর্যন্ত বিবিধ দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে। তার ফলে সভ্যজগতের সমস্ত শহরের মধ্যে একমাত্র হরেই কলেরা এখনও বাৎসরিক অতিথি—গ্রীষ্মাগমে ৎসর মহামারীরূপে দেখা দেয়। আর চিরস্থায়ী ামের গুণে আমাদের মেজাজ এমনই আশ্চর্য স্থিতি-তা অর্জন করেছে যে এতে বিচলিত হবার মত স আমাদের মনে বাড়তে পারে না। আর তাই র পয়ঃপ্রণালীগুলি প্রায় একপুরুষের অবহেলায় এমন য় উপনীত যে সামান্য বৃষ্টিপাতেই শহরের জীবন হয়ে পড়ে। তবু কারুর কোনও বিকার নেই।

শহরে রান্নাবান্নার ঘরোয়া প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুৎ সের কোনও ব্যবস্থা নেই। প্রাগৈতিহাসিক কাঁচা ই সকলের নির্ভর। তাই সকালে সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি বড় ঘর, গলি থেকে রাজপথ, এক একটি ture Inferno হয়ে ওঠে। এবং যদিও শহর একটা বৃত্তাকার রেলপথ তৈরি করা আজও হল না, তবু শহরের চতুপার্শে রেলের ফাঁস ভাবে আঁটা। প্রাচীন ও পরিত্যক্ত যন্ত্র-লির হাঁসফাসানির আর অন্ত নেই এবং গতি যদিও প্রায়শই পশ্চাদমুখী, তবু ধূম্র উদ্গিরণে তারা যমেরও গুরু হতে পারে।

় একটি হেমন্ত-সন্ধ্যায় কলকাতার শরীর কি রণ আর্ত হয়ে ওঠে। ধোঁয়া, ধোঁয়া—ধোঁয়ায় অস্পষ্ট বিশাল শবাধার, রাজপথ অবলুপ্ত, মানুষেরা প্রেতচ্ছায়া, যানবাহন পলায়মান আতঙ্কের প্রতীক। কোনও কোনও প্রশস্ত পথের প্রান্তে নিষ্পত্র রুক্ষ গাছগুলি শোকার্ত বৃদ্ধের মত দাঁড়িয়ে, ডালপালাগুলি উপায়হীন অন্ধ আকুতি, আচ্ছন্ন রাস্তার বাতিগুলি মাথা ধরার মত দবদব করে চলেছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের পরিচ্ছন্ন সম্প্রসার ও সমুদ্র-সান্নিধ্যে যাঁরা অভ্যস্ত, কলকাতা যে তাঁদের পীড়িত করবে এ আর আশ্চর্য কি! আর নয়াদিল্লীর বিজন-প্রান্তে কাননঘেরা বাড়িতে যাঁরা বাস করেন, সকালে সন্ধ্যায় দৌবারিকের কণ্ঠে আত্মস্তুতি গান শুনতে শুনতে যাঁদের সমস্ত স্বরলিপি থেকে বিরোধী সুর মুছে গেছে, কোলাহলমুখর আর্ত অশান্ত কলকাতা যে তাঁদের কাছে নৈশদুঃস্বপ্ন বলে প্রতীত হবে তা আর বিচিত্র কি! এক একবার শহরের পথের দিকে তাকালে মনে হয়, যে সব মানুষ নিক্ষিপ্ত তীরের মত এগিয়ে চলেছে—তারা যেন স্বয়ং সময়ের দ্বারা তাড়িত। আর ইতস্তত: যে সব ব্যর্থ মানুষ পথে পথে ছেঁড়া কাগজের মত ছড়িয়ে পড়ে আছে, সময়ের সারাগাসো সমুদ্রে চিরকালের মত ঠেকে গেছে তারা, জটিল পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে চলেছে শুধু। পার্কের বেঞ্চে বেঞ্চে বেকার মানুষের ভিড়, বিরামমণ্ডপ-গুলিতে ভবঘুরেদের জটলা, এখানে-সেখানে যে কোনও ফাঁকা জায়গায়, স্টেশনে, উদ্বাস্তুদের ভাসমান উপনিবেশ গুলির কথা না হয় অনুচ্চারিত থাক্। কাজেই এ কথা শুনে বিস্মিত হবার কিছুই নেই যে, কলকাতায় যে ব্যাধিতে সবচেয়ে বেশী-সংখ্যক লোক মরে তা হল যক্ষ্মা—বুকের যক্ষ্মা। তার সঙ্গে যদি অন্যান্য শ্বাসরোগের মৃত্যুসংখ্যা ধরা যায় তখন বোঝা যায় যে শহরের সমস্ত ধোঁয়ার কালিমা আর বিরামহীন ব্যস্ততার তাড়না শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছয়।

* * *

তবু এ তো শুধু কলকাতার সাধারণ রূপ। আমাদের প্রশ্ন আরও সীমিত—এর মধ্যে বাঙালী সমাজকে নিয়ে। কলকাতা কোনও দিনই শুধুমাত্র বাঙালীর নয়। ইংরেজ, আর্মানী, ইহুদী, ফিরিঙ্গী, পর্তুগীজ, উত্তর-ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান সকলেরই হাত আছে এই শহরের পত্তন ও

বাড়-বাড়ন্তের মূলে। তবু কলকাতা বিশেষ ভাবে বাঙালীর, এবং সূচনাতেই যা বলেছি—আজকের বাঙালী বিশেষভাবে কলকাতায়। প্রথমেই তাই যে প্রশ্ন জাগে তা এই। আজকের কলকাতার কতটুকু বাঙালী-অধ্যুষিত? এর উত্তর আশ্চর্য। ঠিক অর্ধেক। যদি অঙ্কে আস্থা থাকে তা হলে বলি: বর্তমান কলকাতার পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৫০·৭ জন বাংলাভাষী। তুলনায় হিন্দীভাষী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩৪ জন। অলমতিবিস্তরেন!

এই সব বাঙালী পরিবারের আর্থিক বনেদ কী? আছেন কি নিয়ে এঁরা? প্রতিটি পরিবারের গড়পড়তা পাঁচ থেকে ছ জন লোক আর প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে অন্তত: সাতটি পরিবারে একজন না একজন মানুষ বেকার। আর যদিও শহরের অর্ধেক মাত্র বাঙালী, বেকার কর্ম-প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা একাত্তর জন আর শিক্ষিত (শিক্ষিত, অর্থাৎ অন্তত: ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ) বেকারদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন হলেন বাংলাভাষী। সুতরাং জাত হিসেবে বাঙালী যদিও কলকাতার অর্ধেক মাত্র জুড়ে আছে, বেকারদের মধ্যে বাঙালীর বিশেষত: শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিষ্ঠা মারে কে? তবু আমি কলকাতার জমি জায়গা বাড়িঘর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তিতে বাঙালীর অধিকার কতটুকু সে হিসেবে অবতীর্ণ হতে চাই না। কিন্তু এ কথা আজ আর কার কাছে অজানা যে যেখানেই শহরের পুরনো অঞ্চলগুলি ভেঙে নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয় সেইখানেই বনেদী বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণের টাকাকটি হাতে করে শহরের বাইরেই পা বাড়ান, কারণ অতিরিক্ত মূল্যে শহরে জমি কিনে বাড়ি করা বর্তমানে তাঁদের সাধ্যের অতীত।

প্রতি বৎসর শহরে কাজের প্রয়োজনে নতুন যে সব প্রাসাদসৌধ নির্মিত হয় তার মধ্যে কতগুলি বাঙালীর উদ্যোগে সে প্রশ্ন আমি করব না। কারণ আজও যেখানে ঘরবাড়ি দোকান জমি বাঙালীর অধিকারে, সেখানে আর যাই থাক, উন্নতি বা উদ্যোগের কোনও লক্ষণ নেই। বেঁটে বেঁটে একতলা কি দোতলা বাড়ি, চুনবালিখসা বিবর্ণ চেহারা, মনু কিংবা মান্ধাতা না হোক, মেকলে কিংবা সা অ্যাশলী ইডেনের আমলে তৈরি হবার পর সিমেন্ট এব বিশেষ বিশেষ ব্যাধি ও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রাচীরপত্র ব্যতীত নতুন কিছু আর তাদের অঙ্গে লাগে নি। তারই ভাড়া আয়ে কারুর না কারুর কোথাও না কোথাও মধ্যবিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যে দিন চলে যাচ্ছে। অতএব আর কি চাই?

কিন্তু এ সবই একটি মূল ব্যাধির বহিরঙ্গ মাত্র। মূল কথা এই যে, আধুনিক যুগে যে দুটি শ্রেণী সত্যকার ক্ষমতাসম্পন্ন তাঁরা হলেন শ্রমিক ও শিল্পপতি। শ্রমিকদের শক্তি তাঁদের সংখ্যায় ও সংঘশক্তিতে এবং সবচেয়ে যা বড় কথা তাঁদের ভবিষ্যতে! শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হবেই, সংঘশক্তি বাড়বেই, এবং আপাত উত্থান-পতন যত হোক না কেন, তাঁদের আয় ও আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাবেই এককথায় তাঁদের না হলে চলবে না। আর বর্তমান সমা শিল্পপতিদের ক্ষমতা তো এতই প্রকট যে, সে বিষা বাক্‌বিস্তার না করলেও চলে। সমাজের আর্থিক জীবনে সঙ্কোচন সম্প্রসারণ এঁদের হাতে, এঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তে ফলে মানুষের নতুন উপনিবেশ বসে, নতুন জীবনধারা পত্তন হয়, পুরনো বসতি উঠে যায়, সঙ্গে সঙ্গে লোপ পা পুরনো জীবনের ছন্দ ও মূল্যবোধ।

এ কথা যদি বোঝা যায় তা হলে কলকাতায় এ বাঙালীর বর্তমান দুর্গতি বোঝা কঠিন হয় না। আজকে বাঙালী কলকাতা আর তার শিল্পাঞ্চলে বাস করে শিল্পপতি কি শ্রমিক কিছুই নয়। সে নিছক মধ্যবিত্ত পরনির্ভর ও নিরুদ্যম। তার বাঁচবার মেয়াদ আছে কি নেই তা নির্ভর করে অন্যের মর্জির ওপর। অন্যে যা তাকে কাজ দেয় সে বাঁচে, না হলে বাঁচে না।

এ কথা ভাবলে কি আশ্চর্য লাগে না যে, যদিও এ শহরের চারপাশে প্রায় শতাধিক পাটের কল আছে—তা মধ্যে সংখ্যায় একটি মাত্র বাঙালী পরিচালিত। পাটশি নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা তিরিশজন মাত্র বাঙা এবং এঁদের মধ্যে বৃহদংশ হলেন উদ্বাস্তুরা। রাসায়নি শিল্পে বাঙালীর উদ্যম অবশ্য উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু সে শু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম—তার বেশী কিছু নয়। প ভারতের এই বৃহৎ শিল্পাঞ্চল, ভারতবর্ষের বৃহত্তম শহর

। যেখান থেকে প্রতি বছর গড়ে ৯০ লক্ষ থেকে কোটি টন পণ্য যাতায়াত করে, যার পশ্চাদ্‌ভূমি ইস্পাত গুরুযন্ত্রশিল্পের পত্তন ও বিস্তারে উজ্জ্বলমুখর, সেখানকার ক্ষত ও বিচারশীল অধিবাসীরা আর কিছুই হতে লেন না—হলেন শুধু কেরানী। আর বাঙালীর স্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে আজ যে অন্তঃসারশূন্যতা নৈরাজ্য বিরাজমান সে শুধু তার অর্থনৈতিক ত্রিশঙ্কু র মানসিক প্রতিফলন। আর যে ভিত্তিহীন আত্মা-মানকে আঁকড়ে ধরে আমরা সমাজে একে অন্যের ধীন হতে শিখেছি এবং তাকেই আপন ব্যক্তিত্বের ভূমি ল বিশ্বাস করেছি, সে শুধু আমাদের সদা-অপমান-ড়িত শঙ্কাতুর সত্তার পক্ষে আত্মরক্ষার মানসিক বর্ম ড়া আর কিছু নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই নি, স্বাধীন সমাজে মানুষ কত স্বাধীন, কিন্তু সে প্রসঙ্গ পাততঃ মুলতুবী থাক্।

যাঁরা মনে করেন যে পশ্চিম-বাংলার কৃষিজীবনের ত্তিভূমি থেকে এমন শক্তি উঠে আসবে যাতে মধ্যবিত্ত তুন জীবনের সন্ধান পাবে, সহজে তাঁদের কথা আমি নে নিতে পারি নে। কারণ এদেশের কৃষিব্যবস্থা ও ন্যাস সম্বন্ধে যিনি তিলার্ধও অবহিত, তিনিই জানেন এর তির খতিয়ানে আজ কত কাল ধরে ক্রমাগত অঙ্কপাত য়ে চলেছে এবং হতে হতে আজ তা কী অবিশ্বাস্য জীর্ণ । জীবনহীন হয়ে পড়েছে। পুরনো বাংলার এক-তীয়াংশ মাত্র জায়গা নিয়ে যে নতুন রাজ্যটি ভারতীয় ক্তরাষ্ট্রের অঙ্গভুক্ত হয়েছিল তার রাজনৈতিক ও াসনতান্ত্রিক সত্তা নিশ্চয়ই আছে—একটা ভাবগত ঐক্যও য়তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়—কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য বা ীবনগত কোন ঐক্য নেই। আমাদের মুখের ভাত আসে ড়িষ্যা থেকে, ডাল যোগায় বিহার ও উত্তর-প্রদেশ, চিনি ার সর্ষপ তৈলেরও সেই একই উৎস, মৎস্য আসে র্বপাকিস্তান থেকে নয়তো আসে না, ডিম পাঠায় াদ্রাজ। আজ এখানে চাষাবাদ করবে কে? চাষীদের ধ্যে নিজের জমি চষে খায় এমন চাষীর সংখ্যা গড়ে তনজনের একজন। এইসব চাষী-পরিবারের মধ্যেও নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে অল্প লোক। আর জনসংখ্যার অনুপাতে এইসব আত্মনির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বিংশশতকের গোড়াতেও যা ছিল, আজ তার অর্ধেকেরও কম হয়ে গেছে। জমিদারী বিলোপের পর সমবায় প্রথা এদেশে দানা বাঁধবে কি না আমার জানা নেই, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যে কৃষিজীবনের থেকে নতুন প্রেরণা বা নেতৃত্ব আসবে তা মনে হয় না।

*　　*　　*

সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই পরিবেশ বাঙালী শিক্ষিত সমাজে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শ মুদ্রিত করেছে, তাই হয়তো বিশেষভাবে হতবুদ্ধিকর। কারণ তার গুণে, আর যাই হোক আমরা অবস্থাচক্রকে অতিক্রম করতে পারছি না, বরং প্রতি পদে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় বা তাকে অস্বীকার করবার প্রয়াসে পরিবেশের কাছে নিজেদের অসহায়তাকে স্পষ্ট ও প্রকট করে চলেছি। সংক্ষেপে নিজেদের পরাজয়কে স্বীকৃতিদানই বর্তমান বাঙালীর সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ।

এই শিল্পযুগের প্রতি আমাদের মনোভাবের কথাই বিচার করা যাক। যেহেতু এই নতুন শিল্পব্যবস্থা আমাদের উদ্যোগে আমাদের জাতীয় ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সূচিত হয় নি, সেই কারণে, এই শিল্পযুগ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব কখনও একটা বিচারশীল সমতা অর্জন করে নি। ঐকান্তিক বিরাগ থেকে আবেগময় অতিস্তুতি, এই দুই তুরীয় মার্গে দোদুল্যমান। একসময়ে যন্ত্রদানবের ভয়ভীষণ মূর্তি কল্পনা করে আমরা কখনও উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ কখনও বা সানুনাসিক স্বরে বিলাপ করেছি। যন্ত্র আমাদের কাছে দানব বলে প্রতীত হয়েছে, কারণ আমরা স্বয়ং তার উদ্ভাবন করি নি, তার ব্যবহার ও প্রয়োজন আমাদের জীবনের গভীর থেকে প্রচলিত বা অনুভূত হয় নি। এবং সর্বোপরি, আমাদের তৎকালীন গুরু ইয়োরোপীয় তথা ইংরেজ রোমান্টিকদের কাছ থেকে আমরা সেই পাঠ গ্রহণ করতে শিখেছি। তারপর যখন আমাদের আর্তনাদ ও বিলাপ সত্ত্বেও বিশ্বসংসারের যন্ত্রঘর্ঘর বন্ধ হয় নি তখন অকস্মাৎ আমরা যন্ত্রযুগ সম্বন্ধে এক নির্বোধ

উদ্দীপনার আবেগে আত্মহারা হয়েছি। যন্ত্রযুগ যে বিপুল ও ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন আনে, সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষের জীবনের ধারা ও বিন্যাস অকস্মাৎ আমূল পরিবর্তিত করে তাদের মূল্যবোধ ও নৈতিক বিশ্বাসের নোঙর ছিন্ন করে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যে গভীর বিপর্যয় সৃষ্টি করে ও শূন্যতাবোধের সঞ্চার করে, সে বিষয়ে অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে আমরা ফাঁপা উল্লাসে মুখর হয়ে পড়েছি। আমাদের বক্তব্য গতিমাত্রেই প্রগতি, আর ঘটনাচক্রের সামনে নতি স্বীকারের অপর নামই উন্নতি। এ বিষয়েও আমরা গুরুর কাছে পাঠ নিয়েছি অবশ্য। রুশবিপ্লব যে শিল্পায়নের সূচনা করে সেইটাই আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং তারই প্রেরণায় ময়দানব অকস্মাৎ আমাদের কাছে পরব্রহ্মের পুরোহিত-পদ প্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়নের পশ্চাতে যে রক্তমাংসের জমাখরচের হিসেব জমা আছে তা আমাদের চিন্তাকে অধিকার করে নি—শিল্পবিস্তারও একটা রোমান্টিক 'আবেগের নিঃসরণ'রূপেই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। উভয়ত: এ ধরনের মনোভাব যে সক্রিয় হতে পেরেছে তার কারণ আর কিছু নয়, তার কারণ এই যে, শিল্পযুগ আমাদের কাছে বাইরের জিনিস, আমরা তার নেতা নই—পরিণামফল মাত্র। শিল্পযুগ আমাদের সৃষ্ট নয়, বরং আমরাই তার সৃষ্টি।

অথচ আজ যখন নানাদিক থেকে এই যন্ত্রযুগ আমাদের মধ্যে উপস্থিত তখন তার সামাজিক ও মানবিক ফলাফল সম্বন্ধে অনবহিত থাকা চলে না। আমাদের মানসিক ও জৈবজীবনে এই নিঃস্ব নাগরিক পরিবেশের প্রতিফলন কী হতে পারে, সে বিষয়ে এক বরেণ্য বৈজ্ঞানিকের মতামত প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে উল্লেখ করি :

Yet if we are intellectually and emotionally cut off from Nature, we suffer a loss which is hard to define but which I will try to explain. The inevitable emotional crises of our lives, birth, love and death are essentially natural events which we share with other animals and particularly with the other mammals. These events fit into nature better than they fit into civilization. All three of them are, from the point of view of a mechanized civilization, indubitably messy processes. Our ancestors surrounded them with religious acts: churching, baptism, marriage, funerals and so on. Without that background they lose something. We can regain that loss and more than regain it, if we come to see them as part of the great rhythm of nature. Probably the relations between man and wife are the most natural thing in most urban peoples lives to-day, but because they are part of nature rather than of civilization, we have surrounded them with sin and dirt (JBS Haldane: A layman's view of Nature; What is Life. pp. 230-31)

নাগরিক জীবনে যে একমাত্র সম্বন্ধ আপন স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে পারে তা স্ত্রীপুরুষের বা স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ। এবং তা স্বাভাবিক বলেই নাগরিক সভ্যতার আওতায় তার থেকে জন্ম নেয় পাপ ও নোংরামির ধারণা। অস্বাভাবিক পরিবেশে কৃতির পথেই বিকৃতির উদ্ভব। বস্তুত: আজকের সাহিত্যে ও শিল্পে নানা ক্ষেত্রে সেক্স এবং ক্রাইমের (যেন দুই-ই সমার্থক) ঢক্কানিনাদ শোনা যায় তা যে এই উপবাসক্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষের নেশার প্রয়োজন মেটাতে, সে কথা তো আমরা সকলেই জানি। কারণ ক্ষুধার খাদ্য আমরা পাব না—তাই নেশায় মেতে আমরা আমাদের প্রয়োজনের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে প্রয়াসী। এর আর এক প্রতিক্রিয়া হল ধর্মবিলাসিতা। তারও প্রাবল্য আজ সর্বত্রই উপলব্ধি করা যায়।

অথচ এই অবস্থায় যা প্রয়োজন ছিল, তা হল এই পরিবেশের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। এবং এই বিশ্লেষণ শুধুমাত্র শুষ্ক বুদ্ধির বিচারণের পথেই সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন পরিণত বিজ্ঞানবুদ্ধি। অথচ আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এখনও পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ ও তাচ্ছিল্যপরায়ণ। তাঁদের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক আজও

ঃ একজন বিশেষজ্ঞ—specialist, এবং বিজ্ঞান কেবল-জ্ঞানচর্চার বিশেষ একটি ধারা মাত্র। G. E. Moore-দর্শন আলোচনায় Russell যা উল্লেখ করেছেন, লী বুদ্ধিজীবী তথা শিক্ষিত সমাজের ক্ষেত্রে তা ও কত বেশী সত্য!...I think that his philohy, suffered from the fact that his educa-ı was purely literary. He knew very le science and apparently did not think t science had any important bearing on losophy. (Trinity College: Cambridge. nual Record 1959, p. 39)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বলতে কি বোঝায়, পর্যবেক্ষণ ও ক্ষার সঙ্গে বিচারবিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের যে জীবন্ত যোগ উপস্থিত, সে বিষয়ে আমাদের মনোরাজ্যে নও স্বীকৃতি নেই। যে কোনও মতবাদের চুলচেরা যণে আমাদের যে অদম্য আগ্রহ, বাস্তব বহির্বিশ্বকে ক চোখ মেলে দেখার সম্পর্কে তার অর্ধেক উৎসাহও পি দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং একে তো মধ্যবিত্ত নের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব জগতের সঙ্গে আমাদের জ্ঞতার সম্বন্ধ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তার ওপর নব্য-ার উত্তরাধিকারীরূপে আমাদের বুদ্ধির প্রবণতা ও যভাবে বুদ্ধির চর্চা। এই সমস্ত কিছুর সমবায়ে যে ঙ্গী গড়ে ওঠে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল নয়, যেহেতু বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত আমাদের ধারণায় রণ সংস্কৃতির বহির্ভূত একটা বিশেষ বৃত্তির চর্চা মাত্র, কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ আশ্চর্য জ্ঞানিক। আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও ষ যোগ নেই। ফলে একদিকে যেমন আমরা জ্ঞতার ক্ষেত্রে যন্ত্রযুগের বাইরের মানুষ, তল্পিদার অন্যদিকে বুদ্ধির ক্ষেত্রেও আমরা আধুনিক যুগের ঙ্গনে রবাহুতের মত জটলা করছি এবং যেন-তেন-বেশ প্রকৃত অতিথিদের কায়দাকানুন আয়ত্ত করে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কালক্ষেপ করছি। এর াম বা অন্য নাম নকলনবিসী। আধুনিক যুগ আমাদের মনকে মোহিত করে, কিন্তু তার স্বরূপ আমাদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত। এবং সেই কারণেই সাহিত্য ও চিত্রকলায় যে কোনও রীতি বা শৈলী, চিন্তার রাজ্যে যে কোনও মত বা আদর্শ যদি আমাদের কাছে 'আধুনিক' এই বিশেষণটি এঁটে সমুপস্থিত হয়, সেইটাই অপ্রতিবাদে আমরা শুধু মেনে নিই নয়, সে বিষয়ে উৎসাহ না দেখিয়ে পারি নে। এই উৎসাহে আন্তরিকতা কতটুকু সে প্রশ্ন আপাততঃ উহ্য থাক্। লক্ষণীয় আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের 'ইস্কুল বয়' মনোবৃত্তি, যে কোনও ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাশন্ সম্বন্ধে সসম্ভ্রম দাস্যভাব। এর ফল এই যে, আধুনিক যুগে যে সব বহু বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বমন্থন চলেছে, সে বিষয়ে আমাদের নিজস্ব কোনও বক্তব্য গড়ে ওঠে নি। আমাদের বুদ্ধি উত্তরোত্তর অপরিণত হয়ে পড়ছে। এবং আধুনিকতা সম্বন্ধে এই অজ্ঞ উৎসাহ দাস্যভাবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বলে একদিকে যেমন আধুনিক যুগের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ে আমাদের চিত্ত বিমুখ, অন্যদিকে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির উৎস সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে মঁমাতরের শিল্পীদের নানা খুঁটিনাটি কলকাতার অনেকেই এখন মুখস্থ করেছেন, কিন্তু আধুনিক যুগে যে শিল্পীগোষ্ঠি প্রকাশের বলিষ্ঠতায় ও ইতিহাসবোধের গভীরতায় চিত্রকলার সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছেন, আমাদের চিত্রকর বা সমালোচকবৃন্দ তাঁদের সম্বন্ধে এখনও উদাসীন। আমি Mexican Murals-এর শিল্পীগোষ্ঠির কথা বলছি। অথচ পশ্চিম-ইয়োরোপীয়দের তুলনায় তাঁদের মর্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হতে পারত। কারণ নিপীড়নের অভিজ্ঞতা তাঁদের মত আমাদেরও। কিন্তু বোধ হয় অভিজ্ঞতার এই সাযুজ্যই আমাদের পক্ষে তাঁদের গ্রহণের পথে বাধা—কারণ আমরা সত্য হতে চাই না, আত্ম-অবিশ্বাসবশতঃ আজব কিছু হতে চাই।

ইম্প্রেশনিস্টরা স্বয়ং তাঁদের যুগে জাপানী ছবির প্রিন্ট দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রেরণা পেয়েছিলেন। চৈনিক চিত্রকলার উৎকর্ষ সম্বন্ধে বাক্-

বিস্তারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পূর্ব এশিয়ার এই আশ্চর্য শিল্পসমৃদ্ধি থেকে আমাদের কজন শিল্পী পাঠ নিতে প্রস্তুত? এবং কেন প্রস্তুত নন? কারণ আমরা যেখান থেকে পাঠ নিই সেখানকার প্রচলিত ফ্যাশন বা তার এক পা বাইরে যাবার ক্ষমতা আজ আমাদের নেই। এবং সেই বিষয় চালু Jargon পরম্পরের প্রতি নিক্ষেপ করেই আমাদের আত্মতৃপ্তি।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও ফ্যাশনের এই অন্ধ দাসত্ব মর্মান্তিক। যে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা নিয়ে আমাদের এত মত্ততা তার আদি-উৎস গ্রীকভাষা শিক্ষা দিতে পারে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান কলকাতায় নেই। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকেই এ কথা বলছি। আর যে এশিয়ার ঐক্য নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা এত আত্মতৃপ্তি বোধ করে, সেই এশিয়ার এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা ও নানা দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে পারে এ রকম কোনও সংস্থাও এ শহরে পাওয়া যাবে না। ফলে আমাদের চেতনা আধুনিক পশ্চিম ইয়োরোপের আবছা পরিচয় সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ—সে পরিচয় গভীর করার কোনও পথ নেই, কারণ ধ্রুপদী ইয়োরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণের কোনও উপায় এখানে নেই। কিন্তু কোনও সাহিত্য বা সংস্কৃতির পরিচয় যদি গ্রহণ করতে হয় তা হলে তার মৌল উৎসগুলির সন্ধান নেওয়া সন্ধানীর দায়িত্ব। খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় যোগ দেবার পূর্বে রামমোহনকে গ্রীক ও হিব্রু আয়ত্ব করতে হয়েছিল। আজকের দিনে ইয়োরোপীয় 'কলচর' নিয়ে তিন পংক্তিতে যাঁরা বিশ্বসাহিত্যের সমাহার পরিবেশন করেন তাঁদের মধ্যে কজন সেই সংস্কৃতির Archetypical formগুলি সম্বন্ধে অবহিত—সেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে জার্মাণ কবি শীলরের চেয়ে যথার্থ কথা আর কেউ বলেছেন বলে আমি জানি না। কার্লাইলের অনুবাদের মাধ্যমে সেই মহদুক্তি আপাততঃ উপস্থিত করি

The artist is surely the son of the age bu[t] pity for him if he be its favourite or eve[n] its pupil!

শিল্পী ও তৎস্মযুগের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা কখনই স্থূল একমুখী হতে পারে না—তার মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন থাকবে, কারণ শিল্পী যদি আর কিছু নাও হন অন্তত একটি সচেতন সত্তা নিশ্চয়। এবং শিল্পীর বা বুদ্ধিজীবী দায়িত্ব শুধু একটি কালকে ধারণা করা নয়, তাঁর জ্ঞাত সম[গ্র] কালপর্যায়কে আত্মচেতনায় যথাসম্ভব বিধৃত করা। তাঁ[র] কর্তব্যও শুধু কথিত বর্তমানের প্রতি নয়, মূলতঃ ভবিষ্যতে[র] প্রতি, কারণ বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের একটি কাল্পনি[ক] মিলনবিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর প্রথম দায়িত্ব তাই নিজে[র] অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, এবং সেই ভূমিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও কালে[র] বিভিন্নমুখী চিন্তা ও সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করা। ব[লা] বাহুল্য, এক জীবনে এ কাজ সম্পূর্ণ হবার নয়। তবু য[দি] আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তি সম্বন্ধে সচেতন থা[কি] এবং আমাদের চর্চার সঙ্গে চর্যা ও অভিজ্ঞতার যো[গ] রক্ষিত হয়, যদি আমাদের সৃষ্টি সত্তার সেই উৎসমূল থেকে উঠে আসে যেখানে চিন্তা ও অনুভব ব্যাপক জীবনচেতনা একনীড় হয়ে গেছে, তবে আমাদের সমস্ত আপাতব্যর্থতা সত্ত্বেও ক্ষোভের কিছু থাকে না। কারণ—

> "Men must endure
> Their going hence, even as
> their coming hither
> Ripeness is all."

---

* বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্যসমূহ নেওয়া হয়েছে Calcut[ta] Corporation Year Book 1946 ও 1959 থেকে এবং অধ্যাপ[ক] নির্মল বসুর Social and Cultural Life of Calcutta.· Geographical Review, Vol. 20, Dec. 1958 থেকে।

জীবনীসাহিত্য ঃ রূপ ও স্বরূপ

রথীন্দ্রনাথ রায়

[লি]টন স্ট্রাচি ফরাসী জীবনীসাহিত্যের তুলনায় ইংরেজী জীবনীসাহিত্যের দৈন্য লক্ষ্য করে একসময় [আ]ক্ষেপ করে বলেছিলেন : "We have had, it is [tru]e, a few masterpieces, but we have never [ha]d, like the French, a great biographical [tra]dition ;⋯ with us, the most delicate and [hu]mane of all the branches of the art of [wri]ting has been relegated to the journeymen [of] letters ; we do not reflect that it is [per]haps as difficult to write a good life as to [liv]e one." স্ট্রাচির এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান-[যো]গ্য। কারণ তিনি এই সূত্র-সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্য দিয়ে [জীব]নীসাহিত্য রচনার নিগূঢ় রহস্যটিকেই নির্দেশ [ক]রেছেন। 'Delicate and humane'— এই দুটি [সূক্ষ্ম] ও অভ্রান্ত বিশেষণ সাহিত্যের এই বিশেষ বিভাগটির [প্রকৃতি ক]থা বিদ্যুৎরেখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। যিনি [এক]সময় আমাদের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু আজ আর নেই, [তাঁর] জীবনের আন্তরিক রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত [দুরূ]হ ব্যাপার সন্দেহ নেই। কারণ জীবনীসাহিত্য শুধু [ব্যক্তি]বজীবনের একটি বহিরাশ্রয়ী ইতিবৃত্ত নয়, তার [অন্তর]াশ্যশায়ী গূঢ় ব্যক্তিত্বের উদ্‌ঘাটনও বটে। ভাল-মন্দ [সব]কিছু নিয়েই একটি গোটা মানুষের রূপ ও স্বরূপের সান্নিধ্য পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করা চাই।

কিন্তু গোটা মানুষের অন্তরঙ্গ ছবি আঁকা সহজ ব্যাপার [নয়]। কারণ এ সম্পর্কে অতিভক্তি ও ভক্তির অভাব—[দুই]ই সমানভাবে বিপজ্জনক। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে [চৈত]ন্যদেবের চরিতগ্রন্থগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা [যায়]। ভক্তির আতিশয্য ও আধ্যাত্মিকতার ফেনোচ্ছ্বাস [অনে]ক সময় চৈতন্যদেবের রক্তমাংসের মানবমূর্তিটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখানে জীবনটি যেন উঁচু সুরে বাঁধা, তাই পদে পদে অলৌকিকতা ও আকস্মিকতার চমক। কারণ বৈষ্ণব মহাজনেরা ভক্তির চন্দনলেখায় মহাপ্রভুর ছবি এঁকেছেন। তাই তাঁদের লেখা জীবনী চরিতামৃত! জীবনীলেখকেরা যেখানে প্রথম থেকেই ভাবাবিষ্ট ও চরিতের মধ্যে অমৃতসন্ধানী, সেখানে যথার্থ জীবনচরিত রচিত হওয়া সম্ভব নয়। ভক্তির আতিশয্য এখানে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে। এর বিপরীত রীতিটিও সমভাবেই মারাত্মক। নিন্দুকের মনোবৃত্তি নিয়েও জীবনচরিত রচনা করা সম্ভব নয়। জীবনীলেখককে তাই এই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। একজন আধুনিক সমালোচক চরিতচয়িতার এই দুরূহ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন : "He must judge the facts, but he must not sit in judgments. He must respect the dead—but he must tell the truth."

আধুনিক চরিতসাহিত্য ও উপন্যাস প্রায় একই সময় উদ্ভূত হয়েছে। ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীরচনা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ, কারণ আখ্যায়িকা অংশও প্রধানতঃ তাঁরই রচনা ; অপর পক্ষে জীবনীরচয়িতার উপাদান নির্দিষ্ট—সেই উপাদানের কোন মৌলিক পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যে উপাদানকে তিনি অবলম্বন করবেন, সেই উপাদানের নির্দেশ তাঁর অবশ্যপালনীয়। এই দিক থেকে জীবনীরচয়িতার দায়িত্ব অনেকটা ঐতিহাসিকের মত। ঐতিহাসিককে যেমন তাঁর 'ডকুমেণ্টে'র নির্দিষ্ট বিধান মেনে চলতে হয়, চরিতরচয়িতাকেও তেমনি তাঁর উপাদান উপকরণের উপর নির্ভর করতে হয়। এইজন্য জীবনীকে উচ্চতর সাহিত্যে পরিণত করা সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু তাই বলে কতকগুলি শুষ্ক উপাদান ও উপকরণই

চরিত-রচয়িতার একমাত্র সম্বল নয়। যে উপকরণকে তিনি অবলম্বন করেন, সেই উপকরণের মধ্যে তাঁর প্রবেশ করা চাই। যে চরিতটি তিনি গ্রহণ করবেন, তার দেশ-কাল-পরিবেশ, তার চলা-ফেরা, আচার-আচরণ সবকিছু তাঁর নিজের করে তোলা চাই। অথচ এত করেও তাঁর ভুললে চলবে না যে, তাঁর বিষয়বস্তু ও তিনি এক নন। জীবনীরচয়িতার সঙ্গে তাঁর অবলম্বিত চরিতটির সম্পর্ক এক বিচিত্র ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত। চরিতকার তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজেকে অনেকখানি মিলিয়ে দিয়েও অনাসক্ত দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করবেন। অনেক সময় চরিতকার তাঁর অবলম্বিত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগার অনেকখানি প্রকাশ করেন। জীবনীসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক আঁদ্রে মরোয়াঁ যখন শেলীর জীবনী রচনা করেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি যে এ বিষয়ে কতখানি কার্যকরী হয়েছিল, তা তিনি উল্লেখ করেছেন: "It seemed to me indeed, that to tell the story of this life would be a way of liberating me from myself." চরিতকারের এই 'আত্মমুক্তি'র স্বপ্ন নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান স্বীকৃতি। অবশ্য এই পদ্ধতির মধ্যে আতিশয্য-দোষ ও ভারসাম্যচ্যুতির সম্ভাবনাও থাকে—জীবনী সেখানে একজাতীয় আত্মজীবনীতে পরিণত হয়। কিন্তু জীবনী রচনার উপাদান নির্বাচন সম্পর্কে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচি ও হৃদয়াংশকে প্রকাশ করে থাকেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে ফ্রয়েড বলেছেন: "They frequently select the hero as the object of study because, for personal reasons of their emotional life, they have a special affection for him from the very outset."

২

উপাদানকে যথাযথভাবে গ্রহণ করেও চরিতকার কি ভাবে তাঁর স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারেন, এ সমস্যার কথা স্ট্রাচিও ভেবেছিলেন। চরিতকার তথ্য সংগ্রহ করবেন, কিন্তু সেই তথ্যকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবে নিজেরই ব্যাখ্যা ও বোধের দ্বারা। অনেক সময় উপকর ও তথ্যের প্রাচুর্যসত্ত্বেও ভাল জীবনী রচিত হয় না, কার জীবনী অর্থ তথ্যপঞ্জী নয়। তথ্য সংগ্রহ করা এক জিনিস তথ্যকে একটি শিল্পরূপ দেওয়া আর এক জিনিস ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ চরিতসাহিত্যকে একজাতীয় 'superio craft' বলেছেন। যে সমস্ত জীবনীগ্রন্থ সাহিত্যে উচ্চস্থা অধিকার করেছে, যাদের রসমূল্য সাহিত্যক্ষেত্রে ক্লাসি মর্যাদা পেয়েছে, তারা শুধু গবেষণানিষ্ঠ বা শ্রমসাধ উপকরণের সঞ্চয়মাত্র নয়। সেখানে রচয়িতার একটি বিশিষ্ট রসদৃষ্টি চাই। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত সার্থক জীবনীসাহিত্যও উপকরণকে নিয়েই, অথচ সেই উপকরণের অতিরিক্ত আরও কিছু সেখানে থাকে তাই সাহিত্যিক জীবনচরিতগুলিও একজাতীয় 'নির্মিতি'

জীবনীরচয়িতাদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি সেই জীব থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন, তাঁরা নিঃসন্দে ভাগ্যবান। তাঁদের সুবিধাও অনেক। কারণ তি রক্তমাংসের দেহধারী মানুষটিকেই অত্যন্ত কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই জাতীয় চরিতগ্রন্থের বসওয়েল রচিত জনসনের জীবনচরিতই খ্যাততম বসওয়েল ছিলেন ডক্টর জনসনের নিত্যসঙ্গী, তাই তাঁ আচার-আচরণ, চালচলন, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনে খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্তও এই কুশলী চরিতকারের দৃষ্টি এড়ায় নি। বসওয়েলের চিত্রনৈপুণ্য ও পর্যবেক্ষণদক্ষত বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অতিনৈকট্যে কতকগুলি দোষও আছে—বসওয়েলও যেগুলি অতিক্র করতে পারেন নি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ একসময় 'মনুষ্যে জীবনচরিত' আলোচনাপ্রসঙ্গে বসওয়েলের ত্রুটিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

"বসওয়েল জনসনের আত্মার ভাবে একেবারে অভিভূ ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও জনসন্ বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। দুর্বলস্বভাবা কুমারীরা যেরূপ আপনাদে বিকৃত কল্পনার আবেগে ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনি

রূপ জন্‌সন্‌ কর্তৃক আবিষ্ট থাকিতেন। এই গুণেই ন অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন ; অথচ এই ই আবার তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। সনের সহিত অপরের তুলনা করিবার কালে, তাঁহার -অন্যায় বোধ থাকিত না ; এবং তাদৃশ ব্যক্তির য়ের মর্মোদ্‌ঘাটনের জন্য যেরূপ বুদ্ধি আবশ্যক তাহাও হার ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্‌সনের কটবর্তী হইলেই স্তম্ভিত হইত।"

পরবর্তীকালের চরিতকারদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভাগ্য না থাকলেও কালগত দূরত্বের জন্য তাঁরা চরিত-কে অধিকতর বস্তুধর্মী করে তুলতে পারেন। সনের ব্যক্তিত্বের স্তম্ভিত দর্শক বস্‌ওয়েল যেমন নিজেকে রিয়ে ফেলেছেন, তেমন দুর্ভাগ্য ঘটার সম্ভাবনা এখানে য়। কালের ব্যবধান ব্যক্তির সমগ্র স্বরূপটিকে উদ্ভাসিত রে তোলে, এখানে ব্যাখ্যা ও ভাবনার অবকাশ অনেক শী থাকে। সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে অনেক সময় তুচ্ছ ও টিনাটি বিষয়ের আড়ালে ব্যক্তির সমগ্র চরিত্ররূপটি পা পড়ে। জীবনের অনেক ঘটনার যথাযথ ও বিস্তৃত িনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ঘটনার াড়ালে যে ব্যক্তিত্বের সমগ্র স্বরূপ আছে তার পরিচয় নেকখানি অনুদ্‌ঘাটিতই থাকে। অজিতকুমার চক্রবর্তীর হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' বাংলা সাহিত্যের একখানি ল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ। মহর্ষির সঙ্গে তাঁর চরিত-খকের কোনও সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। এজন্য তাঁর মন আক্ষেপ ছিল, তেমনি কতকগুলি সুবিধাও ছিল। জিতকুমার নিজেই তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

"সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলে এ জীবনচিত্রের রেখাগুলি রও স্পষ্ট হইত, রঙ আরও উজ্জ্বল হইত সন্দেহ নাই। বু বোধ হয় সাক্ষাৎ পরিচয় থাকার যেমন কতকগুলি বিধা আছে, তেমনি কতকগুলি অসুবিধাও আছে। ব কাছ হইতে কোন জিনিসকে দেখিলে তাহার টিনাটিগুলাই অত্যন্ত বেশী নজরে পড়ে ; কোন জিনিসের মগ্র রূপটি দেখিবার পক্ষে বোধ হয় একটুখানি দূরত্বের রকার আছে। সেই জন্য মনে হয়, কোন মহাত্মা যেকালে বাস করিয়াছেন ও কাজ করিয়াছেন, সেই কালটা শেষ হইয়া গেলে, তাহার পরবর্তীকালের লোকের পক্ষেই তাঁহার কালের ভিতরকার অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় সেই মহাত্মার জীবনে কি ভাবে ফলিয়াছে তাহা বোঝা সহজ হয়। একটা কালের চেহারাকে সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য যে একটি দূরত্বের দরকার হয়, সেই দূরত্বটি না থাকিলে অনেক ছোট জিনিস বড় হইয়া উঠিতে পারে এবং যাহা যথার্থ বড় তাহা ছোট হইয়া যাইতে পারে।"

ডক্টর জন্‌সন মনে করতেন যে, যিনি চরিতবর্ণিত ব্যক্তির সঙ্গে ওঠা-বসা, পান-ভোজন করেন নি তিনি কোনদিন উক্ত ব্যক্তির জীবনী রচনা করতে পারবেন না। বলাবাহুল্য, জন্‌সন এখানে এই রীতির দুর্বলতার দিকটি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু তাই বলে লেখার টেবিলের উপর স্তূপীকৃত মালমসলা নিয়ে বসে তাকে সুকৌশলে বিন্যাস করলেও চরিতকারের সবটুকু কর্তব্য শেষ হবে না। চরিতকারকে সমালোচকের ভূমিকাও নিতে হবে—মানুষটির ব্যাখ্যা করতে গেলে, তাঁর অন্তর্জীবন পরিস্ফুট করতে হলে সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আধুনিক-কালের চরিতসাহিত্য বিচারকেরা এই সমালোচনার আশ্রয় হিসেবে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে মনোজীবনের অনুদ্‌ঘাটিত ক্ষেত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক চরিতকারদের মধ্যে কেউ কেউ ফ্রয়েড-প্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করেছেন। জীবনচরিত রচনার মালমসলাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তাঁরা ক্রমশঃ জীবনীবর্ণিত ব্যক্তির মনোজীবনের দুর্গম রহস্যগহনে প্রবেশ করে জটিল গ্রন্থিগুলি মোচন করার চেষ্টা করেন। অপেক্ষাকৃত বড় জিনিসকে বাদ দিয়ে অনেক তুচ্ছ জিনিসের উপরও তাঁদের নির্ভর করতে হয়।

৩

বর্তমান যুগে জীবনীসাহিত্যকে শুধু কয়েকটি বিশিষ্ট সূত্রের সাহায্যে বিচার করা সম্ভব নয়। কারণ সাহিত্যের এই বিভাগটি সম্পর্কেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

তার ফলে জীবনীসাহিত্য রচনার প্রচলিত ও পূর্ববর্তী ধারণাগুলিও অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনী-সাহিত্যের বহু বিচিত্র আঙ্গিক থেকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী চোখে পড়ে। প্রথমত: প্রচলিত বহু উপকরণ-সমৃদ্ধ ইতিবৃত্তমূলক জীবনী। এই শ্রেণীর জীবনীতে জীবনীকার প্রচুর তথ্যবিন্যাস করেন। বসওয়েল রচিত জনসনের জীবনীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ জীবনীই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই শ্রেণীর জীবনীতে উপরকরণগুলিকে কালানুক্রমিক ভাগে সাজিয়ে তোলা হয়। কোনও কোনও সময় এই জাতীয় চরিতগ্রন্থে দেশ-কাল ও সামাজিক জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা থাকে, দেশ-কালের বিস্তৃত পটভূমিকায় ব্যক্তিচরিত আলোচনা করা হয়। ম্যাসন-রচিত মিল্টনের জীবনী এই জাতীয় চরিতগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইংরেজীতে এই ধরনের জীবনীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'Life and times' বলা হয়েছে। বাংলায় এর খ্যাততম উদাহরণ হল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। এখানে রামতনু লাহিড়ীর জীবনীর চেয়ে 'তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র চিত্রটি বড় হয়ে উঠেছে। প্রকৃত-পক্ষে চরিতগ্রন্থের চেয়ে একে একখানি মূল্যবান সামাজিক দলিল বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনীকে 'চরিত্র-চিত্রণ' বলা যায়। এই শ্রেণীর জীবনীকে চিত্রকরের চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়—ইংরেজীতে এই রীতিকে বলা যায় 'পোর্ট্রেয়েট'। এখানে তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীর মত বিস্তৃতির অবকাশ নেই। এ যেন একটি সযত্নচিত্রিত ছবি, যার চারদিকে আছে ফ্রেমের সংহত বন্ধন। জন্ মর্লে সম্পাদিত 'ইংলিশ মেন অব লেটার্স' গ্রন্থমালাকে এই শ্রেণীর চরিতগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এখানে লেখক উপাদানের কোন কোন অংশকে আপন অভিপ্রায় মত নির্বাচিত করেন। সেই নির্বাচিত ঘটনা ও জীবনবৃত্তাংশের মধ্য দিয়ে চরিত্রটিকে আলোকিত করেন। এই জাতীয় জীবনী এক ধরনের জীবনী-চিত্র। ইংরেজীতে যাকে 'ক্রিটিক্যাল বায়োগ্রাফি' বলা হয়—তাও এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। এই শ্রেণীর চরিতগ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের চরিত্ররূপকে তিনি স্বল্পপরিসর ফ্রেমের মধ্যে কয়েকটি সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ রেখাবিন্যাসে ফুটিয়েছেন। 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধটির উদাহরণ নিলেই চরিত্রচিত্রের স্বরূপধর্মটিকে উপলব্ধি করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চরিত্র রচনায় নিপুণ গবেষকের মত পুঞ্জীভূত তথ্য নিয়ে বসেন নি। হাতের কাছে যে দুখানি প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল, তারই সদ্ব্যবহার করেছেন। এই দুখানি গ্রন্থ হল বিদ্যাসাগর-অসম্পূর্ণ আত্মচরিত ও বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত'। এই দুটি রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে কবি অপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন :

"তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পরমার্থিক ছিলেন ; শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বসওয়েল কেহ ছিল না ; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না।"

বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল ছিলেন না বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রচিত্র রচনা করেছেন, তাতে স্বল্পপরিসরে বিদ্যাসাগরের যে আন্তরিক পরিচয় ফুটে উঠেছে, তার তুলনা নেই। তিনি সামান্য উপাদান সম্বল করে এই অসাধারণ চরিত্রটির দুর্গম জটিল উৎস সন্ধান করেছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর জীবনীকে বলা যায় ঔপন্যাসিক রীতির জীবনচরিত। প্রচলিত তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীর মত বিস্তৃতি ও ঘটনার পল্লবিত প্রাচুর্য এখানে নেই। যে সমস্ত উপকরণকে অবলম্বন করে এই জাতীয় জীবনী রচিত হয়, তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কণ্টকিত করে তোলাও এই জাতীয় চরিতরচনার উদ্দেশ্য নয়। উপাদানগুলি

লিত ও রূপান্তরিত হয়ে একটি ব্যক্তিচরিতে পরিণত। অথচ 'চরিত্রচিত্র' জাতীয় রচনার চেয়ে এর প্রশস্ততর। এই শ্রেণীর জীবনী রচনায় অনেকটা ন্যাসিকের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কালানুক্রমিক নবিন্যাসের ধারাকেও এখানে অনুসরণ করা হয় -চরিত্রটিকে ফোটাতে গিয়ে পরের ঘটনা আগে এবং গর ঘটনা পরে বর্ণিতও হতে পারে।

এই শ্রেণীর চরিতরচনার পথনির্দেশ করেছেন লিটন চ। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ান্স' প্রকাশের পর থেকে চরিতসাহিত্য রচনার নতুন বনার দ্বারোদ্ঘাটন হল। এই গ্রন্থটিকে নতুন ধরনের নী রচনার সর্বপ্রথম উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি বলা যায়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অনাগতকালের জীবনীকারদের তিনীতি সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবনীকারদের পক্ষে তাঁদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিরিক্ত তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান সার্থক চরিতরচনার এক প্রধান রায়। তথ্যের সঞ্চয়ন নয়, নির্বাচন ও সুনিপুণ গ্রহণ-নই হবে চরিতরচয়িতার আদর্শ। এই পদ্ধতির ্যমে তিনি চরিত্রটির অনেক রুদ্ধকক্ষ আলোকিত রছেন। স্ট্রাচি বলেছেন যে সার্থক চরিতরচয়িতা ill attack his subject in unexpected places ; will fall upon the flank, or the rear ; he ll shoot a sudden, revealing searchlight o obscure recesses, hitherto undivined.' রেন্স নাইটিঙ্গেলের চরিতরচনায় তিনি এক নতুন দিক ঘাটিত করেছেন। 'দীপকুমারী' সম্পর্কিত প্রচলিত রণাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়ে তাঁর স্বরূপমূর্তি—ngel of wrath armed with thunderbolt'—য়ে তুলেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে কতকগুলি লিত ও লোকরঞ্জন রোমাণ্টিক উপকথা দিয়ে জীবনী না করা সম্ভব নয় : "It is not his business to complimentary ; it is his business to lay e the facts of the case, as he understands m. That is what I have aimed at in this book—to lay bare the facts of some cases, as I understand them, dispassionately, impartially and without ulterior intentions."

স্ট্রাচির এই নবপ্রবর্তিত রীতি সমকালীন ও পরবর্তী-সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু ইংলণ্ডে নয়, ইংলণ্ডের বাইরেও এই রীতির বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আঁদ্রে মরোয়াঁ, এমিল লুড্‌ভিগ, স্তেফান ৎসাইগ প্রমুখ খ্যাতনামা চরিতরচয়িতারা ঔপন্যাসিকরীতির চরিতরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই রীতির মধ্যে ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনাও অলক্ষ্য-গোচর নয়। জীবনীকে পুরোপুরি উপন্যাস করে তোলার দিকেও একটি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। জীবনী উপন্যাসের কাছাকাছি এসে পড়েছে বটে, কিন্তু জীবনী ও উপন্যাস এক জিনিস নয়। জীবনীর ক্ষেত্রে উপন্যাসের অতি-প্রাধান্য জীবনীর যাথার্থ্য ও বস্তুধর্মিতাকে দুর্বল করে ফেলে। ফলে জীবনী হয়ে ওঠে সুখপাঠ্য উপন্যাস। বলাবাহুল্য, স্ট্রাচি-শিষ্যদের কারও-কারও লেখায় এ লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

৪

রবীন্দ্রনাথ একসময় ইউরোপের চরিতলেখকদের 'চরিতবায়ুগ্রস্ত' বলেছিলেন। বলাবাহুল্য, জীবনীরচনার আধুনিক পদ্ধতি ইউরোপ থেকেই এসেছে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থগুলি প্রধানতঃ ভক্তদের লেখা—তাঁরা ভক্তির তুলি দিয়ে তাঁদের উপাস্যদেবতার এক জ্যোতির্ময় বরমূর্তি এঁকেছেন। অবশ্য এই সমস্ত চরিতগ্রন্থে কোথায়ও মহাপ্রভুর মানবমূর্তি প্রকাশিত হয় নি—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু স্বরূপতঃ, এই সমস্ত চরিতগ্রন্থ চরিত নয়—চরিতামৃত। দর্শন, ধর্ম, কাব্য, রসতত্ত্ব কখনও কখনও সমকালীন সমাজজীবনের ইতিহাসও সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্ত মহাজনের বিষয়ের সঙ্গে অনাসক্ত হতে পারেন নি—ভক্তিচন্দনের দ্বারা মহাপ্রভুকে অর্চনা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীমানস ও বাংলা সাহিত্যের

বিচিত্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের জীবনীসাহিত্য রচিত হল। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'—গদ্যে রচিত প্রথম দুখানি জীবনচরিত, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এদের মূল্য যাই থাক্ না কেন, কোনও সাহিত্যিক মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী-জীবনচরিতগুলিকে বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যিক জীবনচরিত রচনার প্রাথমিক উদ্যম বলা যায়। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীর জীবনচরিত রচিত হয়েছে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, বিহারীলাল সরকারের বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসূদনের জীবনচরিত, নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি', কুমারদেব মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত তিন খণ্ডে বিভক্ত 'ভূদেব-চরিত', নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহনের জীবনচরিত, অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিবেকানন্দের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা চরিতসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বলাবাহুল্য, এই চরিতগ্রন্থগুলি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিবৃত্তমূলক জীবনীর (classical chronicle type of biography) পর্যায়েই পড়ে। এই বৃহদায়তন চরিতগ্রন্থগুলিতে উপাদান ও উপকরণের অভাব নেই, অনেক ক্ষেত্রে শ্রমনিষ্ঠ গবেষণারও পরিচয় আছে।

অন্য কোনও শ্রেণীর অভাবে একই তালিকায় গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করা হলেও এদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত ও সাহিত্যিকগুণগত পার্থক্য আছে। রচয়িতার ব্যক্তিগত নৈতিক দৃষ্টি অনেক সময় বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর জীবনীগ্রন্থটি নানাদিক থেকে মূল্যবান। কিন্তু তাঁর অত্যুগ্র নীতিজ্ঞান অনেক সময় মধুসূদনের কবিচরিত নির্ণয়ের অন্তরায়ই হয়েছে। মধুসূদনের জীবনের মূলসত্য হিসেবে তিনি তাঁর স্বধর্ম-ত্যাগকে অত্যধিক মূল্য দিয়েছেন। এই কারণেই তিনি মধুসূদনের অন্তর্জীবনের মধ্যে প্রবেশাধিকার পান নি। অনুরূপ নৈতিক দৃষ্টি বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থেও অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। বিহারীলাল বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ব্যাপারটি সুনজরে দেখেন নি। তিনি প্রথম থেকেই এই বিষয়টির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের "বিধবাবিবাহ" অধ্যায়টির প্রারম্ভ অংশটুকু থেকেই তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট হবে:

"এইবার সেই বিরাট ব্যাপার। তাহাতে হিন্দু সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর অখ্যাতি; এবং অহিন্দু ও অহিন্দু ভাবাপন্ন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি; সুতরাং যাহার জন্য তাঁহার নাম বিশ্বব্যাপী; এবার সেই বিধবা-বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল।…এ অহিন্দু আচার হিন্দুসমাজে যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, ইহা হিন্দু সমাজের সম্যক্ সৌভাগ্যের পরিচয় বলিতে হইবে। কারুণ্য-প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মসংযমে সমর্থ হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে এই অকীর্তিকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

বলাবাহুল্য, সরকার মহাশয় এখানে তখনকার দিনের রক্ষণশীল 'হিন্দু-সমাজ সংরক্ষকে'র দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসাগরকে বিচার করেছেন। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ফলে তাঁর গ্রন্থে একটি গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে। বাংলাদেশের সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তাঁর গ্রন্থে ফুটে উঠতে পারে নি। এই জাতীয় খণ্ডিত দৃষ্টি সমগ্র চরিত্রের কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় পরিস্ফুট করার পরিপন্থী।

সাহিত্যিক-চরিত গ্রন্থে সাহিত্যের আস্বাদন থাকা চাই। তিনখণ্ডে প্রকাশিত 'ভূদেব চরিত' তথ্যের খনি বিশেষ। কিন্তু এই বৃহদায়তন গ্রন্থটির কোনও সাহিত্যিক মূল্য নেই। ভূদেবের ডায়েরি, চিঠি-পত্র ও অন্যান্য উপকরণকে প্রচুর পরিমাণে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, কিন্তু বিন্যাসের কৌশল, পারিপাট্য ও যথোপযুক্ত ভাষার অভাবে গ্রন্থটি মোটেই সুখপাঠ্য হয় নি। কিন্তু তথ্যভারে সমৃদ্ধ এই সুদীর্ঘ গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এই উপাদানগুলি নিয়ে একাধিক সুখপাঠ্য ভূদেবজীবনী রচনা

সম্ভব। অজিতকুমারের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি সমৃদ্ধ ইতিবৃত্তমূলক জীবনচরিতের মধ্যে বোধ হয় পেক্ষা সুখপাঠ্য গ্রন্থ। অজিতকুমার তাঁর গ্রন্থবর্ণিত খ রীতিটিকে ভূমিকায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"...অতিভক্তি এবং ভক্তির অভাব—এই দুইই চরিত কের পক্ষে সমান বিপদের কারণ। এই সঙ্কট হইতে র্ণ হওয়ার একমাত্র রাস্তা—কোন মানুষের অন্তর্নিহিত ক হইতে স্ফূর্ত হইতেছে যে জীবনচরিতটি—যুগের হাসের অভিপ্রায়ের মধ্যে তাহাকে মেলিয়া ধরা। ার জীবনে সে অভিপ্রায় কতখানি সার্থক হইয়াছে কি পরিমাণে হয় নাই চরিতালোচনার সময়ে তাহা াইবার চেষ্টা করা। তাহা দেখাইতে গেলেই জীবনের রকার মনঃশক্তি এবং বাহিরের বিশ্বশক্তির ঘাত-তঘাতের নাট্যলীলার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।... নের ভিতরকার শক্তি কোথায় তাহার খোঁজ করিতে ত্ত্বের রীতিমত বিশ্লেষণ চাই। বাহিরের বিশ্বশক্তির প্রভাব তাহার উপরে পড়িতেছে তাহার খোঁজ াতে গেলে কালের ইতিহাসের দৃশ্যপট তুলিয়া ধরা । তারপর এই দুয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের যে ক জমিল, তাহাকে দেখাইতে হইবে। জীবনচরিত ার ইহাই এ কালে আদর্শ।"

"ভিতরকার শক্তি" ও "বাহিরের বিশ্বশক্তি"র ঘাত-তঘাতের নাট্যলীলার যবনিকা উন্মোচন করাই চরিত-কের কাজ—এই উক্তিকে অজিতকুমার তাঁর চরিত-় সার্থক করে তুলেছেন। জীবনসম্পর্কিত দার্শনিক ও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে লেখকের সুমার্জিত শিল্পদৃষ্টি ন্বিত হয়েছে। সহজ স্বচ্ছন্দচারী মর্মর-মসৃণ গদ্যরীতি দীর্ঘ-মন্থর চরিতকথাটিকে এক শিল্প-সমুজ্জ্বল রাজকীয় ভিজাত্যে মণ্ডিত করেছে।

৫

বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চরিত-হত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অবশ্য আত্মচরিতের কথা ানে আসে না। ইউরোপে বর্তমানকালে জীবনী-সাহিত্য নিয়ে শুধু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলছে না, চরিতসাহিত্য নিয়ে এক সমৃদ্ধ সমালোচনা সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। বাংলার চরিতসাহিত্যে বৈচিত্র্যও কম। বেশীর ভাগ জীবনচরিতই হয় বিশেষত্বহীন, না হয় নীরস পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, চরিত-সাহিত্যের সাহিত্যিক গুণও সেখানে নেই। তা ছাড়া চরিতসাহিত্যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টাও তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

এই সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও দু-একটি ক্ষেত্রে বাঙালী লেখকেরা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ইতিবৃত্তধর্মী জীবনীসাহিত্যের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চারখণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ 'রবীন্দ্র-জীবনী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রজীবনী রচনা করতে গিয়ে প্রভাতকুমার প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসংস্কৃতির কিঞ্চিদধিক একশো বছরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। শ্রমনিষ্ঠ গবেষণা, ঐতিহাসিকসুলভ তথ্যনিষ্ঠা, দেশ-কাল-সমাজের নিপুণ বিশ্লেষণ প্রভৃতি দিক থেকে প্রভাতকুমারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে বাংলা-সাহিত্যে ইতিবৃত্তধর্মী চরিতগ্রন্থের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলা যায়। কিন্তু সুবৃহৎ জীবনীকে শুধু ইতিবৃত্ত বললেও ভুল হবে, তিনি প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। তবু চার খণ্ডের গ্রন্থটি শেষ করে পাঠকচিত্তে কবিকথিত উক্তিটিই অতৃপ্তির বেদনায় আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : "কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে"।

সাম্প্রতিককালের আর একখানি জীবনচরিত সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বিনয় ঘোষের তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থটি বাংলা চরিতসাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন দিক্ নির্দেশ করেছে। এই গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির জীবনীসাহিত্য বলা যায়। উনিশ শতকের নতুন সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় লেখক বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বল্পায়তন প্রথম খণ্ডটিকে তাঁর এই অভিনব ব্যাখ্যার ভূমিকা বলা যায়। এই খণ্ডে

তিনি মূলত তাঁর বিশ্লেষণপদ্ধতির সূত্র নির্দেশ করেছেন, পরবর্তী দুই খণ্ডে বিদ্যাসাগরের চরিত বিশ্লেষণ করে তিনি রেখাগুলিকে পূর্ণচিত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিদ্যাসাগরচরিত রচয়িতাদের ত্রুটিবিচ্যুতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিটির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র ধারা বিশ্লেষণ করে বিদ্যাসাগরের কর্মচঞ্চল জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত জীবনীরচনার এই সুনিপুণ প্রয়াস বাংলা চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে এক সম্ভাবনাদীপ্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ঔপন্যাসিক পদ্ধতির চরিতরচনাও বাংলাসাহিত্যে শুরু হয়েছে। অবশ্য এই শ্রেণীর জীবনীর সংখ্যা এখনও খুব বেশী নয়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের চরিতগ্রন্থগুলি প্রধানতঃ এই পর্যায়েই পড়ে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের 'শেলী' আঁদ্রে মরোয়াঁর 'এরিয়েল' রচনাটির প্রভাবে রচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক রীতির চরিতরচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্বোক্ত ফরাসী শিল্পীকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' সাহিত্যক্ষেত্রে একসময় খুব আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন: "দিয়াশলাই জ্বেলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এ-বই শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পূজা, দীপ-জ্বালানো আরতি।" বলাবাহুল্য, লেখকের এই উক্তি থেকেই তাঁর রচিত গ্রন্থটির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। ভক্তিচন্দনের দ্বারা তিনি 'পরম-পুরুষ'কে আরতি করেছেন। ভাষার সূক্ষ্ম সুরময় সুষমা, সংক্ষিপ্ত অথচ ইঙ্গিতময় বাক্‌রীতি, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব এই চরিতগ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথম খণ্ডে লেখকের যে ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী খণ্ডগুলিতে ক্রমশঃ তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে—কতকগুলি উপমা, বিশেষণ ও শব্দবিন্যাস মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। লেখক শব্দ নিয়ে খেলতে গিয়ে শব্দের খেলনা হয়ে পড়েছেন। ঔপন্যাসিক পদ্ধতির আতিশয্য দোষও এখানে আছে, তাই জীবনী দিয়ে শুরু করে উপন্যাসে শেষ করেছেন। একে জীবনীর চেয়ে সুখপাঠ্য উপন্যাস বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বিজ্ঞানসম্মত চরিতরচনার বিপরীত কোটি। উচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগ ও ভক্তিচন্দনের অর্ঘ্য চরিতগ্রন্থটিকে চরিতামৃতে পরিণত করেছে।

বাংলা-সাহিত্যে নতুন পদ্ধতির জীবনী রচনার ইতিহাসে প্রমথনাথ বিশীর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। তাঁর 'চিত্র-চরিত্র' এ যুগের পোর্ট্রেয়েট জাতীয় চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন' জীবনী-সাহিত্যের একটি একক গ্রন্থ। প্রায় পঁচিশ বছর আগে তিনি এই অভিনব চরিত-গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের মধ্যেও এই গ্রন্থের দোসর মেলে নি। গ্রন্থকার নিজে এই গ্রন্থটিকে বলেছেন 'জীবন-ভাষ্য'। ব্যক্তি মধুসূদনের নিগূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাব্য-ব্যাখ্যাও করেছেন। লেখক মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব-ব্যাখ্যার দায়িত্বই নিয়েছেন, কিন্তু মধুসূদনের কাব্য-ব্যাখ্যার জন্য যাঁরা এই গ্রন্থটি পড়বেন, তাঁরাও উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। সুনিপুণ কাহিনী-বিন্যাসে, নাটকীয় আকস্মিকতায়, প্যারাডক্স ও এপিগ্রামের বিদ্যুচ্চমকে, কবিকল্পনার রশ্মিরাগে, পরিহাসরসিকের সুমার্জিত বাগ্-বৈদগ্ধ্যে এই চরিতগ্রন্থখানি অভিনব শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে চিরস্থায়ী মর্যাদার দাবি রাখে। কবি, সমালোচক, কথাশিল্পী, নাট্যকার প্রমথনাথ ও পরিহাসরসিক প্র-না-বি, এখানে একই পাত্রে রসপরি[illegible] করেছেন। গ্রন্থটি শুধু মধুসূদনেরই নয়, রচয়িতারও অখণ্ড ব্যক্তিত্বের ছবি।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন: "পাঠকের কেমন লাগিবে তাহা জানি না, তবে ব্যক্তি-মধুসূদন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে—তাহাতে মনে হয়, এই জীবনী মধুসূদনকে লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে পড়িয়া শোনানো হইলে তিনি নিশ্চয়ই উচ্চহাস্যে উল্লাস প্রকাশ করিতেন; মাঝে মাঝে করতালি দিয়া উঠিতেন; মিসেস ডি-কে ডাকিয়া শুনাইতেন; আর লেখক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে বলিতেন—'Don't go away, man; boy, give him a peg.'

লেখকের এ অনুমান মিথ্যা নয়—মিথ্যা হলে ব্যক্তি মধুসূদনও মিথ্যা হতেন!

উইলিয়ম হিকি (৩)

কলকাতার আশেপাশে

গ্রীষ্মকালে মার্চ মাসের পর আদালতের ছুটি মিলল কিছুদিন। এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে বড়াতে বেরুলাম। একটি ফিটনে করে প্রথমে গেলাম ্যারাকপুর—কলকাতা থেকে মাত্র মাইল পনের দূরে। ্যারাকপুরে সিপাইরা থাকে, এবং প্রত্যেক মাসের পয়লা ারিখে সিপাইদের একটি ব্যাটেলিয়ন সেখান থেকে ফোর্ট ইলিয়মে যায় 'ডিউটি' দেবার জন্য। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ্যারাকপুরে থেকে আমরা পলতায় গেলাম জন প্রিন্সেপের াছে, তাঁর কাপড় ছাপানোর কারখানা দেখতে। তিনি ামাদের যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করলেন, এবং আমরা 'দিন বেশ আরামে সেখানে কাটিয়ে দিলাম। পলতা থকে আমরা চন্দননগর গেলাম ফরাসী গবর্নরের বাড়ি। ার বাড়িতে অবশ্য তিনি তখন থাকতেন না, মঁশিয়ে শভিলার্ড নামে একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসী ভদ্রলোক াকতেন। তিনিও আমাদের বেশ রাজকীয় স্টাইলে াপ্যায়ন করলেন। চন্দননগর থেকে গেলাম চুচুঁড়ায়, ংলাদেশের ডাচ উপনিবেশে। তখন গবর্নর ছিলেন ঃ রোজ। হল্যাণ্ডে জন্ম হলেও, তাঁর পিতা ছিলেন চম্যান। ডাচ গবর্নরও ঠিক নবাবের মতন বাস করতেন চুচুঁড়ায়। মধ্যে মধ্যে তাঁর কৌন্সিলের সদস্যদের সভা বসত তাঁর বাড়িতে এবং সভার শেষে কেউ তাঁর দিকে পিছন ফিরে যেতে পারত না। অর্থাৎ ফিরে যাবার সময় তাঁদের এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে হত। যাবার সময় তাঁরা মাথা হেঁট করে হাত তুলে সেলাম করতে করতে যেতেন। আমরা যেদিন তাঁর বাড়িতে পৌছলাম, সেদিন দেখলাম তাঁর বাড়ির বিশাল একটি হলঘরে প্রকাণ্ড একটি টেবিল পাতা, এবং তার উপর প্রায় পঞ্চাশটি কভার বিছানো। বুঝলাম এটি ভোজের আয়োজন ছাড়া কিছু নয়। ভোজের সময় হল যখন, তখন হলঘরের পিছনের একটি দরজা হঠাৎ খুলে গেল, এবং সকলের সামনে আবির্ভাব হল গবর্নর রোজের। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কায়দায় ব্যাণ্ড বেজে উঠল, এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাজনা চলতে থাকল—থামল না। সন্ধ্যার সময় আমরা ফোর্ট ও পাবলিক বিল্ডিং সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তিনদিন মহানন্দে চুঁচুড়ায় কাটিয়ে আমরা আবার পলতায় গেলাম প্রিন্সেপের কাছে, এবং সেখানে আরও তিনদিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

'ক্যাচ ক্লাবের' কথা

কলকাতায় ফিরে এসে আমি একটি ক্লাবের সভ্য হলাম, তার নাম 'ক্যাচ ক্লাব' (Catch Club)। এরকম একটি চমৎকার ক্লাবের সভ্য আর কখনও আমি হয়েছি বলে মনে পড়ে না। ক্লাবটি মহিলাদের কাছে মোটেই পছন্দসই ছিল না, এবং তাঁদের ঢুকতেও দেওয়া হত না ক্লাবে। অর্থাৎ ক্লাবের সভ্য হবার অধিকার ছিল না মহিলাদের। কয়েকজন সুরশিল্পী ও সঙ্গীতরসিক মিলে এই ক্লাবটি গড়ে তোলেন। 'হারমনিক' নামে সুরজ্ঞদের একটি সভায় এই ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। দেখা যায়, সেই সভায় যখন কোন সঙ্গীত বা বাজনা হত, তখন কাঁচা-বয়সের ছেলেমেয়েরা অনবরত বক্‌বক্ করে কথা বলে তার রসভঙ্গ করে দিত। সুতরাং বিজ্ঞ ও বিশুদ্ধ রসিকরা মনস্থ করলেন যে তাঁরা একটি আলাদা সুরসভা করবেন, এবং তাতে বেরসিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এই সভারই আমি সভ্য হলাম। আমি অবশ্য পুরনো হারমনিকেরও সভ্য ছিলাম, কিন্তু নতুন সভা স্থাপিত হবার পর হারমনিক ক্রমে একটি নাচসভায় পরিণত হল, এবং তার খ্যাতি কমে গেল অনেক। তরুণী মেয়েরা বিদ্রূপ করে নতুন ক্লাবকে বলত 'He Harmonic,' অর্থাৎ 'পুরুষ হারমনিক'। নতুন ক্লাবের উদ্বোধন হল বিখ্যাত একটি কনসার্টের মহড়া দিয়ে। কলকাতা শহরের খ্যাতনামা শিল্পীরা সকলে প্রায় এই মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা সাতটায় আরম্ভ হয়ে কনসার্ট শেষ হল রাত্রি সাড়ে নটায়। দশটায় আমরা 'সাপার' খেতে বসলাম। তারপর আরম্ভ হল ভাল ভাল 'catch,' 'glee' ও একক-সঙ্গীত। লর্ড স্যাণ্ডউইচের বিখ্যাত 'ক্যাচ ক্লাবের' সভ্য মিঃ প্ল্যাটেল থেকে আরম্ভ করে গোল্ডিং, হেইনস, প্লেডেল প্রমুখ নামজাদা গায়করা একে একে গাইলেন, এবং ক্লাবের সভ্যরা পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করলেন। অবশেষে আমারও ডাক পড়ল, এবং আমি সভাপতির চেয়ারে বসেই কয়েক কেটলি শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলাম। সভাস্থ সকলে আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাহবা দিতে লাগলেন। প্ল্যাটেল নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে এই অমূল্য প্রস্তাবের জন্য স্বর্ণাক্ষরে আমার নাম খোদাই করে রাখা উচিত।

গানবাজনার মজলিসে রাতভোর হয়ে গিয়ে সূর্য উঠে গেল। মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেল বলে সেইদিনই ঠিক করা হল যে রাত দুটো বাজলেই এবার থেকে শ্যাম্পেনের অর্ডার দেওয়া হবে। ক্লাবের সভ্যসংখ্যা পঁচিশ জনের বেশী হবে না বলে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু 'ক্যাচ ক্লাব' শেষ পর্যন্ত এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে একটি সভ্যপদ খালি হলে তার জন্য অন্তত পঞ্চাশজন আবেদন করতেন।

পপাত গর্ত মধ্যে

বাংলাদেশে তখন যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রায় জলের মতন মদ্যপান করতেন, এবং নানারকমের ভোজসভায় কেবল নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতেন। সামাজিকতার ব্যাপারে আমি বিশেষ অনুরাগী ছিলাম, এবং সেইজন্য কলকাতা শহরে অল্পদিনের মধ্যে 'best host' বলে আমি সকলের কাছে পরিচিত হলাম। বেলা ১টায় সাধারণত তখন ডিনার খাওয়া হত, এবং খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যার আগে গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরুনো হত ঘোড়-দৌড়ের মাঠের দিকে। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে বেড়াতে বেড়াতে সকলে কিছুক্ষণ গল্পগুজবও করতেন।

একবার আমি একটি বেশ বড় ডিনার-পার্টি দিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন হেফারম্যান নামে একজন আইরিশ ভদ্রলোক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন এমনিতে খুব চমৎকার লোক, তবে একটু ল্যাদ্‌লেদে স্বভাবের। অতিথিদের সকলকে আমি আকণ্ঠ মদ্যপান করালাম। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সকলেই চিত হয়ে পড়লেন—হেফারম্যান ছাড়া। কিন্তু তিনিও আর এক ফোঁটাও পান করতে চাইলেন না। আমি তাঁকে বললাম, "চলুন একটু বাইরে থেকে হাওয়া খেয়ে ঘুরে আসি, তা হলেই শরীর ও মেজাজ দুই-ই ঠিক হয়ে যাবে।" আমার

স্তাবে তিনি রাজী হলেন, এবং আমরা দুজনে আমার ফটনে করে বেরিয়ে পড়লাম।

যত জোরে একজোড়া ঘোড়া দৌড়তে পারে, তত জারে আমার ফিটনও ছুটতে লাগল। আধঘণ্টার ধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। কি অন্ধকার, কি বা আলো, কোন কিছুরই চেতনা তখন আমার ছিল না। কণ্ঠ তো বটেই, মাথা পর্যন্ত তখন আমার ক্ল্যারেটে আচ্ছন্ন—রীতিমত ভোঁ ভোঁ করছে। ঘোড়া কোন্‌দিকে ছুটছে, তার দিকনির্ণয় করাও তখন ঃসাধ্য। সঙ্গী হেফারম্যান গাড়ির মধ্যে দু-চারবার চণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা ক ঠিক রাস্তায় চলেছি? আমার তো তা মনে হয় না।" আমি তাঁর কাছে স্বীকার করলাম যে সঠিক রাস্তার বর আমি জানি না। এ কথা বলতে না বলতেই ঘোড়া টি ফিটনসহ আমাদের নিয়ে বিরাট একটি গর্তের মধ্যে ড়মুড় করে পড়ল। গর্তটি প্রায় বারো-চোদ্দ ফুট গভীর এবং বারোমাসের মধ্যে আটমাস জলে ভর্তি থাকে। কন্তু আমাদের পতনকালে, ভাগ্য ভাল বলেই গর্তটি কনো ছিল। স্বর্গ থেকে নরকে পড়লেও বোধ হয় মানুষ এরকম হতভম্ব হয়ে যায় না। আমবা অবাক না তে হতে প্রায় অজ্ঞানই হয়ে গেলাম, এবং সম্বিৎ-হারা য়ে যেন একটা অন্ধকার কবরের মধ্যে হাঁটুমুখ গুঁজে ড়ে রইলাম। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন দেখলাম, আমার আইরিশ বন্ধুটি পুঁটলি পাকিয়ে পাশে পড়ে য়েছেন, এবং হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে কি যেন তড়াচ্ছেন। আমার মাথায় হাত ঠেকতেই বললেন, এই যে পেয়েছি, নিশ্চয় ঘোড়া নয়, হিকি সাহেবের মাথা।" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" তিনি বললেন, 'এমন গাড্ডাতে ফেলেছেন যে আর উঠতে পারব বলে তা মনে হচ্ছে না। কোথায় ধরণী আর কোথায় আমি, তা কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। দয়া করে আমাকে গাড্ডা থেকে নির্গমনের পথ দেখিয়ে দিন।"

"পথ তো নিশ্চয় দেখানো উচিত, কিন্তু উভয়েরই য অবস্থা তাতে কে কাকে পথ দেখাবে বলুন!" এই কথা বলে আমি কোনরকমে মাটি হাঁচড়ে উপরে ঠেলে উঠলাম, এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার বন্ধুটিকেও উঠতে সাহায্য করলাম। দূরে দেখলাম একটি আলো জ্বলছে। বন্ধুটিকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলে আমি সেই আলো লক্ষ্য করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ঘোড়া দুটি সম্বন্ধে খোঁজ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে হনহন করে চলতে চলতে আবার ফের একটি গর্তের মধ্যে পড়লাম। পা মুচকে বেকায়দায় পড়াতে এবারে রীতিমত আঘাত পেলাম—মনে হল যেন হাড়গোড় ভেঙে গেল। চোখের সামনে থেকে আলো নিভে গেল, অন্ধকারে চেতনাও ক্রমে ডুবে যেতে লাগল। এ রকম ঘোর সংকটে কখনও পড়ি নি। এমন সময় কয়েকজন এদেশী গ্রাম্যলোক ওই স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা আমায় দেখতে পেয়ে দাঁড়াল, এবং গর্ত থেকে টেনে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল। হাসপাতাল কাছেই ছিল, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যে পালকিতে করে সেখানে পৌছতে কোন অসুবিধা হল না। লোকজনেরাই আমার জন্য পালকি ডেকে এনেছিল।

হাসপাতালে হেড-সার্জেনের ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি তাঁকে আদ্যোপান্ত ঘটনার বিবরণ দিলাম, এবং আমার সঙ্গীটিকে কি অবস্থায় রেখে এসেছি, তাও তাঁকে জানালাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি লোকজন পাঠিয়ে আমার ঘোড়া দুটি, গাড়ি ও বন্ধুটিকে খুঁজে নিয়ে এলেন। ঘোড়া দুটি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে রয়েছে দেখে আমার খুবই আনন্দ হল। হেফারম্যানও দেখলাম বিশেষ আঘাত পান নি, হাঁটুতে সামান্য চোট লেগেছে মাত্র। আমারই অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে কাহিল—বিশেষ করে দ্বিতীয়বার গর্তে পড়ার পর। আমাদের অবস্থা সব দেখেশুনে আইরিশ বন্ধুটি গম্ভীরভাবে বললেন যে ভবিষ্যতে আর কোনদিন তিনি মাতাল গাড়োয়ানের গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরুবেন না।

লেডি ইম্পের নাচসভা

কয়েকদিনের মধ্যে চীফ জাস্টিসের বাড়িতে একটি

নাচসভায় নেমন্তন্ন হল। লেডি ইম্পেই এই সভার আয়োজন করেছিলেন। নাচসভায় কলকাতা শহরের গণ্যমান্য সাহেবসুবোদের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। খাবার সময় আমি জাস্টিস হাইডের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিলাম। আমাদের পাশে একদল তরুণ ছোকরা খেতে বসেছিল। জাস্টিস হাইড যেমন খেতে ভালবাসতেন, তেমনি খেতেও পারতেন। তাঁর খাওয়া দেখে একজন তরুণ ছোকরা মন্তব্য করল, "জজসাহেব যে রকম গোগ্রাসে মুরগি খাচ্ছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর স্ত্রীর চেয়ে টাকি মুরগি ভালবাসেন বেশী।" কথাটা বেশ স্পষ্টই হাইডের কানে এল। তিনি মুরগির ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে ছোকরার দিকে মুখ তুলে বললেন, "তা ঠিক নয় হে ছোকরা, তা ঠিক নয়!" হাইড শুনতে পেয়েছেন দেখে ছেলেটি লজ্জায় চেয়ার ছেড়ে দূরে চলে গেল।

সপ্তাহে প্রায় একদিন করে আমি জাস্টিস হাইডের বাড়ি যেতাম সঙ্গীতসভায় যোগ দিতে। লেডি হাইড সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, এবং সুগায়িকা বলে তাঁর নিজেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অহঙ্কারী কমোডোর

আমি যখন বাংলাদেশে এলাম তখন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই চলেছে পণ্ডিচেরীতে, এবং একটি বৃটিশ নৌবহর ফরাসী উপনিবেশে অভিযান করবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ অ্যাডমিরালের অধীনে যে নৌবহর ছিল তা ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যোগ্য নয়। বাংলাদেশে তাই খবর এল কিছু সাহায্য পাঠাবার জন্য। ওয়ারেন হেস্টিংস দুখানি বাণিজ্যপোত সামরিক কায়দায় সাজিয়ে মাদ্রাজে পাঠাবেন স্থির করলেন। জাহাজ দুখানির ভার দেওয়া হল জোসেফ প্রাইস নামে এক ভদ্রলোকের উপর। ভদ্রলোক একসময় নৌবিভাগে ছিলেন বটে, কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়ে হেস্টিংসের কৃপাশ্রয়ে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর উপর জাহাজের ভার দিয়ে 'কমোডোর' উপাধি দেওয়া হল, এবং 'রেজলিউশন' নামে একটি জাহাজে একজন ক্যাপ্টেনও দেওয়া হল তাঁর অধীনে।

অনেকদিন থেকে হেস্টিংসের ইচ্ছা ছিল বোম্বাইয়ের মতন কলকাতাতেও নৌবিভাগের একটি ঘাঁটি স্থাপন করা। এই সুযোগে তিনি তাঁর কৌন্সিলে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হল। কোম্পানির নিজের জাহাজ 'ব্রিটানিয়া' ও 'ন্যান্সি' রণপোতে পরিণত করে কলকাতার শেরিফ রিচার্ডসনের উপর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল, এবং তাঁকেও করা হল 'কমোডোর'। রিচার্ডসন সগৌরবে তাঁর জাহাজে মর্যাদার নিশান উড়িয়ে দিলেন। ওদিকে প্রাইসও তাঁর জাহাজে 'কমোডোর' হয়ে একই নিশান উড়িয়েছিলেন। কার এই নিশান ওড়াবার অধিকার আছে তাই নিয়ে দুই দৈবাৎ-কমোডোরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হল। ব্যাপারটা হেস্টিংসের কানে পৌঁছল, এবং তিনি রীতিমত বিরক্ত হয়ে দুজনকেই ডেকে পাঠালেন। দুজনে কাছে আসতে তাঁদের তিনি বেশ ধমক দিয়ে বললেন, "ছেলেপিলেরা যেমন খেলনা নিয়ে ঝগড়া করে, আপনারা দুজনেও তেমনই নিশান নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন। যদি এখনই এই ঝগড়ার শেষ না হয়, তা হলে আপনাদের খেলনা কেড়ে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হব। ভবিষ্যতে আর কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনাদের দেওয়া হবে না।"

হেস্টিংসের কথায় কাজ হল। দুই কমোডোরের নিশানই সমান মর্যাদার হাওয়ায় উড়তে লাগল। রিচার্ডসন অবশ্য খুব বেশী মাথা হেঁট করেন নি। 'ন্যান্সি' জাহাজ-খানির ভার দেওয়া হল আমার আইরিশ বন্ধু হেফার-ম্যানের উপর। ১৭৭৮, এপ্রিলের মাঝামাঝি কমোডোর প্রাইস মাদ্রাজ যাত্রা করলেন তাঁর জাহাজ নিয়ে। রিচার্ডসন যাত্রা করার আগে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করলেন তাঁর জাহাজে। এ রকম ভোজ কলকাতা শহরে উঁচু মহলেও সাধারণত হয় না। শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ব্রিটানিয়া জাহাজখানিকে অনেক টাকা খরচ করে

চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল। কোন দিক আয়োজনের ত্রুটি হয় নি কিছু। কেবল একটি মাত্র ছিল এই যে, ডক থেকে জাহাজে উঠবার কোন ল্যাডার কিছু তখন ছিল না। নিমন্ত্রিত মহিলাদের বাধ্য হয়ে চেয়ারে বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে হত। তায় মিসেস উড নামে কোম্পানির এক বিশিষ্ট রীর বিখ্যাত স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রী হিসেবে তিনি বিখ্যাত । তাঁর বিরাট বপুর জন্য। তাঁর মত স্থূলকায় মহিলা কলকাতায় আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। র দিন মুশকিল হল, তাঁকে ডক থেকে জাহাজ পর্যন্ত রা নিয়ে। চারজন লোক যখন তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে পার করবার চেষ্টা করল, তখন দেখা গেল যে দড়ি সরছে না। একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে দেখে র কেবিন থেকে নাবিকেরা নীচের দিকে লক্ষ্য করে মিসেস উডের অবস্থা। তাঁর চেহারা দেখে সকলে ঙ্গ হৈচৈ করে উঠে বলল, "এ মাল জাহাজে তোলা না, সকলে মিলে চেষ্টা করলেও না।" অবশেষে মিসেস উডকে জাহাজে তোলা হল বটে, কিন্তু হল্লা করে তোলা হল যে, ব্যাপারটা অনেকের ই খুব শোভন মনে হল না। গোড়াতেই শ্রীমতী ক নিয়ে একটা করুণ ও হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হল। স্বামী বেচারী অসম্ভব চেঁচামেচি করলেন, এবং বোঝা বিরক্তও হলেন যথেষ্ট। কিন্তু শ্রীমতী একেবারে কার রইলেন, এবং অপরাধীদের ক্ষমা করতেও তিনি হলেন না।

ভদ্রলোক ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় দেড় শো জন সেদিন সভায় যোগ দিয়েছিলেন। খানাপিনার বেশ এলাহী । করেছিলেন কমোডোর সাহেব। খাবার সময় রক বিভাগের বাদকেরা চমৎকার বাজনাও বাজিয়ে- । সমস্ত জাহাজ ও ডক নানা রঙের রঙিন বাতি সাজানো হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর নর্তকীদের শুরু হল নৃত্যমঞ্চে। একদিকে নাচ চলতে লাগল, একদিকে চলতে লাগল মদ্যপান। উর্বশীদের সভায় গেলেন না, তাঁরা সুরাদেবতা ব্যাকাসের সাধনায় মশগুল হয়ে রইলেন। অনর্গল ধারায় তাঁদের কণ্ঠনালী দিয়ে শ্যাম্পেন ও ক্ল্যারেট বয়ে যেতে লাগল। বরফে ঠাণ্ডা করা পানীয়ের আস্বাদই আলাদা বলে সকলে আকণ্ঠ সুরাপান করলেন। রাত্রি ১টার সময় যথারীতি 'সাপার' খেতে দেওয়া হল এবং সকলেই তা বেশ সাগ্রহেই খেলেন। তারপর গায়ক-গায়িকারা আরম্ভ করলেন সুললিত কণ্ঠে গান। গানের রেশ শেষ হতে না হতে সুন্দরী নর্তকীরা আবার উঠলেন নাচের জন্য। সকাল ৬টা পর্যন্ত তাঁদের নাচ চলল। ক্লান্তিতে সকলে তখন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। এবারে যে যার উঠে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন।

সাংবাদিক জেমস অগস্টস হিকি

কলকাতায় কয়েকদিন থাকার পর আমি একদিন সাংবাদিক হিকির কাছ থেকে একখানি অপ্রত্যাশিত চিঠি পেলাম। তখন তিনি ঋণের দায়ে জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন। চিঠি লিখে আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, এবং সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর তাঁকে রীতিমত মাথাপাগলা লোক বলে মনে হল। তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হল না। আচারে-ব্যবহারে তাঁকে বদ্ধ পাগল বললে ভুল হয় না। তাঁর পাগলামির জন্য তাঁকে আমি 'ক্ষ্যাপা আইরিশম্যান' বলে ডাকতাম। যেদিন তাঁর সঙ্গে জেলখানায় সাক্ষাৎ হল সেদিন তিনি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কারাজীবনের চরম দুর্দশার কথা আমাকে বললেন। তাঁর এই দুর্ভোগের জন্য কয়েকজন কুচক্রী বাঙালীই যে দায়ী, সেকথাও তিনি আমাকে জানাতে ভুললেন না। বুঝলাম, বাঙালী মহাজন বা বেনিয়ানদের কাছে ঋণের দায়ে তিনি প্রায় দু বছরের উপর জেল খাটছেন। হিকি অবশ্য ঋণের কথা অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার আমি জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিলাম, এবং তিনি

আমাকে যে-সব কাগজপত্র দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। বেচারীর দুরবস্থা দেখে দুঃখও হল এবং আদালতে তাঁর মামলা তদারক করব বলে আমি তাঁকে কথা দিলাম।

জেমস হিকি যে মাথাপাগলা লোক, তা আগেই বলেছি, লোকজনের কাছে খোঁজ করতে তাঁরাও ওই কথা বললেন। আদালতে মামলা উঠলে একটুতেই তিনি নাকি ক্ষেপে যান এবং নিজের অ্যাটর্নি-উকিলদের যা-তা বলে গালিগালাজ করেন। সেজন্য তাঁর মামলা করতে আর কেউই রাজী হন না। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই চিন্তার বিষয় হল বটে, কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে সত্যিই করুণা হল, রাজী না হয়ে পারলাম না। তবু তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যে মামলার ভার যতক্ষণ আমার উপর থাকবে ততক্ষণ, হাজার ভুলচুক ও অন্যায় হলেও, সে সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বলতে পারবেন না। এই ধরনের কোন বেয়াদপি আমি সহ্য করতে পারব না। আমার কথায় যখন তিনি রাজী হলেন, তখন তাঁর মামলার কাগজপত্র আমি চেয়ে নিলাম।

কাগজপত্র বুঝে নিয়ে টিলঘম্যান ও মর্সকে অনুরোধ করলাম হিকির পক্ষে দাঁড়াবার জন্য। মামলার শুনানির দিন হেবিয়াস কর্পাসের সাহায্যে তাঁকে জেলখানা থেকে আদালতে নিয়ে আসা হল। টিলঘম্যান যখন একজন সাক্ষীকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হিকি সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি আর মুখ বুজে থাকতে পারলেন না; প্রতিশ্রুতির কথাও ভুলে গেলেন। হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে উন্মাদের মতন চিৎকার করে বললেন টিলঘম্যানের দিকে আঙুল দেখিয়ে, "সার্, উনি কিছুই জানেন না সার্! এদেশের আদালতে ওকালতি করছেন বটে, কিন্তু নেটিব বাঙালীদের কিভাবে জেরা করে কথা বার করতে হয় তা তিনি এখনও শেখেন নি। হুজুর যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি নিজেই সাক্ষীকে জেরা করতে পারি।"

হিকির এই ব্যবহারে টিলঘম্যান তৎক্ষণাৎ মামলার কাগজপত্র ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, এবং এই অপমানের জন্য আমার উপরেই দোষারোপ করলেন। করাই স্বাভাবিক, কারণ আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে আদালতে হিকি কোন অশোভন ব্যবহার করবে না। এইভাবে আমাকে অপদস্থ করা হল বলে আমি হিকিকে ডেকে এনে মিথ্যাবাদী, ভবঘুরে, কুলাঙ্গার ইত্যাদি বলে খুব গালমন্দ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেচারী একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে আমার পা জড়িয়ে ধরলে এবং তাঁর অন্যায় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন কেবল আমার কাছে নয়, চীফ জাস্টিসের কাছেও। তাঁর কাছে তিনি হাতজোড় করে বললেন যে আর কখন তিনি আদালতের মধ্যে এ রকম ব্যবহার করবেন না। যাতে আমি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে আবার মামলার ভার নিই, সেজন্য আমাকে অনুরোধ করতে তিনি জজসাহেবের কাছে আবেদন করলেন। আমি শেষ পর্যন্ত রাগ করে পারলাম না, আবার তাঁর মামলার ভার নিলাম। অবশেষে মামলাতে আমাদেরই জিত হল, বিশ হাজার টাকা মিথ্যা ঋণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হিকি কারামুক্ত হলেন।

মুক্তি পাবার দু দিনের মধ্যেই আবার একজন বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ করলেন। এবারেও শুনানির সময় তিনি আদালত-গৃহের মধ্যেই সাক্ষীকে অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করে গালাগালি করলেন—চোর জোচ্চোর-পাষণ্ড-নরাধম ইত্যাদি বলে। ঘন ঘন বুক চাপড়ে তিনি ভগবান যীশুকে ডেকে বলতে লাগলেন "হায় যীশু! কেন আমায় শঠ ও প্রবঞ্চকদের খপ্পরে ফেলে এইভাবে নাজেহাল করছ!" যাই হোক, এ দ্বিতীয় মামলাতেও আমাদের জিত হল, হিকি সমস্ত ঋণের দায় থেকে একেবারে মুক্ত হলেন।

হিকির প্রথম প্রেস ও সংবাদপত্র

আমার সঙ্গে যখন হিকির প্রথম সাক্ষাৎ হল, তার প্রায় সাত বছর আগে তিনি এদেশে আসেন। জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকার সময় একটি কারণে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি প্রিন্টিং সম্বন্ধে এই সময় একখানি

তে পান, এবং বইখানি পড়ে তাঁর মনে প্রিন্টার বাসনা জাগে। আমি যতদূর জানি, কলকাতা তখন ছাপাখানা বলে বিশেষ কিছু ছিল না। অত্যন্ত াগ দিয়ে বইখানি পড়ে হিকি ছাপার 'অক্ষর' কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেন, এবং অনেকদিন ধৈর্য সাধারণ পরিশ্রম করে তিনি একসেট ছাপার হরফ করেন। তাঁর এই ছাপার হরফ দিয়ে বিজ্ঞাপন গুবিল ছাপার কাজ মোটামুটি চলে যেত। যথেষ্ট হারে তিনি এই সব কাজ করতে পারতেন বলে ছাপাখানার ব্যবসা অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জমে

ব্যবসা থেকে কিছুদিনের মধ্যে সামান্য কয়েক শো জমিয়ে তিনি ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন, পুরো এক-ছাপাখানার যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদি আনার জন্য। সঙ্গে কিছু ওষুধ-পত্তরেরও অর্ডার দিলেন ডাক্তারী উদ্দেশ্যে। প্রিন্টার ও ডাক্তার দুই-ই হবার ইচ্ছা ার।

ংলণ্ডে ছাপাখানার অর্ডার দিয়ে মনে মনে তিনি একটি পরিকল্পনা করে বসলেন। তাঁর ইচ্ছা হল, তা থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন। তখন সংবাদপত্র শহরে ছিল বলে আমি জানি না। ত থেকে টাইপপত্র এসে পৌঁছতে তিনি একটি হিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন বলে বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ চাইলেন। সকলেই তাঁর পরিকল্পনার শুনে খুশী হয়ে তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। উৎসাহ হিকি যথাসময়ে তাঁর পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ার বিশেষত্ব ও নূতনত্বের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই পাঠকসংখ্যাও বেশ জুটে গেল। শ্লেষ-বিদ্রূপ ও সিকতাই ছিল পত্রিকার বিশেষত্ব, যদিও সেগুলি চ্চস্তরের নয়। তার আরও একটা বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যে-কোন ব্যক্তির চরিত্র অনুযায়ী চমৎকার রণ করতে পারতেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম নী রচনা করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কলকাতা শহরে তখন টিরেটা নামে এক ভদ্রলোক ন, তাঁর পেশা ছিল স্থাপত্য। তিনি ইটালীয়ান হলেও জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে ফ্রান্স ও জার্মানিতে কাটাতে হয়। প্রায় কুড়ি বছর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে বাস করার পরেও তিনি তাই ইংরেজী ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেন নি। কথা বলার সময় এমন একটা জগাখিচুড়ি ভাষায় তিনি কথা বলতেন, যা ইংরেজী ফরাসী পর্তুগীজ ও হিন্দুস্থানী না জানলে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। দেখতে তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন, এবং সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে সবচেয়ে আগে নজরে পড়ত তাঁর দীর্ঘ তীক্ষ্ণ উঁচু নাকটি।

গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী উত্তাপ বাড়ে জুন মাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ৪ জুন রাজার জন্মদিন উপলক্ষে গবর্নরের নাচ-সভায় তিনি দামী ভেলভেটের সুট পরে সুসজ্জিত হয়ে প্রতি বছরেই যোগ দিতেন। একবার এই নাচ-সভার বিবরণ দিতে গিয়ে টিরেটা সম্বন্ধে হিকি তাঁর পত্রিকায় লেখেন :

"Nosey Jargon danced his annual minuets, seasonably dressed in a full suit of crimson velvet." টিরেটা সম্বন্ধে এমন সুন্দর নামকরণ আগে কেউ করতে পারেন নি। তারপর থেকে টিরেটা 'Nosey Jargon' নামে কলকাতার সাহেব-সমাজে পরিচিত হয়ে যান। (বিশিষ্ট নাকের জন্য 'Nosey', এবং পাঁচমিশালী ভাষার জন্য 'Jargon')

পত্রিকা চালিয়ে হিকি বেশ মোটা মুনাফা করতেন। যদি একটু মাথাঠাণ্ডা করে তিনি পত্রিকাটি চালাতেন, তা হলে ব্যবসার দিক থেকে লাভবান তো হতেনই, নিজেও যথেষ্ট অর্থ রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি পারেন নি, কারণ সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে পত্রিকায় কটু মন্তব্য করার ফলে তিনি অনেকবার মানহানির মামলার দায়ে পড়ে বহু টাকা খেসারত দিয়েছেন। তাঁর পত্রিকার ব্যাপারে একটা না একটা মামলা আদালতে লেগেই থাকত এবং সবই মানহানির মামলা। মানহানির দায়ে এই ভাবে হিকি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, তবু তাঁর পত্রিকার এই আত্মঘাতী নীতি পরিহার করেন নি।

গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে আমি প্রায় বজবজে আমার এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে যেতাম। কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি সুন্দর জায়গায় নদীর তীরে তিনি থাকতেন, এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আমি সত্যিই খুব আনন্দ পেতাম। এই ভাবে কলকাতার বিশিষ্ট সমাজে চলেফিরে পরমানন্দে আমার দিনগুলি কেটে যেতে লাগল। অ্যাটর্নির ব্যবসাও বেশ জমে উঠল, এবং দিন দিন মক্কেলের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে লাগল। সারা সকাল একটানা কাজ করেও আমি তাল সামলাতে পারতাম না।

জুরির বিচারের জন্য ইংরেজদের আন্দোলন

কলকাতা শহরের আদালতের বিচারকরা তখন ইংরেজই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিচারে ইংরেজরাই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এদেশের 'নেটিবদে'র মতন আদালতে তাঁদেরও অপরাধের বিচার করা হবে, ইংলিশ-ম্যান ও ইণ্ডিয়ানের মধ্যে মর্যাদার কোন তারতম্য থাকবে না,—এ কথা মেনে নিতে তাঁদের জাত্যভিমানে বাধল। যে ঘটনা থেকে ইংরেজদের মধ্যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হল, সেটি কিন্তু খুবই সামান্য একটি ঘটনা।

কর্নেল ওয়াটসনের দুজন বাঙালী ছুতোর মিস্ত্রি একবার কিছু যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র চুরি করে ধরা পড়ে। চীফ সুপারিনণ্টেডেণ্ট মিঃ ক্রেসির কাছে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজের সঙ্গী হিসেবে ক্রেসির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ক্রেসি ওই দুজন মিস্ত্রিকে হাত-পা বেঁধে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করেন। কেবল বেত্রাঘাত করেই তাদের তিনি রেহাই দেন নি, দুদিন একটি গুদামঘরে বন্দাও করে রেখেছিলেন। ক্রেসির এই ব্যবহার নিশ্চয় আইনসঙ্গত হয় নি।

মিস্ত্রি দুজন ছাড়া পাবার পরেই একজন অ্যাটর্নির কাছে যায়—ক্রেসির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। অ্যাটর্নি তাদের মামলা করতে পরামর্শ দেন, এবং তাদেরই নির্দেশে ক্রেসির কাছে অ্যাটর্নি চিঠি পাঠান। মিস্ত্রিদের অবৈধ ও অন্যায়ভাবে আটক ও বেত্রাঘাত করার জন্য ক্রে[সির] কাছে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। তাঁকে এ কথ[া] চিঠিতে জানানো হয় যে ক্ষতিপূরণ না করলে তাঁ[কে] আদালতে যথারীতি অভিযুক্ত করা হবে। ক্রেসি ছি[লেন] অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। 'নেটিব'দের স[ঙ্গে] বিবাদের ব্যাপারে আপসের কথা তিনি ভাবতেই পার[তেন] না। এ ক্ষেত্রে সেই 'নেটিব'রা আবার মিস্ত্রিশ্রেণীর লো[ক], সুতরাং তাঁর আত্মাভিমানে আরও বেশী বাধল। তি[নি] অ্যাটর্নির চিঠি উপেক্ষা করলেন, এবং তার কোন জব[াব] দেওয়াই প্রয়োজনবোধ করলেন না। অবশেষে তাঁ[র] বিরুদ্ধে দুজন মিস্ত্রি আদালতে দুটি মামলা দায়ের কর[ে] প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার টাকা খেসারত দাবির মামলা।

মামলা শুরু হবার পর ওয়াটসনের বাড়িতে একদি[ন] বৈঠক হল। অ্যাটর্নি অ্যাডভোকেট নিয়োগ করে ক্রেসি[র] পক্ষ কিভাবে সমর্থন করা যায়, বৈঠকে তাই নি[য়ে] আলোচনা হল। ক্রেসি কিন্তু এই অন্যের ওকালতি[র] ব্যাপারে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তাঁর প[ক্ষে] তিনি নিজেই ওকালতি করবেন, এবং একজন ইং[রেজ] হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশের রীতি অনুযায়ী দাবি ক[রবেন] জুরির বিচার। আমি তাঁকে একজন আইনজ্ঞ হিসে[বে] অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, আমাদে[র] পার্লামেণ্টের আদেশেই এদেশে আদালত স্থাপিত হয়েছে[,] এবং বিচারকরা নিযুক্ত হয়েছেন। দেওয়ানী মামলা[য়] বিচারকরাই হলেন জুরর। কিন্তু কোন কথায় কর্ণপা[ত] করার মতন মানসিক অবস্থা তখন ক্রেসির ছিল না[।] তিনি বললেন যে তা হতে পারে না, এ প্রথা ব্রিটি[শ] কনস্টিটিউশন-বিরোধী, তিনি প্রাণপণ করে এই অন্যা[য়] রীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

আদালতে মামলা শুরু হল, এবং ক্রেসি ঠিক করলে[ন] তিনি নিজে আদালতে তাঁর পক্ষের বক্তব্য পেশ করবেন[।] মামলার দিন সকাল ৮টার মধ্যে কোর্টে ভিড় জমে গেল[।] কলকাতার ব্রিটিশ বাসিন্দারা, সিবিল ও মিলিটারী সকলেই প্রায় কোর্টে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেদি[ন] অসুস্থতার জন্য চীফ জাস্টিস কোর্টে আসতে পারেন নি

়ইজন্য মামলার শুনানি সেদিনকার মতন স্থগিত ়খা হল।

দিনটা ছিল মুসলমানদের মহরম উৎসবের দিন। ়হরমের সময় সর্বশ্রেণীর মুসলমানরা রাস্তায় শোভাযাত্রা ়রে বেরোয়, এবং ভাঙ (Bang) নামে একরকমের ড্রাগ ়য়ে উন্মত্তের মতন আচরণ করতে থাকে। এরকম ়চ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা আর কোন সময় তাদের মধ্যে দেখা ়য় না। শোনা যায়, সেই বছর নবাব সাদৎ আলি ়লকাতায় এসেছিলেন, এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ়ই কারণে মহরম উৎসবের উন্মত্ততা ওই বছরে অত্যধিক ়ড়েছিল।

মামলার শুনানির দিনে জাস্টিস রবার্ট চেম্বার্স ও হাইড ়দের আসনে এসে বসেছেন, এবং কোর্টের কাজকর্ম ়রু করার তোড়জোড় চলছে, এমন সময় রাস্তায়— ়কেবারে আদালত গৃহের নীচে বিরাট একটি জনতার ়ল্লা শোনা গেল। কাড়া-নাকাড়ার প্রচণ্ড শব্দে কোর্টে ়কউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। জনতার ়হট্টগোল ও বাজনার শব্দে কোর্টের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ ়বার উপক্রম হল। সার্ রবার্ট নিরুপায় হয়ে আদালতের ়কনস্টেবলদের হুকুম দিলেন নীচে রাস্তায় গিয়ে জনতাকে ়ছত্রভঙ্গ করে দিতে। হুকুম জারি করার কয়েক মিনিটের ়মধ্যেই রূপ নামে একজন বৃদ্ধ জার্মান কনস্টেবল চিৎকার ়করে দৌড়তে দৌড়তে নীচে থেকে উপরে ছুটে এল। ়এত ভয় পেয়েছে সে যে তার হাঁপানি আর থামে না। ়দেখা গেল যে তার মাথার পরচুলোটাও নেই। হাঁপানি ়একটু থামতে সে বলল যে, নীচে যখন সে জনতাকে ়ছত্রভঙ্গ করতে গিয়েছিল তখন তারা তাকে ধরে বেদম ়প্রহার করেছে, এবং তার টুপি ও পরচুলো কেড়ে নিয়েছে। ়তার হাতে বিচারালয়ের ন্যায়ের প্রতীকস্বরূপ যে 'দণ্ড'টি ়ছিল, জনতার ভিতর থেকে দুজন ব্রিটিশ খালাসী এসে ়সেটি কেড়ে নিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেছে ়এদেশী লোকের জনতার মধ্যে ব্রিটিশ খালাসীর যোগদান এই আচরণ লক্ষণীয়—বি.)।

জার্মান কনস্টেবলের এই বিবরণ কোর্টের সাহেবরা উদগ্রীব হয়ে শুনলেন, এবং শুনে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

জনতার হট্টগোল ক্রমেই খুব বাড়তে লাগল। কোর্টের আণ্ডার-শেরিফকে আদেশ করা হল, জনতাকে হটিয়ে দেবার জন্য। ততক্ষণে আরও কয়েক হাজার লোক এসে জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং তার চেহারাও হয়ে উঠেছে মারমুখী। দেখলে মনে হয়, যে-কোন সময় একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। আণ্ডার-শেরিফ হ্যারি স্টার্ক তাঁর শাস্তির দণ্ডটি নিয়ে জনতার সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তারা তাঁর দণ্ডটি কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিল, এবং তাঁকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে চলে গেল। নবাবের কয়েকজন ভৃত্য তাঁকে চিনত। ভিড়ের ভিতর থেকে দেখতে পেয়ে তারা তাঁকে উদ্ধার না করলে, জনতার হাতে আণ্ডার-শেরিফ হয়তো সেদিন মারা পড়তেন।

দেখতে দেখতে জনতা যেন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কোর্টের সামনে যে সব বেয়ারা ও হরকরা দাঁড়িয়েছিল, তাদের উপর হামলা করল জনতা। চারিদিকে যত পালকি ছিল, সেগুলিকেও তারা ভাঙতে আরম্ভ করল। একদল আদালতগৃহ লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। কাচের জানলাগুলি ভেঙে পড়তে লাগল ঝন্‌ঝন্ করে। ঘরের মধ্যে পর্যন্ত ইট-পাথরের টুকরো আসতে লাগল।

এইভাবে আধঘণ্টা কাটবার পর শোনা গেল যে জনতা তলোয়ার নিয়ে আদালতের প্রহরীদের আক্রমণ করেছে, এবং মধ্যের বড় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। খবরটা শোনা মাত্রই উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হল, এবং যে যেদিকে সম্ভব ছুটতে আরম্ভ করল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। আতঙ্কিত পলাতকদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, এবং প্রাণ বাঁচাবার জন্য একেবারে ছাদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, সার্ রবার্ট চেম্বার্সের ভাই উইলিয়াম চেম্বার্স আগে থেকেই পালিয়ে বসে আছেন। নেটিবদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর রীতিমত জ্ঞান আছে বলে তিনি

মনে করেন। তিনি বললেন, "আজকে আর আমাদের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। ক্ষিপ্ত জনতা এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজকে ধরে ধরে হত্যা করবে মনে হয়।"

সত্যি কথা বলতে কি, আমি ব্যাপারস্থাপার দেখে রীতিমত ভয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ইংরেজ বলে গর্বিত মিঃ ক্রেসি উইলিয়ামের কথা শুনে বুক ফুলিয়ে বললেন, "ব্যাপার যদি তাই হয়, তা হলে আসুন আমরা ঠিক ইংরেজের মতন আমাদের সৎসাহসের পরিচয় দিই, এবং এইভাবে না পালিয়ে এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। যদি প্রাণই দিতে হয়, তা হলে তা বীরের মতন দেওয়াই ভাল—কাপুরুষের মতন মরে কোন লাভ নেই।" এই কথা বলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে আরম্ভ করলেন, এবং তাঁর পিছু পিছু অন্যান্য ইংরেজরাও দৌড়তে লাগলেন।

ক্রেসির এই ব্যবহারে আশ্চর্য ফল হল। সকলে মিলে সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়াতে জনতা পিছু হটতে আরম্ভ করল। এর মধ্যে পুরনো কেল্লা থেকে একদল সৈন্য এসে হাজির হল ঘটনাস্থলে। প্রবলবেগে এক পসলা ইট-পাটকেল বর্ষণ করে, গোরা সৈন্য দর্শনে, জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছুটতে থাকল। সেনাদলের কমাণ্ডারের কপালে সজোরে একটি ইঁটের টুকরো এসে লাগল, এবং ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল তাঁর কপাল দিয়ে। কমাণ্ডার তাতে আদৌ দমলেন না। খটখট করে তিনি আদালতগৃহের মধ্যে ঢুকে সোজা বিচারকদের কক্ষের দিকে চলে গেলেন। সামনে গিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "আমরা জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও আপনাদের মর্যাদা রক্ষা করব।"

আমার কাছে বীর ইংরেজপুঙ্গবদের এই অভিনয়টি অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। কারণ ক্রেসি কিভাবে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন তা শোনবার জন্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেদিন বহু ইংরেজ মিলিটারি অফিসার অস্ত্রশস্ত্রসহ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। জনতার হট্টগোলের সময় তাঁদের কাউকেই বীরপুরুষের মতন আচরণ করতে দেখা যায় নি। সাধারণ লোকের মতন তাঁরাও ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছিলেন।

সৈন্যরা আসার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল বটে, কিন্তু একেবারে ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল না—দূরে দূরে ছোট ছোট দল বেঁধে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

দাঙ্গায় আমার পালকিটি খোয়া গেল আরও অনেকের মতন। তিন শো টাকা দামের পালকিটি একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, জোড়াতালি দেবারও কোন উপায় ছিল না। বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনতা রাইটার্স বিল্ডিঙের (Writers' Buildings) বাইরের ফটক, জানলার শার্সি ও বাতিও অনেক ভেঙে ফেলেছিল। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় পথে কোন সাহেব দেখলেই তারা ঢিল ছুঁড়ছিল, এবং ধরে প্রহারও করছিল।

ভারতের ব্রিটিশ রাজধানীতে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, সারা দেশব্যাপী একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অনেকে বলাবলি করতে লাগলেন যে নবাব নিজে এই দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়েছেন, এবং তাঁর অভিসন্ধি হল ইউরোপীয়দের হত্যা করা। গুজব নবাবের কানে পৌঁছতে তিনি তার প্রতিবাদ করে একটি ইস্তেহার জারি করেন, এবং কলকাতা শহরময় তা প্রচুর পরিমাণে বিলি করেন। দাঙ্গার পাণ্ডাদের ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারি করে দেন এই মর্মে যে মহরম উৎসবের সময় কলকাতা শহরের ভিতরে কোনরকম শোভাযাত্রা করা চলবে না।

কিছুদিন পরে ক্রেসির মামলা আবার আরম্ভ হল। শুনানির দিন কোর্টে আগের মতনই সাহেবদের ভিড় হল। ক্রেসি আত্মপক্ষ সমর্থনে বেশ ভালই ওকালতি করলেন। ঠিক এতটা তিনি করতে পারবেন এ আমি ভাবি নি। চীফ জাস্টিস অবশ্য তাঁর বিপক্ষেই রায় দিলেন, এবং তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য ৪০০ সিক্কা টাকা জরিমানা করলেন। অন্য মামলাটির আর আলাদা শুনানি হল না; ওই একই জরিমানা সাব্যস্ত হল। কিন্তু

াপীল করার ন্যায্য অধিকার থাকবে ক্রেসির—এ কথা ার পক্ষের উকিল দাবি করলেন।

এর পরেই ইংরেজদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের ান্দোলন আরম্ভ হল। কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই ান্দোলন সীমবদ্ধ রইল না, বাইরে কোম্পানির অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশের তো বটেই, ারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজরা চিঠিপত্র লিখেও কাকড়ি পাঠিয়ে তাঁকে ইংলিশম্যানের মর্যাদা রক্ষার য উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁকে "Wilkes of ıdia" বলে ইংরেজ-সমাজ অভিনন্দন জানালেন। তাঁর াপীলের সমস্ত খরচ সংগ্রহের জন্য সাহেবরা সোৎসাহে দা আদায় করতে আরম্ভ করলেন। তার জন্য আলাদা কটি কমিটিও গঠিত হল।

কর্নেল ওয়াটসন বিচারকের রায় নিয়েই আপীল রার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার তাতে মত ছিল না, রণ তাতে কোন লাভ হবে না বলেই আমার ধারণা ল। আমার মতন আরও অনেকে এই মত পোষণ রতেন। কিন্তু ওয়াটসন জিদ করলেন যে ব্যাপারটা ানিতে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। অবশেষে নি শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ইংরেজকে ডেকে বিষয়ে পরামর্শ করলেন, এবং আলোচনা করে ঠিক ়া যে যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতার ইংরেজদের একটি সভা কে এ বিষয়ে কি কর্তব্য তা স্থির করা হবে। বিষয়টি টিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপন না করে ছাড়া হবে না।

১৭৭৯ জানুয়ারি মাসে এই উদ্দেশ্যে কলকাতার ়েটারগৃহে ইংরেজদের বিরাট একটি সভা হল। এই ায় সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে একটি পীলের প্রস্তাবও গৃহীত হল। আপীলে ভারতে ারালয় প্রতিষ্ঠার অ্যাক্ট সংশোধনের দাবি জানানো হল, ং প্রস্তাব করা হল যেন ভারতের ব্রিটিশ নাগরিকদের াদা রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, এবং ই বিচার যেন জুরির বিচার হয়।

আবেদনপত্র খসড়া করার জন্য একটি কমিটি গঠন া হল। কমিটিতে ছিলেন কর্নেল পীয়ার্স, কর্নেল ওয়াটসন, জন শোর (লর্ড টিগন্‌মাউথ), জন পেট্রি, আলেকজাণ্ডার হিগিনসন, হেনরি কটারেল, জন ইভেলিং, চার্লস পালিং, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন ও ক্রুক। প্রত্যেকেই বিখ্যাত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং বিষয়টি নিয়ে সকলেই যথাসাধ্য মাথা ঘামাতে লাগলেন। সপ্তাহে চারদিন করে কমিটির বৈঠক বসতে থাকল। বৈঠকে ঠিক হল যে আপীল খসড়া করতে হলে মামলার নথিপত্রগুলি দরকার। তার জন্য চীফ জাস্টিসের কাছে আবেদন জানানো হল, কিন্তু কোন ফল হল না। তিনি কোর্টের কর্মচারীদের হুকুম দিলেন যেন মামলা সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র কাউকে না দেখানো হয়। তাই হল—দলিলপত্র পাওয়া গেল না।

কমিটির পরবর্তী বৈঠকে কর্নেল ওয়াটসন বিচারকদের দাম্ভিক আচরণের তীব্র সমালোচনা করলেন। প্রসঙ্গত আমার স্বাধীন মনোভাব ও নির্ভীক মতামতের প্রশংসা করে, কমিটির কাছে তিনি এই ব্যাপারে আমাকেই অ্যাটর্নি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পেশ করলেন। কমিটির সভ্যরা এই প্রস্তাব অবশ্য একবাক্যে সমর্থন করলেন, এবং পত্রের দ্বারা তাঁরা আমাকে জানালেন যে আমিই তাঁদের অ্যাটর্নির কাজ করব। তার পর থেকে কমিটির প্রত্যেক সভার নোটিশ আমি পেতাম, এবং আমাকে সভায় উপস্থিতও থাকতে হত।

অনেক চেষ্টা করে আমি কোর্টের দলিলপত্র দেখার অনুমতি পেলাম। তার জন্য কমিটির কাছে আমার খাতির খুব বেড়ে গেল। কারণ কয়েকটি দলিল না দেখতে পেলে আপীল খসড়া করা কঠিন হত। করলেও তা টিকত কি না সন্দেহ। যাই হোক, আমার কৃতিত্বে সকলেই মুগ্ধ হলেন। একজন প্রস্তাব করে বসলেন যে, আপীলসহ আমাকে ইংলণ্ডে পাঠালে কাজটি আরও ভাল হতে পারে। প্রস্তাবটি সময় মতন বিবেচনা করে দেখবেন বলে সকলে আশ্বাস দিলেন।

এই কথা শোনবার পর থেকে আমার মন ক্রমেই ইংলণ্ডমুখী হতে থাকল। স্বদেশের অনেক স্মৃতি বারবার জাগতে থাকল মনে। কিছুদিনের জন্য সব গুটিয়ে ফেলা

যায় কি না ভাবতে লাগলাম। লোকজনের কাছে ও বাজারে কত দেনা আছে, এবং মক্কেলদের কাছে পাওনাই বা কত আছে, তার একটা হিসেবপত্তর করতে আরম্ভ করলাম। আমার ইংলণ্ড যাবার মনোবাসনা অবশ্য কারও কাছে আভাসে-ইঙ্গিতেও প্রকাশ করি নি। সারাক্ষণ পরিশ্রম করে নিজের কাজ করতে থাকলাম, এবং আপীলের ব্যাপারটাও যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায় তার জন্য তৎপর হলাম। বলা বাহুল্য, আপীলের আন্দোলনের সঙ্গে এইভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্য বিচারকরা কেউ আমার উপর খুশী হন নি। সার্ এলিজা ইম্পে আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে বাইরের কোন সভা-সমিতিতে সাক্ষাৎ হলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন, কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। সার্ চেম্বার্স বা হাইড অবশ্য দেখা হলে কথা বলতেন, কিন্তু সকলেই যে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। একদিন চেম্বার্স আমাকে বলেই ফেললেন যে আমি আপীলের ব্যাপারে জড়িত হয়ে বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছি। এতে আমার অ্যাটনির পেশারও ক্ষতি হবে বলে তিনি ইঙ্গিত করলেন।

১৭৭৯, ফেব্রুয়ারি মাসে কমিটির আবেদনপত্র খসড়ার কাজ শেষ হল। পত্রে নিবেদন করা হল, যে-অ্যাক্ট অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সংশোধন করা প্রয়োজন—ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় অন্তত যেন ইংরেজদের জুরির দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের সভা ডেকে আপীলের খসড়া মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হল। আপীলের একটা কপি আমার কাছে ছিল, এবং আমি তা এখানে প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু একবার প্রচণ্ড ঝড়ে আমার অনেক জিনিসপত্রের সঙ্গে কপিটিও নষ্ট হয়ে যায়।

আবার সকলে পরম উৎসাহে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলেন আপীলের খরচ যোগাবার জন্য। অনেক টাকা উঠল। এইবার আমি কর্নেল ওয়াটসনকে আমার ইংলণ্ড যাবার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলাম, এবং বললাম যে বছর দুয়েকের জন্য আপীলের কাজের দায়িত্ব নিয়ে যদি ইংলণ্ড ঘুরে আসি, তা হলে ক্ষতি কি? তিনি বললেন, ক্ষতি অনেক, কয়েক বছরে অ্যাটনি হিসেবে আমার যে পসার জমেছে তা নষ্ট হয়ে যাবে, এবং আবার তা জমানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। উঠতির মুখে এখন আমার বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কর্নেলের কথা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ জেনেও মনটা আমার ইংলণ্ডের জন্যই উন্মুখ হয়ে রইল। ইংলণ্ড যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম।

ইংলণ্ড যাওয়া সম্বন্ধে মন স্থির করে ফেলেছি দেখে ওয়াটসন শেষে কমিটির কাছে আমার ইচ্ছার কথা জানালেন, এবং প্রস্তাব করলেন যে পার্লামেণ্টে আপীল পেশ ও তদারক করার ভার আমার উপরেই দেওয়া হোক। তার জন্য আমার যাতায়াতের খরচ এবং দু বছরের জন্য বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড অ্যালাউন্স মঞ্জুর করা হোক। কমিটির সভ্যরা খুশী হয়েই প্রস্তাব পাস করলেন, এবং দু শো পাউণ্ডের বদলে বছরে ৪০০ পাউণ্ড করে আমার অ্যালাউন্স ঠিক হল।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমার বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জিকে ডেকে বললাম, তাঁর হিসেবপত্র বুঝে নিতে। অন্যান্য পাওনাদারদেরও খবর দিলাম। মাসান্তে বাজারের দেনা যথাসাধ্য শোধ করে দিতাম বলে আমার ধারণা ছিল যে দরজি বোধ হয় আমার কাছে হাজার দেড় দুই টাকা পাবে। কিন্তু হিসেব আনতে দেখলাম, দরজির কাছে দেনা পাঁচ হাজার টাকা। বেনিয়ানকে তাগিদ দিয়েও পুরো হিসেব পাওয়া গেল না। যাবার দিন এগিয়ে এল। সার্ চেম্বার্স ও জাস্টিস হাইডের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, কিন্তু সার্ এলিজার কাছে যাবার সাহস হল না।

১৫ এপ্রিল, ১৭৭৯ সন্ধ্যায় কলকাতা ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলাম।*

[ক্রমশঃ]

[* দু বছর নয়, চার বছর পরে উইলিয়ম হিকি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন, এবং কিছুদিন মাদ্রাজে থেকে ১৭৮৩ জুন মাসে বাংলাদেশে এসে আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করেন।—বি]

আত্মহত্যার অধিকার

দেবব্রত ভৌমিক

:গো জজসাহেব! আমাকে তোমরা কেন ধরে আনলে? আমি নাকি তোমাদের আইন মানি তাই তুমি আমাকে শাস্তি দেবে! কিন্তু কেন, জজসাহেব, কেন?

াজ আমি সব বলব তোমার কাছে। এই এত ক্র মাঝে দাঁড়িয়ে সব কথা বলব।

ারীবের মেয়ে আমি। বাবা ছিলেন আমার ব্রাহ্মণ ত। যজমান ছিল দু-চার ঘর, আর ছিল একটা ারী ইস্কুলের মাস্টারী। তবু তাতেই চলত কোনও । সংসারে লোক তো বেশী ছিল না—মা-বাবা আমরা দু-বোন, আমি আর দিদি। অভাব থাকলেও ছিল।

ামি যখন ছোট, দিদির তখন বিয়ে হয়। আর য়েতে বাবা জড়িয়ে পড়েন সবদিক থেকে। মেয়েকে ঘরে বরে দিতে গিয়ে বাবা তাঁর সাধ্যেরও অতিরিক্ত করে ফেলেছিলেন। সারা জীবনের সঞ্চয় সামান্য ছিল, তা তো গিয়েছিলই, আরও এদিক-ওদিকে নাও হয়েছিল কিছু-কিছু। সেই সব ধার শোধের য় তাঁর শরীরও ভেঙে পড়েছিল আস্তেআস্তে।

ামার তখন বাবা-মার দুঃখ বোঝার মত বয়েস নয়। আমাকে বুঝতে দেনও নি কিছু। আমি আগের বইখাতা নিয়ে ইস্কুলে গেছি, হেসেছি খেলেছি। র যে কোন দিক থেকে কোন পরিবর্তন ঘটেছে, ামি বুঝতে পারি নি কিছুই। বুঝতে পারলাম প্রথম পনেরো বছর বয়েসে এইট থেকে নাইনে উঠলাম ইস্কুলের মাইনে বাকি পড়ল পরপর কয়েক মাস। র নাম কাটা গেল, বাড়িতে চিঠি গেল। কিন্তু তবু মাইনের টাকা যোগাড় করে উঠতে পারলেন না। ই শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হল ইস্কুল যাওয়া। আর

এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম, পৃথিবীটাকে এতদিন যেমন ভেবে এসেছি, সেটা মোটেই সে-রকম নয়।

না, তখনও ঠিক বুঝতে পেরেছি বললে মিথ্যে বলা হয়। বুঝতে তখনও আমি সত্যি সত্যি কিছুই পারি নি। বাইরে থেকে শুধু একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম, এই যা। মনে মনে কিন্তু তখনও আমি স্বপ্নের আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছি—তখনও আমার মাটিতে পা পড়ে নি।

স্বপ্নের কথা শুনে বোধ হয় তোমাদের হাসি পাচ্ছে। আমি গরীব বামুনের মেয়ে—আমার আবার স্বপ্ন! কিন্তু না, ওগো জজসাহেব, তোমরা হেসো না। মেয়েদের মনের কথা তোমরা কী করে জানবে—মেয়েরা সবাই স্বপ্ন দেখে! আইবুড়ো সব মেয়েই যে-স্বপ্ন দেখে, আমিও সেই স্বপ্নই দেখেছিলাম—ভাল ঘর আর বরের স্বপ্ন। না, ওগো না—তোমরা হেসো না।

আমার যে রূপ আছে পোড়ামুখে সে-কথা আর বলি কেমন করে! সে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এইটুকু বয়েস থেকে সবার মুখে রূপের কথা শুনে শুনে ছেলেবেলা থেকেই আমি নিজের রূপের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই বলত, আমার নাকি রাজরানীর মত রূপ—এই রূপের জন্যেই নাকি গরীবের মেয়ের কপালেও রাজপুত্তুর জুটবে। শুনে শুনে কথাটায় আমারও কেমন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। আর তা ছাড়া, দিদিকেও ভাল ঘরে-বরে পড়তে দেখেছি। কাজেই আমার কপালে যে তা জুটবে না, এ-কথা আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারি নি।

ওই যে বললাম, কম বয়েসেই আমি একটু বেশী সেয়ানা হয়ে উঠেছিলাম। তার ফলে আমার চারপাশকে আমি যে-ভাবে দেখতাম, আমার বয়সী অনেক মেয়েই বোধ হয় ঠিক তেমন করে দেখতে পারত না। যখন

ইস্কুলে যেতাম, দেখতাম, পথের সব লোক আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, পাড়ার ছেলেরা অনেকে পিছনে-পিছনে আসা-যাওয়াও করত। দেখে আমার খারাপ লাগত না কখনও। বরং মনে মনে একটু আনন্দই পেতাম। এগুলো যেন আমার প্রাপ্যই—আমার যে রূপ আছে!

কথাটা ঠিক পরিষ্কার করে তখন না ভাবলেও পরে ভেবেছি—যখন ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়ার পর বাবা আমার জন্যে সম্বন্ধ খুঁজতে শুরু করেছেন তখন। কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়েছি আমি। আর তাই ইস্কুল ছাড়ার ব্যথা ভুলতেও সময় লাগে নি বেশী। সত্যি কথা বলতে কি, আমার দিনরাত্তির ভরে গিয়েছিল ওই এক ভাবনায়। এমন কি, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও তারই স্বপ্ন দেখতাম। বুকের মধ্যে সব সময় শুনতে পেতাম তার পায়ের সাড়া—সে আসছে, সে আসছে। আমি জানতাম, সে আসবেই। নইলে বিধাতা আমাকে এত রূপ দেবে কেন! সে আসবেই। আর তার জন্যেই আমি নিজেকে তিলতিল করে তৈরি করতাম। শুধু তো রূপ নয়—আমার বুক ভরে তুলতাম মধু দিয়ে।

ওগো জজসাহেব! তোমরা হেসো না। আমি মুখ্যু মেয়ে। এ ছাড়া আর কিছুর স্বপ্ন দেখার সাধ্য আমার ছিল না। মেয়েদের জীবনে আর আছেই বা কী বল? অন্ততঃ আছে বলে আমি জানতাম না। কাজেই আমার সারা মন জুড়ে বসেছিল শুধু সেই রাজপুত্তুরের স্বপ্ন—ছেলেবেলা থেকেই পাড়া-পড়শীর মুখে যার কথা শুনে এসেছি। সে যে ঠিক কেমন হবে, তা আমি স্পষ্ট করে ভাবতে পারতাম না। শুধু আবছা অনুভব করতাম যে যারা আমার জীবনের চারপাশে ছিল, সে হবে তাদের থেকে আলাদা কিছু। রূপে-গুণে-ধনে সবার সেরা। যদি সে সবার সেরাই না হবে তবে বিধাতা আমাকে এত রূপ দেবে কেন!

গরীবের সংসারে অভাব ছিল, দুঃখকষ্টও ছিল। কিন্তু [illegible]র কিছুই আমার গায়ে লাগত না। আমার যে সারা মন ভরে ছিল। আমি যে জানতাম, সে আসবেই—আমার সব দুঃখ দূর করে দেবেই।

কিন্তু হায় রে আমার পোড়াকপাল! তখন কি জানতাম যে রূপের থেকেও রুপো বড়! রূপ দেন বিধাতা কিন্তু রুপো তৈরি করে মানুষ। আর মানুষের কাছে এই রুপোরই আসল কদর—রূপের নয়। আমার বাবার রুপো ছিল না—তাই রাজপুত্তুরও এল না। দেখতে এসেছিল অনেকেই, কিন্তু টাকার কথা শুনে এগোয় নি কেউ। বিনা পণে গরীবের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হবে কে!

না, একেবারে এগোয় নি বললে মিথ্যে বলা হয়। এগোতে চেয়েছিল অনেকেই—অবশ্য একটু অন্যদিক দিয়ে। আমার ঘরের ভাঙা জানলা দিয়ে রঙিন কাগজে লেখা অনেক চিঠিই এসেছিল। সেই সব চিঠি শুধু পাড়ার বখাটে ছোকরাদের কাছ থেকেই আসে নি—এসেছিল অনেক গণ্যমান্য বয়স্ক ভদ্রলোকদের কাছ থেকেও। তারা সবাই প্রায় লিখেছিল···। না থাক্‌, সে-সব কথা এতদিন পরে সকলের সামনে আর না-ই বা বললাম।

যাই হোক, পাত্র জুটল না বটে, কিন্তু আমার বয়েস থেমে থাকল না, বেড়ে চলল ধাঁ ধাঁ করে। আর য[illegible] আমার বয়স বাড়তে লাগল, ততই বাবা অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন। আমার ভাবনায় তাঁর চোখের ঘুম দূর হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও আমাদের ছিল না। কাজেই বাবা মারা গেলে আমি দাঁড়াব কোথায় সেটা একটা ভাবনার বিষয়ই ছিল বটে।

বাবা প্রথম প্রথম ভাল ঘরে-বরেই আমার সম্বন্ধ খুঁজেছেন। শেষে হতাশ হয়ে খুঁজতে শুরু করেছেন সব দিকে—ভাল হোক মন্দ হোক একটা জুটলে হল। পণের টাকা যোগানোর যখন সামর্থ্য নেই, তখন কপালে যা জোটে তা-ই ভাল। কিন্তু কপালে কিছুই জুটতে চাইল না সহজে। কানা-খোঁড়া-বোবা যাই হোক না কেন, বিয়ের বাজারে সব ছেলেরই দাম বেশী। পণের টাকা দিতে পারবে না যে-বাপ, তার মেয়েকে উদ্ধার করতে সহজে এগোতে চায় না কেউই। এগোয় নিও কেউ।

বাবা ছেলে দেখে-দেখে, আর আমি নিজেকে দেখিয়ে-

ক্রমেই হতাশ হয়ে উঠেছি। শেষে সব আশা যখন ছেড়ে দিতে বসেছি, এমন সময় বিনা পণেই আমাকে রাজী হয়েছে একজন। সে-ই আমার স্বামী।

সে রাজপুত্তুর ছিল না। গরীব, সামান্য মানুষ। তার রূপ, না ছিল বিদ্যে, না ছিল ঐশ্বর্য। সম্বলের এক উদ্বাস্তু কলোনীতে নিজের-হাতে-তোলা ছোট্ট ঘর। আপনজনও কেউ তার ছিল না—হিন্দু-দের দাঙ্গায় মারা গিয়েছিল সবাই। আর সেই পরেই খালি হাতে এক-কাপড়ে চলে এসেছিল সে। দরজায়-দরজায় কাপড় ফেরি করে কোন রকমে চল দিন।

আমার কল্পনার রাজপুত্তুরের সঙ্গে কোথাও তার মিল ছিল না। কিন্তু তার জন্যে আমার একটুও হয় নি, ওকে একটুও খারাপ লাগে নি। আমার বয়স বেড়েছে, আর তাই পুরুষমানুষের সত্যিকারের বুঝতে শিখেছি। তা ছাড়া, ও রাজপুত্তুর নাই বা ওর ঘরে গিয়ে আমি তো রাজরানীই হয়েছিলাম।

সত্যিকারের পুরুষের ভালবাসা যে মেয়েদের কী, তা এক মেয়েরাই জানে। সেই ভালবাসা পেয়েছিলাম। সারাদিন সে সারা শহর ঘুরেঘুরে -জামা ফেরি করে বেড়াত। আর সারাদিন আমি ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে ঘুরেঘুরে সংসারের কাজ ম। সন্ধ্যে হলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে কপালে সিঁদুরের দিয়ে বসে থাকতাম। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরত সে। দিয়ে বাতাস করে তার ক্লান্তি দূর করতাম। নিজের ভাত বেড়ে সামনে বসে খাওয়াতাম। আর তারপর ত তার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতাম। তার শক্ত দিয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখত। আমি ম না—কিচ্ছু ভাবতাম না। আমার সব ভাবনার ছেড়ে দিয়েছিলাম তার উপরে। আমি শুধু পড়ে-পড়ে ক্ত দুই হাতের মধ্যে আমার সব ছেড়ে দেবার ক উপভোগ করতাম।

নই করে কয়েক বছর কেটেছে। এর মধ্যে বাবা-মা গছেন। আমাদের ঘরে দুজন লোক বেড়েছে—পরপর দুটো ছেলে এসেছে আমার কোলে। আমার মতই চেহারা পেয়েছে ওরা, আর ওদের বাবার মত স্বভাব। সংসারে কাজ বেড়ে গেছে অনেক। সারাদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থেকেছি। আর মাঝেমাঝে ওদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি, বিধাতা কেন যে আমাকে এত রূপ দিয়েছেন তার সত্যিকারের মানেটা যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছি। ছেলেবেলায় যা ভেবেছিলাম, তা সব ভুল, সব মিথ্যে।

সুখেই দিন কাটছিল আমার। না, সুখ না থাক্, শান্তি ছিল। জীবন আমার ভরে ছিল। কিন্তু ওগো জজসাহেব, তোমাদের আইনের তা সইল না। একদিন হঠাৎ সকালে উঠে শুনলাম, আমরা যে-জমিতে ঘর তুলেছি, সে-জমি নাকি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। জমির মালিক যে সে নাকি আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, আর আইন তার পক্ষেই রায় দিয়েছে। কাজেই নিজের হাতে যে-ঘর আমরা তুলেছি, নিজের হাতেই সে-ঘর আমাদের ভেঙে দিতে হবে।

ওগো জজসাহেব! আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, জানি না তোমাদের আইন কী! তোমাদের আইন কি শুধু আমাদের ঘর ভেঙে দিতেই চায়? যাদের ঘর তোমরা একবার ভেঙে দিয়েছ, তাদের ঘর তোমরা আবার ভাঙতে চাও কেন? ওগো জজসাহেব! এই কি তোমাদের আইন? এর নাম কি তোমাদের বিচার?

না, আমাদের কলোনীর মানুষগুলো তোমাদের এই বিচার মেনে নিতে পারে নি। তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। নিজের-হাতে-তোলা ঘর তারা বারবার ভাঙতে দেবে না। ওগো জজসাহেব, বল, তোমার ঘর ভেঙে দিলে তুমিই কি খুশী হও? একটা চড়াই পাখির বাসা ভেঙে দিলে সেও বাধা দেয়। আর এতগুলো মানুষের ঘর কেড়ে নেবে তোমরা, আর তারা বাধা দেবে না?

তবু পুলিস এল। গুলি চলল। আর সেই গুলিতে আমার কপাল ভেঙে দিলে তোমরা। আমার হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর সব কেড়ে নিলে।

ওগো জজসাহেব! এই কি তোমাদের আইন? এই কি তোমাদের বিচার?

আমি সেইদিনই গলায় দড়ি দিতাম। দিই নি শুধু ছেলেদুটোর মুখ চেয়ে। আমি মরলে ওদের দেখবে কে? তাই ওদের জন্যেই আমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে।

আমি বেঁচে থাকতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তা তোমরা আমাকে দিলে কই। আত্মীয়স্বজন আমার কেউ কোথাও ছিল না—না পিতৃকুলে, না শ্বশুরকুলে। এক ছিল দিদি। কিন্তু সেও তখন আর আমার আপন-জন নয়। সে বড় ঘরের বউ, আর আমি দীন-দুঃখীর বিধবা। আমার সঙ্গে তার তখন অনেক তফাত। তাই আমি সব কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তার উত্তর দেয় নি। দেবে না জানতাম—তোমাদের ঘরের বউয়ের সঙ্গে ঘর-ভাঙা আমার কিসের সম্পর্ক!

আশ্রয় দিয়েছিল আমার এক প্রতিবেশিনী। তার ঘরের এক কোণে আমরা ঠাঁই নিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্রয় দিলেও, তার আহার দেবার সামর্থ্য ছিল না। কাজেই আমাকে কাজের চেষ্টায় বেরুতে হয়েছে। ভেবেছিলাম, লেখাপড়া তো শিখেছিলাম একটু-একটু, সেটা আবার ঝালিয়ে নিলে কাজ যা-হোক-কিছু খুঁজে পাব।

কিন্তু পাই নি কিছু। যত জায়গায় গেছি, সবাই বলেছে এ-বিদ্যেয় কোন কাজ হয় না। অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাস না করলেই নয়। ভদ্রগোছের কাজ খুঁজেখুঁজে যখন হয়রান হয়েছি, পাই নি কিছু, তখন মরিয়া হয়ে লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করতেও চেয়েছি, রাঁধুনি-গিরি করতেও চেয়েছি। কিন্তু তা-ও জোটে নি কোথাও। আমার যে ভদ্রলোকের মেয়ের মত চেহারা, আমার যে রূপ আছে! তাই কোন বাড়ির মেয়েরাই আমাকে ঘরে ঢোকাতে রাজী হয় নি।

না, কাজ আমাকে কেউ দেয় নি। কিন্তু সাহায্য করতে চেয়েছে অনেকে। চাইতেও হয় নি—সবাই যেচে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠেছি। না, সবাই যে মুখ্যু ছোটলোক ছিল, তা নয়। অনেক শিক্ষিত, সমাজের গণ্যমান্য বিদ্যা[illegible] ভদ্রলোকও ছিল তার মধ্যে। কিন্তু তাদের সবা[illegible] চোখেই আমি একই দৃষ্টি দেখেছিলাম—যার মা[illegible] বুঝতে মেয়েদের ভুল হয় না কখনও। ওগো জ[illegible] সাহেব, তারা সবাই আমাকে শুধু মেয়েমানুষই ভেবেছিল মানুষ ভাবে নি কেউ।

কাজ আমাকে দেয় নি কেউ। চেয়েচি[illegible] প্রতিবেশীদের কাছে ধার-কর্জ করে আমার দিন কেটেছে[illegible] কিন্তু আমার প্রতিবেশীরাও সবাই প্রায় আমার মত গরীব। তারাই বা দিতে পারে কদিন! তাই ক্র[illegible] দুবেলা খাওয়া আমাদের একবেলা দাঁড়িয়েছে; শেষে তা[illegible] প্রায় বন্ধ হবার দাখিল হয়েছে।

নিজে না খেয়ে থাকতে পারতাম। না, তাতে আমা[illegible] কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু ছেলেদুটোকে না খেতে দি[illegible] রাখব কেমন করে! চোখের সামনে পেটের ছেলে যা[illegible] খিদেয় কাঁদতে থাকে, তা হলে মার প্রাণ যে কেমন করে— তা যে মা হয়েছে শুধু সে-ই জানে। ওগো জজসাহে[illegible] তোমাদের তা আমি বোঝাই কেমন করে।

আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তোমরা বি[illegible] কর, আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাগল হয়েই ঘু[illegible] বেড়িয়েছি। কোথায় দুটো পয়সা পাব, ছেলেদুটো[illegible] খেতে দেব, বাঁচিয়ে রাখব—সেই চিন্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি।

এমনি সময় আলাপ আমার মণিমালার সঙ্গে। সে- আমাকে পথের খোঁজ দিয়েছিল—যে-পথ মেয়েদে[illegible] কাছে চিরদিনই খোলা। বিশেষ করে আমার মত রূ[illegible] যার আছে, তার কাছে তো বটেই। ওগো জজসাহে[illegible] তোমরা বিশ্বাস কর, ও-পথে যেতে আমি চাই নি। গে[illegible] তো অনেক আগেই যেতে পারতাম। আর গেলে যে সু[illegible] থাকতাম, তাও আমি জানতাম। কিন্তু আমি গরীবে[illegible] মেয়ে, গরীবের বউ—সুখের জন্যে সব-কিছু কর[illegible] মত মন আমার ছিল না। সুখের স্বপ্ন দেখেছি [illegible] ছেলেবেলায়। তারপরে আমার সব সুখ জড়ো হয়েছি[illegible] কেবল আমার স্বামীর ঘরে—কেবল আমার সংসারে। অ[illegible]

ন সুখের চিন্তা কোনদিন করি নি। তোমরা বিশ্বাস আমি অসতী ছিলাম না—অসতী হতে চাইও নি। মণিমালার পরামর্শ আমি শুনি নি। একদিন, ন, তিনদিন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু তারপরে, যেদিন পরপর দুদিন ছেলেদুটোকে ত দিতে কিছু জুটল না, শুধু জল খেয়ে সারাদিন কেঁদে- দ সন্ধ্যেবেলায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেইদিন— া জজসাহেব, সেইদিন আর আমি পারলাম না। বেলায় মণিমালার সঙ্গে তারই দেওয়া কাপড়-জামা সেজে বেরুলাম। ওগো জজসাহেব, সেই প্রথম দিন— আমার প্রথম দিন!

ভেবেছিলাম, আমি মরি মরব, কিন্তু ওরা যেন বাঁচে— র যেন আর মরতে না হয়। তাই, শুধু তাই—ওগো সাহেব, শুধু তাই আমি মরতে রাজী হয়েছিলাম। ন্তু তোমাদের আইন যে আমার সে-সাধেও বাদ সাধল। ন পরেই এক রাত্রে চৌরঙ্গীর পথ থেকে তোমাদের শ আমাকে ধরে আনল। সে-কথা তো তুমি জান । তোমার কাছেই তো আমাকে নিয়ে এসেছিল। মই তো আমার বিচার করেছিলে।

সেদিন দয়া করে আমাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে। লছিলে, আমরা যদি পাপের পথে চলি, তা হলে সমাজ কি ভেঙে পড়বে। কিন্তু আমরা যদি না খেয়ে মরি, হলেই কি তোমাদের সমাজ বাঁচবে? ওগো জজসাহেব, ন্যর সব পথ বন্ধ করে দিয়ে পাপের পথে যাওয়া তোমরা াইন করে কী করে ঠেকাবে? গাছের গোড়া কেটে াগায় জল ঢাললে কি সে-গাছ বাঁচে, না বড় হয়?

সেদিন যখন আমি তোমার কাছে ছাড়া পেয়ে রুলাম, তখন আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। মনে-মনে আমার সব তখন ভেঙেচুরে গেছে। পথে বেরিয়ে আমার মনে হল, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সবাই আমাকে দেখে হাসছে, সবাই টের পেয়ে গেছে— আমি অসতী।

ওগো জজসাহেব, তাও সয়েছিল। কিন্তু যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, আর ছেলেদুটো কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কাছে এল না, তখন—ওগো জজ- সাহেব, তখন আর আমার সইল না। ওরা আমার কথা কী শুনেছিল, কী ভেবেছিল, জানি না। কিন্তু একদিন তো শুনবেই। আর সেদিন ওরা আমাকে কী ভাববে! ওদের মায়ের কোন্ পরিচয় আমি রেখে যাব! ওরাও কি আমাকে অসতী বলবে?

ওগো জজসাহেব! আর আমি সইতে পারলাম না। আমি যে ওদের মা! মা হয়ে সে আমি কেমন করে সইব!

না, ওগো না, সে আমি সইতে পারব না!

তাই সেইদিন রাত্রে যখন ওরা ঘুমিয়ে পড়ল আমি চুপিচুপি উঠে পরনের শাড়িতে ফাঁস দিয়ে জানলার উপরে বাঁধলাম। আর, তারপর···

না, ওগো না, তবু তোমরা আমাকে মরতে দিলে না!

ওগো জজসাহেব! আমি নাকি আইন মানি নি, তাই তুমি আমার বিচার করবে—শাস্তি দেবে?

কিন্তু কেন, ওগো জজসাহেব, কেন? তোমরা আমাকে বাঁচতেও দেবে না, তোমরা আমাকে মরতেও দেবে না—এই কি তোমাদের বিচার?

তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও নি, তাই তো আমি মরতে চেয়েছি। কিন্তু ওগো জজসাহেব, তোমরা কি আমার মরার অধিকারও কেড়ে নেবে?

শীতের বেলা

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

শীতের পড়ন্ত রোদে ভরে গেছে ঘরের উঠান
বেলা শেষ হয়ে আসে, অচিরেই স্তব্ধ হবে গান
অরণ্য প্রদেশে যত পথিক পাখির। দিনান্তের
বিষণ্ণ সঙ্কেত বাজে গ্রামান্তের ক্লান্ত রাখালের
বাঁশের বাঁশীর সুরে। দ্রুত পায়ে ফিরে আসে ঘরে
হাটে যারা গিয়েছিল পণ্য নিয়ে বিক্রয়ের তরে।
বেলা শেষ হয়ে আসে ; মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়ায়
বনস্পতির অঙ্গে অতর্কিতে কাঁপন জাগায়।

এখুনি মিলিয়ে যাবে এই রোদ,—খুশীতে চঞ্চল,
চির-নৈঃশব্দ্যের মাঝে লীন হবে সব কোলাহল
পরাজিত মুমূর্ষু দিনের। জীবন-সংগ্রামে ক্ষত—
অচিরে অদৃশ্য হবে, ওই সূর্য, এবারের মত
মুহূর্তে বিকীর্ণ করে নিরুত্তাপ যৌবনের দ্যুতি
শেষবার। পশ্চিম আকাশে তারি ত্বরিত প্রস্তুতি।

হাউই

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

এই তো ছিল! কোথায় গেল?

কোথায় গেলেন সুধাময় হালদার, মিস্টার হালদার, যিনি আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল জগতের একজন প্রভাবশালী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মাত্র গতকাল যাঁর ছেচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং এই বয়সেও যিনি স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ নামে পরিচিত। গতরাত্রির পার্টিতেও চেম্বার অব কমার্সের মিস্টার নহপান্ থেকে মিসেস অ্যাণ্ডারসন পর্যন্ত, সকলেই তাঁকে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি সবাইকে, সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেছেন সকলের।···আজ কোথায় গেলেন তিনি?

ঠিক এই মুহূর্তে, দুটো বেজে সতের মিনিটে তাঁর স্ত্রী অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে—বাড়িতে লাঞ্চ করেন মিস্টার হালদার। বড় ছেলে অনিন্দ্য কলেজের অফ পিরিয়ডে কফিহাউসে বন্ধুদের মধ্যে বসে ফরাসী মডেলের ছবি দেখছে তন্ময় হয়ে। সবচেয়ে আদরের ছোট মেয়ে টুটুল স্কুলের কমন-রুমে স্কার্ট দুলিয়ে পিংপং খেলছে।

কিছুক্ষণ আগেও অফিস-পাড়ায় জনস্টন ম্যান্সনের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ধরাতে দেখা গেছে তাঁকে। কী যেন ভাবছিলেন তিনি—পকেটের সৌখীন চামড়ায়-বাঁধানো নোট-বুকের সাহায্য ছাড়াই!

এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। সারিবাঁধা সবুজ গাছগুলোর ভিজে পাতা চিকমিকিয়ে উঠছে রোদ্দুরে। ট্রাম লাইনের উপরের তারে বৃষ্টির জলের বড় বড় ফোঁটা বাদুরঝোলা হয়ে মরকত মণির মত চকচক করছে। ট্র্যাফিক পুলিসের পায়ের নীচে সাদা-কালো বার্নিশ করা ড্রামটা আপাদমস্তক ভিজে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলার এক-চাকাওয়ালা গাড়িটাও চিত হয়ে পড়ে আছে ফুটপাতের একপাশে।

না। বাড়িতে যান নি মিস্টার হালদার। স্ত্রীকে টেলিফোন করে লাঞ্চে কি কি খাবেন সেটাও জেনে নেবার সময় পান নি তিনি। শেয়ারমার্কেট বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে আজ। বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের জরুরী মিটিং আছে ঠিক তিনটে বেজে পনের মিনিটে, পাঁচটা দশে উলওয়ার্থ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট।

ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেন মিস্টার হালদার। অন্যান্য দিনের মত আজও ব্যতিক্রম হয় নি এ নিয়মের। সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেছেন। বাথরুম ঘুরে এসে দাড়ি কামিয়েছেন নিখুঁত ভাবে। দামী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সদ্য কামানো মসৃণ নিটোল গালে হাত বোলাতে বোলাতে একটা অতি পরিচিত সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তির হাসি ফুটেছে চোখের কোণে। তারপর আবার বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

সাড়ে ছটা—চায়ের টেবিলে এসে বসলেন তিনি। ছেলেমেয়েরা তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। স্ত্রী গায়ত্রী দেবী স্লাইশ করা রুটিতে পুরু করে মাখন মাখাতে মাখাতে জিজ্ঞাসা করলেন, আজও কি লাঞ্চে ফিরতে পারবে না?

মিস্টার হালদার ততক্ষণে ডিমের পোচের লাল কুসুমটা অক্ষত অবস্থায় মুখে পুরে দিতে পেরেছেন। অস্পষ্ট গলায় বললেন, দেখি।

গায়ত্রী দেবী প্লেট সাজাতে সাজাতে মৃদুস্বরে বললেন, রোজ এমন অনিয়ম ভাল নয়, অ্যাসিডিটি হতে পারে।

হালদার সাহেব চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে একটু বিস্মিত ভাবে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর নজর খুব সজাগ। তবুও স্ত্রীর এই অনর্থক আশঙ্কাটা তাঁর ভালই লাগল। রুমালে ঠোঁট মুছে একটা চুরুট ধরালেন তিনি। গতকালের অনেকগুলো চিঠি মুখবন্ধ হয়েই পড়ে আছে। আজ সেগুলো খুলে একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগলেন হালদার সাহেব।

একটা চিঠি পড়তে পড়তে তাঁর মুখভাব ঈষৎ তিত হল। অনেক দিনের পুরনো কোন কথা করতে চেষ্টা করলেন তিনি। চিঠি লিখেছে মালতী, গ্রামের মেয়ে। এখন অবশ্য মহিলা, কিন্তু মিস্টার র যখন কেবল সুধাময় ছিলেন, তখন মেয়েটি তন্বী তরুণীই ছিল। সুধাময়ের চাইতে বছর চারেক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। এক ডাকে চিনত মালতীর বাবা ভৈরব ঘোষালকে। রী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। পাশাপাশি বাড়ি। এবং অব্রাহ্মণ হলেও পরীক্ষায় জলপানি পাওয়া কৈশোরোত্তীর্ণ দিনেও মালতীদের বাড়ি তের অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল।

সেই মালতী, মিস্টার হালদারের ছেচল্লিশতম জন্মদিনে জীবনের শুভকামনা জানিয়ে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য না করেছে। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে নাকি বড় আছে মালতী। পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে দার সাহেব যেন তাকে নিরাশ না করেন।

স্বামীকে প্রশান্ত চিন্তায় মগ্ন দেখে গায়ত্রী দেবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু হালদার সাহেব ও কোনদিন অপ্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করেন ধীরেসুস্থে চা-পান শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন । যেতে হবে নতুন ফ্যাক্টরীর জন্যে জমি দেখতে জলা অঞ্চলে।

মাঠে তখনও ভোরের শিশির শুকোয় নি। সাদা শার ঘন বুনট পাতলা হয়েছে শুধু। রেল লাইন য়ে কচুরীপানা। তারপর মাঠ। প্রথমে মরচেধরা টিন, মেটে কলসীর কাণা, শ্যাওলা-ধরা ইঁটের পাঁজা, পর ফাঁকা মাঠ—এবড়ো-খেবড়ো, ঢেউ-খেলানো।

গাড়ি থেকে নামলেন হালদার সাহেব। ড্রাইভারকে দেশ দিলেন রাস্তার অন্য পাশে গাড়ি দাঁড় করাতে, পর মাঠে নামলেন। কিছুদূর মন্থর পায়ে এগিয়ে তাকালেন চারদিকে একবার। আকাশের শেষ গাঢ়নীল দাগটা আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে ছে। অনেকক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর আরও দু-এক পা এগোলেন ট্রাউজারের তলায় কাদা লাগার ভয় উপেক্ষা করে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন হালদার সাহেব, টাইয়ের নটটা আলগা করে দিয়ে নীচু হয়ে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিলেন হাতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ ঢেলাটা, তারপর কি মনে করে লাল রঙের প্রকাণ্ড সূর্যটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন সেটা।...এ পাশে হরতকী গাছটা থেকে একটা কোকিল চিৎকার করে উঠল তারস্বরে।...এক ঝাঁক উইপোকা ফরফর করে বাতাসে উড়ল কোনও গর্ত থেকে সেই সময়।

হালদার সাহেব কোকিল দেখলেন, উইপোকাও। মনে মনে ভাবলেন উইপোকা থেকে কোকিল!... অ্যানথ্রপয়েড থেকে হোমো—কি যেন...হোমোসেপিয়েনস্। মনে মনে কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হেসে ফেললেন তিনি। বানর থেকে মানুষ!...ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে উঁচু আলপথের গায়ে হোঁচট খেলেন জোরে—উঃ। নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মনে পড়ল মালতী টাকা চেয়েছে।

মালতী! এককালে নামটাতে জাদু মাখানো ছিল। কলকাতার হস্টেলে বসেও চঞ্চল হয়ে উঠত সুধাময়। মেলামেশাটা নিষিদ্ধ, কাজেই আকর্ষণ ছিল বেশী। কলেজ কামাই করে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত সুধাময়। শীতের দুপুরে বোটানিকাল গার্ডেনের সবুজ ঘাসের মখমলে গা ডুবিয়ে দিয়ে, আউটরাম ঘাটের শান-বাঁধানো চাতালে পা ছড়িয়ে বসে সুধাময় স্বপ্ন দেখত। দিবাস্বপ্ন। চিঠি লেখার পথ বন্ধ। মনে মনে ভাবতে ভাল লাগত, মালতী হয়তো এতক্ষণে স্নান করে এসে রঙিন ডুড়ে শাড়ির আঁচল বাঁচিয়ে পিঠের উপর চুল ছড়িয়ে দিয়েছে—ঘন কালো আর কোঁকড়ানো দীর্ঘ চুলের রাশ। কাছে থাকলে একটা অস্পষ্ট মিষ্টি গন্ধ টের পাওয়া যায়। টানা টানা ভুরুর ঠিক মাঝখানে কুমকুমের ছোট্ট টিপ। ঢিলেঢালা ব্লাউজের হাতায় রঙিন সুতোর কারুকাজ। সুধাময় প্রথম প্রথম যখন নিঃসঙ্কোচে ঘোষালদের বাড়িতে ঢুকে সপ্রতিভ হেসে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসত,

মালতী খানিক পরে এ-ঘর ও-ঘরে অকারণ ঘোরাফেরা বন্ধ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে একপাশে জায়গা করে নিত। কথার ফাঁকে ফাঁকে মালতীর পায়ের পাতার দিকে না তাকিয়ে পারত না সুধাময়। শঙ্খের মত সাদা নিটোল পা—

ফিরে যাচ্ছিলেন হালদার সাহেব। হঠাৎ কি মনে হল, ঘুরে দাঁড়ালেন। মাটি থেকে আবার একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিলেন। খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন সেটা হাতে করে। তারপর ছুঁড়ে মারলেন উইয়ের ঝাঁকটাকে লক্ষ্য করে। কতকগুলি উইপোকা মাটিতে পড়ল, বারকতক ঘুরপাক খেয়ে শেষে স্থির হল। হালদার সাহেব জুতোর ডগা দিয়ে একটা পোকা উলটে দেখলেন। পেট মোটা। ডিম পাড়বার সময় হয়েছিল বোধ হয়। ঘুরে তাকালেন হরতকী গাছটার দিকে, কোকিলটা উড়ে গেছে।

গাড়িতে বসে ইংরেজী খবরের কাগজটা খুললেন হালদার সাহেব।··· লেবাননে বিদ্রোহ। সাবমেশিন গানের নলটা কত ছোট! মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখলেন তিনি। কাঁচ-ঢাকা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন তারপর। কর্পোরেশনের লোক রাস্তায় জল দিচ্ছে। হাইড্রান্টের একটা স্ক্রু আলগা হল—অমনি ভুস্‌ভুস্ করে ঘোলা জলের ফোয়ারা তৈরি হল একটা। বেশ কৌতুক অনুভব করলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখলেন কয়েকবার। মনে মনে ভাবলেন, উইপোকা থেকে কোকিল···ইস্ক্রুপ থেকে···

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা ব্রেক কষল হঠাৎ, সামনে একটা কুকুর পড়েছিল। হালদার সাহেব নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন, তারপর ডুবে গেলেন স্টক-এক্সচেঞ্জের পাতায়।

স্যুইং-ডোরের নীচে ছায়া পড়েছে একটা। ছায়াটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। এগিয়ে আসছে একটু একটু করে সামনের কার্পেটের দিকে। হাতের লাল-নীল পেনসিলটা নামিয়ে রাখলেন হালদার সাহেব। তাকিয়ে রইলেন ছায়াটার দিকে। কার্পেট থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ছায়াটা থমকে দাঁড়াল। মিনিট দুই। তারপর আবার ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল একসময়। হালদার সাহেব মৃদু হাসলেন। আরদালীটা বাইরের টুলে বসে নো[illegible] বোধ হয়।

একটা আড়মোড়া ভেঙে গদি-আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন মিস্টার হালদার। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বসে কাজ করেছেন। শূন্যমনে সামনের সাদা দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পরে আবার—আবার ভাবলেন মালতীর কথা।

স্যুইং-ডোরের নীচে ছায়াটা যেমন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল কার্পেটের দিকে, সুধাময়ও তেমনি এগিয়ে যাচ্ছিল মালতীর কাছে। কলেজ কামাই করে সুধাময় গ্রামে গিয়ে হাজির হত। নদীর ধারের কাশবনে অপেক্ষা করত মালতীর জন্যে। ওপারের আকাশের প্রান্তে নীল দাগের মাথাটা যখন হঠাৎ আরক্তিম হয়ে উঠত তখন আসত মালতী সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে।

হ্যাঁ, সকলের দৃষ্টি এড়িয়েই আসত মালতী। [illegible] করেও আর আগেকার মত যখন-তখন কাঠ-গোলাপ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে খোঁপায় ফুল পরবার সাধ, কি বাগানের বৃষ্টি-ভেজা মাটিতে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে হঠাৎ জামরুল খাবার বাসনা ঘটাতে পারত না। কেন না, তখন প্রয়োজন ঘটত সুধাময়কে—এতকাল অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে এই সব ছোটখাটো ইচ্ছে পূরণ করেছে। এতকাল বলতে দু বছর আগেও, ম্যাট্রিক পাস করে সুধাময়ের কলকাতায় পড়তে যাবার আগে।

কিন্তু তখন হাওয়া বদলের পালা। ঘোষালদের ফুলবাগানে হাস্নুহানার গন্ধ তীব্র হয়ে উঠলেও সুধাময় ওদিকটায় যেতে সাহস পেত না। মালতীর বাবার গম্ভীর মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠত। সুধাময় তার চেয়েও বেশী ভয় পেত মালতীর শুচিবায়ুগ্রস্ত পিসীমাকে। প্রতিবেশীদের কানাকানিটা বাড়াবাড়ি রকমেরই হয়েছিল, কেন না সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে গন্ধরাজের ঝোপের আড়ালে

াপাশি বসে থাকাটা এমন কিছু মারাত্মক রকমের রাধ নয়।

···টেলিফোন বাজল। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল ার হালদারের। হ্যালো স্পিকিং, ইয়েস। বুলিয়ন ট···মাই গুডনেস···কে? আগরওয়ালা···আই সী! ারেঞ্জ, কেন? আচ্ছা।—টেলিফোন রেখে দিলেন ার হালদার। স্টেনোগ্রাফার মিস ডা'সিল্ভা নিয়ে এল প ফাইল আর টাইপ করা চিঠিপত্র। একটার পর টা সই করে যেতে লাগলেন তিনি—ডগলাস ম্যাকেঞ্জী, চাঁদ, উলওয়ার্থ, প্রেম ভাটিয়া, ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক—সব কিছু। বেয়ারা ঢুকল। সাড়ে নটার সময় এক কাপ কফি মিস্টার হালদার। সবুজ রবারের কুশনের উপর সাদা সিলেনের কাপ। ফ্যাকাশে রক্তের মত কফি। টের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বেয়ারা চলে গেল। আবার । কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ তুললেন হালদার সাহেব। নের দেওয়ালটা সাদা। একটা টিকটিকি পোকা ছে।·· ওগুলো কি পোকা কে জানে! উইপোকা কে কোকিল···ইস্ক্রুপ থেকে···! চুরুটের ছাই ঝাড়লেন দার সাহেব।

মালতী আগে প্রায়ই আসত সুধাময়ের কাছে। ীর ধারে কাশবনের আড়ালে দূরের আকাশ যখন াৎ রক্তিম হয়ে উঠত তখন। কানের কাছে মুখ মিয়ে কথা বলতে ভালবাসত মালতী। মেঠো তাসের মত আকুল হয়ে উঠত। অস্পষ্ট একটা মিষ্টি ন্ধ ভরা নিবিড় কালো পুঞ্জ পুঞ্জ চুলের সমুদ্রে সুধাময়ের টি ভেসে বেড়াত দিশেহারা পানসির মত। লতার মত কড়ে ধরত মালতী দু হাত দিয়ে। সুধাময় দেখত ারের আকাশে তারা উঠেছে। নীল তারা। আচ্ছা, লোটা আসতে কত সময় লাগে? এক বছর, কি—বছর—তিন—চার—এক শো—হাজার—এক লক্ষ র!···হয়তো আরও বেশী! এই মুহূর্তে যে আলোর শ্মটা রওনা দিল সেটা যদি দেখা যেত এখানে বসে!

দরজায় টোকা পড়ল। মিস্টার উপাধ্যায় ঢুকলেন—কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর। কাজের কথা নিয়ে এসেছেন মিস্টার উপাধ্যায়। ট্রাভাঙ্কোর ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে যাচ্ছে। ঝরিয়া কোলফিল্ডের কিছু মোটা টাকার শেয়ার ওদের হাত থেকে রাতারাতি জলের দরে কিনে নেওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ওদের সঙ্গে আলোচনাটাও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তিনি, এখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি—চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মিস্টার হালদার সংক্ষিপ্ত ভাষায় আলোচনায় যতি টানলেন: ক্লোজ দ্য ডীল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা উপেক্ষা করবার সাহস বোর্ডের নেই। হৃষ্টমনে মিস্টার উপাধ্যায় উঠে দাঁড়ালেন।

হালদার সাহেব চেয়ার ছেড়ে বাইরে এলেন। বাইরে মানে—কোমর-উঁচু রেলিং-ঘেরা কেরানীদের রাজত্বে। লাইন ধরে সাজানো টেবিল-চেয়ার। প্রথমে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ডোম-ঘেরা ল্যাম্প, টেলিফোন, শেয়ারমার্কেট গাইড, ব্র্যাডশ। তার পরের টেবিলগুলো ছোট, আরও ছোট। শেষে স্যুইচবোর্ডের নীচে পিওনের টুল। প্রথমে জাঁদরেল চেহারার বড়বাবু, তারপর রোগা চেহারার কেরানীবাবু। সবেমাত্র জলের গ্লাস, চায়ের কাপ মুখে তুলে নিয়েছিল অনেকে—ঠকাঠক্ নামিয়ে রাখল তারা। ভনভনানি একমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। তড়াক করে সোজা হয়ে বসে ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়ল তারা। মিস্টার হালদার মনে মনে হাসলেন। তাঁকে ভয় করে সবাই এরা।

ভাসা ভাসা চোখে তাকালেন চারিদিকে। বড় টেবিল থেকে ছোট টেবিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন বড়বাবু, কেরানীবাবু, জলের কুঁজো, কড়িকাঠ। কানের কাছে গুন্‌গুন্ করে উঠল সকালের সেই পুরনো কথাটা—উইপোকা থেকে কোকিল···অ্যান্থ্রপয়েড থেকে হোমো, কি যেন·· হোমোসেপিয়েনস্। কথাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ হেসে ফেললেন হালদার সাহেব। বানর থেকে মানুষ···!

আশেপাশের সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নিঃশব্দে ফিরে আবার গিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন হালদার সাহেব।

মিস ডা'সিলভাকে ডিক্টেশন দিতে হবে। সকালের ডাকের চিঠি তাড়া করে বাঁধা, টেবিলে দিয়ে গেছে। মিস্টার হালদার ডুবে গেলেন তার মধ্যে—ডগলাস ম্যাকেঞ্জী, উমিচাঁদ, উলওয়ার্থ, প্রেম ভাটিয়া, ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক। কিছুক্ষণ পর এক মুহূর্তের জন্যে চোখ তুললেন তিনি। দেখলেন, হাতঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা বারোটা থেকে পিঁপড়ে-পায়ে এগিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করে আবার বারোটাতেই গিয়ে মিশল। সামনের দেওয়ালটা সাদা।… টিকটিকিটা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটা পোকার ওপর।

হালদার সাহেব চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

মালতী শেষ পর্যন্ত নিজেই আসা বন্ধ করে দিল। নদীর ধারে কাশবনে রোজ অপেক্ষা করত সুধাময়। দূরে নীল দাগটার ঠিক ওপরে আকাশটা হঠাৎ আরক্তিম হয়ে উঠত, কিন্তু মালতী আর আসত না। দেখা পর্যন্ত পায় নি সুধাময়। দূর থেকেও না। পাশাপাশি বাড়ি, চুড়ির টুংটাং, লঘু পায়ের শব্দ শুনে কতবার চমকে উঠে ঘুরে তাকিয়েছে সুধাময়। সারা দিনমান বৃথাই খুঁজে বেড়িয়েছে তার অবাধ্য দৃষ্টি মালতীকে।

কলেজ-কামাই-করা অনেক দিন তারপর নদীর ধারে কাশবনের আড়ালে বসে কেটেছে। দূরের আকাশ আরক্তিম হয়ে এসেছে। গরু মোষ ঘরে ফিরেছে লালধুলো উড়িয়ে। চখা-চখী আর বালিহাঁসের দলও ভাটিবাতাসের আলসেমিতে গা ভাসিয়ে ফিরে এসেছে নীড়ে। কিন্তু মালতী আর আসে নি। সে যেন চিরকালের মত মিশে গেছে গোধূলির ধূসরে। ওপারের আকাশে তারা উঠেছে। নীল তারা। ওখান থেকে আলো এসে পৌঁছতে—কত সময়…কত সময় লাগে? কে জানে?

ক্রিং ক্রিং—টেলিফোন বাজল।…ইয়েস। হ্যাঁ, স্ক্র্যাপ আয়রণ…কোটেশন…সাড়ে বারো পার্সেন্ট!…আচ্ছা, বম্বে স্টক-এক্সচেঞ্জের কি খবর…তাই নাকি? উমিচাঁদ কি বলে? …ফুল! অথচ সুইং-ডোরের নীচের ছায়াটার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ছায়াটা কার্পেট ছোঁয় নি, সুধাময় মালতীকে পায় নি। কানের কাছে একটা ড্রামের শব্দ হতে লাগল ঢুক্ ঢুক্।—ছায়াটা কার্পেট ছোঁয় নি…সুধাময় মালতীকে পায় নি—ছায়াটা…হ্যাল্লো, হ্যাঁ, রামগড়ের মাইকা হবে না? হতাশভাবে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন মিঃ হালদার।…টাকা চেয়েছে মালতী!

ঘণ্টা বাজিয়ে মিস ডা'সিলভাকে ডাকলেন হালদার সাহেব। অনেকক্ষণ ডিক্টেশন দিলেন নিবিষ্ট মনে। ঠিক তিনটে বেজে পনের মিনিটে বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের মিটিং আছে। নিপুণ হাতে অ্যাজেণ্ডা তৈরি করে ফেললেন তিনি। পাঁচটা দশে উলওয়ার্থ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট।

মিস ডা'সিলভা চলে গেছে। কাজ শেষ করে হালদার সাহেব পাশের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ফ্যাকাশে হলুদ রোদ। আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাস্তায় টেলিফোনের তারের ওপর একটা বুড়ো কাক বসে আছে। রোঁয়া-ওঠা মেটে রঙের ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ভিতরে তাকাচ্ছে। একবার চিৎকার করে উঠল কা-কা। কি বিশ্রী গলার স্বর! সকালের কোকিলটার কথা মনে পড়ল। হালদার সাহেব ভাবলেন কাক থেকে কোকিল, না কোকিল থেকে কাক? কোনটা? কিন্তু উইপোকা থেকে…?

কোণের জানলার শার্সিটার একটা পাট বন্ধ। একটা মাকড়সা জাল বুনেছে। জালটাকে দূর থেকে একটা তারার মত দেখাচ্ছে। নীল তারা। নীচে অনেকদূর পর্যন্ত একটা সরু সুতো নেমে গেছে, ডগায় মাকড়সাটা ঝুলছে। হালদার সাহেব তাকিয়ে রইলেন ওই দিকে। মাকড়সাটা সুতো বেয়ে অনেকটা উপরে উঠে এল, জালটার কাছাকাছি এসে আবার ঝপ করে নেমে গেল অনেক দূর। আবার উঠল, আবার পড়ে গেল। এই ওঠানামা দেখতে দেখতে হালদার সাহেব ভাবতে লাগলেন—মাকড়সাটা জাল পর্যন্ত কোনদিন পৌঁছুবে কি না?

কাকটা টেবিলের উপর সাদা পোর্সিলেনের পেয়ালাটার দিকে নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে থাকতে

তে হঠাৎ উড়ে গেল কা-কা করে। হাতঘড়ির দিকে পড়ল, মিনিটের কাঁটা বারোটার ঘর থেকে রওনা ছিল অনেকক্ষণ আগে। একটা বৃত্ত রচনা করে র সেটা বারোটায় গিয়ে মিশল।

বাড়িতে দোতলার শোবার ঘরের ব্যালকনির নীচে য়ালিয়া গাছটাতে ফুল ফুটেছে। মালিটা বোধ হয় দেখে না, ওটাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। একটা হাই লেন হালদার সাহেব। সামনের দেওয়ালে হ্যাট্-এর গোল আরশিতে এখানে বসে মুখ দেখা যায়। চড়ে সোজা হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, গায়ত্রী মোটা পড়ছে। বিয়ের সময় রোগা ছিল কিন্তু! লাল-নীল সল দিয়ে ব্লটিং-পেপারের উপর হিজিবিজি দাগ তে কাটতে হালদার সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল—দা লুকিয়ে আমেরিকান টু-পেনী সিরীজের বই পড়ে। শেই আবার সস্নেহে হাসলেন—টুটুল বড় ভাল মেয়ে, ফার্স্ট হয়, আবার পিংপং খেলে।

মিস ডা'সিলভা সুইং-ডোরের ও-পাশ থেকে গলা য়ে মিহি সুরে বলল, ইট্‌স্ লাঞ্চ টাইম, স্যর্।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হালদার সাহেব। মনে দ্বন্দ্ব করতে শুরু করলেন, চেম্বারে বসেই লাঞ্চ করবেন, হোটেলে যাবেন। দু মিনিটের রাস্তা। হ্যাঙারে নো কোটটা গায়ে চড়ালেন। দরজার ও-পাশে র-উঁচু রেলিং-ঘেরা কেরানীদের রাজত্ব। হালদার চারদিকে তাকালেন একবার। বড়বাবু···কেরানী-ক্লের কুঁজো···কড়িকাঠ। ভনভনানি একমুহূর্তে গেল। তড়াক করে সোজা হয়ে বসে ফাইলের উপর পড়ল সবাই। মৃদু হাসলেন মিস্টার হালদার। তাঁকে রে এরা।

লিফ্‌ট্‌ম্যানকে নিষেধ করলেন তিনি, ড্রাইভারকেও। বেয়ে তরতর করে নেমে এলেন রাস্তায়। ফ্যাকাশে রোদ তাঁর কোটের কলারে আশ্রয় নিল, অলিভ-কপাল উজ্জ্বল হল। ঠিক দু মিনিট পরে গিয়ে লেন হোটেলের দরজায়। একটা বেজে পাঁচ। ঢুকলেন হালদার সাহেব। ব্যাণ্ডে নীচু পর্দায় তী সুর বাজছে। দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনলেন, তারপর সটান এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন টেবিলের পাশে। চারদিকে তাকালেন একবার, ফাঁকা। মনে মনে খুশী হলেন তিনি, এখানে খেতে বেশী। ফাউল স্ট্যুর প্লেটের পাশে স্যালাডের বাটি নিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে চললেন।

কছুক্ষণ পর কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে স্যাণ্ডুইচের দিকে তাকালেন।···ঠিক হৃৎপিণ্ডের মত। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন হালদার সাহেব। কি যেন ভেবে চোখ নামিয়ে মাংসের প্লেটের দিকে তাকালেন। না—নেই! ফাউলের হৃৎপিণ্ডের শব্দটা কেমন কে জানে? মালতীর হৃৎপিণ্ড কিন্তু খুব জোরে শব্দ করত। খুব জোরে আর তাড়াতাড়ি।···ধক্··· ধক্···ধক্···ধক্। সুধাময় কান পেতে শুনেছিল একদিন। ঝড়ের মুখে ক্লান্ত পাখির মত সুধাময়কে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল মালতী অনেকক্ষণ। সুধাময় ভাবছিল, এই মুহূর্তে ওই নীল তারা থেকে যে আলোর রশ্মিটা রওনা দিল সেটা এখানে আসতে··· কত সময় লাগে? ··যদি এখানে বসে দেখা যেত!

খাওয়া শেষ করলেন হালদার সাহেব। ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছে কফির পেয়ালা টেনে নিলেন সামনে। চুরুট ধরিয়ে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল জগতের কথা।···উমিচাঁদের দাবি বড় বেশী···রামগড়ের মাইকা···উলওয়ার্থ শেষ পর্যন্ত কত পার্সেন্টে রাজী হবে, বলা শক্ত···মিস্ ডা'সিলভার লো-কাট্ গাউন···ফিগারটি বেশ।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হালদার। সামনে চকচকে ক্রোমিয়ামের থালা-হাতে দাঁড়ানো ওয়েটারকে মোটা রকম বকশিশ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। চওড়া টানা প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে কৃত্রিম ফোয়ারাটার পাশে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সামনে কাঁচের আলমারির মত পাবলিক টেলিফোনটা দেখে মনে পড়ল, স্ত্রী গায়ত্রী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। খুচরো পয়সার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন মিস্টার হালদার। সাদা সার্ট আর প্যাণ্ট পরা একটা লোক দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে টেলিফোন করছে। শান্ত-ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

ফ্যাকাশে হলুদ রোদটা আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে বাইরে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে আবার। হালদার সাহেব তাকিয়ে আছেন টেলিফোন-ঘরটার দিকে একদৃষ্টে। সাদা সার্টপ্যাণ্ট পরা লোকটা উত্তেজিত ভাবে হাত নাড়ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঠোঁট নড়ছে অনর্গল। অথচ কোন শব্দ নেই। কাঁচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে লোকটার নিঃশব্দ অঙ্গভঙ্গী দেখতে দেখতে হালদার সাহেবের মাথাটা হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল যেন। বিদ্যুৎঝলকের মত ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় একদিন চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে শিম্পাঞ্জীর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। শিম্পাঞ্জীটা একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাঁর

চোখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কি ছিল ?…কী যেন বলতে চেয়েছিল শিম্পাঞ্জীটা !…বলতে পারে নি। সেই না বলতে পারার আকুলতা—হতাশা ছিল তার দৃষ্টিতে আর অঙ্গভঙ্গীতে।

ভয় পেয়ে সরে এসেছিলেন তিনি ওখান থেকে। এই টেলিফোন-ঘরের লোকটাও—হালদার সাহেবের মনে হল—কি যেন বলতে চায়। অথচ বলার পথ বন্ধ। এই পৃথিবীতে সবাই যেন তাকিয়ে আছে টেলিফোন-ঘরটার দিকে, অথচ কেউ শুনছে না—কেউ বুঝছে না লোকটার কথা! এবারেও ভয় পেলেন তিনি। মাথাটা টিপটিপ করছে অনেকক্ষণ থেকে। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম রুমাল দিয়ে বার বার মুছলেন হালদার সাহেব, তার-পর টেলিফোন-ঘরটার দিকে না তাকিয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন বাইরের দরজার দিকে।

হোটেলের শিখ দারোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম করে উঠে দাঁড়াল। গোল দরজাটা সব সময় ঘুরছে। ঘুরছে পৃথিবীর আহ্নিক গতির মত রুপোলী স্টীলের রডটাকে কেন্দ্র করে। হালদার সাহেব ভাবলেন, দরজার কুঠুরি থেকে যে সময়মত বেরুতে পারবে না, সে আটকা পড়ে যাবে চিরকালের মত। বেরুবার পথ নেই।…চিরকালের মত আটকা পড়ে যাবে। দরজা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সেও ঘুরবে। মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে উইপোকা…কোকিল…কাক…মাকড়সা…মানুষ…যেমন ঘুরছে—বেরুবার পথ নেই।

হালদার সাহেব হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। ভিতরের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে জবজব করছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত স্খলিত পদে বেরিয়ে এলেন তিনি। তারপর নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার ধরিয়ে ঘোলাটে দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেন একবার।

এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। ফ্যাকাশে হলুদ রোদ। ট্রাম লাইনের তারে বৃষ্টির জল জমে মরকত মণির মত চকচক করছে।

একটা লাইটপোস্টের নীচে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সকাল থেকে মনের অসম্বদ্ধ চিন্তাগুলিকে জোড়া দিতে চেষ্টা করলেন হালদার সাহেব।

উইপোকা থেকে কোকিল…অ্যানথ্রপয়েড থেকে হোমো…কি যেন, হোমোসেপিয়েনস। ডগলাস ম্যাকেঞ্জী…উমিচাঁদ…ইস্ক্রুপ…না না, ফ্রেঞ্চব্যাঙ্ক—বেশ…টিকটিকি পোকা খায়! খানিকটা থুতু ছিটোলেন হালদার সাহেব। চুরুটের পিছনটা ভিজে গেছে। তামাকটা তেতো। তারপর, হ্যাঁ মাকড়সা—মাকড়সাটা সুতো বেয়ে জালে পৌঁছুবে কবে ? ফাউলের হৃৎপিণ্ড ! তারপর টেলিফোনের সেই লোকটা।…শিম্পাঞ্জী…কি আশ্চর্য, কথা বলতে চায়!…দরজাটাই বা ঘোরে কেন ? যে সময়মত বেরুতে পারে না, চিরকালের মত আটকা পড়ে যায়। বেরুবার পথ নেই…চিরকাল…বেরুবার পথ নেই !

একটা আবছা হাসি যেন হালদার সাহেবের গলায় বুড়বুড়ি কাটতে লাগল। কানের কাছে আবার বাজতে আরম্ভ করল সেই ড্রামের ডুরু ডুরু শব্দ—ছায়াটা কাপেট ছোঁবে না, সুধাময় মালতীকে পাবে না। ছায়াটা—হঠাৎ একটা অদম্য হাসির তোড়ে হালদার সাহেবের ভারী দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। উন্মাদের মত হাসতে লাগলেন তিনি।…টাকা চেয়েছে মালতী!

দূরে একটা ডবল-ডেকার বাস ফুটপাথ ঘেঁষে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। হালদার সাহেব চারদিকে তাকালেন একবার। গাছপালা পশুপাখি মানুষ ট্রাম বাস সবকিছুই যেন এক প্রবল মাধ্যাকর্ষণের বেগে বন্‌বন্ করে নিরুপায়ের মত ঘুরছে।…চিরকাল এমনি ভাবে ঘুরবে…বেরুবার পথ নেই…! শিউরে উঠলেন তিনি। ডবল-ডেকার বাসটা এসে পড়েছে প্রায়, মৃদু হেসে হালদার সাহেব ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন।

এই তো ছিল ! কোথায় গেল ?

কোথায় গেলেন সুধাময় হালদার, বিখ্যাত আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ; মাত্র গতকাল যাঁর ছেচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং এই বয়সেও যিনি সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান হিসেবে সোসাইটিতে সুপরিচিত ?

ঠিক এই মুহূর্তে, দুটো বেজে সতের মিনিটে, বাড়িতে তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। বড় ছেলে ফরাসী মডেলের ছবি দেখছে তন্ময় হয়ে, আর বড় আদরের ছোট মেয়ে টুটুল স্কুলের কমন-রুমে স্কার্ট দুলিয়ে পিংপং খেলছে।

কিছুক্ষণ আগেও দেখা গেছে তাঁকে। লাঞ্চ শেষ করে এসে জনস্টন ম্যানসনের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ধরিয়েছিলেন মিস্টার হালদার। কি যেন ভাবছিলেন তিনি, পকেটের সৌখীন চামড়ায়-বাঁধানো নোট-বুকের সাহায্য ছাড়াই !

[ত্রিংশৎ শতাব্দীর ভ্রাম্যমাণের ডায়েরী থেকে]

এখন যে-কোন মানুষ যখন খুশি প্রাক্-সভ্যতার যুগে রেলগাড়িতে তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়ার চেয়ে মান্য কিছু বেশী দিয়ে অনায়াসে স্পুটনিক-যোগে যে ান গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে। ামাদের সময়ে কিন্তু তেমন সুবিধে ছিল না। তখন সবে টনিকের সাহায্যে মহাকাশ-ভ্রমণ শুরু হয়েছে—এক ফবার স্পুটনিক পাঠাতে কোটি কোটি টাকা খরচ পড়ত। জেই তখন স্পুটনিকের একখানা টিকিট কাটতে যা চ পড়ত তা দিয়ে একখানা রাজ্য কেনা যেত। অথবা া চলে বিক্রি করার মত রাজ্য যদি কারও থাকত তবে র পক্ষেই স্পুটনিকের টিকিট কাটা সম্ভবপর ছিল। ন্তু তখন ব্যক্তিগত মালিকানার রাজ্য বড় একটা ছিল । অবশ্য তখনকার দিনে শিল্পপতি বা বাণিজ্যপতিরা গাধ টাকার মালিক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কথা উল্লেখ রাই অবান্তর। কারণ স্পুটনিকের টিকিট কেটে টাকা চ করার চেয়ে স্পুটনিকের ব্যবসা করে টাকা াজগারের ব্যাপারেই তাঁরা বেশী আগ্রহী ছিলেন।

তবু সে সময় বেশ কিছু সংখ্যক স্পুটনিকের টিকিট ক্রি হত। ব্যাপারটা আসলে তেমন কিছু রহস্যজনক । সে সময় প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু অবাঞ্ছিত াক থাকত, এবং সে দেশের সরকার দেশে বা বিদেশে ান রকম আলোড়ন সৃষ্টি না করে তাদের অপসারিত তে চাইতেন। সরকার তখন বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাদের একখানা করে স্পুটনিকের টিকিট উপহার দিতেন। তাতে যে সরকারকে খুব একটা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত তা নয়। ভূতের টাকা কোত্থেকে যে আসত এবং কোথায় যে যেত তা ভূতের বাবারও জানার জো ছিল না।

বোধ হয় কোন না-জানা কারণে সরকার আমাকে অবাঞ্ছিত লোক বলে গণ্য করেছিলেন। একদিন এক অফিসার এসে একগাল হেসে আমাকে একখানা স্পুটনিকের টিকিট উপহার দিয়ে গেলেন। তিনি অবশ্য জানালেন যে এটা আসলে আমার সাহিত্য-কৃতির স্বীকৃতি এবং সাহিত্যিক-সুলভ সরলতার সঙ্গে কথাটা আমি অকপটে বিশ্বাসও করে নিলাম। এই রকমের একটা জিনিসের আমি তখন বিশেষ দরকার বোধ করছিলাম। তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক আমদানি হ্রাসের হিড়িকে আমার ঘড়ির কারখানার চাকরিটা যাই যাই করছে। এগারো ক্লাসের শিক্ষা-ব্যবস্থার হিড়িকে ছেলেকে কোন স্কুলে ঢোকাতে সক্ষম হই নি; কন্যা শাসিয়ে রেখেছে যে অবিলম্বে বিয়ে না দিলে সে যথারীতি মন্ত্র পড়ে চিত্রাভিনেত্রী হবে, আর সর্বোপরি স্ত্রী 'জোনাকির আলো' প্যাটার্নের নেকলেস না তৈরি করে দিলে পিত্রালয়ে যাবেন বলে নোটিস দিয়েছেন। কাজেই স্পুটনি টিকিটখানা পেয়ে আমি যে সরকারকে দু হাত তুলে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম তা বোধ করি না বললেও চলে।

আমাদের স্পুটনিকটির চাঁদে, না মঙ্গলে, না বুধে যাওয়ার কথা ছিল, এখন আর ঠিক মনে নেই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে এ সবের কোন জায়গাতেই স্পুটনিকটি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় নি। এত বড় বিপর্যয়ের কারণ হল স্পুটনিকটি ছাড়ার সময় সামান্য একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। কৌণিক মাপের হিসাবে এক ডিগ্রীর দু হাজার ভাগের এক ভাগ তফাত হয়ে গিয়েছিল। আর তার ফলে সে কী কাণ্ড! নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে স্পুটনিকটি পৌঁছলো না। আতঙ্কে যাত্রীদের মুখ অ্যাটমিক ডাস্টের মত সাদা হয়ে গেল। তাদের আকৃতি চুপসে গিয়ে সরু আর ছোট হয়ে গেল। তার কারণ অবশ্য আইনস্টাইনের একটি তত্ত্ব—আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় কোন গতিবেগ অর্জন করলে জিনিসের দৈর্ঘ্য কমে যায়। কিন্তু সে কথা আমাদের তখন মনে ছিল না। আমরা তখন ভেবেছিলাম মহাশূন্যে আতঙ্কের লক্ষণসমূহও নিশ্চয়ই মহাশূন্য-মার্কা, পাথিব লক্ষণের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সুখের বিষয় সেই আতঙ্ক আমাদের খুব বেশী সময় অনুভব করতে হয় নি। শীগগিরই আমরা জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম।

যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়েছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত স্পুটনিকের ভিতরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা কিছু কিছু মনে আছে। সে বড় মজার অভিজ্ঞতা। কিন্তু কেউ যদি বলেন সেই মজাটা আর একবার উপভোগ করতে তো আমি রাজী হব কি না সন্দেহ। নিজের শরীরের কোন ওজন নেই এটা অনুভব করা বড় অস্বস্তিকর। আমি হয়তো আমার হাতটাকে সামান্য একটু সরিয়ে আনব বলে ভাবছি, আর অমনই হাতখানা প্রচণ্ড বেগে শূন্যে পুরো এক পাক ঘুরে এল। হয়তো কোন খাবার মুখে দেব বলে হাত বাড়িয়েছি, আর হাতখানা প্রচণ্ড শক্তিতে মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পিঠে ধাক্কা খেল। খাবারটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে তলায় পড়ে যাবে না, শূন্যে ভাসতে থাকবে। সেটাকে ধরার জন্য আমি হয়তো হাত বাড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই জায়গা মত হাতটাকে পৌঁছে দিতে পারছি না। আসল কথা, পৃথিবীতে আমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং বায়ুর চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাংসপেশী পরিচালনা করতে অভ্যস্ত হই। যেখানে এ সব শক্তিগুলি নেই সেখানে তাই আমরা নিজের উপর অধিকার যেন হারিয়ে ফেলি।

আরও কত রকমের বিসদৃশ অবস্থার মধ্যেই যে আমাকে পড়তে হয়েছিল! হয়তো স্পুটনিকের তলায় শুয়ে ঘুমিয়েছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি মাঝখানে শূন্যে ভাসছি। হয়তো চেষ্টা করলাম নীচে আসতে, কিন্তু স্পুটনিকের ছাদে গিয়ে সেঁটে গেলাম। আসলে তো মহাশূন্যে নীচু আর উঁচু বলে কোন জিনিস নেই। ঘুমের আগে যেটাকে নীচু বলে ধরে নিয়েছিলাম, ঘুমের পরে হয়তো সেই দিকটাকেই আমি উঁচু বলে ধরে নিচ্ছি।

যাই হোক, এ সব অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই, কারণ অনেকেই আজকাল এ সবের সঙ্গে পরিচিত আছেন।

স্পুটনিকে আমি মোটামুটি কতটা সময় ছিলাম বলা মুশকিল। তবে সজ্ঞান এবং অজ্ঞান অবস্থায় মোটমাট দিন দশেক কেটেছিল বলে আমার ধারণা। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন কোথায় স্পুটনিক আর কোথায় মহাশূন্য! আমি একগাদা পচা খয়েরি রঙের কাদার মধ্যে প[illegible] আছি। আমি যে আছি এ কথাটাও হঠাৎ মনে করতে পারলাম না। আমি যেন একটি চেতনামাত্র, আর সেই চেতনা জুড়ে রয়েছে অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদ। শুধু মুখের খানিকটা অংশ ছাড়া আমার সারাটা শরীর কাদার মধ্যে ডুবে রয়েছে। কাজেই চোখ দিয়ে দেখে যে আমি নিজের শরীরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হব এমন জো ছিল না। শরীরের মধ্যে কোন রকম অনুভূতি থাকলে আমি তার থেকেও শরীরের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারতাম। কিন্তু হায়! দারুণ আঘাতে আমার স্নায়ুমণ্ডলী এমন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল যে শরীর সম্পর্কে কোন বোধই আমি অনুভব করতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে কেমন করে যেন আমার এক অস্পষ্ট ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে আমারই একখানা হাত উপরে উঠে এল। সেই কাদামাখা হাতখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গভীর মমতায় আমার মন ভরে গেল।

চখানাকে মুখের কাছে নিয়ে এসে আমি তার উপর টি চুমু খেলাম। সারা মুখে কেমন একটা বিশ্রী ! অনুভব করলাম। তখন বুঝতে পারলাম আমার মণ্ডল এখনও বজায় আছে। তারপর সেই হাত য় আমি সারা দেহ স্পর্শ করে করে অনুভব করতে রলাম যে আমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই জীবিত। কী ভাল লাগল আমার হাতের সঙ্গে আমারই দেহের স্পর্শের স্পর্শসুখটুকু!

পরম আনন্দে মন ভরে উঠল। বেঁচে আছি—আমি ব বেঁচে আছি! শুধু চেতনাসর্বস্ব হয়ে নয়, দেহধারী ব হিসাবে!

আমি দাঁড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম। দুঃখের বিষয় ক্রমাগত নীচের দিকে তলিয়ে যেতে লাগল। কাদার চ কোথাও শক্ত মাটির আশ্রয় পেলাম না। দারুণ ! পেয়ে তাড়াতাড়ি করে পা গুটিয়ে নিয়ে যেমন য়ছিলাম তেমনই ভাবে শুয়ে পড়লাম। তারপর কত ষ্ট যে গড়িয়ে গড়িয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাদার অঞ্চলটি ড়ে শক্ত মাটির সন্ধান পেলাম—তার বিস্তৃত বিবরণ য় লাভ নেই।

ডাঙায় এসে যখন দাঁড়াতে পারলাম তখন আমি চতাল কাদা ছাড়া আর কিছু নয়। যেন কোন ৠকার খয়েরি রঙের মাটি দিয়ে একটি সজীব মানুষের ত তৈরি করেছে। বার বার করে পরমস্নেহে নিজের ই কর্দমাক্ত দেহের উপরে হাত বুলোতে লাগলাম। ন হল গ্রীক উপকথার সেই নায়ক পিগ্ম্যালিয়নের মত মি আমার নিজের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

আস্তে আস্তে আগের ঘটনা সব মনে পড়ে গেল। টনিকের ধ্বংসাবশেষটি অথবা জীবিত বা মৃত অবস্থায় মার সহযাত্রীদের দেখার জন্য চারদিকে তাকাতে গলাম। কিন্তু তাদের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। রও তাদের দেখতে পাওয়ার জন্য অনেক খোঁজ রেছি। দেখতে পাই নি। এই বিরাট বিশ্বের কোন্ চেনা পুরীতে তারা চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে ঃ জানে!

সেই সময়ে আমার সহযাত্রীদের জন্য মনে মনে একটা তীব্র দুঃখ অনুভব করেছিলাম। শুধু যে তাদের জন্যই তা নয়, অনেকখানি নিজের জন্যও বটে। অজানা দেশে নিজের নিঃসঙ্গতার অসহায়তার চিন্তা নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার সমস্ত দুঃখকে ছাপিয়ে উঠেছিল আমি যে বেঁচে আছি এই আনন্দ। সেই সঙ্গে আমার সহযাত্রীরা সবাই বিগতপ্রাণ এ কথা চিন্তা করে তাদের প্রতি একরকমের কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞাও যে না বোধ করছিলাম এমন নয়। বলতে কি, তারা যে বেঁচে থাকতে পারে নি, আর আমি যে বেঁচে আছি, এটাই কি আমার শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ নয়?

চারদিকে ফুটফুট করছে রোদ। আমি যে-রোদের সঙ্গে পরিচিত সে-রোদের মত অত তীব্র নয়। কিন্তু আমার গায়ের কাদা শুকোতে আরম্ভ করায় গায়ের চামড়া চড়চড় করতে শুরু করেছিল, কাজেই জলের অনুসন্ধানে আমি ইতস্তত: ঘুরতে লাগলাম।

চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম অঞ্চলটা পাহাড়ে অঞ্চল। যেদিকে তাকানো যাক উঁচু-নীচু নানা সাইজের পাহাড়ের চূড়ো। চূড়োগুলোর রঙ দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। নানা রকমের রঙ, আর সব রঙই যেমন উজ্জ্বল, তেমনই অমিশ্র। পৃথিবীতে কোথাও এমন রূপকথার মত রঙিন পাহাড় আছে বলে ইতিহাসে বা ভূগোলে কোথাও পড়ি নি। শুধু পাহাড়ই নয়, গাছপালাগুলো এমন কি পায়ের নীচের দূর্বাঘাস পর্যন্ত নানা বর্ণে সজ্জিত। বুঝতে পারলাম মার্কিনী ছবির সর্বগ্রাসী প্রভাবের থেকে প্রকৃতিমাতাও রেহাই পান নি। এতদিন প্রকৃতির গায়ে যে ম্যাটমেটে অনুজ্জ্বল আর মিশ্রিত রঙের কদর্যতা ছিল, প্রকৃতি মা সেই লজ্জা গোপন করার জন্য যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মার্কিনী ঢঙে সাজিয়ে নিয়েছেন। বুড়ী মার এই তন্বী রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার মনের যে-শিশুটি এতকাল নির্বিচারে মার্কিনী ছবি উপভোগ করে এসেছে, সেই শিশুটি আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল।

পরমুহূর্তেই নিজের চিন্তাকে সংযত করলাম। কী সব যা-তা ভাবছি—যার নির্গলিতার্থ হল আমি যেন পৃথিবীতেই আবার ফিরে এসেছি। স্পুটনিকে চড়ে আমি পৃথিবী ত্যাগ করেছি; সে স্পুটনিক আর পৃথিবীতে ফিরে যায় নি। তা ছাড়া মাত্র আট-দশ দিনের মধ্যে পার্থিব প্রকৃতি একেবারে পুরোপুরিভাবে মাকিনী ছবি হয়ে গিয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। এত তাড়াতাড়ি ভোল পালটানোর মত বুদ্ধি প্রকৃতিমায়ের থাকলে তো কোন কথাই ছিল না! তা হলে কি আর কালিদাসের প্রকৃতির বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির বর্ণনা একই প্রকৃতির বর্ণনা বলে মনে হত?

কাজেই আমি অনুমান করলাম আমি আর কোন গ্রহ বা উপগ্রহে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে গাছপালা যখন আছে তখন জীব-জগৎও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখানকার জীবন-যাত্রা রূপে-বর্ণে-প্রকৃতিতে পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে আমার মনে প্রত্যাশা জন্মাল। মনে মনে আমি নিজেকে ভাস্কো ডি গামা বা কলম্বাসের সম-পর্যায়ের জীব বলে কল্পনা করে পুলকিত হলাম। তফাত এই যে গামা বা কলম্বাসের নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে; আমার নাম ইতিহাসকারেরা কোনদিন জানতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

পচা কাদাগুলো গায়ে যত এঁটে বসছিল ততই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কাদাটা ধুয়ে ফেলার তাগিদ তাই মনে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইতস্তত: ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় গর্তের মধ্যে খানিকটা সংরক্ষিত জল দেখতে পেলাম। জলের আশ্চর্য নীল রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সে নীল সমুদ্রের নীল জলের মত মনে-হওয়া নীল নয়, সত্যিকারের নীল। এতকাল জলের অরূপত্বকে একটা নিবিকল্প সত্য বলে মনে করতাম। সে ধারণাটা ভাঙল এতদিনে।

সেই চোখ-জুড়নো নীল জলে গা-হাত-পা ভাল করে ধুয়ে শরীরে বড় তৃপ্তি অনুভব করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উৎপাত চাড়া দিয়ে উঠল—ক্ষুধার উৎপাত। বিশেষ করে খাওয়া উচিত নয় বলে মনে করেও দারুণ পিপাসার দরুন সেই নীল জল খানিকটা খেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকেই ক্ষুধাটা যেন আরও দাউ দাউ করে জলে উঠল। মনে হতে লাগল অন্নপ্রাশনের পর থেকেই আর আমার আহার গ্রহণ করা হয় নি।

এমন সময় আর একটি আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। আমার থেকে বিশ-ত্রিশ হাত দূরে একদল খুব ছোট আকৃতির মানুষ দেখতে পেলাম। এমন আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাব বলে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। সেই মাণবকদের কেউ কেউ লম্বায় খরগোশের সমান, কেউ বা বেড়ালের সমান, কেউ বা কুকুরের সমান। তবে কি আমি গালিভার বর্ণিত লিলিপুটদের দেশে চলে এসেছি! কিন্তু তাও ঠিক বলে মনে হল না। মাণবকদের মধ্যে কয়েকটিকে দেখলাম বেশ বড় বড়—প্রায় আমাদের কোমরের সমান।

অনুমান করলাম এই গ্রহে বা উপগ্রহে জীবজগতের অগ্রগতি ভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়েছে।

কিন্তু তখন আমার ঔদরিক তাড়না এত প্রবল যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা করার মত মনের অবস্থা ছিল না বালখিল্য মানুষদের দেখে ভাবলাম, এরা আমার শত্রু হোক মিত্র হোক, এদের কাছে আমি খাদ্য চাইব। এরা যখন দেহধারী তখন নিশ্চয়ই এদের কোন-না-কোন রকমের খাদ্য দরকার হয়। কিন্তু তাদের দিকে আমি দু-চার পা অগ্রসর হতে না হতেই তারা মহা-কলরব করে ছুটে পালিয়ে গেল।

তারা যে আমাকে দেখে ভয় পেতে পারে এ কথাটা আমার মনেই হয় নি। তাদের পালিয়ে যাওয়া দেখে আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম।

তারপর কী করে কতক্ষণ ধরে যে আমি খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম বলতে পারব না। কিন্তু সে তীব্র যন্ত্রণার কথা সহজে ভোলবার নয়। আমার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে শুধু জেগে ছিল শরীরের একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। যে গ্রহলোকের ছবির মত সৌন্দর্যকে আমি একটু আগে পরম রমণীয় বলে বোধ করেছিলাম, তা এখন মনে হল যেন আমাকে ব্যঙ্গ করছে। সেই উজ্জ্বল রঙের

রাহের মধ্যে কোথাও আমার জন্য এতটুকু সহানুভূতি চ বলে মনে করতে পারলাম না।

শেষে একটা গুহার কাছে এসে আমি সেই রঙিন চার মত ঘাসের উপর বসে পড়লাম। হঠাৎ যেন হল সেই গুহার ভিতর থেকে মানুষের কণ্ঠ ভেসে ছে। তৎক্ষণাৎ আমি যে ভীষণ পরিশ্রান্ত সে কথা গিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, ই ভিতরে মেয়ে-পুরুষ মিলে তিন-চারজন মানুষ। াকে দেখে ভয় পেয়ে তারা পাথরের দেওয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেসব কথা বিবেচনা করার মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আমি পেটে দিয়ে ইংরেজী বাংলা হিন্দী প্রভৃতি যে কটা ভাষা া ছিল সব কটা ভাষায় আমি যে ক্ষুধার্ত এ কথাটা ঝাতে চেষ্টা করলাম।

তাদের ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। নিজেদের য় তারা কী সব যেন বলাবলি করল। ভাষাটা যেন মন চেনা চেনা বলে মনে হল। শেষে একটি মেয়ে য়ে এসে পরিষ্কার সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞেস করল, পথিক, ম কি আহার্য চাইছ?

সংস্কৃত ভাষা যে আন্তঃ-নাক্ষত্রিক যোগাযোগের ভাষা াবে গৃহীত হয়েছে এ কথা আমি সেই প্রথম জানতে রি। সুদূর অতীত বিংশ শতাব্দীতে যে কজন বাঙালী ষী সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে-লেন তাঁদের অসাধারণ দূরদর্শিতার জন্য সেদিন আমি দের মনে মনে নমস্কার জানিয়েছিলাম।

ছেলেবেলায় নর নরৌ নরাঃর অবাধ সংস্কৃত পড়া ন। এটুকু জানতাম, বাংলা শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে টু বুদ্ধি খরচ করে অনুস্বার বা বিসর্গ বসিয়ে দিতে রলেই এক রকমের কাজ-চলা-গোছের সংস্কৃত হয়ে যায়। জেই সেই রকমের সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করে জানালাম, , দারুণ খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার দিন।

মেয়েটি বোধ করি একটু হাসল। তারপর গুহার তরে গিয়ে খানিকটা পোড়া মাংস আর গোটা কয়েক চেনা ফল এনে হাজির করল।

সেই প্রায় অখাদ্য খাদ্যগুলিই আমার কাছে পরম উপাদেয় বলে মনে হল সেদিন। খাওয়ার পর দেহে যখন প্রাণ ফিরে পেলাম তখন পরম পরিতৃপ্ত মনে পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ পেলাম। বুঝতে পারলাম গুহার বাসিন্দা হিসাবে যাদের দেখছি তারা এই গ্রহের জীবজগতের মানুষ নামক স্পিসিজের মধ্যে পরিণত-বয়স্ক। খুব আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে পৃথিবীর মানুষদের মত সাদা কালো বা মিশ্রিত ম্যাটমেটে বর্ণের কোন মানুষ এখানে নেই। এখানকার পুরুষদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল লাল, এবং মেয়েদের উজ্জ্বল নীল। পুরুষেরা নীল রঙের পোশাক পরেছে এবং মেয়েরা লাল রঙের। গুহাবাসী বলেই এদের পোশাক বোধ করি খুব সাধারণ, এক ফালি করে নেকড়া কোমরে জড়িয়েছে এবং আর এক ফালি শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে। নেকড়াগুলি তুলোর তৈরি কাপড়ের বলে মনে হল না, কিন্তু খুব উজ্জ্বল এবং ঝকঝকে।

দেখলাম গুহাবাসী হওয়া সত্ত্বেও এরা কেউ ষণ্ডামার্কা নয়। উচ্চতায় বড়জোর চার ফুট সাড়ে চার ফুট হবে। আমার ছ ফুট লম্বা আর তেমনি চওড়া দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারা দেখে এদেরই ভয় পাওয়ার কথা। এদের আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

পৃথিবীর মানুষের স্বভাব হিসাবে এদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল নিদারুণ হয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমার সম্পর্কে এদের মনে যে কোন কৌতূহল আছে তার লক্ষণ অনুপস্থিত।

সেই গুহাবাসীদের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্য থেকে গেলাম। জাতি হিসাবে এদের কৌতূহল না থাক্, আতিথেয়তা আছে।

পরদিন রাস্তায় বেরিয়ে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটল। অবশ্য আর আশ্চর্য হলাম না। এখানে এসে অবধি এত সব বিচিত্র আজগুবী জিনিসকে বাস্তবে দেখতে পাচ্ছিলাম যে ঠিক করেছিলাম আর কোন কিছুতেই আমি বিস্মিত হব না।

দেখলাম মানুষের আকারের একটি বিচিত্র যন্ত্র ছুটতে

ছুটতে আসছে। সিনেমার পর্দায় যেমন কলের মানুষ দেখা যায় অনেকটা সেইরকমের চেহারা। আর তার সামনে পাশে অগুনতি আমার পূর্ব-পরিচিত মাণবকের দল পড়ি কি মরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশ দিয়েও অনেক মাণবক পালিয়ে গেল। ভয় যে আমারও করছিল না এমন নয়। কিন্তু সেই পলায়নপর ক্ষুদ্র মানুষদের দেখে আমার মনে বৃহত্তের অহংকার জেগে উঠল। কিছুতেই তাদের মত করে তাদের একজন হয়ে পালিয়ে যেতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মত আর কটমট করে তাকিয়ে রইলাম সেই কলের মানুষটার দিকে। যন্ত্রমানুষটা আমার কাছাকাছি এসে পড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হেলতে দুলতে আবার পিছন ফিরে রওয়ানা দিল।

সেটা চলে যাওয়ার পর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম অসংখ্য মাণবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ চারদিকে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। একটা জায়গায় দেখলাম তাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে। রক্তটা লাল।

গুহায় ফিরে এসে আমি কালকের সেই অতিথিবৎসল মেয়েটিকে পাকড়াও করলাম। মেয়েটি আমাকে দেখে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল। আমি খপ করে তার হাত ধরে ফেলে আমার পাশে বসালাম। মেয়েটি কুঁকড়ে-সুঁকড়ে বসে পাংশুমুখে জলজল করে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম।

আচ্ছা মেয়ে, বাইরে মানুষের আকারের একটা কল দেখলাম। সেটা কী?

আমার মুখের ভাঙা ভাঙা সংস্কৃত শুনে মেয়েটি হাসল। বোধ করি একটু চুপ করে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল আমি কি বলতে চাইছি। তারপর বলল, ওরা শহর থেকে আসে মানুষ মারতে।

মানুষ মারতে! সে কি! কেন?

জানি না। সেইটেই ওদের কাজ। ওদের ভয়েই তো আমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। রাতের বেলায় ছাড়া সহজে শিকারে পর্যন্ত বেরুই না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, শহরে কারা থাকে?

কারা আবার থাকে! সভ্য মানুষ। পাঁচ বছর বয়স হলে এখানকার ছেলেমেয়েরা লাল নীল কাপড় উড়িয়ে পাহাড়ের প্রান্তে রেজিস্ট্রেশন অফিসে যায়। সেখানে তাদের কলের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। সত্যিই পাঁচ বছর পার হয়েছে দেখলে তাদের শহরে বাসের উপযুক্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর বয়স কম বলে প্রমাণিত হলে মেরে ফেলা হয়।

তোমার তো কবে পাঁচ বছর পার হয়েছে। যাও নি কেন?

ভয়ে।

তবে যে সব ছেলেমেয়েরা যায়, তারাই বা যায় কেন?

ভয়ে।

আর একটি কথা জানার জন্য পেট মোচড়াচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, তোমাদের এখানে খুব ছোট ছোট একদল মানুষের মত প্রাণী দেখছি। তারা কারা?

এবার উলটে মেয়েটি অবাক হল: ওমা, কী বলছ গো তুমি? মানুষ জন্মানোর পরে ছোট থাকবে না? ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েই কি এত বড়টি হবে নাকি!

তোমাদের মধ্যে তা হলে মেয়েদের পেট থেকে মানুষ জন্মায় না?

ছি ছি! সে আবার কী কথা! কী ঘেন্নার কথা!

আমি নিজে নারীগর্ভ-সম্ভূত বলে লজ্জায় খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু আরও অনেক কথা জানার ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, কলের মানুষটা আমাকে দেখে ফিরে গেল কেন?

সামনে বড় বাধা পড়লে ওরা পালিয়ে যায়।

তবে তোমরা কেন বড় বড় গাছ কেটে তাতে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে চারদিকে পুঁতে রাখ না?

মেয়েটি ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ এ ভাবে যে বাধা সৃষ্টি করা যায় তা বোঝার মত কল্পনাশক্তি এ মেয়েটির নেই।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি মেয়েটির হাত শক্ত করে ধরে ছিলাম, কিন্তু নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন আমার

র বাঁধন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি সুযোগ পেয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। গুহার আর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসল। অর্থাৎ, কেমন, য়ে দিলাম তো তোমাকে!

জানতাম, ইচ্ছে করলেই ওকে আবার ধরতে পারি। তেমন কোন প্রবল ইচ্ছা বোধ করলাম না।

তারপর যে তিন চার দিন গুহার মধ্যে ছিলাম তার ওদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলাম। দেখলাম শিকার খাওয়া এবং ঘুমনোর মধ্যে ওদের দিনরাত্রি ক্ত। ওরা মেয়ে-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায় থাকে ী-স্ত্রীর মত। পরস্পরের প্রতি আনুগত্য খুব ।

তিন-চারদিন পর একদিন লাল নীল কাপড় যোগাড় শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কাপড়ের সন্ধান রছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। ওগুলো গাছের পাতা— আমাদের ব্যবহারের কাপড়ের মত বড় বড়।

পথে বেরিয়ে আরও তিন চারটি পাঁচ বছরের ছেলে- র সঙ্গ পেলাম। তারাও লাল নীল কাপড় উড়িয়ে ছল দেখে বুঝতে পারলাম তাদেরও লক্ষ্য একই। য আমি তাদের থেকে সঙ্গত দূরত্ব বজায় রেখে নে পিছনে চললাম—যাতে তারা আমাকে দেখে পেয়ে পালিয়ে না যায়।

এই ছেলেগুলোকে সঙ্গী পাওয়ায় রেজিস্ট্রেশন অফিস বার করার অনর্থক হয়রানি থেকে অব্যাহতি াম।

দেখলাম এই ছেলেমেয়েরা শারীরিক দিক দিয়ে াদের সমাজের এই বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রায় ন। আর বুদ্ধির দিক দিয়ে এরা অনেক বেশী চটপটে চৌকস। অনুমান করলাম এই গ্রহের মানুষদের াশটা গোড়ার দিকেই বেশী হয়। যেমন হয়ে থাকে ছাগল বা ভেড়াদের বাচ্চার ক্ষেত্রে।

রেজিস্ট্রেশন অফিসের বাড়িটা দেখে কিন্তু আমাকে মনে স্বীকার করতে হল এমন অপূর্ব জিনিস আমি জীবনে কখনও দেখি নি। ইন্দ্রধনুর সাত রঙে রঞ্জিত সেই বাড়ি যেন সত্যিই ইন্দ্রপুরী। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সমুদ্রের ঊর্মিমালার মধ্যে একটি পদ্মফুল। বাড়িটার দেওয়াল কিসের যেন পাতলা পাতে তৈরি। সে পাত লোহার নয়, কোন ধাতুর নয়, প্লাস্টিকের নয়—কিন্তু কিসের যে তা অনুমান করতে পারলাম না। আগাগোড়া মেঝেতে দেখলাম গোলাপ ফুল বিছিয়ে দেওয়া রয়েছে। কিন্তু পা দিয়ে বুঝতে পারলাম গোলাপ ফুল নয়, গালিচা।

ঘরের ভিতর অপরূপ আসবাব-পত্রের মধ্যে চারজন সুবেশা তরুণী কর্তব্যরত। তারা ঠিক বাঙালী মেয়েদের কায়দায় শাড়ি গায়ে জড়িয়ে পড়েছে দেখে অবাক হলাম। ধরে নিলাম যে সংস্কৃত ভাষার মত বাঙালী মেয়েদের শাড়িটাও বোধ করি আন্তঃ-নক্ষত্র বেশ বলে গৃহীত হয়েছে।

আমার একটু আগে যে ছেলেমেয়েরা এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের পরীক্ষা-কার্য শুরু হল। দুজন কলের মানুষ উপস্থিত ছিল, তারাই সব কাজ করতে লাগল। প্রথমে একটি ছেলেকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্র থাকে তেমনি একটি যন্ত্রের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। একটি লাল কার্ড উঠে এল। যখন একটি মেয়ের সময় এল, তখন একটি নীল কার্ড উঠল। বুঝলাম এই কার্ডগুলিই নাগরিক অধিকারের স্মারক।

কেবল একটিমাত্র ছেলের ক্ষেত্রে কালো রঙের কার্ড উঠল। তৎক্ষণাৎ একটি কলের মানুষ এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে টানতে টানতে একটা ভিন্ন পথে নিয়ে গেল। অনুমান করলাম বয়সের পরীক্ষায় তার বয়স পাঁচ বছরের কম বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার জন্য কী শাস্তি অপেক্ষা করছে অনুমান করে শিউরে উঠলাম।

সকলের শেষে আমার পালা এল। এতক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এবার খানিকটা এগিয়ে গেলাম। তবু আমাকে কেউ হাত ধরে নিতে এগিয়ে এল না। কিন্তু মহিলা-চতুষ্টয়ের দৃষ্টি এতক্ষণে আমার উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তারা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

এতক্ষণ যে-সব রুটিন-মাফিক কাজ চলছিল তার মধ্যে তাদের করণীয় কিছু ছিল বলে মনে হয় না। এবার যেন মনে হল যে তাদের অনেক কিছু করণীয় আছে।

তাদের মুখের আগ্রহশীল ভাব দেখে আমি সাহস পেয়ে আর একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, দেখুন মহাশয়াগণ, আমি গ্রহান্তর থেকে দৈবক্রমে এখানে এসে পড়েছি। আমি আপনাদের দেশের নাগরিক হতে চাই।

একজন বলল, বেশ তো!

দ্বিতীয়জন বলল, খুব ভাল কথা।

তৃতীয়জন আরও উৎসাহিত হয়ে বলল, আমরা আপনাকে মাথায় করে রাখব।

চতুর্থজন বোধ করি এর চেয়েও উচ্ছ্বাসপূর্ণ কিছু বলার না পেয়ে বিরস কণ্ঠে মাথা চুলকিয়ে বলল, কিন্তু এখানে যে শুধু পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েদেরই নাগরিক করা হয়।

এ কথা শুনে অবশিষ্ট তিনজনের মুখ আমার চেয়েও করুণ হয়ে উঠল। সবাই সবাইয়ের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে। অবশেষে প্রথমজন বলল, আচ্ছা, আপনি ওই যন্ত্রটার ওপর উঠুন তো, দেখা যাক কী হয়।

আমি যন্ত্রটার উপর উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু যন্ত্রের মুখ দিয়ে কোন কার্ড বেরিয়ে এল না।

মহিলা চারজনের মুখ আবার শুকিয়ে গেল।

দু-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, তবে উপায়?

চতুর্থজন আমার দিকে তাকিয়ে মুরুব্বীয়ানার সু বলল, আমরা খুব দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে আমরা বো হয় গ্রহণ করতে পারলাম না। আপনার ফিরে যাও ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অবশিষ্ট তিনজন চতুর্থের দিকে এমন ভাবে তাকা যেন তারা তাকে ভস্ম করে দিতে পারলেই খুশী হয়।

এ রাজ্যে আমি বার বার লক্ষ্য করেছি যে, যখন আ মেয়েদের সম্মুখীন হয়েছি তখন নানা অসুবিধার মধ্যে সুবিধার সন্ধান মিলেছে এবং যখন পুরুষদের কাছে গিয়ে তখন নানা সুবিধার মধ্যেও অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এ নিয়মে ব্যতিক্রম হয় নি।

দ্বিতীয় মহিলাটি প্রস্তাব করলেন, আমাদের স্থানীয় য যখন কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না তখন আপনার ব্যাপারটাকে আমরা পার্লামেণ্টে পাঠিয়ে দিতে পারি।

দুজন সোৎসাহে এ প্রস্তাবে সায় দিল এবং চতুর্থজ বিরস মুখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল—যেন সে এ সব তুচ্ছ ব্যাপারের অনেক ঊর্ধ্বে।

তাদের নির্দেশমত আমি বাইরে বেরিয়ে এসে একখানা গাড়ি পেলাম।

[ক্রমশ]

চোরাবালি

অসিতকুমার চক্রবর্তী

মৃত্যুর চোরাবালি জীবনের পথে পথে যদিও
সেই পথে নিশিদিন চলিতেছি আমি, আর তুমিও।

সময়ের সীমাহীন সাগরে
যেদিকে তাকাও তুমি নেই তীর
ঢেউ ওঠে, ঢেউ পড়ে নিত্যই
সে সাগর চলমান অস্থির।

অসুখন অকারণে ফুল ফোটে মনবনে
(ঝরে যায় সেই ফুল যদিও)
ঝরে যাই, আমি আর তুমিও!

মৃত্যুর চোরাবালি জীবনের পথে পথে যদিও
সেই পথে নিশিদিন চলিতেছি আমি, আর তুমিও।

নবজন্ম

কুন্তল মজুমদার

আদি

[সময়—সন্ধ্যার পরে। স্থান—গঙ্গার ধারে পুলের
:চ। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। গোলমাল যথেষ্ট
।। শুধু আশপাশে মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক
ানা যায় আর দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে
ারের বাঁশীর আওয়াজ। কখনও কখনও কাছেই
লর শব্দ শোনা যায়—ছলাৎ ছলাৎ।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এক যুবক। প্রায় চৌত্রিশ-
ত্রিশ বছর বয়স। মোটামুটি সুপুরুষ বলা যায়। কিন্তু
মা-কাপড়-জুতোয় দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মুখে খোঁচা
চা দাড়ি। ভদ্রতা ও শিক্ষার ছাপ যুবকের মুখে।
স্তু বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত সে। হাতে কয়েকটি খাতা ও
একখানি বই।

মাথা নীচু করে সে ধীরে ধীরে চলে আসে পুলের
চ। চুপ করে দাঁড়ায়। কী যেন ভাবে কিছুক্ষণ।
রপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জামার পকেট থেকে ফাউন্টেন
নটি বের করে। খাতার একটি পাতা ছিঁড়ে নেয়।
র হাত কাঁপে। আলো-আঁধারে ঠিক দেখা যায় না,
ন্তু বোঝা যায় যুবক অতিশয় উত্তেজিত।

কাগজের ওপর কলম দিয়ে তাড়াতাড়ি কী যেন
খ। লিখতে থাকে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়।
তর বইখাতা ফেলে দেয় পায়ের কাছে। শুধু লেখা
াজটি চোখের সামনে এনে অস্ফুটে পড়তে থাকে]

যুবক। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সজ্ঞানে
শরীরে এবং যথেষ্ট চিন্তা করেই আমি এই কাজ
ছি।

কেন মরলাম?

জীবন যেখানে শুধুই রিক্ততা আর তিক্ততা, মরণই
তো সেখানে স্বাভাবিক পরিণতি। মানি, এ মৃত্যু
অগৌরবের। কিন্তু রূঢ় বাস্তব যে কত সত্য, তাও জানি।

আত্মীয়বন্ধুহীন জীবনে আমার একমাত্র অবলম্বন,
এই বিড়ম্বিত অস্তিত্বকেও যা সার্থকতায় সুন্দর করে
তুলতে পারত, সেই আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় সাহিত্য-
সাধনাই সম্পূর্ণ নিষ্ফল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে জীবনে।
না পেয়েছি লক্ষ্মীর প্রসাদ, না পেলাম সরস্বতীর আশীর্বাদ।

শুধু কি আমিই দায়ী?

আমারই সংগ্রামবিমুখতা?

জানি না, এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধ অবস্থার কাছে হার না
মেনে পারে কিনা কোন মানুষ। যদি পারে কেউ, তাকে
প্রণতি জানাই। আমি পারি নি।

তাই জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমার অনিবার্য হয়ে
উঠল।

[হাতের কাগজটি যুবক তাড়াতাড়ি সেইখানেই ফেলে
রাখে। তারপর পুল বেয়ে উঠতে থাকে।

সহসা কাছেই কিছুটা হট্টগোল শোনা যায়।
জোরালো আলো এসে পড়ে মঞ্চের ওপরে। পুলের ওপরে
যুবক থমকে দাঁড়ায়।

দ্রুত প্রবেশ করেন এক ব্যক্তি। সাহেবী পোশাক
পরনে। হাতে একটি ফাইল। পূর্বোক্ত যুবকেরই প্রায়
সমবয়সী। তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে আসে দ্বিতীয়
ব্যক্তি। পরনে সার্ট প্যাণ্ট। কাঁধে ঝোলানো ফোটো-
গ্রাফিক ফিতে]

১ম ব্যক্তি। এই—এইখানটাই আইডিয়াল হবে।

২য় ব্যক্তি। (চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে) না
সার্, আমার যেন মনে হচ্ছে গঙ্গার [illegible]
জায়গাটাই যেন ভাল ছিল।

১ম ব্যক্তি। সে কি হে? এমন নির্জন নদীতীর,

চারপাশে গাছপালা, তীর থেকে পুল গিয়ে উঠেছে জলের ওপর, কৃষ্ণপক্ষের রাত। ধর, এই পথ ধরে এসে ধীরে ধীরে নায়িকা গিয়ে উঠল পুলে।

২য় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আপনি ডাইরেক্টর, আপনার কথাই ফাইনাল। আপনি যখন বলছেন—

১ম ব্যক্তি। না হে না, এটা ক্যামেরাম্যানের যুগ, বুঝেছ? লোকের ধারণাই হয়ে গেছে যে ভাল ক্যামেরাম্যান না হলে কিছুতেই সাক্‌সেসফুল ফিল্ম ডাইরেক্টার হওয়া যায় না। তোমার মতেরই তো দাম হে!

২য় ব্যক্তি। আজ্ঞে না না সার্‌, তাও কি হয়! আপনি যখন বলছেন—এখানটাই টেক্‌ করা হোক। (ভেতরের দিকে চেয়ে) লাইটস্‌, লাইটস্‌ আপ—

[ভেতরের আলো উঁচু হয়ে পুলের গায়ে পড়ে। যুবককে দেখা যায়]

১ম ব্যক্তি। আরে, ওখানে কে? (একটু দেখে) কি করছে বল তো লোকটা ওখানে?

২য় ব্যক্তি। পাগল-টাগল হবে বোধ হয়। হয় জলে লাফাবে, নয়তো পুলের মাথায় চেপে বসবে।

১ম ব্যক্তি। ওহে না না, ভদ্রলোক বলেই তো মনে হচ্ছে।

[যুবক ধীরে নেমে আসে। ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। জোরালো আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে]

১ম ব্যক্তি। (এগিয়ে গিয়ে) আপনি ওখানে করছিলেন কি মশায়?

যুবক। আপনার প্রয়োজন?

২য় ব্যক্তি। আমরা ফিল্ম কোম্পানি থেকে এসেছি স্যুটিংয়ে।

১ম ব্যক্তি। (যুবকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, সহসা) আরে, শান্তনু না?

যুবক। (এগিয়ে এসে উজ্জ্বল আলোয় আগন্তুককে দেখে নিয়ে) ও! তুমি কেদার, কেদার ঘোষ!

১ম ব্যক্তি। (মৃদু হেসে) ইয়েস্‌ দ্যাটস্‌ মি, তোমার মনে আছে দেখছি।

যুবক। দু বছর কলেজে পড়লাম একসঙ্গে—খুব কমদিন কি? যাক, অ্যাদ্দিন পরে তুমি এ সময়ে এখানে?

১ম ব্যক্তি। (সগর্বে) আর বল কেন ভাই, শুনেছ বোধ হয় আমি এখন বম্বের নাম্বার থ্রি, মানে—নাম্বার থ্রি ফিল্ম-ডাইরেক্টর।

যুবক। তোমার নাম দেখি বটে কাগজে মাঝে মাঝে।

১ম ব্যক্তি। (সগর্বে) ওঃ, দ্যাটস্‌ নাথিং—নাথিং। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কি করছিলে বল তো ওখানে?

যুবক। আমি আগে জিজ্ঞাসা করেছি—

১ম ব্যক্তি। (হেসে) অন বিজ্‌নেস্‌ মিশন—

২য় ব্যক্তি। আমরা এখানে এসেছি লোকেশন স্যুটিংয়ে। (১ম ব্যক্তিকে দেখিয়ে) মানে ওঁরই ডিরেক্‌সনে।

যুবক। এই সময়ে এখানে!

১ম ব্যক্তি। (সহাস্যে) নাঃ, তুমি এখনও অনেক পিছিয়ে আছ দেখছি। আরে, এখনও কি আর সেদিন আছে হে যে, কি রাত্রি কি দিন—স্টুডিওর বন্ধ ঘরে আলো ফেলে তোল ছবি। উই আর মাচ অ্যাড্‌ভান্সড্‌, তাই রাতের ছবি রাতে, গঙ্গার জলে ডোবার ছবি—এই গঙ্গারই ধারে, পুলের ওপরে।

যুবক। (সচকিত) গঙ্গার ধারে—পুলের ওপরে জলে ডোবা! মানে, ডুববে কে?

১ম ব্যক্তি। হিরোয়িন। ছবির নায়িকা।

যুবক। আশ্চর্য!

১ম ব্যক্তি। কিসের?

যুবক। (সংযত) মানে, কেন ডুববে?

২য় ব্যক্তি। উপায় কি বলুন? কিছুক্ষণ আগে যে ভিক্টোরিয়ার সামনের মাঠে বসে নায়ক তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে—তুমি পথ দেখ।

১ম ব্যক্তি। (সহসা) আই অ্যাম সরি, তোমাদের পরিচয় করাই নি, ইনি আমার চীফ ক্যামেরাম্যান

[যুবক নমস্কার জানায়]

১ম ব্যক্তি। এইবার শুনি তোমার কথা।

যুবক। লেখক মানুষ, হঠাৎ মনে ভাব এল, সোজা চলে এলাম এখানে। জায়গাটা বেশ নির্জন, অন্ধকার

।র ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চমৎকার একটা প্লট ।ছিলাম।

১ম ব্যক্তি। তুমি লেখ নাকি? তা, কী লেখ শুনি?

যুবক। ওই একটু-আধটু—

১ম ব্যক্তি। তবু—

যুবক। মানে, এই গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস। এই আর ।

১ম ব্যক্তি। পয়সা-টয়সা পাও?

যুবক। বিশেষ কিছু নয়।

১ম ব্যক্তি। গিভ আপ দ্যাট রাবিশ। লেখ ফিল্মের ।। টাকা নাম—যা চাও—যা চায় মানুষে।

যুবক। কিন্তু আমি তো ফিল্মের কিছুই জানি না।

১ম ব্যক্তি। দরকারও করে না। দেশী-বিদেশী য়েকটা গল্প থেকে খানিকটা খানিকটা তুলে নিয়ে ।জাতে পারবে না একটা গল্প?

২য় ব্যক্তি। তারপর তো স্যারই রয়েছেন।

১ম ব্যক্তি। ওঃ ইয়েস, আই মিন—আই উইল ডু ই বেস্ট। প্লাস, আমার এই চীফ ক্যামেরাম্যানের ট্রিক্ ।টস্ তো জান না! ভেলকি খেলিয়ে দেবেন তোমার ।ল্পে।

যুবক। তোমার ডিরেকসন, ওঁর ট্রিক্ শটস্—আমার ।ল্প থাকবে তো?

২য় ব্যক্তি। স্যার, তা হলে লোকেশনটা—

১ম ব্যক্তি। ইয়েস ইয়েস, লেট্স্ প্রোসিড, আই উড ।্যাদার অ্যাক্সেপ্ট ইওর সাজেশন। গঙ্গার ওপারে পুলের ওধারটার নীচেই ছবি নেওয়া যাক। তোমরা গিয়ে ওঠ নৌকোয় মালপত্তর নিয়ে, আমি আসছি। (যুবকের দিয়ে চেয়ে) ও কে, সো লঙ, বম্বে গেলে দেখা করো।

[উভয়ের প্রস্থান]

[স্টেজের আলো আবার পূর্ববৎ। শুধু অন্ধকার গাঢ়তর হয়, কারণ রাত বাড়ে। পরিবেশও পূর্ববৎ। যুবক আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটি টান মেরে খুলে ফেলে, পায়ের জুতোজোড়াও ফেলে রেখে দেয় সেইখানেই, আবার পুল বেয়ে উঠতে থাকে। হাতের শেষ বইটি পুলের ওপরেই ফেলে দেয়। এগোতে থাকে। কিন্তু মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়]

যুবক। কে, কে ওখানে?

[পুলের অপরদিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এক মূর্তি। যুবকের প্রায় সামনাসামনি এসে থমকে দাঁড়ায়। মুখ তোলে—নারী একজন। প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। সুশ্রী কিন্তু বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট; পরনের কাপড়চোপড় দৈন্যের পরিচয় দেয়]

যুবক। আ—আপনি…

যুবতী। আমি—মানে, তুমি কে, তুমি কি চাও এখানে?

[যুবতীর "তুমি" সম্বোধনে প্রথমে যুবক হকচকিয়ে যায়। তারপর চকিতে নিজের খালি পা, শুধু গেঞ্জি গায়ের দিকে একনজর তাকিয়ে নেয়, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও মাথার রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে নেয় একবার। বোঝে, ভুল স্বাভাবিক। হঠাৎ তার মাথায় কী যেন ভাব আসে]

যুবক। (হাত কচলিয়ে) আজ্ঞে, আমি, মানে মনিবের একটা কাজে এই পথে—ওপারে—

[যুবতী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে]

যুবক। (সহসা) কিন্তু আপনি এখানে কেন, তা তো বললেন না?

যুবতী। কিন্তু তুমি সত্যি কথা বল নি—

যুবক। কেন বলুন তো?

যুবতী। (বিচিত্র হেসে) আমি একই উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, তাই বুঝতে ভুল হয় নি।

যুবক। মানে, কী জন্যে এসেছিলেন বললেন?

যুবতী। মরতে।

যুবক। কেন?

যুবতী। উপায় নেই। কিন্তু তুমিও [illegible]

যুবক। কি বলছেন আপনি?

যুবতী। দেখ, মরতে এসে মানুষ মিথ্যে বলে না।

[যুবক মাথা নীচু করে থাকে। যুবতীর পায়ে কি যেন ঠেকে। আলো-আঁধারে তুলে নেয় একটি বই। যুবকেরই ফেলে দেওয়া বইগুলির একটি]

যুবক। আমার মনিবের বই। তাঁরই লেখা। হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।

[যুবতী স্বল্প আলোয় নামটা পড়ার চেষ্টা করে]

যুবক। শান্তনু রায়। উনিই আমার মনিব। আর আমার কেউ নেই তিনকুলে।

[যুবতী বইটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। যুবক দেখে তাকে]

যুবতী। অনেকটা আমারই মত। (অন্যমনস্ক) সবই ছিল—একদিনে মিলিয়ে গেল। ঢাকা থেকে—

যুবক। আপনি পূর্ব-বাংলা থেকে আসছেন ?

যুবতী। (নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে) এখনি নয় অবশ্য। প্রায় এক বছর হল। তুমি তো বেশ শুদ্ধ বাংলা বল!

যুবক। (সলজ্জ) আজ্ঞে, মনিব লেখেন-টেখেন, তাই একটু-আধটু—

যুবতী। বুঝলাম। কিন্তু মরতে এলে কেন ?

যুবক। আজ্ঞে সেটা তো বলে বোঝানো যায় না।

যুবতী। যদি না কেউ মন থেকে বুঝতে চেষ্টা করে। ঠিক কথা। আমিও তাই বলি। দেখছি সাহিত্যিকের কাছে কাজ করে তুমিও আধা সাহিত্যিক হয়ে বসে আছ।

[যুবতী ভাল করে যুবককে দেখার চেষ্টা করে। যুবক লজ্জা পায়। কিন্তু কেমন যেন অভিভূত বোধ করে কিছুটা]

যুবতী। (অল্প হেসে) একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে চেহারাও চলে যাবে বলেই বোধ হয়।

[যুবতী ধীরে ধীরে পুলের রেলিঙে দুই হাত রেখে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবতে থাকে কিছুক্ষণ। দূর থেকে স্টীমারের বাঁশী বাজে। স্নানার্থী হিন্দুস্থানীয় গানের রেশ ভেসে আসে]

যুবক। কি ভাবছেন ?

যুবতী। (ধীরে একবার মাথা ঘুরিয়ে যুবককে দেখে নেয়। আবার সামনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে বাঁচার উপায়।

যুবক। ঠিক বুঝতে—

যুবতী। মরা যখন হলই না—আর কেনই ব নিজেকে মারব—এখন বাঁচার উপায় কি ?

[সহসা হেসে উঠে যুবকের দিকে ফিরে বলে]

তাই ভাবছি।...আপনি কি বলেন ?

[হঠাৎ "আপনি" সম্বোধনে যুবক অবাক হয় কিছুটা

যুবক। আপনি...!

যুবতী। ভেবে দেখলাম, আমি রিফিউজী মেয়ে আজ আর কোন পরিচয় নেই, সাজে না। আপনি তবু সাহিত্যিকের বাড়ি কাজ করেন। তা সে কাজ যা হোক না কেন। দুজনেই এলাম মরতে। হয়ে উঠল ন শেষ পর্যন্ত। অদ্ভুতভাবে দেখা হল আমাদের। দেখা যাচ্ছে বেঁচে রয়েছি আমরা এখনও। মনে হচ্ছে, থাকি না বেঁ আরও যদ্দিন পারি।...আপনি কি বলেন ?

যুবক। আমার কথাই আপনি বলছেন।

যুবতী। তা হলেই দেখুন, আমরা শুধু মরতেই আ নি, বাঁচতেও চাই দুজনে একসঙ্গে।

যুবক। দুজনে একসঙ্গে !

যুবতী। নয় কেন ? আমার কথা বিশ্বাস হল না বুঝি

যুবক। ওকথা কেন বলছেন ?

যুবতী। (অন্যমনস্ক) কী কষ্টে যে এক বছ কাটিয়েছি সে আমিই জানি। মানুষের জীবন তা নয় দেশ ভাগ হল, প্রাণ গেল, ঘরবাড়ি গেল; কিন্তু তা চেয়েও ভয়াবহ কলকাতায় এই এক বছর। তবু বেঁ ছিলাম। ওরই মাঝে কোনরকমে সম্মানটুকু বাঁচিয়ে রে বেঁচেছিলাম দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে। কিন্তু তা রইল না আর আজ।

[যুবতীর গলা ধরে আসে। যুবক ধীরে এগিয়ে এ তার পাশে দাঁড়ায়]

যুবক। আমার অবস্থাও হয়তো আপনি ঠিক বু উঠতে পারবেন না।...কিংবা কে জানে, হয়তো আপনিই বুঝবেন। ছেলেবেলাতেই সব গেছে। স

[ঐ]ই সয়েও ছিলাম তবু। আজ কদিন হল—ওঃ, [ক]াকে বলি নি এখনও, আজ কদিন হল আমার কাজ [নে]ই পথে পথে ঘুরেছি। মনিবের বইকটা চুরি করে [বে]চলাম, চার পয়সা দিয়েও কেউ কিনল না। এই [দা]স, এই অপমানের মধ্যে মানুষ বাঁচে কী করে [ব]ই বলুন ?

[যু]বতী। আচ্ছা, আপনি কি করতে পারেন ?

[যু]বক। মানে ?

[য]ুবতী। লোকের বাড়ি কাজ ছাড়া আর কি পারেন [আপ]নি ?

যুবক। মানে, আর কিছু পাই নি তো এখনও—ছাড়া লেখাপড়া—

যুবতী। সময় লাগে। (তারপর উৎসাহের সুরে) [আ]মি কাজ করি কিছু কিছু। মানে, লেখাপড়া জানি সামান্য। শেলাই-টেলাইয়ের কাজও পারি মোটামুটি। [তা]ই বোধ হয় বাঁচা যায় যদি সামান্য সাহায্য পাওয়া যায়।

যুবক। কোথায় ?

যুবতী। কাছেই।

যুবক। মানে ?

যুবতী। আপনি—

যুবক। আমি ?

যুবতী। এবং আমি। আমরা পরস্পরকে সাহায্য [ক]রতে পারি। পরস্পরের সাহায্যে বেঁচে উঠতে পারি, [বাঁ]চে থাকতে পারি। পারি না, বলুন ?

যুবক। আমি কি—

যুবতী। লিখবেন। গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস। সব ভাঙনের [ম]ধ্যেও তো মানুষ জাগছে, গড়ে উঠছে কত কী। [স]েখেই প্রতিষ্ঠা পাবেন আপনি।

যুবক। কি বলছেন ?

যুবতী। ঠিকই বলছি। আমি আপনাকে সাহিত্যিক [ক]রেই তুলব। সত্যিকার সাহিত্যিক, সার্থক সাহিত্যিক। [লো]কায়, মানে, লোকের মনে।

যুবক। আপনি ?

যুবতী। বললাম না আমি পূর্ববঙ্গের মেয়ে—তায় রিফিউজী। না পারি কি—অন্ততঃ লোকে তো তাই জানে। ছোট ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, বাড়ি বাড়ি শেলাই বিক্রি করে, শিখিয়ে, চালিয়ে নেবই।

যুবক। কিন্তু শুরু ?

যুবতী। এইখান থেকেই। থাকবার মত কোন ঠাঁই-ই কি মিলবে না ?

যুবক। কিন্তু আপনি—আমার সঙ্গে ?

যুবতী। আবার ভুল। মৃত্যুর তীরে এসে আমাদের পরিচয়। সেই পরিচয়ে ফিরে যাচ্ছি জীবনে। তাতেও দ্বিধা সন্দেহ আর সংস্কার ? আমি তার বাইরে।

যুবক। আমিও। কিন্তু শুনি লোকে বলে, পূব-পশ্চিম মেলে না।

যুবতী। অর্থাৎ ?

যুবক। আমি এদেশী।

যুবতী। আগেই বুঝেছি। ও কথাটা অনেক পুরনো। দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে তার পরে। আমার শুধু একটি কথা—

যুবক। বলুন।

যুবতী। আজ আমাদের নবজন্ম। তাই বলছি, আমরা বন্ধু হলাম। পরস্পরের সাহায্যে নতুন জীবন গড়ব। পারি ভাল, না পারি—হার মানলাম। তাও ভাল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা কেউ কাউকে ভুল বুঝব না, বোঝাব না, কেমন ? রাজী ?

যুবক। প্রতিজ্ঞা করছি।

যুবতী। তবে চলুন।

যুবক। চলুন।

যুবতী। (এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে) হ্যাঁ, ভাল কথা, বন্ধুর নাম ?

যুবক। (থতমত খেয়ে) কেষ্ট।

যুবতী। (হেসে) তবে আমারই নামটা পালটাতে হয়।

যুবক। কেন ?

যুবতী। আমি রাধা। (যেতে যেতে) ভয় নেই—অনুরাধা।

অন্ত

প্রায় দু বছর পরের ঘটনা

[উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাড়িতে মাঝের বড় ঘর। দুদিকে দুটি দরজায় পর্দা। মাঝে তৃতীয় দরজাটি বাইরে আসা-যাওয়ার। স্বল্প আসবাবপত্রে সুরুচি ও মোটামুটি সঙ্গতি বোঝায়। বুককেসে অনেকগুলি বই। টেবিলে ইতস্ততঃ ছড়ানো খাতা পেনসিল কলম ইত্যাদি। সময় সন্ধ্যা।

অনুরাধা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। তার চালচলনে পোশাকে-পরিচ্ছদে অবস্থার উন্নতি স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু সে উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন। বিশেষ দ্বন্দ্ব চলেছে তার মনে। কোণের একটা চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে ডাঃ মুখার্জি—চিকিৎসক। তাঁর বড় কোটের বুক পকেটে বেরিয়ে থাকা 'স্টেথো'ই সে পরিচয় দেয়]

অনুরাধা। (ডাঃ মুখার্জির সামনে এসে দাঁড়ায়) তা হলে আপনার কথাই সত্যি ?

ডাঃ মুখার্জি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বুড়ো মানুষ—ডাক্তার, আমি কি মিছে কথা বলছি ?

অনু। থামুন, আমায় ভাবতে দিন—(আবার পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ থামে, অভিমানে তার গলা ভারী হয়ে ওঠে) কিন্তু কেন, কি দরকার ছিল এই কপটতা, এমন লুকোচুরি—এক আধদিন নয়, পুরো দুটি বছর !

[ডাঃ মুখার্জি নীরব]

অনু। (অনুতপ্ত) আপনি ক্ষমা করবেন আমায়। আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনি ডাক্তার ; তা ছাড়া আপনি বলছেন আপনি এই পরিবারের বন্ধু। আপনার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবার কোন অধিকারই নেই আমার। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমায়, আপনি তো জানেন না সব কথা।

(নিজের মনে) আমি কে ? আমি কে তবে ?

[illegible]পনি—মানে—

অনু। এ বাড়ির আমি কে ? কেউ নই, কিছু নই। দু বছর ধরে সব মিথ্যে, সব অভিনয়—তাও কি হয় !

ডাঃ। দেখুন, আপনি অত উত্তেজিত হবেন না।

অনু। রাখুন আপনার ডাক্তারী। আপনি কি বুঝবেন আমার কী হচ্ছে ?

ডাঃ। সত্যিই আমি কিছু বুঝছি না।

অনু। (শ্লেষে) হ্যাঁ, আপনি তো বুঝবেনই না, এদেরই তো পারিবারিক চিকিৎসক আপনি !

ডাঃ। দেখুন, যদি আপত্তি না থাকে, দয়া করে যদি কথাটা খুলে বলেন আমায়—

অনু। (চেয়ারে বসে পড়ে। হাতে মাথা রাখে। তারপর ধরা গলায়) কেন, আপনিই না এইমাত্র বললেন যে কেষ্ট, মানে—এ বাড়ির চাকর কেষ্ট প্রায় আড়াই বছর হল মারা গেছে, আর আপনিই নাকি তার চিকিৎসা করেছিলেন। বলেন নি ?

ডাঃ। হ্যাঁ, বলেছি।

অনু। তবে এ কে, কার সঙ্গে এই দু বছর দিনরাত্তির আমি ঘর করছি।

ডাঃ। সত্যি বলতে কি আপনাকে, আমারও যেন কেমন গোলমাল ঠেকছে। মানে, প্রায় দু বছর আমিও কলকাতা ছাড়া। অনেকদিন পর এসে শান্তনুর সঙ্গে দেখা করার বড় ইচ্ছে হল। আগের বাড়িতে খোঁ[জ] নিয়ে দেখি, দু বছর হল ও আর সেখানে নেই। কিছুতেই আর খবর পাই না, শেষে হঠাৎ পথে সেদিন শান্তনুর সঙ্গে দেখা। ওর কাছেই পেলাম এই নতুন বাড়ির খবর। অবশ্য ও আমায় আসতে বলে নি একবারও। বরঞ্চ বলেছিল ও আগে আসবে আমাদের বাড়ি, অনেক কথা আছে নাকি আমার সঙ্গে। ত[া] এইদিকেই এসেছিলাম একটা কাজে, সোজা চলে এলাম এখানে। তুমি বলছি বলে কিছু মনে করো না। তোমার বাবার বয়সী আমি, তোমায় দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল ভাবলাম এতদিনে লক্ষ্মীছাড়ার জীবনে লক্ষ্মী এলেন বুঝি আমি যে ওর বাপের আমলের ডাক্তার মা। আমা[র] মনের কথাও তো তুমি বুঝবে না।

অনু। (অন্যমনস্ক) কিন্তু আমার কি দোষ বলতে পারেন ? দু বছর ধরে যাকে জানলাম বুঝলাম চিনলাম—

নে তা সব ভুল প্রমাণ হয়ে গেল। সব ভুল। লিয়ে নিয়ে) আমি লক্ষ্মী-টক্ষ্মী নই। ভাগ্যিস এখনও হয় নি, নইলে আপনি বলতেন সেটাও মিথ্যে।

ডাঃ। আমি!

অনু। ওই একই কথা। এই যে, যেমন আজ নি এখানে এসেছেন সত্যিকে মিথ্যে করে দিতে।

ডাঃ। সে কেমন কথা মা?

অনু। অপরাধের মধ্যে, কেষ্ট বলে একটি চাকর তার র চেষ্টাযত্নে আজ দেশের একজন নামকরা াত্যক। অমনি আপনাদের সহ্য হল না। মনিবকে চিনতও না, আর চাকর উঠবে জাতে! তাই থা থেকে আজ আপনি উড়ে এসে জুড়ে বসতে ছেন যে দু বছরেরও আগে কেষ্ট মরে গেছে, র পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে আপনিই তাকে রছেন।

ডাঃ। এ—এ তুমি কি বলছ মা, আমি মেরেছি?

অনু। (হঠাৎ বসে পড়ে) আর আপনার কথাই ঠিক হয় তো এ কে! কে এ—যার সঙ্গে এই দু বছর য়ার মত ঘুরেছি।

ডাঃ। (বিব্রত) দেখ মা, আমি তো সেই লোকটিকে খি নি এখনও। তবে শান্তনুই তো আমাকে এ ড়ির ঠিকানা দিল। আর, তার তো তিনকুলে কেউই ই।

অনু। (উঠে দাঁড়িয়ে) আবার ওই শান্তনু শান্তনু রছেন? বলছি না, তাকে আমি মোটেই চিনি না। ধু কেষ্টর মুখে তার কথা শুনেছি।

ডাঃ। কে কেষ্ট?

অনু। কজন আবার কেষ্ট? শান্তনু রায়ের চাকর।

ডাঃ। সে তো মরে গেছে।

অনু। (আবার বসে পড়ে। তারপর নিজের মনে) সে কি শান্তনুই কেষ্ট?

ডাঃ। কি বললে?

অনু। (সামলিয়ে নিয়ে) কিছু না।

ডাঃ। কি জানি, দু বছর হল আমিই শহর ছাড়া, যাক্ সে কথা। একটা কথা না বলে পারছি না—বুড়ো মানুষ, অপরাধ নিয়ো না মা। তুমি মেয়েছেলে, একা—তোমার কেষ্টই হোক বা আমার শান্তনুই হোক, একজন পরপুরুষের সঙ্গে বসবাস করছ। অথচ, দেখে তো মনে হয় না তোমার বিয়ে হয়েছে।

অনু। তবেই দেখুন, আপনাদের দৃষ্টিশক্তি কত অল্প, আর দৃষ্টিভঙ্গী কত পঙ্কিল। অমনি ধরে নিলেন, এর মধ্যে খারাপ কিছু আছে।

ডাঃ। তুমি উত্তেজিত হয়েছ মা। মনে এতটুকু সংশয় বা অশ্রদ্ধা থাকলে আমি কি তোমায় 'মা' বলে ডাকতে পারি? আমার প্রতি অবিচার করো না।

অনু। তবে কি আপনি তামাশা করতে এসেছেন?

ডাঃ। দেখ মা, আমার কথার ওপরেই যখন বিভ্রাট, আমি চলে যাচ্ছি। কেষ্ট মরে গেছে, তা সত্যি। পার যদি মরা লোককে বাঁচিয়ে তোল, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শান্তনু—

অনু। সে নেই।

ডাঃ। দোহাই তোমার, যে আছে তাকে মেরো না—তাকে বাঁচতে দাও। (উঠে প্রস্থানোদ্যত) শান্তনুর কাছে আমার ঠিকানা আছে, দরকার হলে ডেকো। আর একটি কথা না বলে পারছি না। তুমি লক্ষ্মী, সত্যিই তুমি এ বাড়ির লক্ষ্মী। যখন এসেছ, চলে যেয়ো না। শান্তনুর বাবা মা থাকলে ঠিক এই কথাই আজ বলতেন তোমায়। বড় ভাল ছেলে শান্তনু। বড় কষ্ট ওর, তুমি ওকে সুখী করো। তুমি পারবে। আরও কটা দিন তো আছি কলকাতায়, এর মধ্যেই যদি শুভ কাজটা সেরে ফেলতে পার, আমায় একটা খবর পাঠিয়ো শুধু। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। একা একা তোমরা এ বাড়িতে এই অবস্থায় থাক এটা ঠিক নয় মা, ওতে অসুবিধে অনেক। আচ্ছা, আমি চলি এখন। কাল সকালেই শান্তনুকে পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু। বড় [illegible] নিয়ে গেলাম।

[ডাঃ মুখার্জি ধীরে ধীরে চলে যান। [illegible] থাকে অনুরাধা। ডাঃ মুখার্জির প্রস্থান-পথে প্রবেশ করে জনৈক পুস্তক-প্রকাশক]

প্রকাশক। নমস্কার মিসেস দাস।

অমু। দেখুন, কোন ভদ্রমহিলাকে এ ভাবে কেউ বিদ্রূপ করে না।

প্রকাশক। (লজ্জিত ভাবে) মাপ করবেন, আমি কিছু ভেবে বলি নি। বিয়ে তো আপনাদের হবেই, আজ বা কাল—এই তো।

অমু। দেখুন, আপনারা বাংলাদেশের বইয়ের প্রকাশক। যা ঠিক নয়—এমন অনেক কথাই আপনাদের জানা আছে, তা আমিও জানি। কিন্তু আপনারা যা জানেন না, যা বিশ্বাস করেন না, সেই অবিশ্বাস্য সত্যটাও তা হলে জেনে রাখুন যে, এই দু বছর আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি দিয়ে সাহায্য করে এসেছি মাত্র। কোন মালিন্য, কোন অসামাজিকতাই নেই আমাদের পরিচয়ে, তাই আমরা মাথা উঁচু করেই আছি সব আলোচনা-সমালোচনার ওপরে।

প্রকাশক। এ—এ সব আপনি কি বলছেন? আপনিই তো কেষ্টবাবুকে গড়ে তুললেন। আপনারই চেষ্টায় তো আজ তিনি বিখ্যাত লেখক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস। কে না জানে বলুন?

অমু। (নিজের মনে) তখন কি জানতাম, মরার চেয়েও খারাপ বেঁচে থাকা।

প্রকাশক। আমায় ক্ষমা করবেন—আপনাকে অজান্তে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কেষ্টবাবুকে পরিচিত করাবার জন্য প্রকাশক হিসাবে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

অমু। যাক, কী জন্যে এসেছিলেন?

প্রকাশক। মানে, একটা কাজ আপনাকে কিন্তু করিয়ে দিতেই হবে। বড়ই গোলমাল শুরু হয়েছে। এখনই প্রতিবাদ না ছাপলে প্রায় 'ব্ল্যাকমেলে' দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত।

অমু। কিসের প্রতিবাদ?

প্রকাশক। অনেকেই বলতে শুরু করেছে যে কেষ্টবাবুর লেখাগুলো অবিকল শান্তনু রায়ের নকল।

অমু। (চমকে উঠে) কই, এ কথা তো আগে কখনও বলেন নি? (একটু পরে) যাঁর সম্বন্ধে কথা, তাঁকে জানিয়েছেন?

প্রকাশক। বলি বলি করেও কেষ্টবাবুকে বলতে পারি নি শেষ পর্যন্ত। কেমন যেন সঙ্কোচ এসে গেল। কিন্তু আর না জানালে নয়, লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে কয়েকটা কাগজে। তাই আপনার কাছেই ছুটে এলাম।

অমু। এ সব আলোচনা-সমালোচনা কেষ্টবাবু নিজে শোনেন নি? পড়েন নি কাগজে?

প্রকাশক। আজ্ঞে, তিনি আত্মভোলা লেখক, কোন কিছুতেই তাঁর খেয়াল নেই।

অমু। অভিযোগটা কী?

প্রকাশক। ওই যে বললাম, কেষ্টবাবুর লেখা নাকি অবিকল শান্তনু রায়ের মত।

অমু। কেষ্টবাবু শান্তনু রায়ের চাকরি করতেন বলেই তো সন্দেহ?

প্রকাশক। সেইটেই তো মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কেষ্টবাবু যে ফলাও করে সব বইয়ের ভূমিকাতেই কথাটা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। নইলে দেখুন না, শান্তনু রায়ের লেখা—পড়া দূরে থাক্, তার নামই তো শোনে নি কেউ আগে। কেষ্টবাবুই পরিচয় দিলেন তবে লোকে শান্তনু রায়ের লেখা পড়ল। তার ফলেই এই ফ্যাসাদ।

অমু। না। তাঁর কোন দোষ নেই। আমিই তাঁকে দিয়ে ওভাবে লিখিয়েছি।

প্রকাশক। আপনি? কিন্তু কেন বলুন তো?

অমু। সুযোগ সুবিধা পেলে অনেক মানুষই যে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, সেই সত্যটাই সকলকে জানিয়ে দেবার জন্যে।

প্রকাশক। মাপ করবেন, লেখার মধ্যেই তো লেখকের পরিচয়—

অমু। যদি সেই লেখা পড়াবার মত, পড়বার মত সুযোগ পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, এই আপনাদের শান্তনু—শান্তনু রায়। কেউ তাঁকে চিনত না জানত না আগে। টনক নড়ল যখন একজন নকল করে তাঁ

া—(সহসা) আচ্ছা, শান্তনু রায় কোথায়? তিনি বলেন?

প্রকাশক। সে তো আর এক মুশকিল। তার তো ান খবরই কেউ রাখে না।

অনু। (অন্যমনস্ক) হয়তো আত্মগ্লানিতে গঙ্গার ল ডুবে তিনি মনের জ্বালা জুড়িয়েছেন। (সচকিত) , যা বলছিলাম। যখন একজন তারই লেখা নকল র তাকে চেনাল, তখনই টনক নড়ল।

প্রকাশক। লোকে ঠিক ওই কথাই বলে।

অনু। (ধীর সংযত দৃঢ়ভাবে) আমি ঠিক উলটোটাই ি। আমারই সামনে বসে দিনের পর দিন কেষ্টবাবু খে গেছেন এই দু বছর ধরে। সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। তাড়াতাড়ি লিখে গেছেন, আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি নকবার। অতি সাধারণ এই মানুষটির মধ্যে কী বিপুল াবনাই না লুকনো ছিল!

প্রকাশক। ঠিক—ঠিক এই কথাটাই আপনি দয়া র লিখে দিন।

অনুরাধা চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনেই বলে]

অনু। কিন্তু বিশ্বাসে যদি আঘাত লাগে, মানুষ তে বসেও যদি মানুষকে ঠকায়! কিন্তু তাই বা কি র হয়। সমস্ত অন্তর দিয়ে যে তাকে মেনে নিল, খানেও বঞ্চনা—কিন্তু কেন? (উঠে পড়ে) দেখুন, ছু মনে করবেন না, আমার শরীরটা আজ ভাল নয়, টাও খারাপ। কেষ্টবাবু আসুন, তাঁকে সব কথা নাব, তারপর যা করার তিনিই করবেন।

প্রকাশক। (উঠে) শুধু দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি। চ্ছা, নমস্কার। [প্রস্থান]

[অনুরাধা পায়চারি করতে থাকে]

অনু। অভিনয়, শুধু অভিনয়, জীবনটা অভিনয়!

[সহসা বসে পড়ে]

এরই নাম কি বাঁচা? বেঁচে থাকা? তবে সেদিন ার জলেই বা ক্ষতি ছিল কি?

[আবার উঠে পড়ে]

না—আর না। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। অন্য কোথা—অন্য কোনখানে। এখানে নয়। কিছুতেই নয়।

[মাঝের দরজা দিয়ে বাইরে থেকে লোক আসার আওয়াজ পাওয়া যায়। মঞ্চের বাঁ পাশের দরজা দিয়ে অনুরাধা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ মঞ্চ খালি পড়ে থাকে। তারপর বাইরের দরজা দিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে এসে ঢোকে শান্তনু। সঙ্গে সাহিত্যিক বন্ধু জয়ন্ত]

শান্তনু। রাধা বোধ হয় বেরিয়েছে।

জয়ন্ত। শ্রীকৃষ্ণ বিহনে—

শান্তনু। কারুর পৌষ মাস, কারুর সর্বনাশ।

জয়ন্ত। নিজের সর্বনাশ তো তুমি নিজেই ডেকে এনেছ বন্ধু।

শান্তনু। উপায় ছিল না জয়ন্ত।

জয়ন্ত। সত্যি, শুধু নাটকীয় নয়, ঘটনাটি অতি নাটকীয়। নইলে দেখ, স্বরূপে তোমায় চিনল না কেউ, নকলকে কিন্তু মেনে নিল সহজেই।

শান্তনু। এটা একটা দুর্ঘটনা বলতে পার। তা ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল রাধা, সেই প্রাণপাত করে ঘুরেছে পাবলিশার্সের দরজায়। তার ব্যক্তিত্ব—

জয়ন্ত। অথবা শ্রীমুখেরই জয় হল শেষ পর্যন্ত, এই তো? কিন্তু এখন করবে কি শুনি?

শান্তনু। পথ আমার একটাই জয়ন্ত।

জয়ন্ত। মাথা ঠাণ্ডা করে একটু বস দেখি।

শান্তনু। বল শুনছি।

[শান্তনু দাঁড়িয়েই থাকে। জয়ন্ত বসে পড়ে]

জয়ন্ত। মিথ্যাটাই যে তোমার জীবনে সত্যি হয়ে গেল কিনা। মানে, তুমি শান্তনু রায়, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেলে আত্মহত্যা করতে, বেঁচে উঠলে কেষ্ট—কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে। ছিলে মনিব, হলে চাকর—মানে যে চাকর প্রায় আড়া[illegible]র আগে মরে ভূত হয়ে গেছে। আবার মজা দেখ, আসল শান্তনু রায় পার [illegible] কিন্তু নকল কৃষ্ণচন্দ্র দু বছরের মধ্যে একটা ভাল লেখক

হয়ে উঠল। আজ প্রশ্ন উঠেছে, কে আসল আর নকলই বা কে? কেষ্টচন্দ্র, না শান্তনু? কে যাবে, থাকবেই বা কে?

শান্তনু। যে যাবার সে-ই যাবে। থাকবে যে, সে-ই রইল।

জয়ন্ত। অর্থাৎ?

শান্তনু। শান্তনু রায় মরে গেছে দু বছর আগে এক সন্ধ্যায়, গঙ্গার ধারে পুলের ওপর। বেঁচে আছে তার চাকর কৃষ্ণচন্দ্র।

জয়ন্ত। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি শান্তনু যে তোমার অনুরাধার মনে কোন প্রশ্নই জাগে নি এ দু বছরে। আর, তুমিই বা সেই সাধারণ মিথ্যেটা তার কাছে প্রকাশ কর নি কেন এতদিন?

শান্তনু। সহজ ছিল না জয়ন্ত। সে আমায় অকপটে বিশ্বাস করেছে। কোন অবস্থাতেই তা ভেঙে দিতে পারি না।

জয়ন্ত। কিন্তু আজ যে প্রশ্ন উঠেছে তার উত্তর দেবে কে? কৃষ্ণচন্দ্র কি সত্যিই তার মনিব শান্তনু রায়ের লেখাগুলোই নিজের বলে চালাচ্ছে? নইলে এত মিল হয় কেমন করে?

শান্তনু। উত্তর নাই বা মিলল। চলুক না যেমন চলেছে। আমাদের দুজনের কেউই তো অত ভীরু, অত দুর্বল নই। নইলে দেখছ না, দু বছর আমরা বন্ধুভাবে একসঙ্গে বাস করছি। বাংলাদেশের কটা ছেলেমেয়ে পারে? আর তোমায় তো বলেছি, শীগগিরই আমাদের বিয়ে—

জয়ন্ত। ব্যাপারটা অত সহজ নয় শান্তনু। সারাজীবন ধরে এতবড় একটা মিথ্যে বয়ে বেড়াতে পারবে?

শান্তনু। কিন্তু তার চেয়েও বড় মিথ্যাচরণ তো করতে পারব না ভাই। সেদিন গঙ্গার ধারে সেই পুলের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে যে পরিচয় দিয়েছি নিজের, সেই সত্য হোক আমার জীবনে।

জয়ন্ত। কেন তুমি এ কাজ করলে?

শান্তনু। জানি না। ও-ই প্রথমে আমাকে চাকর-বাকর ঠাউরে নিয়েছিল। দোষও নেই। খালি পা, গায়ে শুধু গেঞ্জি, হাঁটুর কাছে কাপড়—ময়লা ছেঁড়া। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রুক্ষ চুল। ওরই বা দোষ কি বল?

জয়ন্ত। কিন্তু তোমার?

শান্তনু। হয়তো ভুল। কেন জানি না, হঠাৎ মনে হল ওরই সমগোত্রীয় হয়ে আমাকে ওর সঙ্গে এক মাটিতে দাঁড়াতে হবে।

জয়ন্ত। কিন্তু ওরই বা কি এমন পরিচয় ছিল শুনি?

শান্তনু। আর কোন্ পরিচয়ই বা আমি দিতে পারতাম নিজের। বলার মত আর কিই বা ছিল আমার। আর ও? জয়ন্ত, তুমিও লেখক, তুমি জান—একটি মেয়ের পরিচয় অনেক।

জয়ন্ত। কিন্তু বিধি বড় দারুণ। কেষ্টচন্দ্র হয়েই আজ হয় বাঁচ, নইলে শান্তনু হয়ে মর—মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

শান্তনু। ঠিক তাই। একদিকে অর্থ সম্মান, আর একদিকে একটি মানুষের স্নেহ শ্রদ্ধা বিশ্বাস। একদিক থাকবে, যাবে আর একদিক। তাই না?

জয়ন্ত। সেই একটি মানুষ যে আবার বিশেষ একজন মানুষী।

শান্তনু। সে অসাধারণ।

জয়ন্ত। আর তুমি অতি সাধারণ।

শান্তনু। তাই তো আর ভুল করব না।

জয়ন্ত। (দাঁড়িয়ে উঠে) দেখ, আমি চললাম, শুধু চাণক্য পণ্ডিতের কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম। হঠাৎ কিছু করে বস না।

শান্তনু। ভাল কাজের দিনক্ষণ নেই। যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। অধিকারগত প্রশ্নও নেই। ভাল করার অধিকার নিয়েই মানুষ জন্মায়। আমি তোমায় শুধু এইটুকুই বলছি জয়ন্ত, রাধাকে আমি বঞ্চনা করি নি এতটুকু। আমার সব দিয়েও আমি তাকে রাখব। সেদিনের সামান্য ভুলের বদলে এতবড় ভুল আর কখনও করব না। অর্থ যশ মান সব যাক, কিন্তু সেই এক মানুষের স্নেহ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আমার কাছে অনেক—অনেক বড়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তা অক্ষুণ্ণ রাখব।

[কথা বলতে বলতে দুজনে এগোয়। জয়ন্ত চলে যায়। শান্তনু ফিরে আসে। মঞ্চের ডানদিকের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে যায়। পর্দায় হাত দিয়ে কী ভেবে পিছন ফিরে তাকায়। অন্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাধা। তার চোখেমুখে বিচিত্র ভাব। সে সব শুনেছে। ধীরে উভয়ে উভয়ের দিকে এগিয়ে আসে। রাধা কেষ্টর বুকে মাথা রাখে। অনুরাধা শান্তনুর]

শান্তনু। রাধা, কেষ্ট তোমারই—যুগে যুগে জন্ম-জন্মান্তরে। আর যা জেনেছ যা শুনেছ যা বুঝেছ সব মিথ্যে। সত্য শুধু তুমি আর আমি, আর যমুনাপুলিনে সেই আমাদের মিলন।

যবনিকা

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রথম খণ্ড : উপন্যাস

দি ব্রাদার্স কারামাজোভ

[র]বীন্দ্রনাথের মৃত্যুহীন কাহিনী গুপ্তধনের হতভাগ্য নায়ক মৃত্যুঞ্জয় যখন তার সারা জীবনের সাধনার [সাম]নে উপস্থিত, ঠিক তখন তার মনের মধ্যে মোহমুক্তির [সেই] অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি গল্পের শেষে মূর্ত হয়ে ওঠে [পাঠ]কের মনে :

"মৃত্যুঞ্জয় পাৎলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা মড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের ছড়াইতে লাগিল। কখনও বা দাঁত দিয়া দংশন [ক]রিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনও একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে [বার]ম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে [লা]গিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা [সো]না লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। [মৃত্যু]ঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। [ত]ার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ [করি]য়া ধূলির মত সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াই[য়া দে]য়—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণলুব্ধ রাজা-রাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে [লই]য়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম [হই]তে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার [স্তূপ] দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!'"

সোনা নয়—বাসনা। দস্তয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে' বাসনার গুপ্তধনের সামনে উপস্থিত হয়ে পাঠকের মনও বলে ওঠে অনুরূপ আর্তনাদে—চাই না। উপন্যাসে জীবনের নির্মম নগ্ন সত্যের সাক্ষাৎ কী ভয়াবহ হতে পারে, হতে পারে কতদূর দুর্বহ অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত—'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে তারই সবচেয়ে অন্ধকার, সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। মানুষের মনে যে অন্তহীন কামনার কালো গহ্বর, কুটিলতম চক্রান্তের ষড়যন্ত্র, স্বার্থের কারণে যে-কোনও হীনতার জন্য নিরন্তর প্রস্তুতি, জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের কদর্যতম পরিকল্পনার পূতিগন্ধ-নরক—তারই আবরণ উন্মোচনের জন্য এই মহৎ উপন্যাসের অবিচলিত পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে গুপ্তধনের হতভাগ্য নায়ক মৃত্যুঞ্জয়ের মতই। কিন্তু সেই চরম মুহূর্ত যখন আসন্ন হয়, যখন অবারিত হয় সেই মানবজীবনের উলঙ্গ কঠিন সত্য, তখন বিস্ফারিত দৃষ্টি দু হাতে আড়াল করে হাহাকার করে ওঠে তার হৃদয়—না, না। চাই না, চাই না। ফিরিয়ে নাও তোমার জীবন-দর্পণ—'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'।

[illegible]লোক ছাড়া মানবলোক অসম্ভব হত সেই জবাকুসু[ম] [illegible] সূর্যের কাছে যাওয়া যায় না আজও। তাকে প্রণাম [illegible] অব্যাহত রেখে। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' ছাড়া বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রের গ্রন্থনা সম্ভব হত না, কিন্তু মৃত্যুতে অকালে যতি না পড়লে মানবপরিবারের এই

মহৎ কাব্য হাতে তুলে নেওয়া অসম্ভব হত। যদি আরও কয়েক পা এগিয়ে আমাদের হাত ধরে দস্তয়ভস্কি নিয়ে যেতেন সেই অনুচ্চার্য সত্যের সম্মুখে, তা হলে সহস্র সূর্যের উত্তাপের চেয়ে দুঃসহ হত মানুষের সত্যকারের চেহারা দেখে মানুষের চোখের জলের অন্তহীন অনুতাপ। তাই হয়তো ভালই হয়েছে যে 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র অসম্পূর্ণ অংশের মাধ্যমে সমগ্র মানবপরিবারের মহাকাব্য লেখবার জন্যে আর একজন দস্তয়ভস্কির দেখা পাওয়া যায় নি আজও।

উপন্যাস কী নয়—এ কথা যদি বা বোঝানো যায়, উপন্যাস কী—এ কথা বোঝানো অসম্ভব। মহৎ উপন্যাস এবং মহাকাব্যের চরিত্র অভিন্ন। কোনটাই বোঝবার নয়—বাজবার। পাঠকের মনের মধ্যে গানের মত যা বেজে ওঠে, যুক্তি তর্ক এবং বিশ্লেষণের অনেক বাইরে যা নিয়ে যায় চিরন্তনের মন্দির-প্রাঙ্গণে, যেখানে বিশ্বাসের বেদীতে আসীন জীবনজিজ্ঞাসুর সামনে আবির্ভূত হয় জ্যোতির্ময় সত্তা—প্রথম দিনের সূর্য যাকে প্রশ্ন করেছিল, কে তুমি? মানবমনের সেই চরম জিজ্ঞাসা যেখানে উচ্চারিত সেই-খানেই উপস্থিত মহাকাব্য—মহৎ উপন্যাস। সূর্য উদিত হলে যেমন বলে দিতে হয় না দিন হয়েছে তেমনই এমন অভিজ্ঞতা যেখানে মেলে সেখানে প্রয়োজন হয় না মল্লিনাথের টীকার। সহৃদয়চিত্ত সহস্রদলের সৌরভে আচ্ছন্ন হয়; ধন্য হয় সে। গেয়ে ওঠে তার মন:

'এই জ্যোতিসমুদ্রমাঝে, যে শতদল পদ্ম রাজে
তাহার মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।'

সত্যিই ধন্য—যিনি লিখেছেন 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' এবং যিনি পাঠক ওই বইয়ের—উভয়েই ধন্য হয়েছেন নিঃসংশয়ে। উপন্যাস কী—এই প্রশ্নের উত্তরে [illegible] কোনও উপন্যাসের চেয়ে জটিলতর কো[illegible]থের টীকা পড়ার প্র[illegible]য়োজন হয় না 'দি ব্রাদা[illegible]জোভে'র পাঠকের। [illegible] স্মরণীয় রচনার দিকে আঙুল দেখিয়েই সে নির্দ্বিধায় বলতে পারে, এই হচ্ছে উপন্যাস—যথার্থ এবং মহৎ।

বিশ্বসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন যে সাহিত্যের ব্যাকরণে যাকে 'স্টাইল' বলে, দস্তয়ভস্কির মহত্তম এই উপন্যাসেও তা উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত। 'স্টাইল' না বলে ভাষার জৌলুস বলাই হয়তো সঙ্গত। কারণ নিন্দার অথবা প্রশংসার যারই কথা হোক, বড় লেখকমাত্রেরই রচনার বৈশিষ্ট্য থাকে; দস্তয়ভস্কিরও ছিল। কিন্তু ভাষার গ্র্যামার অথবা সাজাবার প্রয়োজন সম্পর্কে আশ্চর্য উদাসীন ছিলেন তিনি। একা নন—বালজাক, তলস্তয় এবং ডিকেন্সও তাই। দস্তয়ভস্কির রচনাশৈলীই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। কখনও আর্থিক, কখনও দৈহিক কারণে যে পরিমাণ মনঃসংযোগ অবশ্যম্ভাবী হয় সৎ সাহিত্যসৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় তা অসম্ভব ছিল 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'-কারের পক্ষে। তিনি নিজেও তাঁর রচনার খসড়া বারংবার পরিবর্তন পরিবর্ধন সংশোধন বর্জন করবার পরও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এবং তাঁর মহত্তম রচনাও সমালোচনার কষ্টিপাথরে ঘষলে দেখা যাবে তাতে পিটুলি গোলার অংশ কম নয়।

এই মহৎ লেখকের অদ্বিতীয় সৃষ্টিতেও রচনাশৈলীর ত্রুটি সুপ্রকট হয়েছে যে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসকারের কাছেও, তার প্রমাণ পাই সমারসেট ম[illegible] যখন 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' প্রসঙ্গে বলেন:

"The Brothers Karamazov suffers fro[m] the prolixity which Dostoevsky knew wa[s] a fault in many of his other books, but o[f] which he could not cure himself. Even i[n] a translation one can hardly fail to b[e] conscious of the sloppiness of the writing Dostoevsky was a great novelist, but a poo[r] artist. His sense of humour was elementar[y] and Madame Hohlakov, who provides th[e] comic relief, is merely tiresome."

প্রচুর ত্রুটির কথা বলবার পর মম্‌-ও অবশ্য সচেত[ন] এবং সংযত হয়েছেন। এবং এ বিষয় তাঁর কাছেও শে[ষ] পর্যন্ত প্রতিভাত হয়েছে যে:

"But this is merely a matter of technique ; e greatness of The Brothers Karamazov pends on the greatness of its theme."

এই উপন্যাসে কাহিনী এবং তার বিন্যাস উপলক্ষ্য র। সব মহৎ সাহিত্যেরই যা শেষ লক্ষ্য—'দি ব্রাদার্স রামাজোভের'ও তাই। সেই লক্ষ্য হচ্ছে মহৎ বক্তব্য ; য়েভস্কি নিজেই বলেছেন যে যার ওপর তাঁর বই দাঁড়াবে হচ্ছে—আইডিয়া। মানুষের সেই মহত্তম আইডিয়ার হক বলেই সমস্ত ত্রুটিকে হেলায় নস্যাৎ করে দি 'ব্রাদার্স ার্যামাজোভ' চিরন্তন সাহিত্য। ত্রুটির পরিবর্তে সর্বাঙ্গ-ন্দর রচনাশৈলী সত্ত্বেও এই মহৎ বক্তব্য ব্যতিরেকে এই হত প্রাণহীন সুন্দর শব মাত্র—কখনই হতে পারত এ বই যা শেষ পর্যন্ত হতে পেরেছে সেই জীবনের নির্বাণ উৎসব।

'Sloppiness of the writing' সত্ত্বেও দস্তয়ভস্কি 'Great Novelist' ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ড় উপন্যাসে যে গল্পের অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ঠে দস্তয়ভস্কির প্রায় কোনও রচনাতেই সেই দুর্ঘটনা টে নি। পাঠককে দুনিবার কৌতূহলের সুতোয় লখকের চরম লক্ষ্যে টেনে নিয়ে যাবার বিস্ময়কর ক্ষমতা হজাত ছিল দস্তয়ভস্কির। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'র ক্ষেত্রে যা সত্য, 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র ক্ষেত্রেও মিথ্যে নয়। কতটুকু বললে এবং কী না ললে পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় থাকে দস্তয়ভস্কি তা ানতেন। আজকের বিশ্বে সবচেয়ে বিস্ময়কর নৈপুণ্য ার গল্প-বলিয়ে হিসেবে, সেই সমারসেট মমেরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি ড়ায় নি তা। তিনি স্পষ্টতঃই এ কথা [illegible] বিস্মৃত ন নি যে :

..."Dostoevsky was not only a grea ovelist, but a very competent one, the two o not always go together, and he had a markable gift for the effective drar[illegible]ation f a situation....and he heightens the thrill y an ingenius device ; his characters are agitated quite out of proportion to the words they utter ; he describes them as trembling with emotions, green in the face or fearfully pallid, so that a significance the reader cannot account for is given to the most ordinary remarks ; and presently he is so wrought up by this extravagant gestures that his own nerves are set on edge and he is prepared to receive a real shock when something happens which otherwise would have left him unmoved."

কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের পাঠকের কাছে দস্তয়ভস্কি কেবলমাত্র competent বলে বড় নন। Man do not live by bread alone.—শুধু 'ব্রেড এবং বাটার' হলেই তার চলে না, বাটারফ্লাইয়ের স্বপ্নও সে দেখে। এবং এই কারণেই যে দেবতা এবং দানব উভয়ের চেয়েই উপযুক্ত তারই যোগ্য পরিচয় যেমন মানুষ বলে, তেমনই যে কেবল competent সে কখনও-কখনও Bestseller-এর লেখক বটে, কিন্তু 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র স্রষ্টা নয় কখনই। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র লেখক যেখানে দস্তয়ভস্কি সেখানে তিনি শুধুই competent নন, সেখানে তিনি—জীবনদ্রষ্টা। সেক্সপীয়র এবং রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী তিনি সেখানে সৃষ্টির সোনার তরীতে।

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং—রসাত্মক বাক্যই কাব্য, কিন্তু রসাত্মক বাক্যমাত্রই মহাকাব্য নয়। মানুষ যেমন কেবলমাত্র রুটির কাঙাল নয়, তেমনই কাব্যও কেবলমাত্র রসের ভিয়েন নয়। বিশ্বনাথেরা তাই বলেছেন, মহাকাব্য কোটিকে গোটিক। মহাকবিও যুগেকালে ক[illegible]আবির্ভূত। কিন্তু অসাধারণ এই কবিকুলের অতিসা[illegible]চনাও সাধারণ লেখকদের শ্রেষ্ঠ লেখার তুলনায় অনেক বেশী অসাধা[illegible] কবিদের এই সব সাধারণ সৃষ্টিকে তাঁরা মহাকাব্য বলে মেনে নেন নি—এদের আখ্যা দিয়েছেন চিত্রকাব্য।

তুলনা দিয়ে বলা যায় 'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রনাথের চিত্রকাব্য। কিন্তু 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের মহৎ কবিতা—তাঁর বিচিত্র-কাব্য। মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও যা সত্য, মহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা অসত্য নয়।

এর আগেই বলা হয়েছে যে দস্তয়ভস্কি তাঁর মহত্তম রচনায় নিরাবরণ সত্যের যত কাছে নিয়ে গেছেন মানুষকে, এত কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া একমাত্র 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'-কারের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এখন বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র সত্যের সম্মুখীন করার কারণেই এ বইয়ের লেখকের এত সম্মান নয়। বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্র জীবনদর্পণ-সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা বিচিত্র ক্ষমতার পরিচয় নিশ্চয়ই, কিন্তু শেষ কথা নয় তা সাহিত্যের বিচারে। কারামাজোভদের উপলক্ষ করে যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছেন দস্তয়ভস্কি, তা কেবল মানবজীবনের অন্ধকার-কালো কুটিল মুখকে অনাবৃত করবার দুঃসাহস নয়—তার চেয়ে কিছু বেশী পাঠককে দেবার প্রচেষ্টাই এ গ্রন্থকে বিশ্বসাহিত্য করেছে। কী সেই লক্ষ্যবস্তু—অতঃপর সেই সার কথায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র সেই নির্যাসকে কেউ বলেছেন 'The Quest of God,' আবার কেউ বলেছেন 'The problem of evil'। এই 'Quest' ছাড়া সর্ব-গুণান্বিত রচনা হয়েও এ বই Best Seller হত মাত্র—সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভার হত না কিছুতেই। যে অংশে দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে এই 'Quest' অথবা 'অন্বেষণ' উপস্থিত, সেই অংশের নাম—Pro and Contra।

Pro and Contra অংশে দস্তয়ভস্কির মুখপাত্র ভগবানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও পৃথিবীতে এত নিষ্ঠুরতা কেন-এই চিরন্তন প্রশ্ন তুলেছেন। বৃদ্ধ কারামাজোভের হঠাৎ ... পুত্র আইভ্যানের জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই যে ... করেছে যারা, তাদের ... দুঃখিত চিরকাল কেন নির্দোষ নিরপরাধেরা করে যাবে? এই জিজ্ঞাসা অথবা অন্বেষণে 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' শেষ নয়। শেষ হলে সাহিত্যের বিচারে দস্তয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র মূল্য হ[ত] না অশেষ।

অন্বেষণেই কারামাজোভদের কাহিনীর ছেদ নয়—[এ] উত্তরও অন্বেষণ করেছেন দস্তয়ভস্কি 'দি ব্রাদা[র্স] কারামাজোভে'। এবং এই সমাধান অংশে এসে আটকে গেছেন দস্তয়ভস্কির সমস্ত টীকাকার। সমারসে[ট] মম্ সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে বলেছেন : "Pro and Contr[a] is there for the reader to read. Dostoevsk[y] never wrote with greater power. But whe[n] he had written it he was frightened of wha[t] he had done. The argument was cogen[t] but the conclusion repugnant to his ow[n] belief that the world for all its evil an[d] suffering is beautiful because it is th[e] creation of God. 'If one loves all livin[g] things in the world, this love will justif[y] suffering and all will share each other['s] guilt. Suffering for the sin of others wi[ll] then become the moral duty of every tr[ue] Christian.' That is what Dostoevsky wanted to believe. And having written Pro an[d] Contra he hastened to write a refutation No one was better aware than he that h[e] had not succeeded. The section is tedius an[d] the refutation unconvincing.

The problem of evil still awaits solution and Ivan Karamazov's indictment has no[t] yet been answered."

দস্তয়ভস্কিকে মম্ এই জায়গায় এসে আর বুঝতে পারেন নি, তাঁর বোঝবার কথাও নয় অবশ্য। বোঝবার কথা নয় তার কারণ মমের সম্বল—'ট্যালেন্ট'-দের চিরকাল যা সহায় সেই কমনসেন্স, যুক্তি বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা। আর 'প্রতিভার পদচারণা ঠিক ... বাইরে—বিশ্বাস, faith, শ্রদ্ধা। এই দিয়ে যে বস্তু তৈরি হয় বুদ্ধি ...

—অভিজ্ঞতার তা নাগালের অনেক বাইরে। মাত্র প্রশ্ন করার জন্য দস্তয়ভস্কি রচনা করেন ব্রাদার্স কারামাজোভ,' প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন যেখানে সেই অংশই এই মহাগ্রন্থের সবচেয়ে উজ্জ্বল। এই উত্তর মনের কাছে convincing বা যোগ্য নয়। নয় তার কারণ, বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু ছাড়া কাছে আর সবই অস্পষ্ট তাঁর পক্ষে অসম্ভব সাস্বাদন। মহত্তম সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সব কিছুই দিবালোকের মত স্পষ্ট নয়। মানুষ পর্যন্ত যত দামী কথা উচ্চারণ করেছে তার মধ্যে স্পষ্ট সেটুকুর যতই হোক একটা মূল্য ঠিক হয়ে তার মধ্যে অমূল্য অংশ হচ্ছে তাই—যার অনেকটাই ।

Competent লেখার জন্য যার সাহায্য ব্যতিরেকে র তার নাম commonsense। আর common-e যেখানে থমকে থেমে গেছে সেইখানে যার ভাব—তারই নাম মহৎ রচনা। Faith অথবা বিশ্বাস ছাড়া—সে বিশ্বাস ভগবানেই হোক আর মনুষ্যত্বেই হোক—মহাকাব্য অথবা মহৎ সাহিত্য অসম্ভব। যুক্তি বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরই মানবজীবনের একমাত্র বিচারক নয়। এর ঊর্ধ্বে আরও কোন বক্তব্য আছে মানুষের, এ বিশ্বাস যাঁর নেই মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর পক্ষে নিঃসংশয়ে অনধিকারচর্চা। কেবল তাই নয়, মহৎ সাহিত্যপাঠও এ বিশ্বাস ছাড়া অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর মাত্র। সেক্সপীয়র যখন বলেন :

> ...Out, out, brief candle !
> Life's but a walking shadow ; a poor player,
> That struts and frets his hour upon
> the stage,
> And then is heard no more. It is a tale
> Told by an idiot, full of sound and fury,
> Signifying nothing.—"

Shaw যখন এর প্রতিবাদে বলেন : "...Life is no 'brief candle' for me. It is a sort of splendid torch, which I have got hold of for the moment : and I want to make it burn as

brightly as possible before handing it on to future generations."—তখন তা হয় বিশেষ কালের বক্তব্য; সেক্সপীয়রেরটি চিরকালের বাণী। 'It is a tale told by an idiot,'—মানবজীবন সম্বন্ধে এ উক্তি করবার জন্যে শ হলে চলে না, সেক্সপীয়র হতে হয়। 'Full of sound and fury signifying nothing'—কেবল যুক্তির উৎস থেকে উৎসারিত হয় না কোনও দিন, এরই জন্যে প্রয়োজন হয় প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞা হচ্ছে সেই তৃতীয় দৃষ্টি—মূল্যহীনকে সোনা করবার জাদু যে জানে—রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে' যা আজীবন—সেই পরশপাথর। 'পরশপাথর' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন যুক্তির আলোয় তা পুরো স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট হলে পরশপাথর হত পদ্য—স্পষ্ট নয় বলেই পরশপাথর রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

শ-ই একবার বলেছিলেন যে Bestseller লেখবার জন্যে তাঁর কলম নয়। সমাজদেহের সর্বাঙ্গে যে দুষ্টব্রণ বিস্তৃত হচ্ছে দিনের পর দিন, শল্যচিকিৎসকের মত ব্যঙ্গের শাণিত ছুরিতে তার উৎসমূলকে নির্মূল করার কারণেই তাঁর লেখনীধারণ, এবং 'নাটক' তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার জন্যে অপরিহার্য মাধ্যম মাত্র। যে সমাজে এই দুষ্টব্রণ আর দেখা দেবে না—অর্থাৎ যে সমাজে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হবে তাঁর অগণ্য নাট্যাবলী, সেই সমাজেই তিনি সার্থক মনে করবেন নিজেকে সর্বান্তঃকরণে; তার আগে তাঁর আত্মার অক্ষয় শান্তি হবে না।

দস্তয়ভস্কির যে refutationকে convincing মনে হয় নি সমারসেট মমের—সেই বাণীর জন্যেই 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভে'র অনিবার্য উপস্থিতি বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রের প্রারম্ভেই। এবং এই উক্তির সমর্থনের জন্যে যেতে হবে Henry Miller-এর কাছে:

"And what of evil? Suddenly it is Dostoievsky's voice I hear. If there be evil, there can be no God. Was that not the thought which plagued Dostoievsky? Whoever knows Dostoievsky knows the torments he endured because of this conflict. But the rebel and the doubter is silenced towards the end, silenced by a magnificent [illegible]on. ("Not resignation", as Janko [illegible] ... 'Love all God's creation and every grain of sand in it Love every leaf, every ray of God's light. If you love everything, you will preserve the divine mystery of things.' (Father Zosima, alias the real Dostoievsky.)"

এই 'the divine mystery of things'-এ যুক্তির পাখায় ভর করে পৌছনো যায় না—একে চেনা যায় প্রজ্ঞার আলোয়। সব মহৎ রচনাই যেখানে মহত্তম সেখানেই যুক্তির ভূমি থেকে তাঁর স্রষ্টা যেখানে উত্তীর্ণ তার নাম প্রজ্ঞার ভূমা।

এই প্রজ্ঞার প্রদীপে 'Crime and punishment'-এর অন্ধকার আলো হয়েছে 'The Brothers Karamazov' এ এসে। আর সেই কারণেই বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে 'Crime and punishment'-এর নয়, 'The Brothers Karamazov'-এর সংযোজনা হয়েছে অবশ্যম্ভাবী।

'The Brothers Karamazov'-প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানবার আগে একটা কথা বলা দরকার। আমরা জানি যে

"He [Dostoevsky] intended in further volumes to continue the development of Alyosha, taking him through a number of vicissitudes, in which it is supposed he was to undergo the great experience of sin and finally through suffering achieve salvation. But death prevented Dostoevsky from carrying out his intention, and The Brothers Karamazov remains a fragment."

যে কথা একটু আগে একবার বলা হয়েছে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে, যদি দস্তয়ভস্কির দুঃসাধ্য পরিকল্পনা সার্থক হত তা হলে যে সত্যের সম্মুখীন হতে হত পাঠককে, যে দৃশ্য অবারিত হত তার মানসচক্ষে তা সহ্য করতে পারত না সে—ভয়ে দু চোখ বন্ধ করে ফেলতে বাধ্য হত। পাগলা মেহের আলীর মত চিৎকার করে উঠত তার মন: তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়!

খাঁটি সোনায় যেমন অলঙ্কার হয় না তেমনই নির্ভেজাল সত্যের হওয়া যায় না ভোক্তা। হওয়া যায় না কারণ সূর্যের তাপ যতই হোক তার চেয়ে নির্জলা সত্যের উত্তাপ যে অনেক—অনেক বেশী।

[ক্রমশ]

[illegible] দুষ্কৃতি চিরকাল কেন নির্দোষ যা সহায় [illegible] নিরপরাধেরা করে যাবে? এই জিজ্ঞাসা [illegible] 'দি [illegible] কারামাজোভ'। [illegible] শক্তিভাণ্ডার পদচারণা [illegible]

পার্বত্য

রমেন্দ্রলাল রায়

থানে ঢং ঢং করে ঘড়ি বা ঘণ্টা বাজে না। বাংলো বাড়িটার তিন দিক ঘিরে ঘন প্রাচীন অরণ্য, আরও চীন পাহাড়। আর আছে নদী। ভয় আতঙ্ক আর া অজানিত রহস্যের আশ্চর্য পৃথিবী।

সুদাস ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। নির্জন বাংলো ড়টার উত্তর কোণের আউট-হাউসের চৌকিদারের রিটাও ঘুমিয়ে পড়েছে। অজানা ঠিকানা থেকে পাথায় ভর করে নামা অন্ধকার এতক্ষণে আঁকড়ে ত পেরেছে এই অঞ্চলটাকে। এটা ডুয়ার্সের একটা বন-স্ত। আর যে বাংলো বাড়িটায় সুদাস কয়েক দিনের আশ্রয় নিয়েছে—সেটা একটা পরিত্যক্ত বাংলো। । কয়েক আগে এক স্কচ্ সাহেবের আবাস ছিল এটা। হব এই বাংলোর চারপাশে প্রায় চার শো বিঘা জমি ন বিচিত্র শখের আবাদ করেছিল। পরে আখের র ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত লোকসান । সাহেব হোমে ফিরে গিয়েছিল।

সুদাস এই বাংলো বাড়িটায় কেন এসে উঠল কে ব! কিছু দূরেই চা-বাগানের ইন্স্পেকশন বাংলো ছ। সেখানে দিব্যি আরামে থাকতে পারত, কিন্তু করেই সুদাস সেখানে গেল না। কদিন সে এখানে বে—তাই বা কে বলবে। কেউ জানে না। সুদাস ও কি জানে! যেমন, যতদিন ভাল লাগে থাকবে, না টিকলে যে-কোন মুহূর্তে বিছানা গোটাবে.

সুদাসের পুরো নাম—সুদাসশঙ্কর চৌধুরী। ডুয়া... অঞ্চলে সুদাসের পরিচিতি ব্যাপক। কিন্তু সুদাস নকার লোক নয়। যে গুণ থাকলে নিঃস্ব বঞ্চিত যেরা ভরসা করে এসে যার সামনে দাঁড়ায় এবং অতি ... কথায় কোমর বেঁধে কাজ করে, ... নেই র মানুষ। ... কিন্তু বোধ হয় ... কিন্তু

সুদাসকে এক জায়গায় বেশীদিন দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যায়—আবার একদিন এখানে দেখা যায়। চুলে যেন ফণা তোলা, জামায় কখনও কড়া ইস্ত্রির জলুস, কখনও অনাদরের ধুলো জমা। কিন্তু চেহারায় সেই একই ভাব। চোখে সেই একই দীপ্তি যা এখানের লোকে প্রথম দিন ওর চোখে দেখেছিল।

রাত্রি মধ্যপ্রহর পার হয়ে গেছে। অন্ধকার-নামা ঘন রাত্রিকে আরও ঘনতর করে সুদাসের মশারি বাতাসে একটু একটু দুলছে।

এরই মধ্যে ঝড় এসে গেল। মশারিটা এবার বেলুনের মত উড়ে যেতে চাইছে। সিরসির করে পায়ের উপর কিসের যেন একটা ছোঁয়া লাগল। ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল সুদাস। মনে হল যেন একটা স্পর্শ, মানুষের হাত আঙুলগুলো দিয়ে স্পর্শ করছে সুদাসের পা। অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় সুদাস পা ছুঁড়ল। উঃ!—অস্ফুট একটা স্বর শুনে আঁতকে উঠে বসল বিছানায়।

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে একটা যেন বেদনার্ত স্বর ফুটল—উঃ!

সাংঘাতিক ব্যাপার। সুদাস চিৎকার করে উঠল: কে? কে ওখানে? চৌকিদার, এই চৌকিদার। এই বিকল! বিকল!

বিকল সুদাসের বিশ্বকর্মা অনুচরের নাম।

...চৌকির যেদিকে সুদাসের পা রাখা ছিল সেদিকে অন্ধক... ...মূর্তি স্তব্ধ হয়ে আছে। নড়ছে না, পালি...

সুদাস কম অবাক হল না। হয় ... আক্রমণ করবে, নয় পালাবে। কিন্তু মূর্তিটা ব... ...ছে।

ডুয়ার্সের এই ভয়ঙ্কর অরণ্য-এলাকায় সুদাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। গা-ঝাড়া দিয়ে আকস্মিক ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলে সুদাস কথা বলল, কে তুমি, কথা বল? নয়তো তোমার বিপদ বাড়বে।

আর একবার চৌকিদার ডাকার কথা সুদাসের মনে হল—তবু সে ডাকল না। যদিও ডাক-বাংলোর একমাত্র রক্ষী চৌকিদার, তবুও এই এত রাত্রে তাকে দু-এক চিৎকারে ঘুম থেকে তোলা যাবে না। জেগে থাকলেও দরজা খুলবে না, বাইরে পা বাড়াবে না। পিতৃপুরুষের দেওয়া প্রাণটা সবসময়েই আপদ-বালাই মুক্ত রাখতে হয়। বন পাহাড় আর অন্ধকারের রাজ্যে দুটি অন্নের জন্যে পড়ে আছে সে শুধু ওই প্রাণটারই মায়ায়।

শিয়রের বালিশের নীচে টর্চটা ছিল—সেটা হাতড়ে পাওয়া গেল না। বোধ হয় গড়িয়ে নীচে পড়ে গেছে। সুদাস তার দীর্ঘ হাতটা মাথার দিকে নামিয়ে দিয়ে বারকয়েক হাতড়াতেই টর্চটা পেয়ে গেল।

টর্চ জ্বালতেই মূর্তি ফুটে উঠল। শুধু ফুটে ওঠাই নয়, কথাও বলল—আমি ডলেকামিনী। মৃদু গলায় কথাটি বলেই মাথাটা আরও ঝুঁকিয়ে ফেলল।

সুদাস কথাটার শেষ ধ্বনিটাকেই যেন আঁকড়ে বলল, ডলেকামিনী! কেমন করে এলি এখানে?

সুদাসের মনে পড়ল—সেই থেকে প্রায় ছ বছর শেষ। ডলেকামিনী একদিন তার কাছে ছিল। আবার নিজের খেয়ালেই সুদাসকে বাঁধনমুক্ত করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। নইলে সুদাসের ঘর বাঁধা ভিন্ন উপায় থাকত না। ডলেকামিনীর কথা পেলেই মানুষগুলো তাকে আটক করতে পারত। ডলেকামিনী বুঝতে পেরেছিল। সুদাস তাকে ঠেলবে না, কিন্তু সুদাসের মন তখন এখানে ছিল না। তাই ডলেকামিনী বলেছিল, তুমি গিয়ে আবার এস। ঘুরে এস।

সুদাস কোথায় যাবে তা জানতে চায় [illegible] মনী, কখন ফিরবে তাও না। [illegible] এস বাবু।

সমস্ত ব্যাপা[illegible] সুদাসের খুব আশ্চর্য লেগেছিল। সে বলেছিল, যেতে বলছিস বলে নয়—যাবার আমার সত্যিই খুব দরকার। তুই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলি, তাই এমন করে হেসে আবার বিপদ বাড়ালি। আমি আবার আসব। কিন্তু তুই? তোর জন্যে যে কো[illegible] ব্যবস্থা করা হল না।

ডলেকামিনী মধুর করে হেসে বলেছিল, কিছুই করতে হবে না বাবু, আমি পাহাড়ী, তারও ওপর মেয়েছেলে না[illegible]

অর্থাৎ জীবনসমস্যা তার কাছে কিছু নয়।

বিস্মিত হলেও সুদাস আর কথা বাড়ায় নি। শু[illegible] বলেছিল, আমার সঙ্গে যেতে চাইলে আমি বাধা দিতা[illegible] না। তোকে চেনা আমার হল না রে, কিন্তু অসম্ভব ভাল লাগে তোকে।

ডলেকামিনী মাথা নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ, তা জানি তবু তুমি যাও। যেখানে মন চায় যাবে।

সেই ডলেকামিনী! আজ এতদিন পরে এ কোথা[illegible] খুঁজে বার করল সুদাসকে! সুদাস তাকিয়ে দেখ[illegible] মেয়েটার চেহারার বাঁধুনি ঠিক সেই একই রকম আছে বয়স যেন বাড়ে নি।

হুহু করে ঝড়ের ঝাপটা আসছে। দমকা বাতা[illegible] আধ-খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ঢুকছে ঘরে। গুম[illegible] করে মেঘ ডেকে উঠল। তারপরেই চড়-বড় চড়-ব[illegible] করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল বাংলো[illegible] টিনের চালায়।

ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সুদাস গায়ের চাদর বেশ জুত ক[illegible] গায়ে জড়িয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও ডালিম।

আগে এমন আদর করেই ডালিম বলে ডাক[illegible] সুদাস। ড[illegible]কামিনীর মনে বুঝি তোলপাড় শুরু কর[illegible] সুদা[illegible] যে আনন্দ চেপে রাখতে চাইছে সেটা বু[illegible] [illegible]র চেপে থাকতে পারছে না ডলেকামিনী। এখন যে বেশী লজ্জাটা তাকে ডালিমের মত আরও সুন্দর করল।

দরজাটা বন্ধ করে এসে দাঁড়াতেই সুদাস নিজে[illegible] [illegible]ার একটা জায়গা হাত দিয়ে সমান করে বলল, বস

ডা[illegible] রাঙা হয়ে ডলেকামিনী [illegible]সের পায়ে কাছে বসল [illegible] সখান থেকে [illegible]কের উপর এ[illegible]

...ল। বুকের মধ্যে কান পেতে বুঝি ডলেকামিনী ...সের মনের গুড়গুড় শব্দ শুনছে। বাইরেও মেঘ ভীষণ ...গুড় করে চলেছে। হয়তো আজ ঢালবে প্রবল। ...সের ঢল যেমন নামে তেমনই নামবে হয়তো।

আশ্চর্য! এমনই এক দিনে সুদাসকে দেখেছিল ...কামিনী। তখন দুপুর পার হয়ে যাচ্ছে। ঝাঝাড়ির ...টার উপরে সেদিন দাঁড়িয়েছিল সুদাস। দু দিকে ...র হাঁকডাকে গর্জনে অন্য সব আওয়াজ ঢাকা ...ছে।

সুদাসের সঙ্গীরা এত বেলা পর্যন্ত কোথায় কী করছে, ... চিন্তার বিষয়। দীর্ঘ ষোল ঘণ্টার ক্ষুধায় সুদাসের ...ভুঁড়ি জ্বলছে। চোখ দুটো আর খুলে তাকাতে ...ছে না। মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ...ক এমনই সময়ে সুদাসের পিছন থেকে কাঁপা কাঁপা ...য় একটি মেয়ে ডাকল, বাবুজি!

সুদাস ফিরে তাকিয়ে দেখল, একটি ষোল-সতেরো ...রের মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার একটা বেতের ...লা। কিছু চিঁড়ে আছে ডালাটায়।

মেয়েটি সলজ্জ হেসে মাথা নীচু করল। বলল, থোড়া ...ড়া—খানস! বাবুজি!

সত্যিই খিদেয় পেট জ্বলছে, তবুও এই মেয়েটির কাছ ...কে খেতে যেন বাধছিল সুদাসের। সুদাস লক্ষ্য করে ...। বন্যায় ভাঙা অসংখ্য পরিবারের মধ্যে একটি ...রিবারের ভিতর থেকে উঠে এসেছে এই মেয়েটি। ...স্নাত অর্ধভুক্ত সুদাসের ব্যবস্থায় এই পরিবারগুলি ...াময়িক আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু সে তো এখান থেকে ...নেক দূরে। পাক্কা মাইল খানেক হবে।

চোখ খুলে সুদাস তাকাতে পারছে না। মাথা তুলে ...ড়াতে পারছে না আর। তবুও সে বলল, না।

মেয়েটি এবার চোখ তুলল। বুভুক্ষু শীর্ণ মুখের সঙ্গে ...ন এ দৃষ্টির অনেক তফাত আছে। মেয়েটির গায়ে ...ল একটা লাল রঙের ব্লাউজ আর জীর্ণ একটি ... ...খে দীঘা...র ধুলো ময়লার ছাপ ... স্বাস্থ্য ও ...প্তি ক্ষুধার ... ...ও হতে গিয়ে যেন পারে নি।

চোখের নজরে বয়সের গুণ উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটি নেপালী। দেহের রঙে সোনার জলুস। দেহের মাংসে যে পাহাড়ী নদীর ঝাঁপামি, তা দেখেই বোঝা যায়। অনাহারের জন্যেই ষোল-সতেরোর ধাক্কাটা দেহের গহীনে ঘুরে মরছে।

সুদাসের চাউনি দেখেই মেয়েটি সামান্য একটু হাসল। আবার বলল, বাবুজি, তুমি ভুখে মরলে আমরাও যে মরব।

সুদাস এবার হেসে ফেলল: বাঃ, বেশ বলেছ। কি নাম তোমার?

মেয়েটির দেহে বুঝি থমকে থাকা বয়সটা ছলকে উঠেছিল। সুদাস মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই একান্ত অপরিচ্ছন্ন মেয়েটির সর্বাঙ্গে যেন কেমন একখানি সম্পূর্ণ সৃষ্টি ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে আছে।

হাত পেতে চিঁড়ে নিয়েছিল সুদাস। মুঠো মুঠো মুখে দিতেই মেয়েটির বয়স-ভাঙা গলা কেঁপে কেঁপে মধু ছড়িয়েছিল: মিঠা ছই ন।

মিঠা নাই এই কথাটাই বলেছিল মেয়েটি। চিঁড়ে-ঠাসা মুখে হাসতে গিয়ে এক রকম শব্দ করেছিল সুদাস। যৌবনের ভরা-দমকের শব্দ—যে শব্দে প্রাণটা হাততালি দিতে থাকে বলে মনে হয়।

ক্লান্তিটা ক্লান্তি না হয়ে আনন্দ হয়েছিল, ক্ষুধাটা তীব্র যন্ত্রণা আর দাহ না ছড়িয়ে সুধা এনে দিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিঁড়ে খেয়ে সুদাস বলেছিল, জল? জল খাব যে।

তাই তো জল কোথায়! মেয়েটি বলে, থোড়া বসনস্ বাবুজি। মেয়েটি ঘুরে এদিক ওদিক তাকায়।

কিন্তু সুদাস জানে এক মাইলের মধ্যে পানীয় জল পাওয়া যাবে না। সুদাস এবার কাছাকাছি এসে মেয়েটির কাঁধে হাত রাখে। মেয়েটির নত মুখটি তুলে ধরে বলে, চল। তোমার আর সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসি।

ঠিক ...ই সময়ে জল ভেঙে সুদাসের খোঁজে এসেছিল ... ...য়েরা। তাদের সঙ্গে যেতে যেতে সুদাস ... ... জানিয়ে দিয়েছিল আবার আসব। কিন্তু আবার কি এসেছিল সুদ...

সেবার সুদাস আপলচাঁদের ...ণ্যে মরেই যেত।

সময়ের খেয়াল না করেই হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। সামনে যে আপলচাঁদের ভিতর দিয়ে পথ আছে, সে পথের কথা বুঝি মনে ছিল না সুদাসের। বনসীমান্তে যখন সে এসে পড়েছে তখন সূর্য জলছে মাথার উপরে। সুদাসের আন্দাজ ছিল সূর্য ডুবতে ডুবতে জঙ্গলের ও-মাথায় সে পৌঁছবে। কত সময় আর লাগবে! ঘণ্টা আড়াই!

কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে সব যে চেনা পথ। কিছু দূর গিয়ে দেখা গেল সব পথেই যে পায়ের চিহ্ন। কোন্ পথে যাবে সুদাস? এক পথ ধরে কিছু দূর গিয়ে পায়ের চিহ্ন যে হারিয়ে যায় আর পথটাও একটা মস্ত ঝোপের কাছে ফুরিয়ে যায়। আবার অন্য পথ ধরে হাঁটে সুদাস। কিছু দূর গিয়েই দেখে ওপর থেকে সরু মোটা লতা ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছের গোড়ায় জড়িয়ে জড়িয়ে পথকে উধাও করে দিয়েছে। সুদাসের কপালে ঘাম জমে। উপরের দিকে চেয়ে দেখে একটা পাখিরও হদিস মেলে না। শুধু নীচে ঝোপের মধ্যে প্রাণীদেহ নড়ে—ক্কক-ক্কক করে বন-মোরগ উড়ে পালায়।

খচমচ করে শুকনো পাতার শব্দ তুলে একা শুধু সুদাস চলে। ভয়াল ভয়ঙ্কর অরণ্যে গাছ-লতাপাতার এক নিশ্চুপ ষড়যন্ত্র আরক্ত চোখে চেয়ে থাকে। পথের পাশে যে সব ফুল চোখে পড়ে, সেগুলির আকারও কেমন ভয়-ধরানো। বড়, ভারী আর টকটকে রঙের। উপরের দিকে চাইলে ফল চোখে পড়ে—এবড়ো-খেবড়ো লম্বাটে বা গোল। বোঁটাগুলো ফলের আন্দাজে বেশ মোটা, বড় বেশী পুষ্ট। বদরাগী লোকের, দস্যি মানুষের মোটা থাড়া গর্দানের মত। কথাটা মনে হতেই সুদাসের হাসি পেয়ে যায়। সে সাদা ফুল খোঁজে আর চেয়ে চেয়ে দেখে এ পথে মানুষের পায়ের চিহ্ন আছে। কিন্তু চিহ্ন থাকলে হবে কি? ওপথ শেষ হয়ে যায় কোন গাছের গোড়ায় বা একটা খাদের পাড়ে। থেমে থাকে পথ। এতক্ষণে [illegible] হঠাৎ মনে [illegible] সুদাসের খেয়াল হয়—পথগুলো কাঠুরেদের আ[illegible] মধ্যে [illegible] প্রয়োজনে হয়েছে। যারা কাঠ কুড়োতে বা [illegible] করে। আর যারা মধু [illegible] বা বেত তুলতে আসে তারা এ পথ করেছে। [illegible] যাবে [illegible]থ ধরে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। কিন্তু এখন উপায়? রোদের তেজ ঠাহর করা যাচ্ছে না। জঙ্গলের অন্ধকার পথে গেলেও সুদাস চোখে অন্ধকার দেখে।

পায়ের পাশে ফোঁস করে ওঠে একটা কী! হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরার আগেই ডোরাকাটা মোরগ-আকারের কি একটা পাখি কাছাকাছি একটা ঝোপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীচে। তার পরেই শুরু হয়ে যায় ঝাপটা-ঝাপটি। সাপে আর কি পাখিতে যেন লড়াই লেগেছে। দুটোই ভয়ঙ্কর। এইবার হয়তো বাঘ ডেকে উঠবে, গণ্ডার ছুটে আসবে, ঝোপের পাশে মুখ বাড়িয়ে অজগর হয়তো নিশ্বাস টানবে!

মরিয়ার মত সুদাস ছুটতে থাকে। পথ আর পথ। এক পথ থেকে দ্রুত অন্য পথ বদল করে সুদাস ছুটতে থাকে।

হঠাৎ কানে আসে ঝোপঝাড় ভেঙে কি একটা যেন ছুটে আসছে। ছুটে পালাতে গিয়ে সুদাস একটা গাছের গায়ে টক্কর খেয়ে মাথায় চোট পেয়ে পড়ে যায়। চেতনা লুপ্ত হয়ে যাবে নাকি! সুদাসের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে সুদাস চোখ খুলে বিস্মিত হয়ে যায় ঝুঁকে চেয়ে আছে একজোড়া মানুষের চোখ—মিষ্টি, মমতামেদুর। সুদাসের কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হতে থাকে। মাথার চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে একটা মায়ার হাত যেন বুলিয়ে যাচ্ছে মাথায়, অপূর্ব স্পর্শ। বেশ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সুদাস। তারপরে একসময়ে তড়াক করে উঠে বসে। এটা তো আপলচাঁদের অরণ্য! এখানে কী হতে চলেছিল যেন কিছুক্ষণ আগে!

ওই [illegible]তো সামনে দিয়ে নেমে চলেছে একটা নদী। বড় [illegible]ড় পাথরে ঘাঘরার ঘূর্ণি ছড়িয়ে ফুলিয়ে জল [illegible]লেছে। জল কেমন টলটল বৃষ্টির মত। বন বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল। রহস্যময় অরণ্যের এও বুঝি এক রহস্য। শেষ হয়ে এলেই শেষ সে হতে চায় না। নইলে সাম[illegible] আর একটু গেলেই মনে হয় [illegible] শেষ। কিন্তু তা নয়! [illegible]র সীমা আর [illegible]। চতুর্দিক

দুর্ভেদ্য হয়ে আছে এই নিয়তকালের অরণ্য। সের মুখের উপর চোখ রেখে বসে আছে কে এই ? এ তো সেই মেয়ে! ঝাঝাণ্ডির বাঁধে যে তাকে খেতে দিয়েছিল—ডলেকামিনী!

সুদাস বসে বসেই দেখতে থাকে পাহাড়ী মেয়েটার লজ্জা পাওয়া চেহারাটা। তারপরে বলে, কি রে ম, এবারেও তুই! এখানেও তুই!

সুদাসের চোখে অপূর্ব সরল বিস্ময়। অতবড় একটা ড়া শিক্ষিতের এ যেন কেমন এক ধরনের সরলতা। মাঝে মাঝে চোখে ঘনায়, মনে ঘনায়। সুদাস তা কার করতে পারে না।

ডলেকামিনী কাঠের বোঝাটার ওপরে চেপে বসে। পর নদীর দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মুখ বলে, কাঠ-কুড়নে যানছু।—শব্দটা যেন পাথরের কলঝরনা যেমন আছড়ে ভেঙে পড়ে, ঠিক তেমনই।

সুদাস দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে ডলেকামিনীকে। টার সীমান্ত থেকে রাঙা রোদ এসে নদীপাড়ের গুলিকে জড়িয়ে ধরে।

ডলেকামিনী বলে, আমার কাঁধে ধর বাবু। চল, য় বনটা পার হয়ে যাই।

ডলেকামিনী অসঙ্কোচে তার ঝকমক সোনারঙের হাত য়ে বলে, ধরো।—হঠাৎ কি মনে হয়, বলে, একটু ও। আমার গা ধোয়া হয় নি। গা ধুয়ে আসি।

বিকেলের গা ধুতে নামে ডলেকামিনী। পাথরের গাত্রাবরণ খুলে রেখে বিরাট বিরাট পাথরের লে স্নান করে মেয়ে।

একটু একটু শীতলাগা শেষ বেলায় স্নান [illegible] এসে য়েছিল ডলেকামিনী। মোহাবিষ্ট হবে না প্রতি[illegible] । সুদাস বিচলিত হয়েছিল। মেয়েটির দু চোখে হাসি ঠিকরে পড়ছিল। কিংবা কোন একটা খেলার । সুদাসের চোখে সেই চোখের ইশারা হারিয়ে ই মেয়েটি ডাক দিল, এস।

টি দুটি [illegible] বুনো কি ফুলের [illegible] র মত ভর ভরে [illegible] আর দ্বিধা না করে সুদাস এগিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় সুদাসের বাহু নিজের বাহুর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটছিল।

বন পার হয়ে একটা বিরাট ভাঙনের মধ্যে নেমে যাচ্ছিল মেয়েটি। পাড় ভেঙে নামতেই নীচে বালি আর বালি। বালির পৃথিবী। সুড়সুড় করে পা ঢুকে যায়। সেখানে সেই বালিতে তলিয়ে যেতেও যেন আনন্দ পাচ্ছিল সুদাস।

এমনই কিছুদূর হেঁটে সুদাস দেখেছিল একটা নদী। তাতে জল আছে। নদীটা বিচিত্র। কোথাও এঁকে-বেঁকে পাথরের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলে, হারিয়ে গিয়ে আবার কোথাও সশব্দে আছড়ে ভেঙে পড়ে বিচিত্র খেলা খেলছে।

ছোট্ট একটা ডালপালায় ছাওয়া ঘরের সামনে এসে পড়েছে দুজনে। সন্ধ্যা তখন সবে নামল।

ডলেকামিনী বলল, ওই ঘরে আমরা থাকি।

তোমরা! তুমি আর কে?

মা।

সুদাস অবাক হল কম নয়। এটা ঠিক বনসীমান্ত নয়। বনের মধ্যে পার্বত্য নদীটার জন্যে এ জায়গাটা ফাঁকা। আসলে একটা বিরাট জঙ্গলের মধ্যের বিরতি মাত্র। এর মাঝখানে, একেবারে অরণ্যের মাঝখানে মানুষ এভাবে বাস করতে পারে—এইটাই বিচিত্র এবং প্রচণ্ড বিস্ময়ের।

কিন্তু সুদাস বিস্মিত হবে না, কারণ সে অনেক দেখেছে। বলল, তোমরা মা আর মেয়ে থাক এখানে?

ডলেকামিনী বলল, আর একজন থাকে।

সে কে?

মা তাকে এনে রেখেছে।—বলেই ডলেকামিনী চুপ [illegible]। আর কিছু বলার থাকলেও সে বলবে না।

[illegible] মান অন্ধকারে দেখা গেল, দূরে দুটি নুয়ে-পড়া [illegible] দেহ দুটো যেন উঠছে [illegible] র নামছে।

ডলেকামিনী বলল, মা আসছে [illegible]

প্রায়ান্ধকার বালুবেলায় দাঁড়িয়ে [illegible] মিনী বলে, বাবুজি, আমার ঘরে থাকবে তো? এখন তো আর

কোথাও যেতে পারবে না। সবদিকেই জঙ্গল, অনেক দূর গিয়ে শেষ হয়েছে।

তাড়াতাড়ি ডলেকামিনী বলেছিল, মা কিছু জিজ্ঞেস করলে তুমি কিছু বলবে না, যা বলবার আমি বলব।

সুদাস শুধু হেসেছিল। বলেছিল, মন্দ কি?

মায়ের বয়সে ভাটা পড়ে নি। দেহ তখনও সুঠাম। সুদাস দেখেই বুঝেছিল, এ স্থির যৌবনা।

একই ঘরে পাশাপাশি মাচানে চারজনে ঘুমিয়েছিল। পরের দিনে ডেরা বেঁধে দিয়েছিল জেঠা সিম্বা। ডলেকামিনীর মায়ের পোষা ছোকরা।

দিনের আলোতে ইচ্ছে থাকলেও সুদাসের ঘুরে বেড়াবার হুকুম ছিল না। ডলেকামিনী বলে দিয়েছে, যতদিন খুশী থাকো, কিন্তু জখমী মানুষটির মত থাকতে হবে। রোজ নিজের হাতে ডলেকামিনী বনৌষধি ঘষে দেয় সুদাসের ক্ষতে। অথচ সুদাস অস্বস্তি বোধ করে। বেশ অভিনয় করা হচ্ছে। কেমন এক ধরনের নতুন জীবন।

জেঠা সিম্বা পোষা মেষের মত ডলেকামিনীর আর তার মায়ের হুকুম খাটে। ডলেকামিনীর মা রীতিমত ধনী। নদীর উপর একটা গাড়ি-পারাপারের সেতু বেঁধে ডেরা করে বসে আছে। আর এ পথে গাড়িও চলে কম নয়। যত গাড়ি যায়, গাড়িপিছু আট আনা বারো আনা আদায় করে। পয়সা কম দিয়ে কোন গাড়িই ছাড়া পায় না। পাহাড়ী মেয়ের আকাশ-কাঁপানো কোন্দল সইবে এমন মরদ যারা গাড়ি চড়ে তারা নয়।

নদীপথটা ইজারা নিয়ে ভয়াল ভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যে রাণী হয়ে বসে আছে কৃষ্ণমায়া—ডলেকামিনীর মা। বন্যার পরে সব হারিয়েও এ মেয়ে এ[illegible] [illegible]সা করেছে।

[illegible] সুদা[illegible] [illegible] লক্ষ্য করছিল, মায়ের সঙ্গে জেঠা [illegible] যে ছোকরাটার যে সম্পর্ক, সেটা ডলেকামিনী সহ্য করতে পারে না। জেঠা সিম্বা ডলেকামিনীর সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করতে আসে। বারুদে আগুন পড়ার মত ফেটে পড়ে ডলেকামিনী।

এ পথে যত গাড়ি আসে, সবই প্রায় চেনা মানুষের। বিভিন্ন চা-বাগানের গাড়ি আসে। গাড়ির ড্রাইভার, গাড়ির আরোহীর মধ্যে অনেকেই গাড়ি থেকে ডেকে ডেকে আলাপ জমায় এদের সঙ্গে। বিশেষ করে ডলেকামিনীর সঙ্গে। ডলেকামিনী হেসে হেসে জবাবও দেয়। তাদের খুশী রাখে। কিন্তু যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ডলেকামিনী কেমন এক ধরনের চেহারা নিয়ে সুদাসের সামনে দাঁড়ায়। সুদাসের চোখও ব্যাকুল হয়ে কি যেন খোঁজে। সুদাস বলে, কি?

কেঁদে ভেঙে পড়ে সুদাসের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলেকামিনী। সুদাসকে আঁকড়ে ধরে হুহু করে কাঁদে আর ফুলে ফুলে অস্থির হয়। সুদাসের মুখে বুকে এই বন্য পাহাড়ী মেয়েটার উদ্দাম ক্ষোভ আছড়ে আছড়ে পড়ে।

একদিন সুদাসের মনে হয়, বড় অন্যায় করছে সে অবশ্য ন্যায়নীতির পুরনো সংজ্ঞায় বিশ্বাসী সে নয়। তবু এমন করে এক কুমারীর সরল বিশ্বাসকে সে যেন অসম্মা[illegible] করছে। এমনই মনের অবস্থায় ডলেকামিনী বলে বাবুজি, টিকারামের হাত থেকে আমায় বাঁচা[illegible] জেঠা সিম্বার হাত থেকে আমায় বাঁচাও।

সুদাস ধীর হাতে ডলেকামিনীর পেছনের ঝাঁকা[illegible] চুলে নাড়া দিতে দিতে একটু ভাবে। তারপর মন স্থি[illegible] করে। দৃঢ়ভাবে বলে, চল। আমার সঙ্গেই চল।

পরদিন সুদাস জেঠা সিম্বা ও কৃষ্ণমায়ার কাছে ব[illegible] ডলেকামিনীকে আমার সঙ্গে দিয়ে দাও।

অবাক হয়েছিল জেঠা সিম্বা ও কৃষ্ণমায়া। দুজনে[illegible] অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে নি। তারপরেই বলেছি[illegible] বিয়ে করবেন বাবু?

সুদাস সোজা ভাবেই বলেছিল, হ্যাঁ, বিয়েই কর[illegible] [illegible] কিছু বলার আছে?

অব[illegible] [illegible] মাত্রাটা একটু [illegible]শাই হয়ে[illegible] উপস্থিত জেঠা সিম্বা আর কৃষ্ণ[illegible] চোখেমুখে [illegible]

ক্রুর একটা মতলব খেলে গিয়েছিল তুজনের। সেটা
াসের তীক্ষ্ণ নজর এড়ায় নি। তবু কোমরে হাত
খে সুদাস দাঁড়িয়েছিল বুক চিতিয়ে।

কিন্তু রুখে দাঁড়াল ডলেকামিনী। কাছাকাছি
থাও ছিল সে। হঠাৎ ঝড়ের বেগে সামনে এসে
ড়িয়েছিল। বলেছিল, না। বাবুজীর সঙ্গে আমি যাব,
কিন এমনি। বিয়ে নয়, কিছু নয়। বাবুজী দয়া করে
মায় তুটি খেতে দেবে। আমি আর তোমার ঘরে খাব
, থাকব না। পাহাড়ী মেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল, তার
দ নিয়ে।

মা আর জেঠা সিম্বার দিকে চেয়ে জলে উঠেছিল
লকামিনী। টাকার থলি চুরি করে পালাতে পারত,
বিষয়ে সুদাসের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল ডলেকামিনী।
দাস বলেছিল, না থাক্। মাকে টাকার শোক দিয়ে
য়ো না। এমনই চল।

একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে উঠতে পারত, কিন্তু তা
তে না দিয়ে অতর্কিতেই সুদাসের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল
লেকামিনী। সুদাসের একটা চেনাজানা মানুষের
পে চড়ে চলে এসেছিল সে।

বাংলো বাড়িতে সুদাস থাকে তুদিন চারদিন।
বার আর এক বাংলোয় যায়। পোশাক-আশাকে
লেকামিনীকে মানিয়েছিল বেশ। ডলেকামিনীর রূপের
াগুনে তখন সুদাসের পাখা পুরোপুরি পুড়েছে।

কিন্তু সুদাস এক রকম। আবার একদিন বলে, চল
ার এক জায়গায় যাব। আসলে সুদাসের ডাক এসেছে
াজের। কোথায় যেন বন্যা আরম্ভ হয়েছে। কলকাতায়
যেতে হবে সুদাসকে, নানা জায়গা থেকে 'রিলিফে'র
্যবস্থা করতে হবে।

ফিরে এসে সুদাস দেখল, ডালিমের রূপ আরও
উপচেছে। কিন্তু কেমন যেন মন্থর আর অলস হয়ে
পড়েছে।

আবার অন্য কোথাও যেতে বললে বলে, আমাকে
রেখে যাও। ফিরে এসে নিয়ে যেয়ো।

আশ্চর্য হয় সুদাস! এ মেয়ে বাঁধে না, অধিকারের
চাপ দিয়ে অনর্থ বাধায় না।

অগত্যা সুদাস ডলেকামিনীর আপন সম্পর্কের জ্যেঠার
কাছে রেখে এসেছিল তাকে। জ্যেঠার বয়স হয়েছে কিন্তু
তখনও বেজায় ফূর্তিবাজ। দেহের বাঁধুনি মজবুত।
ইংরেজী কায়দায় কেতাদুরস্ত চা-বাগানের মুন্‌শী সে।
সুদাসের সঙ্গে অল্প সময়ের আলাপে বেশ জমে গিয়েছিল।
সুদাসের সঙ্গে ডলেকামিনীর সম্পর্কটা সুদাস খুব সঙ্কোচ
ভরেই জানিয়েছিল। বৃদ্ধ হেসেছিল প্রাণ খুলে।

তারপর বলেছিল, ওয়েল বাবু, ওয়েল! তোমার
সঙ্গে আমার মিল আছে।

কিন্তু কি মিল সে আর জিজ্ঞেস করে নি সুদাস।
তার তখন চলে যাওয়ার তাড়া।

আড়াল থেকে ডলেকামিনীর সঙ্গে অন্দরমহলের
আরও অনেক মেয়ের মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সুদাসের সেই চলে আসা।

এই ঘটনার পরে কতদিন পার হয়ে গিয়েছে।

আবার এতদিন পরে বাংলো বাড়িটায় এই রহস্যময়ী
নারী সুদাসের কাছে ফিরে এসেছে। সুদাস রাতের
মত ঘুম বিদায় করে দিয়ে নতুন করে দেখতে লাগল
ডলেকামিনীকে।

উত্তরের পাহাড় আর ঘন অরণ্যের মধ্য থেকে
তন্দ্রাজাগা একটা পাখির ডাক ভেসে এল। রাত্রির
মধ্যপ্রহর। অরণ্যপাহাড়ের খণ্ড পৃথিবীটা এই মুহূর্তে
...র দেখা উঠল।

ডেস্ট্রাক্টিভ এলিমেণ্ট

পল্লব সেনগুপ্ত

না, ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের সুবিখ্যাত বইয়ের আলোচনা শুরু করছি না। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন—তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেণ্ডার ওই অভিধাটি ব্যবহার করেছেন।

স্পেণ্ডার থেমে গেছেন তাঁর সমকালে এসে। অর্থাৎ জয়েস্ থেকে শুরু করে এলিয়ট্, পাউণ্ড, অডেন, কামিংস এবং স্বয়ং স্পেণ্ডার পর্যন্ত। এমন কি, ইএট্‌স্‌কেও তিনি ওই দলে টেনেছেন।

কিন্তু স্পেণ্ডারের বই বেরুনোর পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। লেখক হিসেবে দেখা দিয়েছেন এক নতুন গোষ্ঠী।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঁরা প্রত্যক্ষে 'নিহিলিজম্' প্রচার করেন না, পরোক্ষে অস্বীকার করেন নিজেদের প্রতিভাকেই। এই আত্ম-অবক্ষয়ের সুতীব্র প্রবণতা আজ-কাল-পরশুর সুপরিচিত কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন ভাবেই ফুটে উঠেছে—যার জন্যে তাঁদের সম্পর্কেও ওই অভিধা ব্যবহার করা হয়তো অনুচিত হবে না।

সার্ত্র, হেমিংওয়ে, ক্যাল্ডওয়েল, মোরাভিয়া,
সার্গ, নবোকফ, কামু, পাস্তেরনাক, ফাস্ট…

মাত্র কয়েকজনেরই নাম নমুনা হিসেবে নিলাম। পৃথিবীজোড়া নাম-ডাকওয়ালা এই সব কথাসাহিত্যিকদের লেখার প্রবণতাটা বিশ্লেষণ করলে, সাম্প্রতিক সাহিত্যে 'ডেস্ট্রাক্টিভ এলিমেণ্ট'রা কি পরিমাণ প্রভাব ছড়াচ্ছেন, সেটা উপলব্ধ হবে।

যে ক[illegible] তাদের সকলেরই কলমের জোর [illegible]। কিন্তু সেই শক্তির উৎপাদিত পণ্য পরিণত হয়েছে [illegible]ঙ্কেনস্টাইনে।

সার্ত্র কি মোরাভিয়া চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন তাঁদের প্রতিভার গুণে—কিন্তু তাঁদের লেখায় প্রাধান্য পেল দেহ-বাসনার তৃপ্তিবিহীন সচিত্র ব্যাখ্যানই! এঁদের লেখনীর মুনশীয়ানা, প্লটের গভীরতা, শিল্পীজনোচিত সূক্ষ্ম তুলির টান—এ সবই অনস্বীকার্য! কিন্তু এর সবটাই নষ্ট হল স্থূল দেহ-বিলাসের সরস বর্ণনায়।

ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়ে এঁরা কি নিজেদের প্রতিভাকেই প্রকারান্তরে অমর্যাদা করলেন না? প্রতিভার মর্যাদা-হানির অধিকার স্বয়ং প্রতিভাধরেরও নেই। তা হলে সেই অধিকার লঙ্ঘন করে এঁরা কি অমার্জনীয় অন্যায় করলেন না? ক্যাল্ডওয়েল এঁদের চেয়েও সজীব বর্ণনা করার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভারও অপচয় হল শুধুমাত্র নর-নারীর জৈব সম্পর্কের গা-পাক দিয়ে ওঠা বর্ণনায়।

সার্গ এবং নবোকফ বিকৃত প্রণয়ের চিত্র এঁকে তাকে বাস্তব বলে চালাতে চেয়েছেন। যেটা সুস্থ সামাজিক জীবনে দুর্ঘটনারূপে প্রতিভাত হয়, সেটা ব্যতিক্রম মা[illegible] এঁরা ব্যতিক্রমটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। বস্তুতপক্ষে এঁরা সার্ত্র-মোরাভিয়া ধারারই একটা প্রশাখা তৈরি করে চলেছেন।

"হেমিংওয়ের 'ব্রুট্যালিটি' এবং 'ম্যাসকুলীন ভাল-গারিটি' নিয়ে ড্রইং-রুম-বিলাসী আলোচনা অধুনাতন ফ্যাশন" [illegible], তার মূল্য আরও বেশী। অবক্ষয়ের ফাঁদে [illegible]ড়া প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই বোধ একমাত্র লোক, যাঁর লেখায় একটা সুনির্দিষ্ট জীবন-দর্শন খুঁজে পাই। (এ কথা অবশ্য বিতর্কের অবকাশ রেখেই বলছি, কারণ 'সার্ত্র'-র 'এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম' [illegible] [illegible]জনগ্রাহ্য—সেটা সন্দেহজনক।) হে[illegible]ওয়ে তাঁর শেষ [illegible]পির মুহূর্তে যদি মানুষের স্ব-প্রতিষ্ঠার বিজয় [illegible]ষণা করেছেন সানন্দ [illegible]নের মধ্যে—

তাঁর কাছে আমরা যা পেয়েছি, তাতে হতাশা গ্লানি মৃত্যুর আচ্ছন্নতায় জর্জর মানুষের ছবিই বেশী। তাঁর শক্তিধরের এ জাতীয় পরিণাম অনেকটাই অস্বাভাবিক নপীড়নের বন্য-আনন্দ নয় কি?……ঠিক এই জাতীয় নবহ রূপ-চিত্রণ করেছেন কামুও। এঁরা দুজনেই বেল-লরিয়েট'—বিশ্বের বিদগ্ধজনের স্বীকৃতি এঁরা ় করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, এই স্বীকৃতি কিসের ? হতাশার জীবন-দর্শন প্রচারের জন্যে কি? এঁদের প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয় বোঝেন যে, যে নশীলতার মূল ক্ষয়িষ্ণু জমির গভীরে, তা চিরস্থায়ী নয়। হলে কি এঁরা সজ্ঞানে এঁদের অমূল্য প্রতিভার অপচয় চ্ছেন না?

এ সব ছাড়াও আর এক ধরনের বিকৃতি এসেছে স্প্রতিক সেরা কথাসাহিত্যিকদের কারুর কারুর মধ্যে। ম করতে পারি পাস্তেরনাকের, হাওয়ার্ড ফাস্টের। ক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনার নামে, মানুষের স্বকীয়তার প্পাবাজির আড়ালে, একজন করছেন 'পৃথিবী-পলায়ন', ন্যজন সারা জীবন সর্বহারা মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়ে ষ্টি করলেন বটে মানুষের সত্যিকারের অধিকারের নবদ্য ইতিহাস—কিন্তু প্রতিভার সায়াহ্নে এসে, সারা ীবনের বিশ্বস্ত শুভবুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলে নিজের সৃষ্টিকেই প্রকারান্তরে জানালেন অস্বীকৃতি। রাজনীতির ছুরি দিয়ে প্রতিভার এই আত্মহত্যা একান্তই দুঃখের! কিন্তু এর কারণ কি? আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী আলোচিত উপন্যাসিকদের কেন এই পরিণতি? এঁরা সবাই কেন এভাবে বিকৃত-ক্ষুধার-ফাঁদে ধরা দিচ্ছেন বা দিয়েছেন?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, দুই শিবিরে বিভক্ত সমস্ত মানব-সমাজ যে-ভাবে সদাসশঙ্ক হয়ে আছে, তাতে উপন্যাসিকোচিত নির্লিপ্তি আসা বোধ হয় সম্ভব নয়। মারণাস্ত্রের ক্রমসঞ্চয়, বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতি এবং সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর বাইরে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক চাপ মানুষকে অভিভূত অব্যবস্থিতচিত্ত করে তুলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো জাতীয় পুনর্গঠনের [illegible] বেশী মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়েছে যে তার ফলে সেখানে শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ মানটা উন্নত হয়েছে বটে, কিন্তু তাও একটা বিশেষ নিরিখ পর্যন্তই।

সবচেয়ে বড় কথা, মানব-সভ্যতার নতুন মূল্যায়ন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান এখন চ্যালেঞ্জ করেছে ধর্ম এবং ইতিহাসকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে মানুষের সভ্যতার প্রেক্ষিতে, তার মূল ভিত্তিটাই নাড়া খেয়েছে বিজ্ঞানের হাতে। গ্রহান্তরের রহস্য আজ মানুষের বুদ্ধির নাগালে এসে পড়ছে—মৃতকে পুনর্জীবন দেওয়ার এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক প্রয়াসে সাফল্যের স্পন্দন শুনেছে বিজ্ঞান। এ-হেন পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম এবং ঈশ্বর—দুয়েরই 'ট্র্যাডিশনাল' আস্তিকতা সম্পর্কে অস্বীকৃতিসূচক দ্বিধার সৃষ্টি হয় না কি? অর্থাৎ, এর ফলে মানুষের এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের রূপটাই কি পালটে যায় না?

স্পষ্টতই, পৃথিবীজোড়া এই গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে এঁদের হতাশার নেই-নেই ভাব চরম প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন। যখন ইতিহাসের এবং ধর্মের পুনর্মূল্যায়ন অনিবার্য হয়ে নবতর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দিকে পা বাড়াচ্ছে মানুষ, তখন সাহিত্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়প্রবণতা কেন? পশ্চিমী সভ্যতার উগ্র-আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের বিকার, ভঙ্গুর সমাজ-জীবন এবং অব্যবস্থিত-যন্ত্রসামিল দিবা জীবন মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিতান্তই 'ordinary' করে তুলেছে। হাক্সলের ভাষায়, "Life is so ordinary that literature has to deal with the exceptional."* 'Ordinary'-র পর্যায় উত্তীর্ণ সেই 'exception'কে আনতে পারছেন না এঁরা। নতুন পৃথিবীর গঠনোন্মুখ পারিপার্শ্বিককে এঁরা অস্বীকার করছেন তাই।

এঁদের প্রতিভা তাই অপচিত। নতুন গোষ্ঠীর আসা [illegible]রে। কিন্তু কই, কোথায় তাঁরা?

* Aldous Huxley : Eyeless in Gaza

বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত শিশুপাঠ্য উপন্যাস ও নাটক

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮ এপ্রিল) 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' হলেও তা অংশতঃ শিশুপাঠ্যও ছিল। 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পর সম্পূর্ণ এবং অংশতঃ শিশুপাঠ্য পত্র-পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'পশ্বাবলী' (১৮২২) থেকে 'আর্য্যকাহিনী' (১৮৮১) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ওই সময়ের পত্রিকাগুলির মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৬), ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় শিশুপাঠ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে উপদেশ ও নীতিমূলক গল্প-কাহিনীর আধিক্যই লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি পত্রিকায় আবার একটু-আধটু খেলাধূলা, পশুপক্ষীর বিবরণ ও কৌতূহলোদ্দীপক নানারকম ঘটনাবিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাময়িক পত্রিকায় শিশু-সাহিত্য তখনও পর্যন্ত শিশুর পর্যায়েই ছিল, এ কথা বলা যায়। মৌলিক গল্প উপন্যাস বা নাটক, অর্থাৎ শিশুমনের প্রকৃত খোরাক ওই সমস্ত পত্রিকায় পাওয়া যায় না।

২

ইংরেজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা' পত্রিকার প্রকাশ বাংলার শিশুসাহিত্যের ইতিহাস—এমন কি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও একাধিক কারণে উ[illegible] বাংলার শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচ[illegible] । যাবে, 'সখা' প[illegible] বাংলা-[illegible]হিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় এবং পরিমাণের দিক থেকেও তা সুপ্রচুর। এই 'সখা' পত্রিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "'সখা' প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের সহায় বটে, কিন্তু এ 'সখা'র সাহায্য অনেক পলিত কেশ বৃদ্ধের পক্ষে অনবলম্বনীয় নহে। বালক বালিকার এমন সদ্বন্ধু দুর্লভ।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অত্যন্ত সহজ সত্যের স্বীকৃতি। প্রকৃতপক্ষে এই 'সখা' পত্রিকাই বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ।

৩

'সখা' পত্রিকায়, সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন স্বরচিত 'ভীমের কপাল' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসখানি 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত] এই উপন্যাসখানি বাংলা সাময়িক সাহিত্য ও শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবিশেষ।

প্রমদাচরণের এই উপন্যাসখানির পর 'সখা' পত্রিকায় ইংরেজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় রচিত একখানি শিশুপাঠ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়। শিশুসাহিত্যে এই দুটি ঘটনা তৎকালীন লেখকদের শিশুপাঠ্য গল্প উপন্যাস ও নাটকাদি রচনায় যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিল এ ক[illegible] নিঃসন্দেহেই বলা যায়। দুঃখের বিষয় এই দু[illegible]নি উপন্যাসই আজও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত [illegible]ছে। উপন্যাসখানি 'সখা' পত্রিকায় ইংরেজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মে-নবেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইতিমধ্যে বাংলার শিশুসাহিত্যের আসর বেশ জমে [illegible] [illegible]করবাড়ির একাধিক সাহিত্যরথী এবং

র অন্যান্য লেখকবৃন্দ শিশুসাহিত্যের দিকে অপেক্ষাকৃত চ মনোযোগী হয়েছেন। তার প্রকাশ দেখি া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' [১৮৮৫, । ১২৯২] পত্রিকায়। এই 'বালক' পত্রিকাতেই, কবি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশুপাঠ্য নাটক শিত হয়। এই নাটকগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র—ঙ্কা জাতীয়। আসলে এগুলি কৌতুকপূর্ণ লিনাট্য। এই ধরনের হেঁয়ালিনাট্য ইউরোপীয় লিতে শারাডে (charade) নামে একপ্রকার নাট্য-হিসাবে প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথই বোধ করি প্রথম, এদেশীয় শিশুসাহিত্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই নিস আমদানি করলেন। এদিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত 'বালক' পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখ-, এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। হেঁয়ালিনাট্যগুলি পরে অন্য কতকগুলি কৌতুকনাট্য র সঙ্গে একত্রে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' [ডিসেম্বর] গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এই জাতীয় রচনাগুলির বাংলা ১২৯২ সালের 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত াতাল' [জৈ্যষ্ঠ ১২৯২]-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই রচনাটি কেন জানি না, হাস্যকৌতুক গ্রন্থের সংস্করণে সংকলিত হয় নি।

খানে উক্ত উপন্যাস দুটি এবং হেঁয়ালিনাট্য রচনাটির াীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। কেন না কপত্রে প্রকাশিত প্রথম শিশুপাঠ্য উপন্যাস ও নাটক ব এদের যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও কৌলীন্য রয়েছে। অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া তাই আমাদের ষই প্রয়োজন।

৪

মদাচরণ সেন রচিত 'ভীমের কপাল' উপন্যাসের ভীম দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম নয়, এ কথা [illegible] য় রাখি। লেখকের বর্ণনানুসারী [illegible] ক্ষেপে াটি এইরকম। [illegible] নার দৌলতপুর বাজারে সতেরো বৎসর বয়স্ক বিপিন ও পনেরো বৎসরের ভীমেন্দ্র আলোচনারত। বিপিন ও ভীম পরস্পর বাল্যবন্ধু। কিন্তু স্বভাবের মিলেরই অভাব দুজনের মধ্যে। বিপিন স্থির, শান্ত, বিনয়ী; ভীম নামে যেমন, কাজেও তেমনি। বিপিনের বাড়ি বাখরগঞ্জ, ভীমের বাড়ি কলিকাতা। উভয়েই কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ে। উভয়েরই মাতুলালয় খুলনার দৌলতপুরের কাছাকাছি কোনও এক গাঁয়ে। দুর্গাপূজার ছুটিতে উভয়ের মাতুলালয়ে আগমন হয়েছে। কলিকাতাবাসী ভীমেন্দ্রের মনে স্বভাবতঃই পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছে। তাই সে মাতুলালয়ে এসে সব সময়েই খুঁতখুঁত করত এবং গ্রামবাসী ছেলেদের দেখলেই "বাঙ্গাল" বলত। ইতিমধ্যে একদিন ভাতের পাতে চুল পড়ার অছিলায়, রাত্রিতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই ভীমেন্দ্র মাতুলালয় ছেড়ে চলল।—[১ম অধ্যায়]

পথে বৃষ্টির মধ্যে ভীমেন্দ্র আশ্রয় নিল এক পাগলের আড্ডায়। পাগলের কাছে তাড়া খেয়ে ভীমেন্দ্র রাস্তায় রাত কাটাল, এবং পরদিন সকালে নিকটস্থ খেয়া পার হয়ে নদীর অপর পারে যেতে চাইল। কিন্তু কাছে পয়সা না থাকায় এবং পাটনী তিলকরামের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করার দরুন, পাটনী তাকে নিকটস্থ এক সদাশয় জমিদারের জাঁদরেল দেওয়ানের কাছে নিয়ে যায়। জমিদার সদাশয় হওয়ায় দেওয়ানের প্রতিপত্তি খাটত না। তাই তিলকরাম পাটনী যখন এই অল্পবয়স্ক ছেলেটিকে নিয়ে এল, দেওয়ানজী তখন জমিদারের অজ্ঞানতেই হুকুম দিল তথাকথিত 'ছোট ঘরে' ছেলেটিকে আটকে রাখতে। পরে জমিদার এ কথা শুনে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়ার [illegible] দিলেন। ভীমেন্দ্র ছাড়া পেল। কিন্তু ভীমেন্দ্রের পেটে [illegible] পড়ে নি। তাই জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে [illegible] বিভিন্ন দোকানদারের কাছে কিছু খাবার চেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। [illegible] চ দিন রাস্তায় কাটল। ক্রমে দুর্গাপূজার নবমী[illegible]ন ভীমেন্দ্র গোপালপুরের রাস্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়ল। এমন সময় গোপালপুরের নিকটবর্তী সুজনখালীর মিত্রবাবুদের ছোট

ছেলে দীনদয়াল মিত্র সেই পথে যাচ্ছিলেন। দীনদয়ালের পরিচয়—বয়স আঠারো, কলিকাতার মেডিকেল স্কুলে পড়ে, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে অগাধ বিশ্বাস। প্রতিবারের মত এবারেও দীনদয়াল পূজার ছুটিতে দেশের বাড়িতে এসেছে কিন্তু সুযোগ পেলেই দীনদুঃখীদের হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিয়ে বিনাপয়সায় চিকিৎসা করেন। গোপালপুরের রাস্তায় একটি অপরিচিত বালককে অচৈতন্য অবস্থায় দেখে দীনদয়াল ওষুধ দিলেন এবং বালকটি চৈতন্য ফিরে পেল। দীনদয়াল ছেলেটিকে তার বাড়িতে নিয়ে চললেন। ভীমেন্দ্রের বন্ধু বিপিন এসব কিছুই জানতে পারল না।—[২য়-৪র্থ অধ্যায়]

এই দীনদয়ালের মাতার ও ভগ্নির শুশ্রূষায় ভীমেন্দ্র সুস্থ হল। এবং প্রায় সাত-আট দিন দীনদয়ালের বাড়িতেই থাকল। নিজের বাড়ির মত ভীমেন্দ্র ব্যবহার পেল কিন্তু উদ্ধত ও চঞ্চল-স্বভাব ভীমেন্দ্র একদিন মাঝরাত্রিতে সেই বাড়ি ছেড়ে ভুলক্রমে অন্যের নিযুক্ত নৌকায় কলিকাতা গমনের উদ্দেশ্যে রওনা হল। ফলে কলিকাতার পরিবর্তে পৌঁছল এসে বগুড়ায়। বগুড়া থেকে কলিকাতায় যেতে হলে চৈতন্যগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হত গরুর গাড়িতে। এই গরুর গাড়িতে ওঠবার সময়েও ভীমেন্দ্র ভুল করল এবং পৌঁছল এসে রসুলপুরে। ভীমেন্দ্রের এই অসহায় অবস্থার কথা শুনে রসুলপুর গ্রামনিবাসী জনৈক হারাণ কর্মকার তার বাড়িতেই ভীমেন্দ্রকে আশ্রয় দিল।—[৫ম-৭ম অধ্যায়]

ইতিমধ্যে কিছুদিন পরে বিপ্রদাস বসু নামে জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক এলেন রসুলপুর বাজারে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে। এইখানেই হারাণ কর্মকার ও ভীমেন্দ্রের সঙ্গে বিপ্রদাসবাবুর পরিচয় হয়। বিপ্রদাসবাবু ভী[illegible] বগুড়ায় ফিরে যাবার জন্যে উপদেশ দি[illegible] সম্মত হল। বি[illegible]প্রদাসবাবু ভীমেন্দ্রকে স[illegible]লেন।—[৮ম অ[illegible]

বিপ্রদা[illegible] চেষ্টায় ভীমেন্দ্র এসে পৌঁছল বগুড়ায় বিপ্রদাসবাবুর [illegible]মাতা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হরিপদবাবুর বাড়িতে। বগুড়ায় এসে ভীমেন্দ্র এই বাড়িতেই আশ্রয় পেয়েছিল। তাই ভীমেন্দ্রকে ফিরে পেয়ে সবাই আবা[র] খুশী হল। ভীমেন্দ্র হরিপদবাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েদে[র] পড়াশুনা ঠিকমত দেখাশুনা করার দায়িত্ব পেল কিছুদিন পরে হরিপদবাবু ভীমেন্দ্রের কলিকাতায় যাওয়া[র] ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু পথে রঘুডাকাতের পাল্লা[য়] পড়ে ভীমেন্দ্র ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে পড়ল। ডাকাতে[র] দলের লোকেরা ভীমেন্দ্রকে তাদের সাকরেদ করবার চে[ষ্টা] করতে লাগল। কিন্তু ভয়ে ও জিদের বশে ভীমে[ন্দ্র] তাতে রাজী হল না। এজন্যে তাকে অনেক অত্যাচ[ার] সহ্য করতে হল। কিন্তু ওই ডাকাতদের আশ্রিতা এ[ক] বৃদ্ধা ভীমেন্দ্রকে নিজের নাতির মত স্নেহ করত, এই [illegible] ভীমেন্দ্রের সান্ত্বনা। অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভীমেন্দ্র প্রা[য়] এই কি "ভীমের কপাল" বলে নীরবে চোখের জল ফেল[ত]। নিরুপায় হয়ে একদিন সে নিকটস্থ পুকুরের জলে ঝাঁ[প] দিল মরবার আশায়। কিন্তু কাছেই তার বন্ধু বি[পিন] তাকে অনুসরণ করছিল, এ কথা সে জানত না। বি[পিন] ইতিমধ্যে বহু জায়গায় সন্ধান নিয়ে অবশেষে [illegible] গাড়োয়ানের কাছে খবর পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে [illegible] হাজির হয়েছে। যাই হোক, বিপিন তার বন্ধু ভীমেন্দ্র[কে] জল থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলল। ক্রমে ভী[illegible] জ্ঞান ফিরলে তাকে কলিকাতার ঠিকানায় গোপ[illegible] লেখবার জন্যে লেফাফা ও পেনসিল দিয়ে গেল।—[১০ অধ্যায়]

ভীমেন্দ্রের চিঠি পেয়ে বিপিন ভীমেন্দ্রের এক কা[কার] কাছে গেল পরামর্শের জন্যে। ভীমেন্দ্রের কাকা [illegible] আলী[illegible]র একজন নামজাদা উকীল। তাঁর প[illegible] [অ]নুযায়ী পুলিসকে খবর দেওয়া হল। এবং ভী[illegible] চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ দেখে খিদিরপুরের কোনও দুর্ভেদ্য অঞ্চল থেকে রঘুডাকাতকে গ্রেপ্তার করা[illegible] বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন বিচ[ারক]।

[ভী]মেন্দ্র কাকার সঙ্গে মায়ের কাছে চলল। রঘুডা[কাতে]র আশ্রিতা সেই বৃদ্ধা ভী[মেন্দ্র]কে দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। [illegible] কাকা [illegible] সঙ্গে নিলেন বাড়ির কাজের জন্যে। ইতিমধ্যে ভী

তার মৃত্যু হয়েছে। ভীমেন্দ্রের বিধবা মা তাঁর রানিধিকে ফিরে পেয়ে এত দুঃখের মধ্যেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।—[১১-১২শ অধ্যায়]

এইখানেই প্রমদাচরণ সেন রচিত 'ভীমের কপাল' নামক উপন্যাসের সমাপ্তি। এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে কেবলমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় ভীমেন্দ্র বরাবরই প্রতিটি বিপদ থেকেই উদ্ধার পেয়েছে। তাই ছেলেরা যেন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, এবং অযথা পিতামাতার মনে দুঃখ দিয়ে বাড়ি থেকে অজানা পথে পা না বাড়ায়, এবং বিপদের সময়ে কর্তব্যজ্ঞান না হারায়।

'সখা' পত্রিকার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রমদাচরণ সেনের জীবনী পড়লে বোঝা যাবে, এই 'ভীমের কপাল' উপন্যাসে প্রমদাচরণের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে। প্রমদাচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় এবং গ্রামবাসী জনৈকা কুমারীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করায় পিতার সঙ্গে মতবিরোধ হয়। ফলে তিনি কলিকাতায় চলে আসেন এবং ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী জনৈক বন্ধুর গৃহে তাদের ছেলেমেয়ে পড়ানোর পরিবর্তে আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এ বাড়িতে তিনি নিজের বাড়ির মতই ছিলেন, এ কথা প্রমদাচরণের ওই জীবনী থেকেই জানা যায়। ওই ঘটনার দীর্ঘদিন পরে প্রমদাচরণ স্বগ্রামে বেড়াতে যান এবং এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠেন। অনুতপ্ত পিতা এই খবর পেয়ে স্বহস্তে রেঁধে প্রমদাচরণকে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। প্রমদাচরণ আহারে বসে নিজের কৃতকর্মের জন্যে এবং পিতার এই অনুতাপের জন্যে নিজে এত অনুতপ্ত হন যে, চোখের জলেই আহারপর্ব অসমাপ্ত রেখে সেই রাত্রেই কলিকাতায় রওনা হন। এই ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসে উক্ত "ভীমেন্দ্রে"র মাতুলালয় ত্যাগের সাদৃশ্য বর্তমান। এই বগুড়ায় ভীমেন্দ্রের "হরিপদবাবু"র বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সঙ্গে কলিকাতায় প্রমদাচরণের জনৈক ব্রাহ্ম-বন্ধুর বাড়িতে ওই ধরনের কাজের সাদৃশ্য বিদ্যমান। মোট কথা উপন্যা[illegible] নানা প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলে তার স্বভাব-চরিত্রের শোধন করবার চেষ্টা করা এবং তাকে শিক্ষা সদুপদেশ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। শিশুপাঠ্য উপন্যাস হিসাবে এইখানেই উপন্যাসখানির সার্থকতা বিদ্যমান। উপন্যাসখানিতে মফস্বল-বাংলার, খুলনা জেলার কয়েকটি গ্রামের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

৫

ওই 'সখা' পত্রিকায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে (মে-নবেম্বর) বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'অজিতকুমার' নামে একটি আদর্শ-মূলক শিশুপাঠ্য উপন্যাস (১২শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নায়ক বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের এক "কয়লা-খনকে"র পুত্র অজিতকুমার। 'অজিতকুমার' উপন্যাসের কাহিনী সংক্ষেপে এই রকম :

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের কোনও এক কয়লা-খনকের কুটির। সযত্নে মার্জিত সেই কুটিরের সর্বত্র একটি শান্তশ্রী বিদ্যমান। উক্ত কয়লা-খনক রামরূপ সর্দার। তারই জ্যেষ্ঠপুত্র অজিতকুমার। তার "বর্ণ সুন্দর অঙ্গ দৃঢ় ও সরল। চক্ষু বৃহৎ ও উজ্জ্বল। একবার মাত্র দেখিলেই বুঝা যায় অন্যান্য বালকেরা সচরাচর যে সকল উপাদানে গঠিত হয় অজিতকুমার সে প্রকৃতির বালক নহে"। অজিতকুমার মধ্যম ভ্রাতা অরুণকুমার এবং কনিষ্ঠা ভগিনী নামে ও স্নেহে বাড়ির সবারই 'আদরিণী'। আদরিণী রূপেগুণে ধন্যা হলেও সে শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি থেকে বঞ্চিত। বয়স নয় বৎসর; অজিতকুমারের তেরো, অরুণকুমারের এগারো। এরা অল্প বয়সেই মাতৃহীন। তাই সংসারের সবচেয়ে কঠিন কাজ রন্ধনপর্বের ভার এই অল্প বয়সেই আদরিণীর উপরেই ন্যস্ত।

একদা ঝড়-জলের রাত্রিতে রামরূপ সর্দারের শক্ত মজবুত ঘরখানি ভেঙে পড়ল নিদ্রিত রামরূপেরই এক কা[illegible]রে। অজিত অরুণ ও আদরিণী কোনও [illegible]পেল। পিতার অসাড় দেহ নিয়ে তখন তারা অসহায় কান্নায় ভেঙে [illegible]র সংসারে নেমে এল দুঃখের ছায়া এখান থেকেই। [illegible]ম-২য় অধ্যায়]

কিন্তু অজিতকুমার বিপদে ধৈর্য হারানোর মত ছেলে

নয়। সারারাত্রি রাস্তায় কাটিয়ে পরদিন সকালে প্রতিবেশী ও পিতার সহকর্মী গণেশের আশ্রয় গ্রহণ করল। পরে গণেশের পরামর্শে কয়লাখনির ডাক্তার রামরূপ সর্দারের চিকিৎসা করতে লাগলেন। প্রতিবেশী গণেশের বাড়ির সকলের চেষ্টা ও সেবাযত্নে রামরূপ ক্রমে সুস্থ হতে লাগল। কিন্তু ডাক্তার বলে গেলেন পুনরায় কর্মক্ষম সে হতে পারবে না। এই খবরে দৃঢ়চিত্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ অজিতকুমার ছোট ভাই অরুণকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করল—খনির সাহেবের কাছে গিয়ে কাজের চেষ্টা করতে হবে। এভাবে গণেশের গলগ্রহ হয়ে থাকা বেশীদিন চলবে না। [৩য় অধ্যায়]

প্রতিজ্ঞামত অজিতকুমার ভাই অরুণকুমারকে সঙ্গে নিয়ে সাহেবের বাড়ি চলল দেখা করতে। সাহেব রামরূপ সর্দারের পুত্রদের এই সাধুসংকল্পের কথা শুনে তাদের কাজ দিতে রাজী হলেন। তারা কাজ পেল। সেই সাহেবের বাড়িতেই জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ মিশ্র অজিতকুমারের মুখে তাদের দুঃখের কথা শুনে পথে এসে অযাচিতভাবেই নগদ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করলেন। অজিতকুমারের এই সাফল্যে তার পিতা দুঃখের মধ্যেও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ভগবানের কাছে অজিতের মঙ্গল প্রার্থনা করলেন।—[৪র্থ অধ্যায়]

ওই জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ [কাহিনীর অনেক জায়গায় গজেন্দ্রনারায়ণ আছে; অতএব যে কোনও একটি মুদ্রণপ্রমাদ।] যে অযাচিতভাবে সাহায্য করলেন তার কারণ, প্রথমতঃ, তিনি গরীব-দুঃখীর 'মা-বাপ', তা ছাড়া অজিতের ভগিনীর মত তাঁরও একটি মূক ও বধির কন্যা আছে। তাঁর আশা, অজিতের ছোট বোনটির সঙ্গ পেয়ে যদি সে খুশী হয়ে ওঠে! তাঁর কথামত অজিত একদিন তার বোনটিকে নিয়ে গেল জমিদারের বাসায়। আদরিণীর সঙ্গ পেয়ে কন্যার মুখে হাসি ফুটল। জমিদার অজিতকে [illegible] সাহায্য করতে লা[illegible]

ইতিমধ্যে অজি[illegible] কদিন খনিতে কাজের সময় কয়লার মধ্যে রুপোর খনি আবিষ্কার করল। খনির পরিদর্শক কর্মচারীকে অজিত এই খবর দিল আবিষ্কারের আনন্দে এবং পুরস্কার পাবার আশায়। কিন্তু সেই স্থানটি ঠিকমত খনি-পরিদর্শককে দেখাতে না পারায় কর্মচারীটি অজিতকে মিথ্যাবাদী বলল। অজিত মনে খুব আঘাত পেল। অজিত যখন সেই কর্মচারীটির কাছে তার আবিষ্কারের সংবাদ দিতে যায় তখন তার পিতার সহকর্মী গণেশ তার দলবলসহ অপর চারজন মজুর সেই রুপোর খনির মুখ বন্ধ করে দেয়। খনির মুখ সবগুলিই প্রায় এক রকম হওয়ায় এবং অজিত ঠিকমত সাহেবকে যথাস্থানে হাজির করতে না পারায় সে মিথ্যাবাদী অপবাদ পেল। ক্ষোভে অজিত রাত্রিতে বাড়ি ফিরল না। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দেখতে লাগল কোথায় সেই রুপোর খনির মুখ। এই সময়ে অজিত আগের সেই চারজন দুবৃত্তের হাতে পড়ে। তারা নানা প্রলোভন ও ভয় দেখায় সাহেবকে রুপোর খনি না দেখাতে। আসলে সেটি রুপোর খনি নয়, পুরাকালের কোনও এক হিন্দু দেব-মন্দিরের রুপোর চূড়ো। যাই হোক অজিত কিছুতেই লোভ ও ভয়ে দুবৃত্তদের কথায় রাজী না হওয়ায় তারা অজিতকে খনির মধ্যে আটকে রেখে চলে গেল। কিন্তু ভুলক্রমে ফেলে গেল খনির একটি আলো।—[৫ম-৭ম অধ্যায়]

সেই আলোর সাহায্যে অজিত কয়লাখনি থেকে উদ্ধার পেল। বাড়ি ফিরে বাবাকে সব কথা খুলে বলায় তিনি দুবৃত্তদের ধরিয়ে দেবার জন্যে এবং অন্যায়ের প্রশ্রয় না দেবার কথাই মনে করিয়ে দিলেন। কিন্তু বিনা প্রমাণে শুধু অজিতের কথায় খনি-কর্তৃপক্ষ কাউকে কোন রকম গুরুতর শাস্তি দেবে না। তাই কি করবে স্থির করার জন্যে বাবার কথামত অজিতকুমার গেল সেই জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণবাবুর কাছে। জমিদার সমস্ত ব্যাপার শুনে খনি-কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলেন এই ঘটনাটি। ফলে কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় দুবৃত্তদের অপরাধ প্রমাণিত হল[illegible] [illegible]বৃত্তরা তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি পেল, এবং অজিতকুমার খনি-কর্তৃপক্ষ[illegible] পুরস্কৃত হল।—[৮ম-১১শ অধ্যায়]

সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ অজিতকুমার এখন তিরিশ াকা বেতনের খনি-পরিদর্শক। অজিতের ভাই অরুণ-ুমার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে। বৃদ্ধ রামরূপ ুত্রসুখে অভিভূত। কিন্তু তার সহকর্মী ও আশ্রয়দাতা, াথচ দুর্বৃত্ত গণেশের দুরবস্থার একশেষ! অজিতকুমারের াছে গণেশের স্ত্রী এসে বলল, "গণেশের আর বাঁচিবার ম্ভাবনা নাই, অন্তিমকাল উপস্থিত। ঘোরতর বিকার, কবল এক একবার অজিতকুমার বলিয়া চেঁচাইয়া ঠিতেছে।" কিন্তু অজিত তার একদা আশ্রয়দাতা গণেশকে তজ্ঞতার সঙ্গে বলে, "বিপদের দিনে তুমি আমাদিগকে াচাইয়াছ। আমি তোমার সন্তানদিগের ভরণপোষণ রিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে উঁহারা অনাহারে রিবে না।" গণেশের মৃত্যু হল। অজিতকুমারের াহিনী শেষ হল এই বলে—"যাহারা বালককালে াপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরালম্ব দেখিয়া সংসার অন্ধকারময় দেখেন, অথবা যাহারা ভয়ের সামান্য বাতাসে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, অজিতকুমার তাহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিতে পারিবে, এই আমাদের বিশ্বাস।" —[১২শ অধ্যায়]

এইখানেই 'অজিতকুমারে'র কাহিনী শেষ। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল এই কাহিনীতে বিষয়বস্তু পরিবেশনে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা-সাহিত্যে একেবারেই নতুন। অনেকেই জানেন, বাংলা-সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কয়লাকুঠির দেশে' প্রথম খনিমজুরদের কথা উপস্থিত করেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। শৈলজানন্দবাবুর কত আগে বিপিনবাবু তা' বাংলা-সাহিত্যের আসরে শিশুপাঠ্য হিসাবে পরিবেশন করেছেন, তা পাঠকবৃন্দ এখন জানতে পারবেন। এ বিষয়ে বোধ করি একটা অতিপ্রচলিত ভুল ধারণার অবসান হল এই প্রবন্ধের মাধ্যমে। কাহিনীর বাস্তবতায় ও

উপভোগ্যতায় এই শিশুপাঠ্য উপন্যাসখানি বয়স্কদেরও মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস করি। এ কথা অল্প ক্ষমতার পরিচয় নয়।

৬

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালিনাট্যগুলি 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশের পরে 'হাস্যকৌতুক' [ডিসেম্বর ১৯০৭] গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাঁসপাতাল' [বালক, ১২৯২ বৈশাখ] নামক হেঁয়ালি নাট্যরচনাটি 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সংকলিত হয় নি। কিন্তু এই রচনাটিই প্রকাশকাল অনুসারে জ্যেষ্ঠ, এ কথা সহজেই বলা যায়। এখানে ওই রচনাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হল। মাত্র চারটি দৃশ্যে এই হেঁয়ালি নাট্যরচনাটির মূল কাহিনী এই রকম :

প্রথম দৃশ্যে হারু নামে একটি গ্রাম্য বালক জনৈক ডাক্তার সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম না পেয়ে হাঁস চুরি করতে গিয়ে তার পা ভাঙে। বালকটি তার কৃতকর্মের কথা পিতাকে বলতে চায় না। কিন্তু পিতা তার পুত্রের স্বভাব ভালই জানেন। এদিকে বালকটির মাতা তাকে তালের বড়ার লোভ দেখান।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেল, হারুর পেট মোটা হয়ে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। হারু বলে, তালের বড়া খেয়ে এই রকম হয়েছে। অথচ হারুর গলা থেকে পেট পর্যন্ত এক থলির ভিতরে রয়েছে সেই ডাক্তারের হাঁস। হারুর পিতা হারুর পেট টিপতেই হাঁসটি ক্যাঁক্ করে ওঠে। হারু বলে, বড্ড ব্যথা করছে। পিতা বলেন, এখনই হাঁসপাতালে চল।

তৃতীয় দৃশ্যে, হারুর পিতা স্ত্রীকেও তাই বোঝাচ্ছেন। হারুর মা সভয়ে হারুর পেট টিপতেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে শব্দ হল। তিনি আরও ভীত হলেন। হারু বলে, ও কিছু নয়, তালের বড়া বাইরের লোকদের কথাবার্তা শুনে ডাকাডাকি করছে। এদিকে পাড়ার জনৈক মুখুজ্যে মশায় বললেন, হারুর পেটের ডাকে পাড়ার লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, হারুর পেটে বাত শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই তিনে মিলেই যত গোল বাধিয়েছে। অতএব একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

চতুর্থ দৃশ্যে হারুর পিতা হারুকে নিয়ে ডাক্তার সাহেবের হাসপাতালে গেলেন। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন "টোমার পেটে কি হইয়াছে?" হারু বলে, কিছু হয় নি। ডাক্তার বলেন, "টোমার ভয়ানক ব্যামো হইয়াছে।" এই বলে ডাক্তার হারুর পেটে খোঁচা দিতেই 'ক্যাঁক্ ক্যাঁক্' শব্দ বেরুল। ডাক্তার বললেন, "টোমার চুরি ব্যামো হইয়াছে; ছুরি না ডিলে সারিবে না!" এই বলে ডাক্তার সাহেব হারুর পেট চিরতে উদ্যত হলেন। তখন হারু তাড়াতাড়ি তার ঝোলা থেকে হাঁস বের করে দিল। হারু বলল সাহেবকে, তোমার এ হাঁস কোন মতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভাল। হারুর পেটের ব্যামো সেরে গেল।

এইখানেই হেঁয়ালিনাট্য সমাপ্ত। এই কাহিনীটির মধ্যে হাঁস, পা ও তাল কথাগুলি এমন ভাবে যোগ করে 'হাঁসপাতাল' কথাটি বলা হয়েছে যে তা শুধু শিশুমনের কাছেই নয়, বয়স্কমনের কাছেও তার আবেদন একেবারে অগ্রাহ্য নয়। কত সাধারণ জিনিস নিয়ে এমন উপভোগ্য রচনা সম্ভব তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও বহুমুখী প্রতিভার এ অতিসাধারণ একটি নমুনামাত্র।

বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত শিশুপাঠ্য উপন্যাস ও নাটকের একটা নির্দিষ্ট আলোচনার মাধ্যমে এখানে তৎকালীন শিশুপাঠ্য উপন্যাস ও নাটক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া গেল। বৃহত্তর পাঠক-সমাজকে পূর্বোক্ত উপন্যাস দুটি সম্পর্কে সজাগ করাই এ-প্রবন্ধ অবতারণার প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ দ্রষ্টব্য ॥

বাংলা সাময়িক পত্র (১-২ খণ্ড); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সখা' ১৮৮৩; প্রমদাচরণ সেন সম্পাদি[illegible]।

'সখা' ১৮৯০; অন্নদাচরণ সেন সম্পা[illegible]

'বালক' ১৮৮৫ (১২৯২ বাং); [illegible] দেবী সম্পাদিত

প্রমদাচরণ সেনের জীবনী; সখা কার্য প্রকাশিত।

হাস্যকৌতুক; রবীন্দ্রনাথ (ডিসেম্বর, ১৯০৭)।

রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপা[illegible] ([illegible]স্করণ)।

প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন ঃ [শ্রী]ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয়, ১২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, [ক]লিকাতা-৬। আট টাকা।

বৌদ্ধ চর্যাপদের কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী [হ]ইতে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ-আজু গোঁসাইয়ের কাল [অর্থা]ৎ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় নয় শত বৎসরের বাংলা [কা]ব্যের ইতিহাসই বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগের [ই]তিহাস। এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা স্বর্গীয় [দী]নেশচন্দ্র সেন হইতে এ যুগের কৃতী গবেষকেরা অনেকেই [দে]খাইয়াছেন কিন্তু শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত এই প্রথম রসবিচারের দিক [দি]য়া এই সকল কাব্যের সৌন্দর্যবিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ধারণ [ক]রিয়া সাহিত্যরসিক পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। [বা]ংলা কাব্যের রামায়ণ মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি [অ]নুবাদ শাখা এবং চৈতন্যভাগবত-চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি [জ]ীবনীশাখা বাদ দিয়া বাকি সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাব্যের ও [র]চয়িতা কবিদের মাধুর্য ও বিশেষত্ব যথাক্রমে উদ্ঘাটিত [ক]রিয়া তিনি মৃত ও বিস্মৃত পুরাতনকে নূতন জীবন-রসে [স]ঞ্জীবিত করিয়াছেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী' ও গ্রাম্য কবিদের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'ও এই আলোচনায় যথাযোগ্য [স্থা]ন পাইয়াছে। বহু আগাছাসমাকীর্ণ বিশাল বাংলা কাব্যারণ্য হইতে সুস্বাদু ফল ও সুরভি পুষ্প আহরণ ও পরিবেশন করিয়া তিনি প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক করিতে পারিয়াছেন—এখানেই তাঁহার গ্রন্থের সার্থকতা। এ বিষয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের তিনি যোগ্য উত্তরসাধক।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার ঃ শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬। বারো টাকা।

গঙ্গার প্রবল প্রবাহে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিলেন, গাঙ্গেয় রবীন্দ্রনাথের দলগত প্রতিপত্তির তোড়ে বাংলার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এতকাল পরে দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠি[ত করিবার] গৌরব শ্রী[র]থীন্দ্রনাথ রায় অর্জন করিলেন [র]ব[ী]প্রবাহ-বিরোধী এই প্রভৃত আয়াসসাধ্য সাহিত্যকর্মের জন্য ডি. ফিল. সামান্য পুরস্কার; লেখককে ডি. লিট.-ভুক্ত করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বাড়িত।

এই গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায় সুচিন্তিত ও প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ। যে দরদ ও শ্রদ্ধা লইয়া লেখক রাহুগ্রস্ত দ্বিজেন্দ্রলালকে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশ করিয়াছেন সে দরদ ও শ্রদ্ধা তিনি তাঁহার গ্রন্থের পাঠকদের মনেও সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন—ইহাই তাঁহার রচনার সার্থকতা। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিসত্তা ও কবিপ্রাণ কত বড় ছিল, তাঁহার মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ও ঋজু ছিল তাহা এ যুগের মানুষদের অজ্ঞাত থাকাতে বাংলা দেশের বড় ক্ষতি হইয়াছে। রথীন্দ্রনাথের সাধনালব্ধ 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বাঙালীকে আর একটা পথের ইঙ্গিত দিতে পারিবে যাহা বল্গাহীন ভাবের প্লাবনে পিচ্ছিল নয়, যে পথ আশ্রয় করিলে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ানোও সম্ভব।

কবি মোহিতলাল ঃ শ্রীহরনাথ পাল। এস. ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা আট আনা।

কথারম্ভ, রূপানুধ্যান ও প্রকৃতিপ্রীতি, প্রেম ও জীবন, দেহাত্মবোধের স্বরূপ-কথা, শিল্পসাধনা ও সিদ্ধি এবং কথাশেষ—এই ছয়টি অধ্যায়ে শিষ্য হরনাথ পাল গুরু মোহিতলালের কবি ও সমালোচক সত্তার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই "লোকোত্তর কবি"কে আবার "লোকপ্রিয়" করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ডক্টর সুশীলকুমার দের সঙ্গে আমরাও বলি "ইহা শুধু অনুরাগীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়; সাহিত্য-রসিকের মর্মগ্রাহিতায় মোহিতলালের কবিতার বিচিত্র রসরূপ [এই গ্রন্থে] উজ্জ্বল ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে।" স. কা. দা.

বরণীয় ঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ক[লিকাতা]-১২। পাঁচ টাকা।

প্র[থি]তনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় তাঁহার নবপ্রকা[শিত 'বর]ণীয়' পুস্তকে

স্মৃতিকথার ভঙ্গীতে বাংলাদেশের কতিপয় শ্রেষ্ঠ মানুষের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ও সম্পর্কের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহাদের কথা তিনি লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশবিশ্রুত ব্যক্তিরা রহিয়াছেন, তেমনই জনজীবনে অর্ধ বা স্বল্পজ্ঞাত এমন কি অনামী একাধিক ব্যক্তির কথাও লিপিবদ্ধ করিতে তিনি ভোলেন নাই। কিন্তু স্বল্পখ্যাত বা অনামী হইলেও চরিত্র-মাহাত্ম্যে ইঁহাদের জীবন সমুজ্জল, আর সেই কারণেই লেখক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের আলোচনার পাশে এই বরণীয় পুরুষদের কথাও মোটামুটি সবিস্তারে বলিয়াছেন। এইরূপ কতিপয় মানুষ হইলেন অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ, গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস, দেশনেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। লেখক তাঁহার পিতৃদেব ও বাল্যের গুরুমহাশয়দের পুণ্যও এইসঙ্গে কীর্তন করিয়াছেন। সব কয়টি স্মৃতি-কথার মধ্য দিয়াই একটি বড় আদর্শের দ্যোতনা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, আর ওই আদর্শের জন্যই গ্রন্থটি যথার্থ পাঠযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থকার অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন। কোথায়ও কষ্টকল্পনা নাই বা বক্তব্যের আড়ষ্টতা নাই। প্রতিটি আলোচনার মধ্যে একটি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও গুণগ্রাহী মনের পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার শ্রদ্ধাপরায়ণতা তাঁহার গুণগ্রহণের ক্ষমতা হইতেই উপজাত হইয়াছে। লেখককে অনেকস্থলে নিজের কথাও বলিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই আত্মকথনের ভিতর আত্মপ্রচারের ভঙ্গী আদৌ নাই। অত্যন্ত অকপটে অথচ অতিশয় বিনম্রচিত্তে তিনি কখনও কখনও আলোচনার মধ্যে আপনাকে টানিয়া আনিয়াছেন—নিজেকে বড় করিবার জন্য নহে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বভাববৈশিষ্ট্য সমধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য। ইহাতে তাঁহার রচনাকুশলতা প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাগল মহাশয়ের এই জাতীয় রচনাগুলিকে এক ধরনের খণ্ডচিত্র বলা যাইতে পারে। ইংরেজী thumb-nail-sketch-এর ইহারা স্বগোত্র। তবে এই চিত্রগুলি পাঠকমনকে শুধু বিনোদিতই করিবে না, অনু[illegible]ও করিবে। নবীনকালের পাঠকবর্গকে আদর্শবাদ[illegible] উদ্বুদ্ধ করিয়া[illegible]মত প্রচুর উপাদান বইটির মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এমন একখানি মহৎ উদ্দেশ্যে পরিপূরক গ্রন্থ ঘরে ঘরে আদৃত হওয়া উচিত।

নারায়ণ চৌধু[রী]

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজঃ ডক্টর অরুণকুম[ার] মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২, বঙ্কিম চ্যাটা[র্জি] স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা।

রবীন্দ্রযুগের প্রথম স্তরে বাংলা কবিতা-রচনায় যাঁ[রা] যশস্বী হয়েছিলেন তাঁদের, অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধা[ন], যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস প্রমুখ কবিদে[র] হাল আমলে আমরা, বলতে গেলে, ভুলতেই বসেছি[।] আধুনিক কবি বলে সাম্প্রতিককালে যাঁরা পাঠকসাধারণে[র] দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই অগ্রজ ক[বি]সমাজকে স্বীকার করতে সম্মত নন। কবি মোহিতলা[ল] তাঁর কবিভ্রাতাদের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে একদা কি[ছু] আলোচনা করেছিলেন—কিন্তু তিনি ছাড়া আর কে[উ] কোনও সাহিত্যিক বা সাহিত্যাধ্যাপক, রবীন্দ্রযুগে[র] প্রবীণ কবিসমাজ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনও আলোচ[না] লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রযুগের প্রথম স্তরে[র] কবিসমাজ সম্বন্ধে আলোচনাগ্রন্থ লিখে সাম্প্রতিক বাংলা[র] বহুদিনসঞ্চিত একটি জাতীয় ঋণ পরিশোধ করলেন।

রবীন্দ্রযুগের প্রথম স্তরের কবিসমাজকে [illegible]তি 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ' নামে অভিহিত করেছেন[।] 'রবীন্দ্রানুসারী' নামটা নিয়ে কিছু বাক্‌বিতণ্ডা হ[তে] পারে। ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাও হয়তো আছে। কি[ন্তু] রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম, শিল্পরীতি, প্রেমচেতনা[,] স্বাদেশিকতার তত্ত্ব—এ-যুগের কবিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে [illegible] করতেন বলেই এঁদের 'রবীন্দ্রানুসারী' বলা হয়েছে[।] এ-সম্বন্ধে অরুণকুমার লিখছেন: 'প্রথম মহাযুদ্ধের পরব[র্তী] পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তাঁ[কে] কেন্দ্র করে যে কবি-পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল, তাঁদের বলি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ। এই কবিদের মধ্যে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় যা তাঁদে[র] একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। এঁদের কাব্য-পরিচয় দেও[য়া] যেতে [পা]রে এই ভাবে: প্রাচীন কাব্যধারার মধ্যে নবী[ন]ত্বের উদ্ঘাটন, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অবিচ্ছে[দ্য] সম্বন্ধ স্থাপন, সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনধারাকে বহনোপযো[গী] সংবেদনশীলতা ও চরিত্রদান এবং গ্রামজীবনের প্র[তি] আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ। এঁদের কবিতায় লক্ষ করি রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে অবিচল নিষ্ঠা, সৃষ্টি ও মঙ্গলে গভী[র] আস্থা, [illegible] শেষ বিজয়ে বিশ্বাস।'

অন্য ভাষায় বলা যায়, বৈদেশিক বিলাসতত্ত্ব ও [illegible]ব্যানুসরণে এবং স্বাদেশিক জীবনতত্ত্বের বিরুদ্ধে উদ্ধত [প্র]তিবাদ ঘোষণায় এঁরা নাস্তিক বা উন্নাসিক ছিলেন [না], বরং ফাণ্ডামেণ্টালি যা সত্য, যা সুন্দর, যা শ্রেয়, [ভা]রতীয় দিব্যবোধের মহিমায় যা প্রোজ্জ্বল—রবীন্দ্রনাথের [ম]ত তা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, বরণ করেছিলেন, এইজন্য [তাঁ]রা রবীন্দ্রানুসারী। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, [তাঁ]দের কবিকর্মের মধ্যে কোনও স্বাতন্ত্র্য-ই ছিল না। [র]বীন্দ্রানুসারী হয়েও এ যুগের কবিদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, [রু]চিগত পার্থক্য এবং রীতিগত ও ভাবগত স্বাতন্ত্র্য যে [ক]র ছিল, অরুণকুমার তা স্পষ্টভাবেই প্রদর্শন করেছেন। [গ]ভীর শ্রদ্ধা যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কবিকর্ম তিনি [প]র্যবেক্ষণ করেছেন, বিচার করেছেন। তাঁর আলোচনার [ম]ধ্যে কোথাও অন্ধ স্তাবকতা নেই, অকারণ পাণ্ডিত্য-[প্র]কাশের অহমিকা নেই, উন্নাসিক মনোবৃত্তির অত্যাধুনিক [প্র]তি-নাস্তিক্যও নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভার তুলনায় [র]বীন্দ্রানুসারীদের প্রায় সকলকেই Minor Poet বলে [গ]ণ্য হতে পারে—এই বিষয় সম্পর্কে অরুণকুমার গভীর [স]ঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সঙ্গেই আলোচনা করেছেন। অনাগত [কা]লে কে মেজর হবেন, কে মাইনর হিসাবে গৃহীত [হ]বেন, আজই স্পষ্টতর বলা সম্ভব নয়, তবে অরুণকুমারের [যু]ক্তি ও মনোভাব আমি শান্তভাবেই বোঝার চেষ্টা [ক]রেছি। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত যে, সব [দে]শে ও যুগেই মাইনর কবি থাকেন, এবং মাইনর [ব]ললেই তাঁকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয় না। Dr. Hugh Walker-এর একটি বচন উদ্ধৃত করে ডক্টর অরুণকুমার বুঝিয়েছেন, ইংলণ্ডে শেক্সপীয়রকে যদি 'রাজকবি' বলা যায়, তবে তাঁর রাজসভায় আর সব [স]দস্যই মাইনর কবি; এ হিসাবে মিলটন-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-[শে]লি-কীটস-ব্রাউনিঙ—সবাই মাইনর পর্যায়ে পড়েন। [র]বীন্দ্রনাথকে কবিসম্রাট হিসেবে গ্রহণ করলে তাঁর তুলনায় [য]তীন্দ্র-মোহিত-নজরুল প্রমুখ কবিরাও মাইনর হিসাবে [গ]ণ্য হবেন। আবার যতীন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল বা [ন]জরুলকে যদি আধুনিক যুগের কবিকুলের 'পুরোধা' বলা [স]ঙ্গত হয়, তবে পরবর্তী কালের একাধিক বিখ্যাত কবিতালেখককেও মাইনর পর্যায়ে রাখা অসঙ্গত হবে না।

আসলে আমরা রবীন্দ্রযুগেই আছি, রবীন্দ্র-রাজসভার [আ]মরা সকলেই ছোট বড় সদস্য—এই হিসাবে রবীন্দ্রা-[নু]সারী আমরা সকলেই। আমাদের বাক্‌ভঙ্গী কিছু [ব]দলেছে, আঙ্গিকরীতির পার্থক্য ঘটেছে, কিন্তু [illegible] [ঠে]কে শিখে শিখে পরিণামে আমরা জীব[ন]দৃষ্টির দিক থেকে কেউ বামপন্থা বেয়ে, কেউ দক্ষিণপন্থা দিয়ে সেই এক ধ্রুবপন্থার অভিমুখে অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক মানবত্ব-বোধে ও সর্বজাতিক প্রেমচেতনায় আস্তিকের আশ্বাস নিয়েই অগ্রসর হয়েছি।

ডক্টর অরুণকুমারের 'কবিসমাজে' এ-বিশ্বাস আভাসিত। এই জন্য অত্যাধুনিক দম্ভ ও গোঁড়ামির দৈন্য সর্বতোভাবে তিনি পরিহার করেছেন। সহজ সরল তথ্যপ্রধান ও যুক্তিগর্ভ তাঁর রচনাবলী; মন্তব্য প্রকাশে শান্তশ্রী সংযম ও সহনশীল রসবোধ তাঁর রচনাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ' কাব্য-পাঠকসমাজে, ছাত্র-সমাজে এবং অধ্যাপক মহলে আদৃত হবে, আলোচিত হবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে সজনীকান্ত দাস—মোট তেরোজন বিখ্যাত কবির আলোচনা এ-গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি রচনাই সুলিখিত, নিরপেক্ষ বিচার-পদ্ধতির আলোকে সমুজ্জ্বল। এমন একখানি মনোজ্ঞ ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থ হাতে পেয়ে সত্য সত্যই আমি পুলকিত হয়েছি, উপকৃতও হয়েছি।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

মানববিকাশের ধারা : প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। বারো টাকা।

মানবজাতির অভ্যুদয়, বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস-সম্বলিত এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি বাংলা জ্ঞানবাদী সাহিত্যে এক অভিনব মূল্যবান সংযোজন। লেখক শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী বহু পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করে আদিম কালের মানুষের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে বিবিধ সূত্র থেকে বিচিত্র তথ্য সংকলন-পূর্বক তাদের এক আধারে এনে বিধৃত করেছেন এবং তার ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ খুব বেশী রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অন্ততঃ এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমন সুবিহিত পরিকল্পনা সমন্বিত পূর্ণ-আয়তন ও সাধু অভিপ্রায়ের বই যে ইতঃপূর্বে লেখা হয় নি সে কথা একপ্রকার জোর করেই বলা চলে। লেখককে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই—প্রথমতঃ এমন একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল বলে এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি তাকে সফল রূপদান করতে পেরেছেন বলে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যখন তথাকথিত রস[illegible]র বান ডাকবার উপক্রম তখন শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রচুর অধ্যয়নপুষ্ট তাঁর জ্ঞাননিষ্ঠ মননের দ্বারা ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ইতি[হাস] ও সমাজতত্ত্বের

সংমিশ্রণে রচিত এই বিশিষ্ট গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকসমাজকে উপহার দিয়ে বাঙালী পাঠকের একটি মহদুপকার সাধন করলেন। তাঁর এই প্রয়াস সব দিক দিয়ে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

গ্রন্থটির পরিকল্পনায় প্রথমে স্থান পেয়েছে পৃথিবীর আবির্ভাব ও পৃথিবী গ্রহের একটি বিশেষ পরিণতির স্তরে জীবনের উদ্ভবের কাহিনী। কী করে অনেকগুলি ভূ-বিপ্লব আর তজ্জনিত জল-হাওয়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবের আবির্ভাব, জীবের বিকাশ ও জীবদেহে নানাবিধ পরিবর্তনের সূচনা হল তার এক বিস্তারিত কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত পরের অধ্যায়গুলিতে বিবৃত হয়েছে। ভূস্তরের পরিবর্তিত বিন্যাস অনুযায়ী এক-এক যুগে এক-এক ধরনের জীব ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলবার চেষ্টায় প্রাণীদেহে দেখা দিয়েছে ক্রমবর্ধমান জটিলতা আর সংহতি, জীবজগতের এই উদ্বর্তন ও বিবর্তনের কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও মনোজ্ঞ। কেমন করে এককোষী জীব বহুকোষী জীবে পরিণত হল, দেহে রক্তের স্থান হল কখন, আদিম ইতিহাসের কোন পর্যায়ে জীবদেহে সুস্পষ্ট নার্ভতন্ত্রের সূত্রপাত হল, জীবের পাখনা থেকে কেমন করে পা গজাল, উদ্ভিদের বিকাশ ও রূপান্তর, সরীসৃপের আধিপত্য, অতিকায় সরীসৃপদের অবলুপ্তি, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জয়যাত্রা—এই সব প্রাচীন জীবজগতের ইতিহাসের একান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যরাজি গ্রন্থকার একের পর এক বইটিতে উন্মোচিত করেছেন।

তারপর পৃথিবীতে মানুষের আদিমতম পূর্বপুরুষের নিকট জ্ঞাতিত্বসম্পন্ন প্রাণীর আবির্ভাব হল। প্রাণীতত্ত্ব-বিদদের বিবর্তন আর নৈসর্গিক নির্বাচনের সূত্র অনুযায়ী এই প্রাণীগোষ্ঠী থেকেই ধীরে ধীরে দেখা দিল মানুষের আদিম পূর্ব-পুরুষ। তারপরের ইতিহাস ডারউইন, ওয়ালেস, লামাক, টি, এইচ, হাক্সলী প্রমুখ প্রসিদ্ধ প্রাণীবিজ্ঞানীদের কল্যাণে আজ সভ্যজগতের নিকট সুপরিচিত। এখানে সে ইতিহাস সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন নেই। লেখক মানবজাতির বিকাশের এই প্রাথমিক অধ্যায়টির উপরও যথেষ্ট মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। তারপর একে একে আদিমানবের জীবনযাত্রা, মানুষের মস্তিষ্ক বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ, মানুষের ভিতর সৌন্দর্যবোধ ও ঈশ্বরানুভূতির উন্মেষ, ভাষার আবির্ভাব, মানুষের সামাজিক বৃত্তির স্ফুরণ, জাতবিচারের মনোভাব, আদিমানবের সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা, মানবসমাজের প্রথম বিপ্লব কৃষির অভ্যুদয়, নগরসভ্যতার গোড়াপত্তন, ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার ইত্যাদি প্রাচীন ইতিহাসের সব কয়টি উল্লেখযোগ্য সুচিহ্নিত স্তর বেয়ে লেখক তাঁর কাহিনীর সূত্র টেনে এনেছেন সুমের মিশর ও সিন্ধু-সভ্যতার প্রান্তদেশে এবং এখানেই তিনি তাঁর গ্রন্থের উপসংহার করেছেন। এ এক চমকপ্রদ ও অবিচ্ছেদে মনকে টেনে ধরে রাখবার মত কাহিনী। এমনতর কাহিনীর আকর্ষণ অন্যবিধ কাহিনীর আকর্ষণের তুলনায় কোন অংশে কম প্রবল নয়, বরং খতিয়ে দেখলে, প্রবলতর। এই গ্রন্থের একটি দ্বিতীয় খণ্ড অবশ্যই রচিত হওয়া আবশ্যক। লেখক সেই খণ্ডে মানবসভ্যতার ইতিহাসকে তার আধুনিকতম পর্যায় পর্যন্ত টেনে আনবেন বলে আমরা আশা করি।

বইয়ের ভাষারীতি ও পরিভাষা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। লেখকের ভাষা মার্জিত যথাযথ ও সুবিন্যস্ত। কিন্তু বাক্যরীতি অতিরিক্ত ঘনসংবদ্ধ ও শব্দ-ব্যবহার সংস্কৃত-ঘেঁষা হওয়ার ফলে প্রাঞ্জলতার কিঞ্চিৎ অভাব ঘটেছে বলে মনে হয়। অর্থবোধে আরও সহজতা আনতে পারা যেত যদি বইটি সাধু ভাষায় ও আরও সরল ভাষায় রচিত হত। এ[illegible] বইটি যখন সকল স্তরের পাঠকের হিতার্থে রচিত, নিছক সাহিত্য-পাঠকের জন্য উদ্দিষ্ট নয়, তখন আরও সহজ সুবোধ্য ভাষায় গ্রন্থটি প্রণীত হবার পথে কী বাধা ছিল? দ্বিতীয়তঃ বইটি আষ্টেপৃষ্ঠে পরিভাষা-কণ্টকিত, অ[illegible] সেই সব পরিভাষার অধিকাংশেরই ব্যাখ্যা দেওয়া [illegible] লেখক ধরেই নিয়েছেন যে পাঠক এই সকল পরিভাষা[র] সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞান-পাঠে অনভ্য[স্ত] সাধারণ পাঠকের মুখ চেয়ে লেখক পরিভাষাগুলির কোন[্টি] কী অর্থ বহন করে তা বোধ হয় বুঝিয়ে দিলে পারতেন। তাতে হয়তো বৃহদায়তন গ্রন্থের আরও কিঞ্চি[ৎ] আয়তনস্ফীতি ঘটত, কিন্তু এই গ্রন্থের প্রকৃতি ও অভিপ্রা[য়] বিচার করে এই শ্রম ও ব্যয়বাহুল্য স্বীকার ক[রে] নেওয়াই সঙ্গত হত। যাই হোক, দ্বিতীয় সংস্করণে এ সব অপূর্ণতার শোধন হবে বলে আশা করি। ইত্যবসরে এই মূল্যবান গ্রন্থটি সকলেরই পড়া উচিত এবং পড়[লে] তাঁরা উপকৃত হবেন সে কথা অবশ্যস্বীকার্য।

নারায়ণ চৌধু[রী]

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগা[ছিয়া], কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। [ফো]ন : ৫৬-২[illegible]

৩২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৬৬
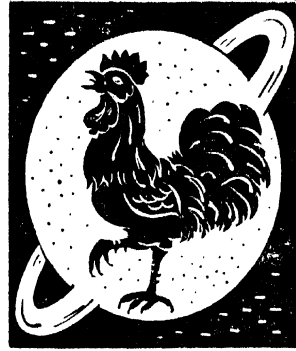
সংবাদ-সাহিত্য

।বর্ষ

গোপালদা লিখিয়াছেন,

"ভায়া হে, দীর্ঘকাল তোমার সংবাদ না পাইয়া ব্যগ্র ছিলাম। অবশ্য লালচীনের হামলায় এভারেস্ট-চূদেশ-শোভী স্বর্ণকিরীটী রংবাক-মন্দিরচ্যুত হইয়া মার মনে যে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কোনও ছুতেই আর আমার কিছুই আসিয়া যায় না; সু-অথবা-সংবাদে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা বিরাগ নাই। থাপি পরম্পরায় যখন জানিতে পারিলাম, তুমি দেড় সেরও অধিককাল হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী আছ এবং মান্য চৌ-এন-লাই-পদরজপূত পবিত্র নববর্ষ ১৩৬৭ লেও তোমাদের বর্ষশেষ-চৈত্রসংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' হির হয় নাই তখন আর উত্তর-গোগৃহের গোধনলোভী কৌরব-নিগ্রহকারী পাণ্ডবদের মত অজ্ঞাতবাসে স্থির কিতে পারিলাম না। তোমার শারীরিক তত্ত্বের জন্য হ—কারণ তিব্বতীয় পীতবাস (yellow-robe) মাদের কল্যাণে সে তত্ত্ব এখানে বসিয়াই পাইতেছি—মার কিঞ্চিৎ ক্লেশ-লাঘবের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বে আত্মপ্রকাশ করিলাম।

ভায়া হে, ... বঙ্গাব্দের নববর্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে "নববর্ষ" শীর্ষক একটি ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, ১৩০৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' তাহা মুদ্রিত দেখিতে পাইবে। দেখিবে কবি লিখিয়াছেন—

'অধুনা আমাদের কাছে [য়ুরোপের আদর্শমতে] কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি।...কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ যে উপায়েই হউক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক একটা জাতিকে পাইয়া বসে তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন, দুর্গম হিমালয়-শিখরে যে লোমশ ছাগ এতকাল নিরুদ্বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকস্মাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বস্ত-চিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন পক্ষী এতকাল জনশূন্য তুষার-মরুর মধ্যে নিবিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল,—অকলঙ্ক শুভ্র নীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহি... পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে,—এবং আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব [শ্বেত-] সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।'

দেখিবে ৫৮ বছরের ব্যবধানে ঋষিকবির সকল উক্তিই

আজ পর্যন্ত সত্য আছে—কেবলমাত্র চীন সম্বন্ধে উক্তিটি ছাড়া। প্রাচীন চীনও সহসা আধুনিক কাজের লোক হইয়া শ্বেত-সভ্যতাবাহীদের মত দুর্গম হিমালয়ের শিখরে শিখরে দাপাদাপি শুরু করিয়াছে। 'শনিবারের চিঠি'র বাঁধানো ফাইল যদি তোমার হাতের কাছে থাকে, ১৩৬২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠার তলানি কবিতা "ভাই-ভাই" পড়—

"পঞ্চশীলের উপাসনায় তোমরা কত ধৈর্যশীল,—
তোমরা কত আদেখ্‌লা তাই দেখ্‌ল ক্রুশভ-
বুলগানিন ;
সদর ছিল খোলা, এবার অন্দরেরও খুলল খিল—
নয়া সড়ক তৈরি হবে ভারত-রুশে via চীন।"

ভায়া হে, ক্রুশভ-বুলগানিনের পদরজগৌরবে অধীনের হুঁশিয়ারিতে তোমরা তখন কান দাও নাই। মাওসেতুংকে স্টালিন-ম্যাণ্ডধারী বলিয়া ভ্যাংচাইয়াছ, চৌ-এন-লাইকে চীনা হোটেলে চাউ-চাউ খাইতে খাইতে উপহাস করিয়াছ—আজ নববর্ষে একটু প্রণিধান করিয়া দেখ, অতিকায় শবদেহ যাহাদের মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়াছে তাহারাই আজ নিজেদের কণ্ঠনালি সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বিষয়টি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। যাহারা গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সুকৌশলে নজিরের পর নজির সৃষ্টি করিয়া মানচিত্রে ও ফেরোপ্রিন্ট কাগজে লক্ষের হারে প্রচারের দ্বারা কল্পিত সীমানাকে স্থায়িত্বদানের বুদ্ধি রাখে তাহাদের কাছে সত্য ইতিহাস ও ভূগোলের নজির দাখিল করিয়া সপারিষদ জওহরলাল জেরবার হইয়া যাইবেন, শক্তিমদমত্ত দুর্যোধন সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও ছাড়িবে না।

মাও-চৌ যে কী পরিমাণ ধড়িবাজ তাহা কি তোমরা তাঁহাদের দাবির অভ্রংলিহ উচ্চতা দেখিয়াও পরিমাপ করিতে পারিতেছ না? পৃথিবীর উচ্চতম বিন্দু এভারেস্ট শীর্ষে aim করিলে যে অন্তত: তিব্বত-নেপাল-সিকিম-ভুটানের নাতি-উচ্চতা পর্যন্ত সহজেই মুঠো বাড়ানো যাইবে এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াই তাঁহারা চাঁদ ধরিবার ছল ধরিয়াছেন। গায়ের জোরে আয়ত্ত তিব্বতের পথে আজ পর্যন্ত কোন অভিযাত্রী এভারেস্টকে কায়দা করিতে পারেন নাই; শেষের সুই দল এবং সার্থক হান্ট-অভিযাত্রীদলকে যে নেপা সরকারেরই অনুমতি লইতে হইয়াছিল, এই সকল ইতিহাস সমগ্র পৃথিবীর কাছে সত্য হইলেও লালচী কাছে সত্য নয়। আসলে তাঁহাদের লক্ষ্য এভারে নয়, হিমালয়ও নয়—তাঁহারা চান খ্যাঁদাখ্যাবড়ানে যাবতীয় পার্বত্য জাতিগুলিকে এককাট্টা করিয়া আধুনি বিশ্বে অপরাজেয় হইতে—নববর্ষে এই কথাটাই তো উপলব্ধি করিয়া ভয়াবহ পরিণামের জন্য প্রস্তুত হ ইহাই বর্তমানে হিমালয়-আশ্রয়ছিন্ন তোমাদের দুর্ভা গোপালদাদার ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

হিমালয়

গোপালদার পত্রের শেষ অংশ হিমালয়-সম্পর্কি তিনি লিখিয়াছেন :

"'আজিকার বর্ষার দুর্দিনে—আজি এ কালরাত্রি শেষ কুলগ্নে, এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগ হে ভারতবাসী, হিমালয়কে ধ্যান কর। কালিদাসে 'কুমারসম্ভব' বা 'মেঘদূতে'র হিমালয়কে নয়, হরপ্র শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়ে'র হিমালয়কেও নয়—এই নববর্ষে—রবীন্দ্র-জন্মের শতবর্ষ পূর্তি বৎসরের শুভার মহাকবি রবীন্দ্রনাথের হিমালয়ের ধ্যান কর, "ভারত-তীর্থে যে হিমালয়কে কবি

'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।'

বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন এবং 'উৎসর্গে' যে হিমালয় সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

'তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন [illegible]মাঞ্চিত

রবীন্দ্র-সংখ্যা

শনিবারের চিঠির বৈশাখ ১৩৬৭ সংখ্যা রবীন্দ্র-সংখ্যারূপে বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনা ছাড়া ক্রমশঃপ্রকাশ্য রচনা অথবা নিয়মিত বিভাগের রচনা থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত বিদগ্ধ এবং চিন্তাশীল সাহিত্যিকদের রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হইবে। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী অবলম্বনে একটি সম্পূর্ণ নাটক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে আলোচনা এবং রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের স্মৃতিকথা যাঁহারা এই সংখ্যায় লিখিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে তাঁহাদের নাম বর্ণানুক্রমিক ভাবে দেওয়া হইল :

অতুলচন্দ্র গুপ্ত
অমল হোম
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
অতুল বসু
অসিতকুমার হালদার
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
অসিতকুমার
চিন্তামণি কর
জগদীশ ভট্টাচার্য
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

নীহাররঞ্জন রায়
প্রমথনাথ বিশী
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পুলিনবিহারী সেন
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
বিমলচন্দ্র সিংহ
বিনয় ঘোষ
বাণী রায়
ভবানী মুখোপাধ্যায়
মৈত্রেয়ী দেবী
রথীন্দ্রনাথ রায়

রাজ্যেশ্বর মিত্র
শিবনারায়ণ রায়
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশীল রায়
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
সন্তোষকুমার দে
হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রজীবনী অবলম্বনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি নাটক

এবং

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবিগণের কবিতা এই সংখ্যায় সংযোজিত হইবে।

রবীন্দ্র-সংখ্যার মূল্য দুই টাকা।

শনিবারের চিঠি, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি।" যে ওংকার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।

*

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি।
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন,—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

*

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ-সমীরণে,
অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।
উর্ধ্ববাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দ-স্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীম-জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
সেইমতো ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধশিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব অদ্বৈতের সনে।"

সেই হিমালয়ের মহত্ত্ব অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আমার একটি গানে সুর মিলাইয়া তোমরাও গাও—

উত্তরদিশি জুড়ি তুমি দেবতাত্মা
হিমালয়, রক্ষিছ এ ভারতে নিত্য ;
বক্ষের স্নেহধারে মৃত্তিকা সিঞ্চিয়া
ফলে-ফুলে-শস্যে করিছ বিচিত্র।

তোমার ছত্রছায়ে ভারতের ঐক্য
রক্ষিছ চিরকাল, চিরকাল রক্ষ।
মহান্ মূর্তি হেরি নতশির আমাদেরই,
বন্দিছে তোমারেই স্পন্দিত চিত্ত।

হিমালয় রহ চির জাগ্রত চক্ষে
রহ অভ্রংলেহী ভারতের বক্ষে।

আমাদের গ্লানি দূর কর দেবতাত্মা,
দূর কর বিরোধের দ্বন্দ্ব।
প্রান্তরে পল্লীতে নির্ঝর-ধারে তব
বয়ে যাক মিলনের ছন্দ।
উপনিষদের মহা-ঋষিদের বাক্য—
মহা হিমালয়, তুমি একা তার সাক্ষ্য,
নমো নমঃ হিমালয়, ভারতের আশ্রয়
নমঃ নগ-অধিরাজ, ভারতের মিত্র॥

আমি জানি, হিমালয়ে আস্থা রাখিলে হিমাল[য়] ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবে। হিমালয়ের একান্ত ভ[ক্ত] পণ্ডিত জওহরলাল আলতাই-পাহাড়ের ঘায়ে নিশ্চ[য়ই] লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না।"

রীচ্ছা ও উপরীচ্ছা

গোপালদা লিখিয়াছেন—

"মিথিলার লৌকিক রামায়ণে আছে—সতীসাধ্বী দেহী সীতার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া অযোধ্যাবাসীরা খন তাঁহার অগ্নিপরীচ্ছা লইতেছিলেন মাতা ধরিত্রী খন উপরি হিচ্ছাবশতঃ কন্যাকে গ্রাস করেন। মাতা-ত্রীতে যাহা সম্ভব মাস্টার-ছাত্রে তাহা অসম্ভব হইবে কন? কাজেই ছাত্রদের এই পরীচ্ছাব্যপদেশে মাস্টাররা উপরি রোজগারের উপায় খোঁজেন ইহা প্রাচীন তিহ্যসম্মত।

রসিকতা থাক্‌। ভায়া হে, তোমরা যে দেশশুদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র বেচারা শিক্ষকদের উপর খাপ্পা হইয়া তাহাদের মুণ্ডপাত করিতেছ, বিশ্ববিদ্যা-লয়কে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষতকে জাহান্নামে পাঠাইতেছ—তাহাদের অপরাধটা কোথায়? যে দেশে প্রধানতম কর্ণধার হইতে নিম্নতন তল্পিবাহক পর্যন্ত প্রত্যেকেই চরিত্রভ্রষ্ট, পরধন ও পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি যেখানে আজীবন-ব্রহ্মচারী-সপ্ততিপর বৃদ্ধদেরও মজ্জায় মজ্জায় প্রবাহিত, যেখানে দুর্মুখদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মন্ত্রীত্ব হইতে পেয়াদাগিরির ঘুষ পর্যন্ত অবাধে প্রচলিত সেখানে এই চরিত্রহীনতার ফাটল সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন কি, ধর্মকে পর্যন্ত যে শিথিলভিত্তি করিয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য কি! যে সকল উচ্চাবচ লোকের হাতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তার ভার অর্পিত—তাহারা তো রোবোট বা যন্ত্র নয়! সামান্য বা মাঝামাঝি বেতনভোগী এই সকল ব্যক্তিকে দেশশুদ্ধ আমরা সকলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া দিবার জন্য নানাভাবে ক্রমাগত ঘুষ কবুল করিয়া চলিয়াছি। ইহারা যদি সত্যসত্যই যন্ত্র হইত এই দুরন্ত প্রলোভনের চোটে জড়-যন্ত্রও ঠুঁটো জগন্নাথের মত হাত বাড়াইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। যে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা দেশ হইতে লেখা-পড়ার বালাই সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে অথচ পরীক্ষার ইয়ার্কি আমাদের পূর্বপুরুষদের লেজের চিহ্ন অ্যাপেণ্ডিক্সের মত থাকিয়া গিয়াছে সেখানে নিরীহ পরীক্ষার্থীদের পূর্বাহ্নে প্রশ্নপত্র অবগত হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে বলিতে পার? যে প্রহসন পরীক্ষার নামে চলিতেছে তাহা স্বচ্ছন্দে তুলিয়া দিয়া সাময়িক ক্লাস-পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা চলিত কিন্তু তাহাতে দুইটি ঘোরতর অসুবিধার সৃষ্টি হইত। প্রথম, ক্লাস-পরীক্ষা লইতে গেলে ও তাহাকেই চরম বলিয়া গণ্য করিতে হইলে সিনিয়র কেম্ব্রিজ জুনিয়র কেম্ব্রিজ শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ পাঠক্রম নিয়মিত বজায় রাখিতে হইত অর্থাৎ পড়াশোনার ব্যবস্থা অপরিহার্য হইত এবং দ্বিতীয়—এই পরীক্ষার ভুয়া ঠাট বজায় রাখিবার জন্য হাজার হাজার প্রশ্নকর্তা, খাতাপরীক্ষক, হেড-একজামিনার, স্ক্রুটিনাইজার, ইনভিজিলেটর, গার্ড, কণ্ট্রোলার প্রভৃতিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের দ্বারা যে একটা বিরাট ঠগীগ্যাংকে পোষণ করিয়া গাঁড়াকল অবিরাম কলকলগতিতে চালানো হইতেছে সেটি বন্ধ হইয়া যাইত। অতএব পড়াশোনার পাট চালু না হইয়াও পরীক্ষার ঠাট বজায় থাকিবে, প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা কোচিং ক্লাসগুলির 'সাজেশন' অমোঘ হইবে, এবং সকল পরীক্ষার্থী সমান সুযোগ না পাইলে এই সাম্যবাদের যুগে বঞ্চিতেরা হৈ-চৈ করিয়া পরীক্ষাকেন্দ্র তছনছ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবেই। তুমি আমি নির্মল সিদ্ধান্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন হরেন্দ্র রায়-চৌধুরী বিধান রায় নৈতিক আদর্শবাদসমন্বিত চোস্ত চোস্ত বক্তৃতা করিলেও তাহা বিফলে যাইবে। যে দেশে বে-আইনী মাল পাচার করিবার জন্য সর্বোচ্চ কর্তারাও সর্বনিম্ন পাহারাকে ঘুষ কবুল করিয়া থাকেন এবং সর্বনিম্ন সর্বোচ্চকে সর্বোচ্চ জানিয়াও হাত পাতিতে দ্বিধা করে না, যে দেশে দুই শত বর্ষের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শিক্ষা তের বৎসরের রাজস্থানী শিক্ষায় জাহান্নামে চলিয়া যায় সে দেশে আর যাই কর—নীতি ও ধর্মের দোহাই পাড়িয়ো না। দোহাই তোমাদের।"

নয়া সাহিত্যতত্ত্ব

সাহিত্যিকের বেলায় স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ—এই কথাটা গোপালদা আমাদের বার বার স্মরণ

করাইয়া দিতেন, অবশ্য বিয়াল্লিশের আগস্ট-আন্দোলনে তিনি নিজেও যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। অনেকেই হয়তো জানেন না, শুধু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই গোপালদা হিমালয়-অঞ্চলে পলাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। আমরা সময়ে অসময়ে পলিটিক্সের ফুট কাটি, নির্বাচন ব্যাপারেও মাথা গলাইতে যাই দেখিয়া পাতালপ্রবিষ্ট গোপালদার সহ্য হয় নাই। তিনি আমাদিগকে সেই সময় এক মারাত্মক পত্রাঘাতে সতর্ক করিয়াছিলেন, পত্রের সঙ্গে আমাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া একটি কবিতাও পাঠাইয়াছিলেন। সাহিত্যিক সমাজের অবগতির জন্য গোপালদার কবিতাটি নীচে হুবহু মুদ্রিত করিলাম :

"আমরা কি যে, সর্প না ব্যাঙ
কেউ জানি না ঠিক সে,
সাহিত্যে হই কুমীর, কিন্তু
ব্যাঘ্র পলিটিক্সে।
লিখতে পারি, বলতে পারি
মাখন হয়ে গলতে পারি
মাতাল হয়ে টলতে পারি
রাত বারোটায় রিক্সে ;
দোহন করতে হই প্রকাশক,
লেখক—মাংতে ভিখ্ সে।

ফ্লার্টে বল, আর্টে বল,
পার্টে বল মঞ্চে,
আমরা আছি—বংশ কভু,
কভু পুচ্ছকে কঞ্চে।

কি যে আমরা নই জানি নি,
বাল্মীকি ব্যাস বাণ পাণিনি
সারে গামা পাধা নিনি
সবই মোদের বন্‌ছে—
ধনেও আছি ধানেও আছি
শাকেও আছি ধন্‌চে।

যে চাও যাহা বলতে পারি
বেতারে, প্ল্যাটফর্মে,
জানি বা না-জানি বিষয়
বিঁধবে গিয়ে মর্মে।
সবজান্তা মোদের কথা,
শুন্‌ছ তাই তো যথাতথা
দৈনিকে যে বাক্‌-বারতা
সম্পাদকী ফর্মে
আমরা লিখি তোমরা শোন
দিনের সর্বকর্মে।

খ্রীষ্ট বুদ্ধ আমরা বানাই
তোমরা জান সত্য,
মোদের রাতের কল্পনা যে
তোমার দিনের তথ্য।
আমরা নেহাত কেউ-কেটা না,
সব দুয়ারেই দিই যে হানা ;
আমরা বিধি আমরা মানা
জোগাই ওষুধ পথ্য
মনের রোগে এই দুনিয়ায়—
এই আমাদের তত্ত্ব।"

মধ্যবিত্ত, ভদ্রলোক ও বাঙালী মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিসঙ্কট

অসিতকুমার

Cleonte : ...I was born sir of honourable parentage, have served for six years in the army and with some redit, and have I believe means sufficient to maintain a retty fair position in the world. Nevertheless, I make o pretence to a title which others in my place might very rell consider themselves entitled to assume. I therefore ell you I am not a gentleman...

Moliere : Le Bourgeois Gentilhomme : Act III.

একারমানের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গেই সম্ভবত: গ্যেটে সেই বিখ্যাত স্বীকারোক্তিটি করেছিলেন : সাহিত্যরুচি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশে বৎসরে একবার অন্তত: আমি মলিয়ের পড়ি। বস্তুত: একথায় বিস্মিত হওয়া যায় না, কারণ নবজাগৃতির পর ইয়োরোপীয় সমাজের সবচেয়ে নিপুণ ভাষ্যকার হিসেবে সপ্তদশ শতকের (১৬২২-১৬৭৩) সেই ব্যঙ্গনিপুণ ফরাসী নট ও নাট্যকারের নামোল্লেখ না করে থাকা যায় না। তাই ইয়োরোপীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎস ও চরিত্রমূল সন্ধান করতে হলে মলিয়েরের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। Le Bourgeois Gentilhomme (বাবুমশাই)-এর M. Jourdain-ই হলেন সেই মধ্যবিত্তের প্রতিভূ—উত্তরকালে যিনি সর্বত্র-ই নিজেকে স্বজাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারই আধার ও উৎস বলে মনে করেছেন এবং বিনয়বশত: সে কথা প্রচার করতে বিরত হয়েছেন এ অপবাদ দেওয়া যায় না।

কিন্তু পরবর্তীকালের প্রসঙ্গ আপাতত: অনুচ্চারিত থাক্। প্রারম্ভে তিনি ছিলেন দোকানদার। তাঁর মাথার উপরে ছিলেন সমুন্নত শির ও শিরোপাবিশিষ্ট ভূস্বামীবর্গ—তাঁরাই ছিলেন ভদ্রপদবাচ্য। পোশাকে-আষাকে, কেতাদুরস্ত চালচলনে এবং উচ্চারণের বনেদী কায়দায়, তাঁরাই ছিলেন সারা সমাজের সেরা—অনুকরণের আদর্শ। দোকানদারের সাধ্য ছিল না সে নিজেকে ভদ্রশ্রেণীভুক্ত বলে চালায়। বাজারের মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দরদস্তুর করতে কে না তাকে দেখেছে আর মাস-কাবারে মালপত্র নিয়ে ভদ্রলোকের দ্বারস্থ তো তাকে হতেই হয় (যদিও ক্রীত পণ্যের মূল্যদানে ইদানীং ভদ্রলোক প্রায়ই অসমর্থ হয়ে পড়তেন কিন্তু তাতে সময়ের অবিচারই প্রকাশ পেত আর কিছু নয়)। আসল কথা ছিল এই যে ভদ্রলোক কোন অবস্থাতেই অর্থকরী কিছু করতেন না—তা করলেই তাঁর জাতিচ্যুতি ঘটত। তাঁর অন্ন জোগাত ভূমিদাসের দল এবং কার্ডিনাল রিশল্যুর (১৫৮৫-১৬৪২) কল্যাণে যখন তিনি গ্রামদেশ ছেড়ে ভের্সাইয়ের ঔজ্জ্বল্যবর্ধনে আত্মনিয়োগ করলেন তখনও বিস্মৃত কৃষিজীবীর দল খাজনার ওপর খাজনা দিয়ে তাঁর পোশাক-আষাক, কায়দাকানুন, ভোজ, শিকার, প্রণয়কলা ও প্রসাধনের আধিভৌতিক ভারটা বহন করেই চলেছিল। কাজের মধ্যে শুধু দুটো দিক তাঁর জন্যে উন্মুক্ত ছিল—এক চার্চ আর তা ছাড়া সৈন্যবাহিনী বিশেষত: অশ্বারোহী দল। চার্চের দিকে যাঁরা যেতেন তাঁরা বিদ্যাচর্চার দিকটা জাগিয়ে রাখতেন এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ছাড়াও সরকারী শাসন-বিভাগের সর্বক্ষেত্রে চার্চের লোকেরাই ছিলেন কর্মী ও কর্মকর্তা। মনে রাখতে হবে যে clerk ও cleric

শব্দের উৎস একই এবং ইংলণ্ডের য়ুলসী (Wolsey) ও ফ্রান্সের রিশল্যু (Richelieu) উভয়েই ছিলেন চার্চের লোক। সমরবাহিনীর মধ্যে নৌবাহিনীর সামাজিক ভিত্তি স্বতন্ত্র, তার উদ্ভব ও সম্প্রসারণ ঘটেছে বাণিজ্যবিপ্লব ও বণিকশ্রেণীর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু স্থল-বাহিনীর নেতৃত্ব চিরকালই ছিল ভূস্বামী ভদ্রলোকদের করতলগত। গ্রামের চাষী সৈন্যবাহিনীতে হত পদাতিক এবং ভূস্বামী হতেন সেনাপতি অফিসার এবং অশ্বারোহী। আর সেনাপতি ও অশ্বারোহী হিসেবে তাঁর একটা নৈতিক মান ছিল—যার নাম শিভালরি (chivalry), যার অনুবাদে কালক্ষয় না করে সংক্ষেপে আমরা ক্ষাত্রধর্ম বলতে পারি। অত্যুগ্র আত্মমর্যাদাবোধ ও দুর্বলের রক্ষণ যার দুই সদর্থক দিক। আর ইয়োরোপীয় সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সামন্তযুগ থেকেই খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও ক্ষাত্রধর্মের নীতি এই দ্বিধারায় প্রবাহিত হয়েছে।* তার অন্তর্দ্বন্দ্ব হৃদয়ঙ্গম না করলে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির স্বরূপটি অজ্ঞাত থেকে যাবে।

উপরের ঐতিহাসিক বিবৃতি থেকে এইটুকু অন্ততঃ বোঝা যায় যে মধ্যবিত্ত এবং ভদ্রলোক এই দুটি শব্দ ইয়োরোপে অন্ততঃ সমার্থক বলে গৃহীত বা বিবেচিত হয় নি। মধ্যবিত্ত কি ভাবে ভদ্রপদবাচ্য হল তা জানতে গেলে বোধ হয় ইংলণ্ডের দিকে চোখ ফেরানো প্রয়োজন। কারণ ইংলণ্ড এক আশ্চর্য দেশ যেখানে সামাজিক কাঠামোর বহিরঙ্গ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অটুট থাকলেও ভিতরে ভিতরে পরিবর্তনের স্রোত কখনও রুদ্ধ হয় নি। তাই যে মধ্যবিত্ত একসময়ে ভদ্রলোকের বসার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, সে যে কখন কী করে নিজেই ভদ্রলোক হয়ে দাঁড়াল এবং আগের ভদ্রশ্রেণীকে নিছক উচ্চশ্রেণীর রঙিন মর্যাদা দিয়ে সমাজের দ্বন্দ্বমুখর আঙিনা থেকে একরকম নির্বাসিত করে দিল, তার ধারাটি বুঝতে হলে ইংলণ্ডের সামাজিক ও আর্থিক বিবর্তনটি বুঝতে হয়।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডেও বণিক-শ্রেণীর থেকেই মধ্যবিত্তের উদ্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিগরদের থেকে বেরিয়ে আসা কিছু কিছু লোক লণ্ডন ও অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে পণ্যউৎপাদনের থেকে বিচ্যুত হয়ে জিনিস লেনদেনের কারবার গড়ে তোলে, এবং তাদের উদ্যোগে এক একটি বাণিজ্যসংস্থার আওতায় বিশেষ বিশেষ পণ্যের একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে। এইসব এক-চেটিয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা গোড়া থেকেই নগর-কেন্দ্রিক হয়ে নগর-পরিচালনার দায়িত্ব করায়ত্ত করে এবং স্বভাবতঃই পৌরপতি হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে আসায় কারিগরশ্রেণীর ওপর এদের প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। এই ভাবেই কৃষিনির্ভর অভিজাতদের আওতার বাইরে নগরে নগরে স্বতন্ত্র নাগরিক ক্ষমতা ও চেতনাসম্পন্ন মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ঘটে। দু-একটি ঘটনার ফলে এই বিকাশ ক্রমশঃ বেগবান হল চতুর্দশ শতকের ইংলণ্ডে দেশজোড়া যে মহামারী ইতিহাসে ব্ল্যাকডেথ নামে খ্যাত, তাতে দেশের প্রায় অর্ধেক লোক মারা পড়ে। লোকসংখ্যা অত্যল্প হয়ে দাঁড়ানোতে ভূমি-দাসদের ওপর সামন্ত প্রভুদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে চাষ-আবাদ ছেড়ে অনেকই মেষপালন ও পশমের ব্যবসায় শুরু করেন। বণিকশ্রেণী আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দেশে টাকার প্রচলন যায় বেড়ে এবং অবশিষ্ট ভূমিদাসেরা পূর্বের মত উৎপন্ন ফসলের হারে (আমাদের ভাগচাষীদের মত) খাজনা না দিয়ে টাকার অঙ্কে খাজনা মেটাতে আরম্ভ করে। ফলে সামন্ত-ব্যবস্থার দায়দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত বশ্যতা লুপ্ত হয়, ভূমিদাসদের পরিবর্তে আসে চাষীপ্রজা এবং ভূমি জিনিসটা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। অবশিষ্ট ভূমিদাসদের অনেকেই তখন প'ড়ো জমিগুলি একত্র করে ভূস্বামীকে খাজনা দিয়ে নিজেরা কার্যতঃ তার মালিক হয়ে বসে এবং লোক

* ১ম মহাযুদ্ধের কালে প্রুশিয়ার ভূস্বামী শাসিত কাইজারের জার্মানী এই ক্ষাত্রনীতির দোহাই পেড়ে রণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং লয়েড জর্জ প্রমুখ ব্রিটিশ নেতারা খ্রীষ্টীয় নীতির সূত্র ধরে ধিক্কার দিয়েছিলেন তাঁদের। এঁরা সকলে যথার্থ কথা বলেছিলেন তা আমার বক্তব্য নয়, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, তাঁদের বিতণ্ডা এই দুই নীতির সূত্রেই চালিত হয়েছিল। অন্য কোন ভাবে নয়।

য়ে স্বাধীনভাবে চাষ-আবাদ শুরু করে। এই ভাবে ও গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়, উত্তরকালে র নাম দেওয়া হয় Gentlemen farmers.

বাণিজ্য এবং স্বাধীন কৃষি ছাড়াও মধ্যবিত্ত সমাজের যে অঙ্গ বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য—এবং এদেশে আমরা বিত্ত বলতে প্রধানতঃ যাঁদের নির্দেশ করি—সেই সব কিল ডাক্তার প্রভৃতি) বৃত্তিনির্ভর শ্রেণীগুলিরও উদ্ভব চার্চ ও অভিজাতদের প্রাচীন শক্তি শিথিল হবার সঙ্গে। চার্চের ক্ষমতা শিথিল হবার পর তার আওতা কে আইন-ব্যবসায়ের উদ্ভব হল। অন্যদিকে ইংলণ্ডের রাধিকার-আইনের কল্যাণে অনুজতনয়দের ভূসম্পত্তিতে কোনদিনই কোনও অধিকার ছিল না। জ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই মধ্যবিত্ত সন্তানের মত মীপরিবারের এইসব অনুজতনয়েরা বিভিন্ন বৃত্তিতে ষ্ঠিত হতে থাকে। আর সরকারী কাজ এবং বিভিন্ন র আঙিনায় চাচ ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে শ্রেণী এবং মধ্যশ্রেণীর সংযোগ সাধিত হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যেসব পরিবর্তনের ফলে ক্ষিত সব বৃত্তিগুলির দ্বার মধ্যশ্রেণীর কাছে ক্রমে উন্মুক্ত ত থাকে, তার মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের উৎসাদন শেষতঃ উল্লেখযোগ্য। চার্চ উৎসন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে চার্চের ম্পত্তি মধ্যবিত্তশ্রেণীর অধিকারে আসে। এই হল প্রপদবাচ্য হবার পথে ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম ক্ষেপ। কিন্তু ভদ্রতার উৎস শুধু সম্পত্তি নয়—শিক্ষা বং ক্ষমতাও। চার্চের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সে দিকেও অগ্রসর হল। তৎকালে শিক্ষা ল চার্চের সম্পত্তি—অনেকটা ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের শেষাধিকারের মত—তাই সরকারী শাসনব্যবস্থায় স্তরে চার্চের লোকেরাই নিযুক্ত হতেন। কিন্তু চার্চের মতা লোপের পর মধ্যবিত্তদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল মার স্কুলগুলি আর সরকারী কাজে এগিয়ে এল এইসব তুন-ধনী-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা। এবং বাণিজ্য-প্রবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও পরিধি বিস্তৃত হবার লে রাজকার্যে দক্ষব্যক্তির প্রয়োজনও প্রসারিত হল, এবং সে প্রয়োজন মেটাতে অগ্রসর হলেন তাঁরা—যাঁরা রাজানুগ্রহে অকস্মাৎ প্রভূত ভূসম্পত্তি অর্জন করেছেন, যাঁদের উদ্যোগে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তৃত হয়েছে এবং বাণিজ্যকর্মে দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বৈষয়িক বিচারবুদ্ধিও অর্জন করেছেন, যাঁদের সমর্থনে টিউডর রাজশক্তি এমন একটা নৌবাহিনীর পত্তন করেছিলেন যার প্রতাপ চার শতাব্দী ধরে পৃথিবীর চতুষ্কোণে অব্যাহত রইল। বস্তুতঃ এই যুগেই ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর গোড়াপত্তন হল এবং সে বনিয়াদ এমনই শক্ত হয়ে বসেছিল যে আজকের ইংলণ্ডে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মচেতনাও শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রয়ানার পরিমিত স্বর্গলোকে আশ্রয় খুঁজছে।

অবশ্য এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্র যে আদি থেকেই সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে তা বললে সত্যের অতিসরলীকরণ হবে। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসে পরবর্তী ঘটনাগুলি মধ্যশ্রেণীকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং তার শ্রেণীচরিত্র আরও দৃঢ় রেখায় অঙ্কিত করেছে শুধু। ক্রমোয়েলের আন্দোলন ও পিউরিটানবাদের অভ্যুত্থান সামাজিক ও নীতিজগতে মধ্যবিত্ত নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। আনন্দ, বিলাস, আলস্য, আমোদ, উৎসব সব-কিছুকে জীবন থেকে চিরনির্বাসন দিয়ে সংযম সঞ্চয় মিতব্যয়িতা ও কাজ, কাজ, নিরন্তর কাজের সর্বতোমুখী শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবার ফলে উৎপাদন বেড়েছে, বাণিজ্যের সম্প্রসার ঘটেছে এবং শক্ত হয়েছে ইংলণ্ডের আর্থিক বনিয়াদ তথা মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর্থিক প্রভুত্ব। আর নষ্ট হয়েছে প্রাক্তন অভিজাতশ্রেণীর জীবনযাত্রা ; গীতকলা, নৃত্যবাসর, অভিনয়, সৌখীন প্রণয় ও প্রসাধন। রেস্টোরেশনের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য প্রাক্তন অভিজাত জীবনবিন্যাসের মৃত্যুকে আরও অবশ্যম্ভাবী করেছে, পুরনোকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। আর্থিক ক্ষেত্রে তো তার চেষ্টামাত্র হয় নি। দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ফিউডাল টেনার (Feudal tenure) রদ করা হল তা আর ফিরে আসে নি এবং ব্রিটিশ নৌবাণিজ্যের শুম্ভস্বরূপ ক্রমোয়েলের

নেভিগেশন সিস্টেম তিন শতাব্দী ধরে চালু থেকে কেবল ইতিহাসের প্রয়োজনে উনিশ শতকের মধ্যভাগে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধে আবার একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রবল হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত তা দাঁড়াতে পারল না। দাঁড়াল না শুধু এই কারণে নয় যে, এই সব ভূস্বামীরাও কার্যতঃ ভুঁইফোঁড়, প্রাক্তন ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারী, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাঁদের কারুরই শিকড় পৌঁছয় না। এমন কি তাঁদের স্বত্ব স্বামিত্ব যে শেষ পর্যন্ত এই বণিকশ্রেণীর কর্মকুশলতার উপরেই নির্ভরশীল এই চেতনাও সজাগ করে নি তাঁদের। আভিজাত্যের গিল্‌টি চিড় খেল শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত হল শিল্পায়নের পালা—এল উদ্যোক্তা ও পুঁজিপতি, কারখানার মালিক। তাদের গৌরব কুলপঞ্জীর কীটে কাটা পাতায় নয়, নির্মম নিরলস কর্মনিষ্ঠায়। সৃষ্টি হল এঞ্জিনীয়র, ব্যাঙ্কার, এ্যাকাউণ্টাণ্ট, নতুন সব বৃত্তির, যার জন্যে বিশেষ শিক্ষা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, অভিজাত জীবনের ধ্রুপদী শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী না হলেও যেসব বৃত্তির মানুষকে অপাংক্তেয় করে রাখা যায় না।* এবং সবচেয়ে যা বড় কথা বোঝা গেল, সম্পত্তি বলতে ভূমির চেয়েও বড় একটা জিনিস আছে, কারখানার মালিকানা বা তার অংশ বা শেয়ার। অবশ্য ইংরেজ রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতার কল্যাণে এতবড় একটা পালাবদলও বাইরের কাঠামোয় বড় একটা পরিবর্তন আনল না—অভিজাত সম্প্রদায়ের আভিজাত্য বাইরে থেকে অটুট রইল, শুধু ভেতর থেকে তার চরিত্র গেল পালটে। শিল্পব্যবস্থায় সার্থক পুরুষদের খেতাব দিয়ে অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে আমন্ত্রণ করে আনা হল† এ শিল্পপতিরাও ভূস্বামিত্বের অন্তর্নিহিত মর্যাদা মেনে নি জমিজায়গা কিনে আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখলেন সৃষ্ট হল নতুন একটা উচ্চশ্রেণী, যেটা প্রাক্তন আভিজাত্যে নাম পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখলেও যার চরিত্র-পরিচয় সম্পূ স্বতন্ত্র। এই পরিবেশে ভিক্টোরীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী যে রূ পরিগ্রহ করে সেটি আজ পর্যন্ত ইংরেজ সমাজ-জীবে পরিত্যক্ত হয় নি—তা সে 'মিড ভিক্টোরীয়' বলে তাকে যতই উপহাস করা হোক না কেন। এই মধ্যবিত্ত, বৃত্তিতে ব্যবসায়ী বণিক অথবা কোনও শিক্ষিত বৃত্তিনির্ভর এবং উদরান্নের জন্য ইনি নিছক কায়িক শ্রমের ওপরে নির্ভরশীল নন। দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন ব্রিটি কোম্পানির কিছু না কিছু শেয়ার এঁর কেনা আছে তারই সুদের টাকায় এঁর বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্যের বিকাশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নির্ভর। ইনি নিজে হয়তো অ বয়ে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করেছিলেন কিন্তু এঁর উচ্চাশা নিজে ছেলেকে শিক্ষার্থে কোনও একটি পাবলিক স্কুলে এব সেখান থেকে প্রাচীন দুটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিে পাঠানো—যেখানে অভিজাতশ্রেণীর সন্তানেরা শিক্ষা এসে থাকে। ইনি নিজে যদি ব্যবসায়ে বিশেষ স অর্জন করতে পারেন, কোনও উদ্যোগে বিশেষ ল ভবা হয়ে পড়েন, তা হলে খেতাব লাভ করে আভিজাত্যে স্বর্গে উত্তরণ এঁর ভাগ্যে আছে। কিন্তু সে সুযোগ য না ঘটে, তা হলে সন্তানের জন্য সে পথ প্রশস্ত করতে পারেন তিনি তাকে পাবলিক স্কুলে পাঠিয়ে। তাই তাঁ প্রাণপণ চেষ্টা সর্বদা—যেভাবেই হোক, পাবলিক স্কু

* ইংলণ্ডে উনিশ শতকে বিশেষতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিবরল এডুকেশন বনাম বিজ্ঞান শিক্ষার যে দ্বন্দ্ব তা অভিজাতশ্রেণীর কায়েমী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বনাম নবজাগ্রত মধ্যবিত্তবুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের দ্বন্দ্ব বলা যেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের অন্ত পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয় নি।

† সারা উনিশ শতক ধরে ধাপে ধাপে তথাকথিত নিম্নতর বৃত্তি মানুষকে এইভাবে আভিজাত্যের আঙিনায় টেনে আনা হয়েছে শতাব্দীর শেষ দশকে যখন তৎকালীন নটশ্রেষ্ঠ হেনরি আভিংকে খেত দেওয়া হল তখন যে গুঞ্জন উঠেছিল তার তাৎপর্য ভোলবার নয়। 'শে পর্যন্ত অভিনেতারাও ভদ্রলোকের জাতে উঠল'—সনিশ্বাসে খেদ প্রকা করেছিলেন অনেকে। বার্নার্ড শ'র বিদ্রূপ সত্ত্বেও ঘটনাটিতে ইংরে শাসকসম্প্রদায়ের যে বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তার তুল অন্যান্য দেশে দুর্লভ।

কে পাঠাতেই হবে। অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর -মিশ্রণের লীলাস্থল এই পাবলিক স্কুলগুলি তাদের school tie সমেত তাই ব্রিটিশ সমাজ-জীবনে মূল্যবান। তাদের শিক্ষায় রয়েছে শাসকশ্রেণীর গুনীয় গুণের সমাবেশ, এবং যে কেউ সেখানে তে পারবে শেষ পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভাগ্যে সুনিশ্চিত। তাই আজকের কল্যাণব্রতী নও পাবলিক স্কুলগুলি বাতিল হল না শুধু ছাত্রবৃত্তি দরিদ্রনারায়ণের প্রবেশপথ প্রসারিত করা হল। হল না, কারণ ইংলণ্ডে আভিজাত্যের ধারা আজও হয় নি এবং সমগ্র জাতটাই মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ভূত হয়েছে।

* * *

Brock lehurst—When the transfer of India to the ment of this Country took place in 1833,* the ction of weaving in India had already taken place, erefore it is not a question of destruction for that t; and we have it in evidence that India is an ltural rather than a manufacturing country, and e *parties formerly employed in manufactures are sorbed in agriculture.*†...

om House of Commons Select Committee Report Quoted in "The Economic History of India in the an Age" by R. C. Dutt, pp. 113. Routledge & Kegan td. 1956.

য়োরোপীয় মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ংক্ষিপ্তটি স্মরণে রাখলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের নিরূপণ ও তার সাংস্কৃতিক সঙ্কটের তাৎপর্য সরলতর হবে। বস্তুতঃ ইয়োরোপীয় শিল্প-যুগ নতন্ত্রের আধিপত্যে বিকশিত বাঙালী মধ্যবিত্ত-ক অনেকাংশে ইয়োরোপীয় মধ্যশ্রেণীর বিকলাঙ্গ ছবি বলে মনে হয় এবং তার মধ্যে ইয়োরোপীয় র বৃহত্তর সমস্যার পরিবর্তে পাওয়া যাবে ছোট উপায়হীনতার আবর্ত—যার মূল রয়েছে বাঙালী মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক উৎসের গভীরে। আমাদের মধ্যশ্রেণী যেন বারবার ইয়োরোপীয় মধ্যশ্রেণীর পথ অবলম্বন করতে অগ্রসর হয়েছে, চিন্তাজগতে আন্তরিকভাবেই তার পাঠ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনও সময়েই, কিছুতেই, সে ঠিক দাঁড়াতে পারে নি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়, শিল্পবিপ্লবহীন জগতে বারবার ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে অর্ধগ্রাম্য স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা আধাশহুরে নকলনবিসীর আবর্তে এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চাশার কোনও ক্ষেত্র না থাকাতে সান্ত্বনা খুঁজতে হয়েছে বিবিধ ভাবোচ্ছ্বাসে, নয়তো ব্যক্তিগত বিদ্রোহে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিছক পারিবারিক সুখের অন্বেষণে। সামাজিক আন্দোলন অবসিত হয়েছে ব্যক্তিপূজা ও তৎকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগত কলহে, রাজনৈতিক জীবন সামাজিক ভূমিকাবর্জিত হওয়াতে অমিত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ব্যক্তি ও দলগত কলহের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি কখনও। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রতিহত হয়েছে জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগে এবং জাতীয়তাবাদ ব্যর্থ হয়েছে প্রচলিত ধর্মসংস্কারের শিকলপূজায়। কিন্তু মতামত বিস্তারের পূর্বে হয়তো বাঙালী মধ্যবিত্তের উৎস সন্ধান সমস্যার স্বরূপনির্ণয়ে সহায়ক হবে।

পূর্বেই যা উল্লিখিত হয়েছে, ইয়োরোপীয় মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত গোষ্ঠীর সমবায়ে। নাগরিক বণিকশ্রেণী, গ্রামীণ Gentlemen farmers এবং আইন, সরকারী কাজ ও চিকিৎসা বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বৃত্তিনির্ভর সম্প্রদায়। এই তৃতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মিলিত মিশ্রিত হয়েছে মধ্যবিত্ত ও অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থ। এই ভাবে বিচার করলে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে প্রথমেই এক আশ্চর্য সংকীর্ণতা চোখে পড়ে।

বাঙালী মধ্যবিত্তের কোনও অংশই উদ্যোগী বণিক-শ্রেণীর থেকে উদ্ভূত নয়। যদিও অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে (১৮২৪-২৬) Daniel Defoe'র চোখে দেখা ইংলণ্ডের সঙ্গে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক বিন্যাসের আকাশ-পাতাল তফাত ছিল না, তবু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর এদেশের আর্থিক জীবন যে ভাবে বিপর্যস্ত

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার হ্রাস প্রসঙ্গে

† Italics লেখকের।

করা হয় তার অন্যতম প্রধান শিকার হয় তৎকালীন দেশীয় বণিক-সম্প্রদায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার তার প্রত্যেক কর্মচারী এবং আমলা-গোমস্তার পর্যন্ত আর্থিক স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং বিশুদ্ধ পশুশক্তির সাহায্যে দেশের মানুষকে অতিরিক্ত মূল্যে বিলিতী পণ্য কিনতে এবং নামমাত্র মূল্যে দেশী পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়।* এই প্রক্রিয়ায় বাধা দানের চেষ্টায় মীর কাশেমের রাজ্যচ্যুতি ঘটল এবং অতঃপর দেশীয় বণিক-সম্প্রদায়ের ধ্বংস হল দ্রুত ও অনিবার্য। সুতরাং যে স্বাধীন ও সুপ্রতিষ্ঠ ঐতিহ্যসম্পন্ন বণিক-সম্প্রদায় ইয়োরোপীয় মধ্যশ্রেণীর স্তম্ভস্বরূপ, এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাতেই তাদের নির্মূল করা হয়েছিল এবং আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশে সেই শ্রেণীর বিশিষ্ট চেতনা ও কর্মদক্ষতার কোনও চিহ্নপাত ঘটে নি।

অন্যদিকে তাঁতী রেশমশিল্পী প্রভৃতি কারিগর-শিল্পজীবীদের উৎসাদন কাহিনী তো সুবিদিত। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা, এঁদের উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠা দূরে থাব বৃত্তিটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে হয় মৃত্যুগ্রাসে ঠেলে দিল, নয়তে বাধ্য করল ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে—উপরে উদ্ধৃতিতেই যার পরিচয় আমরা পেয়েছি। এক্ষেত্রে দেখতে পাই যে এদেশের মধ্যশ্রেণীর বিকাশে দ[illegible] কারিগরশ্রেণীর কোনও স্থান বা ভূমিকা নেই; অথ শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের মধ্যশ্রেণীর বিকাশে দক্ষ কারিগরদে ভূমিকা কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বাঙাল মধ্যবিত্তের চরিত্র তাই আদি থেকেই অগ্রসর ধনতান্ত্রি দেশগুলির মধ্যশ্রেণীর তুলনায় অনেক সঙ্কীর্ণ—তা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক পরিমিত এবং বাস্তব জগতে সঙ্গে জীবন্ত যোগ বহুলাংশে শিথিল ও অকিঞ্চিৎকর।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স[illegible] সংশ্লিষ্ট এ দেশেও একটা বণিকসম্প্রদায় উনিশ শতকে গোড়ায় এই কলকাতাতেই গড়ে উঠেছিল যার অন্যত প্রতিভূ ছিলেন 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' দ্বারিকানাথ ঠাকুর। আজকে বিস্ময়কর মনে হলেও [illegible] কথা তো ঐতিহাসিক সত্য যে, বর্তমানে ইংরেজ-অধ্য[illegible] বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠার যুগে এ[illegible] বঙ্গসন্তান তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর ইংরেজ সংস্রবে শ্রেণীবিশেষ লাভবান হচ্ছিলেন বলেই তাঁদে হাড়ে সারা হিন্দুস্থান যখন সাদা হয়ে যাচ্ছে তখ সেই ১৮১৯ সনে 'সমাচার দর্পণ' লিখতে পেরেছিলেন "...এ দেশের ধন বাণিজ্য দ্বারা অতিশয় বাড়িতেছে এব পূর্ব নবাবের অধিকার কাল হইতে এখন স্থানে স্থা দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে এখন যত ভাগ্যবান লো বাঙ্গালাতে আছে পূর্বে নবাবের কালে এত ভাগ্যবা ছিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে কেবল এখন বাণিজ দ্বারা লোকেরা ভাগ্যবান হইতেছে।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা : প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৫)

এই ভাগ্যবানদের মধ্যে অনেকে তাই টাউনহলে সভা করে প্রস্তাব করেন এদেশে ইংরেজের বসতি কর হোক, তা না হলে নাকি হতভাগ্য ভারতের উন্নতি

---

*"A gentleman sends a Gomastah here to buy or sell; he immediately looks upon himself as sufficient to force every inhabitant either to buy his goods or sell him theirs; and on refusal (in case of non-capacity) a flogging or confinement immediately ensues. This is not sufficient even when willing, but a second force is made use of, which is to engross the different branches of trade to themselves, and not to suffer any person buy or sell the articles they trade in; and if the country people do it, then a repetition of their authority is put in practice; and again, what things they purchase, they think the least they can do is to take them for a considerable deal less than another merchant, and often times refuse paying that; and my interfering occasions an immediate complaint. These, and many other oppressions more than can be related, which are daily used by the Bengal Gomastahs, is the reason that this place is growing destitute of inhabitants; every day numbers leave the town to seek a residence more safe, and the very markets, which before afforded plenty, do hardly now produce anything of use...."

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ থেকে সার্জেণ্ট ব্রেগোর চিঠি : রামকৃষ্ণ মুখার্জির, "The Rise and Fall of East India Company" Deutsche wissenschaftlichen verlag. পৃঃ ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

সম্ভব। বলা বাহুল্য, এঁরা ছিলেন সে যুগের উচ্চশ্রেণী—রবর্তী মধ্যবিত্তের সঙ্গে এঁদের জীবন্ত কোনও যোগ াই। কিন্তু সাম্রাজ্য শাসনের আওতায় এঁরাও পারলেন । নিজেদের আর্থিক সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে, এঁদেরও জাত খায়াতে হল। উনিশ শতকের তৃতীয় কি চতুর্থ দশক থেকে শুরু করে বাঙালী বণিক ও ধনিকেরা (মুৎসুদ্দী প্রভৃতি) কি করে যে আর্থিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে ক্রমশঃ রে এলেন তার কার্যকারণসম্বন্ধ আমার জানা নেই, কিন্তু মূল ঘটনার ধারা সম্বন্ধে তো আজ সকলেই অবহিত। বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার আবর্তে বিপর্যস্ত হয়ে এঁরা আশ্রয় খুঁজলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছায়াতলে—হলেন জমিদার। অথচ এই জমিদারীরও জৌলুষ যতই থাক্, ইয়োরোপীয় অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে এর পার্থক্য এত অসহ্য রূপে প্রকট যে মনে হয় তাঁরা যেন কোন অপটু কারিগরের হাতে গড়া ইয়োরোপীয় অভিজাতশ্রেণীর বিকৃত সংস্করণ। রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থায় তাঁদের কোনও অধিকার নেই, নাগমের নিজস্ব পথ অবলুপ্ত এবং দেশের বাণিজ্যও বিদেশীর করতলগত, সুতরাং সামাজিক প্রভুত্ব বা নেতৃত্বের ক্ষেত্র সংকুচিত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে আর্থিক জীবনে কোনও দায়দায়িত্ব নেই, ফলে উদ্যোগেরও আবশ্যকতা নেই এবং শিল্পব্যবস্থাহীন আর্থিক কাঠামোয় তার প্রয়োজন নেই হয়তো, সুতরাং এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ চরিত্র-সম্পন্ন তাঁরা সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হয়ে হলেও দেশের বাস্তব জীবনের উন্নতিতে নেতৃত্ব দানে কেউ সক্ষম হলেন না। কৃষিতে নতুন কোন প্রণালী প্রবর্তন করলেন না কেউ, নতুন কোন যন্ত্রের আবিষ্কারে অগ্রসর হলেন না কোন অভিজাত, সেচের কোন ব্যবস্থায় উদ্যোগী হলেন না কোন ভূস্বামী। হয়তো দেশে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় নি বলে কৃষিজাত পণ্যের চাহিদাও ছিল না এবং তাই তাগিদ ছিল না কোন পরিবর্তন সাধনের। তাই অভিজাতশ্রেণীর যে সামাজিক নেতৃত্ব ইয়োরোপে কার্যকরী হয়েছিল এখানে তা হয় নি। তবু মনে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চিরস্থায়িত্ব যদি অত অটুট না হত তা হলে হয়তো শ্রেণী হিসাবে উনিশ শতকের বাঙালী ভূস্বামী আরও কিছুটা প্রাণলক্ষণ প্রকাশ করতে পারতেন। অবশেষে একদিকে ভূমিব্যবস্থার ক্রমিক অবনতি অন্যদিকে দায়ভাগ-শাসিত সমাজে ভূসম্পত্তির ক্রমবিভাজনের ফলে এই সব অভিজাতও দরিদ্র হতে হতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের দলে নাম লেখালেন। কিন্তু সেটাকে মধ্যবিত্তের বিকাশ বলা যায় না, মধ্যবিত্তের স্তরে পতন বলতে হয়। এই কালে মধ্যবিত্তের নিজস্ব সমাজ-জীবনে সদর্থক কোন প্রেরণা এঁরা দিতে পারেন নি বরং অবিশ্বাস ও উন্মার্গগামিতার আবর্ত রচনা করে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছেন শুধু।

বস্তুতঃ বাঙালী মধ্যবিত্তের সৃজন ও বিস্তার ঘটেছে ইংরেজ রাজশক্তির বনিয়াদপত্তন ও প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের-ই অনুচর হিসেবে। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল ব্রিটিশ শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারবশতঃ তারই মধ্য থেকে এদেশী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়।* লক্ষণীয় এই যে উনিশ শতকের সূচনাকালে এদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণী বলতে স্বতন্ত্র কোন শ্রেণী ছিল না। ছিল না, কারণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে জয়ী হবার পূর্ব পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুরস্করগণ স্বয়ং নিশ্চিত ছিলেন না যে ভারতভূখণ্ডে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েমী হবে। মারাঠারা উৎসন্ন হবার পর ভারতবর্ষে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাজশক্তি রইল না, কারণ শিখেরা ছিলেন পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সীমাবদ্ধ এবং তখন তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের প্রভুত্ব এখানে স্থায়ী হল। তখনই তারা শাসনের প্রয়োজনে এদেশে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পত্তনে উদ্যোগী হলেন। প্রথমে তাঁরা নিজেদের শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধেও সুনিশ্চিত ছিলেন না, তাই যে দুটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কাশীর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ ও কোলকাতা মাদ্রাসা—সে দুটিই ইংরেজ বিচারাধীপদের সাহায্যার্থে হিন্দু ও মুসলমান আইনের ব্যাখ্যাতা

---

* আদিতে উচ্চবর্ণের থেকে উদ্ভূত বলেই এদেশের মধ্যবিত্ত ও ভদ্রলোক শব্দ দুটি সাধারণ কথোপকথনে সমার্থক।

পণ্ডিত ও মৌলবী উৎপাদনের জন্য। কিন্তু ইতোমধ্যেই হৌসের কর্মচারী ও শিপ সরকার হবার প্রয়োজনে অনেকের ইংরেজী শেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ডিক্রুজ সাহেব থেকে জগমোহন বসু ও গৌরমোহন আঢ্যের মত অনেকেই শুধু ইংরেজী ভাষা নয়, ক্ষেত্রবিশেষে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিতরণে অগ্রণী হয়েছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে ইংরেজরা যখন সন্দেহের দোলায় দোলায়মান, এদেশী বুদ্ধিজীবীরা তখন তার আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছেন। ১৮২৩-এ তাই রামমোহন লর্ড এল্‌মহার্স্টকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছেন যে এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক। অন্যান্য কারণ ছাড়াও তার ফলেই লোক যোগ্যতর সামাজিক প্রাণী (better members of society) হতে পারবে। তাই ১৮১৭তে লটারীর টাকার ওপর নির্ভর করে যে স্কুল বুক সোসাইটির পত্তন হল সেই সোসাইটির উপর নির্ভর করে ইংরেজী শিক্ষা থেমে থাকে নি। অবশেষে ১৮২৫-এ ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, দেশের প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী ব্যক্তিরা সকলেই আপনাপন সন্তানকে ইংরেজী শিক্ষাদানে অগ্রসর হয়েছেন, কারণ তখন একথা প্রচার হয়ে গেছে যে, লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। আর লেখাপড়া অর্থেই ইংরেজি লেখা ও ইংরেজি পড়া (ইংরেজি শিক্ষার তাগিদ যে কি প্রবল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে)। ইংরেজিনবিসদের পক্ষে মহামান্য কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে ও পরে কুইনের রাজ্যে কর্মযোগ তো বাঁধা আর সামান্য দুটো কথা শিখে হাতের লেখাটুকু পর্যন্ত যারা পাকা করতে শিখেছে তারাও পড়ে থাকবে না, হৌসের কর্মপ্রাপ্তি তাদের হবেই। এইভাবেই বেড়ে উঠেছে বাঙালী মধ্যবিত্ত—অষ্টাদশ শতকের সমাজজীবন যাদের কাছে দূরতম নক্ষত্রের চেয়েও সুদূর, যাদের পেশা ইংরেজের চাকরি এবং শিক্ষা ইংরেজি ভাষা। এই যুগে তাই মধ্যবিত্তের সঙ্গে কোথাও ইংরেজের বিরোধ বাধে নি বরং চতুষ্পার্শ্ব ইংরেজের স্তবগানে মুখর। আর তাই জন্যেই বোধ হয় এই যুগে ইংরেজি শিক্ষার সদর্থক দিক যত সহজে ও গভীরে সমাজ-মানসে প্রবেশ লাভ করেছে পরবর্তী কালে তা হয় নি। সতীদাহ রদ করা থেকে যার শুরু (১৮২৯), বিধবা-বিবাহ আইনত সিদ্ধ করার মধ্যে (১৮৫৬) তার পরিণতি ঘটেছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে, এবং শিক্ষাবিস্তারে [illegible]ক্তিগত উদ্যোগ, উদ্যম ও বদান্যতার যে প্রাচুর্য দেখা [illegible]ছে আজও তা সমাজের স্মৃতি-চেতনা থেকে সম্পূর্ণ [illegible] হয় নি। অন্যদিকে ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সম্প্রসারণ[illegible] বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই ঐকান্তিক যোগের প্রত্য[illegible] পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, যখন কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ দু-একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ বাদ দিলে, বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্মিলিতভাবে ইংরেজ রাজশক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, কারণ উভয়ের স্বার্থ যেমন তাঁদের চেতনায় অভিন্ন ছিল তেমনি সংস্কৃতিসূত্রেও তাঁরা নবাগত ইংরেজের কাছেই বদ্ধ ছিলে[illegible] প্রাক্তন ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আ[illegible] যোগ ছিল না তাঁদের। এবং এইভাবে চাকরির মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে তাঁদের যে স্বার্থ-সংযোগ ঘটেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে সেই সংযোগ রীতিমত বন্ধন হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজের চাকরিতে অর্জিত আয়ের উদ্বৃত্ত প্রবাহিত হল ইংরেজের আইনে নির্দিষ্ট ভূমিস্বত্ব সংগ্রহের পথে। এদেশে শিল্পব্যবস্থা ছিল না, কাজেই ভিক্টোরীয় মধ্যবিত্তের আর্থিক ভিত্তিস্বরূপ যে শিল্পসমৃদ্ধি ও কারখানার শেয়ার বা পুঁজির অংশ কাজ করেছে এদেশে, তৎপরিবর্তে এল এই জমিদারী—ভদ্রাসনে ভদ্রস্থ হয়ে রাজাসাজার পালা। কিয়ৎকালের জন্য মনে হয়েছিল হয়তো এদেশী মধ্যবিত্তও বিলেতী মধ্যবিত্তের অনুরূপ, ননকনফরমিস্টদের সঙ্গে তুল্য হলেন ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও আত্মবিচারে বিশ্বাসী। কিন্তু হায়, প্রভেদ যে মূলে, তাই এদেশী অভিজাত যেমন ইয়োরোপীয় অভিজাতের ব্যঙ্গচিত্র হয়েছিলেন মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কারণ এদেশের মধ্যবিত্তসমাজ

কটা যুগের উদ্বোধক বা স্রষ্টা নয়, নতুন অবস্থার সৃষ্টি াত্র। তাই অবস্থার পরিবর্তন যখন ঘটল, তখন তাঁদের ানসমণ্ডলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল দ্রুত এবং চিন্তা- গতে এমন একটা দ্বিধারার উদ্ভব হল যার সমাধান ্তীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পূর্বে ঘটে নি।

পরিবর্তন এল যথারীতি ইংরেজ শাসনের চরিত্র রিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৫৭-১৮৫৭) মন কি সংহতি সাধনের যুগেও যে বাঙালী মধ্যবিত্ত ংরেজের মিত্র রূপে গৃহীত এবং অনুগৃহীত হয়েছিল াম্রাজ্য সুসংহত হবার* পর অকস্মাৎ ইংরেজের কাছে ারাই অসহ্য হয়ে উঠল। বাঙালী মধ্যবিত্তের শেক্সপীয়র ্লটন আবৃত্তি বাড়াবাড়ি কপচানি বলে মনে হল াদের কাছে, তাদের সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাকে অবজ্ঞেয়ের ল্লম্ফন জ্ঞান করলেন তাঁরা। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গীর এই রিবর্তন অতি স্বাভাবিক কারণেই এসেছিল। সাম্রাজ্য- ্সন দৃঢ়ভাবে কায়েমী হবার পর, সারা ভারত জুড়ে ্লপথ ইংরেজ সেনা ও পণ্যের গতি অবার করে তোলার ়, বাঙালী মধ্যবিত্তকে মিত্ররূপে পোষণ করার কোনও ারণ আর ইংরেজের ছিল না। অপর পক্ষে তাঁরা ্পষ্টই দেখছিলেন যে এই শিক্ষিত শ্রেণী ক্রমশই প্রশ্নমুখর সমালোচক হয়ে উঠছে—চীন থেকে পারস্য ও াফগানিস্তান পর্যন্ত সারা এশিয়া জুড়ে তাদের দাঙ্গাবাজ ্রাজ্যনীতির আর্থিক ভার পদানত ভারতের রাজস্ব, ও ্রুমোক্ষণের দায় ভাড়াটে ভারতীয় সেপাইদের ওপর পিয়ে দেওয়ার নীতিকে চোস্ত ইংরেজিতেই সমালোচনা ্রতে আরম্ভ করেছে তারা। প্ল্যান্টারদের বিরুদ্ধেও ান্দোলন করছে এদিকে ওদিকে। দেশের শিল্প ও ষিপণ্যের ওপরেও আবগারী কর চাপিয়ে আর্থিক ্বনের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টাকে Pax Britannica-র ্বগান শুনিয়ে ঢাকা যাচ্ছে না। তার সুতরাং লোচন ্রুকষায়িত করতে হল।

অন্যদিকে বাঙালী মধ্যবিত্তও অনুভব করলেন যে তাঁরা যতই সমাজ সংস্কার করুন ইংরেজের মন তাঁরা পাবেন না। আসলে হিন্দু সমাজের দোষ-ত্রুটিতে ইংরেজের কিছু যায় আসে না, সেগুলোকে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্য ইংরেজের নিজের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তি সংগ্রহ করা। এবং বাঙালী যাই করুন ইংরেজের বিদ্রূপ ও অপমানের স্রোত বন্ধ হবে না, কারণ, তার উৎস অন্যত্র। অথচ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ রুদ্ধ হবার পর আর্থিক ক্ষেত্রেও সঙ্কোচন এল এবং ইংরেজী শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে মধ্যবিত্তের সংখ্যা হল সম্প্রসারিত।

সৃষ্টি হল শিক্ষিত বেকারের সমস্যা যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এবং এই নৈতিক বিরাগ ও অভিমান, রাজ- নৈতিক অসন্তোষ এবং আর্থিক ক্রমাবনতির আবহাওয়ায় উদ্ভূত হল আমাদের জাতীয়তাবাদ। হিন্দু হঠাৎ কয়েকটি দশকের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়ট হয়ে উঠল। না না, এখন আর সমাজ সংস্কার নয়, এখন পতিত ভারতের উদ্ধার করতে হলে একদিকে চাই হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অন্যদিকে ইংরেজের উৎসাদন। দুই-ই তাঁদের চিন্তায় সমার্থক প্রতিভাত হয়েছিল কারণ সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় ছিল ইংরেজি ভাবধারার আদর্শ, কাজেই, জাত্যাভিমান যখন জাগল তখন শুধু ইংরেজের রাজনৈতিক সংস্রব নয়, নৈতিক সংস্রব পর্যন্ত ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হল। এর ফলেই জাগল সেই দ্বিধারা—সমাজ সংস্কারে যাঁরা অগ্রণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা হলেন পশ্চাদপর এবং রাজনৈতিক সমরে যাঁরা অগ্রসর, সামাজিক ব্যবহারে প্রত্যেকটি সংস্কার, প্রত্যেকটি পরিত্যাজ্য প্রথা তাঁরা 'আমাদের' বলে আঁকড়ে ধরলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের যদি কোনও মৌলিক দুর্বলতা থেকে থাকে তবে বোধ হয় তা এই ভাবভিত্তির গহনে। নয়া হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান (Neo-Hindu Revival) বলে অভিহিত এই আন্দোলনের দুর্বলতা আজ আর তর্ক করে বোঝাতে হয় না—ইতিহাস নির্মম করে নিজেই তা নির্দেশ করে দিয়েছে। যে জাতিভেদমূলক হিন্দুত্বের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আস্ফালনের অন্ত ছিল না; এবং শুধু আস্ফালন নয় ত্যাগ ও সাধনাও সঞ্চিত হয়েছিল যার সমর্থনে, যাকে

* লর্ড লিটনের দরবার (১৮৭৭) এই সংহতি সাধন পর্বের সমাপ্তি সূচনা করে।

সত্য বলে মেনে ১৯০৫-র আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করতে সক্ষম হয়েছিল (১৯১১) সেই হিন্দুত্ব অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বঁটিতে টুকরো টুকরো হয়ে শেষ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দী অতীত না হতেই বঙ্গভঙ্গকেই নতশিরে মেনে না নিয়ে পারল না।

বাঙালী মধ্যবিত্ত তাঁদের অল্পাধিক শতাব্দীকালের ইতিহাসে দুটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সে দুই স্বপ্নই বাস্তবের কঠিন অভিঘাতে নির্মমভাবে বিনষ্ট হয়েছে। প্রথমে তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজ সংস্কারের, কিন্তু গণসমাজের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ যোগ—জাতিভেদ, ইংরেজের চাকরি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, এই ত্রিশূলের কল্যাণে কোনদিনই গভীর ছিল না, কাজেই সমাজ-মানসের গভীরে তাঁরা রেখাপাত করতে পারেন নি। এবং আর্থিক জীবনে তাঁদের নিজস্ব কোনও প্রতিষ্ঠা ও সক্রিয় কোনও ভূমিকা না থাকায় তাঁদের প্রত্যয়গুলিও কখনও গভীর ও দৃঢ়মূল হতে পারে নি। তাই সাম্রাজ্যের নীতির হাওয়াবদল হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সমস্ত পাশ্চাত্য বিদ্যা নিয়ে অকস্মাৎ উগ্রভাবে পশ্চাদমুখী হয়ে পড়লেন এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় জাতিভেদক্লিষ্ট সমাজে প্রত্যেক গলিত প্রথাকে অন্ধ সমর্থন জানালেন সোৎসাহে। তাঁদের প্রথম স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হল।

এরপর তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতীয় স্বাধীনতার যা তাঁদের সজ্ঞান চেতনায় হিন্দুজীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলে মুকুরিত হয়েছিল। এর জন্য এদেশের যুবশক্তি মরণপণ করে অগ্রসর হয়েছে, চিন্তাশীলরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, ইংরেজের আইনের মহিমার মুখোশ চিরতরে ছিঁড়ে ফেলে দেশের বরেণ্যরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অপসৃত হয়েছেন। কিন্তু তবু তার থেকে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদও রক্ষা পায় নি। পূর্ববঙ্গে শুধু মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর নয়, বর্ণহিন্দুর সঙ্গে তপশীলী সম্প্রদায়ের বিরোধ দানা বেঁধে, উত্তরোত্তর স্ফীত হয়েছে এবং মধ্যবিত্তের আর্থিক জীবন ক্রমশঃ সংকুচিত হতে হতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিশেষতঃ তার যুবশক্তি, ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত আশা ও আত্মিক সম্পদ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আজকের উচ্ছৃঙ্খল অন্ধতায় আত্মহারা হয়েছে।

বস্তুতঃ বলা যেতে পারে যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙালী মধ্যবিত্ত নতুন করে আর কোনও স্বপ্ন দেখে নি। তবু যতদিন পরাধীনতার পীড়ন প্রত্যক্ষ ছিল ততদিন যুবশক্তির সামনে লক্ষ্য একটা সুনির্দিষ্ট ছিল, তারপর কি হয়েছে তা আমরা সকলেই জানি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে যা এসেছে তা শুধু অবিশ্বাস—অবিশ্বাস নিজের প্রতি, পূর্বপুরুষের প্রতি এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতি। পাশ্চাত্যের সমস্ত জলুষ সত্ত্বেও তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসর্বস্ব শয়তান এ চেতনা একদিকে দৃঢ় হয়েছে, অন্যদিকে এই বিংশ শতকের দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হিঁদুয়ানির গোবর-মাখানো জয়পতাকা উড়িয়ে যে আত্মনিপীড়ন ব্যতীত কোনও কিছু হবে না—সে বোধও চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে। আর পারিপার্শ্বিক জগতে কোনও প্রতিষ্ঠা না থাকায় আর্থিক পরবশ্যতার ফলে, এসেছে অনাস্থা—পারিপার্শ্বিকের ওপর, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওপর।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাই অনেকে মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয় অস্বীকার করতে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং তা গৃহীতও হচ্ছে। সাম্যবাদ মধ্যবিত্ত মানসে জনপ্রিয় এবং লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক নাগরিক মধ্যবিত্তেরাই। তবু প্রশ্ন জাগে আত্ম-অস্বীকরণের পথে কেউ কি কোনওদিন আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছে? লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করবে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ দায়িকেরা? আর শিল্প-ব্যবস্থায় যারা শ্রমিকও নয়, পরিচালকও নয়, তাদের সাম্যবাদ বা অন্য যে কোনও বাদেরই বা মূল্য কি? কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় কোনও ব্যক্তিবিশেষের দেয় নয়—বোধ হয় একমাত্র ইতিহাস-পুরুষই এর সমাধানে সমর্থ।

ধূলার ধরণী

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

আবার পিছিয়ে পড়েছিল নীলমাধব চক্রবর্তী। থমকে দাঁড়িয়ে দু চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে ামনের দিকে তাকাল সে। ছেলে দুটিকে আর দেখা যায় া। স্ত্রী অন্নপূর্ণাও অনেক দূরে চলে গিয়েছে। নিরাশ ল নীলমাধব—সে এখন প্রাণপণে চেষ্টা করলেও নিজে হেঁটে গিয়ে অন্নপূর্ণাকে ধরতে পারবে না বুঝে পথের ারেই একটি শিলাখণ্ডের উপর বসে পড়ল সে।

এরকম অবস্থায় স্ত্রীকে কাছে পাবার জন্য এই তার কৌশল।

এবারও অব্যর্থ প্রয়োগ: অভ্যাসমত এগিয়ে গয়েছিল অন্নপূর্ণা। কিন্তু আরও পুরনো এক অভ্যাসবশে থকে থেকে পিছন দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল সে। কবার পিছনে চেয়ে স্বামীকে দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন ল অন্নপূর্ণা, চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সে হাঁটতে াগল বিপরীত দিকে।

মিনিট পাঁচেক পরেই মুখোমুখি দুজনে। হাসি ফুটল ন্নপূর্ণার উদ্বিগ্ন মুখে; কিন্তু ভর্ৎসনার স্বরে সে বলল, াবার হাঁফ ধরছে তো? অত করে তখন তোমায় লাম যে এই বয়সে এত কষ্টের তীর্থ না হয় না-ই করলে ুমি। তা তুমি ভাবলে যে আমি তোমার ধর্মের পথে াটা দিতে চাই।

নীলমাধবের খুবই চেনা অন্নপূর্ণার ওই কণ্ঠস্বর, ওই ভর্ৎসনা। গায়ে না মেখে সে হেসেই উত্তর দিল, বার-ার যে বয়সের খোঁটা দিচ্ছ তুমি, তা কী এমন বয়স য়েছে আমার? সবে তো ষাট পার হয়েছি।

হ্যাঁ, ষাট বছরের খোকা তুমি।

খোকা না হলেও বুড়ো নই। আর দোষ যদি বল বে তা আমার বয়সের নয়, এই পথের।

মিথ্যা বলে নি নীলমাধব। হিমতীর্থ কেদারনাথে যাবার পায়দলমার্গ—মানে হাঁটাপথ। স্বয়ং পাণ্ডারাই ওকে বলে কেদারের "বিকট পন্থ"। বিকট না হলেও কঠিন তো বটেই। কেবল চড়াই আর উতরাই। হয়তো এক মাইল পথ খাড়া উপর দিকে উঠবার পর দেড় মাইল নীচে নামা এবং তার পরেই আবার দু মাইল উপরে ওঠা। একদিকে আকাশসমান উঁচু পাহাড়, অপরদিকে মন্দাকিনীর গর্ভ পর্যন্ত হয়তো মাইলখানেক খদ। দু দিকেই নিবিড় অরণ্য। শাখায় পাতায় লতায় গুল্মে যেন পাথরের মতই ঠাস-বুননি সেই বনের। ভরদুপুরেও পথে মনে হয় সন্ধ্যার অন্ধকার। হাঁফ ধরে সেই পথে চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে; হাঁটু-ভাঙা উতরাই-পথে প্রতি মুহূর্তেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরবার ভয়।

আক্ষরিক অর্থেই দুস্তর পথ। পায়ে পায়ে বাধা। কোথাও ঝরনার জল গড়িয়ে নামছে উপর থেকে, কোথাও আবার দইয়ের মত অর্ধেক গলা বরফের কাদা। সজীব বাধাও আছে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলে কোন কোন ধনী যাত্রী, পিঠে বোঝা চাপিয়ে ছাগলের পাল নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা, পশমের চলন্ত গুদাম পালে পালে ভেড়া, মোষের পাল আর সম্পূর্ণ সংসার নিয়ে চলে যাযাবর ভৈসাল। অদৃশ্য বাধা সত্যিই ভয়ঙ্কর। থেকে থেকেই বাঁক নিয়েছে পথ। মোড়ে মোড়ে শেওলা আর গুল্মের ঘন আবরণের নীচে মারাত্মক গর্তের চোরা ফাঁদ পেতে যেন ঘুপটি মেরে বসে আছে যমরাজার ছদ্মবেশী সিপাই-সান্ত্রীরা।

দুর্গম পথে এত সব বাধা এড়িয়ে চলতে গেলে অসহ্য চাপ পড়ে দেহের স্নায়ুগুলির উপরেও। একমাত্র ভরসা পথের ধারে ধারে ছুটকো পাথরগুলি। নিতান্তই আর চলতে না পারলে ওদের কোন একটির উপর বসে পড়া যায় একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে।

তুমিও বসে একটু জিরিয়ে নাও।—নীলমাধব স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল।

অন্নপূর্ণা রাজী হল না, ছেলেদের জন্যও দুর্ভাবনা আছে তার মনে।

এবার এক সঙ্গেই চলল দুজনে। ঠিক পাশাপাশি অবশ্য নয়, এ পথে সেরকম চলাই যায় না। নীলমাধবকে সামনে রেখে অন্নপূর্ণা চলল তার পিছনে। কিন্তু খানিকটা চলবার পরেই বাধা পড়ল।

এবার আর চলন্ত সংসার নয় ভৈসালের। বাঁ দিকে পাহাড়ের ঢালু কোল থেকে শুরু করে চলার পথেরই প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে সম্পূর্ণ সংসার পেতে বসেছে সে। স্থাবর অস্থাবর নানারকম সম্পত্তি তার। তাঁবু পড়েছে দুটি; অনেকগুলি হাঁড়ি কড়া, কয়েকটি বস্তা ও একটি কাঠের বাক্স বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মোষও আছে কয়েকটি। দেখেই মনে হয় যে খুব বড় পরিবার। কিন্তু আপাততঃ কেবল একটি পুরুষই চোখে পড়ল নীলমাধবের। আর সেই লোকটিই তার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বেঁটেখাটো মানুষটি। পরনে কম্বলের পাৎলুন আর বেঢপ একটি কোট। লম্বা চুল আর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে মুখখানি তার ভাল দেখা যায় না।

তবু সেই মুখেই আপ্যায়নের হাসি হেসে লোকটি নীলমাধবকে উদ্দেশ করে বলল, জড়ী-বুটী লোগে? কঠিনসে কঠিন জহরভী ইসসে পানি হো যাতা হৈ।

উত্তরে নীলমাধব বলল, দেখাও।

কিন্তু পিছন থেকে তাড়া দিল অন্নপূর্ণা; তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলল, না, দেখতে হবে না। এই অজুহাতে আবার বুঝি গল্প জমাবার মতলব তোমার? সাপের বিষ থেকে সাপিনীর খোঁজ পড়বে। না, ওসব আজ আর নয়। অনেক পিছিয়ে পড়েছি আমরা।

শুধু মুখের কথায় নয়, হাত দিয়েও স্বামীকে একটি ঠেলা দিল অন্নপূর্ণা।

সত্যিই আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল নীলমাধবের। সুতরাং ক্ষুণ্নকণ্ঠেই ভৈসালকে সে বলল, এবার আমাদের সময় নেই খাঁ সাহেব। তবে ফিরতি পথে তোমার মাল কিছু কিনব আমি; বসে তখন গল্পও করব তোমার সঙ্গে।

চলতে চলতেই কথাগুলি বলেছিল নীলমাধব। শুনে কেমন অবস্থা হল লোকটির মুখের তাই দেখবার উদ্দেশ্যে সে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করেছিল। বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে মুখ ফিরবে তার। কিন্তু অর্ধেকটা ফিরতে না ফিরতেই তার চোখ দুটির সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

তাঁবু ছাড়াও বাঁ দিকে নীলমাধবের দৃষ্টিপথে এতক্ষণ আর একটি বাধা ছিল—বিশাল একটি মহীরুহ। সুতরাং এতক্ষণ যা তার চোখে পড়ে নি তাই এখন সে দেখতে পেল। হাঁড়ি-কড়া ও মোষ ছাড়াও ভৈসালের সংসারে রয়েছে একটি মেয়ে।

কত বর্ণের শত তালি দেওয়া ঘাগরা ও কাঁচুলি পরা যাযাবরী। সেও মুখ তুলে চেয়েছে নীলমাধবের দিকে। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল তাদের।

নীলমাধবকে নিশ্চল দেখে অন্নপূর্ণা বলল, কি হল আবার? থামলে কেন?

নীলমাধব অস্ফুট স্বরে বলল, এই তো সেই!

স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্নপূর্ণাও দেখল মেয়েটিকে, দেখে বিহ্বলস্বরে সে বলল, কি বলছ তুমি? কে?

সেই মেয়েটি। সেই—

যা ছিল সুদূর অতীতের স্মৃতিমাত্র, তাই এখন নীলমাধবের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

২

বছর পঞ্চাশেক আগের কথা।

বছর ষোল মাত্র বয়স নীলমাধবের। পিতা বেণীমাধব তখন বিহারের আরা শহরে কলেক্টর সাহেবের আপিসে কেরানী। নীলমাধব স্থানীয় হাইস্কুলে তার চেয়ে বয়সে বড় এবং অধিকাংশই বিবাহিত সহপাঠীদের সঙ্গে নবম শ্রেণীতে পড়ে। শেখে শিক্ষকদের কাছ থেকে যতটুকু, সহপাঠীদের কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী।
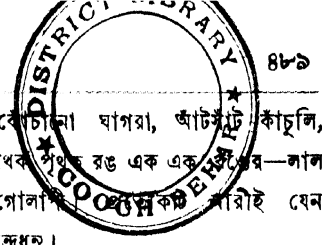
সেই তার সহপাঠীদেরই একজন সেদিন বিকেলে নীলমাধবকে পথে দেখতে পেয়ে নিজের বাঁ হাতখানা তার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, দেখ, কেমন চমৎকার ছবি আঁকিয়ে নিয়েছি।

ছবি মানে উলকি। ছেলেটির হাতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত কালো হয়ে জমে আছে তখনও। তবু তাজমহলের নীল রঙের ছাপ বেশ ভালই দেখা যায়। দেখে লুব্ধ হয়ে নীলমাধব বলল, কোথা থেকে তোলালি রে? কে ছেপে দিল?

যাযাবর মুসলমানেরা।—উত্তর দিল ছেলেটি: ওদিকে আমবাগানে ছাউনি পড়েছে তাদের। আর কাছেই পথের ধারে বসে উলকি এঁকে দিচ্ছে সেই দলের মেয়ে-পুরুষ পটুয়ারা। এক একটির জন্যে মজুরি মোটে দু পয়সা।

সেই ছেলেটির সঙ্গেই সোৎসাহে সেখানে ছুটে গেল নীলমাধব।

শহরের উপান্তে প্রকাণ্ড আমবাগানটি—আগের দিন বিকেলেও একেবারে ফাঁকা দেখে গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ তা মৌচাকের মতই রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে উঠেছে। যাযাবরের জমজমাট সংসার সেখানে। অগুনতি ভেড়া, অনেকগুলি মোষ, ডজনখানেক ঘোড়া না খচ্চর আর গলায় বকলস আঁটা বাঘের মত তিন-চারটি কুকুর অতবড় আমবাগানটার অধিকাংশ জায়গাই দখল করে বসেছে। ঠিক রাজপথের গা ঘেঁষে পড়েছে তিন-চারটি তাঁবু। ওর সামনে অদ্ভুতদর্শন একদল মানুষ।

পুরুষদের পরনে ঢোলা পাৎলুন ও কুর্তা; তার উপর মোটা গরম কাপড়ের হাতা-কাটা কোমর পর্যন্ত খাটো কোট। কত যে তালি পড়েছে প্রতি প্রস্থ পোশাকের এক একটি খণ্ডে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। তার উপরে অত্যন্ত নোংরা সেই পোশাক। নোংরা তাদের দেহও। তবে সুঠাম, শক্ত, দীর্ঘ গঠন। ফরসা রঙ। মুখে চাপদাড়ির জঙ্গল বা বিদঘুটে মুসলমানি সুর থাকলেও চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় এক একটি মুখের দিকে।

মেয়েদের সাজ আরও চটকদার; রূপ আরও সুন্দর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনের তীক্ষ্ণতা ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ধাঁধা লাগায় চোখে। কোঁচানো ঘাগরা, আঁটসাঁট কাঁচুলি, মাথায় ওড়না। পৃথক পৃথক রঙ এক একটির—লাল সবুজ হলুদ নীল গোলাপী। এক একটি নারীই যেন এক একটি জীবন্ত ইন্দ্রধনু।

এদেরই দুজন পুরুষ ও দুটি নারী তাঁবু থেকে একটু দূরে এসে বসেছে লোকের গায়ে উলকি এঁকে পয়সা রোজগার করবার উদ্দেশ্যে। মক্কেলের ভিড়ও খুব।

নীলমাধব তার বন্ধুর সঙ্গে যখন সেখানে পৌঁছল তখন তিনজন কারিগরের হাতেই কাজ রয়েছে। তবু নতুন মক্কেল দেখেই পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যার বয়স সেই রহমান সবচেয়ে কমবয়সী মেয়েটিকে উদ্দেশ করে হুকুম দিল, বাবুজীকা কাম জলদি কর্ দে মুনিয়া, আচ্ছা এক তসবির খিচ দে।

উলকি ফুটিয়ে তুলতে ব্যথা লাগে হাতে। তবে বেশ ক্ষিপ্র হাত মেয়েটির। নীলমাধব তিন-চার বারের বেশী উঃ আঃ করবার সময়ই পেল না। এবং তার পরেই নিজের হাতের উপর সম্পূর্ণ একটি উটের ছবি দেখতে পেয়ে সেটুকু ব্যথাও ভুলে গেল সে।

কাজ শেষ করেই হাত পাতল মেয়েটি; অপর হাতের দুটি আঙুল দেখিয়ে মুখে সে বলল, দো পৈসে দো।

প্রসারিত হাতের উপর একটি আনি ফেলে দিয়ে নীলমাধব বলল, পয়সা নেই আমার কাছে। তুমি দু পয়সা আমাকে ফেরত দাও।

বুঝি সেই জন্যই মোড় ঘুরল ঘটনাস্রোতের।

মুনিয়ার চেয়ে বেশী বয়সের যে স্ত্রীলোকটি তার কাছে বসে কাজ করছিল সে তার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি নীলমাধবের মুখের উপর বিন্যস্ত করে বলল, তুমনে বাবু যো জিন্দা তসবীর দেখী উসকে লিয়ে ঔর দো পয়সে নহী দেওগে?

বক্তব্যের অর্থ স্ত্রীলোকটির চোখের দৃষ্টিতে—একটি চোখ তার নীলমাধবের চোখের উপর, আর একটি গিয়ে পড়েছে মুনিয়ার মুখে। দুটি চোখেই দুষ্টুমির হাসি চিক-চিক করছে।

নীলমাধবকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে যে বেশী বয়সের

বিহারী ছেলেটি তারও চোখে পড়ল ওই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পড়তেই সে হো হো করে হেসে উঠে বলল, দে রে নীলুয়া, জরুর দেনা চাহিয়ে।

এতক্ষণে মুনিয়ার মুখের উপর চোখ পড়ল নীলমাধবের। তারই সমবয়সী হবে মেয়েটি। যেমন গঠন, তেমনি রঙ, তেমনি স্বাস্থ্য। তেমনি তার বেশভূষাও। সবুজ সাটিনের টান টান কাঁচুলি আলতোভাবে ছুঁয়ে টকটকে লাল ফিনফিনে ওড়নাখানি তার পিঠের উপর দিয়ে নেমে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। মাথায় আবরণ নেই। এক-মাথা রুক্ষ চুলের সাপের মত লকলকে একটি বেণী আবার পিঠের দিক থেকে কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর এসে পড়েছে তার। কনকচাঁপা রঙ মুখের। তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই ফুটে উঠেছে তার টিকলো নাক আর কালো চোখ দুটির ঝকঝকে দৃষ্টিতে ইস্পাতের শাণিত তীক্ষ্ণতা।

দেখেই নীলমাধবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত হঠাৎ যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। একেবারেই দুর্বোধ্য কি যেন একটা অনুভূতি তার মনে; ওই শীতকালেও হঠাৎ যেন ঘেমে উঠল সে। ভাল মন্দ একটি কথাও না বলে নীলমাধব ওখান থেকে তখনই একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল।

তারপর সারাটা রাত কাটল নীলমাধবের যেন কেমন এক জ্বরের ঘোরে। সদ্য উলকি-আঁকা হাতখানি তার যত টনটন করছে ততই অদূরে আমবাগানের মধ্যে তার দেখা যাযাবরদের সেই বিচিত্র সংসারের প্রতিটি দৃশ্যই যেন ছায়াচিত্রের মত তার স্মৃতির পটে বারবার ফুটে ফুটে উঠছে। বিরাট ও বিচিত্র সেই ছবির কেন্দ্রবিন্দু মুনিয়ার মুখখানি। তা তাকে টানছে। পরদিন স্কুলে গিয়েও পড়ায় মন বসল না নীলমাধবের। ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে সে চলে গেল সেই আমবাগানে।

যে কারণেই হোক, কালকের মত যাযাবরেরা আজ পথের ধারে উলকি আঁকতে বসে নি। তাঁবুর সামনে বসে বাঁশের কাজ করছে দুজন পুরুষ। সেই রহমান মেটে গড়গড়াতে দীর্ঘ একটি নল লাগিয়ে বসে বসে তামাক টানছে। একটু দূরে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করছে মেয়েরা। সেই দলেই মুনিয়াকেও দেখতে পেল নীলমাধব।

অন্য কাজ করছে সে। পা ছড়িয়ে বসেছে মেয়েটি। তার সামনে শিকল দিয়ে বাঁধা একটি কুকুর। উভয়ের মাঝখানে বড় একটি কানা-উঁচু থালায় ভাতের সঙ্গে মোটা মোটা কয়েকখানা মাংসের হাড়। থালা থেকে খাচ্ছে কুকুরটি। মেয়েটি আদর করে খাওয়াচ্ছে তাকে। শাসন ও আদরের মাখামাখি—চড়-চাপড়ের সঙ্গে দু-একটি চুমোও পড়ছে ওই কালো কুকুরটার এঁটো মুখের কাছাকাছি কপাল বা গালের উপরেও।

আমবাগান পর্যন্ত একরকম ছুটেই গিয়েছিল নীলমাধব। কিন্তু মুনিয়াকে দেখবার পরেই গতি বন্ধ হল তার। তারপর যেন না আছে তার এগিয়ে যাবার সাহস, না ফিরে যাবার ইচ্ছা। ভীরু চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে চুপ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

মুনিয়াও দেখল তাকে। বার দুই চোখাচোখি হল দুজনের। তারপর অকস্মাৎ মুনিয়া তার ওই সুন্দর মুখে নিতান্ত বেমানান একটি ভেংচি কেটে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, ক্যা দেখতে হো?

অপ্রস্তুত হয়ে নীলমাধব বলল, কুছ নঁহী।

ভাগো য়হাঁসে।—মুনিয়া এবার ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল ওই কুকুরটিও। সে যেন বাঘের গর্জন।

ভয় পেয়ে পালিয়েই যাচ্ছিল নীলমাধব, কিন্তু তখনই তার কানে এল একেবারে বিপরীত সুরের আমন্ত্রণ: ডড়ো মৎ বাবু; আও, ইধর আও।

সেই রহমান। চোখের দৃষ্টি তার অবশ্য তেমন ভাল মনে হয় না, বড় বেশী তীক্ষ্ণ যেন তা। কিন্তু মুখে সে হাসছে। সুতরাং খুব আশ্বস্ত না হলেও পায়ে পায়ে এগিয়ে ছাউনির ভিতরেই চলে গেল নীলমাধব।

সেখানে আরও এক প্রস্থ অভ্যর্থনা পেল সে। তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি স্ত্রীলোক। একটি বেতের মোড়া পেতে দিয়ে সেও নীলমাধবকে বলল বস বাবু, বস।

তারপরেই সে মুনিয়ার দিকে চেয়ে আবার বলল, বড় মেয়ে হলি মুনিয়া, এখনও আদবকায়দা শিখলি নেই! মেহমানকে কি তাড়িয়ে দিতে আছে!

উত্তরে মেয়েটি তার টুকটুকে ঠোঁট উলটিয়ে বলল, আমাদের মেহমান হল কিসে? ও তো পরদেশী।

হোক পরদেশী। তাঁবুতে এসেছে তো আমাদের। এলেই মেহমান হয়।

ও!—বলে উঠে দাঁড়াল মুনিয়া; বড় বড় চোখদুটি আরও যেন বড় করে তাকাল সে নীলমাধবের র দিকে।

ততক্ষণে নীলমাধবের মনের সেই ভয় ভয় ভাবটা একবারে কেটে গিয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে এখন একটা অস্বস্তির ভাব। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কাল সে ওই বেশী বয়সের স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে।

স্ত্রীলোকটি এবার হেসে বলল, ও আমাদের মেয়ে য়া। খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু এখনও ওর ছেলেমানুষী ন না।

কথাটা ভাল লাগল নীলমাধবের। কিন্তু বিহ্বল দৃষ্টি র চোখে। অনেক যেন বেশী বয়স এ স্ত্রীলোকটির। কাল যে নারী তার মুখের উপর অদৃষ্টপূর্ব একটি লাল কটাক্ষ হেনে অশ্রুতপূর্ব একটি কথা তাকে নয়েছিল, এ তো সে নয়! বিহ্বল স্বরেই জিজ্ঞাসা ল নীলমাধব, সে কই? কাল যে ওখানে বসে উঁকি কচ্ছিল?

এবার উত্তর দিল রহমান নিজে। বলল, আয়েষার া তুমি জিজ্ঞাসা করছ বাবু? সে আমাদের বেটার , চুড়ি বেচতে গিয়েছে বস্তীতে। বস তুমি, সে বলে।

সরস উপক্রমণিকা। সুতরাং আলাপও ভালই জমল। ও অস্বস্তি দুই-ই কাটিয়ে উঠে কৌতূহলী হয়ে উঠল লমাধব।

কৌতূহল রহমানেরও। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে পরিচয় জ্ঞাসা করে নিল নীলমাধবের; খবর নিল তার বাড়ির। সরল মনে উত্তর দিল নীলমাধব। কিন্তু সে প্রশ্ন করল তুলনায় অনেক বেশী। আগ্রহে উজ্জ্বল দুটি চোখ তার। সেই চোখের দিকে চেয়ে উত্তর দিচ্ছে কখনও রহমান, কখনও তার স্ত্রী। আর বুভুক্ষুর মত গোগ্রাসে গিলছে নীলমাধব তাদের এক একটি উত্তর—সত্যাসত্য, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য বিচার করবার না আছে প্রয়োজন, না ক্ষমতা।

না, এদের সঙ্গে বাঘ ভালুক নেই; এখানে সার্কাস দেখাবে না ওরা। তিন চারদিন এখানে থেকে পুরুষেরা ছাগল ভেড়া মোষ বেচবে, আর মেয়েরা বেচবে রঙ-বেরঙের কাচের চুড়ি ও নানারকম জড়ী-বুটী। তবে খুব ভাল সার্কাসও ওরা দেখাতে পারে, সিংহের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিতে পারে রহমান নিজে, গর্ত থেকে গোখরো সাপ টেনে বের করতে পারে তার দলের যে কোন পুরুষ বা মেয়ে, আগুনের ভিতর দিয়ে বা আকাশপথে হেঁটে যেতে পারে তাদের কেউ কেউ। সে-সব খেলা ওরা দেখায় বড় বড় শহরে, দেখাবে বানারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লীতে—যেখানে ওদের দলের বড় বড় ওস্তাদেরা প্রয়োজনীয় সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষা করছে।

শুনতে শুনতে আরও উজ্জ্বল হল নীলমাধবের কৌতূহলী দুটি চোখ। এই মাটির জগৎ ছেড়ে যেন অনেক উপরে চলে গিয়েছে সে চোখের দৃষ্টি; দেখছে রক্তমাংসের নরনারী আর নয়, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মেঘলোকের দেবদেবী সব।

ভাবাবিষ্ট সেই চোখ দুটির সামনেই এসে দাঁড়াল মুনিয়া। অ্যালুমিনিয়মের ছোট থালায় এক টুকরো মাংস ও একখানা রুটি নীলমাধবের সামনে রেখে মুচকি হেসে সে বলল, খাও মেহমান।

য়হ্ ক্যা!

কেবল নীলমাধবই নয়, কাণ্ড দেখে রহমানের মুখ থেকেও বেরুল তার বিস্মিত মনের ওই জিজ্ঞাসা।

কিন্তু ভ্রূভঙ্গি করে তরল পরিহাসের স্বরে উত্তর দিল মুনিয়া, মেহমানের খাতির করতে হয় না? কেবল গল্প করলেই বুঝি চলে?

কিন্তু বাবুজী যে হিন্দু। তোর গোস্ত-রুটি খাবে কেন সে ?

তব কৈসা মেহমান হৈ ওহ্ ?

বলতে বলতে মুনিয়ার কালো চোখের দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল যেন, সেই দৃষ্টি নীলমাধবের মুখের উপর বিন্যস্ত করে সে আবার বলল, সচ ? নহী খাওগে তুম ?

আকাশেই তো উড়ে বেড়াচ্ছিল নীলমাধব, এবার আরও যেন উপরে উঠে গেল সে। মর্ত্যের বাধানিষেধ স্বর্গে অচল। শেষ সঙ্কোচটুকু জোর করে ঝেড়ে ফেলে গাঢ়স্বরে সে বলল, কাঁ্যাও নহী ! জরুর খাউঙ্গা।

কি খেল তা আর মনে নেই নীলমাধবের। মনটাই যে হারিয়ে গিয়েছে তার। ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই যাযাবরদের সঙ্গে। আরা থেকে বানারস, বানারস থেকে লক্ষ্ণৌ; তারপর আরও কত জানা ও নাম-না-জানা শহরে শহরে; কত তেপান্তরের মাঠ, কত গহন বন, কত পাহাড় পর্বত পার হয়ে। পায়ে হেঁটে পথ চলা আর নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়েও মনে হল নীলমাধবের যে সে যেন পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটে চলেছে। একা নয়, ওই একই ঘোড়ার পিঠে তার নিজের কোমর জড়িয়ে ধরে পিছনে তার বসে আছে ওই যাযাবরী কিশোরী মুনিয়া।

পরদিন নীলমাধব স্কুলে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরুল নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগে। কিন্তু স্কুলে না গিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হল সে ওই যাযাবরদের শিবিরে।

আজ বেপরোয়া ভাব তার। ছাউনির ভিতর ঢুকে গিয়ে নিজেই সে নাম ধরে ডাকল মুনিয়াকে।

ডাক শুনেই একটি তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি। প্রথমে বিস্ময়ের ঘোর তার চোখে; কিন্তু পরক্ষণেই উল্লসিত স্বরে সে বলে উঠল, যহ্ ক্যা ! ফির মেহমান আ গয়ে !

মুখের হাসি দিয়েই উত্তর দিল নীলমাধব; বাকিটুকু তার চোখের দৃষ্টিতে।

কিন্তু মুনিয়া মুখরা; ভ্রূভঙ্গি করে সে আবার বলল, তবে আজ আর গোস্ত-রুটি পাবে না মেহমান—খা[না] পাকাতে অনেক দেরি।

কুছ পরোয়া নহী।—বলতে বলতে নীলমাধব এগি[য়ে] গেল তার কাছে; নিজের পকেট থেকে দুটি লাড্ডু বে[র] করে সে আবার বলল, আজ তুমি আমার মেহমান তোমার খাতির আজ আমিই করব।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। কিন্তু লাড্ডু—মুনিয়া ঠিক জানে, মিষ্টি। আর লাড্ডুর চেয়েও বুঝি বেশী মি[ষ্টি] লাগল তার কাছে নওজোয়ান পরদেশীর ওই অপ্রত্যাশি[ত] আচরণ। সে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, দেখ[ো] আব্বাজান, মেহমাননে মেরে লিয়ে মিঠাই লে আয়া।

ততক্ষণে আর একটি তাঁবুর ভিতর থেকে বেরি[য়ে] এসেছে রহমান। নীলমাধবের আপাদমস্তক বার দু[ই] তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে দেখল সে। কিন্তু তারপ[র] কন্যার দিকে চেয়ে হেসেই সে বলল, লে বেটী, মিঠা[ই] লেনেমে হর্জ ক্যা ! লেকিন পহলে বৈঠনে তো [দে] বাবুজীকো।

কৃতার্থ নীলমাধব। কিন্তু শুধু বসে থাকতে ভা[ল] লাগে না তার। মন তার মুনিয়াকে সঙ্গে নি[য়ে] তেপান্তরের মাঠে ছুটে যেতে চায়। সেই উগ[্র] বাসনার প্রকাশ তার মুখের অনর্গল প্রশ্ন ও দুটি চো[খের] চঞ্চল দৃষ্টিতে। আবার সার্কাসের কথা তুলল সে। বা[ঘ] ভালুক ছাড়াও তো কত খেলা দেখানো হয় সার্কাসে তার কোন একটা তাকে দেখাতে পারে না মুনিয়া ?

সোজাসুজি তার মুখের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করেছি[ল] নীলমাধব; কিন্তু মুনিয়া উত্তর না দিয়ে হতভম্বের ম[ত] তাকাল তার পিতার মুখের দিকে। কন্যার হয়ে রহমান বলল, সার্কাসের দু-একটা খেলা দেখে কি হবে বাবু[জী] তার চেয়ে নাচ দেখ মুনিয়ার, দেখবে ?

গম্ভীর কণ্ঠস্বর রহমানের। কিন্তু শুনেই নীলমাধব প্রা[য়] লাফিয়ে উঠে বলল, সে তো আরও ভাল; আলব[ত] দেখব।

তবে টাকা বের কর।—বলল রহমান; এবার আগে[র] চেয়েও গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার।

ন আকাশ থেকে পড়ল নীলমাধব, শুষ্ককণ্ঠে সে টাকা!

া বাবু, পাঁচ টাকা লাগবে।

ন্ধ নীলমাধব। মুখে আর কথা ফোটে না তার। সূক্ষ্ম কয়েকটি হাসির রেখা রহমানের গোঁফ-দাড়ি করে প্রকাশ হয়ে পড়ল তার মুখের উপর। মাথাটা দুলিয়ে আবার সে নীলমাধবকে বলল, হ্যাঁ বাবু, াকাই লাগবে। মুনিয়ার নাচ যদি দেখতে চাও াকা নিয়ে এস গে।

াকাও নিয়ে এসেছিল নীলমাধব, সেই দিনই, ঘণ্টা রে, নিজের কয়েকখানা পাঠ্য বই পুরাতন পুস্তকের ানে বেচে দিয়ে।

তারপর তাঁবুর মধ্যে ঘটা করেই নাচের আসর বসল। াসরে ওদের দলের পুরুষদের মধ্যে উপস্থিত একা ন। কিন্তু স্ত্রীলোক এসে বসল তিন-চারজন। র মধ্যে একজন সেই হাস্যমুখী কৌতুকমুখরা াষা। মুনিয়া এবার কেতাদুরস্ত। এল সে পায়ে পরে, কুনিশ করল নীলমাধবকে। তারপর ঢোলকের তালে শুরু হল তার নাচ। দেখে নীলমাধব মুগ্ধ, বিস্মিত। চোখে তার সহজ দৃষ্টি ফিরে আসবার পর ম সে বুঝতে পারল যে আসরের আর সব দর্শক য়াকে ছেড়ে তাকেই দেখছে আর তার ফাঁকে ফাঁকে খে চোখে কি যেন কথা বলছে তারা পরস্পর স্পরের সঙ্গে।

ওই সব চোখেরই একজোড়া এসে মিলল নীলমাধবের খের সঙ্গে—আয়েষার চোখ। চোখ নাচিয়েই আয়েষা াসা করল তাকে, কেমন নাচ দেখলে বাবু?

খুব ভাল—সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল নীলমাধব।

আয়েষা তখন ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তুমি বাবু কাল াদের নিমক খেয়েছ, আজ দেখলে আমাদের ঘরের য়র নাচ। কাজেই এখন তো তুমি আমাদেরই দলের াক।

সমস্বরে সায় দিল অন্য মেয়েরা, বেশক।

আয়েষা তখন মুনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি বলিস রে মুন্নি? কালকের মেহমান আজ ঘরের আদমী হল না আমাদের?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল মুনিয়া, জরুর।

দুই চোখে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়ে উত্তর দিয়েছে মুনিয়া। বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল আয়েষার চোখেও। কালকের মতই দুজনের মুখের উপর দুই চোখ ফেলে মুনিয়াকে সে বলল, তবে আর কী! শাদী লাগিয়ে দিই তোর সঙ্গে?

ছিঃ!

প্রত্যুত্তর সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কথা আর সুর যেন নদীর এপার আর ওপার। বলতে বলতেই চোখ নামিয়ে নিল মুনিয়া, মুখখানাও যেন সে লুকতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তা ওখানে সম্ভব নয় বলেই বুঝি পরক্ষণেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ত্রস্তা হরিণীর মত দ্রুতবেগে তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

খিলখিল করে হেসে উঠল আয়েষা; ঘুরে নীলমাধবের মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, বুঝলে তো বাবু, মুনিয়া রাজী আছে তোমাকে বিয়ে করতে। এবার গয়নাগাঁটি নিয়ে এস তুমি। চাঁদি-কাঁসা হলে চলবে না; হীরা-জহরত না পার সব সোনা হওয়া চাই।

আর একবার আকাশ থেকে পড়ল নীলমাধব, এবার যেন আরও উঁচু থেকে। আহত বিবর্ণ মুখে আয়েষার মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, সোনার গয়না তো আমার নেই।

তবে মুনিয়াও নেই।—নিজের ডান হাতখানি এক বিচিত্র ভঙ্গিতে নীলমাধবের মুখের সামনে ঘুরিয়ে উত্তর দিল আয়েষা।

আরও শুকিয়ে গেল নীলমাধবের মুখ।

দেখে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল আয়েষা, এবং নিজের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি নীলমাধবের মুখের প্রায় কাছে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে আবার বলল, তুমি বাবু, এত বোকা কেন? সোনার গয়না কি পুরুষ-মানুষের থাকে? আছে তোমার মায়ের, তোমার বোনের। মুনিয়াকে যদি চাও তবে তাই নিয়ে এস গে।

মুগ্ধ নীলমাধব। সংবেশনের মতই কাজ করেছে তার উপর আয়েষার ওই অভিভাব। কিন্তু দরিদ্র কেরানীর ঘরে সোনার গয়না কোথায়? নীলমাধবের ছোট বোন খুবই ছোট; হাত তার একেবারে খালি। মায়ের হাতে এক এক গাছা সরু চুড়ি যা আছে তা বহু ব্যবহারে এতই বিবর্ণ হয়েছে যে সোনা বলে তা চেনাই যায় না। তবু সেই দিকে চেয়েই নীলমাধব তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার আর কোন সোনার গয়না নেই মা?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে মা সবিস্ময়ে বললেন, কেন রে? এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস?

কেন তা মুখ ফুটে বলা যায় না। আর মিথ্যা কথাও বলা যায় না মায়ের ঠিক মুখের দিকে চেয়ে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে নীলমাধব বলল, কতজনের গায়ে কত গয়না দেখি, আর তোমার গা মনে হয় খালি খালি। তাই মনে এল কথাটা।

ছেলের ছলনা বুঝতে পারলেন না মা। তাই হেসে বললেন তিনি, তবু ভাল যে তোর চোখে পড়ল, উনি তো একেবারে কানা। তা দিবি নাকি বাবা, মাকে একছড়া হার?

শুনে নীলমাধবের চোখে জল আসে আর কী। করুণা বা মমতায় নয়, রাগে। ওই যাযাবর শিবিরের লোকগুলি যেমন, তার নিজের মা-ও তাই। সকলের মুখেই কেবল 'দাও দাও' রব। কিন্তু সোনার গয়নার মত দামী জিনিস সে পাবে কোথায়?

তবু মন মানে না তার। জলখাবার খেয়েই বাজারে চলে গেল সে; সেখানে এক সেকরার দোকানে মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করল একছড়া সোনার হারের দাম।

লাভ হল আর একটি কঠিন আঘাত। বুলাকি সাউ তার নিকেল ফ্রেমের চশমা নাকের ডগা থেকে ঠেলে কপালে তুলে এমনভাবে তাকাল তার মুখের দিকে যেন সে ভূত দেখেছে। তখন পালাবার পথ পায় না নীলমাধব।

তবে পালাতে গিয়েই যেন পরমার্থ লাভ হল তার। হঠাৎ তার কানে এল মিহি সুরের মিষ্টি ডাক: ও মেহমান!

মুখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ল পরিচিত মুখ জগতের সব সোনা বুঝি একত্র মিলিয়ে যার মুখখানি তৈরি হয়েছে সেই মুনিয়া এক মুদীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকে ডাকছে। কেরোসিন তেল কিনতে এসেছে সে। একেবারে একা।

নিজেই নীলমাধবের কাছে এগিয়ে এল মুনিয়া; চো[illegible] ও ঠোঁটের বিশেষ একটি ভঙ্গি করে জিজ্ঞাসা করল এখানেই বুঝি তোমার বাড়ি?

নীলমাধব ঘাড় নাড়ল মন্ত্রমুগ্ধের মত; তারপর আগ্রহে স্বরে সে বলল, আমাদের বাড়িতে তুমি যাবে মুনিয়া?

না।—সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে মুনি[illegible] বলল, ঘরবাড়ি ভাল লাগে না আমার। তার চেয়ে তুমি চল আমাদের তাঁবুতে।

তাতেই রাজী নীলমাধব। বরং আরও বেশী ধীরে ধীরে যে হীনতাবোধ জেগে উঠেছিল তার মনে [illegible] ওই একটি অনুরোধেই একেবারে দূর হয়ে গেল। মুনিয়া[illegible] সঙ্গে পাশাপাশি চলতে লাগল সে। কিন্তু পায়ে হেঁ[illegible] চলা যেন আর নয়, সে যেন উড়ে চলেছে।

মুনিয়া হাঁটছে আর মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে তাকি[illegible] দেখছে নীলমাধবকে। একবার চোখাচোখি হয়ে [illegible] দুজনের। সঙ্গে সঙ্গেই ফিক করে হেসে ফেলে [illegible] বলল, একটা জায়গায় ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে কেম[illegible] করে যে তোমরা থাক তা আমি ভেবে পাই নে আমাদের তাঁবু থাকলেও দিনরাত বাইরেই আমরা কাটা[illegible] ঘুরে ঘুরে বেড়াই এক শহর থেকে আর এক শহ[illegible] শহর থেকে বনজঙ্গল, পাহাড় পর্বতে।

নীলমাধব সাগ্রহে বলল, আমিও তো তাই চাই।

তবে চল না আমাদের সঙ্গে।

যেতেই তো চাই। কিন্তু—

বলেই থামল নীলমাধব। গোড়ার কথাটা হঠ[illegible] আবার মনে পড়ে গিয়েছে তার; সঙ্গে সঙ্গেই একটা [illegible] ছায়া নেমে এসেছে তার মুখের উপর। একটু চুপ ক[illegible] থাকবার পর বিষণ্নকণ্ঠে সে কথাটাকে শেষ করল: কি[illegible] আমার কাছে তো সোনার গয়না নেই!

নহী হৈ তো ক্যা হুয়া?—তৎক্ষণাৎ বলে উঠল নিয়া।

নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না নীলমাধবের। পথের াঝেই থমকে দাঁড়িয়ে বিহ্বলস্বরে সে বলল, কিন্তু ওরা । সোনার গয়নার ফরমাশ করেছে আমাকে—ওই তামার ভউজী!

শুনে থমকে দাঁড়াল মুনিয়াও। তার মধ্যেও াস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। কন্তু লজ্জার চেয়ে কৌতুক ও কৌতূহলই বুঝি বেশী তার। াস্যোজ্জ্বল চোখে নীলমাধবের চোখের দিকে চেয়ে সে লল, কহা তো যা শাদীকে সিলসিলামে। তুম মুঝসে শাদী রোগে?

দিশাহারা ভাব নীলমাধবের। মুখে তার কথা ফুটল া, তবে এত জোরে সে মাথা ঝাঁকাল যে তা দেখলে ারও মনেই তার সম্মতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতে ারে না।

চাপা হাসি তখন ছড়িয়ে পড়ল মুনিয়ার সারা মুখে। দ জিজ্ঞাসা করল কেঁও?

নীলমাধব নিরুত্তর।

কিন্তু মুনিয়া তার সহাস্য চোখ দুটির তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ালমাধবের মুখের উপর বিন্যস্ত করে নিজের মাথাটাও ব জোরে ঝেঁকে আবার বলল, ক্যা, তুম মুঝসে মহব্বত রতে হো?

তবু কথা ফোটে না নীলমাধবের মুখে, কিন্তু ঘাড় নড়ে সম্মতি জানাল সে।

কিন্তু নির্মম জেরা মুনিয়ার; সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ইমানসে বোলতা হৈ?

বারবার এত আঘাত কি প্রতিরোধ করতে পারে কউ? নীলমাধবের মনের মধ্যে সঙ্কোচের বাঁধ এবার াম্পূর্ণ ভেঙে গেল। মুখ ফুটেই সে বলল, জরুর।

তখনও হাসি যেন ফেটে পড়ছে মুনিয়ার চোখ দুটি থেকে; তবু ওর মধ্যেই একখানি যেন পর্দা নেমে এল সেই চোখের উপর; দুটি গাল ও ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে-াড়া প্রচুর চঞ্চল হাসি হঠাৎ যেন স্থির হয়ে গেল। নীলমাধবের চোখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, অপনা ঘর ছোড়কর মেরে সাথ চলোগে তুম?

নীলমাধব উত্তর দিল, হ্যাঁ।

জঙ্গলমে, পাহাড়মে?

হ্যাঁ।

ভৈস চরাওগে—বকরা-বকরী?

আলবত।

মুনিয়া শুনছে আর আরও বদলে যাচ্ছে তার মুখের চেহারা। অদ্ভুত পরিবর্তন। আকাশের বিদ্যুতের মতই তীক্ষ্ণ যে হাসি তার, ধীরে ধীরে কোমল হতে হতে যেন ঘৃত-প্রদীপের মতই স্নিগ্ধ হল তা; চোখের দৃষ্টি তার নীলমাধবের চোখের উপর পড়ে থেকেও ধীরে ধীরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। গলার স্বর তার নীচু পর্দায় নামছে না দূরে সরে যাচ্ছে, তা ঠিক বুঝতে পারছে না নীলমাধব। শেষ কথাটার সুর আশ্চর্য কোমল, কিন্তু গভীর তার ঝঙ্কার।

তব্ সোনেকা ক্যা জরুরত!

এবারও নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না নীলমাধবের। কিন্তু তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে তার বুকের মধ্যে ছুটে এসে হঠাৎ টগবগ করে ফুটে উঠেছে। আত্মহারা নীলমাধব খপ করে মুনিয়ার একখানা হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, সচ বোলতী হো মুনিয়া? সোনেকী জরুরত নহী হৈ? তুম সির্ফ মহব্বতকে লিয়ে মুঝসে শাদী করোগী?

হাঁ।

উত্তরে ওই কথাই বলল মুনিয়া, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের হাত টেনে ছাড়িয়ে নিল সে। বিদ্যুদ্বেগে খানিকটা দূরেও সরে গেল। ততক্ষণে গাল দুটি তার আবার টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নীলমাধবের চোখে পড়ে না তা। সে অসহিষ্ণুর মত জিজ্ঞাসা করল, কব্?

শুনেই খিলখিল করে হেসে উঠল মুনিয়া। ভ্রূভঙ্গী করে নীলমাধবের মুখের দিকে চেয়ে সেই প্রথম দিনের মতই একটি ভেংচি কেটে সে বলল, তুম একদম বুদ্ধু হো।

মুঝসে ক্যা পুছতা ? তৈয়ার হো কর তাঁবুমে আ যাও—আব্বাকো বোলো।

বলেই নিজেদের শিবিরের দিকে যেন ছুটে পালিয়ে গেল মুনিয়া।

তাই করেছিল নীলমাধব। খান তিন-চার জামা-কাপড়ের ছোট একটি গাঁটরি বগলদাবা করে নিয়ে পরদিনই সে আবার গিয়েছিল সেই যাযাবরদের শিবিরে। রহমানের খুব কাছ ঘেঁষে বসে সে বলেছিল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমাদের দলে থাকব, ছাগল-মোষ চরাব, সব কাজ করে দেব তোমাদের।

হাঁ ?

বলে দাঁত বের করে, চোখ বড় করে হেসেছিল রহমান; তার বাঘের মত হাতের থাবাটা দিয়ে নীলমাধবের পিঠ চাপড়ে আরও সে বলেছিল, বহুত অচ্ছা নওযোয়ান তুম। হমলোগ জরুর লে লেঙ্গে তুমকো, শানদার খেলোয়ার এক বনাউঙ্গে তুমকো। লেকিন—

বলেই থেমে গিয়ে নীলমাধবের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে রহমান।

প্রথম দিকে কৃতার্থ বোধ করেছিল নীলমাধব, আরও একটু এগিয়ে গিয়েছিল রহমানের দিকে। কিন্তু তার মুখে ওই দুর্বোধ্য হাসি দেখে কেমন যেন এক অস্পষ্ট আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

আর তখনই মাথাটা নীচু করে রহমান ফিসফিস করে আবার বলল, লেকিন জেবর ? জেবর লে আয়া ?

শুনেই মুখ শুকিয়ে গেল নীলমাধবের; সে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল।

তব্ রুপয়া ?—হাসি থামিয়ে চোখ দুটি ছোট করে রহমান বলল, সোনা নহী হৈ তো রুপয়া ক্যোঁও নহী লে আয়া ?

শুষ্ককণ্ঠে ছোট্ট করে উত্তর দিল নীলমাধব, টাকাও আমার নেই।

শুনেই একেবারে অন্য মূর্তি রহমানের। মেঘের মত থমথমে তার মুখ, দাড়িগুলি তার হঠাৎ যেন সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি জ্বলছে ভাঁটির মত। রুক্ষকণ্ঠে সে বলল, তব্ ভাগো।

একবার নয়—তিনবার। দ্বিতীয় বার তর্জনীর ইশারা ছিল, তৃতীয় বারে রহমানের বাঘের মত থাবায় অর্ধচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রকাশ।

শুকনো জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটি লেহন করবার জন্য বার দুই ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর নীলমাধব উঠে দূরে সরে গেল।

আর তখনই তার কানে এল মোটা ও সরু কয়েকটি কণ্ঠের সমবেত অট্টহাস্য। এতক্ষণ দেখেও দেখে নি নীলমাধব; এখন দেখতে না চাইলেও দৃশ্যটিকে এড়াতে পারল না সে। খানিকটা দূরে এই দলেরই অবশিষ্ট কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ একটি জ্বলন্ত উনুনের চারিদিকে ছড়িয়ে বসেছিল। তারাই এখন নীলমাধবের দিকে চেয়ে সশব্দে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি তা—চাবুকের চেয়েও যেন নির্মম।

কেবল একটি ব্যতিক্রম।

দলের মধ্যে মুনিয়াও আছে। সেও চেয়ে আছে নীলমাধবের দিকে। কিন্তু হাসছে না সে। নীলমাধবের মনে হল যে তার গৌরবর্ণ মুখখানি এখন কেমন নীল নীল দেখাচ্ছে; বড় বড় চোখ দুটিতে তার যেন আহত পশুর কাতর দৃষ্টি।

সেই শেষ দেখা চোখে চোখে। তারপর গত পঞ্চাশ বছর ধরে নীলমাধব তার মনের চোখে দেখে আসছে সেই মুনিয়া, সেই তার প্রথমা প্রেয়সীকে।

৩

সেই মুনিয়া!

আজ আর বেদনায় নীল নয় তার চাঁপাফুলের মত রঙ, আড়ষ্ট নয় দুটি নীল-কালো চোখের দৃষ্টি। সেইজন্যই তো অত সহজ তাকে চেনা।

আজ মিটিমিটি হাসছে সে—যেমন সে হেসেছিল সেই আরা শহরের বাজার থেকে আমবাগানে যাযাবরের ছাউনির দিকে নীলমাধবের পাশে পাশে চলতে চলতে

...ঝে মাঝে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। দুষ্টু ...য়ের ঝাল-ঝাল মিষ্টি-মিষ্টি হাসি!

সেই মুনিয়া!

অস্ফুটস্বরে বলল নীলমাধব। কিন্তু তার শীর্ণ মুখখানি ...ত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

অন্নপূর্ণা জানে ওই নাম, জানে মুনিয়ার পরিচয়ও। ...মীর মুখেই শুনেছে সে তার সেই প্রথম প্রেমের সরস ...হিনী। নীলমাধব নিজেই সে গল্প শুনিয়েছিল তার ...বিবাহিতা স্ত্রীকে এবং তার পরেও অনেকবার। শুনে ...থম প্রথম রাগ হত অন্নপূর্ণার, বা মনে যে দুঃখ পেত ...ই ঢাকবার জন্যেই সে বাইরে রাগের ভান করত। ...বে সয়ে যাবার পর ওই গল্প শুনে কৌতুকই অনুভব ...রেছে সে; অনেক সময় নিজেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্বামীকে ...ত্তেজিত করে তাকে দিয়ে সেই পুরনো গল্প নতুন করে ...নিয়েছে অন্নপূর্ণা তার নিজের অবসর বিনোদনের জন্যে।

কিন্তু কল্পনার মুনিয়া যা, রক্তমাংসের সম্পূর্ণ জীবন্ত ...কটি নারী তা হতে পারে না। স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ ...রে যাযাবরীকে একটিবার দেখবার পরেই অন্নপূর্ণার ...জ্বল দৃষ্টি সন্দেহে কুটিল হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে ...ীলমাধবের মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, কি বলছ তুমি?

সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর নীলমাধবের: এই তো মুনিয়া।

অন্নপূর্ণা আবার দেখে নিল মেয়েটিকে; তারপর ...ামীর মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, বুড়ো হলে ...ীমরতি হয় জানি। তাই বলে এমন!

কেন?

কত বছর আগে দেখেছিলে তুমি তোমার মুনিয়াকে?

একটু দেরি করে উত্তর দিল নীলমাধব: তা বছর ...ঞ্চাশেক তো হবেই।

আর এ মেয়েটির বয়স কত হতে পারে?

নীলমাধব একেবারে স্তব্ধ।

কিন্তু অন্নপূর্ণা নিজেই ফিসফিস করে বলল, কুড়ি ...ছরও হবে না।

তারপরেই মুখের ভাব ও গলার স্বর দুই-ই বদলে ...গল তার। দুই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে আবার বলল, এই দুর্গম পথে তুমি না কেদারনাথকে দর্শন করতে চলেছ। তবু অমন চোখে একটি কাঁচা বয়সী জংলী মেয়ের দিকে চাইতে পারলে তুমি? ধিক তোমাকে।

যেন চাবুকের একটি আঘাত। কিন্তু মিথ্যা তো নয় কথাটা! সত্যিই কচি মুখ মেয়েটির, জংলী মেয়ের অটুট স্বাস্থ্য তার আছে বলেই যা একটু বড়-সড় দেখাচ্ছে। অপ্রতিভ হয়ে নীলমাধব বলল, তাই তো!

কিন্তু অন্নপূর্ণা নির্মম; সে আরও জোরে ধমক দিয়ে বলল, থাক্, আর ন্যাকামি করতে হবে না। এগিয়ে চল এখন।

শুধু মুখের কথাই নয়; এবার সে হাত দিয়ে একটি ঠেলা দিল স্বামীকে।

দু-তিন মিনিটের ঘটনা। যাযাবরী কেমন করে জানবে কত দীর্ঘকালের কত রোমাঞ্চকর ইতিহাস লুকিয়ে আছে ওর পিছনে! স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য চোখে সে তাকিয়ে ছিল অচেনা পরদেশী যাত্রীর দিকে; তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল সে বুড়ো-বুড়ীর দুর্বোধ্য ব্যবহার। দেখতে দেখতে নিজের মনের মত একটা আন্দাজ করে নিয়ে সে ওদের দিকে দু পা এগিয়ে গিয়ে বলল, ক্যা মাঙতা? দুধ?

দুজনের একজনও উত্তর দিল না; কেবল অন্নপূর্ণা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মেয়েটির মুখের উপর।

তথাপি মেয়েটি আবার বলল, মট্‌ঠা লেওগে! মট্‌ঠা ভী হৈ।

শুনে আরও জোরে পা চালিয়ে দিল অন্নপূর্ণা—যেন ভূত দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে। আর সেই গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বেচারা নীলমাধব ওই শীতের দেশেও ঘেমে ভিজে উঠল।

•

পিছনে রণরঙ্গিণী স্ত্রীর তাড়া না থাকলেও উতরাই-পথে বিশ্রাম করবার জন্যে থামা সহজ নয়। তবে অপ্রত্যাশিত একটি সুযোগ পেয়ে গেল নীলমাধব; আর সেই সঙ্গে সহজভাবে কথা বলবারও।

নীচে থেকে একপাল মোষ ওপরে উঠে আসছে ; সঙ্গে ওদের পালক তিন-চারজন। জানোয়ারদের পথ ছেড়ে না দিয়ে উপায় নেই। আর ওরা যতক্ষণ তাদের অতিক্রম করে না যায় ততক্ষণ পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলাও বিপজ্জনক। যোগাযোগও ঘটে গেল একটা। ঠিক মসৃণ খাড়া পাহাড় নয় বাঁ দিকে। সড়ক থেকে একটু উঁচুতে পাহাড়ের ঢালু কোলে ইতস্ততঃ যেসব শিলাখণ্ড ছড়িয়ে আছে তারই একটির উপর গিয়ে বসে পড়ল নীলমাধব। মোষের ভয় অন্নপূর্ণারও কম নয় ; সুতরাং আপত্তি না করে সেও গিয়ে বসল স্বামীর কাছে।

বসবার জায়গাটা ভালই পেয়েছিল তারা। মোষের গুঁতো খাবার আশঙ্কা নেই, অথচ তাদের গতি বেশ লক্ষ্য করা যায়। আরও সুবিধা—ওই উতরাই পথটুকু বেশ খানিকটা নীচে যে ছোট পুলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেই পর্যন্ত সবটা পথও ওই উপর থেকেও বেশ চোখে পড়ে। তাই দেখেই রুষ্টা স্ত্রীকে খুশী করে সহজ অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার একটা ফন্দিও এসে গেল নীলমাধবের মাথায়।

নিজে নীচের দিকে তাকিয়েই স্ত্রীকে উদ্দেশ করে সে বলল, দেখ তো, ছেলেদের কাউকে ওখানে দেখা যায় কি না।

ফল ফলল আশানুরূপ। অন্নপূর্ণার মনের চাকা এক নিমেষেই অন্যদিকে ঘুরে গেল। সেও তার দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর সে বলল, না, দেখছি নে তো।

তাই তো!—নীলমাধব এমনভাবে বলল কথাটা যেন ছেলেদের দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে সে।

তবে ওই হল চালে ভুল। সত্যিই উদ্বিগ্ন হল অন্নপূর্ণা। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, চল এখন, ওরা কোথায় কি বিপদে পড়ল কে জানে!

ততক্ষণে সামনের পথ একেবারে খালি করে দিয়ে অতবড় পালের শেষ মোষটিও উপরে উঠে গিয়েছে। আপত্তি করবার আর সঙ্গত কোন কারণ নেই। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হল নীলমাধবকে।

তবে পথে নামবার পর অজুহাত একটা পেয়ে গেল সে। সামনে তাকিয়ে সে বলল, আর একটা মোষ আসছে না!

অন্নপূর্ণা ভাল করে তাকিয়ে দেখে উত্তর দিল, তাই তো মনে হচ্ছে। ওই দলেরই একটা জানোয়ার বুঝি পিছিয়ে পড়েছে।

তা হলে আর একটু সবুর করলে হয় না!—নীলমাধব বলল মুখ কাঁচুমাচু করে।

শুনে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল অন্নপূর্ণা ; হেসে সে বলল, কি বীরপুরুষ রে! পথে একটি মোষ দেখেই জুজুবুড়ী হয়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকবে—না?

ব্যঙ্গ আছে অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বরে ; তবে সরস ব্যঙ্গ এবার। সুতরাং একদিকে নিরাশ হয়েও অন্যদিকে আশ্বস্ত হল নীলমাধব। সেও হেসে সরস ব্যঙ্গের সুরেই উত্তর দিল, না, আর বসে থাকা নয়। সামনের ওই মোষটা আমাকে তাড়াও যদি করে তবু ভয় পাব না ; মহিষমর্দিনী তো সঙ্গেই থাকবেন।

কথাবার্তায় ওই সুরটি বজায় রেখেই এগিয়ে যাচ্ছিল দুজনে। কিন্তু খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল অন্নপূর্ণা। সবিস্ময়ে সে বলল, এ কি কাণ্ড!

এতক্ষণ যাকে তারা একটি মোষ মনে করছিল সেটি মোষ নিশ্চয়ই, তবে ওই সঙ্গে মানুষও। কালো ঘাগরা-পরা একটি স্ত্রীলোক একটি বাচ্চা মোষ তার কাঁধে নিয়ে হেঁটে আসছে। মহিষ-শাবকের চারটি পা-ই নিজের দুই কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর এনে দুই হাতে ধরে রেখেছে সে। নীচে থেকে উপর দিকে গতি তার ; তায় আবার কাঁধের উপর ওই জীবন্ত বোঝা। সুতরাং স্ত্রীলোকটির দেহের উপরার্ধ কোমর থেকে বেঁকে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চোখ তার পড়ে রয়েছে পথের উপর। সুতরাং মুখ মোটে দেখাই যায় না। তবে বেশ বোঝা যায় যে সে বৃদ্ধা। তার মাথার চুল প্রায় সবই সাদা।

দেখে স্ত্রীর মতই নিজেও বিস্মিত নীলমাধব। সেও থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তাই তো, এ কি কাণ্ড!

দু দিক থেকে দুটি দল পরস্পরের কাছাকাছি এসে ছে ততক্ষণে, নীলমাধবের বিস্মিত কণ্ঠস্বরও বুঝি গেল স্ত্রীলোকটির। সে শুধু তার চোখ দুটি উপর তুলে বলল, ক্যা বোলতা?

উত্তরে আবার বিস্মিত প্রশ্ন নীলমাধবের: তুমকো কাঁধাপর কৌন উঠায়া?

অন্য কণ্ঠে উত্তর শোনা গেল: বচ্চা হৈ, চল্ নগী।।

কথাটা শেষ করবার পর বেশ একটু চেষ্টা করেই হয়ে দাঁড়াল স্ত্রীলোকটি। ঠিক নীলমাধবের পাশাপাশি, কেবল ঢালু পথ বলেই সে যা একটু নীচে। বর বাচ্চাটি তখনও তার কাঁধের উপর, তবু সবটা তার দেখা যায়। দেখেই চমকে উঠল নীলমাধব; স্পৃষ্টের মতই এক পা পিছনে সরে গিয়ে নীলমাধব চিত স্বরে বলল, একি! কে তুমি?

তুলনায় অনেকটা খোলামেলা সে জায়গাটা। রোদ থাকলেও আলো আছে। বেশ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মাধব স্ত্রীলোকটির মুখ। বিস্ময়কর সাদৃশ্য! বশ্বাস্য, কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

মাথার পাকা চুলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে লম্বাটে খানির। গাল তেমন না ভাঙলেও চামড়া কুঁচকে গেছে, ঝুলে ঝুলে পড়েছে এখানে সেখানে। অগুনতি রেখা সেই মুখের উপর, কালের কদাকার পদাচিহ্ন। তবু সেই মুখখানিই। একটু আগেই যাকে উপলক্ষ র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমন কাণ্ড হয়ে গেল সেই যাযাবরী ণীর কচি মুখেরই নিখুঁত ছাঁচে ঢালা পাকা মুখ আর কখানি।

নীলমাধব কেবল বিস্মিত নয়, আত্মবিস্মৃত। উত্তেজিত ণ্ঠের স্বর আরও এক পর্দা উপরে চড়িয়ে সে বলে উঠল: মুনিয়া!

কিন্তু স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল স্ত্রীলোকটির খের উপর। সেও স্বর চড়িয়ে বলল, হাঁ, হম তো নিয়া হী হৈ। তুম কোন্?

কেবল উত্তরটুকুই শুনেছে নীলমাধব, পরের প্রশ্নটি আর নয়। সে তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণার একখানা বাহু চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, শুনলে তুমি? ও বলছে যে ওর নাম মুনিয়া।

বিস্মিত হয়েছে অন্নপূর্ণাও, বরং আরও বেশী। স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সে স্ত্রীলোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, উপরে যে একটি মেয়ে দেখে এলাম সে তোমার কেউ হয়?

স্ত্রীলোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, হাঁ।

একটু থেমে আবার সে বলল, মেরী নাতনী, লড়কী কী লড়কী।

অন্নপূর্ণা মুখ ফিরিয়ে তাকাল স্বামীর মুখের দিকে, নীলমাধব ততক্ষণে আবার তার বাহু চেপে ধরেছে। তবে এবার আর উত্তেজনায় নয়—অবসাদে।

আর কোন সংশয় নেই নীলমাধবের মনে। গত পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে মনে মনে যে মুনিয়াকে সে খুঁজে এসেছে, এই সেই নারী। কিন্তু এ কী সমাপ্তি তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার! আকাশচারী বিহঙ্গ হঠাৎ যেন ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে গিয়েছে।

তবুও নীলমাধব মুনিয়ার জরালাঞ্ছিত মুখের দিকেই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল; বুঝি তাই লক্ষ্য করেই বৃদ্ধা অসহিষ্ণুর মত বলল, ক্যা মাঙতা তুম?

সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল নীলমাধব। তারপর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন করল সে: মুঝকো তুম নহী পহচানতী হো, মুনিয়া?

নহী।

দেখো তো ঠিকসে।

বৃদ্ধার বিরক্ত মুখ আরও বেশী বিরক্ত দেখাচ্ছে তখন। তবুও সে ভাল করেই তাকিয়ে দেখল—ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে একবার ডান দিক থেকে ও একবার বাঁ দিক থেকে। কিন্তু তারপর মাথা নেড়ে সে বলল, নহী পহচানতা। তুম কৌন হো?

মৈ হুঁ মেহমান।

বলেই হেসে ফেলল নীলমাধব।

কিন্তু ওই উত্তর শুনেই একেবারে যেন তেলে-বেগুনে জলে উঠল বৃদ্ধা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলল, মেহমান! কাঁহাকা বেসরম আদমী তুম? রাস্তা রোথকর ক্যা দিল্লগী করতা হৈ?

বলতে বলতে হাত তুলল বৃদ্ধা, যেন নীলমাধবকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েই নিজের পথ করে নেবে সে। দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল অন্নপূর্ণা; স্বামীর হাত ধরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সে বলল, কি পাগলামি করছ তুমি? ও তোমার সেই মুনিয়া বলেই এতদিন পর ওর হাতের চড় খাবার সাধ নাকি তোমার? ছি ছি ছি!

ফল হল বিপরীত। বুঝি স্ত্রীর ওই ভর্ৎসনা শুনেই একটা ঝোঁক চাপল নীলমাধবের মাথায়। সে অন্নপূর্ণাকেই ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধার সামনে; জামার আস্তিন গুটিয়ে বাঁ হাতের উলকি চিহ্নটি তার প্রায় চোখের সামনে তুলে ধরে সে বলল, এটি চিনতে পার? তুমিই এঁকে দিয়েছিলে এটি, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে।

নীলমাধবের জরাজীর্ণ হাতের লোলচর্মেও মোটামুটি দেখা যায় উটের ছবিটা। বেশ মন দিয়েই যেন সে ছবি দেখল ওই বৃদ্ধা; দেখতে দেখতে তার মুখের বিরক্ত ভাবও কিছুটা যেন কেটে গেল। কিন্তু আর কিছু নয়। মুখ তুলে নীলমাধবের মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, য়হ্ গোদনা তুম হমসে লিয়া থা?

হাঁ।—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল নীলমাধব, করিপ পঁচাশ সাল পহলে—আরামে।

হো সকতা।—নিরাসক্ত কণ্ঠের উত্তর বৃদ্ধার। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে মাথাটা ঝাঁকাল সে।

সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল নীলমাধবের চোখমুখ, ওই মাথা ঝাঁকাবার ভঙ্গিটা যে বড় বেশী চেনা তার। উল্লাসের সঙ্গেই তার মনে এল উৎসাহ, এই বৃদ্ধা মুনিয়ার স্মৃতির বদ্ধদ্বারে ঘা দিয়ে দিয়ে ষোড়শী মুনিয়াকে পুনর্জীবিত করবার প্রবল একটা ইচ্ছা। জাদুকর যেমন করে প্রায় তেমনি ভঙ্গিতে নিজের ডান হাতের কটি আঙুল বৃদ্ধার মুখের সামনে নাচিয়ে নাচিয়ে নীলমাধব বলল, হো সকতা নহী, জরুর হুয়া থা। হম নে তুমহীসে লিয়া থা য়হ্ গোদনা। আরামে—বিহার রাজ্যকা শহর আরা। লক্ষ্ণৌ বানারসসে ঔর নীচে—

অনর্গল বলে যেতে লাগল নীলমাধব তার সেই প্রথম প্রেমের কাহিনী, আনুপূর্বিক বলে গেল সে—যেমন সে ইতিপূর্বে অনেকবার বলেছে তার স্ত্রী অন্নপূর্ণাকেও। শুধু কি বলা! এ কাহিনী বলতে গেলেই আগেও যেমন আত্মহারা হয়েছে সে, আজও সেই অবস্থা তার। বরং বেশী। প্রথম যৌবনের সেই উন্মাদনাই আবার যেন শিরায় শিরায় অনুভব করছে নীলমাধব; ভুলে গিয়েছে তার পাশেই তার প্রৌঢ়া সহধর্মিণী অন্নপূর্ণার উপস্থিতি, ভুলে গিয়েছে বুঝি তার নিজের বর্তমান বয়স ও পরিবেশও।

আর মুনিয়া! ঘাড়টা একটু কাত করে নীলমাধবের মুখের দিকে চেয়ে সবটা গল্পই মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। শুনতে শুনতে অনেকবারই সে হাসল, অন্যমনস্ক হল কয়েকবার; স্মৃতির অতলে তলিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কি বুঝি খুঁজল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা তার। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী অতীতের ঘন কুয়াশা ভেদ করে ছানি-পড়া চোখের দৃষ্টি তার সেই সুদূর অতীতে পৌঁছতে পারে না। অথবা অযত্নরক্ষিত বহু পুরাতন একখানা জল রঙের ছবি দেখবার চেষ্টা তার। রঙ আর নেই, কয়েকটি মাত্র রেখা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

কিন্তু বর্তমানে ওই যে তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে পুরুষটি, সে নিঃসংশয়ে প্রত্যক্ষ সত্য। সুর আছে কণ্ঠস্বরে, রসও আছে তার বর্ণনায়। বৃদ্ধার কান আর চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে তার মনকে স্পর্শ করছে তা।

বিশ্বাস না করেও সে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারল না ওই গল্প। নীলমাধব তার কাহিনী শেষ করে চুপ করবার পর শব্দ করেই হেসে উঠল বৃদ্ধা মুনিয়া। সে বলল, ক্যা জানে! হো সকতা ঐসাহী হুয়া হো।

সহাস্য মুখ, সহাস্য কণ্ঠস্বর বৃদ্ধার। কিন্তু উত্তর যা সে দিয়েছে তাতে প্রাণ নেই। শুনে বিবর্ণ হয়ে গে

লমাধবের মুখ। সেই মুখের দিকে চেয়ে অন্নপূর্ণা তাকে কটি ঠেলা দিয়ে বলল, হল তো? না, আরও েলেল্লাগিরি চলবে!

আঘাতটা কঠিন, কিন্তু প্রতিবাদ করবার মত জোর াার নেই নীলমাধবের মনে। আবার সশব্দে একটি ীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়েই সে লল, দেখলে? মুনিয়া আমাকে একেবারে ভুলে গেছে।

কিন্তু এ কথা শুনে আরও চটে গেল অন্নপূর্ণা; ঝঙ্কার দিয়ে সে বলল, ও তো মেয়েছেলে, পুরুষদের মত বেইমান য়। মেয়েরা একজনের ঘর করতে করতে মনের মধ্যে আর একজনের পূজো করে না।

আবার যেন একটি কশাঘাত পড়ল নীলমাধবের মুখের উপর। তবুও একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে বৃদ্ধার দিকে ফিরে বলল সে। বিষণ্ণকণ্ঠে আবার তাকেই সে বলল, ফির দেখো তো মুনিয়া। মৈনে তো তুমকো একহী নজরমে বিলকুল পহচান লিয়া। ঔর তুম মুঝকো হী পহচানতী? তব্ কৈসী মহব্বত থী তুমহারী!

তুম্ একদম বুদ্ধু হো।—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল মুনিয়া।

শুনেই চমকে উঠল নীলমাধব। এ যে ঠিক সেই কথা যা কিশোরী মুনিয়ার মুখ থেকে সে শুনেছিল অতীতের সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় মুনিয়ার পাশে পাশে বাজার থেকে যাযাবরদের ছাউনির দিকে যেতে যেতে। আর সেই সুদূর অতীত থেকে ভেসে এসেছে সরস একটি কথাই কেবল নয়। স্পষ্ট চোখে পড়ল নীলমাধবের যে বৃদ্ধার সাদাটে চোখের কোণে একটি বার ঝিলিক দিয়েই যা মিলিয়ে গেল তাও সেই সেদিনের কিশোরী মুনিয়ার হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপরকার নীল-কালো চোখ দুটির বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষই।

অথচ কত তফাত!

ক্ষণপ্রভা চকিতে মিলিয়ে গেল। দুই হাতে নিজের চোখ দুটি রগড়াবার পর আবার যখন ভাল ক'রে তাকাতে পারল নীলমাধব, তখন বৃদ্ধা মুনিয়া তাদের স্বামী-স্ত্রীকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা উপরে উঠে গিয়েছে।

মা ভৈষীঃ

বাণী রায়

বিলাসিনী, সন্ধ্যাকাশে রক্তিম মেঘের
বর্ণ কি ধরেছে আজ ওই চেলাঞ্চল ?
অপাঙ্গে তড়িৎ খেলে কজ্জল প্রভায়
আরক্ত অধরদ্বয়ে তাম্বূলপ্রসাদ।

পার্শ্বে আছে প্রিয়তম, বিপুল পুলকে
চেয়ে চোখে চোখে ভাব—স্বর্গ বুঝি এই,
প্রেমের গড়েছ গৃহ ধরার বালুতে,
পেয়েছ আশ্রয় খুঁজে, ঝড়ের বিহগী।

আমি তো গিয়েছি, নারী, মালঞ্চে তোমার
দীনবেশে বিদেশিনী সৌহার্দ্য আশায়,
ডেকেছিলে একদিন বড় ভালবেসে,
জানাতে গেলাম তাই মঙ্গলকামনা।

সহসা কি ভয় পেলে ? ভয় কি তোমার ?
প্রিয়কে আড়াল করে চকিতে সভয়ে,
কোনমতে ভদ্রতার রেখে আবরণ
আমাকে বিদায় দিলে শঙ্কায় ব্যাকুল।

হায় প্রেম, এই নাকি পরম আশ্বাস ?
হায় প্রেম, মিথ্যা বালু ডোবে চোরাবালি ;
চোখে চোখে প্রতিক্ষণ আগুলিয়ে রেখে
কৃপণ সঞ্চয় করা সর্বদৃষ্টি থেকে !
অস্ত্রহীন এসেছি তো, নাই কোন ভয় ;
তোমার প্রেমিকে তুমি, 'ভুঞ্জহ কৌতুকে' !

প্রথম আঁখি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ঝরা পাতার বন যখন কাঁদিয়ে তোলে মন
হাওয়ার তারে নিঠুর কে দেয় মিড় যে অকারণ !
বিছিয়ে ছায়ার এলোকেশে
উদাস হয়ে বেড়ায় কে সে,
গুঞ্জরণের চমক দিয়ে পুঞ্জ বিস্মরণে
গন্ধকেশর শিউরে উঠে কোনখানে এই ক্ষণে !

একটি সোনার করুণ কিরণ ধূসর ঊর্ণাজালে
শূন্য নীড়ের প্রার্থনাতে, ব্যর্থ বিহগ ডালে।
অস্তাচলের চূড়ায় চূড়ায়
পথহারা মেঘ পালক পুড়ায়,
রঙের জ্বালা ধরে তখন ঘুম-কাজলী জলে ;
প্রবাল হয়ে কাঁপছে শিশির পাথর কপোলতলে।

ঝরা পাতার বন যখন কাঁদিয়ে তোলে মন,
হাওয়ার তারে নিঠুর কে দেয় মিড় যে অকারণ !
হঠাৎ কোথায় নীরব ফুলে
প্রথম আঁখি ফাগুন খুলে,
আদি কবির সেই অনাদি অন্তবিহীন শ্লোক ;
দৃষ্টিতে তার রূপের প্রসাদ পায় বিষণ্ণলোক।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'মাদাম বোভারী' (২)

"In the beginning is the word."

নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল মনোমোহিনী এই ভুবনে ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রথম কথা যে না উচ্চারণ করেছে বাংলা ভাষায়, সে যেমন কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হবে না রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কী এবং কে, তেমনই ফরাসী নয় যার মাতৃভাষা তার পক্ষে গুস্তেভ ফ্লবেয়ারকে পরিপূর্ণ আস্বাদন অসম্ভব। বিশ্বের যে কোনও বিস্ময়কর রচনারই উষ্ণতা অথবা শৈত্য অনুবাদের দস্তানা হাতে পরে অনুভব করা সম্ভব নয়; ফ্লবেয়ারের ক্ষেত্রে তা আরও অনেক—অনেক বেশী অসম্ভব। বালজাক, তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি এবং ডিকেন্স বিশ্বসাহিত্যের এই চার দিকপালের কাছে যে সত্য আমরা জানতে পেরেছি, সাহিত্যের সেই শাশ্বত বাণী হচ্ছে : মহৎ সাহিত্যের উৎস সর্বদাই গভীর বক্তব্য; বৃহৎ বক্তব্য ছাড়া কোনও সাহিত্য কিছুতেই কোনদিন মহৎপদবাচ্য নয়। বিশ্বসাহিত্যের পঞ্চম পাণ্ডব গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের কাছেই আমরা সর্বপ্রথম জানলাম যে, না—এক চোখে সত্য এবং আর এক চোখে যার শিবের প্রকাশ, তৃতীয় আর এক নেত্রে যে দাবি করে এই চরম সত্য ও শিবকে পরম সুন্দর করে প্রকাশ করা চাই—কবিই তার যথার্থ ও একমাত্র পরিচয়। ঘটন-দুর্ঘটনের জট পাকিয়েছেন যেখানে গল্পের মুখ চেয়ে গুস্তেভ ফ্লবেয়ার, সেখানে তিনি কথাকার মাত্র; কিন্তু যেখানে এই জটিলতার বন্ধন মোচন হয়েছে, যেখানে অনির্বচনীয় ক্ষণকালের জন্যেও হয়েছে বাঙ্‌ময়, সেখানে 'মাদাম বোভারী' এবং 'য়োপার্সাঁ'র স্রষ্টা আর কেবল কথাকার নন, সেখানে তিনি সুনিশ্চিত কবি। মাদাম বোভারী যেখানে প্রেমিকের পর প্রেমিকের পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অধঃপাতের অন্তিম প্রান্তে উপস্থিত হয়ে জীবনের কাছে হার মানার ঋণ শোধ করতে উদ্যত, মৃত্যুর মুখচুম্বনে সেইখানেই শুধু সেই চিরন্তন সাহিত্যিক কূট অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিয়েছে : 'মাদাম বোভারী' রোমান্টিক, না রিয়ালিস্ট? সেখানেই কেবল মাথাচাড়া দেয় আইনের অনধিকার প্রবেশ : 'মাদাম বোভারী' শ্লীল, না অশ্লীল?

কিন্তু যেখানে মাদাম বোভারী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন বিরহ তার অবিনশ্বর প্রতীক সেখানে প্রশ্ন ওঠে না সে সুন্দর কি অসুন্দর; কেউ জানতে চায় না তখন 'মাদাম বোভারী' রোমান্টিক, না রিয়ালিস্ট। 'মাদাম বোভারী' তখন আর কোনও বিশেষ একজনের কথা নয়, অনাদিকালের হৃদয়-উৎস থেকে যুগলবিরহের স্রোতে যারা ভেসে এসে নিরবধিকাল এই বিপুলা পৃথ্বীতে খুঁজে বেড়াচ্ছে পরস্পরকে কিন্তু পাচ্ছে না—সেই সমস্ত মানুষের কান্নাই 'মাদাম বোভারী'কে মুহূর্তে উত্তীর্ণ করেছে কবিতায়। এই কবিতার শ্রেণীবিচার—ক্লাসিক না লিরিক, প্রাচীন না আধুনিক—যার কাজ সে পণ্ডিত; সাহিত্যের ঠিকুজিকোষ্ঠী যারা তৈরি করে দেয় তারা সমালোচক; কোন্‌টা উপন্যাস আর কি বস্তু ছোটগল্প; কাকে বলে রোমান্টিক আর কার পরিচয় নির্ভুল রিয়ালিস্ট বলে সাহিত্যের সর্বাঙ্গে এইসব ছোটবড় নানা মাপের নানান রঙের লেবেল এঁটে দিয়েই যাদের ছুটি,

তাদের কাজ সারা হলে তবেই শুরু হয় যাদের পালা তারাই শুধু রসিক। রসাত্মক বাক্য ছাড়া যেমন কাব্য হয় না তেমনই যথার্থ রসিক ছাড়া কাব্যসাহিত্যচর্চা—আর সকলেরই পক্ষে অনধিকার চর্চা। রসিকেরই কেবল বাণীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার চিরদিনই অব্যাহত; আর সকলেই সেখানে হরিজন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতা দোষের এবং তা বর্জনযোগ্য। শুধু শিল্পের সান্নিধ্যে এসেই রসিককে সতর্কতার সঙ্গে বৈয়াকরণের গা বাঁচিয়ে চলতে হয় প্রতি পদক্ষেপে। সহৃদয়হৃদয়ের কাছেই কেবল উন্মুক্ত শিল্পের সিংহদ্বার। ভারতীর বীণা কেবল তার প্রাণেই বাজে, আর সকলের কাছেই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সমস্ত সুকুমারকলাই সেই বিশেষ প্রাণীর গলায় দোলে মুক্তোর মালার মত—কোনক্রমেই দন্তস্ফুট করতে না পেরে ছিন্নভিন্ন করাই কেবল যার কাছে মুক্তোর মালা পরবার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

নিজের নাভির গন্ধে মাতাল যে সে কেবল মৃগ নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে সেই মৃগতৃষ্ণা যা তাকে চিরকাল আলেয়াকে ভুল করে ভাবায় আলো, মরীচিকাকে মনে করায় তৃষ্ণার ক্লান্তি শীতল সরোবর, চোরাবালিকে মেনে নেওয়ায় উঠে দাঁড়াবার শক্ত জমি বলে। 'মাদাম বোভারী' এই চিরন্তন জীবনতৃষ্ণারই আর এক রূপ মাত্র। এই অপরূপ নারী তাই কোনও 'একজন' নয়—অনেকজন! অনেকজনের জীবন থেকে তিল তিল সংগ্রহ করে তবে ফ্লবেয়ার গড়েছেন বিশ্বসাহিত্যের এই চিরন্তন তিলোত্তমাকে। এই 'অনেকজনে'র মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম যে 'একজন' তিনি নিঃসংশয়ে গুস্তেভ ফ্লবেয়ার নিজে ছাড়া আর কে? গুস্তেভ ফ্লবেয়ারকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় মাদাম বোভারী আসলে কে?—তখন ফ্লবেয়ার তার উত্তরে বলেন: "Madame Bovary is me"। এই উত্তর যথার্থ এবং জীবনসঙ্গত। শুধু ফ্লবেয়ার এবং 'মাদাম বোভারী'র ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত জীবনগ্রাহ্য রচনার বেলাতেই এই উক্তি সমান অবধারিত সত্য। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে একজন স্বপনচারিণী যার ভাষ আমরা আজও বুঝতে পারি নি। সেই স্বপনচারিণীই বারংবার দেখা দিয়েছে মাদাম বোভারীর নিদ্রায়, তা জাগরণে। ধরতে গেলে যে ধরা দেয় না, ছুঁতে গেলে যে পালিয়ে যায়, ভুলতে গেলে যাকে ভোলা যায় না—সেই রহস্যময়ীকে যখনই প্রশ্ন করেছে বোভারী: 'আ কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন পা ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?'—তখনই নিরুদ্দে যাত্রার কোনও অর্থ না পেয়ে হতাশ হয়ে সে হাহাকা করে উঠেছে: 'যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী, তুমি হা শুধু মধুরহাসিনী!' ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারী ব পুরুষের পরিচর্যা করেও উত্তর পায় নি তার জীবন জিজ্ঞাসার; পায় নি বলেই রমণক্লান্ত এই নারী মরে রমণীয় হয়ে আছে আজও। 'মাদাম বোভারী' রোমান্টিব না রিয়ালিস্ট—কে বলবে?

মাদাম বোভারী কী এবং কে যথাস্থানে তার পূর্ণত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যাবে। তার আ ফ্লবেয়ার-প্রসঙ্গে ওপরে যে উদ্ধৃতি দিয়ে আরম্ভ করে সেই উক্তিটি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, কারণ ত সম্পূর্ণ তাৎপর্য অবহিত না হওয়া পর্যন্ত ফ্লবে অনুধাবন করা অসম্ভব। উদ্ধৃতির মধ্যের উক্তিটি কি ফ্লবেয়ারের সাহিত্য সম্পর্কে আংশিক উক্তি মাত্র; 'I the beginning' তো বটেই, মধ্যপথে এবং উপসংহা কোথাও কথা কেবলমাত্র কথা নয়। তার প্রমাণ:

"To Flaubert, a word was not merely tl conveyer of a thought. It was a livi entity—with a voice, a perfume, a person lity, a soul. He polished and repolished h pages—frequently devoting an entire d to a single phrase—until the society of t words upon those pages had been reduc to a perfect singing unit. If at all possib he never used the same word twice on t same page. 'It is wrong to offend the e just as it is wrong to offend the heart, of r readers.'" [Living Biographies Of Famc Novelists.]

এ কথা জানবার পর আর বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চার না যখন জানতে পারি আরও যে 'মাদাম বোভারী' ন্যাসের রচনাকাল পঞ্চান্ন মাস। ফ্লবেয়ারের বইয়ের ্যাও কেন বেশী নয়, বালজাকের তুলনায় সংখ্যায় কেন তুই নয়, তার কারণও আত্মগোপন করে থাকে যদি ধাও তাও গোঁজা আছে ওই উক্তিরই আস্তিনের : "In the beginning is the word."

২

বালজাক, তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, ডিকেন্সের কাছে চেয়ে বড় কথা ছিল—কী লিখব। গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের ছে 'কী লিখব' ছাড়াও কথা ছিল—'কেমন করে খব'। প্রথম চারজনের সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করলে যে পাওয়া যাবে তার নাম 'বক্তব্য'। এই চারজন কেন, শ্বসাহিত্যের বিস্ময় যাঁরা তাঁদের সকলের বক্তব্যই এক—ছু বলবার থাকলে তবেই লেখনী ধর। ফ্লবেয়ারের ক্তব্য আরও কিছু বেশী—শুধু বলার কথা থাকলেই হবে , বলবার কায়দাও করা চাই আয়ত্ত। লেখা হচ্ছে লোয়ার খেলার মত; চালানোয় একটু এদিক-ওদিক লেই শত্রুকে আঘাত করার বদলে তোমার অস্ত্রে তুমিই াহত তখন! লেখনী ধারণ তলোয়ার ধরার চেয়েও ঠিন, কারণ কলম এমনিতে খুব হালকা, তে নিতে তেমন জোরের দরকার হয় না। কিন্তু গজে যথেষ্ট শক্তি না ধরলে লেখনী ধারণের চেয়ে তখন রুভার বস্তু আর কিছু নেই। ফ্লবেয়ারের হাতে কলম চ্ছে গায়কের কণ্ঠে সুর। পাখিকে প্রকৃতি গলায় সুর দয়েই পাঠিয়েছে, মানুষকে করতে হয়েছে তার জন্যে সুর সাধনা। স্বর থেকে তাকে উঠতে হয়েছে সুরে। ণ্ঠস্বরের কলমে যখন সুরের লেখা সে লেখে তখন আমরা তবাক হয়ে বলি: 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।' এই যে গান—যে গানের সুরে ভোরের আকাশ ভরে যায় আলোয়, সেই সুরের জন্যে স্বরের আকুতি কৃষ্ণের জন্যে রাধার আকুলতার চেয়ে নয় এতটুকু ন্যূন। স্বরের এই সোনার তরীতে আহ্বানমাত্রই কি... দেয় না ...। বহু সাধনায়, বহুতর আরাধনায় ... গোটিকের হতে বাধ্য হয় সহযাত্রী। শুধু প্রতিভায় নয়, সুবিপুল পরিশ্রমে। কেবল আকুলতায় নয়, একাগ্রতায়। কেবল প্রারব্ধে নয়, পুরুষকারে। স্বরলোক থেকে সুরলোকে উত্তরণ কেবল তরণীসম্বলে সম্ভব নয়, অবিচলিত প্রতিজ্ঞার দু-পায়ে নিরন্তর সন্তরণ ছাড়া অসম্ভব সেই সুরের সিন্ধুতরণ।

এই স্বরের শব থেকে সুরের উৎসবে উপনীত হবার জন্যে যে অন্তহীন আরাধনা, তারই সঙ্গে শুধু তুলনা চলে ফ্লবেয়ারের সাহিত্য-সাধনার। প্রত্যেকটি অক্ষর ওজন করে, প্রত্যেক শব্দের মধ্যে শব্দাতীতের নিঃশব্দ উপস্থিতি উপলব্ধি করে, প্রতি বাক্যের মধ্যে তিনি যার সমাবেশ করেছেন তা রূপরসবর্ণগন্ধ এবং ধ্বনিমুক্ত জীবনেরই প্রতিধ্বনি। শুধু ধ্বনির গৌরব নয়, অর্থের সৌরভ। শুধু ব্যঞ্জনার বিদ্যুৎছটা নয়, বক্তব্যের আলোয় বিস্ময়কর আত্মবিশ্লেষণ। কেবল তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা নয়, আনন্দের উদয়শিখরে নবজাগ্রত বেদনার অশ্রুর উৎস-সন্ধান—ফ্লবেয়ারের সাহিত্য সাধ্যাতীতে পৌঁছবার সাধ। কল্পনার রূপকথায় জীবনের অপরূপ কথার আস্বাদ গ্রহণ—দুধের-সাধ-ঘোলে-মেটানোর সাধনা নয় তাঁর জন্যে। স্বরসাধক যে আনন্দে সুরসাধক, জীবন-নিষ্ঠ সাহিত্যসাধক গুস্তেভ ফ্লবেয়ার সেই আনন্দেই শব্দের বীণকার—যে আনন্দে বাম ও দক্ষিণ পাণিতে ধৃত বীণা-পাণির বীণায় শ্রুত হয় সৃষ্টির ঝঙ্কার। এই ঝঙ্কার যার কানে গেছে তার কাছে শব্দ কিছুতেই নয় অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। অক্ষর তার কাছে অগ্নিশিখা, শব্দ তার কানে সঙ্গীত। এই অক্ষরের আগুনেই চিরকাল ধরে চলেছে অনির্বচনীয়ের আরতি, অব্যাহত রয়েছে 'নিত্যকালের উৎসলোকে বিশ্বের দীপালিকা'। এই অগ্নিশিখা যে জ্বালাতে পেরেছে অক্ষরের প্রদীপে, শব্দের এই নিঃশব্দ সঙ্গীত যার কানের ভেতর দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে তার মর্মলোকে—কেবল সে-ই নিত্যকালের এই উৎসবে আলো জ্বালাবার পেয়েছে অক্ষয় অধিকার। এই অধিকার গুস্তেভ ফ্লবেয়ারও

অর্জন করেছিলেন। একদিনের নয়—অনেক দিনের অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়, পর্যবেক্ষণে, নিরন্তর মার্জনায় এবং নিদিধ্যাসনে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন তাঁর পথের প্রান্তে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এবং কোনও উপলক্ষেই বিচ্যুত হতে চান নি শিল্পীর স্বধর্ম থেকে কোনদিন। তাঁর সাহিত্যসাধনা সকল যুগের সমস্ত দেশের কথাসাহিত্যকর্মীর অনুধাবনযোগ্য ["...for much can be learned from his theory and practice that will be useful to the writer of any country."]।

এই কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিবৃত্তের পাতা উলটোলে অবাক হয়ে যেতে হয়। 'মাদাম বোভারী' রচনার আগে তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত রচনাপাঠে জানা যায়, ভাষার জাদু কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মত তাঁর লেখনী কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসে নি, বরং তাঁর গদ্য তখন বাগাড়ম্বর-বহুল এবং কিঞ্চিৎ কাব্যিক ছিল ["...appear to be verbose and rhetorical"]। কিন্তু 'মাদাম বোভারী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মাতৃভাষায় সবচেয়ে রূপদক্ষ ভাষার মণিকার বলে স্বীকৃতি পান। কি করে এই অবিশ্বাস্য অলীক অলৌকিক পটপরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল? আগেই বলা হয়েছে, যেভাবেই তা সম্ভব হোক, রোমনগরীর মতই তাও একদিনে তৈরি হয় নি। ফ্লবেয়ার 'মাদাম বোভারী'র মাধ্যমে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পকর্ম নির্মাণে প্রবৃত্ত হবার মুহূর্তে যে অঙ্গীকারে নিজের কাছে আবদ্ধ হন তা পুনরাবৃত্তির যোগ্য: "He was determined to produce a work of art and he felt that he could surmount the difficulties presented by the sordid nature of his subject and the vulgarity of his characters only by means of beauty of style." এই অনিন্দ্য লিপিকুশলতা আয়ত্ত করবার প্রারম্ভেই নিজের সামনে তিনি যে নির্দেশ খাড়া করেন তা হচ্ছে: "...to write well, one must at the same time feel well, think well and say well." ফ্লবেয়ারের মতে কোনও একটি ভাবপ্রকাশের জন্যে একটির বেশী দুটি যথার্থ প্রকাশভঙ্গী নেই ["When I find dissonance or a repetition in one of m phrases, I know that I am ensnared i something false".]। এই অসাধ্য সাধন করতে গি কী দুরূহ ব্রত তাঁকে উদ্‌যাপন করতে হয় তার পর্যা পরিচয় পাওয়া যায় ফ্লবেয়ার সম্পর্কে এই আলোচনায়:

"First of all he worked hard. Befo starting on a book he read everythin he could find that was pertinent. He ma voluminous notes. When writing he wou sketch out roughly what he wished to s and then work on what he had writte elaborating, cutting, rewriting, till he g the effect he wanted. That done, he wou go out onto his terrace and shout out t phrases he had written, convinced that they did not sound well to the ear, if their form they were not perfectly easy say, there must be something wrong wi them. In that case he would take th back and work over them again until was at last satisfied. In one of his lett he writes: 'The whole of Monday Tuesday were taken up with a search two lines.' This of course does not me that he wrote only two lines in two da he may well have written ten or a do pages; it means that with all that lab he succeeded in writing only two lines perfect as he wanted them. It is no won that Madame Bovary took him fifty months to write."

কোনও একদিন আর কোনও বিস্ময়ের-স অতিক্রান্ত বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারে হয়তো রোমন একদিনে না হোক কয়েকদিনে সম্ভব হবে তৈরি কিন্তু কোনও দিনই সম্ভব হবে না এই দুশ্চর বাক্-ত ছাড়া 'মাদাম বোভারী' রচনা। ফ্লবেয়ার ছাড়া এ সাধ অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নেওয়া দুরূহ হবে আর যে কে

সাহিত্যপথচারীর পক্ষেই এবং ফ্লবেয়ারের চেয়ে বেশী প্রতিভা নিয়ে জন্মানো যদি সম্ভবও হয় তবুও 'মাদাম বোভারী'র রচনা-নৈপুণ্য মপাসাঁর সাহিত্যগুরুর একাগ্রতা নিষ্ঠা এবং স্বধর্মে অবিচলিত থাকার পুরুষ-চৈতন্য ছাড়া অনায়ত্ত রইবে চিরকালই।

৩

গুস্তেভ ফ্লবেয়ার নিঃসঙ্গ প্রতিভাবান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও জানতেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া জীবনদর্শন ব্যতীত মাদাম বোভারীর সাক্ষাৎ পাবার আশা দুরাশা বই কিছু নয়। তাঁর প্রিয় শিষ্য মপাসাঁকে তিনি যে ইষ্টমন্ত্র দেন সাহিত্যে দীক্ষা দেবার কালে তা হচ্ছে: "Observe, and then observe again and again." 'নেকলেসে'র মত চিরকালের সাহিত্যের রত্নহার যিনি গাঁথবেন একদিন তাঁর হাতে গাণ্ডীব তুলে দেবার মুহূর্তে ফ্লবেয়ার যে বীজ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির কানে কানে উচ্চারণ করেছিলেন, তা নিজেও পালন করে গেছেন শেষদিন পর্যন্ত। কখনও সেই প্রতিজ্ঞা থেকে এক পা সরে আসেন নি ফ্লবেয়ার। সরে আসেন নি বলেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে সেই দু-খানি অদ্বিতীয় বই—'The Sentimental Education', তাঁর স্বদেশীয়দের মতে তাঁর অদ্বিতীয় সৃষ্টি; এবং 'Madame Bovary'—বিশ্ববাসীর মতে গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের তো বটেই, craft-এর বিচারে বিশ্বসাহিত্যেরও অদ্বিতীয় বিস্ময়। এই বিস্ময়কর বই যখন তিনি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ এবং তখনও পর্যন্ত 'The Temptation of Saint. Anthony' ছাড়া আর যা উল্লেখযোগ্য রচনা তাঁর তার সবই প্রকৃতিতে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ["···the more important of his early works had been strictly personal."]।

গুস্তেভ ফ্লবেয়ার যখন প্রাচ্যে পরিভ্রমণ করছেন সবান্ধবে, সেই সময়েই তিনি মনে মনে এমন একটি রচনার খসড়া করছিলেন যেটি তাঁর এযাবৎকালের সমস্ত রচনার ছক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রীতির অন্য বস্তু হবে। ইতালীতে একটি ছবি দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। ছবিটি Brueghel-এর আঁকা। বিষয়: The Temptation of Saint. Anthony। এর পর এক সঙ্গে চলে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন এবং রচনা-প্রস্তুতি। লেখাশেষে ডেকে পাঠান দুজন অভিন্নহৃদয় মিত্রকে Croisset-এ তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাবার জন্যে। পাণ্ডুলিপি পড়া হয়ে গেলে চতুর্থ দিনের মধ্যরাত্রে একজন শ্রোতা মন্তব্য করেন: "We think you ought to throw it in the fire and not speak of it again." পরের দিন বিমর্ষ ফ্লবেয়ারকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেন: "Why don't you write the story of Delamare." ফ্লবেয়ারের মুখে বিষণ্ণতার মেঘ সরে গিয়ে মুহূর্তে অবারিত হল অদম্য আশার উজ্জ্বলালোক: "Why not ?"

Delamare-এর কাহিনী তখন সকলেরই কানে গেছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর Delamare প্রতিবেশী এক চাষীর পরমাসুন্দরী তন্বী মেয়েকে বিয়ে করে। অত্যন্ত খরুচে আর সাংঘাতিক সৌখীন এই তরুণী স্বামীর প্রতি অল্পদিনেই বিমুখ হয়; একের পর একে প্রেমাস্পদের পর প্রেমাস্পদ পরিবর্তন করে পুরাতন পরিচ্ছদ বাতিল করে নতুন পরিচ্ছদ ক্রয়ের চেয়েও দ্রুতহারে। ঋণের দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে দেবার আগে সেই যে রূপসী রমণী বিষ খেয়ে মারা যায় সেই হচ্ছে মাদাম বোভারীর মডেল ["Flaubert followed this mean little story with complete fidelity."]।

'মাদাম বোভারী'—গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের অবিনশ্বর সাহিত্যসম্ভার। প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই ফরাসী সাহিত্য-সমঝদারেরা তাঁকে মনুষ্যত্বের অবমাননার দায়ে তীব্র তিরস্কার করেন ["...the critics condemned him as a moral leper."]। ফরাসী সরকার তাঁকে অভিযুক্ত করেন রাজদ্বারে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে: 'foisting pornographic literature upon the public." ফ্লবেয়ারের পক্ষ সমর্থন করেন যে আইন ব্যবসায়ী, তিনি বলেন যে অশ্লীলতা-দুষ্ট বলে বর্ণিত পরিচ্ছেদগুলি চরিত্র-পরিস্ফুটনের কারণে শুধু প্রয়োজনীয়

নয়, অপরিহার্য ছিল। এ ছাড়া তিনি আরও বলেন যে: "...the moral of the novel was good because Madame Bovary suffered for her misbehavior." সমারসেট মম্ এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'Great Novelists And Their Novels'-এ তা পড়বার মত। মম্ বলছেন যে এ কথা সেই মামলা চলবার সময়ে কারুর মাথায় আসে নি যে মাদাম বোভারীর পতন তার সতীত্বহীনতার কারণে ঘটে নি: "·· but because she ran up bills that she hadn't the money to pay for." মমের হৃদয়হীন যুক্তিশীতল তির্যক্ পর্যবেক্ষণ বলতে বিস্মৃত হয় নি এ কথাও যে: "If she had had the economical instincts of the French peasant that we are told she was, there is no reoson why she should not have gone from lover to lover without coming to harm." সাহিত্যানুরাগীদের সৌভাগ্যক্রমে 'মাদাম বোভারী'-মামলার বিচারপতির কমনসেন্স মমের চেয়ে অনেক কম ছিল; তিনি মাদাম বোভারীর পক্ষের উকিলের যুক্তি গ্রাহ্য করে ফ্লবেয়ারকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি দেন।

সমস্ত পারী যখন 'মাদাম বোভারী' শ্লীল কি অশ্লীল এই বিবাদে কেউ সরকারপক্ষে কেউ লেখকের সপক্ষে কোমর বেঁধে কোন্দলে উন্মত্ত, তখন যাকে নিয়ে সাহিত্যজগতে পাড়াপড়শী কারুর ঘুম নেই সেই 'মাদাম বোভারী'র জনক এবং মপাসাঁর সাহিত্যমন্ত্রোদ্গাতা গুস্তেভ ফ্লবেয়ার ধ্যানসমাহিত ধূর্জটির মত তরঙ্গাহত তট থেকে বহুদূরবর্তী মধ্যসমুদ্রের মত কোলাহলকাতর ক্লান্ত ধরার কর্দমাক্ত মৃত্তিকার অনেক উর্ধ্বে নিঃসঙ্গ আকাশপ্রদীপের মতই সঙ্গীহীন নিস্পৃহ ও নিরাসক্তচিত্তে 'মাদাম বোভারী'-পরবর্তী রচনার প্রস্তুতিপর্বোপলক্ষে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ নিত্য বিশ্লেষণ এবং একনিষ্ঠ নিদিধ্যাসনে একাকী সমাসীন। সেই আসনে উপবিষ্ট থেকেই ফ্লবেয়ার উচ্চারণ করেছেন তাঁর জীবন ও সাহিত্য-বাণী: "I am a satirist, to be sure. But satire is the salt that enables mankind to digest the flatness of life."

8

সমগ্র য়ুরোপে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেদিন গুস্তেভ ফ্লবেয়ার। অভিজ্ঞতার্জনের অভিপ্রায়ে প্রতি বছর তিনি পারীতে অবস্থান করতেন। যদিও তিন চার মাস এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয় স্বভাবতঃই তবুও জানা যায় তাঁর সাহিত্য-শিল্প সহকর্মীরা তাঁকে ভয় করতেন বেশী, ভালবাসতেন কম ["...he was admired rather than liked."]। তাঁর সাহিত্যালোচনায় অবতীর্ণ একজন মানুষ ফ্লবেয়ার সম্পর্কে যে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন তা মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়: "His companions found him very sensitive and very irritable. He would suffer no contradiction, and they took care not to disagree with him since if they ventured to do so his rage was alarming. He was a harsh critic of other men's work and shared a delusion common to autho that what he could not do himself was worthless. On the other hand he was infuriated by any criticism of his own work and ascribed it to jealousy, malice or stupidity."। এ ছাড়া ফ্লবেয়ার অর্থের বিনিময়ে লেখার বিরুদ্ধে ছিলেন। লিখে টাকা করলে লেখার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় লেখক এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট মত। তাঁর এই মত সম্পর্কে অবশ্য মমের বক্তব্য এখানে উদ্ধার করে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরং কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে অনায়াসেই: "It was of course less difficult for him to take up this disinterested attitude since he had for the period a substantial fortune."

ফ্লবেয়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া আর যা মূলধন করেছিলেন

নার জন্যে তা হচ্ছে অধ্যয়ন। যে কোনও লেখায় হাত বার আগে সেই বিষয়ে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য াপাদমস্তক তথ্যানুসন্ধানের পর তবেই তুলে নিতেন ার কলম। এবং আগেই বলা হয়েছে কলমের মুখে যাই াসত তাই বসিয়ে যাওয়া তাঁর চরিত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার ল। কলমের মুখ নয়, পাঠকের মুখ নয়, নিজের খ চেয়ে, সত্যের মুখ চেয়ে এবং সর্বোপরি জীবনের মুখ য়ে তিনি খেপার মত খুঁজে খুঁজে বেড়াতেন কথার রশপাথর। যে কথা হীরা-মণি-মাণিক্যের চেয়েও ল্যবান সেই অমূল্য কথার সওদাগর ফ্লবেয়ার। তিনি থার অযথা অথবা অপব্যবহারের বিরোধী ছিলেন াজীবন। অপরিহার্য অনিবার্য প্রয়োগ ছাড়া কথার াস্ত্রনিক্ষেপ ছিল অক্ষমতার পরিচায়ক। অনুরূপ উজ্জ্বল ার এক উদাহরণ আছে রামায়ণে। অমোচনীয় কোনও াপরাধের প্রায়শ্চিত্তের প্রক্রিয়া জানতে স্বয়ং দশরথ াপস্থিত ত্রিকালজ্ঞ ঋষির দরজায়। ঋষি তখন কুটীরে নুপস্থিত; ঋষিপুত্র শ্রীরামজনককে বিধান দিলেন গবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম করতে তিনবার। ঋষি ুটীরে প্রত্যাবর্তন করবার পর যখন অবগত হলেন এই প্রায়শ্চিত্তকরণ-বিধি, তখন তিনি অভিশাপ দিলেন নিজের পুত্রকে। ঋষিপুত্রের অপরাধ দশরথের চেয়েও অনেক গুরুভার। কেন? কারণ, যে শ্রীরামচন্দ্রের নাম একবার নিলে, যাঁকে একবার মাত্র প্রণাম করলে মুহূর্তে মুছে যায় জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জিত জঞ্জাল, সেই পবিত্র নাম একবার করা যথেষ্ট মনে না করায় দশরথের অপরাধ যদি বা ক্ষমার যোগ্য, মার্জনার অযোগ্য অপরাধ করেছেন ঋষিতনয়।

'কথা' ছিল ফ্লবেয়ারের সৃষ্টির কৌটোয় মন্ত্রপূত ঔষধের মত; প্রত্যেকটির ওজন গুণ এবং ব্যবহারের মাত্রা ছিল সুনির্দিষ্ট। একের জগতে আর একের অনধিকার প্রবেশ হিতে বিপরীতের কারণ হতে পারত অনায়াসেই। হতে পারত, কিন্তু হয় নি। মানবমনের সুদক্ষ চিকিৎসক গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের কথার ঔষধ ব্যবহারের অপরূপ দক্ষতাই না হওয়ার প্রধান সহায় হয়েছে।

'মাদাম বোভারী' লেখার প্রাক্কালে তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে একজন আলোচকের মতে: "His aim now was to be not only realistic but objective. He determined to tell the truth without bias or prejudice, and not in any way himself to enter into the narrative." ফ্লবেয়ারের সমালোচক মন্তব্য করেছেন অতঃপর: "But the attempt at complete impersonality fails with Flaubert as it fails with every novelist, because complete impersonality is impossible." এই বিশ্লেষণ এবং অভিমত সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিচারে প্রবৃত্ত হবার আগে গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের জীবনের আর অতি অল্প যে দু-একটি পরিচ্ছেদ তখনও লেখা হয় নি তারই সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ফ্লবেয়ার এবং মাদাম বোভারী দুজনকেই বুঝতে তা সাহায্য না করুক, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না তার উল্লেখ।

'মাদাম বোভারী'র পর তিনি তাঁর ব্যর্থ-সৃষ্টি 'Salammbo' প্রকাশ করেন ["...generally concidered a failure,"]। 'The Sentimental Education'—যার কথা আগেই বলা হয়েছে, সেটি পরিমার্জনার পর প্রকাশ করেন অতঃপর। এবং তৃতীয়বার সংস্কার করেন তাঁর অন্যতম রচনা: 'The Temptation of Saint. Anthony'-র। মনে রাখতে হবে ফ্লবেয়ার-প্রসঙ্গে যে তিনি বারংবার একই 'থিম' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যৌবনের নানা রঙের দিনের স্মৃতি তাঁর মনের খাঁচার চারপাশে কেবলই উড়ে উড়ে এসেছে; তাঁর ব্যাখ্যাকার আমাদের জানাতে ভোলেন নি: "...it is as though he could not disembarass his soul of the burden of them until he had written them down in a definite form."

সোনার শেকলের বাঁধন যারা সইল না সেই যৌবনের আগুন-জ্বালা-দিনের বেদনাকে গুস্তেভ ফ্লবেয়ার লালন করে গেছেন শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। অক্ষরের পর অক্ষরের সুতোয়,

শব্দের পর শব্দের শৃঙ্খলে গেঁথে গেছেন মালার মত, যে মালায় বারবারই দেখা দিয়েছে সেই একটি ফুল—যার নাম Elisa Schlesinger।

৫

ফ্লবেয়ারের জীবন-নাট্যের যবনিকা পতনের মুহূর্তে একটি স্মরণীয় ঘটনা তাঁর চরিত্রকে অবিস্মরণীয় মহিমায় মণ্ডিত করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের পতনের পর তাঁর ভাইঝি Caroline-এর স্বামী অর্থাভাবে দেউলিয়া হবার উপক্রম হলে ফ্লবেয়ার তাঁর যথাসর্বস্ব সঞ্চয় নিঃসঙ্কোচে তুলে দেন তার হাতে। প্রতিবেশীদের কটূক্তিতে গুস্তেভ ফ্লবেয়ার সেদিন কিন্তু: "A crusty old misanthropy"। একটি নীচু লম্বা বাড়িতে গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের কানে পৌঁছত না সেই কটূক্তি; দোতলার ঘরে পাঁচটি খোলা জানলা দিয়ে তিনি তখন যেদিকে তাকান সেদিকেই মেঘমুক্ত আকাশ হেসে ওঠে প্রসন্ন বন্ধুর মত: "Whichever way I look, I see the universal sky." সঙ্গীহীন গুস্তেভ ফ্লবেয়ার সেই ঘরে দশটা পর্যন্ত চিঠি এবং কাগজপত্র পড়তেন, এগারোটায় অল্প জলযোগ করে নদীর ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফিরতেন যখন তখন বেলা দ্বিপ্রহর। লিখতেন সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত, নৈশাহারের পর বাগানে বেড়াতেন অল্পক্ষণ, তারপর আবার ডুবে যেতেন কাজে। কাজ সারা হত যখন তখন দিন শুরু হতে আর বেশী দেরি নেই। নিঃসঙ্গতার অস্বাচ্ছন্দ্য কখনও স্পর্শ করে নি 'মাদাম বোভারী'র জনককে। কারণ: "In the final analysis, a man lives in his ideas. That is where he finds his only amusement and receives his only reward."

একটির পর একটি প্রিয়জনকে হারাতে হারাতে ফ্লবেয়ারের জীবনের অপরাহ্ণেই কখন গড়িয়ে এসেছে সায়াহ্ন জানতে পারে নি কেউ। Caroline-এর স্বামীকে সর্বস্ব দিয়ে ঋণমুক্ত করবার পর আর্থিক দুশ্চিন্তার দুর্দিনে দেখা দিল দীর্ঘ ব্যবধানের পর আবার সেই দুরারোগ্য hystero-epilepsy। ঠিক সেই সময়ে জীবনের সর্বশেষ রচনা: 'Buvardet Pecuchet'-এ হাত দিয়েছেন। এই বইতে শেষবারের মত জ্বলে উঠতে চেয়েছেন গুস্তেভ ফ্লবেয়ার: "...in which he determined to have his final fling at the stupidity of the human race,..."। দু খণ্ডে সমাপ্য এই বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন যখন তখন একদিন—১৮৮০ সনের ৮ই মের এক সকালে: "...the maid went into the library at eleven to bring him his lunch. She found him lying on the divan muttering incomprehensible words. She ran for the doctor and brought him back with her. He could do nothing. In less than an hour Gustave Flaubert was dead...." [The World's Ten Greatest Novels]।

মৃত্যুর মসীকৃষ্ণ মুখ আঁকা জীবনের বর্ণাঢ্য এই পটভূমি স্মরণে রেখে তবেই আমরা অগ্রসর হব 'মাদাম বোভারী' আলোচনায়। সে আলোচনা আরম্ভের আগে আমরা আরও যা মনে রাখব তা 'রক্তকরবী' নাটকের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় উক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আ... "...রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে এক মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন ত হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবী পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে ত হলে তার দায় কবির নয়।..."

বিশ্বের যে কোনও মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ অর্জন করতে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র এই ভূমিকাই সবচেয়ে জীবনসঙ্গত পটভূমিকা এ কথা আমাদের ম রাখতেই হবে।

[ক্রমশ]

উইলিয়ম হিকি (৫)

কলকাতায় বাসা করে থিতিয়ে বসার অল্পদিনের মধ্যেই আবার আগেকার মতন আমার প্র্যাকটিশ জমে উঠল। আমার মক্কেলরা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে খুব খুশী হতেন, এমন কি বিপরীত পক্ষের লোকেরাও আমার উদারতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমি সবসময় আমার অধীন কর্মচারীদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতাম, কখনও তাদের অসম্মান করতাম না, অথচ মেলামেশার ব্যাপারে একটা পার্থক্য বজায় রেখে চলতাম। এই কারণে কোন স্তরের লোকের কাছেই আমি কোনদিন অপ্রিয় হই নি।

কলকাতায় বাসা করার পর মিসেস হিকি ও আমার জন্য দু'খানা গাড়ি কিনতে হল। মিসেস হিকির জন্য কিনলাম লণ্ডনে তৈরী চ্যারিয়ট গাড়ি, তিন হাজার সিক্কা টাকা দিয়ে। আমার জন্য কিনলাম একটি ফিটন গাড়ি, আঠার-শো টাকা দিয়ে। তিনটি ঘোড়া কিনলাম ১৭৫০৲ টাকা দামে। তখনকার দিনে ভাল জাত-ঘোড়ার এরকমই দাম ছিল। এইসব জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে আমাকে প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা খরচ করতে হল। তার জন্য আমাকে বছরে শতকরা ১২৲ টাকা করে সুদ দিতে হত। প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমাকে এই ঋণের বোঝা বহন করতে হয়েছে।

লর্ডের ছেলে

সেপ্টেম্বর মাসে তেরো বছরের ছেলে অনরেবল ফ্রেডারিক ফিৎসরয় কলকাতায় এসে পৌঁছল। লর্ড সাউদাম্পটনের ছেলে, তাই 'অনরেবল' বললাম। বিরাট পরিবার নিয়ে লর্ড শেষদিকে বেশ একটু আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে পড়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর কিশোর পুত্রকে কোম্পানির সামান্য 'রাইটার' করে বাংলাদেশে পাঠাতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ছেলেটি খুব চঞ্চল ও হালকাপ্রকৃতির ছিল বলে আমার নিজের খুব ভাল লাগত, কারণ কিশোর বয়সে আমিও তাই ছিলাম। আমি তাকে আমার বাড়ির ভোজসভায় প্রায়ই নেমন্তন্ন করতাম। কিন্তু কিছুদিন আলাপ-পরিচয়ের পর বুঝলাম যে, বাইরে থেকে তাকে যেরকম হালকাপ্রকৃতির মনে হত আসলে তা সে নয়। ছেলেমানুষির মুখোশ পরে যে-কোন কুকর্ম তার পক্ষে করা সম্ভব। ছেলেটির এই পরিচয় পাবার পর থেকে আমি আর তাকে খুব বেশী পাত্তা দিতাম না বাড়িতে। শুনলাম তার মধ্যে কিছু পাগলামিরও লক্ষণ ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তার মার কাছ থেকে সে এই উপসর্গটি পেয়েছিল। এই পাগলামির একটি ছোট্ট ঘটনা এখানে বর্ণনা করছি।

এক ভদ্রলোক কলকাতায় পৌঁছে মেকলে নামে এক

ব্যক্তির খোঁজ করতে ফিৎসরয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিঙের কোয়ার্টারে তখন এঁরা সকলে একটি করে ঘর নিয়ে থাকতেন। মেকলে তখন বাসায় ছিলেন না। ভদ্রলোক ফিৎসরয়কে জিজ্ঞাসা করতে সে বলে, "মেকলে তো অনেক আছে, আপনি কোন্ মেকলেকে চান?" ভদ্রলোক বলেন, "এতজন মেকলে আছেন তা আমি জানতাম না, আমার বন্ধু একজন স্কচ্ ম্যান।" সে বলে, "ঐ পরিচয় দিলে কি আর মেকলেকে খুঁজে পাওয়া যায়? তবে আসুন, দেখা যাক্ কোন একটা উপায় খুঁজে বার করা যায় কি না! আপনি তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?" তিনি উত্তর দিলেন, "তা নিশ্চয় পারব।" "তবে এক কাজ করুন, বাড়ির সামনে রাস্তায় চলে যান, সেখানে দাঁড়িয়ে 'ম্যাক' 'ম্যাক' করে ডাক দিন। ডাক শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনেকেই রাস্তার দিকে চেয়ে দেখবে, তখন আপনি আপনার মেকলেকে দেখে ফেলবেন।"—এই কথা বলে ফিৎসরয় চলে গেল। ভদ্রলোক নিশ্চয় বুঝলেন যে পাগলের পাল্লায় পড়েছেন।

কলকাতায় বাসা করার কিছুদিন পর থেকেই আমার স্ত্রী শার্লতের দ্রুত শরীর খারাপ হতে লাগল। ডাক্তার বৈদ্য দেখিয়েও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল করা সম্ভব হল না। তার কারণ, বাইরের সামাজিক লৌকিকতা রক্ষা করার জন্য তাঁকে এত পরিশ্রম করতে হত যে ডাক্তারের কোন উপদেশই তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভব হত না। পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা অনবরত চিঠিপত্র লিখে আমাদের নিমন্ত্রণ করতেন ও প্রতিদানে নিমন্ত্রিত হতে চাইতেন। উপহার-উপঢৌকনও তাঁদের কাছ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় আসতে আরম্ভ করল। অতএব প্রতিউপহারেরও ঝক্কি বাড়ল অনেক। সব ঝক্কিটাই প্রায় শার্লতেকে একলাই সামলাতে হত। মধ্যে মধ্যে বন্ধুপত্নীরা বাড়ি চড়াও করে তাঁকে বাজারে কেনাকাটা করার জন্য ধরে নিয়ে যেতেন। অসুস্থ শরীরে এত ঝঞ্ঝাট ও উপদ্রব তাঁর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। স্বাস্থ্যও তাঁর ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল।

বাজারের কথা

শ্রীমতীর একদিনের বাজার করার অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে আছে। জনৈকা বন্ধুপত্নীর সঙ্গে তিনি একদিন কলকাতার চীনাবাজারে বাজার করতে গিয়েছিলেন। চীনাবাজারে তখন বাঙালীদের অনেক দোকান ছিল, বাজারে গিয়ে তাঁর সঙ্গিনী একটির পর একটি দোকান ঘুরে জিনিসপত্র একেবারে তছনছ করে ফেললেন, কিন্তু একটি পয়সারও জিনিস কিছু কিনলেন না। দোকানদাররা অত্যন্ত বিরক্ত হল, শার্লতেও আদৌ খুশী হন নি। অবশেষে দোকানদারদের কাছে সম্মান বাঁচাবার জন্য শার্লতে কয়েকটি বিলিতী রিবন কেনেন। ব্যাপারটা আমি কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, যখন ব্যবসায়ী গোপী দে'র তরফ থেকে অ্যাটর্নি হ্যামিলটন চিঠি লিখে জানালেন যে, দু' টুকরো রিবনের জন্য তাঁর ক্লায়েন্টের ৩২৲ সিক্কা টাকা অবিলম্বে আমাকে দিতে হবে, আরও পাঁচ টাকা তাঁর চিঠির খরচসহ। তা না দিলে সুপ্রিম-কোর্টে ঐ টাকার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

চিঠি পেয়ে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সামান্য টাকার জন্য একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ীর এই উকিলের চিঠি লেখার ঔদ্ধত্য আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না। পাওনা টাকার সঙ্গে আমি অ্যাটর্নিকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাঁর চিঠির একটি জবাবও পাঠিয়ে দিলাম। হ্যামিলটনের চিঠিখানি আমি কোর্টের জজ, অ্যাডভোকেট ও অন্যান্য অফিসারদের সকলকে দেখালাম। সকলেই তাঁর চিঠির খুব নিন্দা করলেন, এবং স্বীকার করলেন যে এরকম চিঠি লেখা গোপী দে ও তাঁর অ্যাটর্নির পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে। হ্যামিলটন অবশ্য পরে খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারি নি। অ্যাটর্নি হিসেবে হ্যামিলটন কর্নেল ওয়াটসনের খুব প্রিয় ছিলেন। তা হলেও আমি সবসময় এরপর থেকে তাঁকে এড়িয়ে চলতাম।

যাই হোক ইতিমধ্যে শার্লতের ক্রমেই স্বাস্থ্যহানি হতে লাগল, এবং বোঝা গেল অসুখ বেশ জটিল হয়ে উঠছে। ১৭৮৩ সনে ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর আমি পূর্বের

রি-কমিটীর কাছে আমার কিছু পাওনা টাকার জন্য চিঠি লখলাম। বিলেতে কমিটীর তরফ থেকে আবেদনপত্রটি পার্লামেণ্টে পেশ করে তদারক করে আমি নিজে বেশ কছু টাকা খরচ করেছিলাম। কর্নেল ওয়াটসন আমার াবি সমর্থন করেন, কিন্তু কর্নেল পীয়ার্স, মিঃ শোর ও ান্যান্য সকলে সমর্থন করেন নি। ব্যক্তিগত কারণে নয়, ান্য কারণে।

আমাকে বাধ্য হয়ে তাই সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করতে হল। আবেদন করার আগে আমি আমার কাউন্সেলকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। ইংলণ্ড যাবার দু' মাস আগে থেকে কি ভাবে কমিটীকে সাহায্য করেছি, ইংলণ্ডে গিয়ে কি ভাবে আমি রেকর্ড-কীপার ও কোর্টের অন্যান্য কর্মচারীদের খরচ যুগিয়েছি, নানাবিধ প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহ করার জন্য, এবং কি ভাবে আবেদনটি পার্লামেণ্টে যথাযথভাবে উত্থাপন ও পরিচালনা করার জন্য নিজে মেহনত করেছি—সেসব কথা তাঁকে গুছিয়ে বললাম। যে টাকা আমি কমিটীর কাছে চেয়েছি, খুঁটিয়ে দাবি করলে তার চেয়ে অনেক বেশী চাইতে পারি। বিবরণ শুনে কাউন্সেলও তাই বললেন। অতএব আমার খরচপত্রের ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের একটি বিস্তারিত বিল তৈরি করে আমি সুপ্রিমকোর্টে ফাইল করে দিলাম। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। শুভাকাঙ্ক্ষীরাও তাই পরামর্শ দিলেন। জুরি-কমিটীর বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে আমাকে মামলা করতে হল। কিছুদিন পরে সালিশী নিযুক্ত করে আমার মামলার নিষ্পত্তি করা হল, কমিটীর কাছ থেকে তিন হাজার সিক্কা টাকা আমি পেলাম।

স্ত্রীবিয়োগ

এদিকে আমার স্ত্রী শার্লতের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, কিছুদিন তাঁকে নিয়ে নদীর বুকে বেড়াতে, যদি হাওয়া বদলের ফলে কোন উপকার হয়। বেশ বড় একটি নৌকা তার জন্য ভাড়া করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলাম। ৭ ডিসেম্বর নৌকা করে বেরিয়ে পড়লাম বজবজের দিকে। সেখানে আমার এক বন্ধু থাকতেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম দিনটা বেশ ভালই কাটল, শার্লতের স্বাস্থ্যেরও যেন একটু উন্নতি হল বলে মনে হল। কিন্তু তার পরের দিন থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের এত দ্রুত অবনতি হতে থাকল যে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পাঁচদিনের দিন সকালে তাঁকে নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলকাতায় ফিরে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যে ডঃ স্টার্ক বললেন যে তাঁর বাঁচবার সম্ভাবনা খুব কম বলে তিনি মনে করেন। বাস্তবিক তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে ক্রীসমাসের দিন এল—২৫ ডিসেম্বর। সকালে উঠে শার্লতে একবার ম্লান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। কথা বলার আর শক্তি নেই তখন। ক্ষীণ সুরে আমাকে কাছে ডাকলেন। হাত তোলার আর ক্ষমতা নেই। তবু কম্পমান হাত দুটি তুলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, মুখটি মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করে কানে-কানে বললেন, "দুঃখ করো না, ঈশ্বরের কথা চিন্তা করো, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখো, শান্তি পাবে।" তার কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার বললেন, শার্লতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একমুহূর্তের মধ্যে আমার চারিদিকের সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে যেন আলো নিভে গেল। মর্মান্তিক বিচ্ছেদবেদনার অগাধ অন্ধকারে আমি তলিয়ে গেলাম। কোন সান্ত্বনাই ভাল লাগছিল না। চেনা ঘরবাড়ি, চেনা মুখ, চেনা পরিবেশ—সবই আরও তীব্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল আমার শার্লতেকে। টলফ্রে, মর্স ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরা সকলে আমাকে কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে বললেন।

আমার বন্ধু রবার্ট পট তখন বর্ধমানে ছিল। সে আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখল। তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলে আমার মনের ভার কিছুটা কমতে পারে ভেবে ৩০ ডিসেম্বর বর্ধমান যাত্রা করলাম। পরদিন সকালে বর্ধমান পৌঁছলাম ব্রেকফাস্টের সময়। পট আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। নানা কাজ ও

নানা পরিবেশের ভিতর দিয়ে সে আমার সর্বক্ষণের একমুখী চিন্তাকে ভিন্নমুখী করবার ব্যবস্থা করল। বর্ধমান থেকে দূরে নানা জায়গায় আমরা বেড়াতে যেতাম। নানারকমের লোকজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতাম। বর্ধমান টাউন থেকে প্রায় মাইল বারো দূরে পট শিকার করার জন্য চমৎকার একটি বাংলো তৈরি করেছিল। তার সঙ্গে প্রায়ই যেতে হত সেখানে। শিকারেও সঙ্গী হতে হত। মানুষের সান্ত্বনার চেয়ে প্রকৃতির পরিবেশের এই সান্ত্বনায় সত্যিই আমার মনের ভার কমেছিল অনেক।

অপরাধীর বিচার

১৪ জানুয়ারি ১৭৮৪ একজন নীচজাতের লোককে খুনের অপরাধে বিচার করা হয়। কোন ধনিক হিন্দু পরিবারের ছ বছরের একটি বালককে বাড়ির দরজার কাছ থেকে ভুলিয়ে ছোট একটা গলির ভিতর নিয়ে গিয়ে লোকটি তার গলা কেটে ফেলে এবং তার ধড়টিকে ভার বেঁধে (যাতে ভেসে না ওঠে) পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। এই বর্বর শিশুহত্যার প্রধান উদ্দেশ্য হল ছেলেটির পায়ের মল, হাতের বালা ও গলার হার ছিনিয়ে নেওয়া। এ দেশের অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বাল্যকালে নানারকম গহনা পরিয়ে রাখা হত। এতবড় অপরাধ করে স্বভাবতঃই লোকটি কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করল যে সে দোষী। কিন্তু সার্ রবার্ট চেম্বার্স অকারণে আইনের সূক্ষ্ম বিচারের কথা ভেবে তাকে ঐভাবে দোষ স্বীকার না করে বিতর্কের সুযোগ নিতে বললেন। বিচারকের এই অনুরোধ শুনে লোকটি কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "বেশ, তা হলে আমি দোষী নই।"

জুরির একটি প্যানেল ঠিক করা হল। শুনানি চলতে লাগল। লোকটি যে সত্যিই খুন করেছে তা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা হল না। অবশেষে আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার কিছু বক্তব্য আছে কি না। সে উত্তর দিল, "আমার আর কি বলবার থাকতে পারে! আমি ছেলেটিকে খুন করেছিলাম। শয়তান আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল। আমি মহা অপরাধ করেছি, এবং আমি জানি সেজন্য আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। সবই আমার অদৃষ্ট, এতে কারও কিছু করার নেই। বিচার আপনারা ঠিকই করেছেন।"

যথারীতি কোর্ট-ক্লার্ক যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তা হলে কি তোমার কিছু বলবার আছে?" লোকটি বেশ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, "না মশায়, কিছুই বলবার নেই। কেন অনর্থক ঘ্যানর-ঘ্যানর করে বিরক্ত করছেন। আপনাদের মতন এমন অদ্ভুত বিচার আমি দেখি নি। আমি বলছি আমি খুন করেছি, আর আপনারা আমাকে দিয়ে বলাতে চান যে আমি খুন করি নি। তারপর আইনের নানারকম কসরত দেখিয়ে ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত জাহির করতে চান। আপনাদের বিচারের উপদ্রবে আমি প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। অনুগ্রহ করে আপনাদের বিচারের পালা শেষ করুন, এবং আমাকে এই জঘন্য কাঠগড়া থেকে মুক্তি দিন।"

তা সত্ত্বেও মধ্যরাত্রের আগে বিচারের পালা শেষ হল না, কারণ আইনের বাতিকগ্রস্ত সার্ রবার্ট চেম্বার্স কেবল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাক্ষীদের নামের বানান এবং তাঁদের প্রত্যেকটি কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অবশেষে খুনী আসামীর মৃত্যুদণ্ড হল। পরদিন সোমবার সকালে ঠিক হল তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

মর্স আমাকে অনুরোধ করলেন, পরদিন ফাঁসির জায়গায় যথাসময়ে উপস্থিত হবার জন্য। আমি তাই উপস্থিত হলাম। ফাঁসির জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। মঞ্চে ওঠার আগে শেরিফ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মৃত্যুর আগে তোমার যদি কিছু বাসনা থাকে তো বল।" লোকটি তখন নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিল, "বাসনা আমার বিশেষ কিছু নেই। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, দয়া করে এখন কিছু খেতে দিন। জেলখানায় আপনারা আমাকে প্রায় না খাইয়ে রেখেছেন।" লোকটির কথা শুনে আমরা সকলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শেরিফের মুখ দিয়ে দেখি কথা বেরুচ্ছে না, তিনি বোবা হয়ে গেছেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে যে ব্যক্তি ফাঁসিকাঠে ঝুলে প্রাণ দেবে

খিদে পেলেও তা যে এমনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, ; তা কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু ঐস্থানে তখন ন খাদ্য সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। রফ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন থ লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, "আপনারা অকারণে ার জন্য এত ব্যস্ত হবেন না। খাবার না পাওয়া ল আর কি করবেন! খাদ্যের প্রতি আমার কোন ভ নেই। তবে আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন মার কি ইচ্ছা আছে, আমি তাই উত্তর দিয়েছিলাম আমার খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিন। কিন্তু ার যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন আর দরকার নেই।" খাদ্যসমস্যার এইভাবে যখন সমাধান হয়ে গেল তখন নট পাঁচেকের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চের তক্তাটিও সরিয়ে ওয়া হল তার পায়ের তলা থেকে, এবং লোকটি দড়িতে তে লাগল।

চিত্রকর টমাস হিকি

ফেব্রুয়ারি মাসে হেস্টিংস-পত্নী মাদাম ইমহফ কোম্পানির হাজে করে কলকাতা ছেড়ে ইউরোপ চলে গেলেন। ` মাসে আর এক তৃতীয় হিকির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। । নাম টমাস হিকি। ইনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর, ট্রে´ট-পেণ্টার। হিকি বাংলাদেশে এলেন মূর্তিচিত্রের জ করবেন বলে। চিত্রকরের পেশা গ্রহণ করে তিনি কাতায় বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে ার পর থেকে আমার আরও বেশী করে শার্লতের । মনে হতে লাগল। একদা যখন আমি ও টমাস ক লিসবনের এক হোটেলে একসঙ্গে থাকতাম, তখন দিন যে শার্লতের কয়েকটি পোর্ট্রে´ট আঁকা সম্বন্ধে তাঁর আমার আলাপ হয়েছে তার ঠিক নেই। টমাস ক কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত পল্লীতে খুব বড় টি বাড়ি ভাড়া নিলেন। সেখানে ঠিকঠাক হয়ে বসে ন শার্লতের একটি পোর্ট্রে´ট আঁকবেন স্থির করলেন। াকার পোর্ট্রে´ট। তাঁর আঁকা শেষ হলে আমাকে শ্য ছবিটি পুরো দু'হাজার সিক্কা টাকা দিয়ে কিনে ত হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শার্লতের চেহারার সঙ্গে অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও, পোর্ট্রে´টটি আমার খুব ভাল লাগে নি।

শার্লতের মৃত্যুর পর থেকে স্বভাবতঃই আমার জীবনের ধারা খানিকটা বদলে গেল। স্রোতের মুখে কিছুটা গা ভাসিয়ে দিলাম। মদ খেয়ে বেশ গরম না হয়ে বিছানায় শুতে পারতাম না। ঘুম আসত না চোখে। মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম, এবং চেষ্টা করতাম এইভাবে শার্লতের স্মৃতি ভুলে থাকতে। ক্রমে ক্রমে মদ্যপান আমার রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। কলকাতায় তখন তরুণ ইংরেজ কর্মচারীরা কতকটা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে মদ্যপান করতেন। তাঁরা আমার সান্ত্বনার উৎস সন্ধানে সবচেয়ে উৎসাহী সুরাসঙ্গী হয়ে উঠলেন। সুতরাং সুরাপানের অভ্যাস হতে খুব বেশী দেরি হল না। টাকা জলের মতন রোজগার করতে লাগলাম বটে, কিন্তু দেনাপত্তর শুধে তাতেও আমার কুলোত না। ঋণের সুদ মিটিয়ে আমার খরচটা চলে যেত বলে টাকা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতাম না। অর্থাৎ টাকার কথা চিন্তা করে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন কখনও বোধ করি নি। গড়ে প্রতি মাসে আমার রোজগার ছিল প্রায় তিন হাজার সিক্কা টাকা। খরচও ছিল তাই। শহরের মধ্যে তখন আমারই চালচলন ও খানাপিনা ছিল সবচেয়ে শৌখিন। সবচেয়ে দামী ফরাসী মদ ও পুরনো মদিরা আমারই খানাটেবিলে নিয়মিত সাজানো থাকত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার কাজের ডেস্কে বসা পর্যন্ত সময়টুকু আমার কাছে খুবই অসহ্য বলে মনে হত। একা একা বসে যখন ব্রেকফাস্ট খেতে হত তখন শার্লতের কথা মনে হত আরও বেশী। চারিদিকে ঘরকন্নার সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করতাম। সমস্ত বাড়িটাতেই যেন তাঁর হাত-পায়ের ছাপ লেগে রয়েছে মনে হত। শার্লতের স্মৃতির এই দুঃসহ বোঝা নিয়ে এ বাড়িতে থাকা যে আর সম্ভব নয়, তা বুঝতে পারলাম। অন্ততঃ বারো মাস থাকার কড়ার করে

বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই ছেড়ে যেতে হবে বলে তাঁকে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলাম। তিনিও তাতে আপত্তি করলেন না। আমি এসপ্লানেডের কাছে গঙ্গার ধারে সুন্দর একটি খোলামেলা বাড়ি ভাড়া করলাম। আরামে বাস করার মতন এত সুন্দর অঞ্চল কলকাতাতে আর নেই। নতুন বাড়িতে গিয়ে খুব দ্রুত আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হল।

ভোজসভা

এই সময় ইউরোপ থেকে আমদানি খাদ্যের ও পানীয়ের বেশ অভাব হয়েছিল কলকাতায়। অবশ্য তার চাহিদাও বেড়েছিল খুব, এবং সেই অনুপাতে জিনিসের আমদানি হচ্ছিল না। তাই ইউরোপীয় জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছিল খুব। হ্যাম ও চীজ পাঁচ সিক্কা টাকা করে পাউণ্ড বিক্রি হত। ক্ল্যারেট পাওয়াই যেত না, যা পাওয়া যেত তা ৬৫৲ টাকা করে ডজন বিক্রি হত। আমাদের অবশ্য তার বিশেষ অভাব ছিল না। ডেনমার্ক থেকে আমাদের এক বন্ধু জাহাজে করে প্রচুর ক্ল্যারেট নিয়ে এসেছিল। তাঁর কাছ থেকে আমি পুরো দু চেষ্ট কিনে মজুত করে রেখেছিলাম।

এপ্রিল মাসে আমার বন্ধু জেম্‌স গ্র্যাণ্ট বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হলেন। যেদিন তিনি এলেন সেইদিন রাত্রেই তাঁকে একটি ক্লাবের তরফ থেকে বিরাট একটি ভোজ দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। আমিও সেই ক্লাবের একজন সভ্য ছিলাম। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে কোন কারণে আমার এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যে কলকাতায় আসার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে আমি তেমন উৎসাহবোধ করছিলাম না। ক্লাবের ভোজসভায় গিয়ে ভেবেছিলাম কোনরকমে পাশ কাটিয়ে চলে যাব। কিন্তু তা হল না। ভোজ আরম্ভ হবার ঠিক আগেই গ্র্যাণ্ট আমার কাছে এগিয়ে এসে একেবারে দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বললেন, "কি মশায়, কেমন আছেন? আমাকে কি ভুলে গেলেন না কি? না, আগেকার রাগ আপনার এখনও কমে নি। আমার উপর রাগ করা কিন্তু আপনার অন্যায়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন আমাদের দুজনেরই পরিচিত এক ব্যক্তি আমাদে পরস্পরের কাছে বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য কুৎসা রটনা করেছে সুতরাং মিথ্যা ধারণা নিয়ে আমার উপর রাগ ক থাকবেন না। আগেকার কথা ভুলে যান। আসু আবার আমরা পুরনো দিনের মত বন্ধু হয়ে যাই।"

এই কথার পর আমার পক্ষে রাগ করে থাকা সম্ভ হল না। আবার আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব আমরা ফি পেলাম। এবার আমি একদিন তাঁকে আমার বাড়ি ডিনার খেতে বললাম। সেইদিন কলকাতার সবসে সাহেবদেরও নেমন্তন্ন করলাম। নিমন্ত্রিত অতিথিদে ইংলিশ ক্ল্যারেট খাওয়াবার ইচ্ছা হল। কলকাতা বাজারে তখন তা একেবারে দুর্লভ। 'ব্যাক্সটার অ্যা জয়' নামে বড় একজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর কাছে খোঁ করতে ইংলিশ ক্ল্যারেটের সন্ধান পেলাম। শুনলা কয়েকজন বাছাই খদ্দেরের জন্য কিছু মাল তাঁরা মজু করে রাখেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁরা আমাকে একজন বাছাই খদ্দের মনে করেন। আমি তাঁদের কা থেকে তিন ডজন ক্ল্যারেট পেলাম। সাধারণতঃ এ অর্ধেকও কোন বিশিষ্ট খদ্দেরকে তাঁরা দেন না। নে ভাগ্যের জোরে আমি পেয়ে গেলাম।

ভোজের দিন সকালবেলা আমি আমার খানসামা বলে রাখলাম রাত্রে খাবার সময় অতিথিদের ইংলি ক্ল্যারেট দিতে। দুদিন আগে দোকান থেকে যে ক্ল্যা নিয়ে এসেছি, তাই দিতে হবে বলে ভাল করে বুঝি দিলাম। রাত্রে ভোজের সময় দেখলাম অতিথি ক্ল্যারেট পান করে একেবারে হৈহল্লা করে প্রশংসা করছে "এ মাল কোথায় পেলেন" বলে সকলে রীতিমত চিৎক শুরু করে দিয়েছেন। আমি তখন চুপচাপ বসে প করছিলাম। পান করার সময় গন্ধ পেয়ে আমার ম হল ডাচ-ক্ল্যারেট পান করছি। ভাবলাম, খানসা হয়তো ভুল করে ইংলিশের বদলে ডাচ-ক্ল্যারেট দিয়েছে কিন্তু কথাটা আর তখন ফাঁস করলাম না। খানসা যখন প্লেট তুলছিল তখন কাছে পেয়ে তাকে জিজ্ঞা

াম, "তুমি কোন্ ক্ল্যারেট দিয়েছিলে, ইংলিশ না ?" খানসামা উত্তর দিল, "না সাহেব, আগে ডাচ-ট দিয়েছি, এবারে খানার শেষে ইংলিশ ক্ল্যারেট ।" তার উত্তর শুনে আমি একটু বিরক্তই হলাম। াই হোক যা হবার তা হয়ে গেছে। এবারে ইংলিশ াট দিতে বললাম। কিন্তু দেওয়া মাত্রই অথিতিরা র বলে উঠলেন, "হিকি সাহেব, আপনার খানসামা কার মাল বদলে দিয়েছে।" আমি বললাম, "বদলে দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আরও দামী ও ভাল মাল, নারা পান করে আরও আরাম পাবেন। বলা মাত্রই সকলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "না না মশায়, মাল ভাল দরকার নেই আমাদের দামী মাল খেয়ে, আপনি াদের আগেকার মাল দিতে বলুন।" আমি তাঁদের য় বিশেষ বিচলিত হলাম না, কারণ আমি জানতাম াদের ইংলিশ ক্ল্যারেটই দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের ই তাঁরা তা বুঝতে পারবেন বলে তাঁদের ধৈর্য ধরতে াম। দ্বিতীয়বার তাঁদের ঐ ক্ল্যারেটই দেওয়া হল। রেও খেয়ে তাঁরা ঐ মত দিলেন। অর্থাৎ তাঁদের ডাচ ক্ল্যারেটই অনেক বেশী সুস্বাদু ও সুগন্ধি। দের কথার আর প্রতিবাদ না করে আমি বললাম, ভাল কথা, আপনাদের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কিছু ার নেই। তবে এইটুকু শুধু বলতে চাই যে আপনারা ক্ল্যারেট খেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন তা ১৮৲ টাকা ডজন দরে কিনেছি। আর যার নিন্দা করলেন তা কিনেছি ৲ টাকা করে ডজন।" কিন্তু সত্যিকারের সমঝদার কের সংখ্যা যে কত অল্প তা বুঝলাম যখন দেখলাম, শোনা মাত্রই কয়েকজন ইংলিশ ক্ল্যারেটের সপক্ষে স্বরে গুণগান করতে আরম্ভ করেছেন। কেউ কেউ ছেন যে ইংলিশ ক্ল্যারেটের একটা এমন আলাদা স্বাদ ছে যা ডাচের নেই, তবে তা ধরতে পারা খুব সহজ পার নয়। দু-চারজন আগেই তা বুঝতে পেরেছিলেন, ন্তু সকলের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন নি। মি আর তাঁদের কথার কোন জবাব দিলাম না। কে কত বড় বোক্কা তা মনে মনেই বুঝলাম।

কলকাতার থিয়েটার

১৭৮৩ সনে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর ফ্রান্সিস রাণ্ডেল নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আমি যখন বিলেতে ছিলাম, রাণ্ডেল তখন কোম্পানির অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেন হয়ে কলকাতায় আসেন। বয়স তাঁর বছর পঁচিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় তাঁর দ্বিগুণ বয়স, লম্বা-চওড়া চেহারার জন্য। মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর, চোখগুলি টানা-টানা, কণ্ঠস্বর গম্ভীর। চোখের চাউনিতে মনের ভাব চমৎকারভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিককেও মধ্যে মধ্যে হার মানিয়ে দেন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলেও তাতে এমন মিষ্টি সুর আছে যে শুনলে মোহিত হয়ে যেতে হয়। এই সব গুণের সমন্বয় দেখে মনে হত, যেন অভিনয় করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। ধীরে ধীরে তাঁরও সেই কথা মনে হল। সার্জেনের চাকরি থেকে মনটা গিয়ে পড়ল স্টেজের উপর। ভাল অভিনেতা হবার ইচ্ছা হল তাঁর। ইচ্ছাটা যে তাঁর কলকাতাতেই প্রথম জাগল তা নয়, তার আগে স্বদেশে ইংলণ্ডেও জেগেছিল। ইংলণ্ডে তিনি অনেক থিয়েটার করেছেন, এবং অভিনেতা হিসেবে অ্যামেচার-মহলে তাঁর বেশ সুনামও হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়টাকে পেশা করার ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সকলের বিশেষ আপত্তি ছিল। সেইজন্য তিনি সার্জারি পড়তে আরম্ভ করেন, এবং কোম্পানির সহকারী সার্জেনের চাকরি নিয়ে এদেশে চলে আসেন।

রাণ্ডেল যখন কলকাতায় আসেন তখন শহরে বেশ বড় একটি পাবলিক থিয়েটার সকলে চাঁদা দিয়ে চালাতেন। কিন্তু এই সময় থিয়েটারের ভদ্রলোক অভিনেতাদের মধ্যে, কার কোন্ চরিত্র অভিনয়ের যোগ্যতা আছে তাই নিয়ে ভয়ানক গণ্ডগোল বেঁধে গেল। প্রত্যেকেই চান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে, কারণ প্রত্যেকেরই ধারণা যে তিনিই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ঝগড়া এমন স্তরে পৌঁছল যে শেষে ডুয়েল পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তার ফল হল এই যে থিয়েটারের জন্য আর অভিনেতাই পাওয়া যেত না। অভিনয়ের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়

করা হয়েছিল। ব্যয়বাহুল্যের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল থিয়েটারের।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই রাণ্ডেল থিয়েটারের মালিকদের কাছে প্রস্তাব করেন যে তিনি তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারেন, যদি তাতে তাঁদের কোন আপত্তি না থাকে। যেখান থেকে যে রকম করে হোক তিনি অভিনেতা সংগ্রহ করবেন, এবং নবেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি—এই চার মাস অন্ততঃ সপ্তাহে একটা করে নতুন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। তা ছাড়া মালিকরা যদি তাঁকে প্রত্যেক বক্সের জন্য এক সোনার মোহর এবং প্রত্যেক সীটের জন্য আট সিক্কা টাকা মূল্য দর্শকদের কাছ থেকে আদায় করতে দেন, তা হলে তিনি থিয়েটারের সমস্ত ঋণও শোধ করে দেবার দায়িত্ব নিতে পারেন, এবং কখনও কোন কারণে মালিকদের কাছে আর টাকা চাইবেন না বলে কথাও দিতে পারেন। রাণ্ডেলের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পেয়ে থিয়েটারের মালিকরা একটি সভা ডেকে বিষয়টি আলোচনা করেন, এবং থিয়েটারের সমস্ত দায়িত্ব রাণ্ডেলকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আলাদা একটি চুক্তিপত্র করে রাণ্ডেলকে থিয়েটারের ভার অর্পণ করা হয়। থিয়েটার পরিচালনার ভার নিয়ে রাণ্ডেল তার কাছেই একটি সুন্দর বাড়িতে বাস করতে থাকেন।

রাণ্ডেলের সুদক্ষ পরিচালনায় দিন দিন থিয়েটারের উন্নতি হতে থাকল। থিয়েটার আগেও হত, কিন্তু রাণ্ডেলের তত্ত্বাবধানে ক্রমে তার সে রূপান্তর ঘটতে থাকল, কলকাতা শহরের অধিবাসীদের কাছে তা অভিনব ও অপ্রত্যাশিত। রাণ্ডেলের মতন পরিচালক ও অভিনেতা আগে কেউ ছিলেন না। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনি স্বভাবচরিত্র। একবার কেউ তাঁর কাছে এলে সহজে ছাড়তে পারতেন না। তাই আগে যাঁরা থিয়েটার থেকে দূরে থাকতেন, সহজে কাছে ঘেঁষতে চাইতেন না; তাঁরা অনেকেই তাঁর অধীনে থিয়েটারে যোগ দিলেন। কার কি কাজ বা অভিনয় করার যোগ্যতা আছে, তা নিয়ে আর বিবাদ হত না। রাণ্ডেলের বিচার-বুদ্ধিকেই সকলে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতেন। বাইরের অনেক ভদ্রলোক তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা ও স্টেজের নানাবিধ পরামর্শের জন্য আসতেন। রাণ্ডেলের পরিচালনায় কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ভঙ্গী ও মঞ্চশিল্প দুয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হল।

উন্নতির প্রথম লক্ষণরূপে দেখা গেল থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। যে-কোন নতুন নাটকের অভিনয় শুরু হলে থিয়েটার-হলে দর্শকদের জায়গা দেওয় সম্ভব হত না। এইভাবে থিয়েটারের আয় বেড়ে যাবা ফলে রাণ্ডেল অল্পদিনের মধ্যেই আগেকার ঋণ সব শো করে ফেললেন। মুনাফার অনেকটা অংশ তি নিজেও ভোগ করতেন। তবে সবটা নিজে গ্রাস ক না ফেলে তিনি তার খানিকটা অংশ অন্যান্য অভিনে ও স্টেজকর্মীদের ভাগ করে দিতেন। অভিনয়ের জ যাঁর যা পোশাকের দরকার হত, তাঁকে তা তিনি য পয়সাই লাগুক কিনে দিতেন। শুধু তাই নয়, অভিনয় শে হবার পর সেই রাত্রে তিনি অভিনেতাদের ভূরিভোজ করাতেন, এবং ক্ল্যারেট, শ্যাম্পেন বা বার্গাণ্ডি দি আপ্যায়ন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কেউ কেউ দেখতা এই রাজকীয় অভ্যর্থনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে রাতভোর পর্য বসে বসে সুরাপান করতেন। এই ভোজের জন্য আ দেখেছি রাণ্ডেলকে ৮০৲ সিক্কা টাকা ডজন মূল্যে শ্যাম্পে কিনতে। রাণ্ডেলের নিজেরও অনেকদিন থেকে সুরা প্রতি গভীর আসক্তি ছিল। সুরাপানের অভ্যাসও তাঁ দীর্ঘকালের। সুতরাং তরুণ অভিনেতাদের সুরাপ্রেমি করে তুলতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। অল্পদিনে মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের তরুণ উড্ডীয়মান ইংরেজদে মধ্যে একজন অদ্বিতীয় জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।

কেবল মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবেই রাণ্ডেল একজন কৃতী ব্যক্তি ছিলেন না। অভিনয়কলাতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষ ছিল। তখন কলকাতা শহরে তাঁর সমস্তরের অভি আর কেউ ছিলেন না। আমার মনে আছে একব উইলিয়ম বার্ক তাঁর সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অভিনয় দে আমাকে বলেছিলেন যে সবদিক থেকেই রাণ্ডেলে ইংলণ্ডের অন্যতম অভিনেতা গ্যারিকের সমকক্ষ বল তাঁর কোন দ্বিধা নেই। বার্কের মতন একজন বিচক্ষ ব্যক্তির মতামত নিশ্চয় উপেক্ষণীয় নয়। কেবল 'হ্যামলে অভিনয় নয়, 'কিঙলীয়ার', 'ওথেলো', 'রিচার্ড দি থা প্রভৃতি অভিনয়েও রাণ্ডেল অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তবে আমার ধারণা, 'ওথেলো'র অভিনয়ে তিনি কখন গ্যারিকের উপরে উঠতে পারেন নি।

কলকাতা শহরে থিয়েটারের সাফল্যে রাণ্ডে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ইংলণ্ড থে অভিনেতা ও অভিনেত্রী দুই-ই তিনি এদেশে নিয়ে আস জন্য উদ্‌যোগী হলেন। তখন কলকাতার রঙ্গমঞ্চে মহি অভিনেত্রী কেউ ছিলেন না। পুরুষরাই দাড়িগোঁ কামিয়ে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যে সময়ে

[৫৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

উঁচুতলা নীচুতলা

রণজিৎকুমার সেন

অনেক কষ্টে যদি বা একটা বাড়ি সংগ্রহ করা গেল, কিন্তু বাড়ির কাজকর্ম যে করে দেবে, এমন ঝি বা চাকর পাওয়া গেল না। বাবুদের মত তাদের মধ্যেও আজকাল ইউনিয়ন হয়েছে। সেই ইউনিয়ন থেকেই মাইনের রেট বেঁধে দেয়, বাসন মাজবে কি কাপড় কাচবে—তারও একটা নির্দেশ থাকে সেই সঙ্গে। তাতে যদি কেউ রাজী থাকে, তবে হয়তো ভাগ্যক্রমে কাউকে পেতেও পারে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভুবন বাঁড়ুজ্জে ভেবে দেখলেন, তেমন ভাগ্যের লোক অন্ততঃ তিনি নন। ফলে গিন্নী অগ্নিবর্ষিণী হলেন। এবার নিয়ে পঞ্চমবার অন্তঃসত্ত্বা তিনি; স্বাস্থ্য এমন নয় যে, দেখেশুনে সংসারের পাঁচ দিকের পাঁচ কাজ করবেন। স্বামীর সামনে এসে ফেটে পড়ে বললেন, ঝি চাকরের ব্যবস্থা করতে না পার তো সবশুদ্ধ উপোস করে মরো, আমি আর এ অবস্থায় নড়তে পারছি না।

বড় মেয়ে হেনার এবার স্কুল-ফাইনাল, দিনরাত মুখে বই গুঁজে বসে আছে, নইলে মায়ের এই অবস্থায় সে কিছু কাজে লাগতে পারত। রিণ্টু, টোকন আর শ্যামা অপেক্ষাকৃত ছোট। একখিলি পান সাজবারও তারা যোগ্য নয়। ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে হঠাৎ বড় বিষিয়ে উঠলেন ভুবন বাঁড়ুজ্জে। অথচ স্ত্রীর কথার জবাবে যে কিছু একটা কড়া উত্তর দেবেন, তা পারলেন না। শরীরের যা অবস্থা, তাতে কড়া কথা টিকবে না। অতএব অনেক কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে অফিসের পথ ধরলেন ভুবন বাঁড়ুজ্জে।

একটা ডিপার্টমেণ্টের তিনি ইনচার্জ। তাঁর অধীনে জনদশেক জুনিয়ার ক্লার্ক কাজ করে। তাদের মধ্যেই কি করে যেন মণ্টু ঘোষ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে নিয়েছে ভুবন বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে। তা নিয়ে বাকি নজনের কম উষ্মা নয়। বলে, তোমার কি, ব্যানার্জির সুনজরে আছ, প্রমোশন পেতে আটকাবে না, চাই কি দুদিন বাদে তোমাকে নিয়ে ঘরজামাইও রাখতে পারেন।—এসব কথার উত্তর দিতে জানে মণ্টু ঘোষ, কিন্তু নিরর্থক; পাশাপাশি বসে কাজ করে—মিছিমিছি মনোমালিন্য বাড়ানো।

কিন্তু মণ্টু ঘোষ যে ভুবন বাঁড়ুজ্জের মিথ্যেই মন জয় করেছে, এমন নয়। চিঠি ড্রাফট্ করা থেকে টাইপ করা পর্যন্ত—সব কাজে দিব্বি চটপটে ছেলেটি। নিজের চেহারা তার এমন কিছু নয়, কিন্তু কাজের চেহারাটা তার দেখবার মত। ভুবন বাঁড়ুজ্জের বাড়ির ব্যাপার শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, এ কথা দুদিন আগে কেন আমাকে বললেন না সার্? ছোট ভাই বাড়ি গেল, তাকে বলে দিলেই আমাদের সোনামুখি থেকে করিৎকর্মা কোন ঝিকে নিয়ে আসতে পারত। রান্না বলুন, ঘর-গেরস্থালীর কাজ বলুন, এক ঝিকে দিয়েই চালিয়ে নেওয়া যায়। আমাদের এস্টাব্লিশমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের নগেনবাবু তো তাই করছেন।

ভুবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, তুমি তবে তোমার ছোট ভাইকে আজই একটা চিঠি লিখে দাও। কলকাতার ঝিয়ের চাইতে মফস্বলের ঝি হলে খানিকটা বাধ্য-বাধকতাতেও থাকবে, কথাবার্তাও শুনবে। এসে বরং আমার বাড়িতেই সে ফুল-টাইম থাকবে; তাতে আমার এমন কিছু অসুবিধে হবে না।

তা আমি লিখে দিচ্ছি।—মণ্টু ঘোষ বলল, সুবিধেজনক খবর পেলে আমি বরং ইতিমধ্যে কোন শনিবার রওনা হয়ে গিয়ে নিয়েও আসতে পারব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সার্, আমি খুব শীগগিরই ব্যবস্থা করছি।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। ছোট ভাইকে চিঠি দিয়ে সপ্তাহখানেক বাদে দিনদুয়েকের ছুটি নিয়ে সোনামুখী

গিয়ে ঝি নিয়ে তবে সে ফিরল। বয়স বেশী নয়, বড়জোর পঁচিশ ছাব্বিশ; নাম শুভঙ্করী, টকটকে গায়ের রঙ, সুন্দর মুখশ্রী, তার উপর একটা গ্রাম্য ছাপ। প্রথম যৌবনেই বছর আষ্টেক হল বিধবা হয়ে এ-বাড়িতে সে-বাড়িতে ঢেঁকি চালানো আর ধান ভানার কাজ করত। একটি ছেলে ছিল কোলে, সেও বছর চারেক হল মারা গেছে। সেই থেকে সংসারে একেবারে একা শুভঙ্করী। মণ্টু ঘোষ বলল, ঘরে ছেলেপুলে পেলে ও আর কোনদিকে তাকাবে না দেখবেন। খাওয়া-পরা ছাড়া মাসকাবারে গোটাদশেক টাকা ওর হাতে ফেলে দেবেন স্যর্, তাতেই ও খুশী থাকবে।

বাধ্য হয়ে সেই ব্যবস্থাতেই রাজী হতে হল ভুবন বাঁড়ুজ্জেকে। ইতিমধ্যে চাকরও একটি সংগ্রহ হয়েছিল। শুভঙ্করীর মতই বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হবে। পাকিস্তান থেকে এসে এতদিন এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছে। নাম ফটিক। মাইনে একডাকে বিশ টাকা হেঁকেছিল, অনেক বলে-কয়ে ঠিকে হিসেবে পনেরোয় রাজী করানো গেছে। সকালের দিকে শুধু এ বাড়িতে থাকবে, বিকেলে কাজকর্ম সেরে ট্যাংরায় চলে যাবে। সেখানে তার মা আর ছোট ভাই থাকে, তারাও কাজ করেই খায়।

অতএব কাজেকর্মে মোটামুটি অসুবিধে হল না ভুবন বাঁড়ুজ্জের। সংসারের দিক দিয়েও অনেকখানি দায়মুক্ত হলেন তিনি। শুভঙ্করীর হাতে খেতে কারুর আপত্তি উঠল না। কাজেকর্মে দিব্বি পরিষ্কার, রান্নাবান্নাও মোটামুটি মন্দ জানে না, একটা আলাদাই স্বাদ আছে তার রান্নায়। তা ছাড়া দুদিনেই সে ভুবন-গিন্নী রত্নেশ্বরীকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিল যে, দেখে হেনা রিণ্টু টোকন আর শ্যামা তো অবাক! হেনা যদিও এতদিন মাঝে-মধ্যে মায়ের টুকটাক ফরমাশ খাটত, এবার থেকে তারও আর ডাক পড়ল না। উঠে যদি একা কখনও সিঁড়িতে দু-পা বাড়াতে গেছেন রত্নেশ্বরী, অমনি উনুনে-উথলানো ভাতের ডেকচি ফেলে রেখে শাসনের কণ্ঠে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে গৃহকর্ত্রীকে আগলে ধরেছে শুভঙ্করী। বলেছে, চার-চারটে ছেলেমেয়ের মা হয়ে এখনও আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান হল না! এভাবে নামতে গিয়ে কখনও যদি পড়ে যান, তবে কী অনর্থটাই বাধবে, বলুন তো! দেশে থাকতে গদাই যখন আমার পেটে এল, আমাদের পাড়ার পিসী তখন আমাকে হাঁটা-চলা সম্পর্কে খুব সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু আমি কি শুনি সে কথা! যেমন শুনি নি, তেমনি পড়লাম একদিন পুকুরঘাটে আছাড় খেয়ে। দুদিন বাদে তবে আমার জ্ঞান ফিরল। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ সন্দেহ নেই, তবু হাঁটতে-চলতে একটু সমঝে চলবেন মা।

শুনে মুখ টিপে টিপে হেসেছেন রত্নেশ্বরী। বলেছেন, আচ্ছা আচ্ছা, খুব হয়েছে, আর তোকে ঠান্‌দিদিপনা করতে হবে না, তার চাইতে বরং নিজের কাজে যা তুই। এ সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠা আমার অভ্যাস আছে, তোকে ভয় পেতে হবে না।

গৃহকর্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে এবারে আবার হেঁসেলের দিকেই পা বাড়াল শুভঙ্করী। যেতে যেতে বলল, তবু সাবধানের মার নেই মা। আমি হেঁসেলেই আছি, দরকার মত আমাকে ডাকবেন।

রত্নেশ্বরীর ভালই লাগছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়িতে এরকম একজন আন্তরিক মেয়েছেলে না থাকলে কি চলে! স্বামীর কাছে এসে একসময় তাই ফিসফিস করে বললেন, শুভঙ্করীকে পাওয়া গেছে মন্দ নয়, তবে একটু বেশী বকে, এই যা।

ভুবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, ও কথাটা আগে থেকে মণ্টু ঘোষকে বলে দেওয়া হয় নি, নইলে ও ঠিক দেখেশুনে কোনও বোবাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত।

ভেবেছিলেন দুদণ্ড স্বামীর কাছে বসবেন রত্নেশ্বরী, কিন্তু কথার ধরন দেখে আর বসতে প্রবৃত্তি হল না। আবার ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুতে শুতে বললেন, তোমাকে জব্দ করবার জন্যে এ সংসারে বোবা মেয়েমানুষেরই দরকার ছিল। তা আমিও পারলাম না, শুভঙ্করীও নয়।

কিন্তু শুভঙ্করী মুখর হয়েই বোধ করি এবারে

নকখানি জব্দ করতে চাইল ভুবন বাঁড়ুজ্জেকে। মাস-বারে ফটিকের হাতে তার মাইনে গুনে দিতে দেখে টা তার খারাপ হয়ে গেল। এ বাড়িতে সারাদিন টে খেটেও সে মাত্র হাতে গুনে দশ টাকা পায়, আর টক বাইরে থেকে এসে কোনরকমে কুটোগাছটি নেড়ে-ড়ে পনেরো টাকা নিয়ে যায়। ফটিকের তুলনায় তার ন্ততঃ তিনগুণ মাইনে হওয়া উচিত।

দিনদুয়েক আর কাজে বিশেষ মন লাগাল না সে। খেশুনে একসময় রত্নেশ্বরী বললেন, তোমার কি শরীর রাপ হল নাকি শুভঙ্করী? কাজে তেমন মন নেই, খানিও ভার-ভার, ব্যাপার কি? এদিকে বাবুর যে ফিসে বেরোতে দেরি হয়ে যায়!

শুভঙ্করী আর চেপে রাখতে পারল না নিজেকে, লল, ফটিককে তো আপনারা অনেক বেশী মাইনে দেন, লেই পারে সে এসে বাবুকে তাড়াতাড়ি অফিসে বিদেয় রে! ওর মত কিছু না করতে হলে আমিও পারি ন্য কোথাও গিয়ে থাকতে।

শুনে রত্নেশ্বরী অবাক। এ বাড়িতে একটা মাস কেবল টেছে, তাতেই যদি এতটা, ভবিষ্যৎ যে তবে অন্ধকার। খনও তাঁর প্রসব হতে অন্ততঃ মাসখানেক বাকি। সে য়ে এমনি করে যদি গা ঢিলে দিয়ে বসে শুভঙ্করী, তবে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হওয়া ছাড়া তাঁর আর দ্বিতীয় থ থাকবে না! অথচ হাসপাতালের আবহাওয়াটা কানকালেই তাঁর পছন্দ নয়। হেনা থেকে শ্যামা পর্যন্ত কলেই বাড়িতে হয়েছে। বাঁধা ধাত্রী আছে টেঁপীর মা, ভিজ্ঞতা প্রচুর, সে-ই এসে এসে দেখেশুনে সব করে-কম্মে ছে। এবারও তাকেই খবর দেওয়া হয়েছে। তার ঙ্গে শুভঙ্করী থাকলে কোনদিকে আটকাবে না। কিন্তু ভঙ্করী যদি এখন থেকেই এমনি করে মাইনের ধুয়ো লতে শুরু করে, তবে যে বিপদ! স্বামীকে একসময় ছে ডেকে তাই রত্নেশ্বরী বললেন, যা ভেবেছিলাম, খন তো দেখছি তা নয়! শুভঙ্করীকে পার তো বুঝিয়ে ছু বল, নইলে সময়কালে বিপদে পড়তে হবে।

শুনে বিরক্তিতে ভুবন বাঁড়ুজ্জের দাঁতগুলো একবার কড়মড় করে উঠল। বললেন, মণ্টুর কথামতই তো ওকে দশ টাকা করে দিচ্ছি, তাতে যদি ওর না পোষায়, মণ্টুকে বলি, যা হয় করুক।

অফিসে গিয়েই নিজের সীটে তিনি ডেকে পাঠালেন মণ্টু ঘোষকে।

সব শুনে মণ্টু ঘোষ বলল, ওইখানেই একটা মস্তবড় ভুল করে ফেলেছেন সার্। একই বাড়িতে ঝি-চাকর দুজনের যদি দু-রকমের মাইনে হয়, তবে কাউকে কি কারুর সামনে মাইনে গুনে দেওয়া উচিত? ওতে আমরা যারা অফিস-স্টাফ—তাদের ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স না এলেও সাব-স্টাফ আর মিনিয়াল ক্লাসের মধ্যে আসে। আমরা তো নো-হোয়্যার, আজকাল যে ওদেরই দিন সার্! আমি অবশ্য একসময় গিয়ে শুভঙ্করীকে যা বলবার বলে আসবখন, কিন্তু মাইনে দেবার ব্যাপারে ভবিষ্যতে ওরকমটা আর না হওয়াই উচিত হবে।

ডিপার্টমেণ্টাল ইন্‌চার্জ হলেও ভুবন বাঁড়ুজ্জে আজ এই প্রথম মনে মনে উপলব্ধি করলেন যে, মণ্টু ঘোষের সাংসারিক অভিজ্ঞতা তাঁর চাইতে অনেক বেশী। সংসার-ক্ষেত্রে সে ইন্‌চার্জেরও ইনচার্জ হবার যোগ্য। বললেন, তুমি তবে একবার বাড়ি যেয়ো, এ ব্যাপারে আমি কিছু ইণ্টারফিয়ার করতে চাই না।

ইতিমধ্যে কখন যে ফটিকের সঙ্গে শুভঙ্করীর এক পসলা হয়ে গেছে, ভুবন বাঁড়ুজ্জে তা জানতে পারেন নি।

হেঁসেলের ব্যাপার নিয়ে দুজনকে অনেক সময় একসঙ্গে কাজ করতে হয়। সেই কাজ নিয়েই কখন একসময় তার পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় ফোড়ন কেটেছিল ফটিক, অমনি যা তা বলে ফটিককে অনেকক্ষণ ধরে গালিগালাজ করে তবে ছাড়ল শুভঙ্করী। তাই নিয়ে দুজনে মিলে বাড়িটাকে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় করে রাখল। রত্নেশ্বরী যত থামাতে চেষ্টা করেন, ফটিক তত রেগে যায়।

রত্নেশ্বরী বললেন, এমনি যদি তোরা কেবল চেঁচাবি, তবে দুজনকেই আমি বাড়ি থেকে বিদায় করে দেব।

এবারে বোধ করি রোগে খানিকটা ওষুধ পড়ল। আর বড় একটা সাড়া পাওয়া গেল না কারুর।

সন্ধ্যার দিকে মণ্টু ঘোষ এসে বলল, কি ব্যাপার, তোমার নাকি কাজে মন নেই শুভঙ্করী? দেশে নিজেকে নিয়ে চলতে পারছিলে না বলে এখানে নিয়ে এসে বাবুর বাড়িতে ভাল কাজ দিলাম তোমাকে। অথচ শুনি, মাইনের টাকা হাতে পেয়ে তোমার মন ওঠে না, সব সময় কেবল ফটিককে ঠেলা মেরে কথা বল—এসব তো ভাল নয়। কলকাতায় একটা মানুষকে খেতে-পরতে কম-পক্ষে ষাট টাকা লাগে, সেখানে তুমি বহাল তবিয়তে থেকে মাসকাবারে উপরি দশ টাকা হাতে পাও। সেটা লাভ না লোকসান, তা কি একবারও ভেবে দেখেছ? ফটিক এ বাড়িতে থাকে না, তা ছাড়া একবেলা খায় একবেলা খায় না, অথচ দুবেলাই কাজ করে দিয়ে যায়। তাতে সে যদি পনেরো টাকাই পেয়ে থাকে, তাতে এমন কি হাতীঘোড়া হল, তা তো বুঝি না! নিজের বাড়ি ভেবে থাকলে ভবিষ্যতে বাবুই কি তোমার দিকে তাকাবেন না? সংসারে একা মেয়েমানুষ তুমি, খাচ্ছো-দাচ্ছো বেশ তো আছ, এর চাইতে কি ভেবেছ অন্য কোথাও গিয়ে তুমি বেশী সুখে থাকবে? নিজের ভেবে থাক—দেখবে, কোনও অসুবিধে হবে না।

শুভঙ্করীর মুখে কথা নেই। তার নিজের গ্রামের লোক মণ্টুবাবু, অভাবে অসুবিধেয় না পড়লে তাঁর সঙ্গেই বা সে সোনামুখী ছেড়ে আসবে কেন! এখানে কেবল পেট চলবার মত আর মাথা গোঁজবার মত তো নয়, তার চাইতে অনেক বেশী ভাল আছে সে। মণ্টু ঘোষের কথা শুনে নিজেকে নিজে যেন নতুন করে খানিকটা ভাববার অবকাশ পেল শুভঙ্করী। কিন্তু একটা ভাবনা সে মাথা থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারল না। স্বামীকে হারিয়ে ছেলেকে হারিয়ে আজ তার নিজের কাছে নিজেকে যেন আরও বেশী নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। অতীতের জীবনটা নিজের কাছে তার যতবেশী ঘোলাটে হয়ে আসছে, ততই ইচ্ছে করছে আবার নতুন করে সংসার পাততে। কিন্তু আজ আর আদৌ কি সে সম্ভাবনা আছে?

ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল শুভঙ্করী। ফটিকও আর মিছিমিছি গায়ে পড়ে তাকে ঘাঁটাতে যায় নি। বরং শুভঙ্করীর রূপে সে মনে মনে অনেকখানি মজেছিল। একদিন হেঁসেলে বসেই কি একটা কথার সূত্রে সে বলল, তুমি তো একটু হলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠো, নইলে কলকাতার কত জিনিস তোমাকে দেখিয়ে আনতে পারি। গাঁয়ে থাকতে শুধু ডোবা আর পুকুরই দেখেছ; এখানে মনুমেণ্ট, চিড়িয়াখানা, গঙ্গার জাহাজঘাট, কত কি! যাবে নাকি দেখতে?

প্রথমটা জবাব দিতে যেন কেমন বাধল শুভঙ্করীর, তারপর বলল, গেলেই তো আর যাওয়া যায় না, বাড়ি ছেড়ে বেরোতে দিলে তো বেরোব?

ফটিক বলল, তবেই বোঝ। শুধু এই জন্যে আমি কোন বাড়িতে বাঁধাবাঁধি থাকি না। ও বড় ঝামেলা। তা ছাড়া আগে থেকে যদি মাইনেটা মোটা করে না নেওয়া যায়, তবে আর গরজ করে বাবুরা কখনও বেতন বাড়াতে চান না। তুমি তো পারলেই আমাকে কেবল খোঁটা দাও; তাই নিয়ে যদি বসে থাকি, তবে আর রোজগার হয় না।

কথা শুনে ফটিকের ওপর কেমন একটা প্রসন্ন খুশীতে মনটা এবারে ভরে উঠল শুভঙ্করীর। এক বর্ণও মিথ্যে বলে নি ফটিক। ওর মত হতে পারলে সেও এতদিনে দু পয়সা বেশী রোজগার করতে পারত। মিছিমিছিই সেদিন সে গালমন্দ করেছে ফটিককে। পাশাপাশি বসে কাজ করলে কখনও কেউ যে ঠাট্টা-তামাশাটুকুও করতে পারে, এটা সে ভুলে ছিল। মাথার কি কিছু ঠিক আছে শুভঙ্করীর? একে একে স্বামী গেল, ছেলে গেল, সংসার গেল। তারপরেও যে নিজেকে নিয়ে এমনি করে চলতে পারছে, এই তো যথেষ্ট। ফটিকের মাইনের ব্যাপার নিয়ে কথা তুলে নিজেকে সে এ বাড়িতে এতটা খেলো না করলেও পারত। তাই নিয়ে মণ্টুবাবু বাড়ি বয়ে এসে কথা বলে গেলেন। ছি ছি ছি, কী লজ্জার কথা! যদি ঠাট্টা-তামাশাটুকুও সে না বুঝবে, তবে আর বাবুদের বাড়িতে তার ঝি আর রাঁধুনিগিরী করতে আসা কেন? কলকাতার মত জায়গায় লোকে ইচ্ছে করলেই কি আর

তে পারে! অথচ সে এসেও এতবড় শহরে বাস
ার মর্ম বুঝতে পারে নি, এ কী কম লজ্জার কথা?
কর যদি মন বলেই কিছু না থাকবে, তবে গায়ে
তাকে নিয়ে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে চাইবে
।? সত্যিই বড় ভাল ফটিক, কারুর কোন অপরাধ
চেপে রাখে না। তার নিজের স্বামী বসন্তের
াও এমনি ছিল। যদি কখনও তার ওপর সে কটূক্তি
ছে, উলটে প্রতিশোধ নেয় নি, বরং হেসে আদর
নিয়েছে। সংসারে সব পুরুষই বোধ হয় একরকম।
বতে গিয়ে মনটা হঠাৎ যেন কেমনই হয়ে গেল
ঙ্করীর। কখন যে নিজের কাজকর্ম শেষ করে ফটিক
র সামনে থেকে উঠে ট্যাংরায় রওনা হয়ে গেছে, সে
রও পায় নি।

নিজের ঘরে শুয়ে তখন প্রসব ব্যথায় অস্থির হয়ে
ড়ছেন রত্নেশ্বরী। পাশের ঘরে রিণ্টু, টোকন আর শ্যামা
য়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নইলে এতক্ষণে এসে মাকে
য়ে ভিড় করে বসত। হেনা ভাল করে সবকিছু না
লেও অনেকটাই বোঝে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে
শের ঘরে বসে সে বই মুখস্ত করছিল। ভুবন বাঁড়ুজ্জে
শুভঙ্করীকে ডাকছেন, তা শুভঙ্করীর কানে গিয়ে না
ছিলেও হেনার কানে যথাসময়েই পৌঁচেছিল।
রেখে অমনি সে উঠে পড়ে হেঁসেলের সামনে এসে
ৎকার করে বলল, বাবা যে কখন থেকে তোমাকে
কছেন, তা কি শুনতে পাও নি শুভঙ্করী?

সত্যিই সে শুনতে পায় নি। নিজের মধ্যে এতক্ষণ
ন কেমন যেন মগ্ন হয়ে ছিল। এবারে ধড়মড় করে উঠে
ড়াল শুভঙ্করী, তারপর হেনার মুখের উপর দিয়ে এক
লক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ত্রস্তে সে বাবুর সামনে গিয়ে
ড়াতেই সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে
গল।

ভুবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, তোমার মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে,
মি একবারটি পাশে এসে বস, আমি টেঁপীর মাকে খবর
য়ে এক্ষুনি ফিরে আসছি।

হেনা কি করবে ইতস্ততঃ করছিল।

ভুবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, তুই যা, রিণ্টু, টোকন আর
শ্যামাকে নিয়ে থাক্ গিয়ে।

বাধ্য হয়ে এবারে তাই করতে হল হেনাকে। রিণ্টুর
ভূমিষ্ঠ হবার কথা অবশ্য তার মনে নেই, কিন্তু টোকন আর
শ্যামার কথা দিব্যি মনে আছে। তখনও মায়ের কাছ
দিয়ে ঘেঁষতে দেন নি তাকে বাবা। বলেছেন, যা, ঘুমো
গিয়ে।—যেন বললেই ঘুম আসে! তখনও অবশ্য ভাল
করে সবকিছু বুঝত না হেনা, আজ অনেকখানিই বোঝে।

শুভঙ্করী আর অপেক্ষা না করে তক্ষণে এসে
রত্নেশ্বরীর শিয়রে বসে পড়েছে। অনেকক্ষণ থেকেই
ব্যথায় ছটফট করছিলেন রত্নেশ্বরী। শুভঙ্করী বলল,
এটুকুতেই আপনি অস্থির হলেন মা, আমার গদাই যখন
পেটে এসেছিল তখন পুরো দুদিন ব্যথায় আমি অজ্ঞান
হয়ে ছিলাম। আপনার এ ব্যথা তো কিছুই নয়।
টেঁপীর মা এসে গেলে দেখবেন, কোল-জোড়া টুক্‌টুকে কী
সুন্দর ছেলে পেয়েছেন!

ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে রত্নেশ্বরী ছোট্ট করে
একবার বললেন, যদি ছেলে হয় তবে তোকে আমি এ
মাসেই দু টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। কেমন, খুশী হবি
তো? কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না শুভঙ্করী।
শুভঙ্করী বলল, লোকে বলে—এই ব্যথা দিয়েই মায়ের
মন তৈরি করে দিয়েছেন ঈশ্বর। আর বেশীক্ষণ আপনাকে
কষ্ট করতে হবে না মা, একটু সহ্য করতে চেষ্টা করুন। এর
পর দেখবেন—দিব্বি ঘুমোতে পেরেছেন।

একসময় টেঁপীর মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন ভুবন
বাঁড়ুজ্জে। বারান্দায় একটা মাদুর পেতে সারারাত তিনি
কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও রত্নেশ্বরীর সন্তান
ভূমিষ্ঠ হল না। শেষ রাত্রির দিকে সারা আকাশে
মেঘ জমে বৃষ্টি এল। ভিজে বাতাসে শরীরটা ঠাণ্ডা
হলেও মাথাটা গরম হয়েই রইল। রত্নেশ্বরীর যদি এমন-
তেমন কিছু হয়, তবে এই দুর্যোগে বেরিয়ে কোনও
ডাক্তারকে যে খবর দিয়ে আনতেও পারবেন না তিনি!
ভাবতে ভাবতে কখন যে রাতটা কেটে গেল, বুঝতে
পারলেন না ভুবন বাঁড়ুজ্জে।

মেঘও জমেছে আকাশে। এত মেঘ যে কোথায় ছিল, কে জানে! শেষ রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে সে বৃষ্টি আর থামল না। ওদিকে একা একা হেনা রিণ্টু, টোকন আর শ্যামা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাদের ডেকে ভুবন বাঁড়ুজ্জে বলে দিলেন, তোরা যেন এদিকে কেউ আসিস নে। ঘরে মুড়ি আর তাল-পাটালি আছে, খেয়ে নিয়ে ঘরে বসে পড়াশুনো কর্।

কিন্তু বইয়ের পাতায় কারুর কি আর মন বসে! একে বর্ষার রিমঝিম, তার ওপর মায়ের অবস্থাটাও এদিকে খারাপ। চোখ-মুখ ধুয়ে মুড়ি আর পাটালি চিবোতে চিবোতে আবার গিয়ে তারা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বেলা একটু একটু করে বাড়ছিল। এদিকে রান্নাবান্নার যোগাড় না করলে নয়। ভুবন বাঁড়ুজ্জের আজ অবশ্য অফিসে বেরুবার তাড়া নেই। আজকের দিনটা ঘর ছেড়ে আর বেরুবেন না তিনি; বেরুবার উপায়ও নেই তাঁর। কিন্তু তা হলেও সময়মত রান্না না হলে রিণ্টু টোকন ওরা ক্ষিদেয় ছটফট করতে শুরু করে দেবে। অথচ শুভঙ্করীকে যে তিনি রান্নার ব্যবস্থা করতে বলবেন, তারই বা সুযোগ কোথায়?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন ভাবনার সূত্রটা কেটে গেল। ঘরের ভিতর থেকে সহসা নবজাতকের কান্না ভেসে এল কানে। দরজাটা ভেজানো ছিল, নইলে একবার উঁকি দিয়ে দেখতেন ভুবন বাঁড়ুজ্জে। এতক্ষণে সত্যিই তবে ব্যথা থেকে মুক্তি পেলেন রত্নেশ্বরী। কিন্তু কি হল? ছেলে, না মেয়ে?

ইতিমধ্যে বারান্দায় ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে শুভঙ্করী বলল, আমাদের এক নতুন দাদামণি এল বাবু। আমি আগেই মাকে বলেছিলাম কার্তিকের মত খোকা আসছে—হয়েছেও তেমনি অবিকল কার্তিকের মত। এ মাস থেকে আমার দু টাকা মাইনে বেড়ে গেল। মা কথা দিয়েছিলেন, সে কথার আর নড়চড় হবার জো নেই।

শুনে মুখে একটাও কথা ফুটল না ভুবন বাঁড়ুজ্জের। রুদ্ধদ্বার ঘরের অভ্যন্তর থেকে নবজাতকের কান্নার শব্দ ভেসে এসে বরং মনটাকে তাঁর উতলা করে তুলছিল।

ততক্ষণে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ফটিক এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াল। তার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন মুহূর্তের জন্যে একবার সম্মোহিতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল শুভঙ্করী। ভিজে সারা গা তার চুপসে গেছে, আর তাতে যেন আজ আরও বেশী সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে। মনে হচ্ছে—তার মুখের উপরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঠিক যেন স্ফটিকের মতই উজ্জ্বল হয়ে তার নামটাকে আরও বেশী সার্থক করে তুলেছে। একটু থেমে ফটিককে উদ্দেশ করেই শুভঙ্করী বলল, শুনেছ, আমাদের হেনা দিদিমণির এই একটু আগেই একটা ভাই হয়েছে? তুমি তো বাড়িতে থাক না, তা জানবে কি! তুমি বরং উনুনটা ধরিয়ে দাও, আমি ততক্ষণে চান করে পরিষ্কার হয়ে নিয়ে রান্নার যোগাড় দেখছি।—বলে এক মিনিটও আর অপেক্ষা না করে অন্দরের কোথায় একদিকে গিয়ে আবার আশ্রয় নিল শুভঙ্করী।

এমনি করেই সারাটা দিন চলে গেল, সন্ধ্যাও কেটে গেল। কিন্তু বৃষ্টির তোড় একটুও কমল না। এতদিনে সত্যিই তবে বুঝি মৌসুমী শুরু হল। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকাতে গিয়ে মনটা স্বভাবতঃই তাই উন্মনা হয়ে ওঠে। সত্যিই সেই সকাল থেকে মনটা যেন ত কেমনই হয়ে গেছে শুভঙ্করীর। স্যাঁতসেঁতে মাটির মত মনটাও বৃষ্টির ঝাপটায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। সেই সকাল থেকে কিছুই আর ভাল লাগছে না। এ বাড়িতে আজ যেমন নতুন শিশু এল, তার জীবনেও একদিন তেমনি গদাই এসেছিল। মাতৃত্ব উপচে পড়েছিল একদিন গদাইকে কোলে পেয়ে। কিন্তু বেঁচে রইল না, তার সারা বুকখানিকে খালি করে দিয়ে গদাই একদিন চোখ বুজে চলে গেল। তাকে কোলে পেয়ে স্বামীর অভাব ভুলে গিয়েছিল শুভঙ্করী। আজ তার কেউ নেই, না স্বামী—না সন্তান। বুকখানি এক একসময় বড় বেশী খাঁ-খাঁ করে ওঠে। মনে হয়—আর বুঝি নিজেকে নিয়ে একটা মুহূর্তও সে চলতে পারবে না। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। এত বড় কলকাতা শহরে এসেও নিজেকে প্রতিমুহূর্তের জন্য একা ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। সেই নিঃসঙ্গ
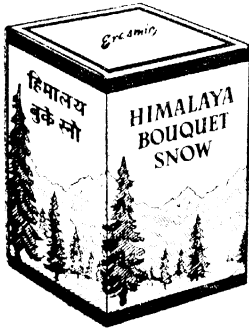
মনকে খানিকটা বহির্মুখী করতে চেয়েছিল ফটিক, কিছু বা বৈচিত্র্য এনে দিতে চেয়েছিল তার এই একটানা একাকিত্বে, কিন্তু তাতেই বা মন খুলে সাড়া দিতে পারল কোথায় শুভঙ্করী? এ বাড়ির উঁচু মন আর উঁচুতলার ঐতিহ্যে গিয়ে বুঝি তবে ঘা লাগত! তার মত নীচুতলার জীবনের জন্যে বুঝি দিন রাত্রির একমাত্র সঙ্গী চোখের জল। সে জলও যে ঝরে ঝরে আজ পাথর হয়ে উঠেছে। আর কান্না নয়—কান্না দিয়ে জীবনকে কখনও ফিরে পাওয়া যায় না, কান্না দিয়ে যৌবনকে কখনও মূল্য দেওয়া যায় না। সে নতুন করে বাঁচতে চায়—যেমন করে এ বাড়িতে গিন্নীমা তাঁর স্বামীকে নিয়ে, পুত্র-কন্যাকে নিয়ে সগৌরবে বেঁচে আছেন। তেমনি করে গৌরবের সঙ্গে বাঁচতে চায় শুভঙ্করী।

ভাবতে গিয়ে হেঁসেলের কাজ এতক্ষণ অগোছালো হয়ে পড়ে ছিল, হঠাৎ হেনার সাড়া পেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেল শুভঙ্করী। তাকিয়ে দেখল বৃষ্টিটা আরও জোরে নেমেছে। কেঁদে কেঁদে শুভঙ্করীর চোখের জল সেই কবেই শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশের জল আর জমাট বাঁধল না। সে বুঝি এমনি করেই ঝরে ঝরে তার মত অভাগিনীদের ভাঙা বুক আরও বেশী করে ভেঙে দিয়ে যায়!

খাওয়াদাওয়া সেরে হেঁসেলের কাজকর্ম গুছিয়ে রাখতে রাখতে শুভঙ্করীর অনেকটা দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে বাড়ির অন্যান্য সবাই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। রাতও দেখতে দেখতে কম হল না। কিন্তু বড় কঠিন ভাবে আটকে পড়েছে ফটিক। সকালে একবার ভিজতে ভিজতে এসেছে, আবার যদি এবেলা ভিজতে ভিজতে ট্যাংরায় যেতে হয়, তবে এরপর জ্বরে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। তবু কোনদিকে পথ না দেখে বলল, বেরিয়ে পড়ি, কি বল শুভঙ্করী? তোমার মত বাবুর বাড়িতে থাকার আরাম তো আর আমার নয়, গতর খাটিয়ে খেতে হলে সময় সময় এই রকম বিপদে পড়তেই হয়। বেরিয়ে পড়ি।

শুনে হা-হা করে উঠল শুভঙ্করী। বলল, এমন দুর্যোগে একটা কাকপক্ষীও যে বাইরে নেই, তোমার কি মাথা খারাপ নাকি যে, তুমি বেরোতে চাও?

ফটিক বলল, বাবুরা তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছে আমি আর কতক্ষণ ঠায় এমনি করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিজব?

মুখ টিপে হেসে শুভঙ্করী বলল, তার জন্যে এতই বা কি চিন্তার? এ বাড়িতে সব দরজা বন্ধ হলেও একটা দরজা তো অন্ততঃ এখনো খোলা আছে।

একটু কি ভেবে নিয়ে ফটিক বলল, বল কি! শেষ পর্যন্ত এই বর্ষার রাত্তিরে একটা জানোয়ারকে নিয়ে তোমার ঘরে ঢুকোতে চাও?

শুভঙ্করীই একদিন তাকে জানোয়ার বলেছিল, সেটা এতদিনে এমন একটা বর্ষাক্রান্ত রাত্রে তাকে ফিরিয়ে দিল ফটিক! কিন্তু তা নিয়ে একটুও ভাবল না শুভঙ্করী বলল, যেখানে একটা কাকপক্ষী পর্যন্ত বাইরে নেই সেখানে এই রাত্রে কোন্ জানোয়ারটাই বা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে! এস, ঘরে এস, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে আর জলের ছাট গায়ে লাগাতে হবে না। ঘরে শুয়ে পড়।

শুনে ফটিকের মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল কিনা, বোঝা গেল না। ঈষৎ চাপা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে একঘরে রাত্তির কাটাব, বাবুরা নিন্দে করবেন না?

শুভঙ্করী বলল, হেঁসেলে যে সারাদিন কাটাও, ক তাতে তো কেউ নিন্দে করে নি! এস, রাত হয়েছে এসে শুয়ে পড়। আমি বরং বসে বসে সারারাত সলতে পাকিয়ে কাটিয়ে দেব।

ফটিকের এবারে আর এমন সাধ্য রইল না যে আপত্তি করে। একসময় সে শুভঙ্করীর ঘরের মেঝেয় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাইরের বর্ষণটা তখন বোধ করি আরও জোরে শুরু হয়েছে।

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল সংসারাশ্রমে। আমাকে একটি দুই-ঘর-বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ওয়া হল। শিক্ষাকালে আমি যে আশ্রয়ে ছিলাম তার য়ে এটি অনেক সুন্দর। মানুষের আরাম বিলাসিতা ং সৌন্দর্যবোধ পরিতৃপ্তির জন্য এদের আয়োজন সত্যিই ামাকে মুগ্ধ করল।

শহরের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরিতে আমি একটি কাজ লাম। আমার ধারণা, এর পিছনেও মনসোনার ানিকটা হাত ছিল। আমি পড়াশুনার চর্চা একটু ালবাসি এটা সে লক্ষ্য করেছিল। বাস্তবিক এই য়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সহজ নিরহঙ্কার ব্যবহার এবং হানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের কথা ভাবতে গেলে আমার চোখে ল আসে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। ঠিক সেই ময়ে আমার মনের সামনে ভেসে ওঠে তার সেই প্রসিডেণ্টের কণ্ঠলগ্না অবস্থার চিত্রটি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ কিয়ে গিয়ে জ্বালা করতে থাকে।

কাজ বলতে যা বোঝায় লাইব্রেরিতে অবশ্য আমাকে ার কিছু করতে হয় না। অবশ্য এ রাজ্যে মানুষকে াথাও কাউকেই কোন কাজ করতে হয় না। শীঃ ভ্যতা মানুষকে সমস্ত রকম কর্মকাণ্ড থেকে চির-অবসর ন করেছে। তবু দু-চারটে সুইচ খোলা বা বন্ধ করার াপার আছে বলে মানুষ তবু মনে করতে পারে সে কেবারে নিরর্থক নয়। যন্ত্র-দানব মানুষকে এটুকু কাজের দায়িত্বও যে দিয়েছে সে-ও বোধ করি নেহাত দয়া-পরবশ হয়ে।

আমি অবশ্য এই কর্মহীনতার রোমাঞ্চটুকু খুব রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতাম। যেখান থেকে আমি এসেছি সেখানে রাতদিন কাজের পিছনে ছুটে ছুটেও তার নাগাল পেতাম না। প্রতিদিনই আগের দিনের মুলতুবী কাজের সঙ্গে সেদিনের কাজের তালিকা যোগ হত। আর এখানে অখণ্ড অবসরের সঙ্গে বসে বসে বই পড়ি অথবা শুনি, আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে যন্ত্রশক্তির নিপুণ অভ্রান্ত এবং নিয়মিত কর্ম-প্রবাহ লক্ষ্য করি।

আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। এই সহকর্মীটির নাম ছিল সুরাইয়াংসেন। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গল্প করে কাটাতাম। অবশ্য খুব আরাম যে লাগত তা নয়, কারণ আমাদের দুজনের ধ্যান-ধারণার মধ্যে সাধারণ মিল বড় কম ছিল। তবু খানিকটা সময় কাটত।

তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, আপনার কখনও কাজ করতে ইচ্ছে হয় না?

তার মানে? কোনদিন আমাকে ফাঁকি দিতে দেখেছেন? এক মিনিট লেটে আমি কখনও অফিসে? মশাই, আমরা সভ্য মানুষ—সব সময় নিয়ম মেনে চলি।

আমার কথাটা ভুল বুঝছে বুঝতে পেরে তাকে বুঝিয়ে বললাম, তা বলছি না। আপনি যে খুব নিয়মনিষ্ঠ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বলছিলাম যে আপনার কি কাজ

করতে ইচ্ছে হয় না? এই যেমন নিজের হাতে বই নামিয়ে আনা, বই তুলে রাখা, পড়ুয়াদের নামের তালিকা রাখা এই সব?

লোকটি অবাক হয়ে গেল, বলল, কিন্তু এসব কাজ মানুষকে করতে হবে কেন?

ঠিকই তো। আমার কাছে এইসব কাজ মানুষকে করতে হয় না সেইটেই আশ্চর্যের। তার কাছে এইসব কাজ মানুষকে করতে হলে সেইটেই আশ্চর্যের বিষয় হত।

লোকটি আমার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকাল। আমি যে স্তন্যপায়ী জীব তা এরা কেমন করে জেনে গেছে।

এখানে কাজের সময় মাত্র তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ডিউটি বদল হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে মানুষ যার যার গাড়িতে করে খানিকক্ষণ খুশিমত বেড়ায়। তারপর ক্লাবে গিয়ে ঢোকে।

এখানকার ক্লাবটা এক আশ্চর্য জায়গা। 'আরব্য-রজনী'র লেখকের কল্পনাতেও বোধ হয় এমন এক ভূস্বর্গের ছবি ধরা পড়ে নি। রঙের সমারোহে পূর্ণ সেই প্রমোদ-কানন যেন আগাগোড়াই আলোর তৈরি। আলোর শিখার মতই তা যেন স্বচ্ছ, অথচ স্বচ্ছ নয়; যেন ছোঁয়া যায় না, অথচ ছোঁয়া যায়। কানে বাজতে থাকে এক মিষ্টি সুরের শেষ রেশটুকু, নাকে অনুভব করা যায় বসন্ত-মদির দিনের ফুলের ক্ষীণ সৌরভ। এই গ্রহ-লোকের সব-কিছুই যেন স্পষ্ট উজ্জ্বল আর সীমাবদ্ধ। শুধু এই আনন্দ-নিকেতনে যেন আছে একটু কুহেলীর আভাস, যেন এক অনির্দেশ্য অপরিচিত বেদনার অতি ক্ষীণ মিশ্রণ।

হয়তো এ কথা সত্যি নয়; আমার অনুমান মাত্র। কারণ কাউকে এ কথা বলতে শুনি নি।

প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে এই ক্লাব। ক্লাবের মধ্যেই খেলার মাঠ, ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, সিনেমা, থিয়েটার ও নাচের স্টেজ, গল্প-গুজব করার পার্ক এবং সমবেত ভোজনালয়। সকলে প্রধান আহারটি এইখানেই সুসম্পন্ন করে। অন্যান্য আহার অবশ্য যার যার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

এতসব প্রমোদ-ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ শুধুই দর্শক বা শ্রোতা। কোন ব্যাপারেই মানুষের অংশ গ্রহণের বালাই নেই। খেলার মাঠে কলের খেলোয়াড়েরা খেলছে। তাই বলে অবশ্য দর্শকদের উৎসাহ কিছু কম নয়। বিভিন্ন খেলার দলের নির্দিষ্ট নাম আছে, যেমন মোহন-বেনু, পূর্ব-দিগন্ত, আড়াই দীঘির চক প্রভৃতি। কলের খেলোয়াড়দের খেলা হলেও সব দলই যে এক রকম খেলে বা কোন দল যে রোজ রোজই সমান খেলার মান বজায় রাখে তা নয়। তার ফলে উত্তেজনা বজায় থাকে। কয়েক বছর যাবৎ নাকি মোহনবেনু আর পূর্ব-দিগন্তই শীর্ষ দল হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে এবং শেষ জয়-পরাজয় তাদের মধ্যেই নির্ধারিত হচ্ছে।

তেমনি থিয়েটারে, নাচে, সিনেমায়—সর্বত্রই কলের মানুষেরাই শিল্পী হিসাবে কাজ করছে। অবশ্য শিল্পী কলের-মানুষদের চেহারায় যন্ত্র-যন্ত্র ভাবটা নেই; তাদের আকৃতি-প্রকৃতি প্রায় সাধারণ মানুষদের মত। এবং তাদের শিল্প-কৌশলের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই। যদিও কিছুদিন লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তাদের বৈচিত্র্যটা কোন একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দীর মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

এখানকার ভোজনালয়ে যেসব খাদ্য দেওয়া হয় কথায় সেগুলোকে উদ্ভিজ্জ বা জান্তব বলা যায় না। শীর্ষ সভ্যতা কৃষি-ব্যবস্থা এবং পশু-পালন উভয়বিধ বর্বরতার থেকেই এই গ্রহকে অব্যাহতি দিয়েছে। এখানে সমস্ত খাদ্যই সিন্থেটিক ফুড। মাটি, পাথর, খনিজ পদার্থ প্রভৃতির থেকেই নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখানে খাদ্য তৈরি হয়। মেনুতে বৈচিত্র্য আছে, একই খাদ্য রোজ রোজ দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের খাদ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এত সব কর্ম-যজ্ঞের মধ্যেও কোথাও মানুষের কোন হাত নেই।

আশ্চর্য! যান্ত্রিক উন্নতি করতে করতে কবে একদিন যন্ত্র স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং মানুষকে একেবারে বেকার করে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম ক্লাবে আমাকে বড়ই নিঃসঙ্গভাবে কাল কাটাতে হত। কেউ আমার সঙ্গে মিশতে চাইত না।

মি যেচে গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেও সে -না-না-না করে সরে পড়ত। আমার দীর্ঘ গৌরবর্ণ হারা দেখে কি এইসব সভ্যতাভিমানীরা ভয় পাচ্ছে? জানি, হতেও পারে। মনে পড়ল, শুনেছিলাম বটে—কৃতাই সভ্যতার মেরুদণ্ডস্বরূপ।

সেদিন আমি অফিস ছুটির পর খুব অন্যমনস্কভাবে রিয়ে আসছিলাম। মনটা নানা কারণে ভাল ছিল না। ড়ির স্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ একজনের সঙ্গে কা খেতেই চমকে উঠলাম। একটি মেয়ে। আমরা রিয়ে যাবার পর যারা ডিউটি দিতে আসে তাদের কজন। মেয়েটিকে এর আগে দু-একবার দেখেছি।

লজ্জিত হয়ে বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

মেয়েটি একমুখ হেসে বলল, না না, ঠিক আছে। মার কিছু হয় নি তো? কোন কাজ না থাকলে চলুন অফিসে একটু আলাপ করা যাক।

অগত্যা মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে আবার অফিসে গিয়ে লাম। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল। মার তার কাছে বিশেষ জিজ্ঞাস্য কিছু ছিল না, কিন্তু র ছিল। আমি কোত্থেকে এসেছি, কী করে এসেছি, নে কেমন লাগছে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস ল। আমি প্রায়ই ভাসা ভাসা দ্ব্যর্থবোধক উত্তর চ্ছিলাম। ভাল লাগছিল না, তবু নিঃসঙ্গতার থেকে ভাল।

ফস্ করে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে বসল, আপনি নাকি য়েমানুষের পেটের থেকে জন্মেছেন?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা কল্পনায় অনুমান করে য়েটি ঘৃণায় মুখটা কুঞ্চিত করল।

বললাম, সেইজন্যই আমরা মেয়েমানুষকে মা বলি।

মেয়েটি বলল, বেশ মজার ব্যাপার কিন্তু, যাই বলুন। বু একটু অশ্লীল!

খানিক পরে অফিস থেকে বেরিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি রে আমি সবে ক্লাবে নাচের আসরে গিয়ে বসেছি, য়েটি এসেই তার ডান হাত দিয়ে আমার ডান হাত ল। এখানকার নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী ক্লাব-বাড়িতে এইভাবে হাত ধরার অর্থ হল আজকের দিন-রাত্রির জন্য সে আমার সঙ্গিনী হয়ে গেল। অবশ্য এই নীতিশাস্ত্রেরই আর একটা নিয়ম একই মেয়ে-পুরুষ পর পর দুদিন পরস্পরকে সঙ্গী নির্বাচন করতে পারবে না।

সঙ্গী-নির্বাচনের ব্যাপারে অবশ্য এখানকার সভ্য মানুষেরা যথেষ্ট অসভ্যতার পরিচয় দেয়। অনেক সময় অনেকে অবাঞ্ছিত সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। হঠাৎ হাত ধরে ফেললেও সে কথা অস্বীকার করে। তাই নিয়ে বেশ ধস্তাধস্তি ছুটোছুটি এবং বাক্-বিতণ্ডা হয়। তখন কলের পুলিস এসে মীমাংসা করে দেয়।

আমার ওই দিনের সঙ্গিনীর নাম ছিল লুসোনা। সে অনর্গল কথা বলছিল এবং হাসছিল। আমি একটু কম কথা বললেও তার খুব অসুবিধা হচ্ছিল না। চারদিক থেকে আমি মেয়েদের তির্যক্ ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি অনুভব করতে পারছিলাম।

ফোটো তোলার ব্যাপারটা খুব সোজা। একটা যন্ত্রের সামনে প্লাটফর্মের উপর দাঁড়ালেই ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ফোটো উঠে আসে। স্বাভাবিক রঙে রঞ্জিত ফোটো।

ফোটোটা বেরিয়ে এলে দেখলাম লুসোনার ছবি ঠিকই উঠেছে, কিন্তু আমার শরীরের দুই-তৃতীয়াংশের মাত্র ছবি উঠেছে। লুসোনা তাইতেই খুশী। বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ডেকে দেখাতে লাগল সেই ফোটো।

সেইদিন রাত্রিবেলা লুসোনা আমার ঘরে এল রাত্রি-যাপন করতে। আমরা ঘরে এসে বিশ্রাম করে জলযোগ সেরে বালক-যন্ত্র-ভৃত্যকে অর্ডার দিয়েছি কফি তৈরি করতে। টেলিভিশনের পর্দায় প্রাক্-সভ্যতার যুগের একটা লোক-নৃত্য দেখানো হচ্ছে। আমি হাতে একখানা বই নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছি আর লুসোনার হাতে একটা ডল-পুতুল।

হঠাৎ লুসোনা পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, লাউনিৎসেন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

মেয়েটির প্রতি তেমন কোন অনুভূতি কিন্তু আমি

বোধ করছিলাম না। অত তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ার আমার অভ্যেস নেই। তবু একজন প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী মহিলার মুখের উপর তো আর সে-কথা বলা যায় না।

বললাম, আমারও বেশ লাগছে তোমাকে লুসোনা।

হঠাৎ একটা দারুণ ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এ একটা সাংঘাতিক মেয়ে। এই অপরিচিত দেশে আমাকে কোন দারুণ বিপদের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে না তো?

কোন রকমে মেয়েটির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়ি না নিয়েই আমি লিফটে চড়ে নীচে নেমে এলাম।

তারপর সরাসরি রাস্তায়। এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কখন যে সামনে একখানি চালকহীন আরোহীহীন গাড়ি এসে পড়েছে তা বুঝতে পারি নি। যখন চোখে পড়ল তখন আর সরে যাওয়ার উপায় নেই। ইষ্টনাম স্মরণ করতে চাইলাম, কিন্তু মনে পড়ল ইষ্টে আমার বিশ্বাস নেই।

কিন্তু আমার কাছাকাছি এসে বাধা পাওয়ায় গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল। আর আমিও কালবিলম্ব না করে ঘুরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

সেই যে গাড়ি চলতে শুরু করল, তারপর তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে তার অবারণগতিতে কোন ছেদ পড়ল না। এমন কি সেই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সামান্যতম হ্রাস বৃদ্ধি ঘটল না। গাড়িকে কী করে নির্দেশ দিতে হয় আমি জানতাম। নির্দিষ্ট জায়গায় মুখ লাগিয়ে কত জায়গার নাম বললাম—প্রেসিডেন্টের বাড়ি, আমার বাড়ি, পার্লামেণ্ট, ক্লাব, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরির অফিস—কিন্তু কোন ফল হল না। ক্ষিপ্ত যান্ত্রিক মস্তিষ্কযন্ত্রের মতই অমোঘ নির্দয়তার সঙ্গে তার খেপামি চরিতার্থ করে চলল।

প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ সেই শহরে সেই খেপা গাড়ি কতবার যে উল্কার বেগে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করল তার ইয়ত্তা নেই। কতবার আমি শহরপ্রান্তের মলিনদর্শন বাড়িগুলির কাছ থেকে বাঁক নিয়ে আবার ফিরে এলাম শহরের কেন্দ্রের প্রাসাদোপম বাড়িগুলির কাছে!

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে আমার প্রাণপাখি প্রায় খাঁচা-ছাড়া হওয়ার জো হল। খেপা-গাড়ি কোন্ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে প্রথম প্রথম এই আশঙ্কায় প্রায় অভিভূত হয়েছিলাম। কিন্তু শেষটায় কোন দুর্ঘটনা ঘটুক এইটেই আমার একমাত্র কামনা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু হায়! মানুষ-চালিত গাড়ি দুর্ঘটনা করে; যন্ত্র-চালিত গাড়ি দুর্ঘটনা কী করে ঘটাতে হয় জানে না।

চতুর্থ দিন সকালে দেখলাম আমার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আমার গাড়ির মতই অজস্র গাড়ি উল্কাবেগে ছুটে চলেছে (এ গ্রহের লোকেরা স্পীড বড় ভালবাসে)। সবারই ভরসা আছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের গতির অবসান ঘটবে। কিন্তু আমার এ গাড়ি চলতে থাকবে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মনে মনে কল্পনা করলাম, আমার শবদেহ পড়ে আছে গাড়ির উপর, তার উপর মাছিরা মচ্ছব বসিয়েছে; আর তখনও মহাকাশের নক্ষত্রের মত আমার গাড়ি গড়িয়ে চলেছে এক লক্ষ্যহীন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে।

আমি শুধু কামনা করছিলাম আমার শেষ দিনটা নিকটবর্তী হোক। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে কাজটা সেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সে শক্তি আর ছিল না।

দুপুরের দিকে আমার শেষদিনের বদলে প্রেসিডেণ্টের গাড়ি আমার গাড়ির নিকটবর্তী এবং শেষ পর্যন্ত পাশাপাশি এসে গেল। আমি করুণ চোখে একবার প্রেসিডেণ্টের দিকে শুধু তাকালাম। কিন্তু তাইতেই আমার অবস্থাটা তিনি হয়তো বুঝতে পারলেন। প্রেসিডেণ্টের মাথা তো! তারপর দেখলাম চলন্ত গাড়ি থেকেই সীটসমেত তিনি শূন্যে উঠে ঠিক আমার পাশে ঝুপ করে নেমে পড়লেন। একটা সুইচ টিপে অনায়াসে আমার গাড়িখানা মুহূর্তেকের জন্য থামালেন। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বাধ্য ভৃত্যের মত গাড়িখানা তাঁর বিরাট বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

সিডেন্টের বাড়ি এ শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়ি। তার া করতে পারি এমন ভাষা আমার জানা নেই। রূপসুধা পান করার মত শরীরের অবস্থাও আমার ল না।

সিডেন্ট আমাকে এক গ্লাস খুব উচ্চশ্রেণীর মদ ন করলেন। সেইটুকু পান করে আমি খানিকটা ধ করলাম।

মি একটু সুস্থ হয়েছি দেখে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস , তোমার এ দশা ঘটল কী করে? গাড়িটাতে তা অন্ততঃ অষ্টআশি ঘণ্টা কাটিয়েছ!

মি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, এ কথা আপনি ন কী করে?

ড়িখানা যে আমার। সেদিন রাত্রে গাড়িটা াছিলাম মনসোনাকে নিয়ে আসার জন্যে। হয়তো তেই গাড়িটার প্রতীক্ষায় কাটাতে হত যদি না াভিশনে মনসোনা জানাত যে গাড়িটা তার কাছে নি।

মার দুর্ঘটনার কারণ প্রেসিডেন্টকে একটু অদল-করে জানালাম। দেখলাম আমার প্রতি প্রেসিডেন্টের ভূতি আছে যথেষ্ট।

তারপর প্রেসিডেন্টের আদেশে বালক-যন্ত্র-ভৃত্য দের খাবার-দাবার দিয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার মি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলাম। প্রেসিডেন্টের ান সময় আর নষ্ট করা উচিত নয় বোধ করে আমি চাইলাম।

প্রসিডেন্ট আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বলে বলতে লন দেখ লাউনিৎসেন, তুমি ভিন্ন গ্রহ থেকে এসেছ তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলছি। আমাদের র মোটামুটি তুমি দেখেছ। মানুষের কল্পনার সমস্ত আমরা আয়ত্ত করেছি। মানুষকে আমরা অখণ্ড শ দিয়েছি। জীবনকে উপভোগ করাই তার াত্র কাজ। উপভোগের আয়োজনও প্রচুর। দের শহর সম্পর্কে এটুকু অন্ততঃ জোর গলায় বলতে যে দুঃখকে আমরা চিরনির্বাসনে পাঠিয়েছি। তেমনি আমরা লুপ্ত করেছি অসুন্দরকে। এই চির-সুখের দেশের আমি প্রেসিডেন্ট। স্বভাবতঃই আমার সুখের মাত্রাটা আর একটু বেশী। এই শহরে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব আছে। কিন্তু আমাদের পার্লামেণ্টের সভ্যদের ক্লাবটা দেখলে তুমি অবাক হবে। সেই পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্যেও আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ভক্তিগদগদচিত্তে আমি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বাণী কান খাড়া করে শুনছিলাম।

তিনি বলে চললেন, পর পর পাঁচবার আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছি। এখানে নির্বাচন কিভাবে হয় বোধ করি জান—লটারীর সাহায্যে। এখানে সব লোকই সমান, কেউ কারও থেকে যোগ্যতায় বা কোন দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ নয়। কাজেই প্রাক্-সভ্যতার যুগের ভোটাভুটির আর এখন প্রয়োজন হয় না। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের থেকে যন্ত্র তার খুশিমত একজন প্রেসিডেন্ট এবং সাড়ে তিন শো সভ্যের নাম বেছে দেয়।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মত বর্তমানের এই পার্লামেণ্টও কি পর পর পাঁচবার নির্বাচিত হয়েছে?

হ্যাঁ।

প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম, তবে এটাকে খুবই তাজ্জব ব্যাপার বলতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম।

তার বদলে বললাম, এটা আপনার অসাধারণ নৈতিক শক্তির পরিচয়।

মনে মনে বোধ করি কথাটা তিনি মেনে নিলেন। বললেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি নানা ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতাও প্রয়োগ করে থাকি। আমার ক্ষমতা যে কত বেশী, সাধারণ লোকে তা জানেও না। কিন্তু তবু আমার মনে একটু দুঃখ আছে লাউনিৎসেন।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি? কী দুঃখ?

লোকে আমাকে চেনে না, জানে না, আমার নাম পর্যন্ত নেয় না—এই দুঃখ। এ শহরে সকলেই নিজের নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত। একবারও ভাবে না, প্রেসিডেন্ট

তাদের জন্যে কী করছে। লাউনিৎসেন, তুমি আমার জন্য একটু প্রচার কর—এইটুকুই আমার অনুরোধ।

অনুরোধ কেন? আদেশ বলুন না।

ভুলে যাচ্ছ লাউনিৎসেন, এটা পূর্ণ গণতন্ত্রের দেশ। এখানে স্বয়ং প্রেসিডেণ্টও একজন সাধারণ প্রজাকে কোন আদেশ দেয় না।

একজন নিতান্ত সাধারণ লোকের উপর যখন কোন মহৎ ব্যক্তি কোন কাজের ভার দেন তখন সে লোক নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে। স্বভাবতঃই প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে একটা কাজের ভার পেয়ে আমি নিজের জন্ম সার্থক বলে বোধ করলাম। শুধু তাই নয়। আমার চোখে মহৎ প্রেসিডেণ্ট মহত্তর হয়ে উঠলেন। এমন কি লটারীর সাহায্যে নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কী করে পর পর পাঁচবার প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নির্বাচিত হলেন এ রহস্যটাও আর আমার কাছে রহস্য বলে মনে হল না।

বিকেলের দিকে আমি আমার পুরনো ক্লাব-বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। কাজেই সকলের আগে ভোজনালয়ে গিয়ে আহার-পর্বটা সেরে নিলাম। আমার উপর বহু লোকের তির্যক্ দৃষ্টি অনুভব করছিলাম, কিন্তু আমি কারও দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম না।

খাওয়া শেষ করে আমি নিঃশব্দে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করলাম, বন্ধুগণ, আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশের বাসিন্দা। এখানে কোন মানুষই আর কারও চেয়ে গুণে ক্ষমতায় শক্তিতে বা মর্যাদায় হীন নয়। কিন্তু আপনাদের এই গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পিছনে আপনাদের প্রেসিডেণ্টের কতখানি হাত আছে একবার ভেবে দেখেছেন কি? এ কথা ঠিক, প্রেসিডেণ্ট আপনাদেরই মত একজন মানুষ; আপনাদেরই মত একটি নাম তিনিও বহন করেন—ক্রনিয়ৎসেন। কিন্তু মানুষ যে ত্যাগে কর্মে শিক্ষায় দীক্ষায় মহত্ত্বের কত উচ্চতম শিখরে উঠতে পারে তিনি তার এক উদাহরণ। আমার বক্তব্য এই যে মহৎ মানুষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করা উচিত, কারণ তাতে আমরাও মহৎ হবার পথের নিশানা পাই।

সবাই বেশ চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনছিল বলে আমি বেশ উৎসাহ বোধ করছিলাম। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে একজন মহিলা বলে উঠলেন, শুনুন ভদ্রলোক, আমার একটি কথা আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, প্রেসিডেণ্ট সম্পর্কে আপনার কি কিছু জানবার আছে?

মহিলাটি বললেন, প্রেসিডেণ্ট চুলোয় যাক। আমি আপনাকে আজকের সঙ্গী হিসাবে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মহিলা বলে উঠল, আমিও চাই। আমিও চাই।

শুধু তাই নয়, দশ-বারোজন মহিলা এসে আমার পা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। টেবিলের উপর ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হবে মনে করে আমি নেমে পড়লাম। কিন্তু তাতে আমি আরও বেশী-সংখ্যক মহিলার আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়লাম।

ব্যাপারটা শুনতে যত বিসদৃশ মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। এই শীর্ষ-সভ্যতার সমাজে পুরনো ধরনের নৈতিক চিন্তার কোন স্থান নেই। এখানে কোন পুরুষ বা নারী প্রতিদিনই তার খুশিমত নতুন নতুন সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে গ্রহণ করে। কাজেই যে-কোন নারীরই যে-কোন পুরুষকে কামনা করার অধিকার আছে এবং প্রায় সব সময়ই সে তার কামনার পাত্রকে লাভও করে।

আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমার ছ ফুট দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারা এতদিন যেমন সকলের ভীতি উদ্রেক করেছিল, তেমনি কয়েকদিনের পরিচিতির ফলে ভীতিটা কেটে যাওয়ায় আজকে আমি একসঙ্গে অনেকের আকাঙ্ক্ষার পাত্র হয়ে পড়লাম। আর আকাঙ্ক্ষাকে সংবরণ করার অভ্যাস এই সমাজের নেই। সেইজন্যই তো এ সমাজে চিরসুখ বিরাজমান।

এ-সবই আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা বড়ই মর্মান্তিক হয়ে উঠল। আমি একা এতজন নারীকে কী করে সন্তুষ্ট করব ভেবে তার কিনারা করতে

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

পারলাম না। এদিকে মেয়েদের আক্রমণে আমার জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল; আমার চুল উষ্কখুষ্ক হয়ে গেল, নখের আঘাতে চামড়া ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল। পালাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাও পারলাম না।

শেষে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। হাত জোড় করে বললাম, দেখুন, আমি সকলের দাবিকেই মেনে নিলাম। যে যে আমার সঙ্গ কামনা করেন, দয়া করে একখানা করে লিখিত দরখাস্ত দিন। সেই অনুযায়ী আমি ব্যবস্থা করব।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত মেয়ে ছুটে গেল দরখাস্ত তৈরি করতে। আমি খানিকক্ষণের জন্য ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে আড়াই শো দরখাস্ত আমার হস্তগত হল। আমি তখন সকলকে জানালাম, প্রতিদিন আমি এদের থেকে দশজনকে আমার সঙ্গে রাত্রি-যাপনের জন্য আমার ঘরে আহ্বান করব।

আমার ভাগ্য খুব প্রসন্ন বলতে হবে, এরা আমার প্রস্তাবে রাজী হল।

অতএব সেদিনকার মত দশজন মহিলাকে নিয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। আমি ইচ্ছে করেই কারও কারও প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করতে লাগলাম যাতে অন্যেরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। বাড়িতে এসে আমি প্রত্যেককে কড়া একপাত্র করে পানীয় খেতে দিলাম। তারপর অর্ধমত্ত অবস্থায় পরস্পরের প্রতি দারুণ ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে তারা যখন ঝগড়া কলহ এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি শুরু করে দিল, তখন ঘরের এক কোণে আমি নিরুপদ্রবে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন।

অনেক রাত পর্যন্ত দাপাদাপি করে শেষ রাত্রের দিকে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি যখন খুব ভোরে উঠলাম তখনও তারা ঘুমুচ্ছে। আরও অনেকক্ষণ তাদের ঘুমনোর দরকার ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরের মত আমি তাদের কাঁচা ঘুমের থেকে ডেকে তুললাম। বললাম, তোমাদের সাহচর্যে সারা রাত আমার খুব আনন্দে কেটেছে। এখন তবে, হে বান্ধবীগণ, আমাকে বিদায়-চুম্বন দাও।

এ সমাজের নিয়ম কী তা তারা জানত। কাজেই বিনা প্রতিবাদে আমাকে একটি করে চুম্বন উপহার দিয়ে তারা বিদায় নিল।

এমনি করে দারুণ হট্টগোলের মধ্যে আমার দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আমি যা করছিলাম তা ভাল না মন্দ তা বিচার করার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি যেন বিকারের ঘোরে কাজ করে চলছিলাম। তবে আমি যাই করে থাকি আত্মরক্ষার তাগিদেই করেছিলাম, এইটেই আমার কাজের একমাত্র কৈফিয়ত।

প্রেসিডেন্টের প্রচারের যে দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম সে কথা স্মরণ করবার বা সে জন্যে চেষ্টা করবার কোন অবকাশ আমার ছিল না। চতুর্থ দিন আমি একখানা চিঠি পেলাম প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। আমার কাজ কতদূর এগিয়েছে জানতে চেয়েছেন। আমি তৎক্ষণাৎ একখানা কাগজে তাঁর একটা প্রশস্তি লিখে দরখাস্তকারিণীদের থেকে তার নীচে একটা করে আঙুলের ছাপ বসিয়ে দিলাম। কী লিখেছি তা অবশ্য কেউ পড়েও দেখল না। কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম প্রেসিডেন্টের কাছে।

প্রেসিডেন্টের ব্যাপারটায় একটু নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এদিকে অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। পঞ্চম দিন শুনলাম চার-পাঁচটি মেয়ে আমাকে পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত পাঁচ শো বছরের মধ্যে নাকি এ দেশে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে নি। এদিকে আমাকে আকাঙ্ক্ষা করে এমন দরখাস্তকারিণীর সংখ্যা হাজারে গিয়ে ঠেকল। এ যেন এক দারুণ সংক্রামক ব্যাধি।

সপ্তম দিন এক হাজার পুরুষের একটি মিছিল পদব্রজে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে যাত্রা করল। প্রত্যেকের হাতে একটি করে পোস্টারে লেখা: 'নারী চাই।' এমন অদ্ভুত দাবির কারণ কি জানতে চেষ্টা করে শুনলাম আমাকে দেখার পর অনেক নারীরই নাকি অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ চলে গিয়েছে। ফলে তারা একা একাই নিজের নিজের ঘরে রাত্রি যাপন করছে। এবং পুরুষদের এইভাবে একক রাত্রি যাপনে বাধ্য করছে। এদের মধ্যে কারা সুখে নিদ্রা যাচ্ছিল আর কারা বিনিদ্র রজনী যাপন করছিল ঠিক বলতে পারব না। তবে পুরুষদের সুখই বাড়ুক আর দুঃখই বাড়ুক, তারা নিশ্চয়ই এটা অনুভব করছিল যে তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এবং এটা উচিত নয়। আমার বিশ্বাস এই কর্তব্যজ্ঞানের থেকেই তারা পার্লামেন্টে অভিযান চালিয়েছিল।

মোটের উপর আমার ঠাণ্ডা রক্তে এই সমস্ত জিনিসটাই খুব ছেলেমানুষী বলে মনে হচ্ছিল। মেয়েরা আমাকে নিয়ে যে অত নাচানাচি করছিল সেটাও আমার কাছে কেমন একটা বিরক্তিকর খেলা বলে বোধ হচ্ছিল। তবে আমি ওদের নিয়ে খেলা করছিলাম, না ওরাই আমাকে নিয়ে খেলা করছিল, সেটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। সেইজন্যই আমি সমস্ত ব্যাপারটার থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা বোধ করছিলাম। প্রেসিডেন্টকে জানালে তিনি কি আমাকে আর কোন পাড়ায় সরে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

[ক্রমশ]

সূতানটি সমাচার

উইলিয়ম হিকি (৫)

[৫১৮ পৃষ্ঠার পর]

লেছি সেই সময় মিঃ ব্রাইড ও মিঃ নরনার নামে সুদর্শন ভদ্রলোক স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করে খুব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তা হলেও নারীর য় পুরুষের অভিনয় যত সুদক্ষই হোক, তা কখনও বিক হতে পারে না। দর্শকদের মনে কল তার ভনয় সম্পর্কে এইদিক থেকে একটা মস্তবড় অভাব রাণ্ডেল এই অভাব পূরণ করে দিয়ে কলকাতার গরের ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। ও থেকে তিনি কয়েকজন মহিলা অভিনেত্রী নিয়ে ন। তাঁরা প্রথমশ্রেণীর না হলেও, দ্বিতীয়শ্রেণীর নেত্রী নিশ্চয়ই। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তাতেই একটা পড়ে যায়। কয়েকজন পুরুষ অভিনেতাও এই ইংলণ্ড থেকে আসেন।

মামার প্রকৃতির সঙ্গে রাণ্ডেলের সাদৃশ্য ছিল অনেক। ন্য তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও বেশ গভীর হয়েছিল। প্রত্যেক দিনই কয়েক ঘণ্টা করে আমি তাঁর সঙ্গে তাম। সুরাপানে মত্ত হয়ে অনেক সময় তিনি অতিরিক্ত হৈ-হল্লা করতেন। তাই করে তিনি র একটি হাত ও পা একেবারে জখম করে াছিলেন।

হেয়ারড্রেসার ফ্রেস্কিনি

আমার আইরিশ বন্ধু ক্যাপ্টেন হেফারম্যান এই বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। রড্রেসার ফ্রেস্কিনি আমার খুব অনুরাগী হয়ে ছল, এবং বাস্তবিকই এমনভাবে আমার চুল ড্রেস দিত যে কলকাতা শহরে আমার মাথার খ্যাতি য়ে পড়েছিল চারিদিকে।

ফ্রেস্কিনিকে নিয়ে একবার একটি সুন্দর ঘটনা ছল, এখনও আমার মনে আছে ঘটনাটি এই: তের মৃত্যুর কয়েকদিন পরের কথা। সারারাত না য় বিছানায় ছটফট করে বেলা প্রায় ৮টা আন্দাজ চুপ করে বারান্দায় বসে আছি। গায়ের লম্বা টা মুড়ি দিয়ে নানারকমের কথা ভাবছি। এমন একটি চাকর এসে খবর দিল, কে একজন অপরিচিত লাক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমার শরীর ও মন কোনটাই সেদিন ভাল ছিল না। তাই চাকরটিকে বললাম, তুমি গিয়ে তাঁকে বল যে আজ আমার পক্ষে দেখা করা সম্ভব হবে না, আর একদিন আসতে। চাকরটি ফিরে এসে বললে যে ভদ্রলোক আমাকে ঠিক দুটি কি তিনটি কথা বলে চলে যাবেন, একেবারেই বিরক্ত করবেন না। এই কথা শোনার পর বাধ্য হয়ে আমাকে নীচে যেতে হল। ভদ্রলোক দেখা হওয়া মাত্রই খুব অনুনয় করে বললেন, "আমি খুব লজ্জিত, আপনাকে বিরক্ত করলাম। একটা কথা শুধু জানতে এসেছি, আপনার কি একদিন সময় হবে আমার বাড়িতে এসে একজন মহিলার একটু কেশচর্চা করে দিতে?" এতক্ষণে আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হল। বুঝলাম ভদ্রলোক আমার হেয়ারড্রেসার ফ্রেস্কিনির খোঁজে এসেছেন, এবং আমাকে তাই মনে করে কথাবার্তা বলছেন। আমি কিছু না বলে একটি নমস্কার করে চলে গেলাম। যাবার সময় বললাম আমি আমার চাকরকে বলে দিচ্ছি, সে ফ্রেস্কিনিকে ডেকে দেবে। প্রায় একঘণ্টা পরে একখানা চিঠি পেলাম ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ভদ্রলোকের নাম জেমস ক্রকেট। লণ্ডনের একজন নামকরা বহেমিয়ান, আমি চিনি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে লণ্ডনে এত ঋণগ্রস্ত হয় পড়েন যে পাওনাদারদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির একটা চাকরি নিয়ে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। তারপর অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমাকে একজন ইটালিয়ান হেয়ারড্রেসার মনে করে তিনি যে ভুল করেছিলেন, তা নিয়ে আমরা প্রায়ই ঠাট্টাবিদ্রূপ করতাম।

বেনিয়ানবাবুর শিল্পবিচার

এবারে শিল্পী টমাস হিকিকে নিয়ে সত্যিই আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার বাড়িতে রোজ ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করলেন, আর একটি পোর্ট্রেট আঁকার জন্য। এবারে তিনি আমার পোর্ট্রেট আঁকতে চান। শার্লতের পূর্ণাকৃতি চিত্রের পাশে যদি আমারও একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র না থাকে তবে নিতান্তই বেমানান হয় বলে তিনি বারংবার আমাকে প্ররোচিত করছিলেন। কিন্তু আমি তো বিলক্ষণ জানতাম যে তাঁর একটি

পোর্ট্রেট মানে হল দু হাজার সিক্কা টাকা। অবশেষে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন এই টাকা দিয়ে ছবি আমাকে আঁকাতেই হল। আঁকা শেষ হবার পর প্রথমে আমি আমার বাঙালী বেনিয়ানবাবুকে ছবিটা দেখালাম। মতামত জিজ্ঞাসা করতে ছবির আপাদমস্তক কয়েকবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, "Yes, picture like master, but where watch ?"' ছবি তো সাব্ ঠিক মাস্টারের মতনই হয়েছে, কিন্তু ঘড়িটা কোথায় গেল ?"

বেনিয়ানবাবুর দোষ নেই। ছবি, বিশেষ করে পোর্ট্রেট বলতে তখন বোঝাত, কেবল চেহারার নয়, পোশাক-পরিচ্ছদেরও নিখুঁত প্রতিলিপি। আমি তখন বেশ ঝকঝকে একটি সোনার হার শীলমোহরসহ বুকে ঝুলিয়ে রাখতাম। ছবিতে এই হারটি ছিল না, তাই বেনিয়ানবাবুর মনে হয়েছিল খুঁত আছে। আমি ইউরোপে অনেক সমঝদারের মুখেও ছবি সম্বন্ধে এই ধরনের সমালোচনা শুনেছি। সাদৃশ্য দিয়েই তারা ছবির শ্রেষ্ঠতা বিচার করতেন। সেক্ষেত্রে একজন বাঙালী বেনিয়ানের আর দোষ কি !

ফেনউইক সাহেবের মেলা

এডওয়ার্ড ফেনউইক নামে তখন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান ছিলেন কলকাতায়। মে মাসে প্রায় প্রত্যেক বছরই গার্ডেনরীচে তাঁর বাগানবাড়িতে তিনি একটি চমৎকার মেলার আয়োজন করতেন। কয়েক হাজার লাল নীল রঙিন বাতি দিয়ে বাগান সাজানো হত। লক্ষ্ণৌ থেকে বিখ্যাত আতসবাজদের আনা হত বাজির উৎসবের জন্য। নানারকমের সঙ সেজে পোশাক পরে লোকজন আসত মেলায়, কেউ কেউ তাদের বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে মুখোশও পরত। বাগানের চারিদিকে তাঁবু খাটানো হত। তাঁবুর তলায় টেবিল সাজিয়ে দেওয়া হত নানারকমের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে। প্রায় তিন শো লোকের খানা এইভাবে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হত। এ ছাড়া বিশাল বাগানবাড়ির প্রায় প্রত্যেক ঘরে প্রচুর পরিমাণে খাবার মজুত থাকত। বাদকের দল থাকত বাগানের নানাস্থানে, মধ্যে মধ্যে তারা সামরিক কায়দায় বাজনা বাজিয়ে অতিথি ও দর্শকদের উৎসাহিত করত। নর্তকীরা থাকত বাজনার তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিমায় সকলের মনোরঞ্জনের জন্য। কেবল বাগানটি নয়, কলকাতা থেকে গার্ডেনরীচ যাবার শেষের দু মাইল রাস্তা দু-দিকে দু-সার করে আলো দিয়ে সাজানো হত। তাতে দিবালোকের মতন পরিষ্কার দেখাত সব। কোনদিক দিয়েই ফেনউইক সাহেব তাঁর এই গ্রাম্য উৎসবের সমারোহের ত্রুটি করতেন না।

সেবার মেলা হল খুব সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে। সাধারণতঃ বছরের এই সময়টাতে দক্ষিণে হাওয়ার জোর থাকে খুব বেশী, এবং প্রায়ই প্রবল ঝড় হয়। সে বছর তা হয় নি। শহরের অন্যান্য সব গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মতন আমি একটি মেলার নিমন্ত্রণের কার্ড পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেইদিনই আবার আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমার বাড়িতে খাবার জন্য। খাবার সময় কতকটা বেহিসেবীর মতন সুরাপান করে ফেলে আমার অবস্থা রীতিমত কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা খুব শোচনীয় দেখে বন্ধুবান্ধবরা সকলেই আমাকে ফিটনের বদলে চ্যারিয়টে চড়ে যেতে বললেন। দু-একজন তাঁদের চ্যারিয়টে আমাকে একটি সীটও দিতে চাইলেন। নিজে ফিটন চালিয়ে গেলে আমি যে নিশ্চিত একটি দুর্ঘটনা ঘটাব, এই তাঁদের ভয় হল। আমি কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলাম না। ঠিক করলাম নিজেই ফিটন চালিয়ে যাব। অবশেষে ফিটনে উঠে বসলাম, এবং লাগাম হাতে নিয়ে আমিরী স্টাইলে ঘোড়া ছোটালাম। সহিস বা মশালচী কাউকেই সঙ্গে নিলাম না। ঘোড়া ছুটল জোর-কদমে। মেলার পথে গার্ডেনরীচের দিকে যাত্রীর ও গাড়ির ভিড় ছিল খুব। আমার ফিটন সকলকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। কর্নেল ওয়াটসনের ডকের প্রাচীরের কাছে এসে আমার হঠাৎ মনে হল ঘোড়াগুলো যেন একটু বেশী জোরে ছুটছে। মনে হতেই লাগাম টেনে ধরলাম, ঘোড়াও আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

এইভাবে বেশ আস্তে আস্তে টুট করে চলছি, এমন সময় দেখলাম আর একটি গাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, গাড়ির মধ্যে দুজন ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রমহিলাদের দেখে স্বভাবতঃই আমার সৌজন্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমার নিজের গাড়িটা রাস্তায় পাশ করে তাঁদের বেরিয়ে যাবার পথ করে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সৌজন্য দেখাতে গিয়ে বিপদ ঘটল আমার। গাড়ি পাশ করতে গিয়ে ঘোড়া দুটো ফিটনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা গাছের গুঁড়ির উপর। একটা পুরনো বাড়ির জীর্ণ দেয়াল ভেদ করে গাছটি ঠেলে উঠেছিল। আমি হঠাৎ ধাক্কায় একেবারে হুমড়ি খেয়ে কামানের গোলার মতন ছিটকে পড়লাম। মাথাটা তীরের মতন গিয়ে মাটিতে পড়ল, এবং মুখের একটা দিকের চামড়া অনেকটা ছড়ে গেল। কিন্তু অতিরিক্ত ক্ল্যারেট পানের জন্য আমার বিশেষ সাড় ছিল না বলে এতটা আঘাত

LUX
TOILET SOAP

পেয়েও আমি কিছু বুঝতে পারি নি। তাই দুর্ঘটনার কথা আদৌ চিন্তা না করে, গাড়ি ও ঘোড়া ফেলে রেখে, আমি ফেনউইক সাহেবের বাগানবাড়ির দিকে টলতে টলতে এগুতে থাকলাম।

যখন মেলায় পৌঁছলাম, তখন আমার চেহারা যে কি রূপ ধারণ করেছে, সে সম্বন্ধে আমার চেতনাই ছিল না। আমার পরনে ছিল নীল রঙের সিল্কের একটি জামা। গাড়ি থেকে আছাড় খেয়ে পড়ার পর তার উপর ছোপ লেগেছিল ভাঙা ইটের গুঁড়োর। গাল দিয়ে রক্তের যে ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, তারও গাঢ় লাল রঙটি এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সব মিলে সত্যিই একটি রঙচঙে সঙ হয়ে উঠেছিলাম আমি। ভিতরে রঙ, বাইরেও রঙ। রঙবেরঙের আলোর মেলায় উপস্থিত হয়ে মনে হল আমিই যেন আদর্শ 'দর্শক'। ফেনউইকের আসল ঘরটিতে পৌঁছতেই উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আমাকে এই অবস্থায় দেখে, ভয়ে ও বিস্ময়ে হৈ-চৈ করে উঠলেন। তাঁরা অনেকেই আমাকে চিনতেন বলে এতখানি অবাক হয়েছিলেন। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার মতন একজন রুচিবাগীশ লোক এরকম ক্লাউনের মতন উন্মত্ত অবস্থায় এসে এখানে হাজির হবে, এ কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। সকলে চেয়ার-টেবিল ছেড়ে হৈ-চৈ করে এসে আমাকে ঘিরে ধরে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায়, কখন ও কেন আমার এই শোচনীয় অবস্থা হল, সকলের মুখে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। এর মধ্যে তাঁরা আমাকে সেবাশুশ্রূষাও করতে আরম্ভ করলেন। মুখের ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে তার উপর সাদা কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হল দেখলাম। এতক্ষণে মনে হল ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াবার মতন অবস্থা হয়েছে আমার। আগেকার মূর্তি নিয়ে কতকটা চেনা-পরিচিত ভদ্রলোকদের সামনে উপস্থিত হতেই তাঁদের যে অবস্থা দেখলাম, তাতে মনে হয় মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলে তাঁরা হয়তো আঁতকে উঠে চিৎকার করতেন অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতেন। সকলে মিলে অনেক বুঝিয়ে আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন, এবং আমোদ-প্রমোদে যোগ দিলে ক্ষতি হবে বলে উপদেশ দিলেন। আমি কিন্তু তাঁদের উপদেশ ও অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। বললাম, ফেনউইক সাহেবের মেলায় কলকাতা শহরের এতসব অপ্সরী-উর্বশীর সমাগম হয়েছে, তাঁরা নড়েচড়ে নেচেগেয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমি তাঁদের না দেখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনব—তা কখনই সম্ভব নয়। অতএব আমোদে ও প্রমোদে আমি যোগদান করবই, কারও বাধা বা আপত্তি শুনব না। তাই হল, খানাপিনা বা হল্লা কোনটাই বাদ দিলাম না। খানা-টেবিলে আমার মতন মজাদার ও মেজাজী সঙ্গী বাস্তবিকই কলকাতা শহরে তখন দুর্লভ ছিল। আমার সাহচর্যে সকলেই তাই পানভোজনে রীতিমত মেতে উঠলেন, এবং আমার ঠাট্টা-রসিকতায় হাসির ফোয়ারা ছুটতে লাগল। কিন্তু তাঁরা সেদিন আমাকে আর বেশী পান করতে দেন নি। ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যে আমার নেশা অনেকটা কেটে গেল, আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

অনেক রাতে আমার গাড়িটা ও ঘোড়া দুটোর কথা মনে হল। ফেনউইকের ভৃত্যদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কোন খোঁজ পেয়েছে কি না। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, জেনারেল ক্লিবার্ট রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আমার গাড়ি-ঘোড়া দেখতে পান, এবং তাঁর লোকজনদের দিয়ে ঠিকঠাক করে ফেনউইক সাহেবের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তিনি ভেবেছিলেন, গাড়ির মালিক বা যাত্রীকে নিশ্চয়ই মেলাতে পাওয়া যাবে। গাড়ি থেকে নীচে পড়ার সময় ঝাঁকুনি খেয়ে আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে লাগানো কয়েকটি মোহর ছিঁড়ে পড়ে যায়। তার মধ্যে একটি মোহর ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়, ১৭৬৮ সনে আমি যখন প্রথম ক্যাডেট হয়ে ভারতবর্ষে আসি তখন আমার ভাই জোসেফ আমাকে উপহার দিয়েছিল। শীলটি দেখতে চমৎকার, টুকটুকে লাল পাথরের উপর এনগ্রেভ করা।

ফেনউইকের অতিথিদের পানভোজনের জের কাটিয়ে উঠতে রাত ভোর হয়ে বেলা ৭টা বেজে গেল। তাই দেখে অনেকে একেবারে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফিরবেন স্থির করলেন। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। বেলা ৯টার সময় আমি আমার ফিটন হাঁকিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলাম। ফেরার পথে যখন সেই দুর্ঘটনার স্থানটিতে পৌঁছলাম, তখন আমার সঙ্গীটিকে বললাম যে গাড়ি থামিয়ে আমি আমার হারানো মোহরটি ভৃত্যদের দিয়ে খুঁজে দেখব। শুনে তিনি উপহাস করলেন। প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা রাস্তার মধ্যে ধুলো ঘেঁটে ছোট মোহর কুড়িয়ে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা ভাঙা টাইলের টুকরোর মতন কি দেখা গেল। ধুলো ঝেড়ে দেখলাম, আমার সেই হারিয়ে যাওয়া মোহরটি। আমার একজন খিদমৎগার সেটি কুড়িয়ে নিয়ে এসে আমাকে দেখাতে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। যেমন আগে পরতাম, তেমনি আজও আমি সেই মোহরটি পরে থাকি। এটি আমার সব সময়ের সঙ্গী বললেও ভুল হয় না।

[ক্রমশ]

রমণী

সন্তোষকুমার দত্ত

'শ বছরের সুন্দর সুঠাম ও ঋজু একটি অবয়ব জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে —আমার চেনা ও জানা একটি মেয়ে।

আমি দেখছি, তার মুখ বিষণ্ণ, চোখ দুটি ক্লান্তি ও ময় ভরা। নিটোল হাত দুটি এমন অসহায় ভঙ্গীতে লার সিক ধরে রয়েছে যা দেখে অন্ততঃ সেই মুহূর্তের আমার মনে হয়েছিল—

না, সে কথা কাউকে বলা চলে না। যা আমার হয়েছিল তা মনেই থাক্। তাতে অন্ততঃ একটা না থাকবে যে, আমার এই চিন্তার খবরটি মনের ীরতম দেশে চিরকাল গোপনই থাকবে, আর মাঝে ঝ কোন স্মৃতিমুখর মুহূর্তে তা আমাকে একটা াস্বাদিত অথচ মধুর রসসিঞ্চনে অভিষিক্ত করবে।

এতই যদি গোপন করার প্রয়াস, তবে এ কাহিনী খতে বসা কেন?

সত্যি, আর পাঁচজনের মত এ প্রশ্ন আমি নিজেকেই রেছি। কোন সদুত্তর না পেলেও একটা উত্তর কিন্তু য়েছি। সেই কথাটাই বলি।

আমি সুব্রত চৌধুরী আজ এ কাহিনী লিখতে বসেছি ই জন্যে যে, তপনকে আমি বিশ্বাস করি নি। তপন মার সাহিত্যিক বন্ধু। আমার এই কথাগুলো তাকে লে, সে এটা নিয়ে খুব ভাল একটা গল্প লিখবে। তাতে বনের সত্যকে অবলম্বন করে সাহিত্যের সত্যকে সে টিয়ে তুলবে। তা আমি চাই না। অসংখ্য পাঠক-াধারণের চোখের সামনে ভাব-কল্পনার একটা বিগ্রহমূর্তি য়ে থেকে লাভ কী! তাতে আমার দোষেগুণে-ভরা কৃতির কতটুকু থাকবে! আমি সাহিত্যিক নই, াধারণ মানুষ। সুতরাং আমার জীবনের সত্যকে বিকৃতভাবে লিখে রাখতে চাই। আর সেই কারণেই ই কাহিনীর অবতারণা।

হ্যাঁ, প্রথমে যা বলছিলাম, বীথি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দিকে চোখ চেয়ে এক উদাসিনী বৈরাগিণীর মত তার সেই দাঁড়িয়ে-থাকা মূর্তিটি কী যেন ভাবছিল। ভাবনা বইকি! না হলে সেই নিঃসঙ্গ একাগ্র চিন্তার মাঝখানে আমার উপস্থিতি তাকে সচেতন করে দিতে পারত। তারই সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকে আমি রাস্তার ধারের ঘরে তার পিছনে এসে দাঁড়ালাম। সে কোন চাঞ্চল্যবোধ করল না, এমন কি আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

আমি আস্তে আস্তে তার নাম ধরে ডাকলাম।

এবার সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর দৃষ্টি রাখল। চোখাচোখি হল পলকের জন্যে, পরমুহূর্তে আমি মুখ নীচু করলাম। আমি নিশ্চিত জানি, আমার এই মুখে এমন কিছু নেই—যার এতটুকু আকর্ষণে বীথি আনন্দ পেতে পারে। আর সত্যি, কুৎসিত কুদর্শন মানুষকে দেখে কোন্ আনন্দ পায় মেয়েরা? হয়তো একটা কৌতূহলের আনন্দ, বড় জোর করুণার আনন্দ! বীথিও তার থেকে আলাদা নয়। তাই এতদিন তার সেই করুণার আনন্দের খোরাক হয়ে থাকতে মন চায় নি। সেই কারণেই বীরেশের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়েও তাদের এই বাড়িতে খুব কম এসেছি। বীথির কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করেছি।

থাক্ সে কথা। বীথি আমার দিকে তাকাবার পর বললাম, পেয়েছি।

পেয়েছেন? তার চোখমুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কই, দেখি!

পকেট থেকে একখানা ছোট ফোটো বার করে তার হাতে দিলাম। বীথি গভীর আগ্রহে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

আমি তাকে দেখছিলাম। হ্যাঁ, মানুষের মনের

ভাব তার মুখের ওপর কত তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয়ে পড়ে—বীথিকে দেখে সেই কথার সত্যতা যাচাই করছিলাম। তাতে ঠকি নি।

একটু আগে-দেখা বীথির বিষণ্ণ মুখ একটা প্রসন্ন হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিতে বিজুরী হেনে সে এবার আমাকে বলল, বেশ দেখতে, নয়?

বললাম, হ্যাঁ। বেশ সুন্দর।

কিন্তু কথাটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। কুৎসিত হলেও একজন সুস্থ সবল মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দরী নারী যদি অপর একজন মানুষের ফোটো হাতে নিয়ে তার রূপের প্রশংসা করে, তা হলে মনে একটু লাগে বইকি। বীথি নিজের চোখে তাকে দেখেও আমার মুখ থেকে একটা সম্মতি আদায় করতে চায়। এ যে কী কষ্ট, তা যারা আমার মত কুৎসিত, কদাকার—তারা জানে।

এবার সে বলল, আপনি কি বলে চাইলেন?

কাল অনুপমকে বললাম, বর যেমন কনের ফোটো দেখেছে, কনেও তেমনি বরের ফোটো দেখার ইচ্ছে জানিয়েছে, অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন কিংবা আপত্তি না থাকে।

অনুপম তখনই রাজী হয়েছিল। বেশ, আগামীকাল আনবেন, একটা কপি দেবখন।

বীথি আবার চোখ রাখল ফোটোখানার ওপর। মুখখানা একটু লম্বা হলেও উন্নত নাক, বড় বড় টানা চোখ-আর সুগঠিত চিবুক দেখতে বেশ ভালই লাগে। কপালটা কত চওড়া! চওড়া কপাল পুরুষমানুষের উন্নতির প্রতীক। ঠোঁট দুটো একটু চাপা অথচ দৃঢ়সংবদ্ধ। বীথি মনে মনে খুশী হল—না, দাদার পছন্দ আছে বলতে হবে।

সে মুখ তুলল। বোধ করি ফোটোর সঙ্গে আমার অসুন্দর মুখের পার্থক্য বুঝতে চাইল।

আমিও বীথিকে দেখছিলাম। কিছুক্ষণ আগের সেই বিষণ্ণ মুখ আর নেই। সুন্দর নীরব হাসিতে ভরে উঠেছে ঠোঁট দুটি। কিন্তু তবু চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা আছে—বেদনা মায়া মোহ কিংবা অন্য একটা আকর্ষণ যা আমার মত আত্মসচেতন মানুষকেও বিমুগ্ধ করল।

তবে সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। বীথির মনের গভীরে স্থান পাবার সৌভাগ্য আমার নেই। সে আমাকে তার দাদার বন্ধু বলে সম্মান দেখায়, হয়তো বা করুণা করে। কিন্তু তাই বলে আমাকে নিয়ে মনোবিলাস করতে সে পারে না। কোন মতেই না।

চলে আসবার সময় সে বলল, দাদার সঙ্গে তো দেখা হল না—আবার আসছেন কবে?

বললাম, ইতিমধ্যে আসি আর না আসি, সামনের বুধবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসব ঠিক।

বীথি হাসল। হ্যাঁ, আসবেন নিশ্চয়ই। আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

সেদিন ওখান থেকে ফেরবার সময় সেই কথা ভাবছিলাম। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে বীথি! আমার কথা চিন্তা করবে! এ কি শুধু কথার কথা?

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলাম। না, তাই বা কেমন করে হয়! তা হলে আমার অসাক্ষাতে সে অমন বিষণ্ণ হয়েছিল কেন! আমি তো কিছু ভুল দেখি নি, দু চোখে বেদনা নিয়ে সে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে কী এমন ভাবছিল!

মাত্র চারদিন পরে যে কুমারীর সিঁথি সিঁদুরে শোভিত হয়ে উঠবে—সুন্দর শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান এক সুদর্শন পুরুষ যার পাণিগ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, সেই মেয়ের মনে এমন কি থাকতে পারে যা তাকে এই আসন্ন শুভমুহূর্তে বিষণ্ণ ব্যথিত করে তুলবে!

কি জানি। মেয়েদের মনের খবর পাওয়া আমার কাজ নয়। অত চিন্তাও করি নি। আর আমার জীবনে বীথি ছাড়া কোন মেয়ের আবির্ভাব হয় নি যার জন্যে এ বিষয়ে কিছু বুঝতে পারি। তাও বীথি আমাকে তার দাদার বন্ধু বলে করুণা করে—হয়তো বা কুৎসিতের প্রতি সুন্দরীসুলভ অনুকম্পা দেখায়।

অনুকম্পা বইকি! না হলে এক বছর আগে প্রথম

S. 267-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

যেদিন আমি আর নিখিল বীরেশের সঙ্গে এ বাড়িতে আসি, বীথির সঙ্গে পরিচিত হই, সেদিন সে নিখিলকে দেখে সবচেয়ে খুশী হয়েছিল। তাদের সেই খুশী-হওয়া যুগল মন একটি রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভপরিণয় আর হয়ে উঠল না। নিখিলের আকস্মিক মৃত্যু তার ওপর যবনিকাপাত করল।

আমি জানি, সে সময়ে বীথি আঘাত পেয়েছিল। তার সেই উচ্ছল প্রকৃতি একটি শান্ততায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সে সময় তাকে আমি সান্ত্বনা দেবার ভাষা পাই নি। কিন্তু আমার ব্যথা ছিল বুকজোড়া। একটি হল নিখিলের মত প্রিয়তম বন্ধুকে হারাবার ব্যথা, অপরটি বীথির বিচ্ছেদ-বেদনা দেখে কষ্ট। আমি কুৎসিত কদাকার—তবু মানুষ তো! আর পাঁচজনের মত আমারও ভালবাসতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে সমস্ত মন একটা অদেখা অজানার জন্যে ব্যথিত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে সময় ভাবি, কে সে, যার কাছে গেলে আমার ব্যথার শান্তি, চিন্তার সমাধান হয়! মনের এই অবস্থায় বীথিকে দেখেছিলাম। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

বীথি আমার প্রতি মনোযোগ না দিলেও তাকে দেখতে আমার ভাল লাগত। তার সঙ্গে কথা বলতে কিংবা একটু সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করত—এ কথা অস্বীকার করে দোষ কাটাবার চেষ্টা করব না। কিন্তু তবু কুৎসিত হলেও আমার এই অভিমানী মন ভিখারীর বেশে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নি। বীথি আর নিখিলের মাঝখানে আমার উপস্থিতি শুধু তালভঙ্গই করবে—এই কারণে দূরে সরে থেকেছি। এমন কি নিখিল মারা যাবার পরেও এই দূরত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বীরেশ অনুরোধ জানিয়েছিল, তুই অমন দূরে সরে থাকিস কেন ভাই! নিখিল নেই বলে কি তুইও আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিবি? তোকে দেখলে বীথি কতকটা স্বস্তি পায়, নিখিলের শোক ভুলে থাকবার চেষ্টা করে—এ আমি বুঝতে পারি। আর কিছু না হলেও এদিক থেকে তোর একটা কর্তব্য আছে তো। সেটুকুও কি তোর কাছ থেকে আশা করতে পারি না!

লজ্জিত হয়ে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই।

অথচ আমি জানি, এ আমার পক্ষে কী কঠিন আত্মপরীক্ষা। অনুরাগী মন যদি ক্ষণিকের জন্যে লুব্ধ হয়ে ওঠে, তাকে সংযত করতে হবে। বেদনার ভারে বুক ভেঙে গেলেও সে বোঝা কোথাও নামাতে পারব না। এর থেকে দূরে সরে থাকা অনেক ভাল।

কিন্তু তা আর হল কই! বীরেশদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়ায় বীথি আমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছিল। সে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলত। কখনও বা লঘু ঠাট্টা-তামাশা করতে ছাড়ত না।

আমি ভাবতাম, নিখিলের শোক সে অনেকটা সামলে নিয়েছে। না নিলে ওর মনের দিক থেকে ক্ষতি হত।

একটা কুমারী মেয়ে—যার সামনে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা রয়েছে—সে যদি অতীতের একটা ঘটনাকে রাত্রিদিন মনে রেখে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়, তা হলে সেটা কি খুব ভাল হত!

মন বলে, না। তা হলে ওর ওই বিষণ্ণ চিন্তা আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা থাকত না।

সেদিন বীথির হাতে অনুপমের ফোটো দিয়ে ফিরে আসবার সময় এই সব কথাই মনে হয়েছিল। অনুপমকে দেখে তার পছন্দ হয়েছে। খুশী হয়েছে সে।

বিয়ের এই বাকি চারদিন ওই কুমারী মেয়ে অনুপমকে নিয়ে কত চিন্তা করবে। মনে মনে এক নতুন স্বপ্নলোক গড়ে তুলবে। শুধু কি তাই! লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ছোট্ট ফোটোখানা কতবার দেখবে। সে সময় হয়তো বা চোখের পলক পড়বে না।

আর ঠিক সেই সময় আমার কথা কি তার মনে পড়বে? তখন কি আমার জন্যে সে কিছু ভাববে! আমি জানি—তা নয়। কিন্তু তবু ভাবতে ভাল লাগে। বুকের মধ্যে একটা অজানা বেদনা মোচড় দিয়ে উঠলেও

একই কেন্দ্রবিন্দুতে মন পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে
য়।
আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি। বিয়ের আগের
বিকেলে আমি গিয়েছিলাম। বীথি তখন সঙ্গিনীদের
বেড়াতে বেরিয়েছে। আমি বললাম, দেখ, আমার
র বেঠিক হয় নি। বরং একদিন আগেই এসে
ছি।
আমাকে দেখে সে যেন ক্ষণিকের জন্যে বিমর্ষ হয়ে
। পরক্ষণেই খুশীর ভাব দেখিয়ে বলল, বেশ তো,
ই করেছেন। তারপর কতকটা কৈফিয়তের সুরে
, আমি একটু বেড়াতে বেরুচ্ছি।
বেশ—বেশ। এ তো ভালই। বিয়ে বলে ঘরের
ণে লুকিয়ে থাকতে হবে! তা হলে আর এ যুগের
হয়ে লাভ কি!
বীথি একটু হেসে চলে গেল।
বাড়িতে ঢুকতেই বীরেশের সঙ্গে দেখা হল। আমাকে
খ সে হাসিমুখে এগিয়ে এল: আমি বিশ্বাস করি নি,
আজকে আসবি।
বললাম, বা, তুই বলে দিয়েছিস আর আসব না?
আগের হাসিটা বীরেশের মুখে লেগেই ছিল: তা
ও তোকে তো চিনি। যাই হোক আজ কাল দুটো
কিন্তু বাড়িতে যেতে পারবি না—এই বলে দিচ্ছি।
আমি হাসিমুখে সম্মতি জানালাম।
সেদিন সন্ধ্যের পর বীথি বেড়িয়ে এসে আমাকে
বার দেখা দিয়েই চলে গেল। তারপর বিয়ে-বাড়ির
লাহলে আর তাকে দেখতে পেলাম না।
পাই নি—তাতে কিছু মনে করি নি। কেন না,
মার সে অধিকার নেই। কেবল সেদিন শেষ রাত্রে
ন ভিয়েনের কাজ শেষ হয়েছে, আমি আর বীরেশ
ইরের ঘরে এসে শুয়েছি, তখন একবার নিখিলের
থাটা মনে হয়েছিল। আজ সে বেঁচে থাকলে এই
সবের শিরোমণি হয়ে থাকত। এর প্রতিটি অনুষ্ঠান
থি আর ওকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত।
কিন্তু বীথি! এই সঙ্গে তাকেও মনে না করে যে
পারছি না। সেও কি আমার মত এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে
নিখিলের কথা মনে করছে! এক বিনিদ্র রজনীর সমস্ত
চিন্তা কি তার চোখের সামনে নিখিলের রূপ ধরে এসে
দাঁড়িয়েছে! কি জানি। এর উত্তর একমাত্র বীথির
কাছেই থাকবে।

বিয়ের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কর্মব্যস্ততার
মধ্যে কেটে গেল। তার মধ্যে বীথির কথা বিশেষ করে
ভাববার বা তাকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম না।
সুযোগ এল বিয়ের সময়। কনের পিঁড়ি ধরবার
জন্যে লোক কম হতে আমার ডাক পড়ল। গেলাম।
দেখলাম, না, শুধু তাই নয়, সেই প্রথম আমার বুকের
মধ্যে আনন্দ-বেদনার এক তীব্র অনুভূতি জাগল। বীথিকে
সাজানো হয়েছে। সে সুন্দরী। এর আগে যতবার
তাকে দেখেছি, সুন্দরীর বেশেই দেখেছি। কিন্তু আজ
এই মুহূর্তে তাকে যে অপরূপ বেশে দেখলাম, তার বর্ণনা—
আমি কবি নই, দিতে পারব না। আমার শুধু আনন্দ
হল। বুক ভরে গেল আমার। সেই সঙ্গে একটা চাপা
মর্মবেদনা মনের মধ্যে গুমরে উঠল। এতদিনে বীথি সত্যিই
কুমারী থেকে বধূ হতে চলল। তাকে নিজের করে পাব,
এ আশা করি নি। তবু এতদিন সে আমার না থাক্, আর
কারও অধিকারের মধ্যে ছিল না। আজ সে সত্যিই
একজনের একান্ত আপনার হতে চলেছে।
কিন্তু এ ভেবে লাভ কি! কিছুই নয়—শুধু মনকে
প্রবোধ দেওয়া।
হুলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দের মধ্যে কনের পিঁড়ি
সাতপাক ঘুরে বরের সামনে থামল। বীরেশের এক
খুড়তুতো ভাই আর আমি পিঁড়ি ধরেছিলাম। মালা
বদল হল, এবার শুভদৃষ্টির পালা।
সুন্দর সুপুরুষ বরকে দেখে বীথি খুশীই হল। হয়তো
বা সে ভাবছিল, ফোটোর থেকে আসল মুখখানা আরও
সুন্দর! আমি কিন্তু সে কথা ভাবছিলাম। অনুপম আর
অনুপমরূপেই বীথিকে জয় করতে এসেছে। তার চোখ
মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পরিচয়

জীবনের আর এক অধ্যায়। শুরু শেষ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে আমাকে সংসারে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো ভুবনেশ্বর ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। ভাল একটা চাকরীও পেয়েছি। রঘুনাথ সরকারের চায়ের দোকানে আনাগোনার দিনগুলোতে জানতাম জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে ধারণা আমার পাল্টে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেকার জীবনে টিউশনিও জোটে। দুষ্কর হলো মহানগরী কোলকাতার বুকে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীয়েদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা সহরে বাড়ী নেই, কিম্বা মালিকরা তা ভাড়ায় দেন না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে দুশো পঁচিশ টাকার ক্ষুদে অফিসারের জন্য নয়।···

দাদার সংসার বেড়ে গেছে। বুড়ো মা। এখন তো একেবারে বেকার নই। আগের তুলনায় ভালই আছি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের আমারও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চন্দননগরেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ৪০ মাইলের দূরত্ব। কি আর করা যাবে, সহরে যখন জায়গা নেই তখন সহরতলীতেই থাকতে হয়। লোকাল ট্রেনে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সকালে আটটার গাড়ী ধরতে হয়। নিত্যির তাড়া। নাকেমুখে দুটো ভাত গুঁজে ষ্টেশন পানে ছুটি। গাড়ীর দু'চার মিনিট আগেই পৌছুই। ভাত একদিন না খেলেও চলতে পারে, কিন্তু আফিসের দেরী হলে আর রক্ষে নেই। ঘচাং করে 'লেট মার্ক' হয়ে যাবে। আমার আবার সেইটেই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা!··· ডেলী প্যাসেঞ্জারের দুর্গতির কথা ভাষায় বলা সম্ভব নয়। বসতে জায়গা পাওয়া তো বাপের ভাগ্যি। 'ফুট-বোর্ডে' দাঁড়ানো আর 'হ্যাণ্ডেল' ধরার অধিকার নিয়েই তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়। ঝুলতে ঝুলতে কোনমতে এসে হয়ত হাওড়া পর্য্যন্ত পৌছানো যায়। তবে গেট থেকে সবার আগে বেরুবার তাড়াহুড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি লাঠি হারাতে হয়। ভিড়ের ঠেলায় পায়ের চটি হারিয়ে আমাকে একদিন খালি পায়ে আপিস যেতে হয়েছিল। একা হলে হয়ত হোটেল মেসেই থাকতাম। মুশকিল হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মানুষ! কষ্ট তাঁর সইতেও পারি না, আবার কিছু করতেও পারছি না। একটা দুটো মাস নয়, আজ আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, রোজই আমি ভীড় ঠেলে আপিসটাতে আসি যাই।···

* * *

দৈবের ঘটনা। আপিস ফেরত বাড়ি ফিরছি। এস্‌প্লানেডে দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার ট্রাম ধরবো বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে কাঁধে এসে ঠেকলো। 'কি ভায়া চিনতে পারেন?' আমি তো অবাক! এভাবে এতদিন পরে আবার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। মিনিট দুই মুখ থেকে কথাই সরলো না। বিস্ময়ে আর আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি। 'আমি রঘুনাথ সরকার। সেই যে ভুবনেশ্বরের চায়ের দোকান মনে পড়ে?' 'সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলার কথা। সত্যিই আপনাকে এখানে এভাবে দেখবো ভাবতেই পারছি না। কত যে খুশী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না।' সরকার মশাই মুচ্‌কি হাসলেন। 'আমি তো ভাবলাম বুঝি চিনতেই পারেন নি। যাক্ ভাল কথা, কোথায় চলছেন?' 'ট্রামের অপেক্ষা করছি। হাওড়া যাবো। চন্দননগরে থাকি। লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করি।' 'চন্দননগর? এত দূরে!' 'কি আর করি বলুন। চাকরী একটা ভালই হয়েছে। তবে কোলকাতা সহরে আমার ভাগ্যে বোধ হয় বাড়ী লেখা নেই। মাকে নিয়ে তো আর হোটেলে থাকতে পারি না। তাই···' 'থাক ওসব কথা পরে শুনবো এখন চলুন আমার সাথে।' 'কোথায়?' 'শ্যামবাজার। আমার শ্বশুরবাড়ী। পূজোর ছুটিতে আমরা সবাই এখানে

।তে এসেছি। স্ত্রীর বাপের বাড়ী থাকতে আবার
বা কোথায় ?' 'কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাবে না ? মা
াতে একা চিন্তা করবেন। তাই বলছি আর একদিন
াখ'ন।' 'না না তা হতেই পারে না। একদিনে
ভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। মা ঠিকই বুঝবেন
য়ান ছেলে বন্ধুবান্ধবের সাথে ছবিটবিতে গেছে। চলুন,
ন।' 'কিন্তু...' 'কোন কিন্তু নয়। চলুন এক সাথে
পনার দু' কাজ হবে। গিন্নীর সাথে পরিচয়টাও হয়ে
ব। আর শ্বশুর মশাইকে বলে তাঁর বেলেঘাটার
ীতে আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাটেরও ব্যবস্থা করে
বা।' এবার কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না।
ীর ব্যবস্থা হতে পারে এর পরেও কি আমি না বলতে
রি।...চমৎকার লোক ঘনশ্যাম রায়। তবে হ্যাঁ,
কার মশাইয়ের যোগ্য শ্বশুরই বটে! সরকার মশাইকে
থামানো যায়। রায় মশাই একবার মুখ খুললে রাত
ার করে দিতে পারেন। যাকৃগে। ভালই হলো।
মশাই জামাইয়ের কথা মতো তাঁর বেলেঘাটার
ীতে আমায় রাখতে রাজী হলেন। নিতান্ত সৌভাগ্য
ত হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা
ার নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ডাক
ায় রায়মশাই উঠে গেলেন। বাবাঃ বাঁচা গেল।
র মনে হয় সরকার মশাইয়ের পালা। তাড়াতাড়ি
া দরকার। এখনও সরকার-গিন্নীর সাথে পরিচয়টা
। না। যাবার আগে আর একবার বলে দেখা যাক।
কার মশাই সবই তো হলো, তবে গিন্নীর যে দর্শন
র নামটি নেই। কি ব্যাপার ? ফাঁকীতে পড়লাম
তো ?' 'ফাঁকীতে পড়বেন কেন, ঐ দেখুন...' শ্রীমতী
ভক্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাঙালী গিন্নী।
যা ভেবেছি। 'আচ্ছা সরকার মশাই এত কষ্টের
দরকার ছিল ? ওনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।'
ষ্কের কিছুই নেই। আপনার কথা ভুবনেশ্বর থাকতে
শুনতাম। খাবার জিনিষ মুখটি বুজে খেয়ে যান।'—
নিমিষে কথাগুলো শেষ করে ঘোমটা টেনে সরকার-
গিন্নী এক রকম দৌড়েই পালিয়ে গেলেন। বাঙালী ঘরের
লক্ষ্মী। 'ভালই হলো, কি বলেন সরকার মশাই! পেটটি
পুরে খাওয়া যাক।' 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'...অনেকদিন
এমন রান্না খাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের
রান্নার হয়ত জগতে তুলনা মেলা ভার। 'কেমন লাগছে ?'
'চমৎকার। গিন্নীর আপনার তুলনা নেই সরকার মশাই।
দাদার ওখানে গেলে বৌদি রেঁধে খাওয়ায়। আমি আর
একটি বৌদি পেলাম।' 'উঃ? কৃতিত্বটা পুরোপুরি
আপনার বৌদির একার নয়। একটু দাঁড়ান'—হঠাৎ
সরকার মশাই অন্দরে ঢুকলেন। এক মিনিটও হয়নি।
একটা টিন হাতে আবার ফিরে এলেন। টিনের গায়ের
খেজুর গাছের ছাপ দেখেই চিনেছিলাম 'ডাল্ডা' বই
আর কিছু নয়। খাবারের স্বাদে গন্ধে সেইটেই মনে
হচ্ছিল। আমায় অবাক করার টোনে টিনটি দেখিয়ে
বললেন, 'এটির সাথে পরিচয় আছে ?' 'এর পরিচয়
তো আপনার চায়ের দোকানেই পেয়েছি সরকার মশাই।'
'ও-হো মনে আছে তা হলে ? আমিই তো গিন্নীকে
'ডাল্ডা'য় রাঁধতে শেখালাম। নইলে এমন রান্না পেতেন
কোথায়।' 'তা হলে আপনাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়,
কি বলুন ?' সরকার মশাই হাসলেন। 'ঘরের ব্যবস্থা
তো হয়ে গেলো। এবার গিন্নী করুন। আমরাও মাঝে
মাঝে আসবো-টাসবো।' চুপি চুপি কখন বৌদিও এসে
পেছনে দাঁড়িয়েছেন। বৌদির কথাগুলো সত্যিই যে
আপন। বাংলার দরদী বৌদি। 'সব হবে বৌদি।
কোলকাতায় আসি। তারপর সব ব্যবস্থাই হবে।'
'বৌঠানের হাতের রান্না খাওয়াবেন তো ?'—টিপ্পনী
কাটলেন সরকার মশাই। 'নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহের কি
আছে ?'.. রাত হয়ে গেছে। আর দেরী নয়। সত্যিই
আজ খুশীর দিন। বাড়ী পেয়েছি, খুশীর খবরটা মাকে
দেওয়া দরকার।......'নমস্কার বৌদি। নমস্কার সরকার
মশাই। আবার দেখা হবে।' 'আসুন ঠাকুরপো।'......

* * *

। 22 Beng.　　　　　　হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

বর-কনেকে এবার পুরোহিতের কাছে বসিয়ে দিয়ে আমি নীচে নেমে আসছিলাম।

আমার সমস্ত মন সেই মুহূর্তে বীথির কল্যাণকামনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালাম। ওপরে গিয়ে বীথিকে এ কথা জানিয়ে এলে সে আনন্দ পাবে। কিন্তু দু-পা উঠেই আবার নেমে এলাম। বীথিকে উদ্দেশ করে এবার আমার মন বলল, তোমার জীবন সুখের হোক।

আমি গল্প লিখতে বসি নি। তাই তার সাস্‌পেন্স আর সার্‌প্রাইজ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার আমার নেই। সে করবে তপনের মত সাহিত্যিকেরা। আমি সাধারণ মানুষ—জীবনের একটা ঘটনা সোজা সরল ভাষায় বলতে চেয়েছি। সেই ঘটনার শেষ পর্যায়ে প্রায় এসেও গিয়েছি। বাকি যেটা, তা না বললেও চলত। কিন্তু এতখানি এসে নিজের দুর্বলতাটুকু চেপে রাখতে পারছি না। জানি, এ অন্যায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি মেয়ের ওপর কটাক্ষপাত। তবু এর পরিশিষ্টটুকু বলতেই হবে। এ যেন নিজের গলাতেই নিজের হাতে ফাঁস টানা।

রাত তখন কম হয় নি, প্রায় সাড়ে বারোটা। খাওয়া-দাওয়া সবে চুকেছে। এমন সময় একটি তরুণী এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল: নতুন বর আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

বীথির বাসরঘর। মেয়েদের কলকাকলিই তাতে বেশী। তার মাঝে কোথায় দাঁড়াই কোথায় বসি—কিছু বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম।

মেয়েরা সব হেসে উঠল। বীথি ঘোমটা সরিয়ে হাসিমুখে বলল, অমন করছেন কেন, বসুন।

এ তো দেখছি তিলধারণের ঠাঁই নেই, এর মধ্যে আবার আমাকে ডেকে আনা কেন ?

অনুপম হাত তুলে নমস্কার করল: আসুন, আমিই আপনার খোঁজ করছিলাম।—তারপর পরিহাসতরল কণ্ঠে বলল, এতগুলো সখীকে একা ম্যানেজ করা শক্ত বলেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

আবার হাসির রোল উঠল বাসরে।

কি ভাবে, কোন্ শক্তিতে জানি না, বাসরের মাঝখানে নিজেকে সেদিন বেশ মানিয়ে নিয়েছিলাম। আমার চিরলাজুক মন কি করে হাসি তামাশা ও সরস কথায় মুখর হয়ে উঠেছিল, সেকথা ভাবতে গেলে নিজেই বিস্মিত হই।

শেষরাত্রে মেয়েদের দল কিছু চলে গেল। জনকয়েক বাসরেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার এ পাশে বীথি অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, এবার অনুপমও ঢুলতে আরম্ভ করল।

হাতঘড়িতে দেখলাম রাত তিনটে। ক্লান্তিতে আলস্যে শেষ পর্যন্ত আমিও শুয়ে পড়লাম। আমার এ-পাশে বীথি ও-পাশে অনুপম। এদিকে-ওদিকে ঘুমন্ত মেয়েরা। সকল উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে শেষরাত্রির বাসরের এই দৃশ্য বড় বিচিত্র। চোখ বুজে শুয়েছিলাম। কখন যে ঘুম এসেছিল টের পাই নি।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখি, অনুপম আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়েছে। তারই গায়ে পা লেগে বোধ হয় ঘুম ভেঙে গেল আমার।

মাথার ওপর ইলেকট্রিক্ আলোটা তখনও জ্বলছে। কিন্তু তার জ্যোতি ম্রিয়মাণ। সেই আলোয় সমস্ত বাসরকে কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

ঘড়ি দেখলাম, ইতিমধ্যে চারটে বেজে গিয়েছে কখন। ভোরের আর দেরি নেই।

তবু আর একবার চোখ বোজবার চেষ্টা করে এ পাশে ফিরলাম। কিন্তু এ কি! বীথি কই!

ঘুমের রেশ কেটে গেল। এ পাশে ফিরে দেখি, সকলেই ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে—কেবল বীথি নেই। এখুনি হয়তো ফিরে আসবে ভেবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু না, সে এল না।

এবার ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম,

নুমানই ঠিক। বারান্দার এক কোণে, যেখান আকাশের অনেকখানি দেখা যায় সেখানে রলিঙে ভর দিয়ে—যেন আকাশের তারা গণনায় ভঙ্গীতে বীথি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতের ওপর ভর রেখে বীথি এতই আত্মনিমগ্ন ছিল যে, উপস্থিতি সে টের পেল না।

খানি চুপ করে থেকে ডাকলাম, বীথি!

ক উঠল সে। পরক্ষণেই সোজা হয়ে আমার রে দাঁড়াল: আপনি!

ভেঙে তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে-। ভেবেছিলাম—

মাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, ভেবেছিলেন বুঝি রও পালিয়ে গেছি!—হাসল সে। বিষণ্ণ স: তা কেন হবে! আমার তো কোন অপছন্দ !

বলব ভেবে না পেয়ে কতকটা অপরাধীর মত নত-দাঁড়িয়ে রইলাম। সত্যিই তো, অনুপমকে অপছন্দ কিছু নেই! সুতরাং বাসরঘরে বীথির অনুপস্থিতি মনে আর যে সন্দেহই আসুক, আমার কথা ভাবতে ানে আসে নি, এটা ঠিক। মুখ ফুটে বললাম, ঠিকই তুমি।

কান্টা ঠিক?—বীথি আমার দিকে তাকাল।

মি সুখী হয়েছ, এর চেয়ে আনন্দের কী থাকতে ।

থি এবার খুব আস্তে অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়স্বরে ভুল বুঝেছেন আপনি। আপনার অনুমান ঠিক ।

কন!—এবার আমার বিস্মিত হবার পালা।

না না!—বীথির মুখ থেকে এই একটি মাত্র কথার বৃত্তি হল মাত্র। তারপর সে মাথা নীচু করল। ল, এক মানসিক যন্ত্রণা চাপবার জন্যে সে কঠিনভাবে ক ব্যাপৃত রেখেছে।

বীথির সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে তার মুখের দিকে কখনও তাকাই নি। আজ এই মুহূর্তে আমার দু চোখ জলে ভরে এল। কেন আমি কুৎসিত হয়ে জন্মেছিলাম! সেই সঙ্গে অন্ধ হলাম না কেন! তা হলে আজ জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজের কুরূপের কথা ভেবে এত কষ্ট পেতাম না।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই নতমুখী সুন্দরীর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম। তারপর কি যেন একটা মোহে, কি যেন আকর্ষণের বশে তার হাত ধরলাম: বীথি!

কিন্তু আর কিছু বলবার আগে সে আমার হাত দুখানা শক্ত করে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রইল। অতি ভয়ঙ্কর দুর্দিনে নারী যেমন তার একান্ত আপনজনকে আঁকড়ে ধরে থাকে, নিজে বাঁচবার এবং সেই আপনজনকে বাঁচাবার যে মনটি তার জেগে ওঠে—ঠিক তেমনি করে। বোধ হয় তেমনি মন নিয়েই বীথি আমার হাত দুটিকে শক্ত নিবিড় করে ধরে রাখল। মনে হল, এ হাত বোধ হয় জীবনে সে ছাড়িয়ে নেবে না।

তবে সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে আমার হাত ছেড়ে দিল। তাড়াতাড়ি চলে গেল বাসরঘরের দিকে।

বিস্ময় ব্যথা আর আনন্দভরা মন নিয়ে আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম।

এভাবে হয়তো আরও কিছুক্ষণ কেটে যেত। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়তে মন স্থির করে ফেললাম। এবার আমাকে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, এখুনি—এই মুহূর্তে। না হলে সকালে উঠে এই বীথিই হয়তো আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে। নিজের দুর্বলতার কথা ভেবে ধিক্কার দেবে নিজেকেই। তার থেকে এই ভাল।

কাউকে না জানিয়ে সকলের অলক্ষ্যে দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

পৃথিবীতে তখন সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু হয়েছে।

ডেস্ট্রাক্‌টিভ এলিমেণ্ট

পল্লব সেনগুপ্ত

ফাল্গুন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত মিহির আচার্য, আমার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ডেস্ট্রাকৃটিভ এলিমেণ্ট' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

'ডেস্ট্রাক্‌টিভ এলিমেণ্ট' বলতে স্পেণ্ডার সাহেব কি বলতে চেয়েছেন, তা আমার প্রবন্ধের (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬৬) প্রথম অনুচ্ছেদেই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে "কোনও বামপন্থী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দলে"র সম্পর্ক নেই এ বিষয় বইটি একটু কষ্ট করে পড়লেই প্রতীয়মান হবে। দ্বিতীয়তঃ, মিহিরবাবু কয়েকটি 'ফ্রেজ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন তাদের অর্থ কী? যথা, 'নিহিলিজম,' 'আত্মঅবক্ষয়' ইত্যাদি। তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কথা দুটি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিহিলিজম' কথার একটা অর্থ অভিধানে বলে, 'A doctrine that denies religion, moral principles and social obligations'; এবং 'অবক্ষয়' কথাটি 'অব' এবং 'ক্ষয়' এই দুটি শব্দের সমাহারে নিষ্পন্ন। 'অব'র আভিধানিক অর্থ: ন্যূনতা, নিম্নতা, অনাদর, ব্যাপ্তি, বিয়োগ ইত্যাদি-সূচক উপসর্গ আর 'ক্ষয়' অর্থে: হ্রাস, অন্ত, অবসান ইত্যাদি। সুতরাং 'অবক্ষয়' অর্থ ব্যাপ্তিসূচক হ্রাস। 'আত্মঅবক্ষয়' কথার অর্থ: নিজের বিরাট লোকসান করা।

মজার কথা এই যে, আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি আমাকেই সমর্থন করেছেন। যেমন, ফাস্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য ছিল, "সারাজীবন সর্বহারা মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করলেন বটে মানুষের সত্যিকারের অধিকারের অনবদ্য ইতিহাস— কিন্তু প্রতিভার সায়াহ্নে এসে সারাজীবনের বিশ্বস্ত শুভবুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলে নিজের সৃষ্টিকেই প্রকারান্তরে জানালেন অস্বীকৃতি। রাজনীতির ছুরি দিয়ে প্রতিভার এই আত্মহত্যা একান্তই দুঃখের।" এর সমালোচনা করতে গিয়ে মিহিরবাবু লিখছেন—"শুধু আমেরিকায় নয়, এ যুগে সত্যিকার ঐতিহাসিক উপন্যাস যদি কেউ লিখে থাকেন তিনি হাওয়ার্ড ফাস্ট। তাঁর 'ফ্রিডম রোড' থেকে শুরু করে শেষতম (!) উপন্যাস "স্পার্টাকাস' পর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের জয়গানে সোচ্চার। নাকি শ্রীসেনগুপ্ত ঔপন্যাসিক ফাস্টকে ছেড়ে তাঁর কম্যুনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ-জনিত রাজনীতির কথা বলতে চেয়েছেন! রাজনীতি সর্বথা ঔপন্যাসিক সততা বিচারের মানদণ্ড নয়।" বর্তমান লেখকের সম্পর্কে মন্তব্যটুকু ছাড়া দুটি উদ্ধৃতির বক্তব্য হুবহু এক নয় কি? 'ফ্রিডম রোড' থেকে 'স্পার্টাকাস' তো বটেই, এমন কি 'দি স্টোরি অফ লোলাগ্রে' পর্যন্ত যে "সংগ্রামী মানুষের জয়গান"—এ কথা তো মূল প্রবন্ধে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে। তা হলে আমার বক্তব্যের সঙ্গে মিহিরবাবুর বিরোধ কোথায়?

"রাজনীতি সর্বথা ঔপন্যাসিক সততা বিচারের মানদণ্ড নয়" এ কথা ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে 'পামেলা' বা 'স্বর্ণলতা'র ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে বটে, কিন্তু 'ফ্রিডম্ রোড' বা 'দি নেকেড গড্'-এর লেখকের পক্ষে সে কথা প্রযোজ্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা মিহিরবাবু অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি ফাস্টকে 'পলায়নবাদী' বলেছি। ওই মন্তব্যটি আমি ফাস্ট সম্পর্কে করি নি, করেছি পাস্তেরনাক সম্পর্কে। এবং পাস্তেরনাক সম্পর্কে ওই অভিমত এখনও আমার কাছে স্বপ্রতিষ্ঠ। 'ডক্টর ঝিভাগো' সম্বন্ধে মিহিরবাবুর নিজের বক্তব্য "নিছক সাবজেকটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। কবিকল্পনার আরকে জারানো।··· নেহাতই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিপ্রসূত।" অর্থাৎ এর মধ্যে উপন্যাসসুলভ বাস্তবতা এবং প্রগতিশীল

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
Rexona
BLENDED WITH CADYL

চিন্তাধারার অভাব। 'পলায়নবাদ' আর কাকে বলে? মিহিরবাবুকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি বইটি আর একবার পড়তে।

হেমিংওয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও মিহিরবাবু আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করার নামে তাকে স্বীকারই করে বসেছেন প্রকারান্তরে! আমি লিখেছিলাম, "হেমিংওয়ে তাঁর শেষ বইয়ের সমাপ্তির মুহূর্তে যদিও মানুষের স্বপ্রতিষ্ঠার বিজয় ঘোষণা করেছেন সানন্দ আবহের মধ্যে…" আর মিহিরবাবু লিখছেন, "'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' এই লেখকেরই সৃষ্টিকর্ম—বিশ শতকে যা অতুলনীয় শিল্পকর্ম বলে অভিনন্দিত হয়েছে।" মনে হয় না, এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের মূল কথার সঙ্গে মিহিরবাবুর বক্তব্যের আসমান জমিন ফারাক।

তিনি আরও লিখছেন—"…আমরা ড্রয়িংরুমে বসেই আলোচনা করি, কিন্তু কখনও কাউকে হেমিংওয়ের 'ভালগারিটি' এবং 'ক্রটালিটি' আবিষ্কার করতে শুনি নি।" বেশ কথা। এ ছাড়াও হেমিংওয়ের লেখায় একই সঙ্গে 'ম্যাসকুলিন ভালগারিটি' এবং জীবনদর্শন খুঁজে পাওয়ায় তাঁর মতে, এ প্রসঙ্গে আমার ধারণা অপরিষ্কার। সম্ভবতঃ মিহিরবাবু 'ম্যাসকুলিন ভালগারিটি' কথাটি বুঝতে না পেরেই এই উক্তি করেছেন। যেখানে হেমিংওয়ে নায়ক-নায়িকার অনাবরণ সন্তরণের বর্ণনা করছেন এবং তারপর তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলিকে চিত্রিত করছেন অসংকোচ দ্বিধাহীনতার সঙ্গে, সেখানে 'ভালগারিটি'র বলিষ্ঠতা পাঠককে বিমূঢ় করে তোলে। এই বলিষ্ঠ 'ভালগারিটি' বা 'ম্যাসকুলিন ভালগারিটি'র সঙ্গে উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শনের কোন বিরোধিতা আছে বলেও স্বীকার করা যায় না। এখানে মিহিরবাবু কোন যুক্তি দেখান নি। সুতরাং তাঁর উক্তি আমরা মানতে অপারগ।

হেমিংওয়ের 'ক্রটালিটি' সম্পর্কেও মিহিরবাবু সংশয় প্রকাশ করেছেন। সংশয় নিরসনের জন্য তাঁকে 'টু-হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট'-এর একটা দৃশ্য স্মরণ করতে বলি। যেখানে নায়িকা টেবিলের কানায় বুক রেখে নতমুখে দাঁড়িয়ে নায়কের ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল সেখানে একটি নিতান্ত জান্তব (ক্রট) ব্যাপারকে হেমিংওয়ে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন। এ রকম সাবজেক্টিভ ইঙ্গিতের ফলে বর্ণনাটা ভালগার হয় নি বটে, কিন্তু এর মূল জান্তবতা বুদ্ধিমান পাঠকের চোখ এড়ায় না। হেমিংওয়ের লেখায় 'বুলফাইটে'র বর্ণনা নিশ্চয়ই মিহিরবাবু দেখেছেন। এই পশুর যুদ্ধ—প্রতীক মাত্র; মানুষের অবলীন পশুশক্তির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ। এখানেই 'ক্রটালিটি' সম্পর্কে হেমিংওয়ের চিন্তাধারার পরিচয় পাই।

হেমিংওয়ে সম্পর্কে এখনই মূল্যায়ন শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর শেষ বইয়ে সুস্পষ্ট বৈচিত্র্য এসেছে। সেক্ষেত্রে 'ক্রটালিটি' এবং 'ভালগারিটি'র উল্লেখ করাতে মিহিরবাবু এ রকম খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন কেন সেটাও বুঝলাম না। তাঁর নিজের কথাতেই "লেখক পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার তাগিদে তাঁর সমস্ত আলোচনাকে একটি ছকে ফেলে বাঁধাধরা বুলি আওড়েছেন।" সম্ভবতঃ, মিহিরবাবু হেমিংওয়ের লেখাকে আগে থেকেই সুসমাচারের মত পবিত্র ধরে নেওয়ার ফলে তাঁর মন্দ দিকটাকে আলোচিত হতে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

হেমিংওয়ে সম্পর্কে আমার আপত্তি হল এই—"তাঁর কাছে আমরা যা পেয়েছি তাতে হতাশা গ্লানি এবং মৃত্যুর আচ্ছন্নতায় জর্জর মানুষের ছবিই বেশী।" এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর লেখার মধ্যে মানুষের উজ্জ্বল রূপটি একেবারে গরহাজির। তবে সেটার পরিমাণ কম, মৃত্যু এবং বাধা অতিক্রম না করতে পারার হতাশাই বেশী—এটুকুই আমার বক্তব্য। এমন কি 'ফর হুম দি বেল টোলস'-এর দুরন্ত আশাবাদী নায়ক জর্ডান, যার ধারণা স্পেনের ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে জিতলে সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক শক্তির জয় হবে, সে পর্যন্ত 'ডেস্পারেট' হয়ে পুল ভাঙতে গিয়ে মরতে বাধ্য হল। হেমিংওয়ের লেখায় দেখি, যুদ্ধের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ এবং হতাশ হয়ে সৈনিক নিজেকে প্রশ্ন করছে যে, বিরুদ্ধপক্ষের সৈনিকের সঙ্গে তার শত্রুতা কোথায়? আহত-দেহ ও

ন মানুষের মুখে এই মর্মান্তিক প্রশ্ন হেমিংওয়ের । 'দি সান্ অলসো রাইজেস'-এ দেখি যুদ্ধের র ফলে হৃত-পৌরুষ সৈনিকের নিষ্ফল মাথাকোটা। াওয়ার টাইম'-এ কম করে অন্ততঃ চার-পাঁচবার াবং মৃত্যুর বাধা অতিক্রম না করতে পারার হতাশ আছে। আড্রিআনোপল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখনকার চিত্রটি একবার স্মরণ করতে র করছি মিহিরবাবুকে—যেখানে অবিশ্রাম শু আর নারীর ক্রন্দন এবং কাদার মধ্যে গরু গাড়ি-ঠেলাঠেলি আর যুবাবৃদ্ধনির্বিশেষে হা-

মল কথা, নিজের যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকেই ওয়ের লেখায় হতাশা ও ভীতির প্রভাব এতটা জন ডনের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে হেমিংওয়ে —"Any man's death diminishes me, se I am involved in mankind." এ যুগের র মধ্যে হেমিংওয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন বর্বর আদিম মৃত্যুভীতি। 'স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো' তো নুষের ডাকিনী-বিদ্যা এবং প্রকৃতির মধ্যে মৃত্যু-র পদধ্বনি যে আবহের সৃষ্টি করেছে সেই আবহ নকে ঘিরে রেখেছিল—অন্ততঃ 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড র আগে পর্যন্ত।

াম্যু সম্পর্কে আমার অভিমত পালটাবার কোনও দেখলাম না। মিহিরবাবু 'আউটসাইডার' াসের উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখছেন— ার পূর্বমুহূর্তে কিন্তু যুবকটি বেঁচে থাকার মানে খুঁজে ছিল, আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে ছিল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। এই নীর মধ্যে শ্রী সেনগুপ্ত কি হতাশা খুঁজে পাবেন।" ।। 'জীবনের মানে' যে খুঁজে পেয়েছে তাকে মরতে , এর চেয়ে বড় হতাশা কি হতে পারে?

মিহিরবাবু কামুর 'দি মিথ্ অফ সিসিফাস' ছেন কিনা জানি না। গ্রীক পুরাণের অভিশপ্ত সিসিফাসের কাহিনীর ইঙ্গিতে কামু এখানে বলতে চেয়েছেন, মানুষ অবিরত চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়। এও কি চরম হতাশার চিত্র নয়?

সার্ত্র সম্পর্কে আমার আলোচনার বিরুদ্ধে মিহিরবাবু অভিযোগ করেছেন—"সার্ত্র সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ এ দেশে কিংবদন্তী মাত্র।" সার্ত্র সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ শুধু এদেশ নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। যাই হোক, মিহিরবাবু আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'নেক্রাসভ' এবং 'দি ওয়াল' পড়ে দেখতে। তাঁর উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখানেও মিহিরবাবু আমার বিরুদ্ধে কি বক্তব্য রাখতে চাইছেন বুঝলাম না। কারণ 'নেক্রাসভ' সাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে লেখা সার্থক স্যাটায়ার হলেও তাকে সার্ত্রর জীবনদর্শনের পরিচায়ক বলা যায় না।

সার্ত্র-প্রমুখ লেখকদের সম্পর্কে আমি বলেছিলাম— "এঁদের লেখনীর মুন্সিয়ানা, প্লটের গভীরতা, শিল্পী-জনোচিত সূক্ষ্ম তুলির টান এ সবই অনস্বীকার্য। কিন্তু এর সবটাই নষ্ট হল স্থূল দেহবিলাসের সরস বর্ণনায়।" এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও আমার অবশ্যই লেখা উচিত ছিল যে হতাশার জীবনদর্শন প্রচারের দায়ে এঁরা কম দায়ী নন।

যাই হোক, সার্ত্রর জীবনদর্শনের সার্থক পরিচায়ক বলে স্বীকৃত 'নজিয়া' কি 'ডার্টি হ্যাণ্ড' কিংবা সাম্প্রতিক-কালে প্রকাশিত 'এজ অফ রিজন', 'দি রিপ্রাইভ', 'আয়রন ইন দি সোল' প্রভৃতি উপন্যাসে অশ্লীলতা এবং অশোভন বর্ণনার পরিমাণ প্রচুর। 'দি ওয়ালে' দেহ-বাসনার উন্মত্ততা নেই বটে, তবে পঙ্গু-জীবনের ব্যর্থতার হাহাকারে গল্পটির প্রাণধর্ম নিষ্পিষ্ট। 'দি ওয়াল' যে সংকলনে গ্রথিত হয়েছে, সেই 'ইনটিমেসি অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজে'রই বেশ কয়েকটি গল্প চরম অশালীন এবং বিকৃত রুচিসম্পন্ন। গল্পগুলির নাম করা অপ্রয়োজনীয় এখানে— বইটি পড়লেই বোঝা যাবে আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য।

সার্ত্রর লেখায় চরিত্রগুলির মধ্যে সমস্যা এবং জটিলতার সম্মুখীন হবার মত দৃঢ়তা এবং সাহস নেই। তাঁর 'ট্রিলজি নভেল', 'রোড টু-ফ্রিডমে' দেখি মার্সালকে

ছেড়ে ম্যাথ্ পালাচ্ছে, লোলাকে ছেড়ে বরিশ পালাচ্ছে, সারাকে ছেড়ে গোমেজ পালাচ্ছে—জীবনযুদ্ধে লড়বার তাদের হিম্মত নেই। এ সব জায়গায় সার্ত্র মানুষের ক্লীব রূপকে চিত্রিত করেছেন আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নীতি এবং রুচিবিগর্হিত কাজ ও ঘটনার সরস ব্যাখ্যান করেছেন। লেখক হিসেবে সার্ত্রের সমস্ত গুণ আমার প্রবন্ধে আমি স্বীকার করেছি। কিন্তু সেই স্বীকৃতির পরে যদি এইসব কথার সারমর্ম উল্লেখ করে তাঁর লেখার মূল্যায়ন করতে চাই তা হলে কি সেটা 'অর্ধসত্য'? নিশ্চয়ই নয়। সেটাই পরিপূর্ণ ভাবে বিচার করা।

মোরাভিয়া সম্পর্কে মিহিরবাবু আমার বক্তব্য অংশতঃ মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি 'দি কনফরমিস্ট' এবং 'কনজুগাল লাভে'র উল্লেখ করেছেন। 'দি কনফরমিস্ট'-এর নায়ক-নায়িকার ট্রেনে মিলন দৃশ্যটি স্মরণ করতে অনুরোধ করছি তাঁকে, সেটি কোনও মাপকাঠিতেই শালীন নয়। 'কনজুগাল লাভে'র ব্যাপারে মিহিরবাবুর সঙ্গে একমত হতে পেরে খুশী হয়েছি। ক্যাল্‌ডয়েল সম্পর্কে তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন। সেজন্য ধন্যবাদ।

সার্গ এবং নবোকভ সম্পর্কে মিহিরবাবু লিখছেন—"সার্গ কি নবোকভ উঁচুদরের সাহিত্যিক নন। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিভার সে খবর আমাদের কানে পৌঁছয় নি। সার্গের নাম যতটা তাঁর রচনায় নয়, তার চেয়ে বেশী তাঁর বয়সের বিজ্ঞাপনে। নবোকভের 'ললিতা' ব্যবসায়িক ভাষায় shocking মাত্র।" দোষটা কানকে দেব না, দেব সেই 'ড্রয়িং-রুম'কে যেখানে সাহিত্য আলোচনার বদলে মহিলা সাহিত্যিকের বয়সের গবেষণা হয় এবং যদি বা সাহিত্যের আলোচনা হয়, তা হলে সেটা ব্যবসায়ের 'টার্ম' অনুযায়ী হয়। যে লেখকের সম্পর্কে আমি দুটো-একটা কথা বলার চেষ্টা করেছি, তাঁদের সকলের সম্পর্কে আমি "উঁচুদরের সাহিত্যিক" কথাটা বলি নি। সাধারণ ভাবে এঁদের সকলের সম্পর্কে আমার উক্তিটি হচ্ছে "পৃথিবী জোড়া নামডাকওয়ালা"—অর্থাৎ জনপ্রিয়। এবং এঁদের সম্পর্কে আমার আর একটি মন্তব্য—"তাঁদের সকলেরই কলমের জোর অতুলনীয়।" এটাও কি অস্বীকার করেন মিহিরবাবু যে সার্গ এবং নবোকভের আর কিছু না থাক্ অন্ততঃ কলমের জোর ও জনপ্রিয়তা সত্যিই বিস্ময়কর।

ব্যবসার 'টার্মে'র উল্লেখ করেছেন মিহিরবাবু। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই সবিনয়ে একটা কথা নিবেদন করি, 'বঁজুর ত্রিয়েতি', 'সার্টেন স্মাইল', 'ললিতা' প্রভৃতি বইগুলোর আজ পর্যন্ত যতগুলো সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে তাতে লেখকের প্রতিভার বিচার না হলেও জনপ্রিয়তার বিচার হয়। এবং 'জনপ্রিয়তা' ও 'নামডাক' বোধ হয় পরস্পর-বিরোধী নয়।

* * * *

তথ্যগত আলোচনার পর মিহিরবাবুর লেখার তত্ত্বগত দিকটির সঙ্গেও একমত হতে পারলুম না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যখন নতুন করে সব কিছু গড়ে তোলা হচ্ছে এবং যখন বহু "অসম্ভব" মানুষের কাছে সম্ভব হয়ে উঠছে তখন সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের লেখায় প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়প্রবণতা কেন—এইটেই ছিল আমার প্রশ্ন। এর অর্থ এই নয় যে জীবনের দূষিত গলিত দিকটার প্রতি চোখ বুজে তাকে অস্বীকার করা হোক এবং রোমান্টিক ভাবরসে বুঁদ হয়ে ইউটোপিয়ার কল্পনা করা হোক। এর অর্থ এই যে জীবনের পঙ্কিল এবং ব্যর্থ দিকটার অস্তিত্ব মেনে নিলাম ঠিকই, কিন্তু সেই দিকটাকে শান্তি এবং সমৃদ্ধির সুস্থতায় কেন নিয়ে আসা হবে না? আশাহত দুঃস্থ মানুষের চিত্রই কি শুধু আঁকা হবে আর সুখী এবং সুস্থ জীবনযাপনকারী মানুষের ছবি আঁকা হবে না? মিহিরবাবু বলছেন—"যে সব সাহসিক লেখক এই পুরনো পৃথিবীর শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করার মহৎ কার্যে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যকে ঘৃণা করা ঠিক নয়।" যে সমস্ত সাহিত্যিকের উল্লেখ আমি করেছি, একমাত্র হেমিংওয়ে কিছুটা পরিমাণে ছাড়া তাঁদের কেউই সে কাজে ব্রতী হন নি। আর তা হন নি বলেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ।

যুগসঞ্চিত গ্লানিকে ভেঙে ফেলার পরেই নতুন কিছু গড়ে তোলা যায়। ভাঙার কাজ শেষ করে গড়ার কাজে

গোন নি আর তাই এঁরা 'ডেস্ট্রাক্টিভ এলিমেণ্ট'। াবুকে আমাদের জিজ্ঞাস্য, এঁদের লেখা থেকে কী ক্টিভ সাজেসন্' পেয়েছেন তিনি, যার ফলে এঁদের । অগ্রদূত বলে ভাবছেন ?

াবীতে একদিকে যখন নতুন করে সবকিছু গড়ে তখনও এঁরা ভাঙার কান্না কাঁদছেন—এজন্যই প্রতিভা অপচিত। এটা 'ভ্রম' নয়—এটাকে 'ভ্রম' ই ভ্রান্তিবিলাস।

হিরবাবুর আর একটি বক্তব্যও খুব আপত্তিকর। লখছেন—"গোষ্ঠী বেঁধে সাহিত্যের আসর জমানো ।। সাহিত্যিকের গোষ্ঠী নেই। তিনি একক, ।" সে কি কথা! পাশ্চাত্যে ডক্টর জনসনের গোষ্ঠী থেকে শুরু করে হাল-আমলের রিয়ান-গোষ্ঠী পর্যন্ত এবং এদেশে 'সংবাদ প্রভাকর'-'বঙ্গদর্শন'-গোষ্ঠী, থেকে আরম্ভ করে 'ভারতী'-া' - 'শনিবারের চিঠি'-'কল্লোল' - 'পরিচয়' হয়ে ন 'কৃত্তিবাস' ও 'কবিতা'গোষ্ঠী পর্যন্ত যে-কোনও শীল সাহিত্য-আন্দোলনই গোষ্ঠীগতভাবে হয়েছে। ক আলোচ্য লেখকদের মধ্যেও সার্ত্র-কামুর স্টন-সিয়ালিস্ট'-গোষ্ঠী কিংবা ফাস্টের 'মেনস্ট্রিম'-র কথা মিহিরবাবু কী করে ভুলে গেলেন সেইটিই া!

িহিরবাবুর লেখায় কয়েকটি তথ্যগত ভ্রান্তিও নজরে ৷। তিনি 'লঘুপক্ষ মোটরকার' বলে একরকম সের উল্লেখ করেছেন—ঠিক বুঝলাম না কি বস্তু । কারণ আমরা সচরাচর যেসব মোটরকার দেখে , লঘু-গুরু কোনও রকম পাখাই তাদের গায়ে না!

স্পার্টাকাস'কে হাওয়ার্ড ফাস্টের শেষতম উপন্যাস ছুন মিহিরবাবু। বেদনার কথা। এই উপন্যাসের পর বেরিয়েছে, 'দি স্টোরি অফ লোলাগ্রে, তারপর 'দি নেকেড গড', তারও পরে 'মোজেস'।

আর একটা কথা। এক নিঃশ্বাসে সার্গ প্রভৃতি এবং হেমিংওয়ে প্রভৃতির নাম করায় মিহিরবাবু বুদ্ধিহীন বলে তিরস্কৃত করেছেন আমাকে। এ ছাড়া Phrase-mongeringএর জন্যও তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু একটা বিনীত নিবেদন যে, নিজে কাঁচের ঘরে থেকে অন্যের গায়ে ঢিল ছোড়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। গতিবেগের যুগ বোঝাতে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে স্পুটনিকের পরেই স্কুটার এবং তার পরেই এরোপ্লেনের উল্লেখ করাটা সুসমঞ্জস কিনা মিহিরবাবুই বিচার করুন। আর ফ্রেজ ? মিহির-বাবুর লেখা থেকে মোটামুটি এইকটি ফ্রেজ সংগ্রহ করলাম :

ভিক্টোরিয়ান ভাবরস, লঘুপক্ষ মোটরকার, মেকানিক্যাল রিয়ালিজম, ঔপন্যাসিক সততা, জয়গানে সোচ্চার, ভয়ঙ্কর বয়ঃসন্ধির জটিলতায় জর্জর।

সবশেষে একটা কথা, মিহিরবাবু লিখছেন—"রাজনীতি আমার আলোচনার বিষয় নয়।" হবে হয়তো। কিন্তু তিনি সাহিত্য আলোচনা করতে এসে, সম্পূর্ণ অকারণে "কোনও বামপন্থী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল" সম্পর্কে যে ভাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অবাঞ্ছনীয় মন্তব্য করলেন তাতে তাঁর এই উক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই ধরনের প্রবণতাকেই ঠাট্টা করে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন :

বল্ দেখি কেন হল না বৃষ্টি ?
তার পেছনেও কমিউনিষ্টি !!

মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এই লেখকের 'ডেস্ট্রাক্টিভ এলিমেণ্ট' প্রবন্ধের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত মিহির আচার্য-কৃত আলোচনার উত্তরে লেখকের জবাব।

অশান্ত প্রভাত

কুমুদ ভট্টাচার্য

যতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকো, ততক্ষণ বেঁচে আছ তুমি,
যতক্ষণ নেশায় বিভোর। নেশা গেলে তুমি নেই।
নেশা গেলে নিশান্ত তোমার। জাগরণ অশান্ত প্রভাতে,
যে-অশান্ত, আর কোনদিন, শান্তিকে জানে না।
তুমি যে নেশায় ভোর, মজা এই, তুমি সে জান না।
জান না, তাইতো বেঁচে আছ।
জেনো না, তাইতে বেঁচে যাবে।

জন্মকালে দুই ঠোঁটে কে ঢালে আসব।
ঘুম-ঘুম দুটি চোখে স্বপ্ন দেয় গুঁজে।
অনৃতকে অমৃত বানায়।
অন্যদিন
একই হাত, কী নিষ্ঠুর, তীক্ষ্ণ নখে তন্দ্রা নেয় ছিঁড়ে।
বুক ছিঁড়ে নেশা কেড়ে নেয়।
আনে
নিদারুণ নিশান্ত-প্রভাত
অতলান্ত মহা-জাগরণে।

সুভগ, তোমার ভাগ্যে সে-প্রভাত কভু না আসুক।

কামনা

তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আকাশে জমেছে মেঘ ঝড় ওঠে কালবোশেখীর
হৃদয়ে সে ঝড় ওঠে এ জীবনে আঁধার নিবিড়,
তোমার গানের কলি গুণগুণ করে তবু মন
স্মৃতির অমৃতস্পর্শে সে বেদনা ভুলি কিছুক্ষণ।
তুমি দূরে আমি আজ হারানু সুদূরে
নীড়হারা পাখিসম সমস্ত আকাশময় ঘুরে
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি দেশে দেশে নগরে নগরে
আমারে ভুলেছ তুমি কান্না তার হৃদয়সাগরে।

তোমার সুনীল আঁখি মগ্ন কার চিন্তায় বিহ্বল
উদাসী হাওয়ার গানে বারেবারে চোখে আনে জল,
সারারাত ঝড় নিয়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতের প্রহরে
স্বপ্ন কাঁদে, ফুল ঝরে, বৃষ্টি পড়ে সারারাত ধরে।

ফাগুন সে বহুদিন বিদায়ের গান গেয়ে হায়
নিরাশায় ফিরে গেল—মন তার কোন যন্ত্রণায়
নীল হল জানি নাকো—অকৃপণ মনের বাসনা
উদ্বেল উথলি ওঠে জীবনের অনন্ত কামনা।

তবুও

শান্তশীল দাশ

কেন যে বসে আছি, কিসের আশা নিয়ে :
তবুও বসে আছি, তবুও বসে আছি।
কী চাই কার কাছে ; কারো কি কথা আছে
এখানে আসবার, আমার এ নির্জনে ?
সে কথা জানি নাতো, কাকেও ডাকি নি তো :
তবুও বসে আছি, তবুও বসে আছি।

অজানা কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে,
অবাক করে দিয়ে ডাকে সে নাম ধরে :
তবে তো বেশ হয়, তবে তো বেশ হয়।
মুখের পানে তার অবাক হয়ে চাই,
সে আসে কাছে, সাড়া দিতেই ভুলে যাই ;
দুজনে মুখোমুখি যদিও চেনা নাই :
তবে তো বেশ হয়, তবে তো বেশ হয়।

এমন হয় না কি ? এ শুধু কল্পনা,
অলস মগজের খেয়ালী জাল বোনা।
কেউ তো আসবে না, কেউ তো ডাকবে না,
দিনের পরে দিন শুধুই দিন গোনা ;
জানি তো পথ-চাওয়া শুধুই অকারণ :
তবুও বসে আছি।
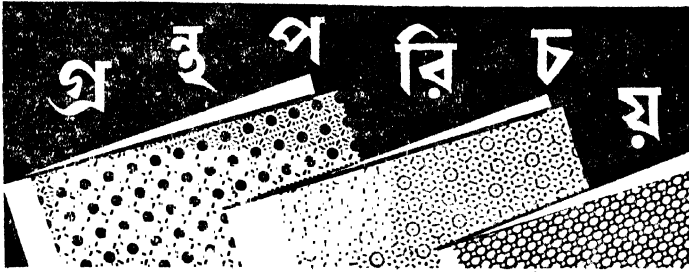
প্রাচীন মিশর : শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, াতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'প্রাচীন ' নামে মিশর দেশের একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা । বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। র গ্রন্থখানি কেবল শুষ্ক তথ্যপঞ্জী বা ইতিহাসের সন-যুক্ত বহিরঙ্গ ঘটনার বিবৃতি মাত্র নহে। গ্রন্থকার ন মিশরীয় মনোভাব, ধর্মচেতনা ও শিল্পপ্রেরণার । মর্মমূলে প্রবেশ করিয়াছেন ও পৃথিবীর একটি নতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অন্তরঙ্গ য়ও দিয়াছেন। মিশরের বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-নর সঙ্গে সঙ্গে উহার মনোজগতে যে সমস্ত পরিবর্তন ।ছিল, উহার ধর্মবোধ ও জীবনদর্শন যে ভাবে ত্তিত হইয়াছিল, উহার শিল্পবোধ ও স্থাপত্যকল্পনা যে াত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা গ্রন্থকার এক কথায় র অন্তর্জগতের সামগ্রিক ইতিহাসটি—অতি চিত্তা-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বল্পপরিসর দুইশত র একখানি গ্রন্থে এক সুপ্রাচীন, বর্তমান শিক্ষিত জের প্রায় অপরিচিত জাতির ভিতর-বাহিরের এমন চয় দেওয়া সাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। তিন ার বৎসরের একটি জীবনকাহিনীর সারনির্যাস এই টির ক্ষুদ্র আধারে রক্ষিত হইয়াছে। শচীনবাবুর া কবিত্বময় ও প্রাঞ্জল, শুষ্ক তথ্যসঞ্চয়কে ইহা প্রাণরসে াবিত করিয়াছে, কঙ্কালস্তূপের অভ্যন্তরের জীবনস্পন্দন । আমাদের গোচর করিয়াছে। এমন একটি উপাদেয় রচনার জন্য ও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস-শাখার টি প্রকাণ্ড ফাঁক পূরণ করার জন্য শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষার প্রতিটি অনুরাগী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমি এই গ্রন্থটির বহুল প্রসারের কামনা করি।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ গড়ার কারিগর : মনোজ বসু। বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

সাম্প্রতিককালে শ্রীযুত মনোজ বসু মহাশয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য আনিবার সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার 'মানুষ গড়ার কারিগর' এই ক্ষেত্রে অধুনাতম দান। একটি শিক্ষক-জীবনের ব্যর্থতার করুণ কাহিনী লইয়া লিখিত এই উপন্যাসখানি। আশেপাশে জড়িত আছে আরও কয়েকটি শিক্ষক-জীবন, বর্তমান-কালের বিদ্যালয়গুলির পরিবেশ—আর সেই পরিবেশ-মণ্ডলে ঘূর্ণ্যমান কিছু কিছু দুষ্ট গ্রহ।

ব্যর্থ শিক্ষক-জীবনের কাহিনী আজকের বাংলাদেশে এমন একটা কিছু অভিনব কাহিনী নয়, এ তো প্রায় এ যুগের নিত্যকারের বর্ণবৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে পাঁচালী। কিন্তু যে কৌশলে সেই পুরাতন পাঁচালী লেখক নূতন করিয়া দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য এবং মন্তব্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা শুধু প্রশংসার্হ নয়, শ্রদ্ধার্হ। ইহাকে ঠিক একটা কলা-কৌশল বলিব না এইজন্য যে, সচেতন প্রয়াসই এখানে বড় হইয়া ওঠে নাই, বড় হইয়া উঠিয়াছে যুগ-জীবনের প্রতি একটি গভীর সংবেদনশীল মনের বেদনাময় দৃষ্টিপাত। শিক্ষকের পরিচয়ে 'মানুষ গড়ার কারিগর' কথাটির মধ্যেই সেই দৃষ্টিপাতের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। ইহা ব্যক্তিজীবনের করুণকাহিনী নয়, ব্যক্তি এখানে সমাজ-

জীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতীক; সেই বিশেষ দিকটিও হইল একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক—সমস্ত ভবিষ্যজাতির বনিয়াদ প্রস্তুত করিয়া দিবার দিক।

আলতাপোল গ্রামের ছেলে মহিম, মফস্বল শহর হইতেই বি. এ. পাস করিয়াছে সসম্মানে—অর্থাৎ অঙ্কে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া। যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যেও তাহার জীবন উচ্ছল, অজস্র আশা-আকাঙ্ক্ষায়ও উদ্দীপ্ত। আশ্রয় গ্রহণ করিল দূর-আত্মীয় সাতু ঘোষকে, কলিকাতায় তাহার কাঠের ব্যবসা—ঢুকিয়া পড়িল সেই কাঠের ব্যবসাতেই, টাকার যে সমূহ দরকার। কিন্তু ব্যবসায়ে অসাধুতা, নীচতা—চারিদিকে একটা মন-ছোট-করিয়া দেওয়া 'বাতাবরণ'; ভিতর হইতে 'চাগা' দিয়া ওঠে আদর্শবাদের ভূত, মহিম ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়িয়া ঢুকিয়া পড়ে কলিকাতার একটি বিদ্যালয়ে—মানুষ গড়িবার কারখানায়—সে মানুষ গড়িবার কারিগর হইয়া জীবনকে সার্থক মহিমা দান করিবে। তাহার পরে চলিল এই 'মানুষ গড়ার কারিগর'রূপে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম; সেই সংগ্রামের শেষে দীর্ঘদিনের শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতার পরে নিঃস্ব দরিদ্র, শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত মহিম মাস্টারকে যেদিন প্রথমভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয়ভাগ ধরা কনিষ্ঠপুত্র পুণ্যব্রতকে পড়াইতে বসিতে দেখি—এবং দেখি—'পড়াতে পড়াতে মহিম স্তব্ধ হলেন এক মুহূর্ত। বলেন, বানান করে পড়, মানে শিখে নে। কিন্তু বিশ্বাস করিস নে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা'—তখন গ্রন্থের ফলশ্রুতিতে নিজেদের চেতনার ঘনীভবনের মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ বিষণ্ণতা দেখিতে পাই—যে বিষণ্ণতা ব্যক্তিমনের পরিধিকে অতিক্রম করিয়া আস্তে আস্তে জাতীয়-জীবনের দিগ্‌বলয়ে ছড়াইয়া পড়ে। লেখক শিক্ষক-জীবনের যে ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা একটা আর্থিক ব্যর্থতা এবং তজ্জনিত সমাজজীবনে অপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা নয়—এ ব্যর্থতা আরও মারাত্মক এইজন্য যে ইহার ইঙ্গিত একটা ঘনায়মান সামগ্রিক ব্যর্থতার দিকে; শুধু শিক্ষক-জীবনের ব্যর্থতার দিকে নয়—আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতার দিকে—এক কথায় জাতির মধ্যে মানুষ গড়িয়া তুলিবার কাজে।

চারিদিকে কেন এই সামগ্রিক ব্যর্থতার দুর্লক্ষণ লেখক কোথাও তাহাকে শুধুমাত্র বিশ্লেষণমুখে দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি তো নিবন্ধকার নন। তিনি স্রষ্টা ঔপন্যাসিক—সুতরাং তিনি কেবল ছবি আঁকিয়াছেন, বিদ্যালয় এবং শিক্ষক-জীবনকে অবলম্বন করিয়া যত রকমের খুঁটিনাটি ছবি—একটি বৃহত্তর প্রবাহে গ্রথিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনা-সন্ততি। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনাকে প্রাণদান করিয়াছে লেখকের ব্যক্তিগত শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম জীবনের গভীর রেখায় বিধৃত অভিজ্ঞতা - আর পরিণত জীবনের সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্য এই উভয়ের বিরল-সমাবেশ ঘটনাগুলির রেখাঙ্কনকে এতটা সজীবতা দান করিয়াছে।

একটা কথা আপাত-সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে, লেখক তবে নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়িয়াছেন কি? এত ব্যর্থতার চিত্র হয়তো সেই সন্দেহ জাগ্রত করিয়া দিবার সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু জাতীয়-জীবনের ব্যর্থতা যেখানে লেখকের গভীর চিত্তালোড়নের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়—বেদনাচিত্র যেখানে ব্যঙ্গচিত্র নয়, সহানুভূতির অশ্রুবিন্দুর সাহায্যে যেখানে চিত্রের বর্ণ প্রস্তুত করা হয় সেখানে নৈরাশ্য ভবিষ্যৎ-আশার তীব্রাকাঙ্ক্ষারই বেদনা-ধূসর রূপান্তর। সুতরাং একদেশ-দর্শিতার বা অবাঞ্ছিতের অনুচিত বিস্তারের অভিযোগে লেখক দায়ী নহেন; চিত্তবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠারই ইহা একটি চিত্রে সমর্পিত ক্রন্দন; সে ক্রন্দন যে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কণে নিপুণ রূপায়ণ লাভ করিয়াছে, স্রষ্টা হিসাবে এইখানেই লেখকের কৃতিত্বের দাবি।

দুই কবি: শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। চার টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

'দুই কবি'-গ্রন্থে লেখক যে দুইজন কবির ভাবধারা ও কাব্যকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এই দুই বাঙালী মনীষা শুধু যে বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণাকেই প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নহে,

য় প্রভাব ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম বিশ্বজগতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লক্ষণীয় ইল এই যে, উভয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি ক-রূপে, আর শ্রীঅরবিন্দের প্রসিদ্ধি যোগিগুরু-রূপে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সর্বপ্রথমেই আমাদের এই সংস্কারটিকে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত করিয়া দার্শনিক এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে অনন্যতা এবং কবি-প্রতিভার দিক হইতে শ্রীঅরবিন্দের যে শক্তি—এই সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত ছেন—শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই, তথ্য ও যুক্তির সমাবেশে পাঠকের মনে তিনি এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই প্রাথমিক চনার ভিতরে লেখক উভয় প্রতিভার মৌলিক ও ক উপাদানসমূহ এবং এই উভয় প্রতিভার উন্মেষ শের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও আমাদের নিকট পিত করিয়াছেন। এই ইতিহাস ও বিশ্লেষণ কবির মানস-সংগঠন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদিগকে ত করিয়া তোলে। ইহার পরে লেখক অতি ব্যাপক এই দুই কবির কবিকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার পদ্ধতি দেখিলে বুঝা যায়, তিনি সত্যকার দ্রষ্টা ও স্রষ্টাকে কবি বলিয়াছেন। বেদে বলা হইয়াছে, 'কবি নৃচক্ষা'—মূর্খের ন্যায় ঊর্ধ্ব হইতে মানুষের জীবন যাঁহারা দেখেন ও সেই জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করিয়া সত্য আহরণ করেন ও সেই সত্যের প্রকাশ করেন—তাঁহারাই কবি। লেখক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই এই মৌলিক অর্থেই কবি।

লেখক ইহার পরে পৃথক পৃথক আলোচনায় 'স্বদেশী যুগকে' অবলম্বন করিয়া এই দুই কবির প্রতিভার প্রকাশ কি ভাবে ঘটিয়াছিল, উভয় কবির বাসনালোককে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, প্রেমের কবিরূপে উভয় কবির বৈশিষ্ট্য ও সাধর্ম্য কি, 'সাবিত্রী'র ধারণাটি শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মনে কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—এই সকল বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জাতীয় সমকালীন দুইটি বিরাট প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে কোনও তর-তম প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না, কবি-প্রতিভার বিচারে সে-জাতীয় আলোচনা সাধারণ

কবিগণের পক্ষেই সম্ভব। লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয়, উভয় কবির চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে যে সাধর্ম্য রহিয়াছে তাহাকেই পরিস্ফুট করিয়া তোলা এবং একই সত্যকে দুইটি বিরাট প্রতিভা কি ভাবে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন পাঠকের নিকটে তাহাকে পরিষ্কার করিয়া তোলা। একটি কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যস্বীকার্য যে এই দুই বিরাট প্রতিভার ধ্যান-মনন-অনুভূতির মধ্যে গভীর সাধর্ম্য ছিল এবং এই সাধর্ম্যই পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় কবির মানস-সংগঠনের মধ্যে যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্যও ছিল এ কথাটিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। লেখক নিজেও তাহা অস্বীকার করেন নাই; তবে এই গ্রন্থের রচনায় লেখকের দৃষ্টি এই সাধর্ম্যের প্রতি যেভাবে নিবদ্ধ ছিল মানস-সংগঠনের পার্থক্যের দিকে সেরূপ ছিল না; ফলে সেই পার্থক্যের আলোচনা অনেকখানি বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত রহিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে লেখক সম্বন্ধে যে কথাটি প্রধান ভাবে মনে হয় তাহা এই যে, দুই বিরাট প্রতিভাকে নিজে গভীরভাবে অনুধাবন না করিতে পারিলে কোনও লেখক এই-জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। তদুপরি ভারতবর্ষের আদর্শ ও ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সে সম্বন্ধে দৃঢ়বদ্ধ এবং অকৃত্রিম একটা শ্রদ্ধা এই দুই কবির আলোচনায় লেখককে একটি বিশেষ অধিকার দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবধার মধ্যে যাঁহারা গভীরভাবে প্রবেশ করিতে চান এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগকে আলো ও আনন্দ উভয়ই দান করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

যদি গদি পাই : শ্রীকুমারেশ ঘোষ। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা-৩৭। আড়াই টাকা।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ প্রণীত 'যদি গদি পাই' পড়ে খুবই আনন্দিত হলাম। এই ছোট ছোট নিবন্ধগুলিতে শ্রীমান্ কুমারেশ শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের সঙ্গে প্রসন্ন হাস্য-রসের যে অপরূপ মিলন ঘটিয়েছেন তা সাহিত্যের আসরে অভিনন্দনযোগ্য। রসোত্তীর্ণ সার্থক ব্যঙ্গরচনা যে রসের ফোয়ারা সৃষ্টি করে, তার মূলে থাকে গোপন অশ্রুর ফল্গুধারা। এই রচনাগুলিতে সে ফল্গুধারার সন্ধান রসিক পাঠক-পাঠিকারা পাবেন। সামাজিক এবং চারিত্রিক যেসব ত্রুটি দেখে আমাদের কাঁদা উচিত সেই-সব ত্রুটিই এই রচনাগুলিতে আমাদের হাসিয়েছে। হাসাতে হাসাতেই জানিয়ে দিয়েছে আমাদের স্বরূপ কী। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

বনফুল

সামান্য ক্ষতি : শ্রীঅমূল্যকুমার চক্রবর্তী। দিশারী প্রকাশনী, ৫২ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

বাংলা দেশের যে অগণ্য সাধারণ দেশকর্মী নীরবে অখ্যাতির অন্ধকারে থেকে দেশের সেবা করে এসেছেন, স্বদেশ-মুক্তির সাধনাই জীবনের একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে এই কৃত্রিম দেশবিভাগকে সহজে মেনে নেওয়াটা সম্ভব হয় নি। হয় নি এইজন্যেই যে তাঁরা সেই-সব নেতা নন, যাঁদের একমাত্র আশ্রয় বক্তৃতামঞ্চ, ক্ষমতার নির্বিচার লিপ্সায় যাঁদের দৃষ্টি অন্ধ, শ্রবণ বধির; তাঁরা সাধারণ লোক, মাটির মানুষের কাছাকাছি তাঁদের বাস। আর তাই, সাধারণ দেশবাসীর ব্যথাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার ক্ষমতা তাঁরা তথাকথিত নেতাদের মত হারিয়ে ফেলেন নি। ক্ষমতার-সিংহাসনে সমাসীন তোগলক যাঁদের কাছে যা 'সামান্য ক্ষতি', সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে তা যে কত বড় কত ভয়ঙ্কর, সে-কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছেন এই অখ্যাত নীরব স্বদেশ-প্রেমিকেরা।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার চক্রবর্তীও উপরোক্ত জাতের জনৈক স্বদেশপ্রেমিক এবং দেশ-বিভাগজনিত তাঁর হৃদয়বেদনার প্রকাশ এই উপন্যাস: 'সামান্য ক্ষতি'। পূর্ব বাঙলার একটি গ্রাম ভেঙে যাওয়ার কাহিনীই বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এ গ্রন্থের নায়ক আদর্শবাদী স্বদেশপ্রেমিক দীপেশ শত চেষ্টাতেও সে ভাঙন রোধ করতে পারে নি। তার জীবনে প্রেম নিয়ে এসেছে বিনীতা। কিন্তু তাকেও সে স্বদেশের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তবুও ইতিহাসের গতি রুদ্ধ হয় নি, তার নির্মম চাকা চলে গেছে সহস্র জীবনকে দলে পিষে। সেই চক্রে পিষ্ট জীবনেরই আর্তনাদ শোনা গেছে এই গ্রন্থে।

লেখকের কাহিনী-বয়নে ভাষায় ভঙ্গীতে সর্বত্র একটি আন্‌সোফিসটিকেটেড (unsophisticated) মনের স্পর্শ পেয়েছি আমি। এবং সে স্পর্শ আমাকে এক ধরনের আনন্দই দিয়েছে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাদেরও দেবে।

দেবব্রত ভৌমিক

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮